সংস্কৃত

ঈদ সংখ্যা ২০২৫

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

AY 25-26

Haileybury Bhaluka

Now in Bangladesh

160 years of British educational heritage

Home away from home

COBIS | Council of British International Schools

- Bangladesh's highest academically achieving school brand.
- 62% of Haileybury UK students joined the Ivy League & Russell Group universities in 2023-24.
- All teachers - Harvard-certified.
- Breathe cleaner, live healthier.
- Extend, Explore, Excite.
- Peace of mind for parents - state-of-the-art safety & security measures.

Bangladesh Safeguarding Alliance for Educators

Cambridge Assessment International Education

bsa | Boarding Schools' Association

ib Global top 2%

Ranked #1 The Sunday Times

tes

ADMISSIONS NOW OPEN

Grades 6-9

+88 01321 155 000-2

www.haileybury.com.bd

TOYOTA Navana Limited

TOYOTA Genuine Service

TOYOTA | Navana Limited

REVAMPED @Chattogram

MEET US HERE!

RENEWED & READY

Navana Limited Service Center at
P.C. Road Shoraipara,Pahartoli, Chattogram

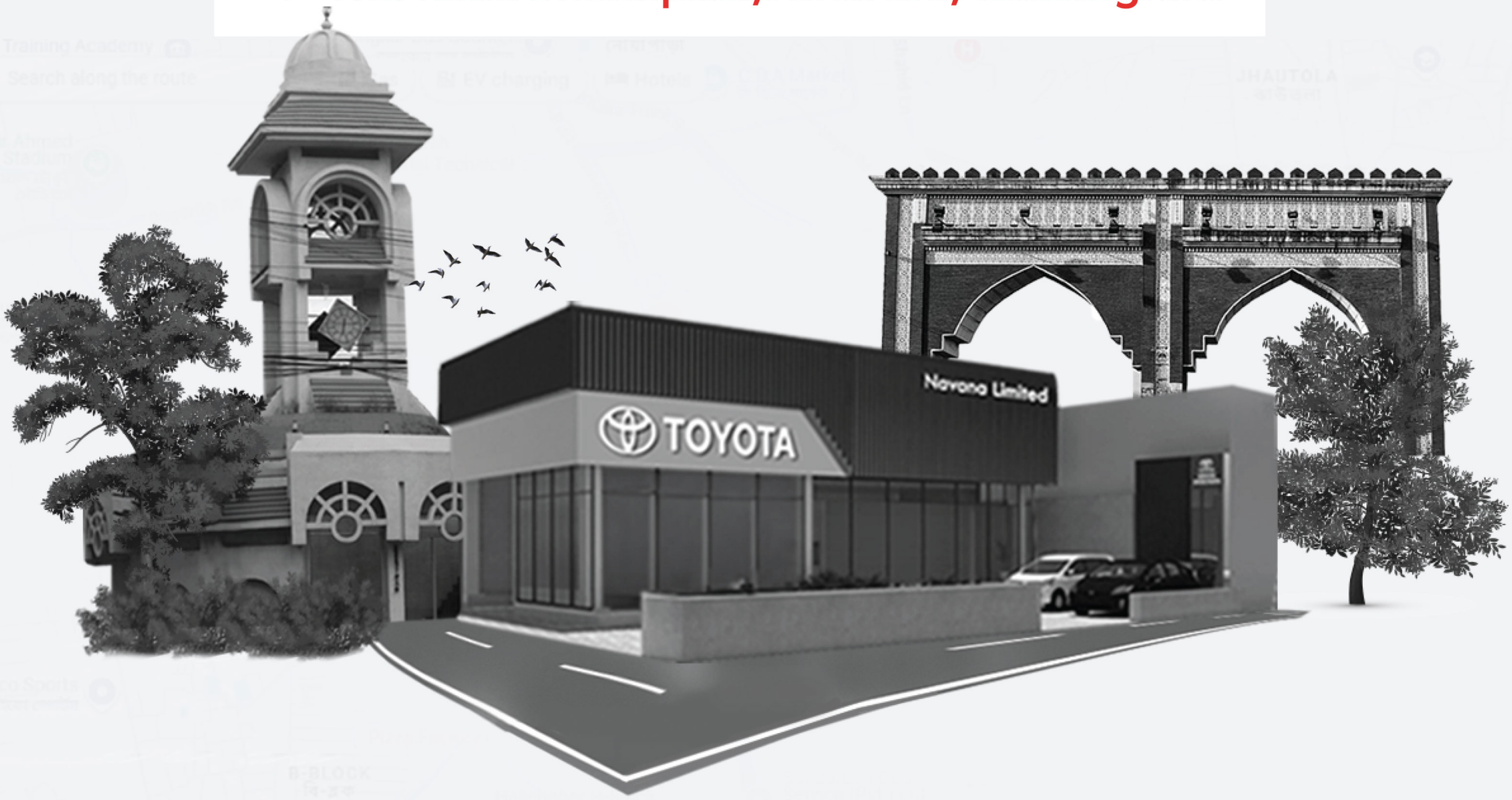

SCAN TO KNOW MORE

toyota.com.bd toyota.com.bd

Navana Toyota 3S Center.
205-207 TEJGAON I/A, DHAKA-1208

Navana Toyota 2S Center.
342 Tejgaon I/A, Dhaka-1208

Navana Toyota Service Center Limited, Uttara.
Road# 06, Sector# 09, Uttara, Dhaka-1230

Genuine Parts

TOYOTA GENUINE MOTOR OIL
ENSURES SUPERIOR ENGINE EFFICIENCY

TOYOTA AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Hotline
16720

Celebrating 50+ YEARS of Friendship

IFIC

সেবায় সাফল্যে আস্থায়

আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই একাউন্ট একটাই

- আকর্ষণীয় রেটে **দৈনিক মুনাফা** পাওয়া যায়।
- **চার্জ ফ্রি*** লেনদেন করা যায়, যত খুশি!
- সারাদেশে **১৪০০০+** এটিএম থেকে বিনা খরচে টাকা তোলার সুযোগ।
- আইএফআইসি আমার কার্ড দিয়ে **দেশে-বিদেশে** লেনদেন করা যায়।

বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন

থাকুন, দেশের সেরা একাউন্টের সাথে

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫ IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

KONKA

happy থাকুন

Electro Mart Limited

Trade International Industries Ltd.

16649

সারা বিশ্বে শতাধিক দেশ খাবার রাখছে গার্ডেন ফ্রেশ

সারা বিশ্বে ১৬৪টিরও
বেশি দেশে সমাদৃত।

CFC free
R600a Gas

Compressor
Replacement
10 YEARS
WARRANTY

SS POWER I

বণিক বার্তা

সিক্করুট

ঈদ সংখ্যা ২০২৫

সম্পাদক
দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

ঈদ সংখ্যা পরিকল্পনা ও সমন্বয়
শানজিদ অর্ণব

শিল্প নির্দেশনা
শতাব্দী জাহিদ

অলংকরণ
ফারজানা রহমান ববি, দিপিকা দাশ
মিজান স্বপন

প্রচ্ছদ
হৃদ্যতা, অ্যাক্রিলিক ও ক্রেয়ন
শিল্পী : **মোস্তাফিজ কারিগর**, ২০১৯

ক্রিয়েটিভ লিড
মোজাব্বীর হাসান

বিজনেস ডেভেলপমেন্ট
মঞ্জুর হোসাইন
মো. মনিরুজ্জামান মৃদুল
মো. ওমর ফারুক
সাঈদ উদ্দিন আহমেদ রনি
মো. রকিবুল আলম
মো. মোস্তাফিজুর রহমান
মো. ছাঈদুর রহমান
আবু সালেহ
শহীদুল ইসলাম রোমেল

বিলিং, কালেকশন অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স
মো. আমিনুল ইসলাম

সার্কুলেশন
মো. আবুল কালাম আজাদ

প্রডাকশন
মো. আবদুল বারিক

গ্রাফিকস
মো. শাহ আলম, হামিদুল হক বাপ্পী

সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ কর্তৃক
বিজবাংলা মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭)
১২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত।
পিএবিএক্স : ০২ ৫৫০১৪৩০১-০৬
ওয়েব : www.bonikbarta.com

দাম : ২৫০ টাকা

নতুন এক রাজনৈতিক-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ। অনুপ্রেরণা যেমন আছে, তেমনি আছে দুশ্চিন্তাও। সংস্কৃতির নিজস্বতাকে নিয়ে লড়াইয়ের বিপরীতে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া বা আরোপিত সংস্কৃতির চাপও আছে। তবে সবকিছুর কেন্দ্রে আছে এ দেশের মাটি আর মানুষ, যা বাংলাদেশের নিজস্ব প্রেরণা।

রমজান মাস পূর্ণতার পথে। ক'দিন বাদেই ঈদ উৎসব। উৎসবকে ঘিরে সব গণমাধ্যমের চেষ্টা থাকে পাঠককে নতুন কিছু উপহার দেয়ার। *বণিক বার্তা* ২০১৬ সাল থেকে পাঠকের জন্য প্রকাশ করছে 'সিক্করুট ঈদ সংখ্যা'। সবার যখন জোর থাকে ফিকশনে, তখন সিক্করুট নন-ফিকশনের আয়োজনকে অনন্য রূপ দেয়ার চেষ্টা করছে। এবারো সে চেষ্টার কোনো ব্যত্যয় হয়নি। পাঠকও আমাদের আয়োজন নিয়ে সচেতন। তবে সঙ্গে থাকে খ্যাতনামা ও তরুণ লেখকদের গল্প-উপন্যাস-নভেলা। সব মিলিয়ে 'সিক্করুট ঈদ সংখ্যা' লেখার বিষয়বৈচিত্র্য, গভীরতা ও মানে পাঠকের দৃষ্টি কেড়েছে।

সিক্করুট ঈদ সংখ্যা ২০২৫-এ আছে ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য, জুলাই অভ্যুত্থান, ভাষা, সংগীত, অ্যান্টিক সংগ্রহ, ভ্রমণ, চলচ্চিত্র, দুর্লভ গ্রন্থ-পত্রিকার মতো বিভিন্ন বিষয়ে চিত্তাকর্ষক রচনা। জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে ফিকশন ও নিবন্ধ পাঠকের মনোযোগ কাড়বে। আমাদের বিশ্বাস, এ সংখ্যার অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও ফিচার পাঠক আনন্দ নিয়ে পড়বেন আবার আলোচনা ও তর্কে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করবেন। গল্প, উপন্যাস ও নভেলায় প্রবীণ ও নবীন লেখকদের উপস্থিতি পাঠকের পাঠ অভিজ্ঞতাকে বৈচিত্র্যময় করবে। নন-ফিকশনে থাকছে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চা ও পাঠ নিয়ে দরকারি আলাপ, আছে সমকালীন রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক, মধ্যযুগের ইতিহাস প্রবাহ। ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় মানচিত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের উপস্থিতি কিংবা চট্টগ্রামে উনিশ শতকের বন্যার বিবরণের পুঁথি পাঠককে বিস্মিত করবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও মুসলিম সমাজের অবস্থা নিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তৎকালের পূর্ববঙ্গের এক সন্তান। আবার একালে দেশের প্রথম প্রজন্মের কয়েকজন উদ্যোক্তা স্মরণ করেছেন তাদের পথপ্রদর্শক পিতাদের। এ রকম আরো অনেক সমৃদ্ধ লেখা পাঠককে মুগ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ঝকঝকে ছাপায় প্রাসঙ্গিক ও চিরায়ত চিত্তাকর্ষক, কৌতূহলোদ্দীপক বিভিন্ন লেখায় সমৃদ্ধ 'সিক্করুট ঈদ সংখ্যা' এবারো পাঠককে মুগ্ধ করবে এবং ঈদের অবসরে তাদের সঙ্গী হবে—এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সবাইকে ঈদ মোবারক!

স্বপ্নে

সেই ৫%

ভ্যাট

আর

নেই

লংকাবাংলা™
সিকিউরিটিজ
iBroker
অনলাইনে
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ
TradeXpress
ট্রেডিং-এ স্বাচ্ছন্দ্য
LankaBangla
FINANCIAL
PORTAL
বিনিয়োগ নির্দেশিকা
মুঠোফোনে
পুঁজিবাজার
Growing Together...
www.lbsbd.com

Danish
Florida Orange
BISCUITS
ড্যানিশ®
ফ্লোরিডা অরেঞ্জ
বিস্কুট
তাজা কমলালেবুর স্বাদে!
/floridaorangebiscuits

উ প ন্যা স

অ্যামেথিস্ট
ফয়জুল লতিফ চৌধুরী
৮৪

শয়নং হট্টমন্দির
নিয়াজ মেহেদী
১৫২

ন ভে লা

দুই পৃথিবীর সূর্য
সাব্বির জাদিদ
৩৪

থ্রি লা র

মীর বহরের খুন
মাহমুদুর রহমান
২২৮

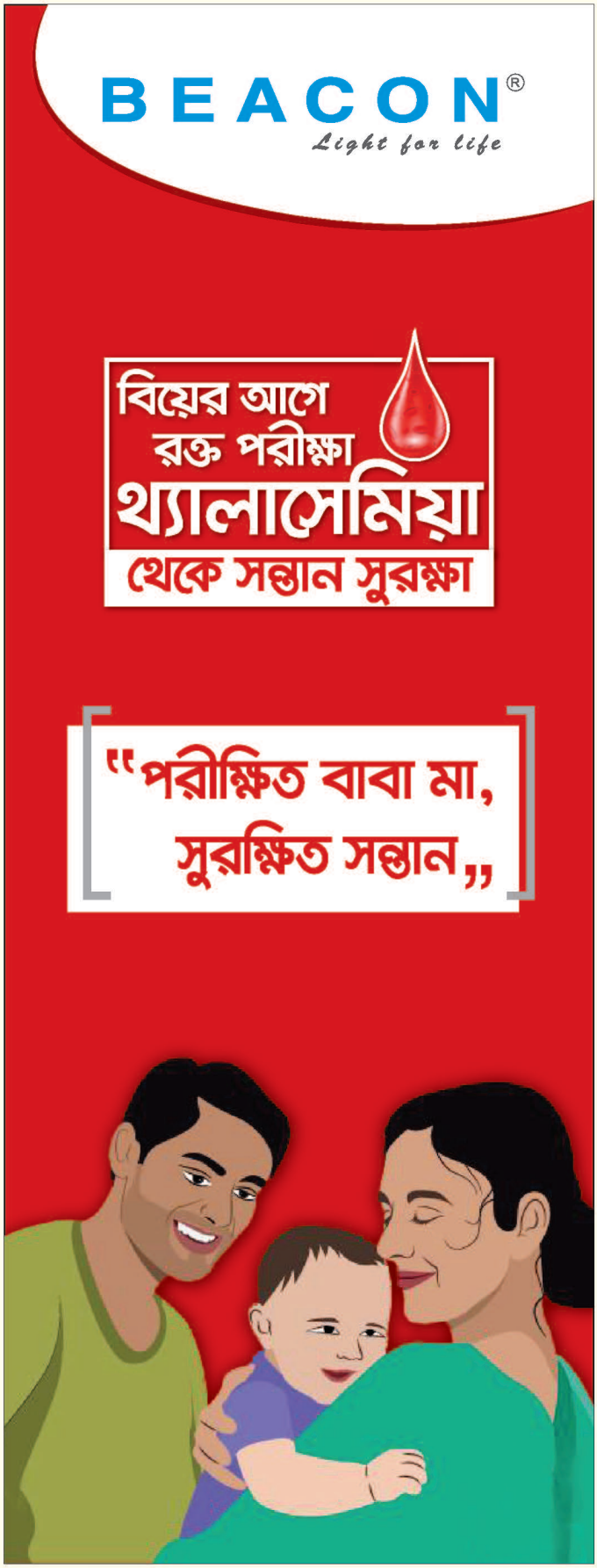

নগদ
ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন

নগদ লেনদেনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দারুণ গিফট

এছাড়া ঈদের কেনাকাটায় নগদ পেমেন্টে থাকছে ৳৩০০ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক

বিস্তারিত: nagad.com.bd

*শর্ত প্রযোজ্য

ব ড় গ ল্প

বাবলি
ফয়জুল ইসলাম
১২৬

গ ল্প

ডায়নোসর
হাসনাত আবদুল হাই
২৫৭

বিভ্রম
মঞ্জু সরকার
৭৪

আক্কেল আলীর গল্পের নায়িকা যেভাবে পালিয়ে বেড়ান । সাখাওয়াত টিপু
১৭৭

দুজন
তানজিনা হোসেন
৩০৭

জুঁই
মাল্টি-ভিটামিন অয়েল

চুলের ভিটামিন

জুঁই মাল্টি-ভিটামিন অয়েল

চুলের সব সমস্যার সমাধান

চুল পড়া কমায়
মাল্টি-ভিটামিন
কোকোনাট অয়েল

নতুন চুল গজায়
মাল্টি-ভিটামিন
অনিয়ন অয়েল

সুরভিত
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল
মাল্টি-ভিটামিন
বেলি অয়েল

স্বয়ার পণ্য দেশের জন্য

SUN/JUI/2025

গল্প

যখন জম্বি নামে
ফজলুল কবিরী
১১৫

অগোচর
নাহার মনিকা
১৪৬

সাদা হাতি
মোস্তাফিজ কারিগর
৩২৭

লেখকের আঙুল ফুঁড়ে
কিষী তাহ্‌নিন
২৬৬

মলিন বিকাল
সুহান রিজওয়ান
১১১

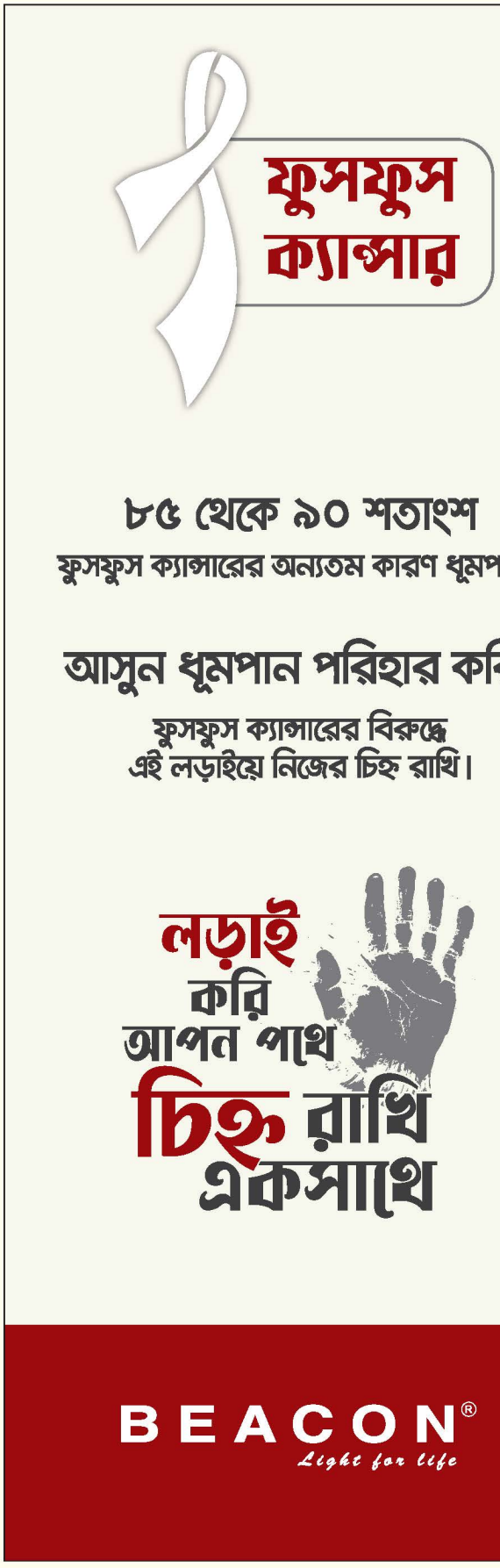

NORTH SOUTH UNIVERSITY

Center of Excellence in Higher Education

NSU Joint 1st in Bangladesh THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2025

GRADUATE ADMISSIONS

SUMMER 2025

GRADUATE PROGRAMS

- Master of Business Administration (MBA)
- Executive Master of Business Administration (EMBA)
- MS in Economics
- Master in Development Studies (MDS)
- MS in CSE
- MS in EEE
- MA in English (Linguistics, Literature, TESOL)
- MS in Biotechnology (MSBTEC)
- MA in History and Asian Studies
- M.Sc. in Civil Engineering
- MPharm in Pharmacology & Clinical Pharmacy
- MPharm in Pharmaceutical Technology & Biopharmaceutics
- MS in Environmental Science and Managment
- Master in Public Health (MPH)
- Executive Master of Public Health (EMPH)
- Master of Laws (LL.M.)
- Executive Master in Policy and Governance (EMPG)
- Master of Science in Applied Mathematics and Computational Science (AMCS)

Application Deadline
April 16, 2025
Admission Test Date
April 18, 2025

Apply online
Website: apply.northsouth.edu

3 scholarships for each program based on admission test
One 50% and Two 25%

Tel: +880 2 55688200 Ext 1062 ,6463 ,6777 Email: graduate.admissions@northsouth.edu Room no: NAC 646, NSU

গল্প

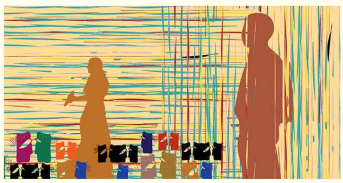

গাও
এনামুল রেজা
২৮৩

যখন সন্ধ্যা নেমেছিল
পিওনা আফরোজ
১৭৪

প্রত্নতত্ত্ব - ইতিহাস

ইতিহাসের পাদপ্রদীপে বাংলাদেশ; স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র ধারায় গড়ে ওঠা জনপদ
ড. মিজানুর রহমান
১৮৮

ইতিহাস চর্চায় 'বাংলার মধ্যযুগ'
ড. শহিদুল হাসান
২১২

গ্রামবাংলার ইতিহাস
খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার
৩০০

অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা
একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল রোগ

স্থূলতার ফলে শরীরে মারাত্মক রোগব্যাধি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন-

উচ্চ রক্তচাপ
হৃদরোগ
স্ট্রোক
ডায়াবেটিস
লিভারের রোগ
অস্থিসন্ধির রোগ
বন্ধ্যাত্ব
ক্যান্সার

আর নয় অবহেলা,
ওজন কমান- সুস্থ থাকুন

ওজন নিয়ন্ত্রণে
ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের
পরামর্শ নিন

BEACON®
Light for life

Keya Cosmetics Ltd.

Kleeno

DISH WASH

তেল-চর্বি তো যাবেই
সাথে জীবাণুও!

জীবাণুমুক্ত করে

সহজে ঝকঝকে পরিষ্কার

গলে কম তাই অধিক সাশ্রয়ী

প্র ত্ন ত ত্ত্ব - ই তি হা স

রহস্যময় মানচিত্র
ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ার ১৫০২
হারুন রশীদ
২৬

'বড় তুফানের কবিতা' পুঁথিতে
উনিশ শতকে চট্টগ্রামের বন্যা
মো. মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ
৩২১

রা জ নী তি

সহিংসতা, পরিচয় ও ক্রান্তিকালীন
ইনসাফের সন্ধানে | সহুল আহমদ
৫৬

পো স্ট ক লো নি য়া ল পা ঠ

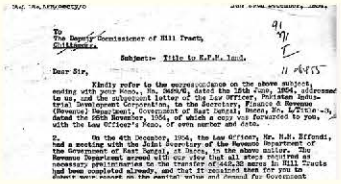

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে
আদিবাসী ও বাঙালি সম্পর্ক
আজিজুল রাসেল
২০৪

ব্য ক্তি ত্ব

মালেক বিন নবি ও মুসলিম
সভ্যতার পুনর্পাঠ | আহমেদ দীন রুমি
৩৪০

"DEVOTED TO INNOVATION
COMMITTED TO QUALITY"

Introduced
IMMUNOTHERAPY,
the latest innovation in
cancer treatment, since 2021

NIVOMAB
Nivolumab Injection

PEMRO
Pembrolizumab INN

BEACON®
Light for life

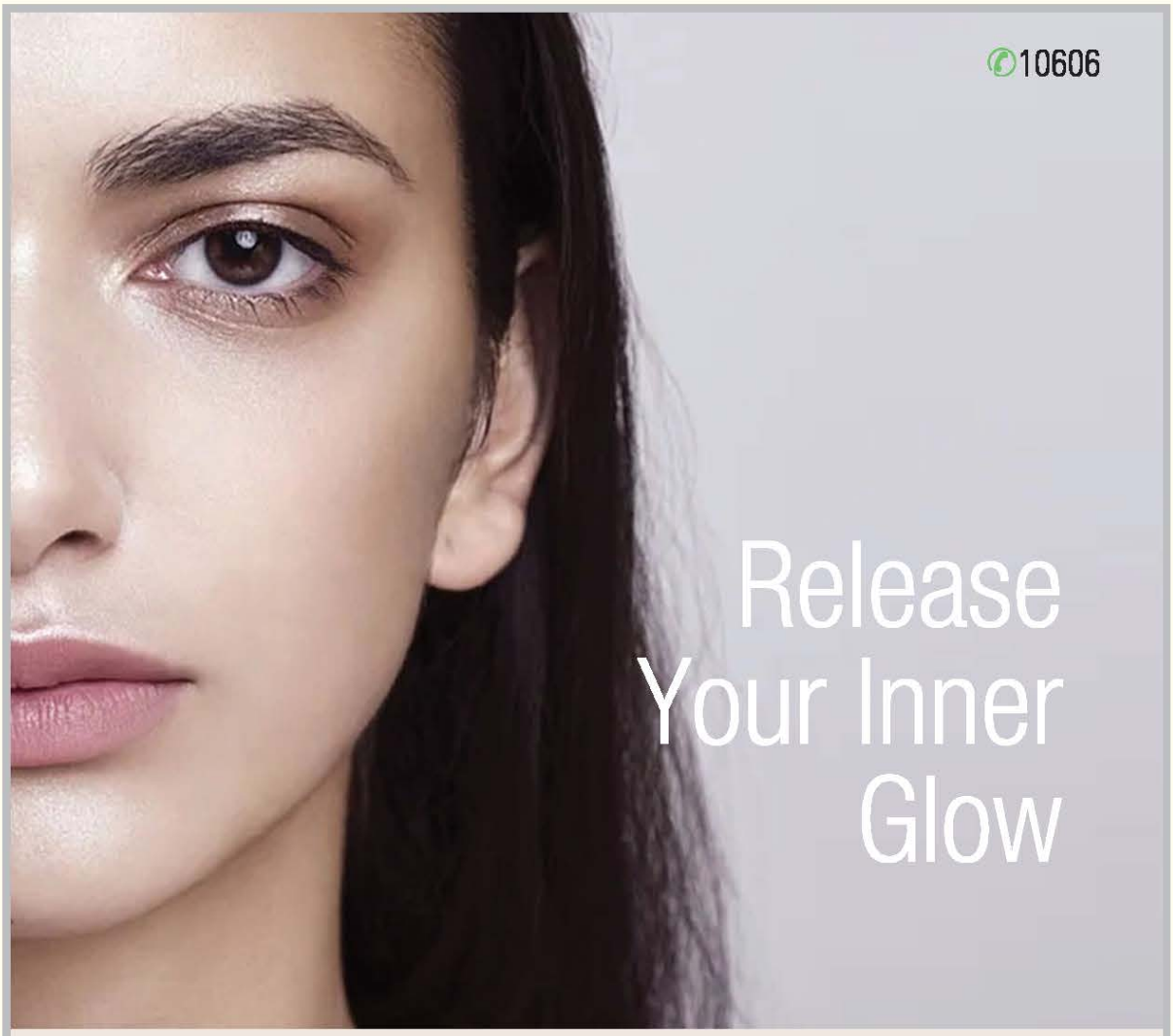

Labaid Aesthetic & Laser Lounge
...sculpting inner beauty

আপনি কি ত্বকের সমস্যা ও উজ্জ্বলতা নিয়ে ভাবছেন?

আপনার ত্বকের পরিপূর্ণ চিকিৎসায়

ল্যাবএইড এস্থেটিক এন্ড লেজার লাউঞ্জ

ল্যাবএইড এস্থেটিক এন্ড লেজার লাউঞ্জে রয়েছে বিশেষজ্ঞ ডার্মাটোলজিস্ট ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি যার সমন্বয়ে ত্বকের পরিপূর্ণ চিকিৎসা, উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় খুব সহজেই।

ল্যাবএইড এস্থেটিক এন্ড লেজার লাউঞ্জ
ল্যাবএইড আইকনিক, বাড়ি ৬৬ (১০ম তলা)
কলাবাগান, ঢাকা ১২০৫

017 6666 1111

- অবাঞ্ছিত লোম অপসারণ
- এডভান্সড হায়ড্রা ফেসিয়াল
- ব্রণ/ব্রণের দাগ ও গর্ত
- কেমিক্যাল পিল
- মেসতা / ত্বকের রঙের অসামঞ্জস্যতা
- ডারমাব্রেশন
- কার্বন লেজার
- পিআরপি (চুল+ত্বক)
- শ্বেতরোগ
- তিল/ আঁচিল/ ট্যাটু/ জন্মদাগ অপসারণ
- হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট
- বোটক্স
- ফিলার
- থ্রেড লিফট
- হাত-পা ঘামা
- বার্ধক্যভাব
- ব্রাইটেনিং/হোয়াইটেনিং

বাবার স্মৃতি

বেড়াতে গিয়ে খাবার নিয়ে বাছাবাছি করলে বাবার ধমক খেতে হতো
তপন চৌধুরী
২৪৭

বাবা আমার জীবনের লাইটহাউজ
এএসএম মাইনউদ্দিন মোনেম
২৪৯

বাবা ছিলেন আমার বেস্ট মেন্টর
আহসান খান চৌধুরী
২৫২

ভ্রমণ গদ্য

কাশ্মীরের মোগল বাগিচা
ফারুক মঈনউদ্দীন
২৭৫

পূর্ণ জীবনে
শূন্যতা
না আসুক

স্তন
ক্যান্সার

প্রতিরোধে নিয়মিত
স্ক্রিনিং করুন

আপনার প্রিয়জনের সাথে থাকুন . . .

BEACON®
Light for life

UNITED INTERNATIONAL UNIVERSITY

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

THE IMPACT RANKINGS

ACCA ACCREDITED

ADMISSION
SUMMER 2025

ACBSP ACCREDITED

IEB ACCREDITED

Apply Online **admission.uiu.ac.bd**

Admission Test: April 25, 2025

Application Deadline: April 23, 2025

Degrees Offered

BBA || BBA in AIS || BS in Economics || BSc in CSE
BSc in Data Science || BSc in EEE || BSc in Civil Engineering
BA in English || BSS in Media Studies & Journalism
BSS in Environment and Development Studies || B.Pharm
BS in Biotechnology & Genetic Engineering
MBA || EMBA || MSc in CSE || MS in Economics || MDS

Result Based **25% to 100%** Scholarship in every semester

Transports from major locations of **Dhaka city**

Strong line up with **70+** full time Ph.D faculty members

100% Tuition fee waiver for meritorious and financialy insolvent students

For detail of tuition waiver and scholarship policy please scan:

United City, Madani Avenue, Dhaka-1212
01759039451, 01759039465, 01759039498, 01914001470
09604-848 848 (Ext - 1301 - 5)
www.uiu.ac.bd /uiuinfo

ভাষা ও সাহিত্য

নদীকে তবু চেনা হলো না
প্রশান্ত মৃধা
১৯৩

সাহিত্যের (নতুন) রাজনীতি
মিগেল আনহেল পালমা বেনিতেজ
ভাষান্তর : নাহার তৃণা
৬৩

দুর্লভ

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান
আব্দুল হান্নান চৌধূরী
২২০

ছায়াবীথি
(কলকাতা, ১৩৪০-৪৩)
ইসরাইল খান
৬৫

সংগ্রাহক

মোহাম্মদ আজিম বখ্‌শ : পুরান ঢাকার হারিয়ে যাওয়া নিদর্শনের সংগ্রাহক
জান্নাতে নাঈম
৩৩৫

শিল্পকলা

জুলাই গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্রের গল্প
বজলুর রশিদ শাওন
৭৯

ফ্যাটি লিভার একটি নীরব ঘাতক

বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক ফ্যাটি লিভার রোগে আক্রান্ত

ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধে করনীয়

- প্রতিদিন কমপক্ষে আধা ঘন্টা শরীর চর্চা
- সুষম খাদ্য গ্রহন
- নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত ঘুম
- সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহন

BEACON®
Light for life

AMERICAN INTERNATIONAL UNIVERSITY-BANGLADESH

where leaders are created

Arts and Social Sciences

Business Administration

Engineering

Health and Life Sciences

Science and Technology

Become the **leader** you are meant to be

Join us today!

408/1 (Old KA 66/1), Kuratoli, Khilkhet, Dhaka-1229, Bangladesh
+88 02 841 4046-9, 841 4050, Ext: 201, 202
+88 018 4411 5000; 018 8656 6666; 018 4451 5912,
admission@aiub.edu

Apply online:
admission.aiub.edu

www.aiub.edu

where leaders are created **AIUB**

সং গী ত

জিম মরিসন : জীবন-মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে
ড. এস এম সাইফুল ইসলাম
১৮১

প্রতিবাদের গান, সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে : প্রেক্ষিত চব্বিশের জুলাই
হুমায়ূন আজম রেওয়াজ
২৯০

সৃষ্টির অর্ধশতাব্দী পরও জনপ্রিয় যে বাংলা গানগুলো । অহিদুর রহমান
৩১২

অ নু বা দ গ ল্প

নাকফুল
বীনা শাহ । অনুবাদ : ফজল হাসান
৬৯

ফ্যা শ ন ই তি হা স

ইনফিনিটি : দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ, সফলতা ও সম্ভাবনার সঙ্গী
নাইমুল হক
৩৪৬

চ ল চ্চি ত্র

সুপারহিরোর রমরমা দুনিয়ায় টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির প্রভাব
ওয়াহিদ সুজন
২৯৬

বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের গল্প ১২০

বাংলাদেশের আঞ্চলিক খাবার ৩৫৩

**সিল্করুট ঈদ সংখ্যা ২০২৫* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল লেখা লেখকের নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন। এর সঙ্গে *বণিক বার্তার* সম্পাদকীয় নীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

কোলোরেক্টাল ক্যান্সার

প্রতি 20 জনে ১ জন কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে

বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর
১.৯ মিলিয়ন এর বেশি
মানুষ কোলোরেক্টাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে*
*Globocan 2022

তাই আর দেরি নয়
নয় কোন ভয়, প্রাথমিক স্ক্রিনিং-এ
হবে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের পরাজয়

BEACON®
Light for life

Uttara University

Excellence in Higher Education and Research

CLASS ROOMS 280+	LABS 75+	FACULTY MEMBERS 800+	WORLDWIDE ALUMNI 38K+	SPECIAL SCHOLARSHIP FOR FEMALE 5%	SCHOOLS 5	LINKAGES 75+	STUDY LOAN PARTNERSHIP WITH BANK ASIA
TOTAL PROGRAMS 40	DEPARTMENTS 14	PHD FACULTY MEMBERS 90	CLUBS 50+	STUDENTS ENJOYING FINANCIAL ASSISTANCE 8K+	STUDENT STRENGTH 14K+	DUAL SEMESTER OBE	INDUSTRY RELEVANT CURRICULUM

ADMISSION OPEN

Summer 2025

www.uttara.ac.bd

Permanent Campus:
Holding 77, Beribadh Road, Turag, Uttara, Dhaka 1230
Helpline: 01872607360-69
info@uttara.ac.bd

Contact Us:

STATE UNIVERSITY OF BANGLADESH
join the trendsetter

16665

ADMISSION GOING ON

Our Departments

Architecture | Business | CSE | English | Environmental Science | Law
Food Engineering & Nutrition Science | Pharmacy | Public Health
Journalism, Communication and Media Studies

- **Internship & Job Placement Support**
- **15000+ Alumni Network**
- **Smart Classrooms and Labs**
- **Hostel and Transport Facilities**
- **Strong Industry Academia Linkage**

Join a university that inspires, innovates, and transforms!

fb.com/subedubd www.sub.ac.bd South Purbachal, Dhaka

International Collaboration

WESTERN SYDNEY UNIVERSITY · UNIVERSITY OF ÉVORA · GNU Gyeongsang National University · BRITISH COUNCIL · HRAY · unisza

Accredited

THE IMPACT RANKINGS 2024

রহস্যময় মানচিত্র
ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ার ১৫০২

হারুন রশীদ

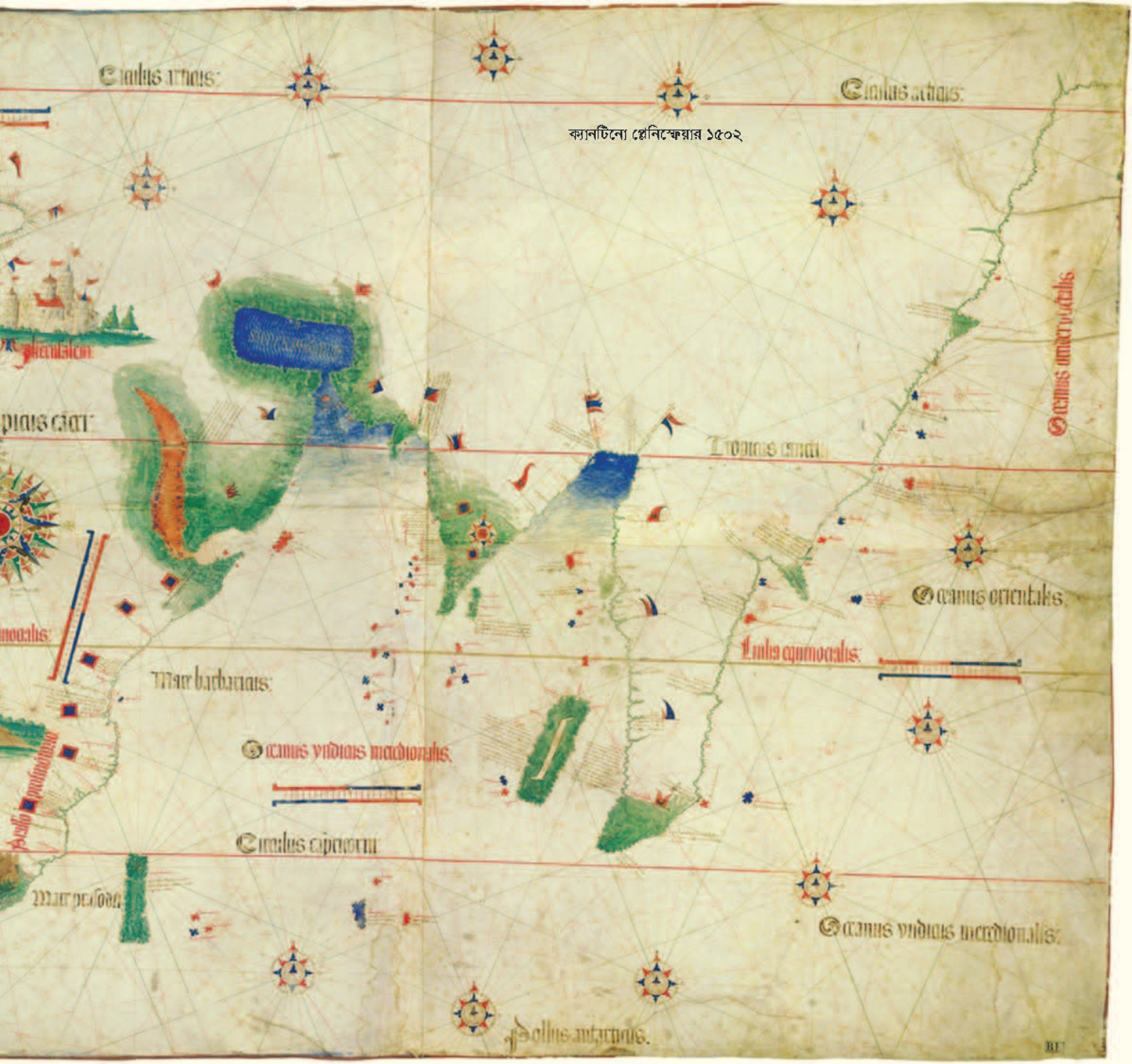

ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ার ১৫০২

নতুন পৃথিবীর অচেনা ভূগোল

পৃথিবীর সবটুকু ভূখণ্ড আবিষ্কার হওয়ার বহুকাল আগ থেকে মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করে গেছে প্রাচীন যুগের মানুষ টলেমির সময় থেকে হিসেব করলেও সে চেষ্টার বয়স প্রায় দুই হাজার বছর দুই হাজার বছর ধরে দুনিয়াজুড়ে বহু মানচিত্র আঁকা হয়েছে, বহু মানচিত্র হারিয়ে গেছে কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভূগোল আসেনি কোনো মানচিত্রে আধুনিক মানচিত্র যুগের সূচনা হয়েছিল ইউরোপে, কলম্বাস ও ভাস্কো-দা-গামার অভিযানের পর এমনকি তখনো পৃথিবীর সব ভূখণ্ড উন্মোচন হয়নি

মানচিত্র ব্যাপারটা এ যুগে সর্বজনীন জ্ঞানের অংশ হলেও ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল রাষ্ট্রীয় গোপনীয় ব্যাপার বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য বিশ্বজুড়ে সমুদ্র অভিযান চালিয়ে যেসব তথ্য পাওয়া যেত সেগুলো খুব গোপনে সংরক্ষণ করা হতো ইউরোপিয়ানদের কাছে এশিয়ার সমুদ্রপথের মানচিত্র ছিল আলাদীনের চেরাগের মতো এ চেরাগ যার হাতে থাকবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাণিজ্য তার নাগালেই থাকতে পারে তাই মানচিত্র ছিল গুপ্ত রহস্যের মতো একটা বিষয়

১৪৯২ সালে কলম্বাসের অভিযানের পর থেকে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল সেটা ১৪৯৪ সালে তরদেসিলাস (Tordesillas) চুক্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে প্রশমিত হয় তরদেসিলাস নামের একটা স্প্যানিশ শহরে সে চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল চুক্তিতে আটলান্টিক মহাসাগরকে ৪৬ ডিগ্রি অক্ষাংশে দাগ টেনে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল পশ্চিম ভাগ নিয়েছিল স্প্যানিশরা, পর্তুগিজদের দেয়া হয়েছিল পূর্বদিক এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ওই রেখার পশ্চিমে স্প্যানিশরা অভিযান চালাবে এবং আবিষ্কৃত ভূখণ্ডগুলো তাদের অধীনে থাকবে ওই রেখার পূর্বদিকে অভিযান চালাবে পর্তুগিজ জাহাজ এবং যেসব ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হবে সেগুলোর মালিক হবে পর্তুগাল

এ চুক্তির ফলে পর্তুগিজরা সাময়িকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল কারণ আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করার সম্ভাবনা

With Best Compliments Of

ALBION LABORATORIES LIMITED

Happiness through Healthy Living...

Manufacturer of Pharmaceutical Products

Corporate Office: Innovative Bhuiyan Orchid (Level 3 & 4) 1025/A,
Bayazid Bostami Road, East Nasirabad, Chittagong, Bangladesh.
Tel: +88 023 34451681-83, Email: info@albionbd.com
Factory: South Rahmatnagar Barbakunda, Sitakunda, Chittagong, Bangladesh

www.albionbd.com

TOUCHING LIVES
to the **Power of Cure**

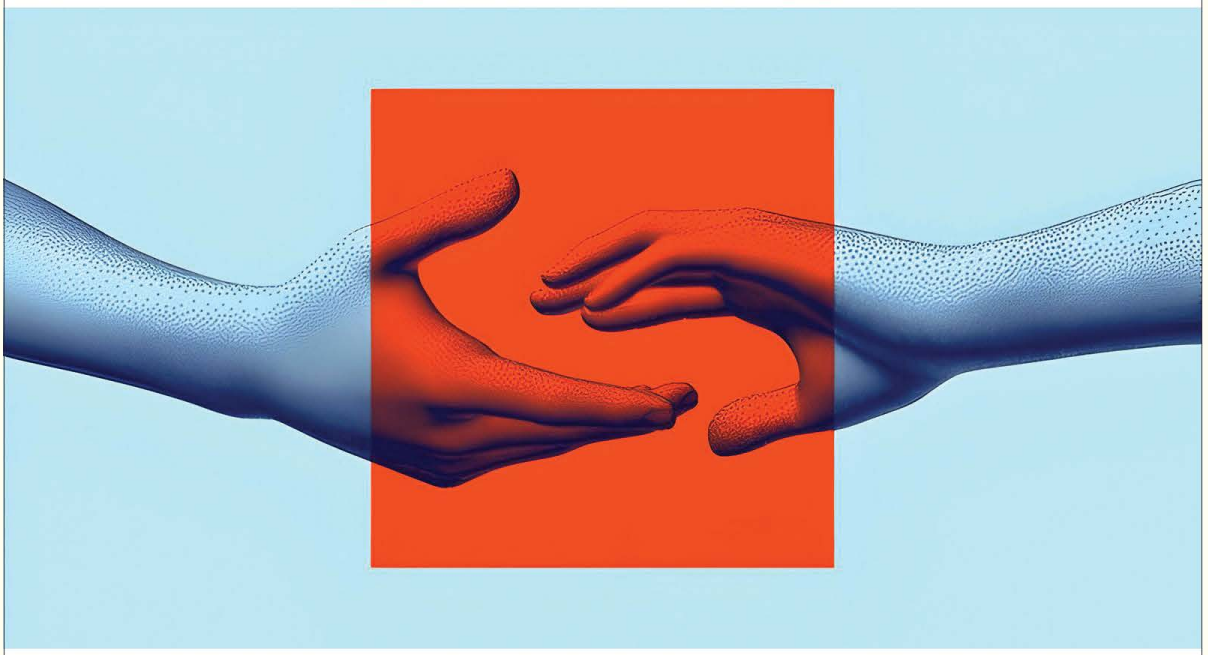

BEACON®

Light for life

ছিল না। কিন্তু মাত্র চার বছর পর ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে গেল যখন আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ভারত মহাসাগরের দেখা পেয়ে গেল ভাস্কো-দা-গামার জাহাজ। এ বিজয় পর্তুগিজদের জন্য বিপুল সমৃদ্ধির সুযোগ এনে হাজির করল। ভারতের সন্ধানে নেমে স্প্যানিশরা আমেরিকা মহাদেশের বিশাল ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছিল ঠিক। কিন্তু সে বিশাল ভূখণ্ডের চেয়ে ভারতের বাণিজ্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশি লোভনীয় ছিল।

ভাস্কো-দা-গামার অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যাত্রাপথের মানচিত্র। দুনিয়ার আর কারো কাছে সে পথের হদিস ছিল না। অন্য কারো হাতে যেন সে তথ্য না যায় সে ব্যাপারে পর্তুগিজরা খুব সতর্ক ছিল।

কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানের পর স্প্যানিশরা কিছু মানচিত্র এঁকেছিল। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে স্প্যানিশ নাবিক জুয়ান ডেলা কোসার আঁকা মানচিত্রটি সে রকম একটি উদাহরণ। তিনি কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানের সফরসঙ্গী ছিলেন। আবিষ্কারের যুগের প্রথম মানচিত্র হিসেবে দেখা হয় ওটাকে। কিন্তু ওই মানচিত্রটি তেমন কাজের ছিল না। অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল, মাপজোখও ঠিক ছিল না।

জুয়ান ডেলা কোসার আঁকা মানচিত্র ১৫০০, মাদ্রিদের নেভাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত

আধুনিক পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র

ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ও তথ্যবহুল মানচিত্রগুলো আঁকা হয়েছিল পর্তুগালে। কিন্তু রাজা ম্যানুয়ালের নিষেধাজ্ঞার কারণে মানচিত্রগুলো গোপন রাখা হয়েছিল। গোপনীয়তার ব্যাপারে এতই কড়াকড়ি ছিল যে আইন অমান্যকারীর মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছিল। ভাস্কো-দা-গামা ও তার পরবর্তীকালে যত অভিযান হয়েছে সব নথিপত্র সংরক্ষণ করা হতো পর্তুগালের রাজপ্রাসাদ রিবেইরা প্যালেসে (Ribeira Palace)। পৃথিবীর অনেক দুর্লভ নথিপত্র এ প্রাসাদে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ১৭৫৫ সালে পর্তুগালের ইতিহাসের ভয়ংকর ভূমিকম্পে প্রাসাদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ওই প্রাসাদে থাকা অমূল্য সব নথিপত্র চিরতরে হারিয়ে যায়।

সৌভাগ্যক্রমে সে যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র রক্ষা পেয়েছিল। কারণ পর্তুগাল থেকে সে মানচিত্রটি চুরি করে ইতালিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। La Carta del Cantino বা 'ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ার' নামের মানচিত্রটি এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় মানচিত্র হিসেবে খ্যাত হয়ে আছে। বলা যায় আবিষ্কারের যুগের প্রথম মানচিত্র।

ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হওয়া মানচিত্র যুগের সবচেয়ে আধুনিক ও বস্তুনিষ্ঠ এ মানচিত্র আঁকা হয়েছিল ১৫০১-০২ সালের কোনো একটা সময়ে। তখনো সম্পূর্ণ এশিয়া উন্মোচন হয়নি ইউরোপের কাছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আংশিক আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র। বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ গড়ে উঠতে তখনো বেশ কয়েক বছর বাকি। সে রকম একটা সময়ে বিশেষ যত্ন নিয়ে মানচিত্রটি আঁকা হয়েছিল পর্তুগালে। এ মানচিত্রে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ উন্মোচন হয়েছে। আবিষ্কারের যুগ থেকে পাওয়া মানচিত্রের মধ্যে এটি ছিল দ্বিতীয়।

মানচিত্রটি কে এঁকেছিল সেটা এখনো জানা যায়নি। শুধু জানা গেছে আলবার্তো ক্যানটিনো নামের এক ইতালিয়ান গুপ্তচর পর্তুগাল থেকে মানচিত্রটি চুরি করে ইতালিতে পাচার করেছিলেন। তার নামেই মানচিত্রটির নামকরণ করা হয়েছিল। সে অমূল্য মানচিত্রটি এখন সংরক্ষিত আছে ইতালির মোদেনা শহরে।

যে কয়েকটি অভিযানের তথ্যের ওপর নির্ভর করে মানচিত্রটি আঁকা হয়েছিল সেগুলো ঘটেছিল ১৪৯২-১৫০১ সালের মধ্যে। ওই সময়ে বিশ্বজুড়ে ভৌগোলিক আবিষ্কারের তিনটি বড় ঘটনা ঘটেছে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২), ভাস্কো-দা-গামার ভারতের জলপথ আবিষ্কার (১৪৯৮), পেদ্রো আলভারেজ কার্ভালের ব্রাজিলের উপকূল আবিষ্কার (১৫০০)।

এ মানচিত্র একটা বিস্ময়কর সৃষ্টি। কারণ ওই সময়ের পৃথিবীতে এ মানের মানচিত্র আর একটিও আঁকা হয়নি। এমনকি পরে আঁকা অনেক মানচিত্রেও এটার চেয়ে অনেক বেশি বিকৃতি, বিচ্যুতি ছিল। এ মানচিত্রে পুরো আফ্রিকা মহাদেশকে প্রায় বিশ শতকের মানচিত্রের মতো দেখা যাচ্ছে। এশিয়ার আকৃতি অবশ্য পুরোপুরি নির্ভুল হয়নি। কারণ তখনো এশিয়ার সব উপকূল তাদের নাগালে আসেনি। যেটুকু তথ্য পেয়েছিল তার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটা প্রায় নিখুঁত বলা চলে।

কেন মানচিত্র চুরি?

চতুর্দশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর দিয়ে ইউরোপিয়ানদের বাণিজ্য করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সুযোগে ভেনিসের বণিকরা মিসরীয় বণিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ থেকে মসলাপাতি আমদানি এবং বেশি দামে বিক্রি করত। ভাস্কো-দা-গামার অভিযানের পর জাহাজে করে ভারত থেকে সস্তায় মসলা আমদানি শুরু হয়। ভেনিসের বণিকদের চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি হতো সে মসলা। এটা ছিল ইউরোপের জন্য বিশাল একটা অগ্রগতি। এ অগ্রগতির সুফল নিজের হাতে ধরে রাখার জন্য পর্তুগিজরা অন্য কোনো প্রতিযোগীকে তাদের যাত্রার অংশীদার করতে চায়নি।

অন্যদিকে পর্তুগিজদের সরাসরি ভারত বাণিজ্যের কারণে ভেনিসের বণিকদের ব্যবসায় ভাটা পড়ে। সম্ভবত সেসব ব্যবসায়ী কিংবা তাদের কোনো সংঘবদ্ধ চক্র পর্তুগিজদের পেছনে লেগে ছিল মানচিত্রের খোঁজে। ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ার চুরি করা সে রকম কোনো পরিকল্পনার অংশ। আসল মানচিত্রগুলো পর্তুগালের রাজার নিজস্ব নিরাপত্তা বলয়ে সংরক্ষণ করা হতো। গবেষকরা অনুমান করেন কোনো রাজকর্মচারীকে ঘুস দিয়ে রিবেইরা প্যালেসে সংরক্ষিত আসল মানচিত্র থেকে গোপনে নকল করা হয়েছিল।

পৃথিবীর যেকোনো মানচিত্রে আঁকিয়ের নাম লেখা থাকে। কিন্তু এ মানচিত্রে সেটা অনুপস্থিত। মানচিত্রের পেছন দিকে শুধু লেখা আছে *"Carta da Navigar" (navigational chart) is given by Alberto Cantino to Ercole I, the Duke of Ferrara,* অর্থাৎ জনৈক আলবার্তো ক্যানটিনো মানচিত্রটি ডিউক অব ফেরেরার জন্য নিয়ে এসেছে। পাচারকারী আলবার্তো ক্যানটিনোর নামটাই মানচিত্রের সঙ্গে জুড়ে গেছে। ডিউক অব ফেরেরা ছিলেন ইতালির জেনোয়া শহরের বাসিন্দা। সে মানচিত্র ডিউকের কতটুকু কাজে দিয়েছিল তার কোনো খবর আমরা জানি না। তবে মানচিত্রের গঠনশৈলী থেকে মাপজোখ ও রঙের ব্যবহার সবদিক মিলিয়ে এটা একটা চমৎকার শিল্পকর্ম।

ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ারের মাঝখানে প্রধান অংশ জুড়ে আফ্রিকার সম্পূর্ণ ভূখণ্ড আঁকা। উত্তরে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ। মধ্যপ্রাচ্যে অটোমান সাম্রাজ্য ও জেরুজালেম খুব চমৎকারভাবে চিত্রণ করা হয়েছে। আফ্রিকার উত্তর ভাগের বিশদ তথ্যাবলি দেয়া আছে। মানচিত্রের পশ্চিমাংশে আমেরিকার নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ডগুলো আংশিক এসেছে। উত্তর আমেরিকার ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আশপাশের ভূখণ্ড, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের একাংশ আঁকা হয়েছে। তখনো সম্পূর্ণ আমেরিকা আবিষ্কার হয়নি, প্রশান্ত মহাসাগরের অস্তিত্ব অজানা। মানচিত্রের ডান দিকে

১৭৫৫ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত পর্তুগালের রাজপ্রাসাদ রিবেইরা প্যালেস

পূর্ব এশিয়ার আংশিক এলাকা দেখানো হয়েছে। এশিয়ার সম্পূর্ণ অংশ তখনো ইউরোপিয়ানদের নাগালে আসেনি। এমনকি মালাক্কাও তখনো পুরোপুরি আবিষ্কৃত হয়নি। মালাক্কার সঠিক অবস্থানও জানা ছিল না ইউরোপিয়ানদের কাছে।

এ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানচিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবীর সব উপকূলীয় নগরকে চিহ্নিত করা। কাজটি সহজ ছিল না। কারণ তখন পর্যন্ত স্পেন-পর্তুগাল বিশ্বব্যাপী সর্বমোট ছয়টি অভিযান চালিয়েছে। স্প্যানিশরা তিনবার আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছে এবং পর্তুগিজরা ভারতে গেছে তিনবার। মাত্র ছয়টা অভিযান দিয়েই পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ এলাকার অধিকাংশ ভৌগোলিক তথ্য উন্মোচন করে ফেলেছিল। মোটকথা ১৫০২ পর্যন্ত পৃথিবীর যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছিল এ মানচিত্রে তার সবটুকু উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪৯৪ সালে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে সম্পাদিত তরদেসিলাস চুক্তির মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগর যে রেখায় ভাগাভাগি করা হয়েছিল সে রেখাটি এ মানচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এ মানচিত্র সে বিভক্তি রেখাকে সুনির্ধারিতভাবে প্রথমবারের মতো উপস্থাপন করেছিল। মানচিত্রের ডান দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে টেনে নেয়া নীল রঙের রেখাটি দক্ষিণ আমেরিকাকে কীভাবে স্পর্শ করে গেছে সেটা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। ১৪৯২ সালে স্প্যানিশরা কলম্বাসের অভিযানে আমেরিকা ভূখণ্ড আবিষ্কার করলে ওই অঞ্চলে নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য ১৪৯৪ সালে তরদেসিলাস চুক্তি করেছিল।

মজার ব্যাপার ওই চুক্তিতে আটলান্টিকের মাঝ বরাবর ৪৬ ডিগ্রি রেখায় যখন ভাগ করা হচ্ছিল, তখনো দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করে আটলান্টিক পাড়ি দিতে গিয়ে পর্তুগিজরা অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ভূখণ্ড আবিষ্কার করে ফেলে ৪৬ ডিগ্রির ভেতরে। সেটা ছিল বর্তমান ব্রাজিলের উপকূল। চুক্তিবদ্ধ সীমার ভেতরে আছে বলে স্প্যানিশরা সেটা নিয়ে কোনো আপত্তি করতে পারেনি। ফলে স্প্যানিশদের নাকের ডগায় ব্রাজিল নামের ভবিষ্যৎ পর্তুগিজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ আমেরিকায়।

ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ারে চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষকদের জন্য এ মানচিত্রের অন্যতম আকর্ষণ চট্টগ্রাম বন্দরের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এখানে চট্টগ্রামকে উল্লেখ করা হয়েছে Catiguam নামে। চট্টগ্রাম নামে উৎস নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত যে চট্টগ্রামের নামে চাটির সঙ্গে একটা গ্রাম যুক্ত হয়েছিল বহুকাল ধরেই।

এ মানচিত্রে পৃথিবীর সব বিখ্যাত নগর বন্দরগুলোকে লাল-নীল রঙের ত্রিকোণাকৃতি বা চতুষ্কোণ আকৃতির পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুসলমান শাসিত অঞ্চলগুলো লাল রঙের ত্রিকোণাকৃতির পতাকা দিয়ে চিহ্নিত। কখনো লালের সঙ্গে নীল রঙের পতাকাও আছে। যেসব এলাকা পর্তুগিজদের অধীনে সেগুলো লাল-নীল রঙের চৌকোনা পর্তুগিজ মানচিত্র। স্প্যানিশ এলাকাগুলো সাদার ওপর লাল রেখা টানা চৌকোনা মানচিত্র। প্রতিটা বন্দরকে চিহ্নিত করা হয়েছে এ রকম কিছু পতাকা দিয়ে। পতাকার চিহ্ন দেখে বোঝা সম্ভব কোন অংশে কার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এশিয়ার যে বন্দরগুলো তখনো পর্যন্ত পর্তুগিজদের নাগালে এসেছে কিংবা খোঁজ পেয়েছে সে বন্দরগুলো এ মানচিত্রে গুরুত্বের সঙ্গে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে মোট ১৪টা বন্দর আছে, যার মধ্যে সাতটাই ভারতের।

ভারতের যে সাতটি বন্দরে পতাকা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে

Mostafa Hakim

জন্মসূত্র
এক সুতোয় গাঁথা

GOLDEN ISPAT
শক্ত ভিতে দৃঢ় ভবিষ্যৎ
www.goldenispat.com

HM STEEL
দৃঢ় মজবুত শক্তিতে অটুট
www.hmsteel.com.bd

Factory
Golden Ispat Limited
Kumira , Sitakunda , Chattogram

Corporate Office
218, D.T Road. Dewanhat
Chattrogram-4100, Bangladesh
Phone : 02-333310610, 720228

Factory
HM Steel & Industry Limited
Dhangar Char , Juldha, Karnaphuli
Chattogram

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলো হলো কেমবে, কালিকট, গোয়া ও চাটিগাম বা চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের দক্ষিণ দিকে বার্মা উপকূলের একটা বন্দর চিহ্নিত করা হয়েছে, সে বন্দর বর্তমানে কী নামে পরিচিত সেটা অজানা। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত যে আরব সাগরের বন্দরগুলো নিয়ে পর্তুগিজদের যে রকম ধারণা ছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূল নিয়ে তাদের ধারণা তেমন পরিষ্কার ছিল না। একইভাবে মালাক্কা অঞ্চল নিয়েও তাদের ধারণা পরিষ্কার ছিল না। এমনকি মালাক্কা যে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা দ্বীপমালা সেটাও তাদের জানা ছিল না। ফলে চট্টগ্রাম থেকে দক্ষিণ দিকে যে ভূখণ্ড চলে গেছে মালাক্কাকে সে ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ারে। মালাক্কা ও তার উত্তরের একটা বন্দরকে আলাদা পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ারে যেসব ভারতীয় বন্দরকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে চাটিগামকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। অথচ এ মানচিত্র যখন আঁকা হয় তখনো পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসেনি, বঙ্গোপসাগরে তাদের আনাগোনা শুরু হয়নি। ১৫১৭ সালের আগে চট্টগ্রামে কোনো পর্তুগিজ জাহাজ আসেনি। সে কারণে চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে পর্তুগিজ নাবিকদের সঠিক ধারণা ছিল না। ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ারে চাটিগাম নামের বন্দরটিকে বঙ্গোপসাগরের যে অবস্থানে দেখানো হয়েছে সেটা আসলে হুগলী নদীর মোহনা হওয়ার কথা। যদিও হুগলীর মোহনায় তখন কোনো বন্দর ছিল না।

মজার ব্যাপার এ মানচিত্রে উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুই নদীর মোহনায় যে দুটো নগরকে চিহ্নিত করা হয়েছে দুটোর মধ্যেই চাটিগাম শব্দটা লেখা আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে সে দুটো বন্দরের একটি কি হুগলী? কিন্তু হুগলী বন্দরের অবস্থান ছিল মোহনা থেকে অনেকটা ভেতরে। চট্টগ্রাম বন্দর ছিল মোহনার কাছে। পরবর্তীকালে পর্তুগিজরা হুগলী এবং চট্টগ্রাম দুই বন্দর দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিল। হুগলীকে ছোট বন্দর এবং চট্টগ্রামকে বলত বড় বন্দর বা পোর্টো গ্রান্ডে হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। সেটা আরো শতবর্ষ পরের কথা। এ মানচিত্র যখন আঁকা হয়েছিল তখন হুগলী কিংবা চট্টগ্রাম কোনোটিতেই তাদের পা পড়েনি। স্পষ্টতই অনুমানের ভিত্তিতেই আঁকা হয়েছিল মানচিত্রটি। সে কারণেই এ বিভ্রান্তি।

ভৌগোলিক অবস্থান পুরোপুরি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা না হলেও মানচিত্রটি চট্টগ্রামের অতীত গৌরবের একটি বড় চিহ্ন বহন করছে। প্রথমত, এ মানচিত্রেই চট্টগ্রামের নামটা প্রথমবারের মতো উল্লেখ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে চট্টগ্রাম পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোর একটি। ওপরের চিত্রে খেয়াল করলে দেখা যায় Catiguam নাম নিয়ে দুটো স্থানকে পতাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ মানচিত্রে পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা স্থানের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পুরো ভারতবর্ষে মাত্র সাতটি নগরকে পতাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে দুটিই চট্টগ্রামে। Catiguam নামে উল্লেখ করা দুটি বন্দরের একটিতে তিন পতাকা অন্যটিতে দুই পতাকা। বেশিরভাগ বন্দরকে একটি পতাকা দিয়েই চিহ্নিত করা হয়েছে। চাটিগাম নাম লেখা পশ্চিম দিকের একটা বন্দরেও আছে লাল ও নীল রঙের দুটি পতাকা। লাল পতাকার মাঝখানে একটা চাঁদ আঁকা।

ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ারে মালাক্কা অঞ্চলে পতাকা চিহ্নিত দুটো বন্দর

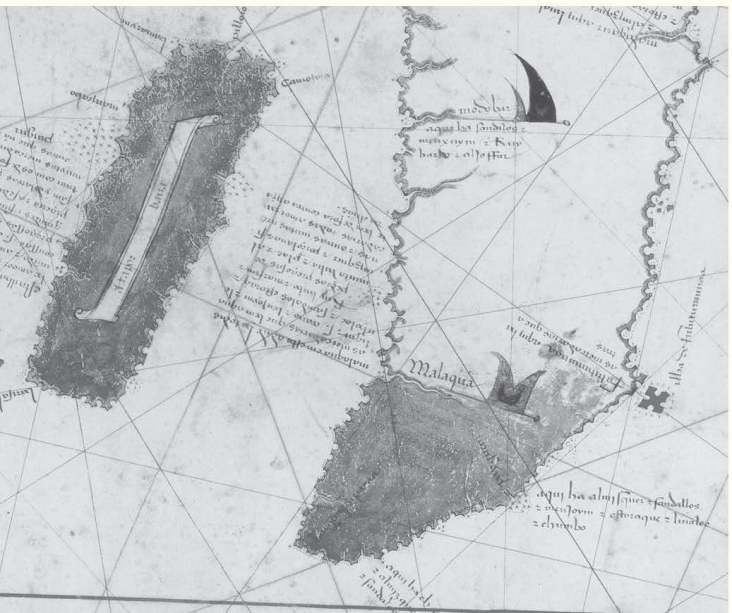

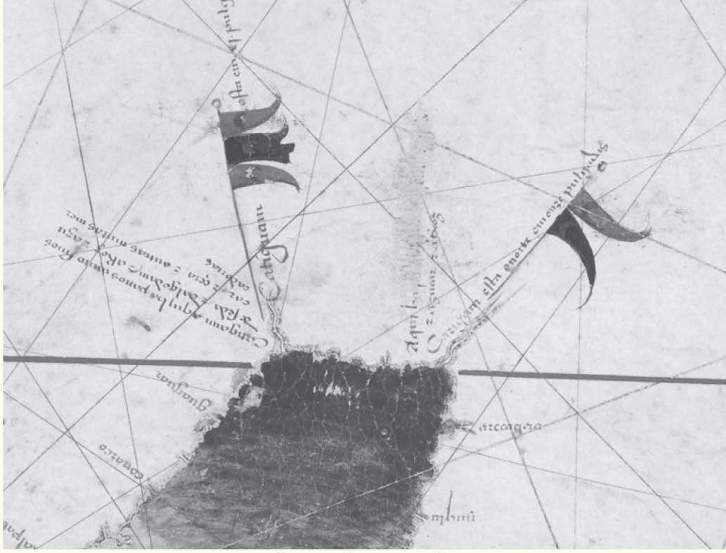

ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ারে চট্টগ্রাম বন্দর, ১৫০২

তাতে মনে হতে পারে এটা মুসলমান অধিকৃত এলাকা। কারণ এ ধরনের চিহ্ন অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত এলাকায়ও দেখা গেছে। প্রাচীনকালে এ জনপদকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হতো। সে নামগুলো বিবর্তন হয়ে চট্টগ্রামে এসে থেমেছে। সর্বশেষ নামটি ছিল চাটিগ্রাম বা চাটিগাঁও বা চাটগাঁ। সেটারই প্রমিত রূপান্তর বর্তমান চট্টগ্রাম। এ মানচিত্র থেকে প্রমাণিত চট্টগ্রাম বা চাটিগ্রাম নামটির বয়স অন্তত ৫০০ বছরের বেশি। পতাকার চিহ্ন ছাড়াও চাটিগাম চিহ্নিত স্থানটিতে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা আছে। যেখানে এ বন্দর দিয়ে মসলিনসহ নানা মূল্যবান সামগ্রী রফতানি করার কথা বলা হয়েছে। আর কোনো ভারতীয় বন্দরের ক্ষেত্রে এমন গুরুত্ব দিয়ে বিবরণ লেখা হয়নি। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা বোঝার জন্য এ একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

ক্যানটিনো প্লেনিস্ফেয়ার কেবল একটি মানচিত্র নয়। এটি মধ্যযুগের ভূগোল, নৌপরিকল্পনা ও উপনিবেশবাদী কৌশলের এক অনন্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। এ মানচিত্র থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের গতিপথও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে যেসব প্রাচীন নৌপথ, অজানা অঞ্চলের বিবরণ দেয়া হয়েছে সেটা গবেষকদের কাছে আজও এক অমূল্য প্রামাণ্য উপাদান। এ মানচিত্রকে ভিত্তি করে অনেক গবেষক মধ্যযুগের উপনিবেশবাদী লড়াই ও আন্তঃমহাদেশীয় সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন। বিশেষত, পনেরো-ষোলো শতকের ইউরোপিয়ান বাণিজ্যের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ গড়ে ওঠার প্রাথমিক গতিপথগুলো এ মানচিত্র থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব। বাংলাদেশের ইতিহাসচর্চায়ও এ মানচিত্র কাজে লাগতে পারে। এখানে ভারতবর্ষের যে প্রাচীন বন্দরগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে তাতে এ অঞ্চলের বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে বাংলার মধ্যযুগীয় সমৃদ্ধির ইতিহাসকে নতুন চোখে দেখতে সাহায্য করতে পারে।

তথ্যসূত্র

১. *The Island of Lost Maps: A True Story of Cartographic Crime*, Miles Harvey (2010)
২. *Les Corte-Real e leurs voyages au Nouveau Monde*, Henry Harisse (1883)
৩. *From the Portolan Chart of the Mediterranean to the Latitude Chart of the Atlantic: Cartometric Analysis and Modelling*, Joaquim A. Gaspar (2010)
৪. *The Representation of the West Indies in Early Iberian Cartography: A Cartometric Approach*, Joaquim Alves Gaspar (2015)
৫. *Cantino planisphere (1502)*, Biblioteca Estense, Modena, Italy
৬. *The Planisphere of Juan de la Cosa (1500)*, Joaquim Alves Gaspar.

সাব্বির জাদিদ

দুই পৃথিবীর সূর্য

নভেলা

ক'উয়ের মচয় ঘুঘুর বস', সেই বস'য় যেদিন ডিম ফুটল', সেদিন আম'দের গল্প শুরু হল' কী গল্প? হননের গল্প কী গল্প? খননের গল্প কী গল্প? ক্ষরণের গল্প তবে সেই হনন, সেই খনন ব' সেই ক্ষরণের দিন আস'র আগে ক'উফুলের গন্ধওয়াল' বাড়িটি ছিল আনন্দ বজ'র, যেখানে বিনি পয়স'য় পাখির ড'ক শোন' যায় যেখানে প্রত্যেক ভোরে কাঁচ হলুদের মতো ঝকঝক' সূর্য ওঠে আব'র সেই রোদ তেতে উঠতে উঠতে ছায় বিকেয় উঠোনের সুবজ অমগাছ ত'র নিচে গেলেই পাওয় যায় আদর আদর অনুভব ঘুঘুর বস'ওয়াল' ক'উয়ের মচটি অমগাছের পাশেই হত-প' মেলে ছড়ানো এই মচ'র ওপর যেদিন একটি ঘুঘুর বস' আবিষ্ক'র করল তমিম, ত'র দিনটি আলোয় ভরে উঠল ত'র দুদিন আগে তমিমের ছোট বোন তমিম, খেয়াল করেছিল এক চমৎক'র দৃশ্য একটি ঘুঘু উঠোনের কুটো ঠোঁটে উড়ে উড়ে যাচ্ছে মচ'র ভেতর খানিক বাদে ফিরে আসছে আব'র, ওই উঠোনেই কিন্তু তমিম তখনো জানে ন', কী এক স্বর্গ রচিত হচ্ছে ওদের ক'উয়ের মচয় দুদিন পর তমিম উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিল তমিমকে—ঘুঘুর বস'! ঘুঘুর বস'!

তমিম তমিম দুজনেরই বড্ড প্রিয় ঘুঘু এত আদর আদর ওদের শরীর! এত ময়'র নকশ'কাটা ওদের কণ্ঠ! এত নিশ্চুপ নিরীহ ওদের চোখ ভাইবোনের মনে হয় মুঠোয় নিয়ে চুমু খেতে ভাইবোনের মনে হয় বালিশের পাশে রেখে ঘুমাতে ভাইবোনের মনে হয় চিরুনি কর' পালকে হাত বোলাতে সেই আদর আদর ঘুঘু ক'উয়ের মচয় বস' বাঁধলে তমিম সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলে, এই মচ সে কোনোদিন ভাঙতে দেবে ন' এই মচ হবে ঘুঘুদের মচ ঘুঘুর এখানে ইচ্ছামতো বস' বাঁধবে, ডিম পাড়বে, বাচ্চ' তুলবে এখানে চিরকাল থাকবে ঘুঘুর চাইলে অন্য পাখিরাও আসতে পারে অবশ্য তাতে যদি ঘুঘুদের আপত্তি ন' থাকে

ম' বাচ্চ' দুটোর কাছে সবসময় বেহেশতের গল্প বলেন বাচ্চ' দুটো মানে তমিম-তমিম আর ম' মানে তাদের ম' ম' বলেন, বেহেশতে সুখ আর সুখ সেখানে নদী আর নহর সেখানে গাছপালা আর পাখি সেখানে যা খুশি তা-ই পাওয় যায় তবে সেখানে যেতে হলে হতে হবে সৎ, ভালো মানুষ কাউকে ঠকানো যাবে ন', কষ্ট দেয় যাবে ন' এমনকি পায়ের তলার মাটি, তাকেও ব্যথা দিয়ে দলদলিয়ে হাঁটা যাবে ন' তবেই না মিলবে বেহেশত

তমিম মুগ্ধ গলায় বলে, ও ম', আমি ঘুঘুটাকে বেহেশতে নিয়ে যেতে চাই ঘুঘুটা ছাড়া আমার বেহেশত ভালো লাগবে ন'

মেয়েকে কোলের ভেতর টেনে নেন ম'—তাই নিস তাই নিস কিন্তু ঘুঘুটা ঘুঘুটা বলছিস ক্যান! ওরা তো দুইজন

দুইজন? বিস্ময়ে চোখ ওল্টায় তমিম আমি তো একটাকেই বস'য় বসে থাকতে দেখি সবসময়

তমিম তো বড় সে দাম্পত্য জীবন বোঝে সে সংসার বোঝে সে বলে, ধুর পাগলি, এক এক কি ঘর বাঁধা যায়! ওরা তো ঘর বেঁধেছে ডিম পেড়েছে ওদের মাধ্যমে নতুন বাচ্চা আসবে তাই ওরা দুইজন একজনে কখনো বাচ্চা তোলা যায় না!

ছেলের উপস্থাপনা ঢঙে অবাক হন মা। এই ছেলে এত চমৎকার করে কথা বলে। এই ছেলের দেখার চোখ এত তীক্ষ্ণ। এই ছেলের ভাবনার গাঁথুনি এত মজবুত। নিজেদের কথা মনে পড়ে মায়ের। সত্যিই তো, তামিম-তামিমা পৃথিবীতেই আসত না, যদি না ওদের বাবার সাথে ঘর বাঁধতেন তিনি। প্রকৃতির জোড়া বাঁধার কারণ তবে প্রজনন। নতুন সৃষ্টির জন্যই তবে পৃথিবীর এত আয়োজন। মা মুগ্ধ চোখে তামিমের দিকে তাকান। মায়ের চাহনিতে সন্দেহ জাগে তামিমের মনে—আমি কি ভুল কিছু বলেছি, মা?

না না। তুই খুব সত্যি কথা বলেছিস।

মা ছেলের মাঝে যখন কথার এইসব নদী বয়, তামিমার তখন মুখ গম্ভীর। অভিমান। কেন গম্ভীর? জানা গেল ক্ষণিক বাদেই। ঘুঘুর বাসায় ডিম অথচ কেউ তাকে বলেনি। সে ভেবেছিল, ওটা শুধুই বাসা। ঘুঘুর বিশ্রাম ও ঘুমানোর বাসা। যেমন বাসা তাদের নিজেদের। সে গাল ফুলিয়ে বলে, ডিম পেড়েছে? আমাকে বলোনি তো আগে, ভাইয়া।

পাখিরা বাসা বাঁধেই তো ডিম ফুটানোর জন্য। বাসা বেঁধেছে মানেই ডিম পেড়েছে। এটা আর বলার মতো কী ঘটনা! তুই যে এমন গাধা তা কি আর আমি জানতাম!

মা, ভাইয়া সুযোগ পেলেই আমাকে গাধা বলে। আমি যদি গাধা হই তুমি তবে কী, মা?

হয়েছে হয়েছে। আর পাকামো করতে হবে না।

মা, আমি ঘুঘুর ডিম দেখব।

ঘুঘুর ডিম কীভাবে দেখবি! মা-ঘুঘু তো সারাক্ষণ ডিমকে বুকের ভেতর আগলে রাখে। যেভাবে আমি তোকে পেটে রেখেছিলাম। এটা গোপন জিনিস। দেখতে নেই।

তাও আমি দেখব। তামিমা জেদি কণ্ঠে বলে।

বাড়িতে একটা হাতলভাঙা কাঠের পুরনো চেয়ার ছিল। বাবা সেদিন চেয়ারটাকে নিয়ে রাখলেন লাউয়ের মাচার তলে। দুপুরের একটা সময় ঘুঘু দম্পতি তাদের দায়িত্ব বদল করে। বেশির ভাগ সময়ই মা-ঘুঘু ডিম আগলে রাখে। দুপুরের দিকে ক্ষুধার্ত হলে মা-ঘুঘু নেমে আসে মাটিতে, খাদ্যের সন্ধানে। আর তখন বাবা-ঘুঘু গিয়ে বসে ডিমের ওপর। দায়িত্ব বদলের এই সামান্য সময়ে অরক্ষিত থাকে ডিম। হাতলভাঙা চেয়ারটা বসাতে বসাতে বাবা বলেন, যে সময়টায় ওদের দায়িত্ব বদল হবে, তখন তোরা চেয়ারে উঠে দাঁড়াবি। শুধু সেই সময়ই তোরা দেখতে পাবি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় এক জোড়া ডিম। অন্য সময় কিন্তু কাছেও যাবি না। গেলে ওরা ভয় পাবে। ভয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।

বাবার কথাই ঠিক। বাবারা এতকিছু কীভাবে যে জানে! দ্বিপ্রহরের শুরুতে যখন রাগী সূর্যটা ওদের আমগাছের মাথায় উঠে চোখ পাকিয়ে তাকায়, তখনই মা-ঘুঘুটা বাসা ছেড়ে নেমে আসে। আর তখন ভাইবোন হুড়মুড়িয়ে চেয়ারে উঠে পড়ে। উত্তেজনায় দুজনেরই ঢিপঢিপ করে বুক। এখান থেকে স্পর্শের দূরত্বে বাসাটা। হাত বাড়ালেই মুঠোয়। তামিমা তো একবার ধরতেও যায়। ধমক মেরে ওকে ঠাণ্ডা করে দেয় তামিম। ভাইবোন তীব্র উত্তেজক, আকর্ষণীয়, আনন্দময়ী চোখে আবিষ্কার করে দুটো ডিম। এত ক্ষুদ্র এই বাসা, এত অল্প এর খড়কুটো, কেবল দুটো ডিমের মাপেই যেন বানানো হয়েছে। তামিমা ফিসফিস করে—নাহ! বড্ড ফাঁকিবাজ তোরা। বাসাটা আরেকটু বড় করলে কী এমন অসুবিধা হতো। এই মাচা পুরোটাই তো তোদের। এই পুঁচকে বাসায় বাচ্চারা কীভাবে বড় হবে!

তামিমার আক্ষেপ শেষ হয় না, তার আগেই দেখে, বাসা থেকে একটু দূরে, লাইয়ের পাতার ফাঁকে এক ঘুঘু, ডিমের কাছে আসার চেষ্টা করছে।

তামিম ঠোঁটে শঁ শঁ শব্দ তুলে বলে, চ চ। ওটা বাবা-ঘুঘু। আমাদের জন্য আসতে পারছে না। ও এখন ডিমের ওপর বসবে।

তামিমার মন খারাপ হয়ে যায়। আরো অনেকটা সময় যদি সে থাকতে পারত! আরো দীর্ঘ সময় নিয়ে যদি সে ডিম ও বাসা দেখতে পারত! মায়ের কাছে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় সে বলে, মা, আমি ডিম ধরব। আমি ডিম নিয়ে খেলব।

রেগে যায় তামিম। খেলবি মানে! আগে নিজে একটা ডিম পাড় তারপর খেল।

মা তামিমকে ধমকান—পচা কথা বলতে নেই, তামিম। মানুষ আবার ডিম পাড়ে নাকি। এসব আর বলবে না কক্ষনো। ছেলেকে থামিয়ে মা এবার কন্যার দিকে ফেরেন। বলেন, ডিম নিয়ে তো খেলা যাবে না, মা।

কেন যাবে না?

কারণ, পাখিরা আসে বেহেশত থেকে। ওরা নিষ্পাপ। কিন্তু আমাদের হাতে তো অনেক পাপ। এই পাপী হাত ডিমে লাগলেই নষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চা ফুটবে না। তাই ডিম ধরা যাবে না, খেলাও যাবে না।

আমার তো একটা খেলনা গ্লাভস আছে। তাহলে সেটা দিয়ে ধরি? ওটায় তো কোনো পাপ নেই।

এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছুতেই পাপ লেগে আছে। তোর ওই গ্লাভসেও। পাপ নেই শুধু পাখিদের। তাই গ্লাভস দিয়েও ধরা যাবে না ডিম।

মায়ের কথায় ডিম ধরার উৎসাহ হারায় তামিমা। ওরা ভাইবোন অপেক্ষায় থাকে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার। ওদের কল্পনাশক্তি গভীর। ওরা কল্পনায় দেখতে পায়, একদিন মড়াৎ করে ডিম দুটো ফেটে গেছে। ফাটা ডিমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে চোখ না ফোটা দুটো বাচ্চা। ওরা ক্ষুধার্ত। ওরা পৃথিবী দেখতে ব্যাকুল। ওরা আকাশে উড়তে আকুল। মা ওদের আগলে রাখে। খাবার খাওয়ায়। ওরা একটু একটু করে বড় হয় আর মা ওদের ওড়ার গল্প বলে। ওদেরউড়তে জানতে হবে। চারপাশে পাখিদের অনেক শত্রু। ডানাই তাদের রক্ষাকারী। যে পাখি উড়তে পারে না তার বিপদ সারাক্ষণ। তামিম-তামিমা স্কুলে যায়, প্রাইভেটে যায় আর এসব ভাবে। যখন ছুটি হয়, ছুটে ছুটে আসে বাড়িতে, যতটা না বাড়ির আকর্ষণে, তার চেয়ে বেশি বাসার আকর্ষণে। পাখির বাসার আকর্ষণে।

সেদিন রাতের কোল থেকে খুব মিষ্টি এক ভোর উঠে এসেছিল তামিমাদের বাড়িতে। শিউলি ফুলের মতো মিষ্টি সেই ভোরটা সকাল হতে হতে উঠোনে বাঘের মুখের মতো হলদে রোদের ছায়া পড়েছিল। রান্নাঘরের পেছনে দুলছিল কলার দুটো পাতা। এর মাঝে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তামিমা। বেরোনোর পথ আবার ওই লাউয়ের মাচার তল। মাচার তল পেরিয়ে একটু এগোলেই গেট। তামিমা পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে মাচা অতিক্রম করতে গিয়ে শোনে চিঁ চিঁ শব্দ। হঠাৎ শুনে মনে হলো মা কোরআন পড়ছে। কিন্তু এখন মায়ের কোরআন পড়ার সময় নয়। মা কোরআন পড়ে ভোরে, যখন প্রকৃতি জাগতে শুরু করে। এখন তো প্রকৃতি পুরোপুরি ঘোমটা মেলেছে। এই সময় তবে চিঁ চিঁ করে কে! তামিমার কান খাড়া হয়ে যায় কৌতূহলে। কিসের ডাক? ঘুঘু তো এভাবে ডাকে না। বাচ্চা ফুটল নাকি! তামিমা ব্যাগটা পিঠ থেকে নামিয়ে চেয়ারের পায়ার কাছে রাখে। তারপর তড়িঘড়ি নিঃশব্দে চেয়ারে উঠে দাঁড়ায়। এ সময় সে খুব করে কামনা করে, ভাইয়া যেন টের না পায়। সত্যি সত্যি যদি ঘুঘুর বাচ্চা ফোটে, প্রথম দেখার অধিকার শুধু তার। তামিমা পায়ের দুই বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁকি মারে বাসা বরাবর। আকাশের চাঁদ হাতে নেমে এলেও ততটা খুশি হতো না তামিমা, ঘুঘুর পেটের নিচে কিছু একটা নড়তে দেখে যতটা খুশি হয় সে। এবং চিঁ চিঁ শব্দের উৎস ঘুঘুর পেটের তল। বাচ্চা ফুটেছে! ঘুঘুছানা আবিষ্কারের উত্তেজনায় তামিমা এত জোরে চিৎকার করে, চিৎকারের ধাক্কায় ও চেয়ার উল্টে পড়ে যায়। চেয়ারের পতন এবং চিৎকারের যুগপৎ আওয়াজ নিশ্চয় সুখকর কোনো বিষয় নয়। পড়ার টেবিল ছেড়ে তামিম, রান্নাঘর ছেড়ে মা ছুটে আসে বাইরে। বাড়ি থাকলেও বাবাও নিশ্চয় ছুটে আসতেন রুদ্ধশ্বাসে। দুজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় একই বাক্য—কী হলো! কী হলো!

তামিমাকে চিৎপটাং পড়ে থাকতে দেখে দুজনই ভাবে, পতনের ব্যথাই বুঝি মুখ্য। পতনের কারণেই এই চিৎকার। কিন্তু তামিমার মুখে ব্যথা কিংবা যন্ত্রণার কোনো ছাপ নেই। আছে উত্তেজনা। আছে খুশির ঝিলিক। আছে আবিষ্কারের আনন্দ। তামিমা ততক্ষণে

নিজে নিজেই উঠে পড়েছে। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সে ঘুঘুর বাসার দিকে ইশারা করে। বলে, বাচ্চা ফুটেছে।

সত্যি? এবার তামিমার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে তামিমের শিরায়-গ্রন্থিতে। সে এক লাফে বারান্দা থেকে উঠোনে নামে। চেয়ারটা খাড়া করে তার ওপর উঠে দাঁড়ায়। বাসাটা পর্যবেক্ষণ করে যখন অনুভব করে বাচ্চার অস্তিত্ব, চিৎকার করে ওঠে সে-ও—মা, সত্যি সত্যি বাচ্চা ফুটেছে!

মায়ের মুখে খুশির উদ্ভাস। নতুন সৃষ্টির আনন্দ। কিন্তু আচরণ সংযত। গলা নামিয়ে মা বলেন, ওখান থেকে সরে আয়। ওরা ভয় পাবে তো। আর এমন চিৎকার করছিস ক্যান!

ছানা ফোটার আনন্দে তামিমার সেদিন আর স্কুলে যাওয়া হয় না। তামিমের তো ক্লাসই বন্ধ। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। ঘরে বসে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেদিন তামিমেরও পড়ালেখা শিঁকেয় ওঠে। তারা অপেক্ষা করে বাবার ফিরে আসার। সেই সকালে না খেয়ে বেরিয়েছেন বাবা। না জানি কোথায় কার সাথে আড্ডা জমিয়েছেন। এই মানুষ বাইরে গেলে ঘরের কথা ভুলে যান। আবার বাড়িতে এলে সন্তানদের এমনভাবে জড়িয়ে ধরেন লতার মতো, তখন ধারণাই করা যায় না তিনি বাইরে গেলে বাড়িভোলা মানুষ।

বাবা আসেন সকাল এগারোটায়। তামিম-তামিমা দুজনই ছুটে গিয়ে সুসংবাদটা দেয়। ওরা বাবার প্রশ্রয়ে বাবাকে সাথে নিয়ে নতুন করে আবার এখনো চোখ না ফোটা ছানা দেখে। মা উঠোনের কোনায় চাল ছিটিয়ে রাখেন। ঘুঘু দুটো সুযোগমতো খুঁটে খুঁটে খেয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে যায়। তামিমদের মনে হয়, এই ঘুঘু দুটো তাদের। বাচ্চা দুটোও। প্রকৃতির অংশ হয়েও ওরা এই পরিবারটির অংশ। নয়তো মানুষের ছিটানো ধান-চাল ওরা খাবে কেন! প্রকৃতি থেকে কুড়িয়ে নিলেই তো পারে। এই ভাবনাটা ভাবতেই ভালো লাগে তামিমের—এক ঘুঘু দম্পতি ওদের সঙ্গে বাস করে।

দুই.

বাইরের বসার ঘরে অভ্যাগতদের আনাগোনা চলতেই থাকে সারা দিন। এই একজন এসে ঘুরে গেল তো পরক্ষণে আরেকজন। বাবা যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, এর কোনো বিরাম বা ব্যত্যয় নেই। এতে মায়ের অবশ্য ভালোই হয়েছে। বাইরের ঘরটা প্রত্যেকবার নতুন করে গোছাতে হয় না। মানে, সারা দিনে গোছানোর ফুরসতই পান না। একবারে রাতে, ঘুমের আগে, মা ঘরটা ঝাড়ামোছা করে রাখেন। লোকেরা খুব যে দরকারে বাবার কাছে আসে, ব্যাপার এমন না। দুদণ্ড গল্প করতে আসে। অনেকের ভাষ্য—আজিজুর রহমানের মুখ দেখলেই মন প্রসন্ন হয়। দিনটা ভালো কাটে। আর তার পাশে যতক্ষণ বসে থাকা যায়, পরম এক প্রশান্তি ছুঁয়ে থাকে তনুমনে। বাবার যেমন কাজ নেই সারা দিন, অমন বেকার উদাস মানুষের সংখ্যাও তো কম না এই শিবপুরে। ফলে দানে দানে একশ দানের মতো রসায়নটা ভালোই জমে সবার। আবার লোকগুলোর প্রত্যাশাও এত ক্ষুদ্র, বাটিতে গুড়মুড়ি এগিয়ে দিলেই তারা খুশি হয়ে ওঠে, বিনয়ে গলে গলে পড়ে। যেন এতটা খাতির-যত্ন তাদের পাওনা না। এসবই রহমান বাড়ির উদারতা। আজিজুর রহমান তাদের সময় দেন, এতেই তারা বর্তে যায়।

তামিম অবাক হয়। লোকগুলো বাবার মাঝে কী এমন পেয়েছে! মাঝে মাঝে বিরক্তও লাগে। বসার ঘরের কথাবার্তা অনুমতি ছাড়া প্রায়ই ঢুকে পড়ে তার পড়ার ঘরে। নাকের ডগায় ঝুলছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। এ সময় ঘাড়ের ওপর এত আড্ডাবাজি ভালো লাগে! তামিম মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে মাকে—লোকগুলো বাবাকে এত ভক্তি করে কেন, মা?

মায়ের হাতে তখন কাজ থাকলে পাত্তা দেন না। কারণ, এর ইতিহাস তো বিরাট। কাজের ফাঁকে কীভাবে এত কথা বলা যায়। কিন্তু মা যদি অবসর থাকেন, গল্পের ডালি খুলে বসেন। রূপকথার মতো সেসব গল্প। তামিমের এত ভালো লাগে। আনন্দের এক ফল্গুধারা বয়ে যায় ওর হৃদয়তন্ত্রীতে। এমন এক পরিবারে জন্ম নিতে পারাও তো সৌভাগ্যের!

মা মুখ খুললেই কথা বলে ওঠেন তার শ্বশুর। তামিম যাকে দেখেনি। তামিম যখন মাতৃগর্ভে ছয় মাস, তখনই চলে গেছেন দাদা। মা বলেন, তিনি চলে গেছেন বেহেশতে। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি যে বেহেশতেই গেছেন, দোজখে যাননি, এতটা নিশ্চিন্ত তুমি কীভাবে হও মা? কথার মাঝে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় তামিম।

মায়ের মুখ তখন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শ্রদ্ধার দীপ্তিতে। অমন ভালো মানুষ যিনি, আল্লাহ তাকে বেহেশত না দিয়ে পারে! যার জানাজায় সাত গ্রামের লোক জড়ো হয়, যার শোকে বাদ যায় না একটি চোখের কান্নাও, তিনি বেহেশতে যাবেন না তো কে যাবে শুনি! মায়ের কাছে দাদার কীর্তিগাথা শুনে কী যে আফসোস হয় তামিমের, আর ক'বছর পরে যদি মরতেন তার দাদা, কিংবা আর ক'বছর আগে যদি জন্মাত তামিম! মা হাসেন, ওরে পাগল, আরো ক'বছর আগে তুই আসবি কীভাবে, তখন তো বাবার সাথে বিয়েই হয়নি আমার। আমিও কি শ্বশুরকে খুব বেশিদিন পেয়েছি! যা কিছু গল্প তার খানিকটা দেখা আর বেশির ভাগই ওই শাশুড়ির কাছ থেকে শোনা।

হ্যাঁ, কথা অসত্য নয়। তামিম নিজেও অনেক গল্প শুনেছে দাদির কাছ থেকে। দাদিটা মারা গেছেন গত বছর। যতদিন বেঁচে ছিলেন, সবকিছু স্বাভাবিক মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, সংসারে বাবা-মা থাকবে, দাদি থাকবে, এই তো নিয়ম। তাদের নিয়ে আলাদা আহ্লাদের কী আছে! কিন্তু দাদি মারা যাওয়ার পর বুঝতে পারে, ভালোবাসার কী এক ঝরনাধারা হঠাৎ শুকিয়ে গেল! তামিমের আফসোস হয় এখন। অনুশোচনাও। মাঝে মাঝে গোপনে দাদির কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন চোখ ভরে ওঠে জলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, আর ক'টা দিন কি থাকতে পারতে না আমাদের সাথে! পাশেই দাদার কবর। মাটি ভেঙে গর্ত হয়ে গেছে। একবার মাথার খুলি বেরিয়ে এসেছিল। বাবা তখন ওই গর্তের ভেতরই আরেকটু গর্ত করে মাথাটা ঢেকে দিয়েছেন। তামিম দেখেছিল, খুলিটা মাটিতে লুকাতে লুকাতে বাবা চোখ মুছছেন। এ যেন দাদাজানের দ্বিতীয় দাফন। এক শিমুল ফাটা দিনে, ভাঙা পুরনো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তামিম, ভাবছিল আর অনুভব করছিল দাদাজানকে। প্রবল প্রতাপশালী মানুষ, অথচ হৃদয়টা ছিল মাখনের মতো নরম। তামিম যে প্রায়ই দাদা-দাদির কবরের পাশে এসে দাঁড়ায়, কেউ জানে না। জীবদ্দশায় না পাওয়া দাদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের এ যেন এক গোপন খেলা তামিমের। তামিমের আত্মার আকুতি যেন টের পান প্রতাপশালী মানুষটা। ঘোরগ্রস্ত তামিম তখন অনুভব করে, দাদা উঠে আসছেন কবর থেকে। তামিমকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন চাপাইগাছি বিলের চরে। সেখানে মনের সুখে চরছে তার তিন জোড়া মোষ। মোষগুলোর দেখাশোনায় নিয়োজিত তিনজন রাখাল। দাদা যাদের নাম রেখেছেন মতি, গতি আর বতি। সবাই তামিমের বয়সী। মতির আসল নাম মতিই। বাকি দুজনের নাম ভিন্ন। একজন আলি অন্যজন তকদির। কিন্তু দাদাজান ছন্দের সুবিধা নিতে আলি আর তকদিরের নাম দিয়েছেন গতি ও বতি। গতি—কারণ, তার চলাফেরায় উল্কার দুরন্তপনা। বতি—কারণ, বয়সের আগেই সে পেকে উঠেছে। মতি, গতি, বতি—নাম তিনটে এত পছন্দ হয় তামিমের, তামিম বারবার আওড়াতে থাকে। তার সবকিছু ছেড়েছুড়ে রাখাল হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। যাদের কোনো দুঃখ নেই। ঘড়ির কাঁটায় মাপা শৃঙ্খলিত জীবন নেই। যখন যেখানে খুশি যাও, উড়ে বেড়াও, মোষের পিঠে চড়ো, পরিব্রাজকদের মতো নতুন নতুন পথ ও পৃথিবী আবিষ্কার করো। দাদাজানের শরীরটাও মোষের মতোই বিশাল। হঠাৎ তিনি নাতিকে শূন্যে তুলে এক মোষের পিঠে বসিয়ে দেন। তামিম চোখ বন্ধ করে ভয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়। তামিমের ভয় দেখে অন্য তিনটি মোষের পিঠ থেকে দাঁত কেলিয়ে হাসে মতি, গতি ও বতি। তামিম যখন বোঝে, মোষের পিঠে চড়া আদৌ ভয়ের কিছু নয়, তখন সে ধমকায় মতি-বতিদের। হাসবি না খবরদার। আমি তোদের মতো রাখাল নাকি যে ভয় পাব না। শুরুতে ভয় একটু পেয়েছিলাম। এখন আর কোনো ভয় নেই। দাদাজানও এবার লাফ দিয়ে তামিমের পেছনে চড়ে বসেন। তামিমকে জড়িয়ে ধরেন বুকের ভেতর। দাদাজানের পরনে লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়া। মুখে

PRAAVA HEALTH
healthcare - anytime, anywhere

বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা, এখন আপনার হাতের কাছে!

- আপনার স্বাস্থ্যসঙ্গী: ফ্যামিলি ডাক্তার সহ ৭০+ উন্নত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- ISO 15189-2012 সার্টিফাইড ল্যাব
- ঘরে ল্যাব– মাত্র ২ ঘণ্টায় হোম স্যাম্পল কালেকশন
- বিশ্বমানের ক্যান্সার মলিকিউলার ল্যাব
- এন্ডোস্কোপি, ইকোসহ উন্নত ইমেজিং সেবা

বিস্তারিত জানতে কল করুন
১০৬৪৮

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.praavahealth.com

প্লট ৯, রোড ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা ১২১৩

লম্বা দাড়ি। দাড়ির ভেতর সাদার-কালোর বুনন। দাড়ি থেকে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোয় আর সুড়সুড়ি দেয় তামিমের ঘাড়ে। তামিম খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে, ও দাদা, তোমার দাড়ি সরাও। সুড়সুড়ি লাগে তো!

দাদাজান আরো জোরে জাপটে ধরেন নাতিকে—আজ তোকে পাইছি, নাতি। আজ তোকে ছাড়ছি না। আজ তোরে আমার দুনিয়া দেখাব।

মোষের পিঠে, দাদার কোলের ভেতর তামিম চরের ভেতর ঘোরে। কত যে পাখি, কত যে কিচিরমিচির কলতান, কত যে সবুজ ঘাস, কত যে লাফিয়ে চলা খরগোশ, রূপকথার মতো কত যে ছড়ানো ঝোপঝাড়—আনন্দে চোখ জুড়িয়ে আসে তামিমের। হৃদয় অবশ হয়ে আসে। এই মোষ, মোষের পিঠ, দাদার কোল, আতরের সুবাস, বিলের হাওয়া, এর মাঝে ভেসে যাওয়া—এর চেয়ে নির্ভার জীবন বুঝি আর হয় না। এই জীবন ছেড়ে তামিমের ফিরতে ইচ্ছে করে না সেখানে, যে জীবনের কপালে সবসময় ঝুলে থাকে : পড়ো পড়ো পড়ো। হঠাৎ মোষের পায়ের কাছ দিয়ে দৌড়ে যায় এক আজব প্রাণী, লুকায় এক ঝোপের ভেতর। তামিম চিৎকার করে ওঠে উত্তেজনায়—ও দাদা, ওটা কী?

ওইটা কী চিনিস না? ওইটা শজারু।

নাম শুনেছি। বইয়েও পড়েছি। কিন্তু বাস্তবে আজই প্রথম দেখলাম। ভয়ংকর কাঁটা। আমাকে একটা শজারু দেবে?

ওদেরকে নিতে হয় না। ওরা পৃথিবীর শোভা, প্রকৃতির সন্তান। আল্লাহ ওদের সৃষ্টিই করেছেন ঝোপঝাড়ে বাস করার জন্য। মানুষের কাছেই বরং ওদের দুঃখ।

মানুষের কাছে ওদের দুঃখ কেন?

কারণ, মানুষ ওদেরকে বোঝে না। মানুষ নিজেকে আশরাফুল মাখলুকাত ভাবে আর সব প্রাণীকে ভাবে নিজেদের খাদেম। ওরা মানুষের এই মনোভাব বোঝে। বোঝে বলেই ওরা মানুষ থেকে দূরে থাকে। তুই দেখবি নাতি, এই পৃথিবী প্রকৃতির অভয়ারণ্য। কিন্তু যেখানেই মানুষের বসতি, প্রকৃতি সেখান থেকে সরে যায়। অন্য কোথাও গিয়ে বসতি গাড়ে। মানুষ যে রাস্তায় চলে, সে রাস্তার ঘাস পর্যন্ত মরে যায়।

দাদাজান, তুমি এমন করে ভাবো! অবাক হয় তামিম। দাদাজানের নিসর্গভাবনা ঢুকে যায় তামিমের মাথায়। এতক্ষণ নির্ভার, ফুরফুরে লাগছিল নিজেকে। দাদাজান তার মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছেন এমন এক চিন্তা, যাতে মাথাটা হয়ে গেছে এক পাথর। যা নাড়াতে গেলেও বাড়তি পরিশ্রম। দাদাজানের কথাকে তামিমের মনে হয় ধ্রুব সত্য। সত্যিই তাই, নিসর্গের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ। একবার ঘরের পেছনে, যেখানে পচুর মা সংসারের যাবতীয় সব ময়লা-আবর্জনা ফেলে, তামিম এক পেয়ারার চারা আবিষ্কার করেছিল। ময়লার ভাগাড়ে সবুজ ছয়টি পাতা নিয়ে লকলক করছিল চারাটি। খুব দামি এবং গোপন কিছু আবিষ্কার করার উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছিল তামিম। তারপর কাউকে না জানিয়ে নিড়ানি দিয়ে চারাটাকে তুলে এনেছিল বাড়িতে। এরপর উঠোনের কোনায় পরম মমতায় পুঁতে দিয়েছিল চারাটা। তারপর কত দেখাশোনা করল, কত যত্নআত্তি করল, কত পানি দিল, গোপনে পাতায় পাতায় কত চুমু আঁকল; কিন্তু চারাটা বাঁচল না। অথচ ময়লার ভেতর অযত্নে অবহেলায় ঠিক জন্মেছিল চারাটা এবং তরতর করে বড়ও হচ্ছিল। চারাটার মৃত্যু খুব বিষণ্ন করেছিল তামিমকে। এত ভালোবাসা পাওয়ার পরও কেন মরে গেল সে? মানুষের কাছে আসার দুঃখে? প্রকৃতির কোল থেকে ছিনিয়ে আনার কষ্টে?

অকালে মরে যাওয়া পেয়ারার চারাটা তামিমের মন ভার করে রাখে, তখন মাথায় সিঁদুর পরা এক শীর্ণ তরুণী উদিত হয় ওদের সামনে। সারা অঙ্গে তার দরিদ্রতার ছাপ। মলিন বেশ। রুক্ষ চুল। খড়খড়ে তক। সামনের দিকে ঝুঁকে দাদাজানকে কুর্নিশ করে মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখে দাদাজানের মুখটা কেমন হাসি হাসি হয়ে যায়। তুই শম্ভুর নাতনি মালতি না?

দাদাজান তাকে চিনতে পেরেছেন, সেই আনন্দেই কিনা কে জানে, ঝলমলিয়ে ওঠে মেয়েটি। প্রাণবন্ত গলায় বলে, জি ঠাকুর, আপনে ঠিকই ধরেচেন। আমি মালতি। আমার ঠাকুদ্দা মরতি বসল যে বচ্ছর, আপনে তারে সদরে নিয়ে গিছলেন চিকিসসার জন্যি। নিজে খরচপাতি দিলেন। তার পরই তো ঠাকুদ্দা আমার বাঁচে গেল। সে কী ডায়রিয়া, কী ডায়রিয়া! আপনে না থাকলি পারে কী যে হতো! আপনে আমাদের ভগমান।

তা শম্ভু কেমন আছে? অনেকদিন তোদের পাড়ায় যাওয়া হয় না। মোষগুলোকে নিয়ে হয়েছে বিরাট জ্বালা। এদের রেখে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। মনও চায় না।

ভগমানের দয়ায় ঠাকুদ্দা ভালোই আছে।

তা এই বিলের ধারে কী কাম তোর?

ঘেটকোল তুলতি আইচি। ঠাকুদ্দার শক করেচে ঘেটকোল ভুনা খাবি।

বাহ বাহ! তোর না একটা ছাওয়াল হয়েছে?

এই জন্যিই বলি, আপনে সাক্ষাৎ ভগমান। আমার ছাওয়াল হয়েচে, সিডাও আপনের জানা। ভগমানের কাছ দোয়া কইরেন আমার ছাওয়ালের জন্যি।

তোর ছাওয়ালের জন্য মোষের দুধ নিয়ে যা। এই বতি, একটা মোষের দুধ দুয়া তো। প্রতিদিন আসবি এই সময়ডায়। আমি থাকব। দুধ নিয়ে যাবি। দুধ না খালি বাচ্চাকাচ্চার মাথা খুলবে কীভাবে! তোর ছাওয়ালের জন্যি প্রতিদিন হাফ সের দুধ বরাদ্দ।

চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো ঘটনারাজি এমনভাবে চোখের সামনে নাচে, তামিমের সবকিছু রূপকথা রূপকথা লাগে। শিবপুরে বাড়ি হলেও মালতিকে সে চিনতে পারেনি। তার জগৎ বড্ড ছোট। পড়ার টেবিল আর স্কুলের মাঝেই বাহিত হয় তার জীবন। এর বাইরে ডুবোচরের মতো মাঝে মাঝে উঁকি মারে নদীতীর ও গোরস্তান। এই তার বিচরণস্থল। মালতিকে সে চিনবে কীভাবে! না চিনলেও বুঝতে পারে, দাদাজানের প্রতি মুগ্ধতার অন্ত নেই মেয়েটার। এমন আরো কত মানুষের মুগ্ধতা যে অর্জন করেছেন দাদাজান, জানে না তামিম। সে এক ধেয়ানে চেয়ে থাকে মালতির বিগলিত মায়াভরা মুখটির দিকে। যেখানে লেপ্টে আছে চিরকালীন এক মমতামাখা মায়ের ছবি। লম্বা পা ফেলে কতক্ষণ পর বতি হাজির হয় মালতির সামনে। বতির হাতে কচুর পাতার ঠোঙা। ঠোঙার ভেতর দুধ। দুধভরা ঠোঙাটা সে খানিকটা তাচ্ছিল্য হেনে তুলে দেয় মালতির হাতে। আর ঝংকার দিয়ে বলে, কাইল থেকে বাটি আনবা। কচুর পাতায় লাবলুর দুধ দুয়ালাম, ওর একটা ইজ্জত আছে না!

বতির কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি দেখে মজা পায় তামিম। কিন্তু লাবলু জিনিসটা কী, ধরতে পারে না সে। তখন বুঝিয়ে দেন দাদাজান—লাবলু হলো মোষের নাম। ওই যে সবচেয়ে বাঁকা শিঙ যে মোষটার, ওর নাম লাবলু। নামটা বতিই দিয়েছে।

নাম পছন্দ? বতি ঝটপট করে তাকায় তামিমের দিকে।

লাবলু একটা নাম হলো! তামিমও তাচ্ছিল্য হানে বতির মতোই। এতক্ষণে সেও বুঝে গেছে, বতি একটা ফাঁপড়বাজ। ওর সাথে এমন আচরণই করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বতির মুখের বাতি নিভে যায়। গ্রাস করে অন্ধকার। তাহলে ভালো নাম কোনটা?

তোর মোষ, তুই ভাব। তোর মোষের নাম রাখার দায়িত্ব তো আমার না।

দাদাজান তাড়া লাগান—এখন আর নাম নিয়ে গবেষণা করে কাজ নেই। লাবলু লাবলু নামেই স্বস্তিবোধ করে। এর মাঝে অন্য নামে ডাকা শুরু করলে সে খেই হারিয়ে ফেলবে। এই মালতি, বাড়ি যা। আর প্রতিদিন আসবি। বতিকে আমি বলে রাখলাম।

তামিম খেয়াল করে, মালতি তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। তার চোখে-মুখে ফুটে থাকা জোছনার আলো বলে দেয়, দাদাজানের সামনে যতটা সময় সে থাকতে পারবে, ততটা সময় তার আনন্দের সময়। এই আনন্দ সে সহজে ফুরাতে চায় না। কিন্তু একটা সময় আনন্দে ইতি টানতেই হয়। তখন তাদের সামনে পড়ে এক ধবল নদী। নদীর বুকে কুয়াশা। কুয়াশার ওপর মেঘ। মেঘের ওপর আল্পনা। তামিমের

নদীকে মনে হয় এক ভ্রম, যার কাছে গেলেই সে দাদাজানকে হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু তাদের বহনকারী মোষ পানির দিকেই ছোটে। নদীতে মুখ ডুবিয়ে পানি খায়। দাদাজান হাত ইশারায় বলেন, নদীর ওপারে রূপপুর। এপারে শিবপুর। এই নদীতে গোসল করতে এসেই তো প্রথম দেখা তোর দাদির সাথে।

ওয়াও! কী বলছ এসব? তামিম খরগোশের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে দাদাজানের মুখের দিকে তাকায়। তারপর চোখে-মুখে রহস্য ফুটিয়ে বলে, তুমি এই নদীর পাড়ে দাদির সাথে প্রেম করেছিল?

ধুর পাগল! তখন কি ওসব করা যেত!

তাহলে? তামিমের কণ্ঠে কিঞ্চিৎ হতাশা।

এক ফাল্গুনের দুপুরে নদীতে গোসল করতে এসে তোর দাদিকে দেখলাম, মায়াভরা মুখ। বাড়ন্ত শরীর। ফুটন্ত রূপ। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আব্বাকে বললাম। রহিতনদের বাড়িতে প্রস্তাব গেল। হয়ে গেল বিয়ে। তারপর শুরু হলো আমাদের যৌথ জীবন।

ওই সময় দাদি দেখতে কেমন ছিল গো?

ওই যে বললাম, মায়াভরা মুখ। বাড়ন্ত শরীর। ফুটন্ত রূপ। হাঁটু অবধি লম্বা চুল। মোষের দুধের মতো উজ্জ্বল রঙ। আর...

আর?

ভুবন ভোলানো লাজুক হাসি।

ওই হাসিতেই তুমি কুপোকাত হয়ে গেলে?

তা বলতে পারিস।

দাদাজান, তুমি বলছিলে দাদির গায়ের রঙ ছিল মোষের দুধের মতো উজ্জ্বল। যদিও আমরা সেই ঔজ্জ্বল্য পুরোপুরি দেখিনি। বয়সের সাথে সাথে হয়তো মানুষের সবকিছুই মলিন হয়ে যায়। কিন্তু তুমি তো শ্যামলা। আমরা নিশ্চয় দাদির রঙ পেয়েছি।

রঙে কী আসে যায় রে...।

তোমার ওই ভাবুক মার্কা কথাবার্তা ছাড়ো। তুমি বিয়ের গল্প বলো তো।

বিয়ের কথা কী বলব! বিয়ের সময় ছেলেরা থাকে বিরাট দুশ্চিন্তায়। বিয়ের দিনের কিছুই তাদের মনে থাকে না। আমারও নেই। শুধু একটা ব্যাপার মনে আছে। পালকি নিয়ে গিয়েছিলাম বিয়ে করতে। ফেরার সময় তোর দাদি পালকিতে বসা, আমি পাশে পাশে হাঁটি। পথের মাঝে যখন এই নদীটা এসে বুক বাড়াল, সবাই নৌকায় উঠলাম। পালকিও তোলা হলো নৌকায়। তোর দাদি কিন্তু পালকিতেই বসে রইলেন। নদীর স্রোতে নৌকা দোলে, দোলে পালকি। তোর দাদি ভয় পায়। আমি পালকি ধরে দাঁড়িয়ে থাকি আর চোখ ইশারায় সাহস দিই। তারপর তো বাড়িই চলে এলাম। এরপর তোর আব্বা হলো। কাকারা হলো। ফুপুরা হলো। আমার ঘর সোনার ফসলে ভরে দিল তোর দাদি, আমার রহিতন। আনন্দ-বেদনার অভিঘাতে দাদাজানের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

দাদাজানের গল্প ও গল্প বলার ঢঙ এত ভালো লাগে তামিমের, মনে হয়, সে কোনো নক্ষত্রের দেশে শিমুল তুলোর নরম বালিশে ঠেস দিয়ে হাত-পা মেলে বসে আছে আর চাঁদমামা তার সামনে এসে নিজ জীবনের গল্প বলছে। তামিমের সাথে সেই গল্পের শ্রোতা নক্ষত্ররাও। দাদাজানের স্বনির্মিত এই নৈসর্গিক জগৎ ছেড়ে নিজের পৃথিবীতে ফিরতে ইচ্ছা করে না তামিমের। এই নিসর্গের মাঝে তার অনন্তকাল থেকে যেতে ইচ্ছে করে। ডুবে যেতে ইচ্ছে করে। লীন হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তবু জীবন তার নিজস্ব প্রয়োজনেই আমাদেরকে ফিরিয়ে আনে। জীবনের প্রয়োজনে ফিরতে হয়, ফিরে আসতেই হয়।

তিন.

তামিমের মনে হয়, আজ রহমান পরিবারের যা কিছু অর্জন, হোক সেটা বৈষয়িক কিংবা অবৈষয়িক, সব ওই দাদাজানের কল্যাণে। রহমান পরিবারের সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক অর্জনে বাবার তেমন কোনো ভূমিকা নেই। জন্মেই তিনি এক সাজিয়ে রাখা স্বর্গ পেয়েছিলেন। সেকালে এমন সৌভাগ্য কম মানুষই পেত। সেই অর্থে বাবা পরম সৌভাগ্যবান। গ্রামীণ প্রাচুর্যের মাঝে বড় হয়েছেন, তবু ছোট থেকেই বাবা ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির অবৈষয়িক মানুষ। অর্থকড়ির ভাবনা কিংবা দুর্ভাবনা তাকে খুব বেশি তাড়িত করেনি কোনোকালেই। সম্পদের লোভও ছিল না একবিন্দু। বাবাকে একজন নির্ভেজাল নির্লোভী মানুষ হিসেবেই দেখে আসছে তামিম। জমিজমাসহ দাদাজান যে বিত্তের অঢেলতা রেখে গেছেন, সেই বিত্তের বাতাসে বাবা পড়াশোনাটাও শেষ করেননি। প্রথম যৌবনে ঢাকার কী এক কোম্পানিতে ঢুকেছিলেন। দুই মাসও টিকতে পারেননি। ফিরে এসেছেন শিবপুরে। তার একই কথা—পৈতৃক সম্পত্তির প্রাচুর্য থাকতে পরের দাসত্ব কেন করব! দাদাজানও ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। তবে উদাসীন হলেও তার উদয়াস্ত পরিশ্রম ছিল প্রবাদতুল্য। সম্পদের জন্য তার এই পরিশ্রমের প্রধান যুক্তি ছিল এই : দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দের কাজ। আর এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থকড়ি। অর্থ না থাকলে আমি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাব কী দিয়ে। তাই তো আমার এই দিন-রাত খেটে চলা। পরিশ্রমী না হলেও দাদাজানের বদান্যতার গুণটা পেয়েছেন বাবা। বাইরের বসার ঘরে প্রতিদিন এই যে এত এত মানুষের ভিড়, তাদের অধিকাংশই কৃপাপ্রার্থী। কেউ অসুস্থ, ওষুধ কেনার টাকা নেই, কারো ঘরে খাবার নেই, কেউ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। মানুষগুলোর দুঃখ ঘোচাতে বাবার হাতে কিংবা হৃদয়ে কখনো কার্পণ্য দেখেনি তামিম।

ছানা দুটোকে মানুষ করে উড়িয়ে দেয়ার পর যতদিনে আবার একই মাচার ভিন্ন বাসায় ডিম পাড়ে ঘুঘু দম্পতি, ততদিনে নির্বাচনের ডামাডোল শুরু হয়ে গেছে দেশে। তার মৃদু ঢেউ এসে লেগেছে শিবপুরে। তামিমদের বসার ঘরে এখন আর কৃপাপ্রার্থীরাই আসে না, আসে এমন লোকও, যাদের চলন-বলন ভালো ঠেকে না তামিমের। তারা আসে মোটরসাইকেলে শব্দ তুলে, ঘরের পেছনে ধুলো উড়িয়ে, উচ্চশব্দের হাসি ছড়িয়ে। তারা আসে একেক দিন একেক দল। কখনো তারা তামিমের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কথা বলে, সিগারেট টানে, ধোঁয়া ওড়ায়, আর হঠাৎ হঠাৎ জানালার দিকে চোরা চোখ ফেলে। লোকগুলোকে দেখলেই মা কেমন তটস্থ হয়ে ওঠেন। দ্রুত বন্ধ করে দেন বাইরের দিককার জানালার কপাট। মায়ের প্রাণোচ্ছল মুখটায় বাসা বাঁধে বিরক্তি। এবং এই দিনগুলোতে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বাবা-মায়ের মাঝে তর্কাতর্কি হয়। বোঝাই যায়, ওদের আসাটা মায়ের পছন্দ না। কিন্তু বাবা নিরুপায়। সরাসরি ভোটের রাজনীতি করেন না বাবা। কিন্তু তিনি সমাজের বিশিষ্টজনদের একজন। তাকে পাশ কাটানোর সাধ্যও নেই রাজনীতির। ফলে লোকগুলো দুদিন পরপর আসেই। আসতে হয়ই। বাবার সাথে নানা সলাপরামর্শ করে। কীভাবে ভোট বাড়ানো যায়, কীভাবে বাবা তার অধীনস্থ ও উপকারভোগীদের বশে রাখতে পারে তার সলাপরামর্শও চলে। আর যখন ওদের যাওয়ার সময় হয়, বাবাকে চাঁদা দিতে হয়। আর মাকে দিতে হয় চা।

মানুষের জন্য টাকা খরচ—এই বাড়িতে ব্যাপারটা সবসময়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু পরোপকার আর চাঁদা প্রদান তো এক বিষয় নয়। এ নিয়েও অশান্তি হয় বাড়িতে। এদিকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে তামিমের। পড়ার বাইরে সে অন্য কিছু ভাবতে পারে না। লোকগুলো যখন থাকে, তাদের বেপরোয়া গমগম হল্লাহাসিতে পড়তে পারে না তামিম। আবার লোকগুলো যখন বিদায় হয়, মা-বাবার স্নায়ুযুদ্ধ অবশ করে রাখে তামিমের মন। ফলে ও প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি ছেড়ে। কখনো হাতে থাকে বই। কখনো ঠোঁটে থাকে পড়া। নদীতীর কিংবা গোরস্তান হয় ওর গন্তব্য। জায়গা দুটো এত প্রিয় তামিমের, গাছের ছায়া আর পাখির ডাকে কেমন মায়াময় লাগে। পড়তে পড়তে যখন ও ঘুমিয়ে পড়ে গোরস্তানের কাঁঠাল গাছে হেলান দিয়ে, দাদার সাথে দেখা হয়। কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা, শ্যামলা রঙের লম্বা-চওড়া প্রতাপশালী মানুষ। সবসময় তাকে মোষের পিঠে চাপাইগাছি বিলেই দেখে তামিম।

মোষগুলো তোমার এত প্রিয় কেন দাদাজান? দাদাকে সেই লাবলু নামের মোষের গালে চুমু খেতে দেখে জিজ্ঞেস না করে পারে না তামিম।

আগের দিনের মতোই একটানে নাতিকে মোষের পিঠে তুলে নেন দাদাজান। জাপটে ধরেন কোলের ভেতর। আগের দিনের মতোই

দাদাজানের লম্বা দাড়ি সুড়সুড়ি কাটে তামিমের ফরসা ঘাড়ে তামিম জিজ্ঞেস করে, তোমার এই মোষের নাম কী, দাদাজান?

খালিদ দাদাজানের অবিলম্বিত উত্তর

এই নাম কেন?

বীর পালোয়ান খালিদ বিন ওয়ালিদের নামে নাম

নবিজির সাহাবি খালিদ বিন ওয়ালিদ মায়ের মুখে যার নাম অনেকবার শুনেছে তামিম তিনি এমন যোদ্ধা ছিলেন, যার জীবন অভিধানে পরাজয় বলে কিছু ছিল না এমনকি ইসলাম গ্রহণের আগে, যখন তিনি কাফেরদের দলের মানুষ, তখনো একবার যুদ্ধ করেছিলেন নবিজিদের বিরুদ্ধে, সেই যুদ্ধেও তিনি জয়ী হয়েছিলেন কী সাংঘাতিক ব্যাপার এই গল্প প্রথম যেদিন শুনেছিল তামিম, বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল কিন্তু দাদাজানের মোষের নাম কেন খালিদ! জিজ্ঞেস করতে হয় না তার আগেই কথা বলে ওঠে দাদাজানের ভরাট স্বর স্বপ্নময় হয়ে ওঠে তার চোখ শক্ত হয়ে ওঠে তার চোয়াল তামিমের শরীরে তার বাহুর বন্ধন দৃঢ় হয়। বোঝা যায়, এই নামকরণের পেছনে আছে প্রেরণাদায়ক সাহসের কোনো গল্প দাদাজানের কণ্ঠ হয়ে ওঠে সেই সাহসী ইতিহাসের ধারাবিবরণী দাদাজানের বয়ানের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রের মতো সবকিছু দেখতে পায় তামিম তার চোখের সামনে এখন বহুকাল পেছনের ফেলে আসা অতীত, যদিও তা চিরকালই প্রাসঙ্গিক একাত্তর নেমেছে শিবপুরে মৃত গরুর ওপর যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন নামে সেভাবে শুধু কি শিবপুরে, পুরো বাংলাদেশে পুরো দেশটাই যেন এক পাকের ভাগাড়, তার ওপর হাজার হাজার শকুনের বিষাক্ত নখ-ঠোঁট ঢাকায় গণহত্যা চালিয়ে শকুনেরা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে তার আঁচ এসে লেগেছে শিবপুরেও সেই শিবপুর, দাদাজান যেখানকার এক খানকাবিহীন পির সেই শিবপুর, যেখানকার প্রতিটি মানুষ; এমনকি দোয়েল মাছরাঙাও দাদাজানকে ভালোবাসে সেই শিবপুর, যেখানকার বাতাস দাদাজানের মহত্ত্বতের সাক্ষ্য দেয় এই শিবপুরের ঘাসে ঘাসে বারুদমাখা ভয় আর আতঙ্ক ধ্বনিত হতে থাকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন দাদাজান কাচারি ঘরে গ্রামের গণ্যমান্য সভাসদদের নিয়ে সলাপরামর্শে বসেন কিন্তু কারো মাথায় কোনো সলা খেলে না ভয়ে সবাই এটচু পলায়নই নাকি একমাত্র সমাধান কিন্তু এই মাটি, মানুষ ও প্রকৃতি থেকে পলায়ন দাদাজানের চূড়ান্ত অপছন্দ যে গাঁয়ের ধুলো তাকে ভালোবাসে, যে গাঁয়ের দোয়েল তার সাথে কথা কয়, যে গাঁয়ের গনগনে সূর্য তার ওপর রহম করে, সেই গাঁ ছেড়ে তিনি কোথায় পালাবেন! এতে গাঁয়ের সাথে নেমকহারামি হবে না? দাদাজান শিবপুর ছেড়ে কোথাও যান না এদিকে প্রতিদিনই শোনা যায় 'মেলেটারি আসছে মেলেটারি আসছে' ভীতিধ্বনি তারা যেন ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী তারা যেদিকে যায় পানি শুকিয়ে যায় তারা যে পথে হাঁটে সবুজ ফুরিয়ে যায় তারা যেদিকে চায়, বাতাসে আগুন ধায় তামিম দেখে, মিলিটারির ভয়ে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে শিবপুরের মানুষেরা তারা গহিনে, তারা সীমান্তবর্তী কোনো অঞ্চলে চলে যাচ্ছে বিশেষ করে হিন্দুরা, যাদেরকে বেছে বেছে মারছে মিলিটারি, তারা এখানে থাকার ঝুঁকি নেয়নি না কিন্তু দাদাজান গাঁটি হয়ে বসে থাকেন, তার কাচারি ঘরে প্রতিদিন নিয়ম করে মোষ চরান, সন্ধ্যায় ঘরে ফেরেন একশ বিঘার ওপর তার ধানি জমি ধান কেটে ঘরে তুলতে মোষের গাড়ির বিকল্প নেই তাই তো মোষগুলোর এত সমাদর

যুদ্ধের দিন দ্রুত ফুরায় না যুদ্ধের দিন হয় বুকের ওপর চেপে বসা পাথরের মতো ভারী যুদ্ধদিনের সন্ধ্যাগুলো হয় শবযাত্রার মতো দীর্ঘ দাদাজান একদিন শুনতে পান, তাদের মহকুমায় ঢুকে পড়েছে আর্মি আরেক দিন শুনতে পান, তাদের পাকের ইউনিয়নে তাণ্ডব চালিয়েছে আর্মি কিন্তু কী এক অদ্ভুত ঐশ্বরিক বলে দাদাজান ধরে নেন, শিবপুরে আর্মি নামবে না শিবপুরে আর্মি আসতে পারে না কিন্তু দাদাজানের ধারণা অথবা অনুমান

THE IMPACT RANKINGS 2024

Rank 6
THE Impact Ranking 2024
among Universities in Bangladesh

WURI WORLD'S UNIVERSITIES WITH REAL IMPACT

Rank 69
in WURI's Global Top 300
Innovative Universities 2024

ULAB
UNIVERSITY OF LIBERAL ARTS BANGLADESH

UNLOCK YOUR POTENTIAL

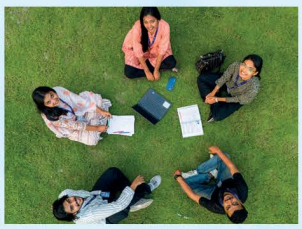

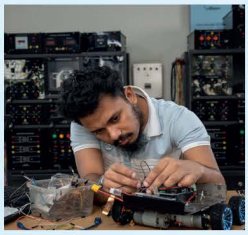

SIZE MATTERS.
QUALITY MATTERS MORE.

While our size grew significantly as we moved from Mohakhali to Dhanmondi to Mohammadpur, we measured our achievement through our international rankings, which is a reflection on our ability to impart quality education.

- The only university of Bangladesh to be ranked among the top 100 in the WURI rankings for the 4 straight years.
- Ranked 1 in SDG 5 (Gender Equality) and SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) in the Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2024.
- Recognized in the QS World University Rankings Asia 2025.

ulab.edu.bd

The international rankings are a testament of our commitment to quality education.

সত্য হয় না। সেপ্টেম্বরের এক আশ্চর্য দিনে, যখন সকালের মিষ্টি রোদ আমগাছের পাতার ফাঁক গলে তামিমদের উঠোনে নেমে আল্পনা আঁকেছে, তখন নদীতীর থেকে 'দ্রিম' শব্দ ভেসে আসে। যারা সেই মুহূর্তে মরিচ ভর্তা দিয়ে ভাত খাচ্ছিল, ভাত তাদের গলার ভেতর আটকে যায়। দাদাজানের হাতে তখন কাঁসার থাল, তাতে মচমচে মুড়ি, থালের কোনায় গুড়, মাত্রই দাদিজান থালটা তুলে দিয়েছেন স্বামীর হাতে। দ্রিম শব্দে দাদাজানের হাত থেকে কাঁসার থাল ঝনঝন করে মাটিতে পড়ে যায়। এই ঝনঝন শব্দ আল্লাহর আরশে পৌঁছায় কিনা জানেন না দাদাজান, তবে বুঝতে পারেন, তার কান দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ গরম বাতাস বেরোচ্ছে। তার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে—আর্মি তবে শিবপুরেও এসে গেল!

এরপরের দিনগুলো ছিল একই সাথে বিভীষিকাময় ও সাহসের। আর্মিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে যায় শিবপুরের দুই মাতব্বর আবদুল জলিল ও আবদুল মজিদ। শেষ মুহূর্তে কী ভেবে তারা দাদাজানের কাছে ছুটে আসে। হন্তদন্ত হয়ে বলে, দেওয়ান ভাই, মেলেটারিদের স্বাগত জানাতে হবে না? যাবেন না আপনে নদীর পাড়ে? তাদের স্বাগতম না জানালে সবকিছু ছারখার করে দেবে। আশপাশের সব গ্রামে এড়াই হয়েছে।

তখন কাচারি ঘরের খুঁটির গলায় দাদাজানের শক্ত থাবা। তখন দাদাজানের শ্যামলা কপালে ছুটে বেড়ায় দপদপে শিরা। তখন দাদাজানের চেহারায় আশ্রয় নেয় সাগরের গাম্ভীর্য। দাদাজান কথা না বলে স্বগতোক্তি করেন : যারা হাজারে হাজারে মানুষ মারছে, বাড়িঘর পোড়াচ্ছে, ধর্ষণ করছে; তাদের স্বগত জানাতে যাব, এ তোরা কী বলিস?

তামিম দেখতে পায়, তার পালোয়ান দাদাজান ক্রোধের চোটে শক্ত এক ঘুসি মারেন কাচারি ঘরের তালকাঠের খুঁটিতে। অমনি দুই ভাগ হয়ে যায় খুঁটিটা। তালকাঠের সুচালো আঁশের খোঁচায় রক্তাক্ত হয় তার হাত। কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই দাদাজানের। যেখানে গোটা দেশের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরছে, সেখানে হাতের এই চামড়া ছেলা রক্ত খুবই তুচ্ছ। দাদাজান মুখের ওপর না করে দেন—খুনিদের স্বাগত জানানো এই দেওয়ান রহমানের শান না। আমি পারব না।

তামিম দেখে, এর পরের ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকে। শিবপুর প্রাইমারি স্কুলে ক্যাম্প করে মিলিটারি। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দেখভালের বিষয়ে নিয়োজিত হয় আবদুল জলিল ও আবদুল মজিদ, যারা শিবপুরের দুই বন্ধু হিসেবে পরিচিত। তামিম জানতে পারে, বহু বছর পর, আঠারোর নির্বাচনে যে মানুষগুলো বারবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে নির্বাচন ইস্যুতে, তাদের মাঝে আছে আবদুল জলিল ও আবদুল মজিদের দুই সন্তান। কিন্তু সেই গল্প তামিম যেহেতু নিজ বাড়িতে ঘটতে দেখছেই, তামিম তাই একাত্তর থেকে সরে না। সে দেখে, আবদুল জলিল ও আবদুল মজিদকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে আরো কতক জানবাজ রাজাকার। গুরুত্বপূর্ণ নয় ভেবে তামিম তাদের নাম জানার কৌতূহল দেখায় না। মিলিটারি শুরুতেই হিন্দুপাড়া জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয় রাজাকারদের। সবাই জানত হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু পাড়ায় আগুন দিতে গিয়ে শম্ভুদের পরিবারের সন্ধান পায় রাজাকাররা, যে শম্ভুর চোখে লাগার মতো এক নাতনি আছে। নাতনির নাম মালতি। রাজাকাররা মালতিকে ধরে আনতে থাকলে শিবপুরের মাটিতে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনার জন্ম হয়। দাদাজানের এক মোষ, যাকে তিনি খালিদ নামে নামকরণ করেছেন পরবর্তীতে, সেই মোষ রশি ছিঁড়ে ছুটে যায় রাস্তায় এবং রাজাকারদের ওপর চড়াও হয়, যারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মালতিকে। ফলে রাজাকারদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় মালতি এবং তখনই বিধ্বস্ত নাতনিকে নিয়ে জঙ্গলে পালায় শম্ভুনাথ। তামিমের মনে পড়ে, সেই যে সেদিন, খালিদের সামনে গড় হয়ে প্রণাম করেছিল মালতি, চাপাইগাছির চরে, তার কারণ তবে দাদাজানের মোষ কর্তৃক তার জীবন ও ইজ্জত রক্ষা। এক অলৌকিক উপকার থেকে নিংড়ে আসা ভক্তিবোধ। ব্যাপারটা নিয়ে দাদাজানকে জিজ্ঞেস করতে যায় তামিম, কিন্তু তার ফুরসত পাওয়া যায় না। কারণ একাত্তরের শিবপুর তখন টালমাটাল। এসব শান্ত অথবা অগুরুত্বপূর্ণ কথা শুনবার জন্য বহু সময় পড়ে আছে জীবনে। এখন বরং শিবপুরের রাজাকারদের ওপরই চোখ রাখা জরুরি, যারা কিছুক্ষণ আগে মোষের হাতে পরাস্ত হয়ে শিকারি হাতছাড়া করেছে। তামিম খেয়াল করে, পরাজয়ের চিহ্ন মুছে তারা ক্যাম্পে ফিরে যায় আর শিকারি হাতছাড়া হওয়ার তথ্যটি চেপে যায় প্রভুদের সামনে। তারা বলে, সব মালাউন ভাগ গিয়া। সব মালাউনকো মাকান আগ লাগা দিয়া।

ক্যাপ্টেন চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে চিন্তিত মুখে বলে, আওর মুক্তি? মুক্তি মিলেগা অর নেহি?

এলাকা মে কুছ মুক্তি নেহি, ছার। রাজাকারগুলো হড়বড় করে বলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

মালাউনদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং এই এলাকা মুক্তিমুক্ত—এই তথ্যেই খুশি হয়ে যায় আর্মি ক্যাপ্টেন। বুক ভরা প্রশান্তি নিয়ে সেই রাতে ঘুমাতে যায় সে। শঙ্কা নেই ভেবে অন্যান্য সৈন্যদের মাঝেও নেমে আসে ক্লান্তি ও সাবধানহীনতা। এই সুযোগটাই নেয় দাদাজানের মোষবাহিনী। নিপীড়ক যখন দুর্বার হয়ে ওঠে, মজলুম যখন ভয়ে বাকহীন হয়ে পড়ে, তখন জালিমের বিরুদ্ধে প্রকৃতি হয়ে ওঠে প্রতিশোধপরায়ণ। প্রকৃতির এই চিরায়ত রীতি হরফে হরফে ফলে যেতে দেখে শিবপুরের অপলায়ন বাসিন্দারা। রাত যখন গভীর হয়, যখন গোরস্তান থেকে থেমে থেমে শিয়ালের ডাক ভেসে আসে, যখন জায়নামাজের সেজদায় আহত বকের মতো ফোঁপাতে থাকেন দাদাজান, তখন শিবপুর প্রাইমারি স্কুল মাঠে তিন জোড়া মোষের ছায়া ভেসে ওঠে। মোষগুলো যখন দেখে, তাদের প্রতিপক্ষ নির্ভার দেহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমাচ্ছে, তাদের ঠোঁটে ফুটে ওঠে হাসি। সেই হাসি দেখতে পায় শুধু তামিম, প্রকৃতির সাথে যার সম্পর্ক সুগভীর। মোষগুলো একেক সৈন্যকে লক্ষ্য বানিয়ে ছুটে যায় এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বশক্তি দিয়ে। সবচেয়ে সাহসী ও শক্তিশালী মোষ, পরবর্তীতে দাদাজান যার নাম রাখবেন খালিদ, সে ঢুকে পড়ে স্কুলঘরের ভেতরে এবং চড়াও হয় ক্যাপ্টেনের ওপর। প্রত্যেক সৈন্যকে থেঁতলে দিয়ে, কারো কারো কোমর ভেঙে দিয়ে, দুজনকে হত্যা করে মোষগুলো যখন বেরিয়ে আসে ক্যাম্প ছেড়ে, ততক্ষণে দু-একজন সৈন্যের রাইফেল গর্জে উঠেছে। সেই গুলির আওতা থেকে তৎক্ষণাৎ পালাতে পারে না সবগুলো মোষ। দুটো মোষ, দাদাজানের প্রিয় দুটো মোষ, ধাতব গুলি খেয়ে পড়ে যায় স্কুল মাঠে। তারা তড়পায়। পুরো বাংলাদেশের মতো তড়পায়। তারপর রক্তের প্লাবন ছুটিয়ে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায় তাদের বিশাল দেহ, বাকিরা পালিয়ে যায় জঙ্গলে।

সেই রাতেই শিবপুরের ওপর কেয়ামত নেমে আসার কথা ছিল। কিন্তু সৈন্যরা আহত, বিশেষত ক্যাপ্টেন ভাঙা কোমর নিয়ে তৎক্ষণাৎ কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। ফলে কেয়ামতের জন্য ভোর পর্যন্ত অপেক্ষার সুযোগ পায় শিবপুরবাসী। তারা বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটে চলেছে আশপাশে। কিন্তু কী ঘটছে ধরতে পারে না। ফলে বুক ধড়ফড় আর দেহ থরথর কাঁপুনি ছাড়া তাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। ওদিকে দাদাজান, তখনো তিনি সেজদায় রত, রাইফেলের শব্দ, মোষের চিৎকার ও গোঙানি তাকে জাগিয়ে তোলে জায়নামাজ থেকে। মোষের ওই গোঙানি খুব পরিচিত লাগে তার। জায়নামাজ গুটিয়ে তিনি দ্রুত ছুটে যান গোয়ালে এবং কোনো মোষকে না পেয়ে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকেন শব্দের উৎসের দিকে। স্কুল পাড়ার ফরিদ, যার ঘরের জানালা স্কুল মাঠের দৃষ্টির দূরত্বে অবস্থিত, নিশ্বাস বন্ধ করে সে দেখছিল এক অলৌকিক ঘটনা, বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী চোখেরাই কেবল তা দেখতে পায়। রূপকথায় এমন অনেক ঘটনা সে শুনেছে জীবনে, কিন্তু দাদা-নানার ঠোঁট থেকে রূপকথার গল্প যে উঠে আসতে পারে তার ঘরের পেছনে, কল্পনাও করেনি ফরিদ। ঘটনা হজম করতে তার লেগে যায় অনেক সময়। যখন গুলি চলে, গোঙাতে গোঙাতে মোষ দুটোর বিশাল দেহ নিথর হয়ে আসে, এরপর ক্যাম্পজুড়ে হুলুস্থুল পড়ে যায়, তখন ধাতস্থ হয় ফরিদ। ঘরের দুয়ার খোলা রেখেই সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে রহমান বাড়ির দিকে। পথের মাঝেই সে পেয়ে যায় দাদাজানকে এবং সবকিছু খুলে বললে দাদাজান সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। ফরিদ দাদাজানের কানে কানে বলে, চাচা, তুমি পালাও। সকাল হতে হতেই ওরা তোমাকে ধরবে,

মেরে ফেলবে, তোমার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। তোমার মোষগুলো জঙ্গলে পালিয়েছে। তুমিও পালাও।

এত দ্রুত ঘটে যায় সবকিছু, দাদাজানের মস্তিষ্ক সবটুকু ধারণ করতে পারে না। তিনি বোকা বোকা চোখে কতক্ষণ চেয়ে থাকেন ফরিদের দিকে। ফরিদ মৃদু ধাক্কা দেয় দাদাজানকে, শুনতে পাচ্ছ না? পালাও তুমি। আমরাও পালাচ্ছি। সকাল হতে হতে ওরা শিবপুরকে নরক বানাবে।

এইবার ঘোর ভাঙে দাদাজানের। মনে পড়ে, মিলিটারি আসার খবরে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে নানার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরিবারকে গ্রাম থেকে সরিয়ে দেয়ার দূরদর্শিতায় তিনি স্বস্তিবোধ করেন। পরক্ষণে তার মোষের কথা মনে পড়ে। ফরিদ বলেছে, তার দুটো মোষ মারা গেছে। মোষ দুটোর জন্য তার বুক ফেটে কান্না আসে।

কাঁদছ কেন চাচা! তোমার মোষগুলো মুক্তিযোদ্ধা। যে দুটো মারা গেছে, ওরা শহীদ। কয়জন এমন বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হয়, বলো! দাদাজানের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে আপ্লুত কণ্ঠে বলে ফরিদ। তার চোখে জল।

দাদাজান এবার শক্ত হয়ে ওঠেন। শক্ত হয়ে ওঠে তার চোয়াল। ক্রোধ ও আবেগের যুগপৎ ঘায়ে ফুলতে থাকে তার গলার শিরা। সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েই ফেলেন, যুদ্ধে যাবেন। যার অবলা প্রাণীরা মুক্তির সংগ্রামে নাম লেখাতে পারে, তিনি কেন নন! এরপর বাড়ির দেউড়িতে শেষ সেজদা ঠুকে মোষগুলোর মতো দাদাজানও হারিয়ে যান জঙ্গলের ভেতর। আর ওদিকে খেতে, এতিমের মতো পড়ে থাকে তার মাঠভর্তি পাকা ধান।

চার.

তামিম আমগাছের চামড়ার গায়ে কিছু একটা খুঁজছিল। তামিমা এসে বলে, ভাইয়া, তুমি কি গাছের গোড়ায় পাখির বাসা খুঁজছ?

অন্য সময় হলে ছোট বোনকে গাধা বলে ব্যঙ্গ করত তামিম। মোটা আমগাছের গোড়ায় পাখির বাসা—একমাত্র গাধারাই ভাবতে পারে। কিন্তু আজ তামিম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার অবস্থায় নেই। আজ তার মন বিমর্ষ। ভয়াবহ বিমর্ষ। আজ বোনের কথা তার কানেও পশে না। সে গভীর মনোযোগের সাথে গাছের গোড়ায় কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করে চলে।

ও ভাইয়া, এখানে কী করো তুমি? তামিমা ভাইয়ার আরো কাছে, একেবারে কোলের ভেতর সরে আসে। বোনের ন্যাকামোতে মেজাজ বিগড়ে যায় তামিমের। যার ফলে, জীবনে যা সে করেনি, আজ তা-ই সে করে বসে। তামিমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় মাটিতে। হতভম্ব তামিমা ধুলোর মধ্যে বসে থাকে। বিস্ময়-ব্যথায় কাঁদতেও ভুলে যায় সে। চোখ বড় বড় করে সে কেবল চেয়ে থাকে হঠাৎ অন্য রকম হয়ে যাওয়া ভাইয়ার দিকে।

মা! বাবা! কোথায় তোমরা? গাছের গোড়ায় কিছু একটা খুঁজে পেয়ে চিৎকার করতে থাকে তামিম। বাবা-মা দুজনই বাড়িতে ছিলেন। পুত্রের কণ্ঠের উৎকণ্ঠা লক্ষ করে তারা বেরিয়ে আসেন ঘর ছেড়ে। মা বলেন, কী হয়েছে, তামিম? গাছের গোড়ায় কী করিস? আর এমন চিৎকারই বা করছিস কেন?

তামিমা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সেও ততক্ষণে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে নিশ্চুপ হয়ে গেছে।

তামিম জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বাবা, আমাদের এই আমগাছের গোড়ায় পোড়া দাগ কেন?

বাবার কপাল কুঁচকে যায়। মা বারান্দা ছেড়ে উঠোনে নেমে আসেন। নামতে নামতে অনুসন্ধানী কণ্ঠে বলেন, পোড়া দাগ! কই?

এই যে দ্যাখো। বহুকালের পুরনো, ঝাপসা হতে হতে আবছা হয়ে যাওয়া এক পোড়া দাগের দিকে ইশারা করে তামিম, যা চোখেই ধরে না মায়ের।

সকালবেলা তোর কী হয়েছে বল তো? আমি তো কোনো দাগই দেখছি না। মা খানিকটা বিরক্তিই প্রকাশ করেন।

যে ক্ষতের ওপর দিয়ে বহু যুগের ধুলো উড়ে যায়, সেই ক্ষত দেখা এত সহজ নয়, মা। তার জন্য প্রয়োজন দিব্যদৃষ্টি। এক রাতের মধ্যে তামিম হঠাৎ যেন বড় হয়ে গেছে। কী কঠিনভাবে কথা বলছে। মা হতভম্ব হয়ে যান। বাবা এবার ধীরে ধীরে নেমে আসেন উঠোনে। পুত্রের কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলেন, এই গাছ, গাছের পোড়া দাগ সম্পর্কে তোকে কে বলেছে?

আগে বলো, দাগটা কিসের?

যেভাবেই হোক, সবটা তুই জানতে পেরেছিস বলেই আমার ধারণা। তার পরও আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে চাওয়ার কোনো অর্থ নেই।

বাবা ঠিকই বলেছেন। দাদাজানের কাছ থেকে সবটাই জানতে পেরেছে তামিম। শিবপুরের সেই ঐতিহাসিক রাতে, দাদাজানের দুটো মোষের শহীদ হওয়ার রাতে, দাদাজানের মোষগুলোর হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ওঠার রাতে, দাদাজানের মুক্তিযুদ্ধে গমনের রাতে, আক্রান্ত হয়েছিল তামিমদের বাড়ি। তামিম তখন পৃথিবীতেই আসেনি। তামিমের বাবা তখন মায়ের কোলের উষ্ণতায় নানা বাড়ির আশ্রয়ে। তবে আমগাছটা তখন থেকেই পরিণত। তামিমের সেই সময়ের দাদাবাড়ি আক্রমণ করতে এসেছিল মিলিটারি বাহিনী, তাদের পথ দেখিয়ে এনেছিল আবদুল জলিল, আবদুল মজিদ ও তাদের সহচররা। দেওয়ান রহমানের পুরো বাড়িটাতেই তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তারই আঁচ এসে লেগেছিল আমগাছটার গায়ে এবং আগুনে পুড়তে পুড়তে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা একখণ্ড টিন ছিটকে এসে পড়েছিল আম গাছের গোড়ায় এবং বাকলের গায়ে তৈরি করেছিল গভীর এক ক্ষত। আজ, এত বছর পর, তামিম যার ক্ষত আবিষ্কার করে বাকরহিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বাবা ভেবেছিলেন, পোড়া দাগের এই ইতিহাসটুকুর ভেতরই ঘটনার ইতি ঘটবে। কিন্তু তামিম যখন ফস করে বলে বসে, বাবা, সেদিন কারা মিলিটারিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়িতে; থতমত খেয়ে যান আজিজুর রহমান। মা বুঝতে পারেন, স্বামী তার কিছু একটা লুকাচ্ছে। কিন্তু নিরীহ একটা গাছের পোড়া দাগের ভেতর কী এমন অপ্রীতিকর অতীত থাকতে পারে যার জন্য আজিজুর রহমান আজ বিব্রত!

বলো, বাবা, কারা সেদিন আমার দাদার সাজানো বাড়িটি পুড়িয়ে দিয়েছিল?

তুই কতটুকু জানিস? বাবার কণ্ঠ নদীর ঢেউয়ের মতো কেঁপে কেঁপে যায়। বোঝাই যায়, সবটুকু বলার সাহস তার নেই।

আমি তোমার মুখে শুনতে চাই।

আবদুল জলিল ও আবদুল মজিদ। বাবা খানিকটা নিচুস্বরে নাম দুটো উচ্চারণ করেন।

গত কয়েক দিন ধরে নির্বাচন উপলক্ষে দুজন আমাদের বাড়িতে আসছে, রায়হান ও ফারুক চাচা, তোমার সাথে মিটিং করছে, মায়ের হাতের চা খাচ্ছে, এই দুজন কারা?

বাবা এবার মাথা নিচু করে থাকেন। মা বিস্মিত কণ্ঠে হড়বড় করে বলেন, এরাই তো আবদুল জলিল ও আবদুল মজিদের দুই ছেলে। ইয়া আল্লাহ, যারা আমাদের বাড়ি পুড়িয়েছিল, তাদের ছেলেদের সাথে তোমার দহরম মহরম।

দুজন রাজাকারের ছেলের সাথে তুমি মিটিং করো। একজন মুক্তিযোদ্ধার পুত্রবধূর হাতে তারা চা খায়। অথচ তাদের বাবারা আমাদের বাড়ি পুড়িয়েছিল। আমার দাদাজানকে ঘরছাড়া করেছিল। তুমি আর দাদি নানাবাড়ি আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলে। অথচ... তামিমের গলায় বাষ্প উঠে আসে। সে আর কিছু বলতে পারে না। একসাথে অনেকগুলো কথা বলে সে হাঁপাতে থাকে।

ঘরে আয়। ঘরে বসে কথা বলি। বাবাকে খুব অসহায় লাগে।

না। আমি এখানে দাঁড়িয়েই সব শুনতে চাই।

আমি কী করব, বল। ফারুক, রায়হান ওরা এই ইউনিয়নের সরকারি দলের বড় নেতা। আমি ওদের কখনো ডাকি না। তোর দাদার কারণে আমি মান্যবর মানুষ। সামনে ইলেকশন। তাই ওরা নিজ থেকে আমার বাড়িতে আসে। আমি কীভাবে ওদের বাধা দিই। এতদিনে তোর বোঝা উচিত, ওদেরকে উপেক্ষা করার ফল ভালো

CONFIDENCE
DRINKING WATER
Refreshes
in
every Drop
CONFIDENCE
DRINKING WATER

কনফিডেন্স

ভ্যাকুয়াম লবণ

ছড়িয়ে পড়েছে
বাংলার ঘরে ঘরে

মানুষের মুখের স্বাদ
হয়ে অন্তরে অন্তরে

দানায় দানায় আস্থা

হবে না। তাছাড়া ওদের বাবারা রাজাকার হলেও ওরা তো আর না।

তুমি দাদাজানের গৌরব ভোগ করলে তারা কেন পিতার কলঙ্কের দায় নেবে না!

গৌরবের পরম্পরা থাকে, কলঙ্কের তা থাকতে নেই। এতে অবিচার হয় না।

কিন্তু তুই কীভাবে এতকিছু জানতে পারলি? এবার পুত্রের মুখোমুখি দাঁড়ায় মা।

যারা জানতে চায়, তারা সবই জানতে পারে। যারা দেখতে চায়, তারা সবই দেখতে পারে। চোখ মেললেই আমি আমার অতীত, আমার পূর্বপুরুষের জীবন ও সংগ্রাম দেখতে পাই। কথাগুলো তামিম বিড়বিড় করে দূরাগত কণ্ঠে এমনভাবে বলে, যেন কণ্ঠের ওপর তার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তার হয়ে কথাগুলো অন্য কেউ বলে দিচ্ছে।

পুত্রের এই আকস্মিক এবং বিস্ময়কর পরিবর্তন ভালো ঠেকে না বাবা-মায়ের। তারা দৃষ্টিবিনিময় করে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরে উঠে পড়েন। নির্বাচনের আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে বাবার এই নীরবতা ও ম্রিয়মাণতা। বাইরে খুব বেশি যান না। চায়ের দোকানে বসেন না। ফারুক রায়হানরা এলে ততটুকু কথাই বলেন, যতটুকু না বললে উপেক্ষাটা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে ধরা পড়ে। নির্বাচনের পরপরই তামিমের ম্যাট্রিক পরীক্ষা। সে আর ইতিহাস বিষয়ে কাউকে ঘাঁটে না। না ঘেঁটে পড়ায় মন দেয়। মাঝে মাঝে গোরস্তানে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘাসের সাথে কথা বলে। কখনো নদীর ঢেউ গোনে। ঘুঘুর বাসার জন্য খড়কুটো গুছিয়ে রাখে। লাউয়ের ঝুলে পড়া ডগা মাচায় তুলে দেয়। লাউয়ের ডগার বেপরোয়া আস্ফালন প্রায়ই বিরক্তির উদ্রেক ঘটায়। এত বড় মাচা, তবু তার শূন্যে ঝাঁপ দেয়া চায়। তামিমের মাঝে মাঝে মনে হয়, বৃক্ষের লক্ষ্য আকাশ ছোঁয়া আর লাউ গাছের লক্ষ্য দিগন্তে যাওয়া। ম্রিয়মাণ ও গুটিয়ে থাকা বাবা নির্বাচনের আগের দিন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। এবারও নিশ্চয় নৌকা মার্কার জয় হবে। তার বাবা দেওয়ান রহমানের পছন্দের দল। বাবা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি না করলেও তিনি দলটির প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেন। সেই দুর্বলতা থেকেই আগামীকাল তিনি নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন। সেই বাসনা বুকে পুষে রাত পেকে ওঠার আগেই তিনি ঘুমাতে যান। সকাল সকাল যেতে হবে ভোট কেন্দ্রে—আগেই মাকে বলে রাখেন। সূর্য চোখ মেলতে মেলতে গোসল করে, তুলে রাখা পাঞ্জাবি পরে, পাঞ্জাবির ওপর মুজিব কোট পরে, তামিমের কাছ থেকে সুগন্ধি মেখে, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট কেন্দ্রে যান বাবা। জানালা দিয়ে বাবা-মায়ের গমনপথে চেয়ে তামিমের মনে হয় আজ ঈদ। বাবা ঈদগাহে যাচ্ছেন। তার শরীর দিয়ে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু এইটুকু, ঈদে বাবার সঙ্গে তামিম থাকে আর আজ মা।

ঈদগাহ মাঠের মতোই সাজানো হয়েছে ভোট কেন্দ্র। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে শিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের জানালা, যেখানে আজ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্কুলঘরের দিকে চেয়ে ক্ষণকালের জন্য বাবা কেমন আনমনা হয়ে যান। এই স্কুলেরই কোনো এক কক্ষে তার বাবার পোষা মোষ পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। দেওয়ান রহমানের মুখে বাবা কতবার যে শুনেছেন এই গল্প। সেই ক্যাপ্টেনের পরিণতির কথা ভেবে আজিজুর রহমানের ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসি চোখ এড়ায় না মায়ের। যেভাবে সংসারের কোনো কিছুই তার চোখ এড়ায় না। মা খোঁচা দিয়ে বলেন, এত ফুর্তি কেন তোমার মনে? মনে হচ্ছে ঈদ লেগেছে।

ঈদই তো। এই দেশে ভোট মানে উৎসব, জানো না তুমি?

উৎসবে লোক কই! বাবাকে খোঁচা দিতে ছাড়েন না মা।

সত্যি তো, যে উৎসবের স্বপ্ন বুকে এঁকে বাবা পথ চলছিলেন, ভোট কেন্দ্রের আরেকটু কাছাকাছি হতেই তার স্বপ্নের ডানা ভেঙে যায়। ভোট কেন্দ্রে লোক সমাগম এত কম যে তাতে উৎসবের উপযোগিতাই থাকে না! বাবা হোঁচট খান। কয়েকটি কুকুর ও এক জোড়া ছাগলকে তিনি শীত-সকালের রোদে ভোটের মাঠে শুয়ে থাকতে দেখেন। কয়েকজন পুলিশ জগতের সকল আলস্য নিয়ে বসে আছে বাইরের বেঞ্চে। যেন ভোটটা দ্রুত শেষ হলেই তারা বাঁচে এবং দ্রুত বাড়ি ফিরতে পারে। কেন্দ্রের প্রবেশপথে নিপাট ভদ্রবেশে দাঁড়িয়ে আছে ফারুক ও রায়হান। মুখ হাসি হাসি রাখলেও ভেতরের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তারা চেপে রাখতে পারছে না কোনোভাবেই। দীর্ঘ লাইন পাড়ি দিয়ে ভোট দিতে হবে জেনে মাকে নিয়ে সকাল সকাল এসেছেন বাবা। কিন্তু আসার পর কী হলো, প্রথম সিরিয়ালটাই তাদের। সহজে সিরিয়াল পেয়ে যাওয়ায় হতাশার মাঝেও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন বাবা। কিন্তু কেন্দ্রে প্রবেশ করতে গেলে বাধার মুখে পড়েন তিনি। রায়হান-ফারুকরা জানায়, তাদের ভোট দিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ ভোট আগেই হয়ে গেছে।

আগেই হয়ে গেছে, সে তো অন্যদের ভোট। আমার ভোট তো এখনো হয়নি। জোর গলায় বলেন বাবা।

রহমান ভাই, আপনের ভোটও আগেই হয়ে গেছে।

আমার ভোটও আগেই হয়ে গেছে! কখন হলো? বাবা বিস্ময়ে থ হয়ে যান।

রাতে।

রাতে? ভোট তো শুরু হওয়ার কথা সকাল ৮টার পর।

আরে ভাই, আপনেকেও কি বোঝায়ে বলতি হবি নাকি! নির্বাচনে বিরোধী দল নেই। আমরাই সব। তাই রাত থাকতি থাকতি আমরা নৌকায় সিল মারে ব্যালট বক্স ভরে রাখছি।

কী বলেন এসব?

তাছাড়া উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতি হলি নৌকা ছাড়া তো গতি নাই। অন্যরা আসলি তো দেশটারে জঙ্গি রাষ্ট্র বানায়া ফেলবিনি। তাই রাতের ভোটই উত্তম।

বুঝলাম। কিন্তু আমি তো নৌকা মার্কাই ভোট দেব। তাও আমার ভোট আগেই হয়ে গেছে?

আর কথা বাড়ায়েন না রহমান ভাই। ভাবিকে নিয়ে কষ্ট করে আইচেন। এবার দ্রুত বাড়ি ফিরে যান। ক্ষমতায় তো আমাদের নেত্রীই আবার আসছে। তো খামোখা এত কষ্ট ক্যান করবেন। যান যান, বাড়ি চলে যান।

ফারুক বাবার কাঁধ ধরে বাড়ির দিকে ঠেলতে থাকে। একজন রাজাকার পুত্রের এই শরীর স্পর্শ, বাড়ির দিকে ঠেলে দেয়া, পছন্দ হয় না বাবার। মনে হয় কোনো এক পিশাচ, নখরের থাবায় চেপে ধরেছে তার কাঁধ। তিনি শক্ত গলায় বলেন, বাড়ি তো যাবই। এখানে চিরকাল থাকার জন্য তো আসিনি। তবে ভোটটা দিয়েই যাব। শেষের দিকে তার কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা ও জেদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সেই জেদ কণ্ঠ বেয়ে নেমে আসে তার শরীরেও। মায়ের হাত মুঠো করে ধরে তিনি কেন্দ্রের ভেতর ঢুকতে যান। তখন শক্ত হয় রায়হান ও ফারুকের দেয়াল। তারা বাবা-মায়ের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আর শক্ত কণ্ঠে বলে, কেন্দ্রের ভেতর কারো ঢোকা বারণ। ওপরের নির্দেশ। সরি রহমান ভাই।

বাবার তখন মাথা গরম হয়ে গেছে। নিজে তিনি আওয়ামী লীগকে পছন্দ করেন, বাবা মুক্তিযোদ্ধা, এই নির্বাচনের জন্য অনেক টাকা চাঁদা দিয়েছেন, তার পরও তার কেন্দ্রে ঢোকা নিষেধ! তিনি ধাক্কা দিয়ে ঢুকতে গেলে তার দিকে ছুটে আসে প্রতিধাক্কা। সেই ধাক্কার টাল সামলাতে না পেরে বাবা পড়ে যান মাটিতে। তখনো বাবার মুঠোর ভেতর মায়ের হাত। বাবার সাথে মাও পড়ে যান মাটিতে। বাবা এতটাই অপমানিত হন, তার কণ্ঠে কোনো কথা ফোটে না। মা দ্রুত সামলে নিয়ে বলেন, কেন শুধু শুধু জেদ করছ। জানোই তো কিছু হবে না। এবার বাড়ি চলো। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন মা।

কিন্তু বাবা মরিয়া। মায়ের হাত ছেড়ে তিনি জোর করে পুনরায় কেন্দ্রে ঢুকতে চান। তখন সূত্রপাত হয় ধস্তাধস্তির। আর স্বাভাবিকভাবেই, সেই ধস্তাধস্তিতে, পরাস্ত হন বাবা। ভোট কেন্দ্রের সামনে, এক জোড়া ছাগল, কয়েকটি বেওয়ারিশ কুকুর, বেঞ্চে বসে থাকা অলস পুলিশ, কেন্দ্রের সামনে উঁকিঝুঁকি মারা কৌতূহলী জনতা এবং কালেমা পড়ে বিয়ে করা স্ত্রীর সামনে এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, তামিমের বাবা, আমাদের আজিজুর রহমান, চূড়ান্ত অপদস্থ হন। তার ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিতে লেগে যায় অপমানের কাদা। তার পালিশ করা চকচকা মুখে লেপ্টে যায় গ্লানির ধুলো। তার উদার,

প্রশস্ত কলিজায় বিঁধে যায় লাঞ্ছনার কাঁটা। সেই কাদা, সেই ধুলো, সেই কাঁটার আঘাত থেকে আর বের হতে পারেন না তিনি। সামনের জীবনেও আর কোনোদিন পারবেন বলে আমাদের মনে হয় না। আমরা দেখি, ভোট কেন্দ্রের মাঠে উপুড় হয়ে পড়েই থাকেন তিনি। তার গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে সকালের মিষ্টি বাতাস বয়ে যায় অথচ তার চোখে জল। সেই তপ্ত জলের অভিশাপে ভিজে যায় কেন্দ্রের মাটি। তার শুধু মনে হয়, মাটি যদি এই মুহূর্তে দুই ভাগ হয়ে যেত, আর তিনি ঢুকে পড়তে পারতেন মাটির পেটে, সে-ই ভালো ছিল। কিন্তু মাটি দুই ভাগ হয় না। এই পৃথিবী যে নির্মিত হয়েছে সৎ মানুষের দোজখ হিসেবে, তার আরো বহু নমুনার উপযুক্ত পাত্র হতে বাবাকে মাটির উপরেই পড়ে থাকতে হয়। আর সেইসব দুঃখ-দিন দেখবার জন্য আমরাও দম বন্ধ করে অপেক্ষা করি।

পাঁচ.

এসএসসিতে গোল্ডেন পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল তামিম। কিন্তু সে পেল এ মাইনাস। এর জন্য সবাই অবশ্য তাদের পারিবারিক দুর্ঘটনাকে দায়ী করছে, তামিমকে নয়। পরীক্ষার আগ মুহূর্তে যে পরিবারের ওপর দিয়ে বিপর্যয়ের সাইক্লোন বয়ে যায়, সেই পরিবারের কোনো পরীক্ষার্থীর আর স্বাভাবিক পরীক্ষাটা দেয়া হয় না। সেদিন ভোট কেন্দ্র থেকে বাবা-মা একা ফিরতে পারেননি। ভোট কেন্দ্রের আশপাশে অবশ্য ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর বাইরে থাকা কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। কিন্তু তারা যেহেতু নিরীহ এবং ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরের লোক, তাই তারা কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। অবশ্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর সবকিছু শান্ত হয়ে এলে তারা রহমান পরিবারকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কী এক অদ্ভুত জেদের কারণে বাবা ভোট কেন্দ্রেই বসে রইলেন। কেন রইলেন? তিনি হয়তো মনে মনে কোনো সাংবাদিকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যিনি তার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের খবরটা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু কোনো সাংবাদিক সেদিন কেন্দ্রে আসেনি। অথবা আসতে দেয়া হয়নি। ততক্ষণে তামিমের কাছে পৌঁছে গেছে সংবাদ। সংবাদটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী দুলে উঠেছিল তামিমের। বই-খাতা ছুড়ে দিকশূন্য অবস্থায় সে ছুটে গিয়েছিল ভোট কেন্দ্রে আর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অবস্থায় চড়াও হয়েছিল রায়হান ও ফারুক কাকার ওপর। মাঝখানে পুলিশ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে আরো গুরুতর কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সূত্রপাত হতে পারত। পুলিশ দ্রুত রহমান পরিবারকে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। বাড়ি আসার পরও ক্রোধে ফুঁসছিল তামিম আর বাবা পড়েছিলেন একদম ভেঙে। খানিক বাদে তামিমের মাথা যখন কাজ করা শুরু করল, তখন সবচেয়ে দুঃসাহসী অথবা নির্বোধসুলভ কাজটি করে বসল সে। তার নিজের কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। বাবার আছে। আছে মানে শুধু অ্যাকাউন্টাই আছে। আর কিছু নেই। মাসে এক-দুবার ফুল, লতাপাতা, সূর্যোদয়, গ্রামের মেঠোপথ ইত্যাদির ছবি আপলোড করেন বাবা। এমন অবস্থা যার টাইমলাইনের, তাকে গালভরে কিংবা আহ্লাদ করে ফেসবুক অ্যাক্টিভিস্ট বা ফেসবুকার বলা যায় না। তা হওয়ার বয়স কিংবা যোগ্যতাও বাবার নেই। তবু এই দুঃসময়ে, মৃতপ্রায় সেই আইডিটাই হাতে তুলে নেয় ক্ষুব্ধ তামিম। বিধ্বস্ত বাবা-মাকে পাশে বসিয়ে বাবার অ্যাকাউন্ট থেকে লাইভে চলে যায় সে। দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেয় পাড়াগাঁয়ের এক ভোট কেন্দ্রে এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নৌকা মার্কায় ভোট দিতে গিয়ে কীভাবে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন সেই খবর। মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় লাইভটি। রাতের ভোটের সেই কলঙ্কময় দিনে, নানা ঘটনা দুর্ঘটনার ভেতরও বাবা হয়ে রইলেন টক অব দ্য কান্ট্রি। লাইভের সংবাদ রায়হানদের কানে পৌঁছতে সময় লাগল না। একপাল পুলিশসহ মোটরসাইকেলে শব্দ তুলে মুহূর্তের মাঝে তারা ছুটে এল তামিমদের বাড়িতে। মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে লাইভ ডিলিট করল। আর এই দুঃসাহসের চড়া মূল্য দিতে হবে মর্মে রেখে গেল হুমকি। হুমকিটা যে শুধু কথার কথা ছিল না, টের পাওয়া গেল কিছুদিন পর। বাবার সকল সামাজিক সম্মান নাটাইয়ে ঘুড়ির সুতা টানার মতো গুটিয়ে নেয়া হলো। বাবা মসজিদ কমিটির সদস্য ছিলেন। বাবা মাদ্রাসা কমিটির সদস্য ছিলেন। বাবা স্কুল কমিটির সদস্য ছিলেন। তার সকল সদস্যপদ বাতিল হলো। সকল সামাজিক কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবা হয়ে পড়লেন একলা এক মানুষ। আর তার সংক্ষুব্ধ ঢেউ, অবধারিতভাবেই, আছড়ে পড়তে লাগল তামিমের পড়ার টেবিলে। তামিমের আর পড়তে ভালো লাগে না। তার যত বই-খাতা সব ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করে কুমারের জলে। আর বসে থাকতে ইচ্ছা করে গোরস্তানে, দাদার কবরের পাশে। সেখানেই যে ওর জন্য অপেক্ষায় থাকে দুনিয়ার সকল সান্ত্বনা ও প্রশান্তি।

খালিদের সাথে তোমার আবার কবে দেখা হলো, দাদাজান? জীবনের চলমান ঘাত-প্রতিঘাত ভুলতে তামিম আশ্রয় নেয় দাদাজানের কোলে।

সেই রাতেই, জঙ্গলের ভেতর।

তারপর কী হলো?

দুই সাথিকে হারিয়ে ওরা কাঁদছিল। আমি ওদের সান্ত্বনা দিলাম। জীবনে বেঁচে থাকাই তো সব না। মহৎ কাজে প্রাণ উৎসর্গ করা হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম। তখন ওরা শান্ত হলো। এরপর ওদের বললাম, তোমরা এই জঙ্গলেই থাকবে, যতদিন না যুদ্ধ শেষ হচ্ছে। জঙ্গলে তোমাদের খাওয়ার জন্য প্রচুর ঘাস, লাতাপাতা আছে। আছে জলাশয়। আমার কথামতো ওরা জঙ্গলে রয়ে গেল। আমি চলে গেলাম যুদ্ধে।

সরাসরি যুদ্ধে? অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল তামিম।

সরাসরি তো যুদ্ধ করা যায় না। আগে গেলাম ট্রেনিং নিতে, ভারতে। তিন মাসের ট্রেনিং দুই সপ্তাহে শেষ করে ফিরে এলাম দেশে। তারপর যুদ্ধে গেলাম। এই যে আমার বাহুতে দাগ দেখছিস, এখানে গুলি লাগছিল। দাদাজান ফতুয়ার হাতা গুটিয়ে বাহু বের করে গৌরবের ক্ষতচিহ্ন দেখান। তামিম কাঁপা কাঁপা হাতে চিহ্নটা ছুঁয়ে দিয়ে বলে, দাদাজান, তোমার শরীরের সবচেয়ে দামি জায়গা এটা। এরপর সে দাদাজানের বাহুতে চুমু খায়। দাদাজন ওকে বুকের ভেতর আগলে নিয়ে বলে, মন দিয়ে পড়ালেখা কর। জীবনে নানা দুর্যোগ, দুর্বিপাক, সংকট আসবেই। জীবন মানেই তো সংগ্রাম। ভেঙে পড়িস না। ভেঙে পড়া ভিতু মানুষের কাজ। তুই আমার নাতি। তুই তো ভিতু না।

তুমি ভুল জানো দাদাজান। আমি ভিতুই। যখন গাছের কোনো পাতা হলুদ হয়ে ওঠে, আমার মন খারাপ হয়। আমার মনে হয় পাতারা গাছের সন্তান। হলুদ পাতার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, গাছটি তার সন্তানকে আর ধরে রাখতে পারবে না। তখন আর আমি ওই গাছ কিংবা পাতার দিকে চাইতে পারি না। ওদের কাছে যেতেও পারি না। খুব মন খারাপ হয়। মনে হয়, আমাদের প্রকৃতি থেকে খুব সুন্দর একটি দৃশ্য হারিয়ে যাবে। বলো, ভিতু না হলে কেউ এমন করে ভাবে?

এটা ভিতু মানুষের লক্ষণ না রে পাগল। এটা মহৎ মানুষের লক্ষণ। এটা সংবেদনশীল মানুষের লক্ষণ। যারা গাছের ঝরা পাতার মাঝেও কান্নার শব্দ খুঁজে পায়, তারাই তো শ্রেষ্ঠ মানুষ। দাদাজান একটু থামেন। তারপর আবার বলেন, এই যে তুই হলুদ পাতার কথা বললি, এর মাঝেও কিন্তু আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার গল্প আছে, ঘুরে দাঁড়ানোর শিক্ষা আছে।

সেটা কেমন?

এই যে এখন, তোদের পরিবারের ওপর যে বিপর্যয় চলছে, তুই পড়তে পারছিস না, আমার কাছে এসে বসে থাকছিস, নদীর কাছে গিয়ে কান্না করছিস, কিন্তু এই আগুনের দিনই তো শেষ দিন না। এরপর আছে সবুজ দিন। যেভাবে বৃক্ষ হলুদ পাতা ঝরিয়ে সবুজ হয়ে ওঠে।

দাদাজানের কথায় মুগ্ধ হয়ে যায় তামিম। তুমি এত সুন্দর করে কীভাবে ভাবো দাদাজান! তারপর তামিম একটু থামে। এরপর মজার ছলে খলবল করে বলে, আমার দ্রুত মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন? জীবন থেকে পালাতে চাস?

না, দাদাজান। তোমার কাছে চিরকালের জন্য চলে আসতে চাই। ইহজনমে তোমার সান্নিধ্য পাইনি। পরজনমে তোমার সান্নিধ্য নিতে

চাই। এখন গল্প করার জন্য তোমার কাছে আসতে হয়, তখন তো তোমার পাশেই আমার ঠিকানা হবে। আমি সারাক্ষণ জ্বালাতন করব।

দাদাজান এবার গম্ভীর হয়ে যান। ঝড় ওঠার আগে নদী যেমন গম্ভীর হয় তেমন। তারপর থমথমে গলায় বিড়বিড় করে বলেন, কিন্তু তোর কবর তো এখানে না রে নাতি।

তমিম এবার থমকায়, চমকায়; আক্রান্ত হয় বিমূঢ়তায়। এই শিবপুর তার গ্রাম। শিবপুরের আলো-ছায়ায় সে বড় হচ্ছে। এই গোরস্তান তাদের পারিবারিক গোরস্তান। তার নিয়তি, তার কবর, তার শেষ চিহ্নতো এখানেই মিশে থাকার কথা। দাদাজান তবে ভিন্ন কথা বলে কেন! জিজ্ঞেস করতে যায় তমিম, কেন তার কবর এখানে হবে না। এখানে না হলে কোথায় হবে? কিন্তু দাদাজান ততক্ষণে দৃষ্টি থেকে লুপ্ত হয়ে গেছেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তমিম তার অস্তিত্বের সন্ধান আর পায় না।

ছয়.

কয়েক বছর পর ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির লিফটে উঠতে উঠতে দাদাজানের কথাটা নতুন করে মনে পড়ে তমিমের এইচএসসি পরীক্ষার পর ঢাবিসহ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল সে কিন্তু চান্স হয়নি কোথাও বাবার তবু স্বপ্ন, ছেলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক হোক সেটা প্রাইভেট অবহেলা করে বাবা উচ্চশিক্ষিত হতে পারেননি ছেলেও তার পরিণতি বরণ করুক, কখনো চাননি তিনি তাই তো অর্থের কথা না ভেবে তিনি ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছেন ঢাকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট-ওয়েস্টে শুধু উচ্চশিক্ষাই নয়, গ্রামের নোংরা রাজনীতি থেকেও তিনি ছেলেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন কিন্তু গ্রাম ছেড়ে এই যে তার ঢাকায় চলে আসা, এটা কি দাদাজানের ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনাবিন্দু? তমিম কি তবে আর ফিরতে পারবে না গ্রামে? তার সেই ছায়াঢাকা, ঘুঘুডাকা মায়ায় জড়ানো গ্রাম শিবপুরে? তমিম ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে চায় না কিন্তু দাদাজানের ভেতর এমন কিছু আধ্যাত্মিক গুণ সে দেখেছে, না চাইলেও ভাবনা চলে আসে তখন তার তমিমার কথা মনে পড়ে ঢাকায় আসার সময় বোনটা তার এমন কান্না জুড়ে দিয়েছিল, যেন তার লাশ জানাজার জন্য খাটিয়ায় উঠছে আর মনে পড়ে আমগাছটার কথা, যার ছায়ায় শীতল থাকে তাদের উঠোন সেই ঘুঘুগুলো, যাদের অক্লান্ত ডাকে বিষণ্ন হয়ে ওঠে বাড়ির দুপুরগুলো, ওদের কথাও মনে পড়ে তমিমের আর মনে পড়ে বাবা-মা ও দাদাজানের কথা ঢাকায় আসার পর সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয়েছে, দাদাজানকে হারিয়ে ফেলা তমিম এখন ইট-পাথরের রুক্ষ শহরের মানুষ যেখানে সবুজ নেই নদী নেই পাখি নেই প্রজাপতি নেই দোয়েলের ডাক নেই ঘুঘুর বাসা নেই আছে শুধু মানুষ সারাক্ষণ অপরকে ঠকানোর মানসিকতা নিয়ে ছুটে চলা গিজগিজে মানুষ সবুজ ধানক্ষেত আর মোষের পিঠে পিঠে ঘুরে বেড়ানো এক আধ্যাত্মিক পির এই শহরের তমিমের সাথে কেন সাক্ষাৎ দিতে যাবেন! ভার্সিটিতে ভর্তির পর তমিম কয়েকবার গ্রামে গেছে বাবা-মা, পাড়া-পড়শিদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে প্রত্যেকবারই সে ছুটে গেছে গোরস্তানে দাদাজানের কাছ থেকে আরো অনেক গল্প শোনা যে বাকি কিন্তু দাদাজান দেখা দেননি

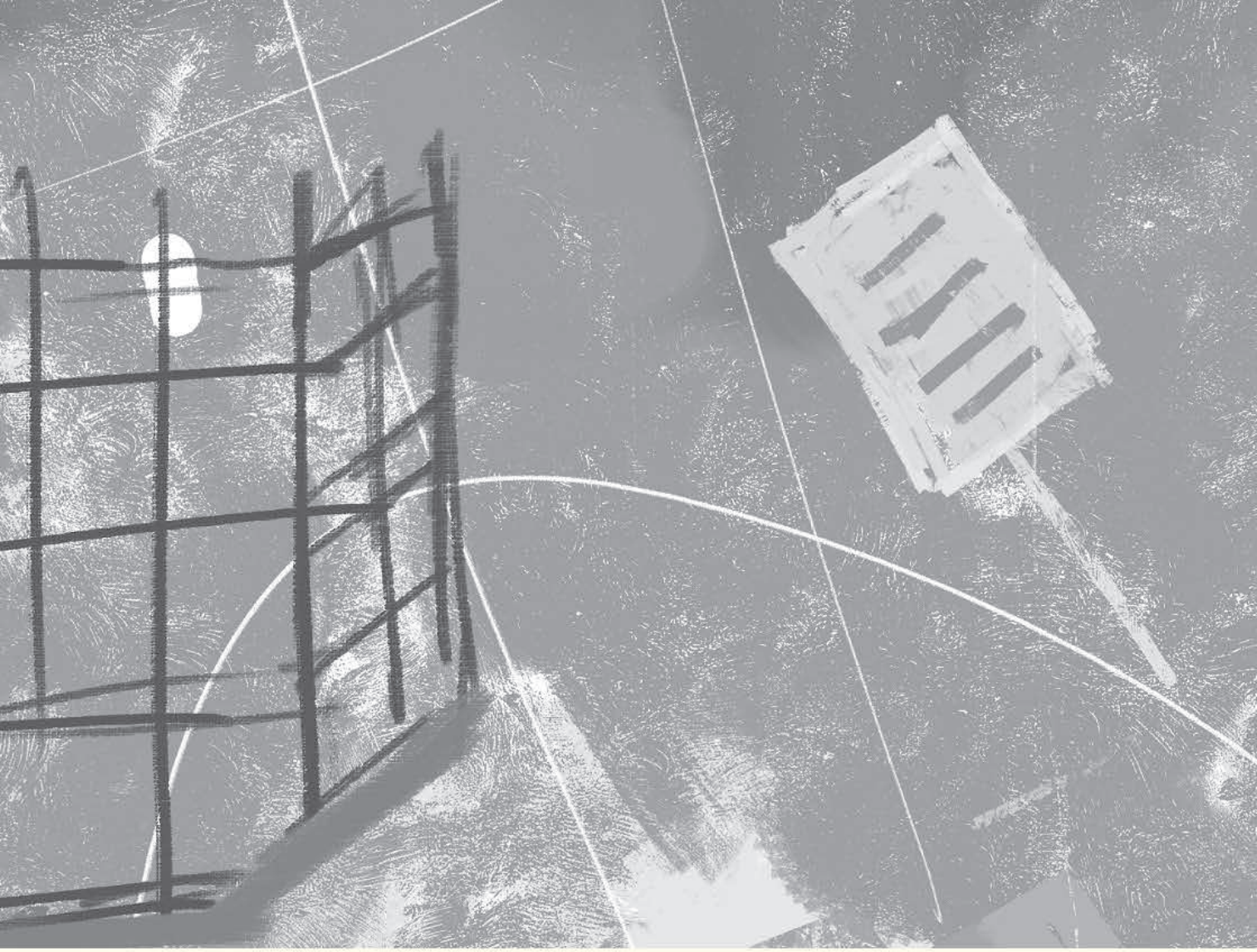

আসেননি তামিমের ভুবনে কেন আসেননি? অভিমান? গ্রামের শেকড় উপড়ে নাতির ঢাকা চলে যাওয়ার অভিমান?

নিসর্গ হারিয়ে ফেললেও রাজধানী ঢাকা তামিমকে সমৃদ্ধ করছে অনেকভাবে ক্লাসমেট শাওনের সাথে তার খুব ভাব হয়েছে ছুটির দিনগুলোতে সে আর শাওন শহরের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো ঘুরে বেড়ায় ইতিহাসের কত ধুলোবালি যে লেগে আছে এই শহরের গায়ে! আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা, জাতীয় মসজিদ, জাতীয় জাদুঘর, রমনা পার্ক, সংসদ ভবন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরো কত জায়গা যে সে ঘুরেছে পাঠ্যবইয়ের বাইরে শাওনের আউট বই পড়ার অভ্যাস গ্রামে ইচ্ছা থাকলেও তেমন কোনো বই তামিম পড়ে উঠতে পারেনি আশপাশে কোনো পাঠাগার বা ভালো বইয়ের দোকান সে খুঁজে পায়নি ঢাকায় এসে, শাওনের সঙ্গ পেয়ে সে বিগত অপড়ুয়া দিনের কাজা-কাফফারা আদায় করে নেয় ক্ল্যাসিক লেখকের বাইরেও সমকালীন লেখক সম্পর্কে শাওনের জানাশোনার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ শাওনের সুবাদে একদিন থান ইটের মতো মোটা লালরঙা এক বই হাতে আসে তামিমের বইয়ের নাম পিতামহ লেখক : সব্বির জাদিদ এই প্রথম সে এ বই এবং লেখকের নাম শুনল শাওন জানাল, এটা জাহিলি যুগের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র আবদুল মোত্তালিব ও তার সময় নিয়ে লেখা দারুণ উপন্যাস বিষয়বস্তু শুনেই বইটা লুফে নেয় তামিম সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সামনে দুদিন ছুটি দুদিনে প্রায় সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠার উপন্যাসটা শেষ করে ফেলে সে পড়ার পর তার অভিব্যক্তিও হয় শাওনের মতো আসলেই এ এক দারুণ বই এ বই তাকে এক মুহূর্তে জাহিলি পৃথিবী থেকে ঘুরিয়ে এনেছে প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার অভ্যাস তামিমের কিন্তু এ দুদিন সেই অভ্যাসে ছেদ পড়ে তার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটবে বলে দুদিন ফোন বন্ধ করে রাখে সে ওদিকে বাড়িতে বাবা-মা দুশ্চিন্তায় শেষ ছেলের ফোন বন্ধ পেয়ে পেয়ে রবিবার সকালে বাবা যখন ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তখনই পাওয়া যায় তামিমকে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার খবর শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে তামিম হাসতে হাসতে বলে, সবচেয়ে খারাপ কিছুও যদি হয়, সেটা হবে মৃত্যু তার চেয়ে বেশি কিছু তো নয়

মা কড়া একটা ধমক মারেন—খবরদার ওসব অলক্ষুণে কথা বলবি না! বললে চড় খাবি

মায়ের কথায় তামিম তবু হাসে, হাসতেই থাকে এইসব আদর-আহ্লাদ, সুখ-দুঃখ আর ক্লান্তির পুকুরে জীবন বইতে বইতে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে যায় তামিম ততদিনে আঠারোর মতো আরো একটি অবান্তর, হাস্যকর ডামি নির্বাচন দেখার দুর্ভাগ্য হয় জাতির পাঁচ বছর আগে, আঠারোর নির্বাচনে বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় তামিম ছিল বাবার থেকে অনেক ছোট চব্বিশের এই নির্বাচনে বয়সে না হোক শহুরে অভিজ্ঞতায় তামিম বড় হয়ে ওঠে তাই তো বাড়িতে ফোন করে বারবার বাবাকে সে সাবধান করে, বাবা যেন ভোটের দিন বাড়ির বাইরে না যায় ওইদিন তার ঘুমানোর দিন পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কোনো খবর রাখার দরকার নেই ওইদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবা শুধু ঘুমাবেন

এই প্রথম পিতৃত্বের জায়গা থেকে মনে মনে তৃপ্ত হয়ে ওঠেন

বাবা। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলে তার সত্যিকারের দায়িত্বশীল এবং বড় হয়ে উঠেছে। এতদিন বাদে আজ তিনি সন্তান হয়ে উঠলেন আর সন্তান হয়ে উঠল বাবা। তিনি এও বুঝলেন, দূরে না সরালে পুত্রের এই পিতৃত্বের ঔজ্জ্বল্য দেখার সৌভাগ্য হতো না তার। দূরত্ব কখনো কখনো দূরে ঠেললেও স্থানিক দূরত্ব যে মানুষকে নতুনভাবে প্রস্ফুটিত করে, উপলব্ধি করেন তিনি। তামিমের সেই নবপ্রস্ফুটিত রূপ দেখে বিগলিতও হন ভেতরে ভেতরে। খুশিতে গদগদ হয়ে মায়ের কাছে মেলে ধরেন আপন হৃদয়—দেখলে তো রাবেয়া, তোমার ছেলে কীভাবে আমাকে শাসন করছে! তুমি যে বলো, ছেলেকে ঢাকায় পাঠিয়ে আমি ভুল করেছি, তুমিই বলো, ঢাকায় না পাঠালে তামিমের এই চমৎকার পরিবর্তন কি আমরা দেখতে পেতাম!

তামিম আগে থেকেই এমন। এখন যা পরিবর্তন তুমি দেখছ, তা বয়স বাড়ার কারণে। বয়সের সাথে সাথে এই পরিবর্তন বাড়িতে থাকলেও হতো। কতদিন ছেলেটাকে দেখি না!

একদিন চলো হুট করে ঢাকায় চলে যাই। ওকে চমকে দিই।

গিয়ে থাকবা কোথায়?

কেন, তামিমের কাছে।

তামিম ওর বন্ধুর সাথে মেস শেয়ার করে থাকে। সেখানে গিয়ে আমরা থাকতে পারব? তোমার মাথা দেখি গেছে।

তাহলে এক কাজ করি, দিনের দিন দেখা করে ঘুরে আসি। ছেলেটা কোথায় থাকে, কী খায়, কোথায় কীভাবে পড়ে কিছুই তো জানি না। একটু দেখারও তো দরকার আছে।

শিবপুর থেকে ঢাকা যেতে লাগবে ছয় ঘণ্টা আসতে লাগবে ছয় ঘণ্টা। এর মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করবা কখন? তার চেয়ে ওকেই আসতে বলো না। অনেকদিন দেখি না ছেলেটাকে।

এটা অবশ্য ভালো বলেছ। ফোন করে দেখি ও কবে ছুটি পাবে, কবে আসতে পারবে। বাবা তখনই ফোন লাগান তামিমকে। কিন্তু সামনে সেমিস্টার পরীক্ষা, সহসা ছুটি পাব না—জানায় তামিম। মা মন খারাপ করেন। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে লাউয়ের মাচা, তার মাঝে ঘুঘুদের ওড়াউড়ি। উঠতে বসতে সেদিকে চোখ পড়ে মায়ের আর মনে পড়ে পুত্রের কথা। পুত্রের এত পছন্দ ওই ঘুঘু। বাড়িতে যখন কেউ থাকে না, মাঝে মাঝে মা ঘুঘুদের সাথে কথা বলেন, মন খারাপ করিসনে তোরা। খুব শিগগিরই তোদের বন্ধুর পরীক্ষা শেষ হবে। তারপর সে বাড়িতে আসবে। তখন বন্ধুর সাথে দেখা হবে, আচ্ছা? মায়ের কথায় ঘুঘুরা ডানা ঝাপটে উড়ে যায় আমগাছে। তামিমের আসার খবরে ওরা কি খুশি হয়? এটা কি খুশির ওড়াউড়ি? মায়ের সাথে ওরাও কি তামিমের জন্য অপেক্ষা করে? হয়তো করে। শুধু মা কিংবা ঘুঘু নয়, পুরো শিবপুর গ্রামই হয়তো অপেক্ষা করে। শিবপুরের নদী, যে নদীর একটি নালা একঝাঁক পুঁটি নিয়ে মিশেছে তামিমদের পুকুরে, সেই নদীও অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে সেই পুকুর, বর্ষা এলে মায়ের নোলকের মতো একগুচ্ছ কচুরি ফুল নিয়ে ঝলমল যে পুকুর, সেই পুকুর। অপেক্ষা করে সেই নারকেল গাছ, যার ডানার ওপর একাকী বসে থাকে এক সঙ্গী হারানো চিল। অপেক্ষা করে সেই আহত প্রজাপতি, ফ্যানের ঘায়ে যার পাখা ভাঙার দুঃখে তিনদিন স্কুলে যায়নি তামিম। অপেক্ষা করে সেই বুলবুলি-বনটিয়া-বউ কথা কও, যাদের খাদ্যসংস্থান নিশ্চিত করতে একটি পেঁপে গাছ উৎসর্গ করেছে তামিম। প্রকৃতি তার সব আয়োজন নিয়ে তামিমের ফেরার অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু তামিমের ফেরা হয় না। পরীক্ষা শেষ হয়, কিন্তু তামিমের ফেরা হয় না। কীভাবে ফিরবে তামিম! ঢাকা যে অগ্নিগর্ভ। মিছিলে মিছিলে উত্তাল যে ঢাকা! কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে ছাত্ররা। ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ মোট কোটার পরিমাণ ৫৬ শতাংশ। অযৌক্তিক এই কোটার কাঁটায় যে বিক্ষত হচ্ছে প্রকৃত মেধাবীরা। বৈষম্যমূলক এই কোটা ব্যবস্থার সংস্কার চায় ছাত্ররা। কিন্তু ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি মানতে নারাজ কর্তৃত্ববাদী সরকার। দীর্ঘ ১৫ বছর তারা মহাপরাক্রমের সাথে দেশ শাসন করছে। এমন কত আন্দোলন এল গেল। সবই দোর্দণ্ডপ্রতাপের বানে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে। অতএব, এই আন্দোলনও কচুরিপানার মতো ভেসে যাবে, সে-ই তো স্বাভাবিক। অতএব তাদের দাবি কানে তোলার সময় নেই সরকার বাহাদুরের। এর মাঝে একদিন এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের তাচ্ছিল্য করে বলেন, মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে। এই এক কথাতেই ফুঁসে ওঠে ছাত্র-জনতা। সেদিন রাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা নেমে আসে রাস্তায়। তাদের মুখে শ্লেষধর্মী অদ্ভুত স্লোগান :

তুমি কে আমি কে
রাজাকার রাজাকার
কে বলেছে কে বলেছে
স্বৈরাচার স্বৈরাচার
চেয়েছিলাম অধিকার
হয়ে গেলাম রাজাকার

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে পরদিন বিক্ষোভের ডাক দেয় ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছাত্রলীগ তো বসে থাকার পাত্র নয়। তারাও ঘোষণা দেয় বিক্ষোভ দমনের। টোকাই বাহিনী নিয়ে তারা অত্যন্ত নৃশংসভাবে হামলা করে ঢাবির ছাত্রছাত্রীদের ওপর। টোকাই বাহিনীর হামলায় আহত হয় অসংখ্য শিক্ষার্থী। বিশেষত ছাত্রীদের রক্তাক্ত ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে সবার মাঝে হাহাকার জেগে ওঠে। একেকটা রক্তাক্ত মেয়ের ছবি পোস্ট করে একেকজন লেখে, মনে হচ্ছে এ আমার বোন। এর আহত মুখের রক্ত দেখে আমি কানতেছি। আহত মেয়েদের ছবি দেখে মাতম করে দেশবাসী, কিন্তু তখনো তারা জানে না, কী এক আগুনের দিন ঠোঁটে নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। তারা জানে না তখনো, শিগগিরই এমন এক ভয়ংকর দিন আসতে চলেছে, যখন প্রতিদিনের শোক তার আগের দিনের শোকের চেয়ে হবে অধিক ভারী ও হৃদয়ভেদী। সেই শোকের সূচনাবিন্দু কি শহীদ আবু সাঈদ? বগুড়ার আবু সাঈদ পুলিশের সামনে দুই হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দিয়েছিল। ভাবটা এমন—গুলি করো। আর তার আগেই তো সেই রক্তে নাচন তোলা স্লোগান উঠে এসেছে সবার ঠোঁটে ঠোঁটে : বুকের মধ্যে অনেক ঝড়/বুক পেতেছি গুলি কর। এই স্লোগানই কি আবু সাঈদকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বুক পাততে? হয়তো তাই। সে বিশ্বাস করেছিল পুলিশকে। নিজের দেশের পুলিশ। নিজের দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বেতন পাওয়া পুলিশ। সেই পুলিশ কি পেতে রাখা এক তরুণ-বুকে গুলি চালাতে পারে! কিন্তু আবু সাঈদ ভুল ছিল। শুরু থেকেই যে পুলিশ সরকারের পেটোয়া বাহিনী হয়ে, ছাত্রলীগের সহকারী হয়ে রক্ত ঝরাচ্ছে, যাদের হাতে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের রক্তের দাগ, সেই পুলিশের ওপর এতটা বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি আবু সাঈদের। এই সরলতার মাশুল আবু সাঈদকে দিতে হলো জীবনের বিনিময়ে। পুলিশ সরাসরি গুলি করে বসল আবু সাঈদের বুকে। আবু সাঈদ লুটিয়ে পড়ল। কয়েকবার ওঠার চেষ্টাও করল। পারল না। বন্ধুরা এসে তাকে ধরল, আগলে নিল, কিন্তু অঞ্জলির জল হয়ে বন্ধুদের আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল আবু সাঈদের আত্মা। মহান আত্মা। যে মহাকাল আবু সাঈদকে যুগের মহানায়ক বানাতে চেয়েছে, বন্ধুরা কীভাবে তাকে আগলে রাখতে পারে!

আবু সাঈদের মৃত্যুর মাঝেই বোধ হয় সুপ্ত ছিল বিপ্লবের বীজ। এরপর আর আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না সরকার। জোয়ারের পানির মতো চারদিক শুধু প্লাবিত করে চলল মিছিল-বিক্ষোভের সাগর। ভয় পেয়ে সরকার বন্ধ করে দিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে মেরেধরে বের করে দিল শিক্ষার্থীদের। দেশবাসীর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। ছাত্রদের যৌক্তিক ও বৈধ এ আন্দোলনের বুঝি এখানেই কবর রচিত হলো। কিন্তু কে জানত, ততদিনে এই আন্দোলন হয়ে উঠেছে এক উপন্যাস কিংবা সিনেমার চিত্রনাট্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে পৃষ্ঠায় উপন্যাসের ইতি টেনেছিল, সেখান থেকে নতুন উপন্যাস শুরু করল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। যাদের সকাল-বিকাল ফার্মের মুরগি বলে তাচ্ছিল্য করা হয় এবং যাদের সরকারি চাকরির কোনো প্রয়োজন

নেই, সেই তারা এবার আবাবিল হয়ে নেমে আসে রাজপথে! সরকার হয়তো ধারণাও করতে পারেনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এভাবে নিজের করে নেবে। কিন্তু তারা নেয়। সময়টাই যে আপন করে নেয়ার। সময়টাই বুকে টেনে নেয়ার। তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকে নিজের করে নেয় এবং আবু সাঈদের মতো প্রতিযোগিতা করে জীবন দিতে থাকে। আর এ কারণেই ঢাকা থেকে বহু দূরের এক নিবিড় ছায়াঘন গ্রামে বসে দুশ্চিন্তায় ক্ষয় হতে থাকেন আজিজুর রহমান ও রাবেয়া, তামিম যাদের বাবা-মা বলে ডাকে। তাদের তামিমও যে এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ঢাকায় মানুষ মরে। তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ-শিশু মরে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছুটে আসে। ইন্টারনেট বন্ধ। কারফিউ চালু। মায়ের কানে এসব খবর যত আসে, তার দুশ্চিন্তার পুকুর ততই ফুলেফেঁপে ওঠে। বাবা অনেকটাই নিশ্চুপ। বাবারা নিশ্চুপই তো থাকেন। বাইরের সকল ঝড় বুকে লুকিয়ে তারা চুপচাপ থাকেন। মাঝে মাঝে ফোন করে ছেলেকে বলেন, সাবধানে থাকিস। অকারণে বাইরে বের হোস না। আর মা, মা তো মা-ই, আপৎকালে তারা হয়ে ওঠেন যুক্তিতর্কের ঊর্ধ্বের মানুষ। মায়ের একই কথা—তুই বাড়ি চলে আয় বাজান। পড়ালেখার দরকার নেই তোর।

বাবা-মায়ের সতর্কবাণী ও সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিপরীতে তামিম শুধু হাঁ-হুঁ করে। কিন্তু তার যা করার, বন্ধুদের সাথে সে তা-ই করে বেড়ায়। প্রতিদিনই সে মিছিলে যায়। পুলিশকে ধাওয়া দেয়, নিজেরাও ধাওয়া খায়, আইল্যান্ডের পাথর উপড়ে ঢিল বানায়, পুলিশের ছোড়া টিয়ার শেল কুড়িয়ে পুলিশের দিকেই নিক্ষেপ করে, চোখের সামনে বন্ধুদেরকে গুলি খেতে দেখে। মিছিল যেন এক নেশা। নদীর মতো। রাতের মতো। শুধু ডেকে যায়। আয় আয়। এই ব্যাপারগুলো এতটাই রোমহর্ষক, উত্তেজনাকর এবং গৌরবময়, মা-বাবাকে না বলে থাকতে পারে না তামিম। বাবা-মা ছেলের মুখে এসব শোনেন আর বাকরুদ্ধ হয়ে যান। তাদের ছেলেটা কবে কবে এত বড় হয়ে গেল! বিপ্লব কি এভাবেই তরুণদের বড় বানিয়ে দেয়! শঙ্কা ও ভয় এমনভাবে জাপটে ধরে তাদের, তারা গর্বিত হবে নাকি শঙ্কিত হবে, বুঝে উঠতে পারেন না।

২৫ জুলাইয়ের দুপুরটা ছিল মায়ের চুলার আগুনের মতো উত্তপ্ত। সেই উত্তপ্ত আগুনের তলায় এক হাতে পানির বোতল অন্য হাতে লাঠি নিয়ে রামপুরা ব্রিজের ওপর স্লোগান দিচ্ছিল তামিম। সঙ্গে তার অনেক বন্ধু। দেশ কয়েক দিন অন্ধকারে থাকার পর নতুন করে চালু হয়েছে ইন্টারনেট। আর তাতেই বেরিয়ে আসছে বীভৎস, চাঞ্চল্যকর সব হত্যাকাণ্ডের খবর। মুগ্ধ ও ইয়ামিনের খুন, মেরাদিয়ার নির্মাণাধীন ভবনের নৃশংসতা, হেলিকপ্টার থেকে ছুটে আসা গুলি হতবাক করে দেয় সবাইকে। এইসব অন্যায্য হত্যাকাণ্ডে নতুন করে ক্রোধে ফেটে পড়ে ছাত্রসমাজ। এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ তামিমদের আজকের মিছিল। মিছিলটি আফতাবনগর গেট পেরিয়ে ধীরে ধীরে বাড্ডার দিকে এগোতে থাকলে তামিম অনুভব করে, তার মাথার ওপর একখণ্ড মেঘ। মেঘখণ্ডটি রোদকে ছিন্নভিন্ন করে তামিমদের সাথে সাথে চলছে। আর তাতেই গরমের উত্তাপ কমে গিয়ে এক ধরনের প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। তামিম অবাক হয়ে মেঘের দিকে তাকায়। আর আশ্চর্য, মেঘের ভেতর সে দাদাজানের মুখটা দেখতে পায়। দাদাজান আজ তার মোষদের মতো গম্ভীর। যে গাম্ভীর্য তামিম কোনোদিন দাদাজানের মুখে দেখেনি। তামিম মিছিলের সাথে হাঁটে আর দাদাজানের সাথে কথা বলে।

দাদাজান, আজ তোমার মুখটা শুকনো কেন? কোনো কারণে দুশ্চিন্তা করছ?

দুশ্চিন্তা করব না? তুই যেভাবে জীবন ঠোঁটে নিয়ে বিক্ষোভ করছিস, তোর জন্য ভয় হয়। এমন বিক্ষোভের দিন আমাদের জীবনেও এসেছিল। সেই উনসত্তর সালে। তখন আমাদের শত্রু ছিল বিদেশী। আর তোদের লড়তে হচ্ছে দেশী শত্রুর বিরুদ্ধে। কী দুর্ভাগ্য তোদের!

দাদাজান, আমরা কি সুদিনের দেখা পাব না? আমরা কি ফিরে পাব আমাদের গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার? আমরা কি কবর দিতে পারব না দুর্নীতি ও বৈষম্যের?

লড়তে থাক। লড়াই করতে করতেই তো সুদিনের দেখা পাওয়া যায়। একটি শাপলা পেতে হলে তোকে পানিতে নামতে হয়। একটি গোলাপ তুলতে হলে তোকে কাঁটার আঘাত সইতে হয়। এখন যে ত্যাগ তোরা স্বীকার করছিস, তা ওই গোলাপের জন্য, পদ্মফুলের জন্য। যার জন্য একদা আমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম।

তুমি এখন কোথায় থাকো? এখনো কি তুমি মোষের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াও?

বেড়াই তো।

বাবার কাছে শুনেছি, তুমি যে রাতে মারা গেলে, তোমার মোষগুলো নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এটাই পৃথিবীর নিয়ম রে নাতি। প্রিয়জনের মৃত্যু প্রকৃতি সহ্য করতে পারে না। যার স্নেহে ওরা থাকে, তার মৃত্যু হলে ওরা জায়গা বদল করে। এই পৃথিবীতে প্রকৃতি শুধু স্নেহ চায়। মমতা চায়। মানুষের স্নেহ। মানুষের মমতা। কিন্তু আমরা বরাবরই ওদের ওপর নিপীড়ন চালাই, নিষ্ঠুরতা দেখাই।

জায়গা বদল করে ওরা কোথায় যায়, দাদাজান?

যেখানে ওদের ভালো লাগে। যেখানে ওরা স্নেহ পায়। তোর মৃত্যু হলে তোর ঘুঘুগুলোও তোদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

তামিমের বুকের ভেতর ধড়াস করে ওঠে। মৃত্যুর কথা ভেবে নয়, ঘুঘুগুলোর অন্যত্র বাসা বাঁধার কথা ভেবে। ও চায় না, ওর অবর্তমানে ঘুঘুগুলো অন্য কোথাও হারিয়ে যাক। ও চায়, ঘুঘুগুলো ওর কবরে বাসা বাঁধুক।

দাদার সাথে কথা বলতে বলতে কখন যে মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তামিম, বুঝতেও পারে না সে। হঠাৎ সে নিজেকে আবিষ্কার করে মেরুল বাড্ডার ইউলুপের নিচে। একা। ওই গনগনে সূর্যের মতো একা। বন্ধুরা সব ফিরে গেছে রামপুরার দিকে। মোড়ে মোড়ে পুলিশ, হুইসেল, গুলির শব্দ, ছাত্রলীগের আস্ফালন; এর মাঝে তামিম একা। হঠাৎ গা ছমছম করে ওঠে তামিমের। কীভাবে সে মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল! তামিম বন্ধুদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দৌড় শুরু করে ইস্ট-ওয়েস্টের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে যমের চোখে পড়ে গেছে সে। দশ কদমও সে আগাতে পারে না, যমদূতের মতো তার সামনে হাজির হয় হেলমেট পরা দুই যুবক। একজনের হাতে পিস্তল, অপরজনের হাতে ছুরি। কোরবানির ঈদে গরু জবাইয়ের আগে হুজুরের হাতে তামিম এমন ছুরি দেখেছে অনেকবার। যুবক দুটো ধাওয়া করে তামিমকে। তামিম দৌড় দিতে যায়, পারে না। আইল্যান্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর তখনই, পেতে দেয়া পিঠের একেবারে কাছে এসে পড়ে অস্ত্রধারী ঘাতক। তামিম ওঠার চেষ্টা করে, দৌড় দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আইল্যান্ডের কংক্রিটে এমনভাবে ধাক্কা খেয়েছে তার পা, ওই আহত পা তাকে তুলতে পারে না, ওর দেহের ভার বহন করতে পারে না। তামিম তখন অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা। তার চোখের সামনে দুলতে থাকে ফেলে আসা আস্ত জীবন। সে দেখে ঘুঘু, তামিমকে ডাকছে। সে দেখে মাছরাঙা, তামিমকে ডাকছে। সে দেখে সবুজ ঘাস, তামিমকে ডাকছে। সে দেখে কুয়াশা ও শিশির, তামিমকে ডাকছে। সে দেখে ধানক্ষেত-পাটক্ষেত, তামিমকে ডাকছে। সে দেখে পুঁটির ঝাঁক, নদীর বাঁক, চাঁদের আলো; তামিমকে ডাকছে। তারা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে—তামিম ওঠো। পালাও। তামিম ওঠো। দৌড়াও। কিন্তু তামিম উঠতে পারে না। পালাতে পারে না। তার পিঠ, কোমর, ঘাড়, শিরা-উপশিরা ফালাফালা হতে থাকে ছুরির কোপে। তামিমের ওই কেঁপে কেঁপে ওঠা রক্তাক্ত দেহ, দেখতে পারে না ঘুঘু ও মাছরাঙা। সহ্য করতে পারে না ধানক্ষেত ও কুয়াশা। তারা কাঁদে। কুয়াশার চোখ দিয়ে পানি ঝরে। শিশিরের চোখ দিয়ে পানি ঝরে। ঘুঘু-মাছরাঙার চেখ দিয়ে পানি ঝরে। কাঁদতে কাঁদতে তারা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর প্রার্থনা করে—প্রভু, তামিমের যন্ত্রণার ভার আমাদের কিছু দাও। আমরা একটু একটু যন্ত্রণা নিয়ে তামিমের যন্ত্রণার ভার হালকা করি। এরপর কী যে হয় তামিমের, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত

তামিম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, ঘাতকদ্বয়ের দিকে নয়, আকাশের দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ঘুঘু, মাছারাঙা, ধানখেত, পাটখেত, কুয়াশা, শিশির, নদীর বাঁক, পুঁটির ঝাঁক। তামিম বিড়বিড় করে বলে, তোমরা আমার বন্ধু। জীবনে মরণে আমরা একসাথেই থাকব।

সেই গনগনা দুপুরে বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, মা আর তামিমা বসেছিল লাউমাচার তলে, পাটি পেতে। দুজনের হাতে দুটো তালপাখা। হঠাৎ মাথার ওপর ডানা ঝাপটানির শব্দ। এই মাচায় এখন পাঁচ জোড়া ঘুঘুর পাঁচটি সংসার। ওরা একসাথে কোথায় উড়ে যায়? মা-মেয়ে দুজনই চমকে ওঠে। কোনো কাক কিংবা চিল কি এল বাচ্চা খেতে? তামিমা দ্রুত মাচার তল থেকে বেরিয়ে আসে। দেখে, একটি কাক কা কা করে চক্কর কাটছে বাড়ির ওপর। মায়ের মনটা কেমন করে। তিনি দ্রুত ফোন দেন তামিমকে। রিংটোন বেজে চলে, কিন্তু রিসিভ হয় না।

সাত.

তামিম একটি বেহেশতি শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে। ওর মুখজুড়ে প্রশান্তির এমন সৌরভ, কেবল সদ্যপ্রসূত সন্তানের মুখেই যা দেখা যায়। কোন সৌভাগ্যের পরশে ২২ বছরের ছেলেটি হঠাৎ নিষ্পাপ শিশু হয়ে উঠল, বুঝে উঠতে পারেন না বাবা। বরাবরই তিনি সংসার বিরাগী মানুষ। জগতের কোনো ঘটনা এবং এর কার্যকারণ যথাসময়ে ধরতে পারেন না তিনি। যখন ধরতে পারেন, অনেক দেরি হয়ে যায়। তখন এই বোঝাপড়ার আর কোনো উপযোগিতাই থাকে না। মা অবশ্য ব্যতিক্রম। রাবেয়া সবকিছু যথাসময়ে বোঝেই না শুধু, ঘটার আগেই সে অনেক ব্যাপার নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। গতকাল বাবা যে ঢাকায় এসেছেন, সেটাও তো মায়ের উৎকণ্ঠিত মনের তাগাদায়।

এই মুহূর্তে তামিমকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটির অবস্থান, কোন রাস্তা পার হচ্ছে, আদৌ চলছে কিনা, জানেন না বাবা। তার মনের অবস্থা এখন সেই কিশোরের মতো, যার বহু সাধনার ঘুড়িটি সুতা কেটে চলে গেছে। কিশোরের ভাবনায় ঘুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। বাবার ভাবনায় এখন শুধুই তামিম, যে কিনা বেহেশতি শিশু হয়ে নির্ভার মুখে ঘুমাচ্ছে। অ্যাম্বুলেন্সটির বাইরের পৃথিবীতে এখন নিশ্চয় কেয়ামত চলছে, কিন্তু বাবা বুকে যে ভয়ংকর কেয়ামত ধারণ করে চলেছেন, সেই কেয়ামত নিয়েই তিনি মগ্ন থাকতে চান। এই মুহূর্তে পৃথিবীর ধ্বংসের খবরও তাকে বিচলিত করবে না। কারণ এর আগেই তার যত্নে গড়া পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে।

দুদিন ধরে ছেলেকে ফোনে পাচ্ছিলেন না বাবা-মা। দুর্ভাবনায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলেন তারা। যে ছেলে বাবা-মায়ের সাথে কথা না বলে কোনোদিন ঘুমাতে যায় না, এমন ছেলের ফোন দুদিন বন্ধ থাকলে যেকোনো বাবা-মায়েরই দুশ্চিন্তায় চুরমার হয়ে যাওয়ার কথা। বাবাও হচ্ছিলেন। মা তো পরশু দুপুর থেকেই, ঘুঘুদের উড়ে যাওয়া এবং কাকের কা কা ডাক শোনার পর থেকেই হা-হুতাশ করছিলেন। কিন্তু বাবা পুরুষ মানুষ। পৃথিবীর সকল বেদনার ভার বুকে নিয়েও যাদেরকে হাসিমুখ করে থাকতে হয়। বাবাও মুখে কৃত্রিম হাসি ঝুলিয়ে রাবেয়াকে শান্ত করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন রাতেও যখন তামিমের ফোন এল না, বরং সাপের শীতল হিসহিসের মতো শোনা গেল, দুঃখিত, এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন বাবার পুরুষ চোখও কেঁদে ফেলল। সারা রাত তিনি আর রাবেয়া পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। ভোরের আলো ফুটতেই সিদ্ধান্ত নিলেন, ঢাকা যাবেন। জনারণ্যের শহর ঢাকায় তিনি তামিমকে খুঁজতে যাবেন। পরদিনই তিনি রওনা দিলেন ঢাকার উদ্দেশে। পথের মাঝে দুশ্চিন্তার কত রকম মেঘ যে উঁকি দিয়েছে। বারবার নিজেকে প্রবোধ দিয়েছেন তিনি—খারাপ কিছু হয়নি ছেলের। মিছিলে গিয়ে হয়তো মোবাইল হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা পুলিশ খুঁজছে বলে মোবাইল বন্ধ। পরক্ষণে উঁকি দিয়েছে নতুন শঙ্কা—তাই বলে বন্ধুর মোবাইল থেকে কি যোগাযোগ করা যায় না!

মনের খাতায় যোগ-বিয়োগের নানা অংক কষতে কষতে সকাল সকাল তিনি হাজির হয়েছিলেন তামিমের ক্যাম্পাসে। রাবেয়াকে কথা দিয়ে এসেছেন, যেভাবেই হোক ছেলেকে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু ওর ফিরে আসা যে শীতের পাতা ঝরার মতো এমন হাহাকারময় হবে, কোনোদিন কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিলেন! কোটাবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল তামিমের ক্যাম্পাসে তামিমকে পাননি তিনি। কেউ কোনো সন্ধান দিতেও পারেনি ওর। তখন ছুটে গিয়েছেন ওর মেসে। সেখানেও পাননি ওকে। ফোন আগের মতোই বন্ধ। এ সময় কোত্থেকে উদয় হয় ওর বন্ধু শাওন। যে শাওন একবার তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। শাওন সন্ধ্যার বিষণ্নতা নিয়ে জানায়, পরশু থেকেই নিখোঁজ তামিম। সেও সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেছে তামিমকে। কিন্তু পায়নি। তখন মেসের মালিক আশপাশের হাসপাতালগুলোতে খুঁজতে বলে। মেস মালিকের পরামর্শ যৌক্তিক মনে হয়। শাওনের সাথে তিনি হাসপাতালে হাসপাতালে ছেলেকে খুঁজতে থাকেন। যদিও তিনি খুব করে চাচ্ছিলেন, ছেলেকে যেন হাসপাতালে পাওয়া না যায়। কারণ হাসপাতাল মানেই তামিম আহত। অথবা নিহ...। না, বাবা আর ভাবতে পারেন না। তিনি বিড়বিড় করে দোয়া করেন, তামিম কোনো বন্ধুর বাসায় লুকিয়ে থাকুক। সুস্থ থাকুক। কিন্তু বাবার সকল দোয়া ও চাওয়াকে ব্যর্থ করে দিয়ে তামিমকে পাওয়া যায় হাসপাতালে। তখন দুপুর। তখন বাতাসে প্রখর রোদের ঝাঁজ। তখন বনশ্রীর রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্সের তীব্র হুইসেল। সে সময়, অনেক দৌড়ঝাঁপের পর, তামিমকে পাওয়া যায় হাসপাতালের মর্গে। কর্তৃপক্ষ জানায়, গত পরশু এক রিকশাচালক আহত তামিমকে হাসপাতালে রেখে গেছে। আজ দুপুরে, এই তো একটু আগে, যখন পাশের মসজিদে জোহরের আজান হচ্ছিল, তখন মারা গেছে তামিম। তার লাশ রাখা আছে মর্গে। কত অকপটে, বাবার সামনে, সন্তানের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়ে গেল। মাস খানেক পর বাবা যখন খানিকটা স্বাভাবিক হবেন, তখন হয়তো বুঝতে পারবেন, এই রক্তাক্ত জুলাইয়ে, লাশের প্রাচুর্যই হাসপাতালগুলোকে অকপট করে তুলেছিল। বাবা কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার চোখের সামনে থেকে পৃথিবীর যত আল্পনা, সব মুছে যেতে থাকল। শাওন দ্রুত একটি চেয়ারের ওপর বসাল আঙ্কেলকে। কাঁধে হাত রেখে নীরবতার দুঃসহ ভাষা দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। বাবার চোখ তখন এক বায়োস্কোপের পর্দায়, সামনে থেকে কত মোহনীয় ছবি সরে সরে যাচ্ছে। তামিমের পেটে আসা, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ওয়াওয়া কান্নাধ্বনি, মহল্লায় মিষ্টি বিতরণ, প্রথম বাবা ডাক, বাবার আঙুল ধরে হাঁটতে শেখা, মুসলমানি, ঈদগাহে পাশাপাশি নামাজ ও কোলাকুলি, প্রথম স্কুলে যাওয়া এবং ঢাকায় পড়তে আসার দিন উঠোনের আমগাছটা ধরে লুকিয়ে কান্না, ঘুঘুদের কাছ থেকে বিদায়—কত মায়াময় দৃশ্য। একটি ছুরি, শুধু একটি ছুরি, কত সহজে সবকিছুকে মৃত বানিয়ে দিল। বাবা যদি জানতেন, এই দিনের মুখোমুখি হতে হবে তাকে, নিজের আয়ুর অর্ধেকটা দিয়ে হলেও তিনি তামিমকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

খাদে পড়ে ঝাঁকুনি খেল অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্সের ছোট্ট বেডে, যেখানে পাশও ফেরা যায় না, ঝাঁকুনি খেল তামিমের দেহটাও। চোট দুটো বন্ধ। ছোট মামার দেয়া প্রিয় টি-শার্ট তখনো তার গায়ে। বুকের কাছে ছোপ ছোপ রক্ত। বাবা এক ধ্যানে চেয়ে রইলেন ওর নিষ্পাপ মুখটার দিকে। ও কি বাবার বিপন্ন বিধ্বস্ত মুখটা দেখতে পাচ্ছে? বাইরে, একটু পরপর, মিছিলের স্লোগান, আর থেমে থেমে, গুলির ভয়ংকর শব্দ। অন্য সময় হলে বাবা ভয়ে সিঁটিয়ে যেতেন। কিন্তু এখন, গুলির শব্দও, তার হৃৎপিণ্ডে দাঁত বসাতে পারছে না। শুধু এতটুকু বুঝছেন, এক রক্তস্নাত বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে তাদের অ্যাম্বুলেন্স। পুলসিরাতের মতো ভয়ংকর যে পথ।

হাসপাতাল থেকে শাওন সঙ্গী হতে চেয়েছিল। কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে সঙ্গে নেননি বাবা। রাষ্ট্রের কাছে তামিম এক রাষ্ট্রদ্রোহী। এই মুহূর্তে ওর প্রতি সহানুভূতিশীল সকলেই রাষ্ট্রদ্রোহী। ওকে না এনেই যে ভালো করেছেন, শিবপুরে নিজের এলাকায় ঢোকার আগ মুহূর্তে বুঝতে পারলেন। গ্রামের প্রবেশপথে সরকারি দলের গুণ্ডাবাহিনী অ্যাম্বুলেন্সের পথরোধ করল। তাদের হাতে লাঠিসোঁটা, রামদা। কীভাবে যেন ওরা জেনে গেছে, আজিজুর রহমানের ছেলে

মিছিলে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। ওদের অপেক্ষা তামিমের জন্যই। ওদের চেহারা, অঙ্গভঙ্গি, দানবের চেয়েও ভয়ংকর। বাবা মনে মনে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। ওরা আজিজুর রহমানকে, এক শহীদের বাবাকে, অ্যাম্বুলেন্স থেকে কলার ধরে নামাল। সব শুনে দেখতে চাইল তামিমের ডেথ সার্টিফিকেট আর ধমকাল, কেন তিনি ছেলেকে নিরস্ত করতে পারেননি। বাবা পকেট হাতড়ে বের করলেন ছেলের মৃত্যুর সনদ। ওরা সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে দুই ভাগ করে ফেলল। জানাল, এই সার্টিফিকেট নিয়ে এলাকায় ঢোকা যাবে না। এলাকায় ঢুকতে হলে স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট লাগবে।

স্বাভাবিক মৃত্যু! কিন্তু ওর মৃত্যু তো স্বাভাবিক না। রাষ্ট্রের পেটোয়া বাহিনী ওকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। রামদায়ের সামনেও বাবা কীভাবে এই প্রতিবাদটুকু করতে পারলেন কে জানে।

যা কচ্ছি তাই করেন। লাশ নিয়ে কোনো রাজনীতি চলবি না। ওই ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও। কথা শেষ হওয়ার আগেই অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে লাঠির বাড়ি পড়তে লাগল, যে অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর ঘুমাচ্ছে তামিম, আজিজুর রহমানের সন্তান। বাবার মনে হলো লাঠির বাড়ি গাড়িতে নয়, তার কলিজায় পড়ছে। এবার তিনি নরম হলেন। ভয়ও পেলেন। জোড় হাতে বললেন, তোমরা আমার ছেলের মতো। আমাদের যেতে দাও। বিশ্বাস করো, আমি কাউকে আমার ছেলের কথা বলব না। আমি চুপিচুপি রাতের অন্ধকারে ওকে দাফন করব।

সদ্য সন্তানহারা এক অসহায় বাবার চোখের জল ওদের হৃদয় ভেজাতে পারল না। ওদের একই কথা—আন্দোলনের চিহ্ন নিয়ে এলাকায় ঢোকা যাবে না। বদলাতে হবে সার্টিফিকেট। বাবার তখন পা ধরাটাই বাকি। তার পরও ছেলেগুলো পথ না ছাড়লে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। চিৎকার করে বললেন, তোরা আমার ছেলেকে ঘরে ফিরতে দে। নইলে আল্লাহর গজব পড়বে তোদের ওপর।

এরপর আর শান্ত থাকে না গুণ্ডাবাহিনী। নিয়মও নেই। একজন ছুটে এসে মুখ চেপে ধরে আজিজুর রহমানের। আরেকজন ছুটে এসে দুটো থাপ্পড় কষে তার গালে। আর দুজন ছুটে এসে চ্যাংদোলা করে তাকে ঢুকিয়ে দেয় অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর। একটু দূরেই, একটি অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়, কয়েকজন মানুষ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হয়তো আঁচ করতে পারছিল ঘটনা। তারা হয়তো ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল ক্রোধে। তাদের কেউ কেউ হয়তো বেদনার ভারে চোখ মুছছিল গোপনে। কিন্তু কাছে এসে প্রতিবাদ করার, মুখ খোলার সাহস ছিল না তাদের। কারণ গত ১৫ বছরে মানুষকে কেবল নীরবতার পাঠ দেয়া হয়েছে। ফ্যাসিবাদের প্রিয় ভাষা যে নীরবতা!

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, গ্লানির ভারে অবসন্ন বাবা তখন এক ভেসে যাওয়া কচুরিপানা, স্রোতের ইচ্ছার বাইরে যার নিজস্ব কোনো গন্তব্য নেই। অ্যাম্বুলেন্স যেখানেই যাক, তিনি তামিমের পাশে বসে আছেন, ওকে চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছেন, এতেই তার শান্তি। বাবার অবস্থা যখন এই, তখন মৃদু প্রতিবাদের জন্য গলা বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। ভাইজানেরা, পথের অবস্থা তো ভালা না। এর ভেতর আবার ঢাকায় গিয়া সার্টিফিকেট চেঞ্জ কইরা আনা তো অসম্ভব।

এই খানকির পোলা, আবার কথা কইস! পথের অবস্থা কারা খারাপ করেছে! এর জন্যি দায় কারে! ওই খানকির পুলারে! আরেকটা কথা কলি গাড়ি তোর পাছার ভিতর ঢুকায় দেবোনে। যা ভাগ!

এরপর আর সাহস দেখানো যায় না। এই দুঃসময়েও সৌজন্যবোধের লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে লাগলেন বাবা। ড্রাইভারটার জন্য তার মায়া লাগতে লাগল। চাকরির জন্য এই কেয়ামতের ভেতর তাকে গাড়ি নিয়ে বেরোতে হয়েছে। তার জন্য মানুষটাকে কী বিশ্রী গালি খেতে হলো। কিন্তু তামিমকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া ড্রাইভারের শুধুই যে চাকরি ছিল না, ছিল এক শহীদের প্রতি ভালোবাসা, বাবা বুঝতে পারলেন একটু পর। তখন গ্রাম ছেড়ে খানিকটা পথ এগিয়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স, বাবার মনের ভেতর উঁকি মারল নতুন শঙ্কা—বারবার আসা-যাওয়ার এই পথের ধকল সইতে পারবে তো তামিমের শরীর! তার মনের খবর যেন পড়ে ফেলল ড্রাইভার। খুব সহানুভূতির সাথে, আন্তরিকতা নিয়ে বলল, ভাইজান, টেনশন কইরেন না, শহীদের শরীর পচে না। ওরা জীবিত।

বাবার কী যে হলো, চোখ ভরে উঠল জলে। ইচ্ছা করল, জাপটে ধরেন ড্রাইভারকে। বুকের সাথে বুক লাগিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদেন। আজ থেকে সে তার ভাই। তার স্বজন। এই দুঃসময়ে, অচেনা ড্রাইভারের এই আন্তরিকতাটুকু আজীবন তিনি বুকের কোনায় রেখে দেবেন। এভাবেই, পুরো পৃথিবী যখন বৈরী হয়ে ওঠে, তখন কেউ না কেউ, নিরবলম্ব মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। হৃদয়ে আবেগের মন্থন তখনো স্তিমিত হয়নি, তার আগেই গায়ে কাঁটা দেয়ার মতো এক হৃদয়বিদারক তথ্য পরিবেশন করে ড্রাইভার, যা শোনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না বাবা : আমার পোলাডাও শহীদ হইছে। কী আর কমু, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার দিয়া আইতেছিলাম। পোলাপান এক আহত পোলারে আমার গাড়িত তুইলা দিল। হাসপাতালে আইতে আইতে সে মরা। দরজা খুইলা দেখি সে আর কেউ না, আমার আরমান।

বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন বাবা। কতক্ষণ যে ওইভাবে বসে থাকলেন, টেরটাও পেলেন না। সময়ের এ কোন বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ল তাদের জীবন, যখন প্রত্যেকেই অপরজন থেকে অধিক শোকগ্রস্ত। ধীরে ধীরে বাবা যখন স্বাভাবিক হলেন, ড্রাইভার নতুন এক পরামর্শ দিল : এভাবে, এই মৃত্যুপুরীর ভেতর লাশ নিয়ে ফের ঢাকায় যাওয়া অসম্ভব। পথে পুলিশ আর গুণ্ডাদের হয়রানি তো থাকবেই, শহীদের বাবা হিসেবে তার জীবনও ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

তাহলে?

আপনার পোলার নানাবাড়ি কোনখানে? সেইখানে গোপনে তার কবর দেয়া যায়।

ওর দাদাবাড়ি আর নানাবাড়ি একই গ্রামে।

তাইলে তো প্রবলেম। এই লাশ কোত্থাও দাফন করন যাইব না। সবখানে গুণ্ডাবাহিনী বইসা আছে।

এই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কালে, যখন সন্তানের কবরের মাটি পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আত্মসান্ত্বনা পেতে রাবেয়াকে সামনে আনেন বাবা। ছেলের মৃত্যুর শোক কি সইতে পারবে রাবেয়া! এমন যদি হয়, ছেলেকে তিনি গোপনে কোথাও দাফন করলেন আর বাড়ি ফিরে বললেন, ছেলেকে পাননি, হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে কিংবা পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, এ খবরটা কি মৃত্যুর চেয়ে কম শোকতাপপূর্ণ না? এতে অন্তত রাবেয়ার স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে তামিম। তাছাড়া তামিমের মৃত্যুর খবর তিনি দেবেনই বা কীভাবে! যে চোখ তামিমের বিক্ষত শরীর দেখেছে, সেই চোখ কি তিনি রাবেয়ার চোখে রাখতে পারবেন! না, তামিম নেই, এ খবর তিনি দিতে পারবেন না স্ত্রীকে।

গভীর রাত পর্যন্ত কুষ্টিয়ার পথে পথে ঘুরতে লাগল অ্যাম্বুলেন্স। যখন চারদিক নিঝুম হয়ে এল, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের এক নীরব পথের ধারে, সবুজ মাঠের কিনারায়, থেমে গেল অ্যাম্বুলেন্স। কোনো এক অদ্ভুত কারণে দূরের নক্ষত্ররাজির চোখে সেই রাতে ঘুম এল না। তারা অবাক বিস্ময়ে দেখল, হঠাৎ বুড়ো হয়ে ওঠা দুজন প্রৌঢ় পৃথিবীর সব আলো-ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রুদ্ধশ্বাসে কবর খুঁড়ে চলেছে। তাদের পাশে এক শহীদের রক্তমাখা দেহ। সেই দেহ ধোয়ানো হলো না। কাফনও পরানো হলো না। বরং গায়ের রক্তাক্ত পোশাকেই তার জানাজা প্রস্তুত হলো। নক্ষত্রজাগা রাতে সবুজের মখমলের ওপর অনুষ্ঠিত হলো এমন এক বিরল জানাজার জামাত, যার ইমাম ও মুসল্লি দুজনই শহীদের বাবা। চোখের জল মুছতে মুছতে, সবুজের জান্নাতে, চিরদিনের জন্য তারা ঘুম পাড়িয়ে দিলেন শহীদ তামিমকে। বিদায়বেলায় কবরের মাটি ছুঁয়ে তারা দৃপ্ত চোয়ালে উচ্চারণ করলেন, যারা তোকে আপন মাটিতে ঘুমাতে দিল না, তাদের ওপর লানত।

কিছুদিন পর ছেলে খোঁজার নাম করে তামিমের কবর দেখতে এলেন বাবা। এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তামিমের সমাধিকে ঘিরে আস্ত শিবপুর গ্রামটাই যেন রচিত হয়েছে। সেখানে আছে সবুজ ঘাস, শিশির, মাছরাঙা, সূর্যের আলো। আর আছে ডালপালা ছড়ানো এক বকুল গাছ, তাতে পাঁচ জোড়া ঘুঘু। ডিম পাড়বে বলে ঘুঘুগুলো বাসা বাঁধছে।

ডেভিডকে সলের আক্রমণ। উডকাঠ। শিল্পী : জুলিয়াস শ্নর ভন কারলসফেল্ড, ১৮৬০

সহিংসতা, পরিচয় ও ক্রান্তিকালীন ইনসাফের সন্ধানে

সহুল আহমদ

The more there is past conflict between groups, the more likely those individuals are judging one another on their group affiliation rather than on individual characteristics.

—Zheng Wang

সহিংসতা ও পরিচয় : দুই ধরনের সম্পর্ক

সহিংসতার সঙ্গে আইডেন্টিটি অথবা পরিচয়ের সম্পর্ক নানামুখী হলেও প্রধানত দুই ধরনের সম্পর্ক দেখতে পাই আমরা : সহিংসতার কারণ হিসেবে 'পরিচয়' এবং পরিচয় নির্মাণে 'সহিংসতা'। হালফিল জমানায় পরিচয়বাদী রাজনীতি (আইডেন্টিটি পলিটিকস) দিয়ে কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিচয়কেন্দ্রিক এমন এক রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে ইশারা দেয়া হয়, যা শ্রেণী-রাজনীতির মতো 'মুক্তিকামী' রাজনৈতিক অ্যাপ্রোচের চাইতে ভিন্নতর কিছু। তবে

আধুনিক গণতন্ত্রে গোষ্ঠী বা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি বা রিকগনিশন চাওয়ার বাসনা এ রাজনীতিকে কেবল নেতিবাচক বলে বিদায় করে দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। উল্টো দেখা যাচ্ছে, প্রায় সব ধরনের রাজনীতিই এক ধরনের পরিচয়বাদী রাজনীতিই হয়ে উঠছে। এমনকি 'শ্রেণী' রাজনৈতিক সাবজেক্ট হয়ে ওঠে, যখন সেটা একটি 'পরিচয়' হিসেবে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, পরিচয়বাদী রাজনীতিকে প্রায়ই নেতিবাচক বলে উপস্থাপন করা হলেও আধুনিক গণতন্ত্রে এর যে আরেকটা ভিন্ন টান রয়েছে তা স্বীকার করে নেয়া মঙ্গলজনক। এ রাজনীতি অবধারিতভাবে হিংসার জন্ম দেয় না, উল্টো স্বীকৃতির দাবিও তোলে।

মানুষের অসংখ্য পরিচয় থাকে, কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিচয়ে সে আবদ্ধ থাকে না। মানে একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে বাঙালি, সিলেটি, মুসলমান, পুরুষ/নারী, এশীয়—এমন অজস্র পরিচয় ধারণ করতে পারেন। গেঞ্জাম পাকে তখনই যখন অন্যান্য সংশ্লিষ্টতা বাদ দিয়ে কেবল একটা 'পরিচয়'-তে ব্যক্তিকে পর্যবসিত করা হয়। ঔপনিবেশিক প্রভু বা অভিজাত শাসকরা ঐতিহাসিকভাবে এ 'পরিচয়'কে এস্তেমাল করেছে, এক পরিচয়ের বিপরীতে আরেক পরিচয়কে খাড়া করে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সহিংসতার বীজ রোপণ করেছে এবং এতে জোগান দিয়েছে। ফলে সহিংসতা পরিচয়ের অবশ্যম্ভাবী কোনো পরিণতি নয়, বরঞ্চ কীভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিচয়কে গঠন করা হচ্ছে এবং এস্তেমাল করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে এ 'পরিচয়' সহিংসতার কারণ হবে কিনা। এই যে নানাবিধ ধর্মীয় বা জাতিগত সহিংসতা আমরা দেখতে পাই, যেমন রুয়ান্ডায় হুতু বনাম তুতসি বা ভারতের পার্টিশনে হিন্দু বনাম মুসলমান—সেখানে 'পরিচয়'ই সহিংসতার উপলক্ষ হিসেবে হাজির থাকে।

গ্লোবায়নের যুগ এসে সীমান্ত ভেঙে দেয়ার শ্লোগান তুললেও দিনশেষে সীমান্তের ভেতরে পরিচয়কে সহিংসতার আরেক উপলক্ষ হিসেবে হাজির করে। গ্লোবায়নের প্রক্রিয়া 'জাতিরাষ্ট্র' নামক রাজনৈতিক সংস্থার 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' স্লোগানকে ব্যতিব্যস্ত করে তোরে। এ 'এক জাতি'র রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরুরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, তারা সংখ্যালঘুর উপস্থিতিকে হুমকি মনে করেন। তাদের মধ্যে এক ধরনের অসম্পূর্ণতার উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। তারা মনে করতে করতে থাকেন, এদের কারণেই বুঝি 'জাতিরাষ্ট্র' অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এমনতর ভাবনা গ্লোবায়নের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংখ্যাগুরুর মনে সঙ্খ্যালঘুদের নিয়ে ভয় তৈরি করে। সংখ্যায় কম হলেও সংখ্যালঘুর পরিচয় হয়ে ওঠে 'ভয়'-এর কারণ। সে ভয় সংখ্যাগুরুকে প্রায়ই ধাবিত করে ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির দিকে। গ্লোবায়ন যখন সাংস্কৃতিক মিলমিশ দাবি তোলে, তার প্রতিক্রিয়ায় উল্টো বিবিধ পরিচয়গত সংঘাত হাজির হয় জাতিরাষ্ট্রের 'পবিত্রতা' রক্ষার জরুরি কাজ হিসেবে। অর্থাৎ, গ্লোবায়নের ফলে যে অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও পরিচয়গত উৎকণ্ঠা দেখা দেয় তা যেন জাতিগত অথবা পরিচয়গত সংঘাতকে আরো উসকে দেয়।

এ তো গেল পরিচয় ও সহিংসতার ভেতরকার সম্পর্কের একটা ধরন। দ্বিতীয় ধরন হচ্ছে, খোদ পরিচয় নির্মাণেই 'সহিংসতা'র ভূমিকা থাকে। আরো স্পষ্টভাবে বললে সহিংসতার ইতিহাস ও স্মৃতি যেকোনো ধরনের সামষ্টিক পরিচয় নির্মাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আমরা এও জানি, রাষ্ট্র কখনো কখনো জাতীয় পরিচয় সুসংহত করার বাসনা থেকে সহিংসতাকে ব্যবহার করে। এটাকে তখন জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যুর সঙ্গে জড়িয়ে দেখানো হয়। তবে আমরা এ দিকটা আলোচনা করব না। আমরা পরিচয় নির্মাণে সহিংসতার স্মৃতি কীভাবে ভূমিকা পালন করে তা নিয়ে আলোচনা করব। অতীতের সহিংসতার সামষ্টিক স্মৃতি যেমন বর্তমান পরিচয়ের গড়নে ভূমিকা পালন করে, তেমনি নতুন করে সহিংসতার চক্রের ন্যায্যতাও প্রদান করতে পারে।

জাতি বা পরিচয় গড়নের জন্য 'স্মৃতি' বা বলা যায় সামষ্টিক স্মৃতি—সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এমনকি জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি খুঁজতে গেলে আসলে এ সামষ্টিক স্মৃতির ময়দানে এসে দাঁড়াতে হয়। একটা দেশের বাসিন্দারা বা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রজনেরা কিসে গর্ববোধ করেন, লজ্জিত বোধ করেন, কিসে ভয় পান ইত্যাদি তৈরি হয় অতীতের স্মৃতির ওপর ভর করে। কোনো একটা নির্দিষ্ট অতীতের

ছবি : **আফ্রোপলিটান**

ওপর সামষ্টিক শরিকানা গোষ্ঠীগত সম্পর্কের একেবারে প্রাথমিক ধাপ। ফলে 'স্মৃতি না থাকলে পরিচয় থাকে না, আর পরিচয় না থাকলে জাতি/নেশন থাকে না' এমন কথা হারহামেশাই শোনা গেছে। তবে স্মৃতি নির্মাণের সঙ্গে বিস্মৃতি নির্মাণও জড়িত। যেমন বহু আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছিলেন, 'নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার'। আধুনিক রাষ্ট্রে বিচিত্র কায়দায় এ স্মৃতি-বিস্মৃতি একত্রেই উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও প্রচারিত হয়ে জাতিগত বা অন্যান্য যেকোনো 'পরিচয়' গড়ে দেয়।

এ স্মৃতি, যাকে আমরা ঐতিহাসিক স্মৃতি বলছি, সেটা কীভাবে গোষ্ঠীগত পরিচয় গড়নে ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করার তিনটা দৃষ্টিভঙ্গি চালু আছে। এক, আদিমতাবাদ; দুই, নির্মাণবাদ এবং তিন, হাতিয়ারবাদ। প্রথমত, আদিমতাবাদ অনুযায়ী স্মৃতি মূলত রক্তের বন্ধন, কুটুম্বিতা, ভাষা ও একই ধরনের ইতিহাসের অংশীদারত্বের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পরিচয় গড়ে দেয়। অর্থাৎ এখানে পরিচয় যেন একটা উত্তরাধিকার বা ঐতিহ্যগত সূত্রে প্রাপ্ত; এটা অন্তর্নিহিতভাবে লেপ্টে আছে আমাদের মধ্যে। দ্বিতীয়ত, নির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পরিচয় আসলে এভাবে সূত্র ধরে আসে না, বরঞ্চ এটা নির্মিত। এখানে স্মৃতি খুব সিলেক্টিভ। সমসাময়িক ধ্যানধারণা ও বাস্তবতার জমিনে দাঁড়িয়ে অতীত থেকে নানা উপাদানকে জড়ো করে সামষ্টিক স্মৃতি নির্মাণ করা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অতীতকে নির্মাণ করা হয় বর্তমানের জরুরত মেটানোর জন্য। তৃতীয়ত, হাতিয়ারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, স্মৃতি ও ইতিহাসের ব্যবহার আসলে 'হাতিয়ার' সুলভ: অভিজাত বা শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা সুসংহত এবং সমর্থন আদায় করতে স্মৃতিকে ব্যবহার করে। যদিও বাংলাদেশে পরিচয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই বেশি জনপ্রিয়। অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী যখন 'হাজার বছরের বাঙালি' বলে ইতিহাস ও পরিচয়ের কুলজী খোঁজেন, তখন সেখানে আদিমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই ধরা পড়ে। অন্যদিকে বামপন্থীদের মধ্যে পরিচয়কে কেবল হাতিয়ারসুলভ বিবেচনা করার প্রবণতা রয়েছে; দাবি করা হয় এখানকার বুর্জোয়ারা পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতি দিয়ে জনগোষ্ঠীকে বুঁদ করে রাখে।

আমরা এ প্রবন্ধে আসলে নির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষেই ওকালতি করব। আমাদের যুক্তি হচ্ছে, পরিচয় নির্মিত হয়, এমনকি একই 'পরিচয়'-এর উপাদান কাল অনুযায়ী ভিন্ন হয়। যেমন চল্লিশের দশকে যারা 'বাঙালি' পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাদের 'বাঙালি'-এর মধ্যে থাকতে পারে সিরাজউদ্দৌলা, পলাশীর যুদ্ধ; অন্যদিকে ধরেন ১৯৭০ সালের দিকে যখন বাঙালি পরিচয় দেয়া হয়, তখন এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন জড়িয়ে পড়ছে। আবার এ মুহূর্তে যখন আমরা বাঙালি হিসেবে পরিচয় কল্পনা করি, তখন সর্বাধিক গুরুত্ব পায় বায়ান্ন ও একাত্তরের স্মৃতি। অর্থাৎ, একই পরিচয় একেক সময় ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে নির্মাণ হচ্ছে। এ নির্মাণের সামষ্টিক স্মৃতি যেমন আছে, তেমনি সামষ্টিক বিস্মৃতি আছে। কিছু স্মৃতিকে উদযাপন করি, কিছু স্মৃতিকে আড়াল করে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ফেলে দেয়া হয়। ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতে সে বিস্মৃতিও ভেসে উঠতে পারে।

এ স্মৃতিতে সহিংসতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন বিজয় ও সাফল্যের অনুভূতি তৈরি করতে পারে, তেমনি সহিংসতার ঐতিহাসিক ট্রমা জনগোষ্ঠীকে আঁকড়ে রাখতে সহায়তা করে। অর্থাৎ, কোনো সহিংসতার ইতিহাস ও স্মৃতির অংশীদার হয়ে নিজেদের মধ্যকার বন্ধনকেও আরো সুদৃঢ় করে তুলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন করে বলেন, 'আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর'। পরিচয় নির্মাণে সহিংসতা কাজ করে জটিল প্রক্রিয়ায়। বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের অনন্য বা ইতিহাস বা ঈশ্বর দ্বারা নির্বাচিত ভাবতে পারে। ভাবতে পারে, গোষ্ঠী হিসেবে তাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব রয়েছে। এ ধরনের পরিচয় ন্যায্যতা উৎপাদন করে সামষ্টিক বয়ান। বয়ানের ভেতর দিয়ে সে গোষ্ঠীর গরিমা বা দুঃখ দুর্দশা হাজির হয়। জায়নবাদীদের রয়েছে হারানো ভূমি বা হিন্দুত্ববাদীদের রয়েছে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার মিথ। এখন যদি কোনো গোষ্ঠীর গণহত্যা বা এথনিক ক্লিনজিং বা উপনিবেশ বা পদ্ধতিগত শোষণের অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে এ ট্রমা তাদের সামষ্টিক বয়ানের সঙ্গে মিশে যায়। সহিংসতার এ স্মৃতি তখন যেমন আরো সহিংসতাকে উসকাতে পারে, তেমনি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে জায়েজ করতে ব্যবহার হতে পারে। ঐতিহাসিক ট্রমা কীভাবে সমসাময়িক সহিংসতা বা রাজনৈতিক পলিসির জায়েজ করার উপাদানে পরিণত হতে পারে তার উজ্জ্বল নজির হতে পারে ইসরায়েল। ইসরায়েল যখনই ফিলিস্তিনিদের হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে, সে তখন বারবার তাদের এ হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞকে জায়েজ করে হলোকাস্টের স্মৃতি দিয়ে। এমনকি ইসরায়েল হলোকাস্টের স্মৃতিকে কাজে লাগিয়ে এমন এক বয়ান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যে তাদের পক্ষে যেন 'গণহত্যা' করাই সম্ভবই নয়, কেননা তারা এখনো বেঁচে থাকার সংগ্রামেই লিপ্ত। ফলে অক্টোবরে হামাসের আক্রমণকে ইসরাইল-সমর্থকরা গণহত্যা বললেও ইসরায়েলের প্রায় দেড় বছর যাবৎ চলমান হত্যাযজ্ঞকে 'গণহত্যা' বলতে ইউরোপীয় চিন্তকরা রাজি হন না। অর্থাৎ, যে পরিচয়কে নির্বাচন বা চুজ করা হয়, সেটাকে জায়েজ করার জন্য অতীতের ট্রমাকে এস্তেমাল করা হয়।

গোষ্ঠী হিসেবে একত্রে জুলুমের শিকার হওয়ার ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ক্ষত আমাদের সামষ্টিক স্মৃতিতে অনেক বড় জায়গা করে নেয় এবং সমসাময়িক পরিচয়কেও নানা কায়দায় গড়ে দিতে সহায়তা করে। এর একটা ঐতিহাসিক নজির আমরা দেখাতে পারি বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস থেকেই। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নির্মাণের সঙ্গে হিন্দুর সামাজিক আধিপত্য ও নির্যাতন 'ঐতিহাসিক ক্ষত' [Historical Wound] হিসেবে বারবার ফিরে এসেছে। আমাদের সাহিত্যে দেখা যায়, হিন্দুর সামাজিক আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার বহু দশক পরেও সে 'ইতিহাস-নির্ভর মিথ-জাতীয় ঐতিহাসিক ক্ষত' বাঙালি মুসলমানের 'আত্মপরিচয়ের গোড়াতে বসেই আছে'। আহমদ ছফা ও আনিসুজ্জামানকে বিচার করতে গিয়ে দীপেশ চক্রবর্তী সে ক্ষত বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আমাদের এ আলোচনার জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছিলেন, এর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, কিন্তু এ ক্ষত শুধু ইতিহাসকে নির্ভর করে নিজেকে জিইয়ে রাখে না; একটি মিথের মতো এর সত্যাসত্য এখন আর শুধু ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে বিচার করা যাবে না। ... সত্তার ও পরিচিতির রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ক্ষতবোধ বর্তমানে কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে বলেই আমাদের মানসে তা জেগে থাকে। এবং বর্তমানে এর কোনো ভূমিকা থাকে বলেই আমরা এ সদা-আহত অবস্থান থেকে বেরোতে পারি না। বরং বলা যায় আমরা আমাদের এ ক্ষতেই যেন একটা সাংস্কৃতিক লগ্নি করে বসে থাকি। ক্ষতটির চারপাশে ঘুরতে থাকি। এ অবস্থা থেকে বেরোনোর সচেতন প্রয়াস আবার আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের প্রতিটি যাত্রার শুরুতে আছে সে ক্ষত।'

ঐতিহাসিক ক্ষতের প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের কথা বলা যায়। গল্পের চরিত্র ভিখু ও পাঁচী তাদের ক্ষতকে সারতে দেয় না, ভিক্ষা করার স্বার্থে : 'বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিনী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনি ও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নিচ হইতে পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে। সেজন্য ঘা-টিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না।' ভিখু বা পাঁচী যেভাবে তাদের 'ক্ষত'কে এস্তেমাল করে, তেমনি ঐতিহাসিক ক্ষতের এস্তেমাল চলে রাজনীতিতে। এ ঐতিহাসিক ক্ষত ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আগ্রাসনকে জায়েজীকরণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি জন্ম দিতে পারে মজলুমিয়াতের জাতিবাদ: মানে আমি জুলুমের শিকার হয়েছি, সেটা সমসাময়িক দুনিয়ায় না হলেও, ইতিহাসের কোনো এক কালে হলেও, সে জুলুমের স্মৃতি নিজেকে সর্বদা মজলুম-বেশে হাজির করার প্রণোদনা জোগাতে পারে। এটা কখনো কখনো প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের নতুন ঢেউ নিয়ে আসতে পারে রাজনীতিতে, এমনকি গণহত্যা বা এথনিক ক্লিনজিংয়ের মতো রাষ্ট্রীয়

সহিংসতার মতাদর্শিক ভিত্তি প্রদান করতে পারে। কর্তৃত্ববাদী নেতারা ঐতিহাসিক এ ক্ষত ও ট্রমাকে ব্যবহার করে তাদের ক্ষমতাকে যেমন সুসংহত করতে পারেন, তেমনি ভিন্নমতকে দমন করতে পারেন। অর্থাৎ, আমি এককালে জুলুমের শিকার হয়েছি, সে অজুহাতে আমিও জালিম হয়ে উঠতে পারি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ক্ষতের ভাষিক চেহারা হতে পারে 'স্বজন হারানোর বেদনা'। বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও নৃশংস স্বৈরাচার শেখ হাসিনার রাজনীতির অন্যতম উপাদান ছিল 'স্বজন হারানোর বেদনা'। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে তিনি স্বজন হারিয়েছেন, এ দুঃসহ স্মৃতি বা আমরা যাকে বলছি ঐতিহাসিক ক্ষতকে এস্তেমাল করে তার স্বৈরশাসনের ভিত্তি দিয়েছিলেন। এমনকি চব্বিশের জুলাইয়ে যখন শিক্ষার্থী-জনতা রাস্তায় মারা যাচ্ছিলেন, তখনো তিনি তার বক্তৃতায় 'স্বজন হারানোর বেদনা আমি বুঝি' বলে তার ঐতিহাসিক ক্ষতকে আবার নিয়ে এসেছিলেন সামনে।

সহিংসতার চক্র : বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশ নামক এ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচয় ও ইতিহাস নির্মাণের সঙ্গে সহিংসতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সাতচল্লিশ থেকে শুরু করে আজতক বিভিন্ন সময় এ জনগোষ্ঠীকে যে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে তা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণ ও পরবর্তী সংঘাতেরও কারণ হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মতাদর্শের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করছে বিভিন্ন সময়ের সহিংসতার স্মৃতি অথবা সহিংসতার ভিন্নরকম পাঠ। সাতচল্লিশের পার্টিশন নানাভাবে এখানকার ইতিহাসচর্চাকে প্রভাবিত করেছে। সাতচল্লিশের সহিংসতাকে কলকাতার জনপ্রিয় পরিসর যেভাবে স্মরণ করে, পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় মানসে তার স্মরণ ভিন্নরকম। ওপারে যখন এটা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা, এপারে সেটা নতুন রাষ্ট্র পাওয়ার উদযাপন। পার্টিশনের এ দুই রকমের উদযাপন ও কল্পনা একাত্তরবিষয়ক পাঠেই ভিন্নতা নিয়ে এসেছিল। কলকাতার বিদ্বৎসমাজ যেখানে পার্টিশন ও একাত্তরের বাংলাদেশ আন্দোলনকে দেখেছিল বিরোধাত্মক হিসেবে, সেখানে বাংলাদেশের তৎকালীন জাতীয়তাবাদীরা পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলাদেশ আন্দোলনকে ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখেছিলেন। অর্থাৎ, পার্টিশনের স্মৃতির ভিন্নতা ইতিহাস পাঠের ভিন্নতা দিয়েছিল, এমনকি দুই অংশের আত্মপরিচয় গড়নেও ভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে জেনোসাইড চাপিয়ে দিয়েছিল এ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর ওপর, সে রক্তক্ষয়ী সহিংসতার স্মৃতি ও তাকে কেন্দ্র করে রাজনীতি আজতক বহাল তবিয়তে আছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিচয়, এমনকি কারো কারো কাছে বাঙালি পরিচয় নির্মাণেও একাত্তরের সহিংসতা প্রবলভাবে সক্রিয় থাকে। জাদুঘর থেকে স্মৃতিস্মারক সবখানেই মুক্তিযুদ্ধের সহিংসতাই প্রধান উপজীব্য; অন্যভাবে বললে জাদুঘর ও স্মৃতিস্মারক দিয়ে জাতীয়তাবাদীরা যে পরিচয় নির্মাণের কোশেশ করেন, সেটার প্রধান অনুষঙ্গ একাত্তরের সহিংসতা। 'বাঙালি' ইতিহাস ও পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্য একাত্তরে তাদের বিজয় গরিমার যতটা মনোযোগ দেয়া হয়, তেমনি সহিংসতার দুঃসহ স্মৃতিকে বারবার হাজির করা হয়েছে। এ দুঃসহ যন্ত্রণা ও যাতনা পূর্বপুরুষ বয়ে বেড়িয়েছেন বলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সে যন্ত্রণা প্রদানকারীদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা—এ ছিল গত ৩০ বছরে রাজনৈতিক পরিসরের দ্বিধাবিভক্ত সুরতের মূল যুক্তিধারা। পাশাপাশি এ সহিংসতাকে কোন নামে ডাকা হবে বা এতে হতাহতের সংখ্যা হতো, তা নিয়েও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসর প্রচণ্ড দ্বিধাবিভক্ত থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে 'মুক্তিযুদ্ধপন্থী' ও 'মুক্তিযুদ্ধবিরোধী' নামক পরিচয়মূলক আবির্ভাব ঘটল, তারও প্রধান ভিত্তি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকালীন সহিংসতা। মুক্তিযুদ্ধপন্থীরা সে সহিংসতার ভুক্তভোগী, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা ছিলেন সে সহিংসতার সমর্থক ও সহায়ক। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ৫০ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে এ 'পরিচয়' কেবল জায়মানই ছিল না, বরঞ্চ প্রচণ্ড প্রতাপ নিয়ে মতাদর্শিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। আবার এ ঐতিহাসিক ক্ষত যতবার অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয়েছে, এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে 'বাঙালি' পরিচয়ের সঙ্গে সে ক্ষত আরো শক্তিশালীভাবে ফিরে এসেছে। আশি ও নব্বইয়ের দশক থেকে যখনই জামায়াতে ইসলামীর কর্তৃপক্ষ এ ট্রমাকে অস্বীকার করেছেন, তখনই সে অস্বীকৃতি নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। নাগরিক সমাজের এ প্রতিরোধে যেমন মাঠ পর্যায়ের অ্যাক্টিভিজম ছিল, তেমনি অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। একাত্তরের সহিংসতাকে গণহত্যা/জেনোসাইড হিসেবে স্বীকার-অস্বীকারের রাজনীতি যেন গত ২০ বছরে বাংলাদেশের সাহিত্যে প্রবলভাবে লেপ্টে আছে। বাঙালি বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি। এ ধরনের আলাপ আলোচনা এখানকার জনপরিসরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একাত্তরের ঐতিহাসিক ক্ষতের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির রাজনীতির কারণেই।

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টে সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নির্মাণের নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছিল। আশির দশক থেকে শেখ হাসিনার এমন কোনো বক্তব্য পাওয়া মুশকিলের হবে, যেখানে তিনি তার স্বজন হারানোর বেদনার উল্লেখ করেননি। ১৫ আগস্টের সহিংসতার তার পরিবারের সদস্যদের হারানোর ফলে তিনি নিজেকে আশির দশক থেকে ক্রমাগত মজলুম হিসেবেই হাজির করার কোশেশ করেছেন, অর্থাৎ, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের ক্ষতকে রাজনৈতিকভাবে এস্তেমাল করে গিয়েছেন। ঐতিহাসিক ক্ষতকে এস্তেমাল করে কেমনে মানুষ জালিম হয়ে উঠতে পারে তার খুব ভালো নজির হচ্ছেন শেখ হাসিনা। তিনি একটা ট্র্যাজেডিমূলক ঘটনাকে তার দুঃশাসন ও খুনখারাবিকে জায়েজ করার কাজে এস্তেমাল করে ইতিহাসের দুঃখজনক এ অধ্যায় নিয়ে হাসিতামাশা করার রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন। 'স্বজন হারানোর বেদনা'র মতো করুণ উক্তি তার ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে জনপ্রিয় পরিসরে সার্কাজমে পরিণত হয়েছে। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের রাজনীতি 'ট্রমা'র মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। ১৫ আগস্টের মতো ট্রমা নিয়ে যিনি রাষ্ট্রপধান হয়েছিলেন তার পক্ষে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আসলে নিরপেক্ষ হওয়া কতটা সম্ভব তা বিচার করাও জরুরি। তিনি যে রাষ্ট্রীয় প্রতিটি ঘটনা ও সিদ্ধান্ত তার ব্যক্তিগত ট্রমাকে দিয়ে যাচাই-বাছাই করতেন তা তার বক্তব্য দেখলেই বোঝা যায়। 'স্বজন হারানোর বেদনা বুঝি' বলে যারা রাজনীতি করতে চান তারা এ ধরনের ক্ষতকে নিরাময় না করে বরঞ্চ চুলকায়ে চুলকায়ে ক্ষতকে কেন্দ্র কইরা ব্যবসার (তা রাজনীতি-ব্যবসা হলেও) প্রসার ঘটান।

পাশাপাশি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিংসতা। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর পরিচয়ের অস্বীকৃতি এবং সংখ্যাগুরুর উঁচু স্বরের তলায় চাপা পড়ে আওয়াজ যখন বিদ্রোহে পরিণত হলো, তখন রাষ্ট্রীয় বাহিনী চড়াও হয়ে আশি ও নব্বইয়ের দশকে এমন কয়েকটি সহিংসতার জন্ম দিল, যাকে গবেষকরা প্রায়ই জেনোসাইড/গণহত্যার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জেনোসাইডমূলক সহিংসতাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যে রাষ্ট্রের জন্ম হলো, সে রাষ্ট্র জন্মের ২০ বছরের মধ্যেই একই ধরনের সহিংসতা তার ভূখণ্ডের বাসিন্দা বা রাষ্ট্রজনদের ওপর চালিয়েছিল। পাহাড়ে এখন যখন পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতি চলে বা আদিবাসী বলা হবে কিনা, তা নিয়ে যখন আলোচনা চলে, তার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে পাহাড়ের সহিংসতার ইতিহাস। পাহাড়ে সহিংসতার পক্ষে যে জাতীয়তাবাদ সক্রিয় থাকে তাকে কেবল বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিয়ে বিচার করা যায় না; এটা কখনো হাজার বছরের বাঙালি; আবার কখনো 'নব্বই ভাগ মুসলমান' বাঙালির জাতীয়তাবাদ। পাহাড় প্রশ্নে আবার সবাই মিলে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। সংখ্যালঘু যেন সংখ্যাগুরুর 'জাতিরাষ্ট্র'-এর পবিত্রতাকে কলুষিত করছে, এ শঙ্কার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় পাহাড়ের ইস্যুতে। এ জাতিবাদ পাহাড়ে অন্যান্য জাতিসত্তাকে 'শত্রু' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করে কল্পিত পাহাড় 'জয়' ও 'সার্বভৌমত্ব রক্ষা'র শ্লোগানে সংখ্যাগরিষ্ঠকে বুঁদ করে পাহাড়ের জুলুমকে আড়াল করে বা জুলুমের পক্ষে সম্মতি

ছবি : সালাহউদ্দীন রাজু

আদায় করে। অন্যদিকে গত আওয়ামী রেজিমে আমরা দেখেছি, 'আদিবাসী' দিবস বা 'আদিবাসী' শব্দের ব্যবহারের বিরুদ্ধে ১৫ আগস্টের সহিংসতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইন্ডিজেনাস বা আদিবাসী দিবস পড়েছিল আগস্টে, সেহেতু ১৫ আগস্টের ঘটনাকে স্মরণ করে আদেশ দেয়া হয় যেন আদিবাসী দিবস উদযাপন করা না নয়। ২০১১ সালে এক অফিশিয়াল বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'Steps should be taken to publicize/broadcast in the print and electronic media that there are no Indigenous people in Bangladesh. The month of August is recognized nationally as the month of mourning. Hence, such unnecessary celebration programmes in the name of Indigenous Day in this month should be avoided.'। কীভাবে প্রান্তিক পরিচয়কে অস্বীকার করার কাজে কর্তৃত্ববাদী নিজেদের ঐতিহাসিক ক্ষতকে এস্তেমাল করে তার উৎকৃষ্ট নজির হচ্ছে এ ঘটনা।

বাংলাদেশে আরেক রকমের সহিংসতা রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে দেখা যায়। বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্রকামী আন্দোলন সে চল্লিশের দশক থেকে শুরু করলেও স্বাধীন বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত টানা দুবার সুষ্ঠু নির্বাচন এ রাষ্ট্রের জনগণ দেখেনি। যিনি বা যারা ক্ষমতায় আসীন হন, তাদের কীভাবে গণতান্ত্রিক কায়দায় নামানো যাবে, সে বিষয়ে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্ত গড়ে ওঠেনি। ফলে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সহিংসতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতা থেকে নামানোর প্রক্রিয়া না থাকলে কী হয়, তার সবচেয়ে বড় নজির আমরা দেখেছি জুলাই-আগস্টে। ক্ষমতাসীন দল হাজার খানেক মানুষকে মেরে ফেলতেও প্রস্তুত ছিল, তবু ক্ষমতা ছাড়তে রাজি ছিল না। অবশেষে জনগণের আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীনদের দেশ থেকেই পালিয়ে যেতে হয়েছে। অর্থাৎ, সহিংসতা ব্যতীত নির্বাচন বা ক্ষমতা হস্তান্তর যেন বাংলাদেশে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে আওয়ামী জমানার ১৫ বছর রাষ্ট্রীয় সহিংসতার কাল। পদ্ধতিগত গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আইনি মামলা ও হামলা—এসব ছিল আওয়ামী জমানার চিহ্নায়ক। কিন্তু বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এমন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল যে ক্ষমতা থেকে একটু দূরে সরলেই জীবন বোধযোগ্য হয়ে উঠত। সে বধযোগ্য বর্গ তৈরি হতো নানা কায়দায়। 'শিবির' বা 'জঙ্গি' বর্গ যেমন 'বধযোগ্য' হয়ে উঠেছিল, তেমনি সামাজিক বাস্তবতায় 'নাস্তিক'ও বধযোগ্য হিসেবে হাজির হয়েছিল। অর্থাৎ, রাষ্ট্র যে কাউকে শিবির বা জঙ্গি বা স্বাধীনতাবিরোধী তকমা দিয়ে হত্যা করে ফেললেও সমাজ থেকে এর সম্মতি উৎপাদন করা হতো নানা কায়দায়, অন্যদিকে 'নাস্তিক' বলে পিটিয়ে মারার ব্যাপারেও সামাজিক সম্মতি উৎপাদন করা হয়েছিল। এই যে কিছু পরিচয়ের লোককে মেরে ফেলা যায়, এ ধরনের একটা সম্মতির চূড়ান্ত বিকার হচ্ছে জুলাই হত্যাযজ্ঞ। জুলাইয়ে পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনী যে নির্বিচারে হত্যা করতে পারল, কারণ এ ধরনের হত্যাযজ্ঞ রেজিমজুড়েই করা হয়েছে। একেকবার একেক গোষ্ঠীকে একেক ধরনের পরিচয়ের তকমা (ট্যাগ) দিয়ে বধযোগ্য আকারে হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের সংকট থেকে যে সহিংসতার জন্ম তা জুলাই-আগস্টে এসে একাত্তরকেন্দ্রিক পরিচয়ের সঙ্গে আবার জুড়ে গেছে। একাত্তর ও চব্বিশের সহিংসতা (জেনোসাইড ও ম্যাসাকার) আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীকে প্রায় এক লাইনে নিয়ে এসেছে। দুটোর সহিংসতার ধরনের ভেতর গুণগত ফারাক থাকলেও দুটোর সঙ্গে দুই দলের সম্পৃক্ততা এ বিশেষ অবস্থা তৈরি করেছে। জামায়াত একাত্তর নিয়ে নিজের অবস্থান যেমনে ব্যাখ্যা করে, লীগও চব্বিশ নিয়ে একই কায়দায় নিজের অবস্থান করবে বা করে যাচ্ছে। বিচারের প্রসঙ্গ উঠলে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সহিংসতা নিয়ে জামায়াত যে ধরনের যুক্তি প্রদান করে, জুলাই ম্যাসাকারের বিচারের প্রসঙ্গেও লীগ একইভাবে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সহিংসতার প্রসঙ্গ উঠাবে। ফলে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী একে অপরের যুক্তি দিয়ে একে অপরের অপরকে জাস্টিফাই করবে। একে অপরকে মতাদর্শিক অবস্থানের ফুয়েল জোগাবে। অর্থাৎ, চব্বিশে এসে একাত্তর আবার বাংলাদেশের

রাজনৈতিক পরিচয়ের নতুন শর্ত যুক্ত করে দিয়েছে। রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর 'পরিচয়' নির্মাণ ও রাজনীতি ঘুরপাক খাবে দুই আমলে দুই সহিংসতায় তাদের সম্পৃক্ততার ধরনকে কেন্দ্র করে।

ফলে আমাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, যদি সহিংসতাকে মোকাবেলা না করা যায় ঐতিহাসিকভাবে, তাহলে এক সহিংসতা পরিচয় নির্মাণের উপাদান হিসেবে কাজ করে কিছুদিন পর নতুন সহিংসতার জমিন তৈরি করে। অথবা সহিংসতার স্মৃতিকে কাজে লাগিয়ে কর্তৃত্ববাদীদের উত্থান ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় আমাদের দরকার সহিংসতা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজা।

ক্রান্তিকালীন ইনসাফের সন্ধানে

বাংলাদেশে সহিংসতার যে নানা দিক ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হলো, এর একটা সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, প্রায় অধিকাংশ সহিংস ঘটনার কোনো বিচার হয়নি। বিশেষত, ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন সহিংসতার বিচার নিয়ে বিন্দু পরিমাণ আলাপও অনুপস্থিত। সে সময়ে নিহত মানুষগুলোকে যেন 'বলিদানযোগ্য' হিসেবেই গণ্য করা হয়। দায়মুক্তি যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অন্যতম বৈশিষ্ট। এমনকি এ ধরনের সহিংসতার যখন বিচারের উদ্যোগও নেয়া হয়, প্রায়ই সেটা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। ফলে এটা আরেক ধরনের সহিংসতার চক্র তৈরি করে। কিন্তু আমরা যদি সামনের দিকে এগোতে চাই, তাহলে আমাদের দৃষ্টি আরো প্রশস্ত করা দরকার। বিশেষত, একাত্তর সালে আমরা যে ধরনের বিপুল হত্যাযজ্ঞের ঘটনা দেখেছি বা আওয়ামী রেজিমে গুম ক্রসফায়ারসহ যে অজস্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেখেছি বা চব্বিশে যে ধরনের সহিংসতা দেখেছি, তাতে কেবল জুডিশিয়াল জাস্টিস বা প্রচলিত আইন-আদালত দিয়ে এগুলোকে মোকাবেলা করা সম্ভব না। এখানেই আমরা ক্রান্তিকালীন ইনসাফ বা ট্রানজিশনাল জাস্টিসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই।

চব্বিশে আমরা যে ধরনের সহিংসতা দেখেছি, সেখানে কেবল কয়েকজন ব্যক্তির সম্পৃক্ততার বিষয় নয়, বরঞ্চ সমাজের একটা বড় অংশ সেখানে জড়িত থাকে। আমলাতন্ত্র, পুলিশসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু লোক এতে জড়িত থাকেন। সবাইকে যেমন আইনের সামনে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না, তেমনি সবাইকে বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠান চালানোও সম্ভব হয়না। আবার প্রচলিত আইন এ ধরনের হত্যাযজ্ঞের বিচার করতে সক্ষম হয় না। অন্যদিকে কেবল আইন-আদালতকেন্দ্রিক বিচার করলে এ সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগীরা যে ধরনের ট্রমার ভেতর দিয়ে যান, সেটা থেকে নিরাময় লাভ (হিল) করতে পারেন না। আবার এ ধরনের সহিংসতায় যে ধরনের বহুমাত্রিক ভুক্তভোগী তৈরি হয়, প্রচলিত ব্যবস্থায় কেবল আপাত বিজয়ী গোষ্ঠীই নিজেদের 'ভুক্তভোগী' হিসেবে দাবি করতে পারে। ফলে কেবল তাদের সঙ্গে সংঘটিত সহিংসতার বিচারের দিকেই ধাবিত হন। ফলে যখন কোনো সমাজে এ ধরনের বিরাট মাত্রায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে, তখন এর প্রভাব ও ধাক্কা সমাজ থেকে ধীরে ধীরে কমাতে চাইলে আমাদের ইনসাফের একটা বিরাট ক্যানভাসের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে সমাজ ও রাষ্ট্রে সে সহিংসতা যেন এমন কোনো 'ক্ষত' তৈরি করতে না পারে, যা ক্রমাগত সহিংসতার দুষ্টুচক্র তৈরি করতে পারে।

ক্রান্তিকালীন ইনসাফ ধারণা হিসেবে নতুন; এর মূল ধারণা হচ্ছে অতীতের সহিংসতার মুখোমুখি হওয়া, মোকাবেলা করা এবং এর থেকে নিরাময় লাভ করা। এর সঙ্গে কয়েকটা মৌলিক বিষয় জড়িত থাকে। প্রথমত, যারা জড়িত তাদের বিচারের আওতায় আনা; দ্বিতীয়ত, প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে অতীতের মুখোমুখি হওয়া; তৃতীয়ত, এ ধরনের সহিংসতার ফলে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাগরিকের যে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে সেটা লাঘব করা; চতুর্থত, সহিংসতার ফলে বিভাজিত সম্প্রদায়ের ভেতর সম্প্রীতি ও আস্থা ফেরত নিয়ে আসা; পঞ্চমত, ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং ষষ্ঠত, একটি অংশীদারমূলক ইতিহাস ও স্মৃতির বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হওয়া। এ কর্মযজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইনসাফ প্রদান করা এবং সমাজে এ ধরনের সহিংসতার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেটা নিশ্চিত করা।

ক্রান্তিকালীন ইনসাফের কিছু প্রধান উপাদান নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই আসে অপরাধমূলক বিচারের প্রসঙ্গ। সহিংসতা বা হত্যাযজ্ঞ বা ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশদাতা, পরিকল্পনাকারী এবং মূল বাস্তবায়নকারীদের আইনের মুখোমুখি করতে হবে। কখনো কখনো এ ধরনের সহিংসতার বিচার প্রচলিত আইনি কাঠামোয় সম্ভব হয় না, তখন বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল করতে হয়। একাত্তরের বাংলাদেশ বা নব্বইয়ের রুয়ান্ডা ও যুগোশ্লোভিয়ায় সহিংসতার পর এ ধরনের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গড়ে উঠতে দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে, এ ধরনের বিচার ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে সহায়তা করে। বাংলাদেশে এরই মধ্যে এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল থাকার কারণে চব্বিশের সহিংসতার বিচার সেখানেও করা সম্ভব বলে অনেকেই মনে করেন। সরকারও এরই মধ্যে সে অনুযায়ী কাজ শুরু করেছেন। কিন্তু এ ট্রাইব্যুনালের ইতিহাস আদতে আমাদের পক্ষে নয়। এটাকে এস্তেমাল করে ভয়াবহ ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা কায়েমের নজিরও এরই মধ্যে তৈরি হয়ে আছে। পাশাপাশি ট্রাইব্যুনালে ফাঁসি বা ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের অন্তর্ভুক্তি এটাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে এবং করবেও।

দ্বিতীয়ত আসে ট্রুথ কমিশন গঠন। আমরা জানি জুডিশিয়াল বিচার বিস্তৃত সহিংসতার বিচিত্র দিককে আমলে নিতে পারে না। ফলে এখানে এমন এক ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন হয় যেখানে ভুক্তভোগীরা তাদের স্মৃতি, তাদের গল্প, তাদের জবানিতেই বলতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন হয় ট্রুথ কমিশনের। এমন না যে এ ট্রুথ বা সত্য কেউ জানতেন না। জানা ও স্বীকৃতির মধ্যে ফারাক রয়েছে। ভুক্তভোগী যখন আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে সাক্ষ্য দেয়ার বদলে তার নিজের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেন, তখন পুরো প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। গুম বা ক্রসফায়ারের মতো ঘটনা কীভাবে ঘটে এবং আর এ মাধ্যমে ভুক্তভোগীকে কী নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয় সেটা ট্রুথ কমিশনের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে। ফলে এ ধরনের কমিশন আসলে আর্কাইভ গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি অংশীদারমূলক ইতিহাস তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে আরো জরুরি যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে, ভুক্তভোগী ও সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতার কাছে তাদের গল্প তুলে ধরে এবং বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সেটাকে বসিয়ে তারা মানসিকভাবে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যান। ব্যক্তি যেমন এটা বলে বা শেয়ার করে তার ট্রমাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে চান, তেমনি তার বক্তব্য থেকে সমাজ উপকৃত হয়। এমনকি সত্যের স্বীকৃতি বিভাজিত সমাজে রিকনসিলিয়েশন বা সম্প্রীতি গড়ে তুলতেও সহায়তা প্রদান করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রুথ কমিশন গঠন এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত নজির। এমনকি সত্য স্বীকারের (কনফেস) মাধ্যমে কখনো কখনো ক্ষমা প্রদর্শনের উদ্যোগও সমাজকে দ্রুত স্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যাওয়াকে সহজ করেছিল। একাত্তরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, শেখ মুজিবের সরকার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগীদের বিচারের উদ্যোগ নিলেও পরে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেন। কিন্তু এখানে কোনো কনফেশনের ব্যবস্থা না থাকায় সমাজে কোনো ধরনের সম্প্রীতি গড়ে উঠতে পারেনি। উল্টো বহুদিন পর সেটা প্রতিশোধপ্রবণ শ্লোগান নিয়ে মূলধারার রাজনৈতিক পরিসরে আবির্ভূত হয়েছিল, যার ফলাফল হয়েছিল অনেক গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

তৃতীয়ত আসে ক্ষতিপূরণ প্রদান। যেসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ক্ষতির শিকার হয়েছেন, তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি চিকিৎসা প্রদান করতে হয়। এ ধরনের ক্ষতিপূরণ কেবল ভুক্তভোগীকে তাদের নিজেদের জীবন নতুন করে গড়ে তুলতেই সহায়তা করে না, বরঞ্চ এক ধরনের প্রতীকী মূল্যও রয়েছে। তবে এ ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান আবার সমাজে যেন বিভাজন তৈরির রাস্তা না হয় সেদিকেও মনোযোগ দেয়া দরকার। এরই মধ্যে বাংলাদেশে জুলাই ফাউন্ডেশনের মতো সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে, আহতদের

চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে, নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এটাকে কেবল সহায়তার দিক থেকেই বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ক্রান্তিকালীন ইনসাফের দিক থেকেও এ ধরনের ক্ষতিপূরণ খুবই জরুরি। এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এ গণ-অভ্যুত্থানে পুলিশি সহিংসতা নিয়ে সবাই আলোচনা করছেন এবং বিভিন্ন ধরনের পুলিশি সংস্কারের প্রস্তাবও আসছে। অভ্যুত্থানের কালে ও অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়েও পুলিশ সদস্যসহ বহুজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ মৃত্যু ও প্রাণহানিকে আমরা কীভাবে ইনসাফের আওতায় আনব? আমাদের মনে রাখা দরকার বাংলাদেশে পুলিশে যারা চাকরি করেন, তারা তো এ দেশের মানুষেরই সন্তান, শ্রমিক-কৃষকের সন্তান। পুলিশি সংস্কৃতি ও কাঠামো যে ঔপনিবেশিক তা তো আমরা জানিই। কিন্তু গত ১৫ বছরে এ পুলিশ সদস্যদের একদিকে সিস্টেম্যাটিক্যালি খুনি (আক্ষরিক অর্থে) বানিয়ে এবং অন্যদিকে তাদেরই জনতার ক্ষোভের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার একক কারিগর হচ্ছে শেখ হাসিনার রেজিম। জুলাই অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে হাজার খানেক মানুষের হতাহত হওয়া এবং জনতার-ক্ষোভে পুলিশের নিহত হওয়া—দুটোই একই সূত্রে গাঁথা। এ সূত্র হচ্ছেন শেখ হাসিনা। গত ১৫ বছরে সাংবিধানিক বেড়াজাল দেখিয়ে, নির্বাচনে কারচুপি করে, দমন পীড়ন চালিয়ে যে শাসন ব্যবস্থা শেখ হাসিনা কায়েম করেছিলেন, তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই হাজির হয়েছিল এ বাস্তবতা। এ পটভূমি ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যারা কেবল পুলিশের হত্যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের উদ্দেশ্য মোটেও সাধু নয়। যার কারণে পুরো দেশ ধীরে ধীরে এক জীবন্ত বোমায় পরিণত হয়েছিল তাকে আড়াল করতে চান ওনারা। জুলাই-আগস্টে যত হত্যাযজ্ঞ ঘটেছিল, তার দায় শেখ হাসিনা ও নেতৃত্বস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের, যাদের অধিকাংশ তাদের ফুটসোলজারদের বিপদের মুখে রেখে দেশ ছাড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। এখন এই যে পুলিশ সদস্য যারা প্রাণ হারিয়েছেন বা অভ্যুত্থান-পরবর্তী সহিংসতায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদেরও নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের এ ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্যোগের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কেননা সহিংসতা পরবর্তী স্থিতিশীল সমাজের জন্য এটা প্রয়োজনীয়। অন্যথায় এক সমাজের গোষ্ঠীর মানসিক ক্ষত নিরাময় হলেও অন্য গোষ্ঠির সে ক্ষত বেড়ে উল্টো সমাজে সহিংসতার চক্র চলতে থাকবে।

চতুর্থত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। চব্বিশের জুলাইয়ে আমরা যে ধরনের সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছি, এ ধরনের সহিংসতার ফলে নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের এক গভীর অনাস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়। কেননা সহিংসতার সঙ্গে নানা মাত্রায় এ প্রতিষ্ঠানাদি যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যেমন রদবদলের জরুরত দেখা দেয়, তেমনি কাঠামোগত দিক থেকেও এসবের সংস্কার করতে হয়। বিশেষত বিচার বিভাগ, পুলিশ বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে এরই মধ্যে অনেক জায়গায় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ সংস্কার কমিশন গঠন যেমন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের জন্য জরুরি, তেমনি জরুরি হচ্ছে ক্রান্তিকালীন ইনসাফের জায়গা থেকেও।

পঞ্চমত হচ্ছে, স্মৃতিচারণ ও স্মৃতিসংরক্ষণ। অর্থাৎ, অতীতের নৃশংস ঘটনাগুলোর স্মৃতিকে সর্বজনীনভাবে সংরক্ষণ ও স্মরণ করার একটি প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় যেমন স্মৃতিস্মারক বা স্মৃতিসৌধ অন্তর্ভুক্ত, তেমনি রয়েছে জাদুঘর। যুদ্ধ ও সহিংসতার ইতিহাসবিষয়ক জাদুঘর আধুনিক রাষ্ট্রের জনপরিসরের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। আগেই পরিচয় গঠনে স্মৃতি ও সহিংসতার জরুরত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জাদুঘর একত্রে সে কাজটা করে। সহিংসতার স্মৃতিকে একটি অংশীদারমূলক স্মৃতিতে পরিণত করার কাজটি করে মূলত জাদুঘর। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা নিয়ে জাদুঘর রয়েছে। কিন্তু সে জাদুঘরগুলো ইনসাফ-অভিমুখী না হয়ে বরঞ্চ জাতীয়তাবাদী প্রচারণার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ফলে এগুলো ভুক্তভোগীর মানসিক ক্ষতকে নিরাময় না করে উল্টো সমাজে ট্রমা উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে চব্বিশের সহিংসতা নিয়ে জাদুঘর ও স্মৃতিসংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এটা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তা ভুক্তভোগীর ভাষ্য তুলতে পারে এবং তার জন্য নিরাময় প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে। এটা কেবল ভুক্তভোগীর দুঃসহ যাতনা স্বীকৃতিই দেবে না, বরঞ্চ সমাজের সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এটা কেবল ব্যক্তিগত ট্রমার নিরাময় করার পাশাপাশি সমাজের সামষ্টিক ট্রমার নিরাময় করবে।

আমরা কোথায় পৌঁছতে চাই

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের রাষ্ট্রীয় সহিংসতা বাংলাদেশকে এক নতুন দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। গত ৫০ বছরের অধিক কাল থেকে বাংলাদেশের নানাবিধ জাতিগত ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণ ও গড়নে 'সহিংসতা' গুরুতর ভূমিকা পালন করে আসছে। পরিচয় নির্মাণ ও গড়নই এর শেষ কথা নয়, বরঞ্চ ক্রমাগত জালিম ও মজলুমের সম্পর্কের অদল বদল ঘটাচ্ছে। আজকে যে মজলুম সে কাল মজলুমিয়াতকে এস্তেমাল করে আবার জালিমে পরিণত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ যেন এক সহিংসতার দুষ্টচক্রের আবর্তে পড়ছে। একাত্তর সালের পর বাংলাদেশ নামক এ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী এত বড় সহিংসতার মুখোমুখি হয়নি। আওয়ামী রেজিমের মুক্তিযুদ্ধ ও একাত্তরের ইতিহাসকে স্বৈরাচারের মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহারের নজির এবং এর প্রতিক্রিয়ায় গড়ে তোলা তীব্র প্রতিরোধ এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যেখানে একাত্তর ও চব্বিশের সহিংসতা আবারো নতুন 'পরিচয়'-এর উপলক্ষ হয়ে উঠছে। এ সহিংসতা মোকাবেলা না করতে পারলে আসন্ন দিনগুলোয় আরো সহিংসতা বাড়বে। সহিংসতার এ দুষ্টচক্র ভেঙে দেয়ার জন্য এবং সমাজে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা কায়েমের লক্ষ্যে এ প্রবন্ধের ক্রান্তিকালীন ইনসাফের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আমরা কেবল প্রতিশোধমূলক বিচার চাই না, বরঞ্চ ইনসাফ কায়েম করতে চাই।

তথ্যসূত্র

১. Nigam, Aditya. "Identity Illusions, Unclassified Categories." *Himal Southasian*, January 21, 2009.
২. Sen, Amartya. *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. New York: W. W. Norton & Co., 2006.
৩. Appadurai, Arjun. *Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger*. Durham, NC: Duke University Press, 2006.
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মশক্তি*, রবীন্দ্র রচনাবলি (অনলাইন)
৫. Wang, Zheng. *Memory Politics, Identity and Conflict: Historical Memory as a Variable*. Cham: Palgrave Macmillan, 2018.
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মশক্তি*, রবীন্দ্র রচনাবলি (অনলাইন)
৭. Wang, Zheng. 2018.
৮. চক্রবর্তী, দীপেশ। "আনিসুজ্জামান-মানস ও মুসলিম বাংলা সাহিত্য : উপক্রমণিকা।" *রাষ্ট্রচিন্তা* ৫, সংখ্যা ১ (জানুয়ারি ২০২১)।
৯. Ahmed, Hana S. *Tourism and State Violence in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. 2017. Electronic Thesis and Dissertation Repository, 4840. https://ir.lib.uwo.ca/etd/4840.
১০. সহুল আহমদ ও সারোয়ার তুষার। *স্মরণ রাজনীতি*। ঢাকা : আদর্শ, ২০২৪।
১১. Roht-Arriaza, Naomi, and Javier Mariezcurrena, eds. *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; Lawther, Cheryl, Luke Moffett, and Dov Jacobs, eds. *Research Handbook on Transitional Justice*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017.
১২. Carter, Jennifer. *Human Rights Museums*. New York: Routledge, 2024.

সাহিত্যের (নতুন) রাজনীতি

মিগেল আনহেল পালমা বেনিতেজ

ভাষান্তর : নাহার তৃণা

একটা সময় ছিল—হয় তা অতিরিক্ত সুখদায়ক নয়; অধিকতর দুঃখময়, কাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার উত্তরের ওপর নির্ভর করে—যখন লিখিত শব্দ একই এক্সক্লুসিভ শ্রেণীবিভাগকে প্রতিফলিত করত যা, একসময় সামাজিক জীবনকে সংগঠিত করেছিল যেমন প্রাচীন সমাজে দৈনন্দিন জীবনে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা যেসব সাহিত্যচর্চা করতেন তাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে শুধু ক্ষমতাবানদের প্রাধান্য দেয়া হতো। তাঁর সমাজের নিচুস্তরের জন্য এক ধরনের সাহিত্য ছিল যা নিম্নবিত্তের জীবনের এবং কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে রচিত হতো—যা হয়তো কুরুচিপূর্ণভাবে মজাদার হতো, কিন্তু সেগুলো উচ্চমার্গীয় সাহিত্য ভাবনার মধ্যে ঠাঁই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কখনই করতে পারত না।

জ্যাক রাঁসিয়ের তার 'দ্য পলিটিকস অব লিটারেচার' গ্রন্থে বলেছেন, উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাহিত্যের আবির্ভাবের মাধ্যমে এ শ্রেণীবিন্যাস রদ করা হয়েছিল, যখন সাহিত্যের ধরন এবং বিষয়গুলোর মধ্যে বিভাজন রেখা ধোঁয়াটে হয়ে গিয়েছিল এবং প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছিল এমন সাধারণ পুরুষ ও নারী, যাদের কোনো মহান গুণাবলি ছিল না, শুধু এ জগতে সরল অস্তিত্বটুকু ছাড়া।

তিনি ঘোষণা করেন, সাহিত্য এমন এক নতুন লিখনরাজ্য, যেখানে যে কেউ লেখক কিংবা পাঠক হতে পারে, অর্থাৎ সাহিত্যের আবির্ভাব প্রাচীন যুগের সেসব যুক্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, যা নির্দেশ দিত বা বর্তমানে কখনো কখনো দিয়ে চলে যে কিছু ব্যক্তি বিশেষভাবে গুণান্বিত যা তাদের কোনো শিল্পকর্মকে প্রশংসা (বা সৃজন) করার অনুমতি দেয়, যখন অন্যরা এ অনুভবশক্তির অভাবের কারণে শুধু সেই জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাই করতে পারে যা শ্রম ও বাঁচার প্রচেষ্টাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। রাঁসিয়ের, এখানে অবশ্য ফরাসি সাহিত্যের কথা ভেবেছেন, তবে তার পর্যবেক্ষণগুলো অন্যান্য দেশের (যেমন লাতিন আমেরিকা) ঘটনাবলিকেও একইভাবে আলোকিত করতে পারে। এ প্রবন্ধে আমি লেগুসোর ও অন্যান্য সংলাপকারীর কথা ব্যবহার করতে চাই, এটি বিবেচনা করার জন্য কীভাবে সাম্প্রতিক কিছু বিতর্ক সাহিত্যে উত্তেজনার প্রকাশ ঘটিয়েছে যা রাজনীতিসাপেক্ষ, কারা ঘটিয়েছে এবং কোত্থেকে এসেছে তা নির্বিচারে, ও রাঁসিয়ের মতে, তা এখনো বর্তমান।

এর মুখোমুখি হয়ে, লেখক এবং পাঠক যে কেউ হতে পারেন—এমন দাবি করা সমস্যাজনক। এটি চিরকাল এমনই হয়ে আসছে। রাঁসিয়ের উল্লেখ করেন কীভাবে এমনকি ভলতেয়ারও আক্ষেপ করেছিলেন যে তার যুগের পাঠকরা তার সেই পরচুলা পরা, গয়না জড়ানো ভদ্রলোক নন, যারা ফরাসি ধ্রুপদি সাহিত্যের প্রতীক কর্নেইয়ের কাজকে প্রশংসা করেছিলেন, বরং তারা কেবল 'কিছু তরুণ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা' তবু তার এই আক্ষেপের মাধ্যমে তিনি একটি মৌলিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: সাহিত্য এমন এক সৃষ্টির রূপ, যা কোনো নির্দেশিকা ছাড়াই তার নিজস্ব পথ অনুসরণ করে এবং তার দিকেই পৌঁছায়, যিনি এটি পড়তে পারেন—বা আজকের দিনে বলতে পারি, শুনতে পারেন—এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্ময়ে থমকে না গিয়ে যে এটি একজন সাহিত্যে পিএইচডি ডিগ্রিধারীর জন্য কথা বলবে, শহরের এক রাস্তার বাউন্ডারের উদ্দেশে না বলে সম্ভবত এ কারণেই, যারা লিখিত শব্দজগতে শ্রেণীবিন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন, যারা কিছু ধরনকে উচ্চতর বা নিম্নতর এবং বিষয়বস্তুকে গুরুত্বপূর্ণ বা তুচ্ছ বিবেচনা করতেন এবং যারা বিবেকের তাড়না ছাড়াই মতামত দিয়েছেন যে কে লিখবেন বা কে লিখবেন না, বিশেষত মানসম্পন্ন সাহিত্য না লিখলেও তারা প্রায়ই আক্ষেপ করেছেন যে সাহিত্য তার আগের মতো নেই।

ক্রিস্টিনা রিভেরা গারজা তার 'ব্রিফ মিসিভস ফ্রম পুয়েব্লা (যেটি রবিন মায়ার্স ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন)' প্রবন্ধে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রযুক্তি—বিশেষত টুইটারের (বর্তমানে 'এক্স') ১৪০ অক্ষরের বার্তাগুলো—লেখালিখির সাংস্কৃতিক শুরুকে প্রভাবিত এবং সমৃদ্ধ করেছে, তিনি বলেন, 'একটি টুইট ভাবগর্ভ উক্তি বা হাইকুর মতো হতে পারে, কিন্তু বাস্তব সময়ের কাঠামোয় লেখা হওয়ার কারণে এটি প্রভাবশালী মতাদর্শের কাঁপা সমাজতান্ত্রিক সময়ের বিপরীতে দাঁড়ায়, যা নিজস্ব সংস্কার মাধ্যমে নির্ধারণ করে কোনটি সাহিত্যগত বা কোনটি সাহিত্যবহির্ভূত, উদাহরণ হিসেবে তিনি আলবার্তো চিমালের ফ্লাশ ফিকশনের উল্লেখ করেন, যা টুইট হিসেবে জন্ম নিয়েছিল এবং পরে একটি গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে (La saga del viajero del tiempo পড়লে বিষয়টা স্পষ্ট হবে), একই সঙ্গে তিনি লেখক ও দৃশ্যকলাশিল্পী (Visual artist) গ্রাসিয়েলা রোমেরোর সৃষ্টিগুলোর উল্লেখ করেছেন যিনি আমাদের এমন রত্নপঙ্‌ক্তি উপহার দিয়েছেন, যেমন : 'ঈশ্বর সময় সৃষ্টি করলেন এবং দেখলেন এটি ভালো তারপর তিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন এবং আমরা দেরি করলাম কী দুর্ভাগ্য।' 'আমি ভাবনাটি হারাইনি, আমি অনেক বিভ্রান্তি অর্জন করেছি।' এবং 'আমি তোমার যথেষ্ট না হলেও অনেক পেয়েছি।'

রিভেরা গারজা বলেন, 'এ লাইনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেগুলো সাহিত্য কিনা তা নয়, বরং এগুলো এক ধরনের পরিবর্তনের লক্ষণ : এখন আর কেউ অসাধারণ হওয়ার জন্য বা আগে থেকেই অসাধারণ ছিলেন বলে লেখেন না, বরং জীবনকে লিখে রাখার জন্য লেখেন। এবং একই সঙ্গে আরো স্মরণ করা যায় যে ভাষা"পাথরে খোদাই করা কিছু নয়, বরং"খেলাচ্ছলে ব্যবহৃত', এবং ভাষা নামের অনুষঙ্গটিও রাজনৈতিক।

রিভেরা গারজা তাদের টুইটরাইটার্স নামে ডেকেছেন, তারা এক চরম উদাহরণ—এবং এই কারণে, খুব কাজেরও। এই ব্যক্তিরা, যাদের লেখার আকাঙ্ক্ষা যেকোনো ব্যক্তির জন্যই হতে পারে, তাদের তা করার বৈধ অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও, সাহিত্যমূল্যের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ এবং সন্দেহ জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু তারা একা নন। জন গুইলবির (Cultural Capital : The Problem of Literar Canon Formation) অনুসরণে, রিভেরা গারজা তার প্রবন্ধের শেষে সাহিত্য মানের সমস্যাটি প্রতিফলিত করেন। টুইটের একটি সিরিজকে কি অন্যান্য সাহিত্যশৈলীর বিশ্লেষণের কাজে একই মানদণ্ড দ্বারা বিচার করা বিবেচনাযোগ্য? প্রকৃতপক্ষে নয়। তবে বিষয়টি হলো সাহিত্য স্ব-অর্থেই ভালো লেখার কিংবা সাহিত্যগুণের সমতুল্য নয়, তিনি বলেন। সাহিত্য হলো শুধু সেই নাম যা উনিশ শতকের কোনো এক সময়ে একটি ধারার লেখাকে দেয়া হয়েছিল, যা কাগজে মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে একটি বিধি গঠনের পেছনে প্রভুত্বব্যঞ্জক মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল। এবং সেটাই সব নয়; গুণ-মান একটি পাঠের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নয়। পাঠটি কেবল তখনই বিদ্যমান যখন কেউ সেটি পড়ে এবং, সেই মুহূর্তে, তাতে একটি নির্দিষ্ট মূল্য প্রদান করে। শুধু একটি অপরিহার্য দৃষ্টিভঙ্গি, এবং তাই তা অপ্রাসঙ্গিক যা 'সাহিত্য'কে 'গুণমানের' সমার্থক করে তোলে। শুধু একটি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি—অর্থাৎ, স্থিতাবস্থা এবং এর অন্তর্নিহিত শ্রেণীবিন্যাসের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত যা একক পদ্ধতির পাঠ্য উৎপাদনের অবিরাম পুনরাবৃত্তি খুঁজে চলবে, এ বক্তব্য দিয়ে তিনি উপসংহার টানেন।

তবে ন্যায়সংগতভাবে বলতে গেলে, সবকিছু যেমন চলছে তেমনই চলতে থাকুক চাওয়ায় কোনো ভুল নেই, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসসহ, যতক্ষণ না এটি অস্বীকার করা হয়—অথবা, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে, অস্বীকার করা হয় কারণ এটি সচেতনভাবে স্বীকৃত নয়। এই সমস্যাটি টেরি ইগলটন কয়েক বছর আগে তার বিখ্যাত *Literary Theory : An Introduction* বইয়ে উপস্থাপন করেছিলেন। সাহিত্যতত্ত্ব এবং পালাক্রমে সাহিত্য সমালোচনা, নির্দিষ্ট পাঠ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি নয় বরং একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা থেকে আমাদের সমাজের বাস্তবতা এবং ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা যায়, তিনি এ বইয়ে লেখেন, যা শিক্ষামূলক এবং বিনোদনমূলক উভয়ই। কার কী রাজনৈতিক অবস্থান তা স্পষ্ট করা নিন্দনীয় নয়, বরং একটি ধারণার ধারাবাহিকতা যা বৈজ্ঞানিক, সমালোচনামূলক এবং নিরপেক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করাই শ্রেয়, যা মূলত একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকদের নির্দিষ্ট স্বার্থকে পছন্দ করে। তা যতই দুঃখজনকই হোক না কেন, ইগলটন বলেন, সত্যটি হলো বেশির ভাগ সাহিত্যতত্ত্ব ক্ষমতা ব্যবস্থার অনুমানগুলো চ্যালেঞ্জ করার চেয়ে শক্তিশালী করেছে। নিশ্চিতভাবে, অনেক সাহিত্য মানের রক্ষকরা বর্তমান সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে পারেন, যা নির্বাচিত কয়েকজনের মধ্যে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে যখন অধিকাংশের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন পরিষেবা বিশৃঙ্খল হয়ে ভেঙে পড়ে, কিন্তু তারা স্বীকার করেন না, ইগলটন লক্ষ করেন, যে এসব সমস্যার সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক আছে। আমাদের প্রত্যেকেই সাহিত্যের প্রতি কম-বেশি যে স্বর্গীয় প্রকৃতি যুক্ত করে তা এটিকে তাদের সঙ্গে কোনো সংযোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তদুপরি, তারা কখনই আমাদের সমস্যা নয়—যতক্ষণ না তারা হাজির হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তি, যারা তাদের পেশা নিয়ে মোটামুটিভাবে সন্তুষ্ট, তারা এটিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে যারা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তাদের সময় উৎসর্গ করে—বিশেষ করে যখন তারা এগুলো থেকে জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয়, কিন্তু এমনকি যখন (ঈশ্বর না করুন!) তা সম্ভব হয় না—তারা সেগুলোকে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। কলেজের একজন ইতিহাস অধ্যাপকের ক্ষেত্রে তার শিক্ষাদানের চেয়ে গবেষণাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার ভাবনা যুক্তিযুক্ত এবং অবশ্যই তারা, নিছক যারা কবিতা লেখেন এবং অন্যদের কবিতার ওপর মন্তব্য করেন, তাদের চেয়ে সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রে অধিক অবদান রাখেন এবং এ চর্চাগুলোকে মানবতার মৌলিক অংশ বলে মনে করেন। তারা নিশ্চিতভাবে সে রকমই। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলতাম যে সম্পাদনা ও অনুবাদ এমন অপরিহার্য কার্যক্রম যা পৃথিবীকে সচল রাখার কাজে সাহায্য করে, করে না কি? কিন্তু ইগলটন, যিনি মানবিকীবিদ্যাকে স্বসম্মানিত আসন থেকে ছুড়ে ফেলে নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেন তিনি সুযোগ পেলেই বলেন, ইতিহাস এবং কবিতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় (লন্ডন রিভিউ অব বুক হোয়াটস ইয়োর স্টোরি? প্রবন্ধ দেখতে পারেন)। শেষ পর্যন্ত, কবিতা মিসাইল থামাতে পারে না, যেমনটি ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে সাম্প্রতিক এক ডকুমেন্টারি সিরিজের শিরোনাম ছিল।

সাহিত্যের কর্মকাণ্ডকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দায়বদ্ধ কাজ হিসেবে ভাবতে গেলে রাঁসিয়েরের এই উক্তিটি মনে আসে, 'সাহিত্য হলো লেখার এমন একটি শিল্প যা বিশেষভাবে তাদের উদ্দেশে যাদের পড়া উচিত নয়।' যখন এ ব্যক্তিরা পড়েন, তখন কিছু খারাপ ঘটবেই। কার জন্য খারাপ? অবশ্যই যারা পড়ছেন তাদের জন্য নয়, বরং তাদের জন্য যারা এই বিপ্লবী কাজের পরিণতিতে প্রভাবিত হন। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, দালিয়া দে লা সের্দার বই পেরাস দে রেসের্ভার (সেক্সতো পিসো, ২০২২) দ্বিতীয় সংস্করণ আমাদের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

এই সংগ্রহের ১৩টি গল্প, কাহিনির সবাই এমন নারীদের দ্বারা বর্ণিত যারা কোনো না কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার (এবং সংঘটনকারী), তাদের নিয়ে কিছু মন্তব্য উঠে এসেছে। সমালোচনায় দেখা যায়, নির্যাতিত নারীরা স্থায়ীভাবে, উত্তমপুরুষে, আঞ্চলিক ও জনপ্রিয় ভাষায় তাদের ওপর হওয়া ঘটনাগুলো বর্ণনা করার জন্য বইটি নিন্দিত হয়েছে। এমনও মনে হতে পারে যে এরাকলিও জেপেদার বেনজুলুল বা আন্তোনিও এসত্রাদার রেস্কোলদোও আজকের সমালোচকদের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেহাই পেতেন না।

সমালোচকেরা বইটির সমস্ত ত্রুটি শনাক্ত করে আত্মতুষ্টি নিয়ে নিজেদের মতো জীবন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে, বিশেষ করে নারীদের মধ্যে, একটি অস্বাভাবিক ঘটনা জেগে উঠেছে। বইটি এমন পাঠকদের কাছে পৌঁছেছে, যাদের কাছে এমন সাহিত্য সচরাচর গিয়ে পৌঁছায় না—তারা ছিলেন: কারাগারে বন্দি নারী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরা, অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী শহরগুলোর বইয়ের ক্লাবের পাঠকরা। এটি এমন ব্যক্তিদের শুধু পড়তে উৎসাহিত করেনি যারা সাধারণত পড়ে না, বরং তাদের এমন ধারণাও দিয়েছে যে তারা লেখারও সামর্থ্য রাখে।

আবার ইগলটনকে স্মরণ করে বলা যেতে পারে, সামাজিক সমালোচনা বা ভিন্নমত কোনো কিছুর নিশ্চয়তা দেয় না। হয়তো তারা তা নয়। কিন্তু এখানে, আমি পেরাস দে রেসের্ভার মতো একটি বইয়ে কেউ সাহিত্যগুণ খুঁজে পাবে কিনা তার চেয়ে এর প্রতিক্রিয়াগুলোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এটি রাঁসিয়েরের ভাষায় বলতে গেলে সাহিত্যের মধ্যে যখন রাজনীতির কূটকচাল দেখা যায়, তখন এটা স্বাভাবিক কোনো বিষয়কে প্রশ্ন করে বা উল্টো করে উপস্থাপন করে।

ফরাসি ম্যাগাজিন *Les Inrockuptibles* (মার্চ ২০২৪)-এ প্রকাশিত একটি মন্তব্যে নেইজ সিনো (Neige Sinno) এ রকম কিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন। এতে তিনি পেরাস দে রিজার্ভাকে (Perras de reserva) একটি লাটিন আমেরিকান ঘটনাবলির অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার মধ্যে মারিয়ানা এনরিকেজ, মনিকা ওজেদা, সামান্থা শোয়েব্লিন ও ইউরি হেরেরাও রয়েছেন—যদিও আমরা সহজেই ফার্নান্ডা মেলচর বা ব্রেন্ডা নাভারোর নামও উল্লেখ করতে পারি—যারা সহিংসতা, ভয়াবহতা, বৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য এবং পরিবেশগত ধ্বংসকে তাদের কাজের বিষয়বস্তু করেছেন। বইয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের উল্লেখ করে, সিনো লিখেছেন, এ নারীরা কর্মস্থল এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার শিকার হয়েছেন এমন একটি দেশে যেখানে ৯৮ শতাংশ নারী হত্যা অপরাধের শাস্তি হয় না, কিন্তু সহায়ক ভূমিকায় নির্বাসিত হওয়ার পরিবর্তে, তারা নায়িকা হয়ে ওঠে, যারা কাজ করে, বিদ্রোহ করে এবং প্রতিশোধ নেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা কাজ করে। এবং তিনি উপসংহারে লেখেন : আপনি অনুভব করেন যে অবশেষে, শ্রমজীবী নারীরা সামান্য গ্ল্যামারের আঁচ এবং স্বীকৃতি পেতে পারে। যদি এটি এখনো বাস্তব জীবনে না ঘটে, তবে এটি সাহিত্যে ঘটতে পারে। এখনো এমনকি এমনটি যদি নাও হয়, বইটি সমাজের নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট এ দুই সংবেদনশীলতার সম্ভাব্য বিভাজন এবং এর ফলে সেই শ্রেণীবিন্যাসগুলো যেখানে প্রচুর অসুবিধাসহ সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তার সমালোচনা করতে সফল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মটিকে সিনো 'পিওর পলিটিকস ইন অ্যাকশন' বা নিখাদ রাজনীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

[মূল প্রবন্ধের আর্থার ম্যালকম ডিক্সনকৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে ভাষান্তর]

ছায়াবীথি

(কলকাতা, ১৩৪০-৪৩)

ইসরাইল খান

সওগাত-যুগে মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'ছায়াবীথি' বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত পত্রিকাটির পরিচয় ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কেউ লেখেননি। কারণ এর কোনো নথি সুলভ ছিল না। অথচ এটি কলকাতা থেকে ১৯৩৩ সালে একজন সপ্রতিভ তরুণ সম্পাদনা করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাকে 'মিতা' বলে উল্লেখ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' (১৯৫০) লিখে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিলেন। নাম তার অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-৮২)।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক-শিল্পী শ্রীদিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) তার গল্পগ্রন্থ 'সোনালী স্বপন' (১৯৩৩) পাঠ করে প্রশংসা করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি 'গদ্য ও পদ্য' নামে *ছায়াবীথি*তে দীর্ঘ একটি পত্রপ্রবন্ধও লিখেছিলেন। অবশ্য *ছায়াবীথি* সম্পাদনকালে তিনি ছিলেন শুধুই 'নাজিরুল ইসলাম'।

নজরুলের সঙ্গে নাজিরুল ইসলামের নামের ব্যবধান মাত্র একটি আ-কার। জসীমউদ্‌দীন, আবুল ফজল, আবু সয়ীদ আইয়ুব, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়), আবদুল কাদির, হুমায়ুন কবির, অজিতকুমার দত্ত, মহিউদ্দীন, বন্দে আলি মিয়া, সুফিয়া কামাল (তখন সুফিয়া এন হোসেন), মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সম্পাদকের সমকালীন সমবয়সীদের তারুণ্যদীপ্ত লেখায় যেমন, তেমন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল হাকিম (বিক্রমপুরী), শাহেদ সুহরাবর্দ্দি, শ্রীদিলীপকুমার রায়, আবদুর রশিদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোলাম মকসুদ হিলালী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ প্রমুখের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল ছায়াবীথি

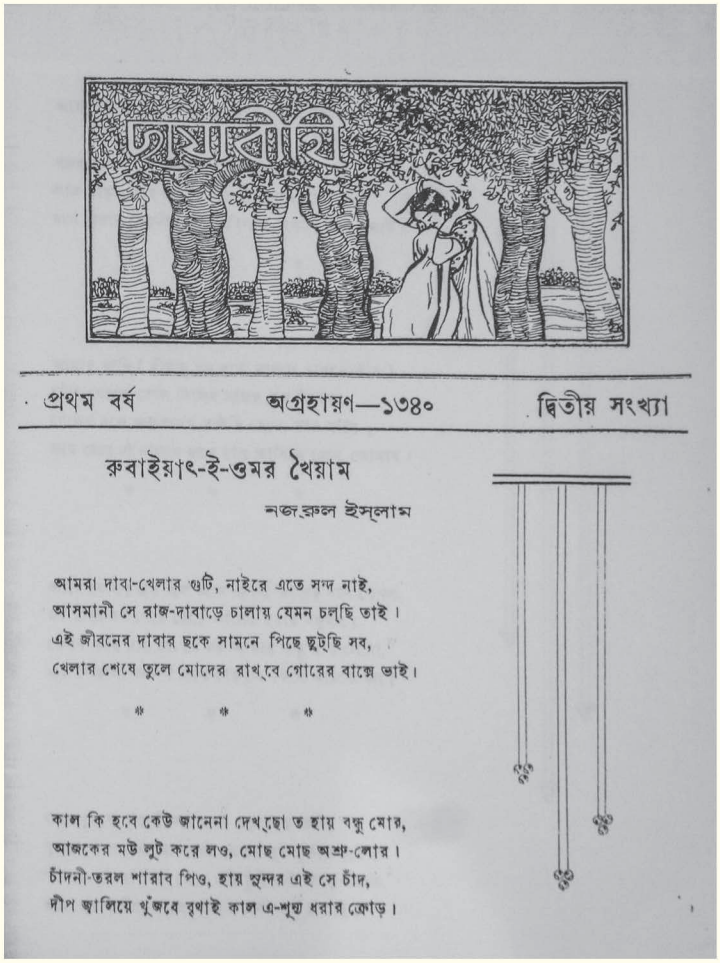
ছায়াবীথি

প্রথম বর্ষ অগ্রহায়ণ—১৩৪০ দ্বিতীয় সংখ্যা

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

নজরুল ইস্‌লাম

আমরা দাবা-খেলার গুটি, নাইরে এতে সন্দ নাই,
আসমানী সে রাজ-দাবাড়ে চালায় যেমন চল্‌ছি তাই।
এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুট্‌ছি সব,
খেলার শেষে তুলে মোদের রাখ্‌বে গোরের বাক্সে ভাই।

* * *

কাল কি হবে কেউ জানেনা দেখ্‌ছো ত হায় বন্ধু মোর,
আজকের মউ লুট করে লও, মোছ মোছ অশ্রু-লোর।
চাঁদনী-তরল শারাব পিও, হায় সুন্দর এই সে চাঁদ,
দীপ জ্বালিয়ে খুঁজবে বৃথাই কাল এ-শূন্য ধরার ক্রোড়।

নজরুলের সঙ্গে নাজিরুল ইসলামের নামের ব্যবধান মাত্র একটি আ-কার। তখন তার বয়স সাতাশ-আঠাশ। জসীমউদ্‌দীন, আবুল ফজল, আবু সয়ীদ আইয়ুব, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়), আবদুল কাদির, হুমায়ুন কবির, অজিতকুমার দত্ত, মহিউদ্দীন, বন্দে আলি মিয়া, সুফিয়া কামাল (তখন সুফিয়া এন হোসেন), মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সম্পাদকের সমকালীন সমবয়সীদের তারুণ্যদীপ্ত লেখায় যেমন, তেমন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল হাকিম (বিক্রমপুরী), অমলেন্দু দাশগুপ্ত, প্রভাবতীদেবী সরস্বতী, শাহেদ সুহরাবর্দ্দি, শ্রীদিলীপকুমার রায়, আবদুর রশিদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোলাম মকসুদ হিলালী, কবিশেখর কালিদাস রায়, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রমুখের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল ছায়াবীথি। বুলবুল যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ সেরা বাঙালি সাহিত্যিকদের যুক্ত করে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান লেখকদের সমবেত করতে চেয়েছিলেন (এবং পেরেছিলেনও), তেমনই ছায়াবীথিরও প্রচেষ্টা ছিল পত্রিকাটিকে অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য দান করতে।

তাই মনীষী রামমোহন রায়ের প্রয়াণ শতবার্ষিক স্মরণানুষ্ঠানে ধর্ম সম্মেলনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ এবং কলকাতা সিনেট হলে দেয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতার সারাংশ এবং অন্যান্য রচনাংশ পুনর্মুদ্রণ করতেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের বিস্তারিত প্রতিবেদন ছেপেছিলেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ও শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আঁকা ড্রয়িংয়ের ব্লক ছেপে ছায়াবীথিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তবে ছায়াবীথি বুলবুলের মতো স্থায়িত্ব লাভ করেনি। হিসাব অনুযায়ীও এটি বিখ্যাত 'বুলবুল'-এর ছয় মাসের অনুজ প্রসূন ছিল।

বুলবুলের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪০-এ, ছায়াবীথি কার্তিকে। বুলবুলের সাথে যেমন কবি নজরুলের গভীর সম্পৃক্তার পরিচয় পাওয়া গেছে, তেমনি ছায়াবীথির সাথেও ছিল তার আত্মিক সম্পর্ক। পত্রিকার নাম-কবিতা ('ছায়াবীথি') লেখেন কাজী নজরুল ইসলাম। প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই তার কবিতা না হলে গজল বা কীর্তন বা আধুনিক গান হতো ছায়াবীথির প্রথম রচনা।

'মুসলিম বাংলা সাহিত্য'-গ্রন্থের লেখক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কবি নজরুলকে নিয়ে রচনা করেন দীর্ঘ গবেষণা-প্রবন্ধ 'তারুণ্যের কবি নজরুল' (এই দামি ঐতিহাসিক লেখাটি এখনো অগ্রন্থিত রয়ে গেছে!)। 'বিষের বাঁশী' কাব্য অবলম্বন করে বিপ্লববাদী সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্তও দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লেখেছিলেন 'বিষের বাঁশীর সৈনিক কবি' শিরোনামে। (নজরুল জীবনীর মূল্যবান উপকরণ এই রচনাটিও অদ্যাবধি অসংগৃহীত ও অসংকলিত।) এত অল্প বয়সে কোনো কবিকে নিয়ে লিখিত প্রবন্ধ-সমালোচনা খুব অল্পসংখ্যক কবিরই ভাগ্যে জুটেছে। তাকে নিয়ে তুলনামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা লেখা হচ্ছে। তার প্রতীকী নাম নতুন নতুন হচ্ছে তো হচ্ছেই। এইসব রীতিমতো বিরল ঘটনা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

সৈনিক কবির সমকালীন তরুণতরদেরও লেখার তখন জোয়ারের বেলা। জসীমউদ্‌দীন, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদিরের সুলিখিত রচনা ও নাজিরুল ইসলাম ও অন্য লেখকদের ধারাবাহিক উপন্যাস, গল্প; আর 'কলস্রোতা' নামের আলোচনা-সমালোচনা ও মতামতের সম্পাদকীয় বিভাগের তথ্যগুলো আজ ইতিহাসের আকরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই পত্রিকার কপিগুলো ভয়াবহরূপে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। ১৯৯৩-৯৮ সময়ে কলকাতায় কাজ করবার সময়ে দ্বিতীয় বর্ষের মাত্র তিনটি সংখ্যার সন্ধান পেয়েছিলাম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। তারই ভিত্তিতে লিখেছিলাম একটি ছোট্ট আলোচনা 'মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা' শীর্ষক সন্দর্ভে। কিন্তু প্রথম বর্ষের একটিও সংখ্যা না-দেখা থাকায় তা ছিল অত্যন্ত অপূর্ণাঙ্গ একটি রচনা। সম্প্রতি মনীষী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারতদের সংগৃহীত পত্রিকার ভিড়ে এই দুর্মূল্য ছায়াবীথির প্রায় ৯০ ভাগ সংখ্যারই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তারই ফসল বর্তমান রচনা।

বিশ শতকের বিশের দশকে যে বাঙালি মুসলমানেরা সাহিত্য ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন না, তা ছায়াবীথির পৃষ্ঠাগুলোও প্রমাণ করছে। এই পত্রিকার পাতা উল্টে যারা মুসলমানদের সাহিত্য প্রয়াসের ব্যাপারে গৌণ ধারণা পোষণ করতেন, তারা অবশ্যই খুশি হবেন। কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে, এটি পেছিয়ে থাকা মুসলমানদের কোনো সাহিত্য পত্রিকা। ছাপা, গেটআপ-মেকআপ, অলংকরণ, মুদ্রণ-পারিপাট্য, আর্টিস্টদের আঁকা ছবির ব্লকের ব্যবহার ও শিল্পসম্মত উপস্থাপন এবং সুচিন্তিত রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয়ের সম্পাদকীয়তে (কলস্রোতা) দৃঢ় বক্তব্য সন্নিবেশ সব মিলিয়ে এককথায় ছায়াবীথি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চমৎকার একটি সাহিত্য পত্রিকা।

'ছায়াবীথি' নামে নজরুলের নাম-কবিতার চারটি লাইন—

স্নিগ্ধ শীতল তৃণাস্তীর্ণ এই ছায়া-বীথি তলে
রচেছি কুঞ্জ শ্রান্ত পথিক জুড়াবে খানিক ব'লে।
ঝরা পাতা আর ফুলদল দিয়া রচিয়াছি হেথা পথ,
এই পথ দিয়া যাবে সুন্দর, বন্ধুর মোর রথ।

দু'বছরের মতো চালু থাকা পত্রিকাটির প্রায় প্রতি সংখ্যার প্রথম লেখাটিই ছিল নজরুল ইসলামের। ছাপা শুরুর সময় সংগৃহীত না-হলেও শেষের দিকে হলেও পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল নজরুলের কোনো না কোনো লেখা তারা রাখবেনই। নজরুলেরও ছিল এটা সংগীত-সৃষ্টির জোয়ারের কাল। তিনি ছায়াবীথিতে বেশির ভাগই দিয়েছেন গান অথবা গানের মতো কবিতা বা অনূদিত রুবাইয়াৎ। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, কোনো প্রারম্ভিকী বা সূচনা বক্তব্য না থাকায় কে নাম দিয়েছিলেন পত্রিকার বা কে বা কারা ছিলেন উৎসাহদাতা কিছুই জানা যায় না। তবে নজরুলচর্চার প্রবণতা দেখে অনুধাবন করা যায় এর সকল লেখক সমালোচক ও পত্রিকার কর্তৃপক্ষ নজরুল ইসলামকে বড় মাপের প্রতিভা হিসেবে অতিউচ্চ শ্রদ্ধার আসনে রেখেছিলেন।

ছায়াবীথিতে নজরুলের যেসকল গান/কবিতা ছাপা হয়েছিল তার প্রথম এক-দুই লাইন করে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম সংখ্যার 'ছায়াবীথি' কবিতার পরে দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় *রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম*। তৃতীয় সংখ্যায় গান—*ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি./ভাঙিতে আসিনি ঘুম*; চতুর্থ সংখ্যায় গান—*কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা/তুমি সুন্দর চাঁদ*; পঞ্চম সংখ্যায় গান—*বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে/নাম-না-জানা বনের পাখি!*; ষষ্ঠ সংখ্যায় ভজন—*বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু/আর হইব না পথহারা*; সপ্তম সংখ্যায় গান—*একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।/ফুলে ও ফসলে কাদা মাটী জলে ঝলমল্ করে লাবণী*; অষ্টম সংখ্যায় গান—*রাত্রি শেষের যাত্রী আমি/যাই চলে যাই একা*; দশম সংখ্যায় গান—*আমি ময়নামতীর সাড়ী দেবো চল আমার বাড়ী/ও গো ভিন্-গেরামের নারী*; একাদশ সংখ্যায় গান—*আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে/দুলে গো আমার ঘুমে জাগরণে!*; দ্বাদশ সংখ্যায় গান—*শিউলি ফুলের মালা দোলে/শারদ-রাতের বুকে ঐ*; দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় গান—*গানের বুলবুলি ('ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি')*; দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় গান—*গত রজনীর কথা পড়ে মনে/রজনী গন্ধার মদির গন্ধে*; দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৪১ গান—*তোমার হাতের সোনার রাখী/আমার হাতে পরালে...*; দ্বিতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় গান/কীর্ত্তন—*তব চরণ প্রান্তে মরণ বেলায়/শরণ দিও হে প্রিয়*; দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় গান—*তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।/কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা*।

সম্পাদক নাজিরুল ইসলাম নিজের দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস-*জীবনের জয়যাত্রা* ও *দুর্ব্বিপাক* ছাড়াও আর্ট ও সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয় ছাড়াও নানা বিষয়ে প্রবন্ধও রচনা করেন। আহমেদ মনির মিখেলভিচ্ গারসিনের রাশিয়ান গল্প থেকে অনুবাদ করেন সিগনালার। প্রধানতম লেখক ছিলেন জসীমউদ্‌দীন ও হুমায়ুন কবির।

প্রথম বর্ষ কার্ত্তিক—১৩৪০ প্রথম সংখ্যা

ছায়া-বীথি

—নজরুল ইস্‌লাম

স্নিগ্ধ শীতল তৃষ্ণাহীর্ণ এই ছায়া-বীথি তলে
রচেছি কুঞ্জ শ্রান্ত পথিক জুড়াবে খানিক ক'লে।
ঝরা পাতা আর ফুলদল দিয়া রচিয়াছি হেথা পথ,
এই পথ দিয়া যাবে সুন্দর, বন্ধুর মোর রথ।
কর্ম্মক্লান্ত রৌদ্র-দগ্ধ মরুচারী মুসাফির
লভিতে শান্তি কুসুম-কীর্ণ এ পথে করিবে ভিড়।
কল্প-লোকের বিমানে উড়িয়া শ্রান্ত যাদের পাখা
হেথা আছে নীড় তাহাদের তরে ফুল-ছাওয়া ছায়া-ঢাকা
তরুলতা-ফুল-পাতা-ঘেরা ছায়া-সবুজ এ সামিয়ানা
দূর তীর্থের পথ মঞ্জিলে নিরালা সরাই খানা।

প্রথম বর্ষ] বৈশাখ—১৩৪১ [সপ্তম সংখ্যা

গান

(মিশ্র-দাদ্‌রা)

—নজরুল্ ইসলাম

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটী জলে ঝলমল্ করে লাবণী ॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম-কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝড়ের সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল ল'য়ে অশনি ॥
কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা,
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী ॥
শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া
শিউলি-ছোপানো শাড়ী প'রে ফের আগমনী গীতি গাহিয়া,
অঘ্রাণে মাগো, আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী ॥
শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে, কীর্ত্তন শোনো রাতে মা,
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী ॥

ফাল্গুন—১৩৪০
প্রথম বর্ষ
গান
(জয়জয়ন্তী মিশ্র—দাদ্‌রা)
—নজরুল ইসলাম

শ্রেষ্ঠ-শারাব পান করে নেয় বদ রসিকে হায়রে হায়,
স্থূল-আত্মা মূর্খ ধনিক শ্রেষ্ঠ বিলাস বিভব পায়।
হায়রে যত চিত্তহারী-রূপকুমারী জর্জ্জিয়ার,
শুকায় কিনা গুম্ফ-বিহীন বালক সাথে মাদ্রাসার।

* * *

কালকে রাতে ফিরছি যখন ভাটিখানার পাঁড় মাতাল,
পীর সাহেবে দেখতে পেলাম, হাতে বোতল ভরা মাল।
কইনু হে পীর, সরম তোমার নেই কি ? হেসে কইল পীর
খোদার দয়ার ভাণ্ডার যে অফুরন্ত রে বাচাল !

* * *

খাইয়াম, তুই কাঁদিস কেন পাপের ভয়ে অযথা,
দুঃখ করে কেঁদে কি তোর ভরবে প্রাণের শূন্যতা।
জীবনে যে করল না পাপ নাই দাবী তার তাঁর দয়ায়,
পাপীর তরে দয়ার সৃষ্টি, আনন্দ কর ভোল ব্যথা।

* * *

জল্লাদিনী ভাগ্যলক্ষ্মী ওফে ওগো গ্রহের ফের,
স্বভাব দোষে চিরটা কাল নিষ্ঠুরতার টানছো জের।
বক্ষ তোমার বিদারিয়া দেখ্‌তো যদি এই ধরা,
খুঁজে পেতে ঐ বুকে তার হারামণি মাণিক ঢের।

দুঃখে আমি মগ্ন প্রভু দুয়ার খোল করুণার,
আমায় কর তোমার জ্যোতিঃ অন্তর মোর অন্ধকার।
স্বর্গ যদি অর্জ্জিতে হয় এতই পরিশ্রম করে,
সেত আমার পারিশ্রমিক, নয় সে দয়ার দান তোমার।

* * *

আবার যখন মিলবে হেথায় শারাব সাকীর আঞ্জামে,
হে বন্ধুদল এক ফোঁটা কেউ অশ্রু ফেলো মোর নামে।
চক্রাকারে পাত্র ঘুরে আসবে যখন সাকীর-পাশ,
পেয়ালা একটি উল্টে দিও স্মরণ করে খাইয়ামে।

জসীমউদ্‌দীনের কবিতা 'নতুন সমাজ'

সোনামণি ভাইটি আমার লক্ষ্মীমণি বোন,
তোদের কেন ভালবাসি সেই কথাটি শোন।
একটি ছোট চিঠির লাগি ব্যাকুল হয়ে রই,
দেশ বিদেশে পদ্য করে তোদের কথা কই ।
কারণ তোরা এই পৃথিবীর নতুন-চলা পথে,
দেবতা হয়ে এসেছিস যে শিশুকালের রথে,
মায়ের মুখের সোহাগভরা আদরভরা ডাকে,
শিখেছিস যে আদর করে ডাকতে যাকে তাকে।
পরও আপন চিনিসনে তাই সবায় ভালবাসে।
আপন করে নিতে পারিস মিষ্টি মুখে হেসে।
এই জগতের মোরাও মানুষ অনেক ছিল আশা।

হুমায়ুন কবিরের 'সমাপ্তি'র কয়েকটি চরণ—

একদিন সাঙ্গ হবে ধরণীতে জীবনের ধারা
আজি হতে লক্ষ বর্ষ পরে,
সমুদ্র পর্ব্বতময়ী এ রম্য ভুবন হবে হারা
অন্তহীন ধ্বংশের গহ্বরে।
কিশোর কিশোরী হিয়া প্রণয়ের প্রথম স্পন্দনে
কাঁপিবে না আনন্দ শঙ্কায়।
ধ্বনিবে দিবসরাত্রি মহাশূন্য প্রলয় গর্জ্জনে
ভীতিহীন ঘন তমসায়।

ইমাউল হক (কবিতা) লিখেছিলেন 'ভালবাসা' শিরোনামে— *ভাল যে বাসনা তাই বলনা খুলিয়া,/মিছামিছি কেন তুমি কর তার ভান;/ প্রেমের আলোকে সখি, রাঙা যার হিয়া/তার কি থাকিতে পারে ভাল-মন্দ জ্ঞান? # ব্রাকুল সমুদ্র যবে চাঁদেরে হেরিয়া/পরশ পাইতে তার হয় আগুয়ান,/ভাবিবার অবসর পায় সেকি, প্রিয়া/রয়েছে দোহার মাঝে কত ব্যবধান!*

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পত্রাকারে প্রবন্ধ রচনা। বুদ্ধদেব বসুর প্রগতিতেও দেখা গেছে এই প্রবণতা। *ছায়াবীথি*তেও তিনি আবদুল কাদির (দিলরুবা-কাব্য) ও নাজিরুল ইসলামের (গল্প-সোনালী স্বপন) দুটি বইয়ের প্রাপ্তিসংবাদ জানানোচ্ছলে 'গদ্য ও পদ্য' বিষয়ে গুরুতর আলোচনার সূত্রপাত করে কয়েক সংখ্যাব্যাপী চালিয়ে গিয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদ তার কবিগুরু গ্যেটে রচনার কালে *ছায়াবীথি*তে অনেকগুলো পর্ব দিয়েছিলেন। এই লেখাগুলোও সম্ভবত অমিলানো। সমালোচকদের হাতে Warther/Warther পত্রোপন্যাসখানি দেশে-বিদেশের পাঠকদের কাছে অপূর্ব সমাদর লাভ করেছিল। *ছায়াবীথি*র পাতায় কবিগুরু গ্যেটের এতদ্বিষয়ক কয়েকটি অংশ ছাপা হয়। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত তার 'সমাজ ও সাহিত্য' বইয়ের সমালোচনা; ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রবন্ধ 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (কয়েক সংখ্যায় ক্রমাগত) এবং আবদুল কাদিরের 'সঙ্গীত-চর্চ্চা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের পর তার ওপর বিতর্ক চলে 'সঙ্গীতে শ্লীলতা' নামে; আর অংশগ্রহণ করেন-আবদুল কাদির ছাড়াও কাজী আবদুল ওদুদ ও নাজিরুল ইসলাম। আবদুল কাদির তার প্রিয় বিষয়-'ছন্দজিজ্ঞাসা' শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন। শাহেদুল্লাহ লেখেন গল্প-'গৃহপালিত জীব'; সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ও গল্প লেখেন 'আকাশ-কুসুম'; বন্দে আলী মিয়ার কবিতা সোনালি ফাগুন দিনে; মোহাম্মদ আজরফ এমএর প্রবন্ধ 'ধর্ম্ম ও নৈতিকতা'; মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এমএ পল্লীগাথা সংগ্রহ করে ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন ;'

'মইষাল বন্ধু' নামে।

ছায়াবীথির সাইজ চতুরঙ্গের মতো। এক কলামে সুন্দর ছাপায় দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে এর শিরোনামগুলোও। ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থেকে একই সময়ে প্রকাশিত 'সবুজ বাঙলা'র ১ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৪১ এ ছায়াবীথির বিজ্ঞাপনটির ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

ছায়াবীথি। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। আপনার সবচেয়ে প্রিয় কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকগণের রচনা পড়িবার পিপাসা একমাত্র ছায়াবীথি পাঠেই নিবৃত্ত হইতে পারে। বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির ভিতরে *ছায়াবীথি* ইতিমধ্যেই একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ছায়াবীথির বিশেষত্ব অতি আধুনিক সাহিত্য-বর্তমান দুনিয়ার আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর আঁকা ছবি। বার্ষিক চার টাকা আট আনা। অথবা ষান্মাসিক দুই টাকা চার আনা ব্যয়ে..., সম্পাদক নাজিরুল ইসলাম এমএবিটি, এফআরইকনএস। অফিস ৭৯/১, লোয়ার সার্কুলার রোড, ইন্টালী, পো : কলিকাতা। বৈশাখ হইতে ছায়াবীথি সম্পূর্ণ নূতন রূপ লইয়া বাহির হইতেছে।

'ছায়াবীথি' প্রথমে ২৯ নং কালিদাস সিংহের লেন, কলকাতা ফিনিক্স প্রেস থেকে এন ইসলাম দ্বারা মুদ্রিত ও ৭৯/১ লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে এন ইসলাম দ্বারা প্রকাশিত হবার তথ্য আছে। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৪১ প্রকাশিত হয় দি এলায়েন্স প্রেস, ৬৩ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত হয়ে এবং প্রকাশিত হয় ৭৯/৩ বি লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে। অতএব ঠিকানা বারে বারে পরিবর্তন হয়েছে।

তবে মুদ্রণ সৌকর্য ও মান ক্ষুণ্ন হয়নি। সাহিত্যালোচনায় এবং পত্রিকা প্রকাশে সম্পাদক মৌলিকত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতা সুফিয়ানের চিন্তাধারাও পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু ছায়াবীথি একটি উদার, প্রগতিশীল গান্ধীবাদী পত্রিকা হিসেবে পরিচিত ছিল সে সময়ে। স্বরাজের প্রচারণাও তাদের পত্রিকায় রয়েছে। গান্ধীর মতাদর্শের প্রচারণা, স্বরাজ ও ইংরাজের শাসন ব্যবস্থা ও গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমালোচনা, নৈতিকতা, ধর্মদর্শন আর সাহিত্যশিল্পের প্রগতিশীল ধারার ছায়াপাত ছায়াবীথির পৃষ্ঠার ঝলকিত সৌকর্য সকলকে চমকিত ও আনন্দিত করবে নিঃসন্দেহে।

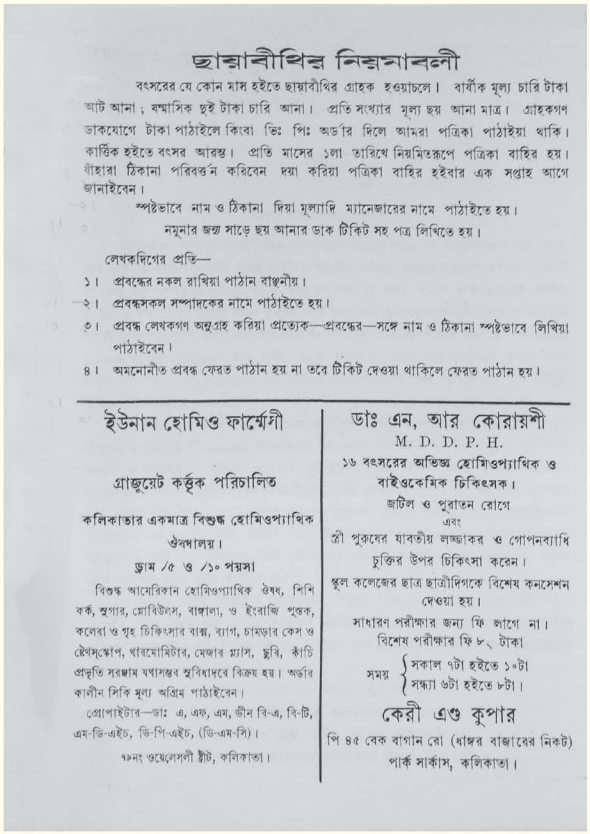

ছায়াবীথির নিয়মাবলী

বৎসরের যে কোন মাস হইতে ছায়াবীথির গ্রাহক হওয়াচলে। বার্ষীক মূল্য চারি টাকা আট আনা ; ষন্মাসিক দুই টাকা চারি আনা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় আনা মাত্র। গ্রাহকগণ ডাকযোগে টাকা পাঠাইলে কিংবা ভিঃ পিঃ অর্ডার দিলে আমরা পত্রিকা পাঠাইয়া থাকি। কার্ত্তিক হইতে বৎসর আরম্ভ। প্রতি মাসের ১লা তারিখে নিয়মিতরূপে পত্রিকা বাহির হয়। যাঁহারা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিবেন দয়া করিয়া পত্রিকা বাহির হইবার এক সপ্তাহ আগে জানাইবেন।

স্পষ্টভাবে নাম ও ঠিকানা দিয়া মূল্যাদি ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়।

নমুনার জন্য সাড়ে ছয় আনার ডাক টিকিট সহ পত্র লিখিতে হয়।

লেখকদিগের প্রতি—

১। প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠান বাঞ্ছনীয়।

২। প্রবন্ধসকল সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যেক—প্রবন্ধের—সঙ্গে নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৪। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না তবে টিকিট দেওয়া থাকিলে ফেরত পাঠান হয়।

ইউনান হোমিও ফার্ম্মেসী

গ্রাজুয়েট কর্ত্তৃক পরিচালিত

কলিকাতার একমাত্র বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

ড্রাম /৫ ও /১০ পয়সা

বিশুদ্ধ আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, শিশি কর্ক, সুগার, গ্লোবিউলস, বাঙ্গালা, ও ইংরাজি পুস্তক, কলেরা ও গৃহ চিকিৎসার বাক্স, ব্যাগ, চামড়ার কেস ও ষ্টেথস্কোপ, থার্মোমিটার, মেজার গ্লাস, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি সরঞ্জাম যথাসম্ভব সুবিধাদরে বিক্রয় হয়। অর্ডার কালীন সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

প্রোপাইটার—ডাঃ এ, এফ, এম, জীন বি-এ, বি-টি, এম-ডি-এইচ, ডি-পি-এইচ, (ডি-এম-সি)।

৭৯নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ এন, আর কোরায়শী

M. D. D. P. H.

১৬ বৎসরের অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক চিকিৎসক।

জটিল ও পুরাতন রোগে

এবং

স্ত্রী পুরুষের যাবতীয় লজ্জাকর ও গোপনব্যাধি চুক্তির উপর চিকিৎসা করেন।

স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদিগকে বিশেষ কনসেশন দেওয়া হয়।

সাধারণ পরীক্ষার জন্য ফি লাগে না।

বিশেষ পরীক্ষার ফি ৮৲ টাকা

সময় { সকাল ৭টা হইতে ১০টা / সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা।

কেরী এণ্ড কুপার

পি ৪৫ বেক বাগান রো (ধাঙ্গর বাজারের নিকট) পার্ক সার্কাস, কলিকাতা।

পাকিস্তানি লেখিকার নারীবাদী গল্প

না ক ফু ল

বীনা শাহ
অনুবাদ : ফজল হাসান

আমি আমার মায়ের অনুপস্থিতি খুব বেশি অনুভব করছি। আমি ভাবছি রাতে ঘুমাতে গেলে তিনি কী আমার কথা মনে করেন?

মায়ের কি মনে পড়ে তিনি কীভাবে আমার চুলে তেল মেখে দিতেন, যে তেলে মেশানো থাকত তিল এবং সরিষা দানা। সেই মিশ্রিত তেলে খুবই কটুগন্ধ ছিল এবং পিঁপড়ার পায়ের কাঁটার মতো আমার চুলকে দংশন করত? মা যখন আমার মাথার তালুতে তেল মেখে দিতেন, তখন আমি শিউরে উঠতাম এবং তাঁর নাছোড়বান্দা আঙুল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে মাথা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতাম।

'শান্ত হয় বসো, রূপা!, মা চিৎকারের সুরে বলতেন এবং চুলের ব্রাশের পেছন দিক দিয়ে আমার কপালে আঘাত করতেন। আমার চোখ থেকে ঝরে পড়া ব্যথা ও অপমানের অশ্রুতে আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম এবং তিনি আমার দিকে ফিরে তাকাতেন। সেই সময় আমার শিশুসুলভ রাগ-অভিমান অবিচলিত থাকত।

'মান্ধাতা আমলের মতো এমন করছ কেন!' আমি চিৎকার করে বলতাম। 'শত শত ব্যবস্থা রয়েছে, যা একই ধরনের কাজ করবে! অ্যামিনোস, বায়োসিউটিক্যালস—এমন সব জিনিস, যা আমার ডিএনএ পরিবর্তন করবে এবং তার ফলে আমার চুল কোঁকড়ানো হবে না। আপনি সবসময় কেন এই জঘন্য তেল দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন, যা চুলগুলো এলোমেলো করে এবং পচা ডিমের মতো গন্ধ ছড়ায়!'

'তোমার চুলে তেল মেখে দেওয়ার কারণে তুমি একদিন কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবে। অই সব রাসায়নিক পদার্থ তোমার চুলের বারোটা বাজিয়ে দিত। তুমি কী তোমার অহংকারের কারণে মরতে চাও? সৃষ্টিকর্তা তোমাকে কন্যাসন্তান দান করুন। তখন তুমিও আমার মতো তার চুলে তেল মেখে দিতে পারবে।'

আমার মা ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মহিলা। তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করতেন এবং আমাকে শিখিয়েছেন সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করতে, যদিও আমি আমার মাকে যেভাবে ভালোবাসি, সেই একইভাবে তাকে ভালোবাসতাম না। মায়ের চুল আমার চুলের মতো সুন্দর ছিল না। আমার চুল ছিল ঘন ও দীর্ঘ, যা আমার কোমরের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ত। অন্যদিকে আমার মায়ের চুল ছিল খাটো এবং পলকা। তাঁর মাথার চারপাশের চুল খসে পড়ত এবং তিনি প্রতিদিন সকালে সেগুলো বালিশে খুঁজে পেতেন।

'আসুন, মা। আপনার চুলে তেল মেখে দেই,' আমি তাকে বলতাম, যেসব দিনে আমরা শান্তিতে থাকতাম, যুদ্ধ নয়, যখন আমরা বন্ধু ছিলাম, যতটা চৌদ্দ বছর বয়সী এক কিশোরী এবং তার মা বন্ধু হতে পারে। 'আসুন, মা। এখানে বসুন। তেল হালকা গরম আছে, ঠিক যেমন আপনি পছন্দ করেন।'

'না, না, রূপা,' জবাবে মা বলতেন। 'আমার চুল খুবই পলকা। এখন আমার সময় নেই। আমার একশটা কাজ বাকি আছে।'

কিন্তু তবুও আমি জোর করতাম। যখন মায়ের মাথার ত্বকে আমার আঙুলগুলো এলোমেলোভাবে আলতো পরশ বুলিয়ে দিত, তখন তার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যেত এবং তিনি অপ্রত্যাশিত সুখ-আনন্দ উপভোগ করতেন।

'মা, আমি কী আপনার মতো নাকফুল পেতে পারি?' আমি খুব দ্রুত বললাম। আমার আশা ছিল যে, তার চুলে আমার আঙুল বুলিয়ে দেওয়ার সময় তাকে রাজি করানো যাবে। আমি সবসময়ই মায়ের নাকের পাশ থেকে ঝিকিমিকি করা চকচকে হীরার প্রশংসা করতাম। আমার কাছে নাকফুলটি বড় হওয়া এবং সুন্দর হওয়ার চূড়ান্ত লক্ষণ বলে মনে হতো।

'না, আর আমাকে কখনো জিজ্ঞেস করবে না,' আমার মা আমার সমস্ত আশাকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে বললেন। 'এখনো তোমার বয়স হয়নি।'

আমি হতাশায় আমার দু'ঠোঁট চেপে ধরি, কিন্তু তিনি আমার দিকে পিঠ করে থাকায় আমার হতাশা-কাতর উল্টানো ঠোঁট দেখতে পেলেন না। আমি অন্য আরেকটা কৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। 'মা, তেলের ব্যাপারে আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি বলেছিলেন যে এতে আমার চুল মজবুত হবে আর দেখতে সুন্দর হবে এবং তাই হয়েছে। আপনার জন্যও একই কাজ করবে।'

'আমাকে সুন্দরী দেখার সময় চলে গেছে। এবার তোমার পালা।'

তবে যেকোনোভাবে হোক না কেন, নাকফুলের ভালো বিকল্প ছিল মায়ের প্রশংসা। এছাড়া সেই লাগামহীন মুহূর্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সেসব শব্দ ছিল এক ধরনের প্রার্থনা, যা সৃষ্টিকর্তা সরাসরি শুনেছিলেন এবং তা কবুল করেছিলেন, কারণ মায়ের কথা উচ্চারিত হওয়ার পরের দিন আমি অপরূপা হয়ে উঠেছি। কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আসলেই ঘটনাটি ছিল সত্য। সেই রাতে আমি কুৎসিত, অস্থিসার আর কুঁচকানো শরীর নিয়ে বিছানায় গিয়েছি। সকালে আমি যখন জেগে উঠি এবং ভোরের সূর্যের নরম আলো আমার শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে, তখন নিজেকে আবিষ্কার করি যে সেই উষ্ণতা আমার ত্বককে কৃষ্ণবর্ণের নুড়িপাথর থেকে মসৃণ মাখনে পরিণত করেছে। আমার উরোজ ফুলে গিয়েছে, আমার নিতম্ব প্রশস্ত হয়ে গেছে, পা লম্বা হয়েছে এবং আমার কোমর পাতলা হয়ে গিয়েছে। আমার চুল কোঁকড়ানো মাকড়সার জাল থেকে পতঙ্গের রেশমী ডানায় পরিণত হয়েছে। আমার চোখ ফুলে গেছে এবং আমার মুখের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাওয়ার জন্য পেঁয়াজের মতো ঠোঁট ও বড় নাক সংকুচিত হয়েছে, যা এক রাতেই প্রলেপ মাখা উপল পাথরে পরিণত হয়।

আমি দেখতে ছিলাম সুন্দর এবং আমার মা আমাকে সুন্দরী করে তুলেছেন। তিনি তার কথাগুলো বিশেষভাবে বলেছিলেন এবং হয়তো রাতে ঘুমিয়ে থাকার সময় সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে খানিকটা দরকষাকষিও করেছিলেন। কিন্তু আমি জানি না তিনি কী করেছিলেন। তবে তিনি কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন এবং সেদিন সকালে যখন আমি নাশতা করার জন্য নিচে নেমে আসি, তখন আমার বাবা এবং ভাই, যার নাম জী, আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকান যেন আমি তাদের মেয়ের চেয়ারে বসে থাকা একজন অপরিচিত নারী। সেসময় আমার মা হেসেছেন এবং কিছুই বলেননি। কিন্তু তার চোখ আমার চোখের সঙ্গে মিলে যায় এবং অনায়াসে সবকিছু বলে দিয়েছে।

প্রথমে আমি আমার নিজের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছি এবং গোসলখানার দরজা বন্ধ করে আয়নার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি, আমার বাঁকানো মেরুদণ্ড দেখার জন্য কাঁধে ওপর থেকে চুল সরিয়েছি, আমার উরোজ যুগল উঁচু করে ধরেছি এবং আমার হাতের মুঠোয় উরোজের ওজন উপভোগ করেছি। আমি আমার উরু সরিয়ে পায়ের আঙুলের দিকে তাকিয়ে থেকেছি এবং আমার শরীরের ভাঁজগুলো যেভাবে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গেছে, তার প্রশংসা করেছি। সেসব ভাঁজ সমান এবং সুন্দর, তবে রহস্যময়, যা আয়নায় দেখা কঠিন।

আমার মা আমাকে তেল এবং চিরুনি নিয়ে তার সামনে বসতে বললেন। আমি সেগুলোর আনার জন্য দ্রুত ছুটে যাই এবং ফিরে এসে তাঁর পায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ি। আমার হাতে তেলের শিশি এবং আমি নিজের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেই সময় হাজার হাজার ছোট ছোট পা আমার মাথার ত্বকে সৈনিকদের কুচকাওয়াজের মতো হাঁটাহাঁটি করছে এবং সরিষা দানার উৎকট গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রকে উত্তেজিত করে তুলেছে। আমার চুল এমন চকচকে এবং ঘন রাখার জন্য আমি যেকোনো কিছু করতে পারি, যাতে আমি যখন চুলের গোছা ধরে রাখি এবং তখন যেন আমার হাতের মুঠো গোছা চুলের পুরোটা ধরতে না পারে।

'এখন আমি কী নাকফুল পেতে পারি?'

'রূপা, আমাকে বিরক্ত করা বন্ধ করো। তুমি যথেষ্ট সুন্দরী। তোমার নাকফুলের প্রয়োজন নেই।'

পুনরায় আমার মায়ের প্রশংসা ছিল মধুর মতো সুমিষ্ট। যদিও সেই ধরনের সৌন্দর্যের মূল্য আছে, কিন্তু তা আমার শান্তি হরণ করে। আর শান্তিহীন সৌন্দর্য হচ্ছে নির্যাতন, এমন এক অভিশাপ, যা পুরো পরিবারের ওপর নেমে আসে। আমি বলতে পারব না আমার পরিবারে কে বেশি অভিশপ্ত ছিল—আমি, নাকি আমার ভাই জী। বেচারা জী!

জী আমার থেকে দু'বছরের বড়, কিন্তু আমি আমার মাথা উঁচু করে তার দিকে তাকাতাম, যেন সে একটা বিশাল আকৃতির দৈত্য। শৈশবে আমরা খুব কাছাকাছি ছিলাম এবং আমি সব সময় তাকে অনুসরণ করতাম। সে আমাকে বই পড়ে শোনাত কিংবা আমার আঁকা এবং কবিতার প্রশংসা করত। আমার বয়সী কোনো বন্ধু ছিল না—সবচেয়ে কাছের মেয়েটি আমাদের বাড়ি থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে

থাকত—আর তাই আমার ভাই আমার সবচেয়ে কাছের এবং ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে। তখন আমার বয়স ছিল চার বছর এবং ভাইয়ের ছিল ছয় বছর। সেই সময় আমরা একসঙ্গে খেলতাম, বাবা কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতেন এবং মা বাড়ির দেখাশোনা করতেন এবং শিশুরা রাজকন্যাদের দানবের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বীর যোদ্ধাদের কল্পিত খেলায় মশগুল থাকত।

বাবা সবসময় কাজে থাকতেন এবং আমাদের দেখভাল করার জন্য মা খুব বেশি সময় পেতেন না। তিনি গৃহস্থালি এবং নারীদের সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং আমি আপন মনে ভাবতাম আমাদের, অর্থাৎ জী এবং আমার মধ্যে একটা না-বলা চুক্তি রয়েছে—যা কিছু হোক না কেন এবং যেকোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হই না কেন, আমরা দুজন একসঙ্গে থাকব। অতীতের দিকে তাকালে স্পষ্ট দেখতে পারি যে তখন আমি পরিস্থিতির যৎসামান্য বুঝতে পারতাম; আমার শিশুসুলভ চিন্তা ও চাহিদা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। একজন সাবালক পুরুষ হয়ে ওঠার জন্য কঠোর পরিশ্রমী একটি ছেলের যা কিছু করার প্রয়োজন বলে আমার ভাই মনে করেছিল, সে তাই করেছে এবং তার বন্ধুদের দেখিয়ে দিয়েছিল যে আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীর জন্য তার কোনো বাড়তি সময় নেই।

প্রথমে যখন জী আমার দিকে ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করে, তখন আমি আমার মধ্যে অদ্ভুত রকমের চমৎকার অনুভূতি অনুভব করতাম। গত পাঁচ বছরে আমি অভ্যস্ত হয়েছি তার বিষণ্ন নীরবতা, আমাদের বন্ধুত্ব থেকে তার দূরে সরে যাওয়া এবং আমি ঘরে প্রবেশ করলে আমাকে উপেক্ষা করার শীতল পরিবেশ। আমি যখনই কথা বলতাম, তখন সে আমাকে বিদ্রূপ করত, এমনকি চোখ ঘুরিয়ে উঁচু গলায় আমার কথাগুলো অনুকরণ করার জন্য মুখ ভেংচাত। আমি কাঁদলে কিংবা রেগে গেলে সে হাসত। আমি এখন তাকে নিষ্ঠুর মনে করি, অথচ একসময় সে ছিল অত্যন্ত দয়ালু। তার এই পরিবর্তনের কারণে আমি যেন তাকে ঘৃণা না করি, সেই জন্য অনেক কষ্ট করেছি। কিন্তু আমি তাকে যতই ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে শুরু করি, ততই সে আমাকে এমনভাবে উড়িয়ে দিচ্ছিল যেন আমি তার মাথার চারপাশে মশার গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই নই।

কিন্তু এখন আমার ভাইয়ের মধ্যে পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি ঘরে ঢুকলে সে আমাকে আগের মতোই উপেক্ষা করার ভান করে। কিন্তু যখন আমি তার দিকে তাকাতাম না—অথবা যখন সে ভাবত যে আমি নই—তখন সে আমার দিকে আড়চোখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিত। তার সেই তাকানো পরিণত হতো দীর্ঘ সময়ের, যা কেবল আমার মুখ নয়, আমার শরীরের প্রতিটি অংশ—আমার পা, আমার নিতম্ব, কখনো আমার উরোজ। আর তখনই সে দৃষ্টি সরিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং মুহূর্তেই তার গাল আরক্তিম হয়ে যেত।

জীর যদি আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হতো, সে যদি শৈশবের দিনগুলোর মতো আমার বন্ধু থাকত, তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। সে আমাকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে দেখত, সেই একই ক্ষুদ্র মানুষ যে তার প্রতিটি কথায় অটল থাকত এবং তার সঙ্গে খেলাধুলা করত, এমনকি একই সঙ্গে গল্প পড়ত। অথচ তার পরিবর্তে সে এমন আচরণ শুরু করেছে যে আমি যেন এমন এক অদ্ভুত প্রাণী, যার মুখোমুখি সে আগে কখনো হয়নি। তবে এ কথা সত্য যে তার সঙ্গে দেখা করার কিংবা গল্প করার জন্য তার সমবয়সী খুব বেশি মেয়ে ছিল না। আমাদের মহল্লায় যে কয়েকটি পরিবারে মেয়ে ছিল, তাদের মধ্যে আমরা ছিলাম অন্যতম। আর আমার ভাই শহরের একটি স্কুলে গিয়েছিল, যা শুধু ছেলেদের জন্য। তাই আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা তো দূরের কথা, সেখানে কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কোনো আশাই তার ছিল না।

আমার ভাইকে নিয়ে আমি উৎকণ্ঠিত হতে শুরু করি। কেন সে সবসময় আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকত? তার কালো, গভীর চোখ যা ঠিক আমার মতোই ছিল, যদিও চোখের পাতার লোম এবং ভ্রু ছিল আমাদের চোখের জন্য একটু বেশি ছোট। কেন সে আমার সঙ্গে কথা না বলে দূরে সরে গেল?

শুধু আমিই একা বিষয়টি খেয়াল করিনি। জীর সেই চাহনি মা-ও লক্ষ করেছেন। তার চাহনির মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা মাকে উদ্বিগ্ন করেছিল; তিনি আমাদের একে অপরের থেকে দূরে রাখার নানান ধরনের কৌশল খুঁজে পেয়েছিলেন—জীকে দোকান থেকে কিছু আনতে বলতেন, কিংবা আমাকে আমার ঘরে যেতে বলতেন এবং পড়াশোনা করতে আদেশ দিতেন। কিন্তু জীর চোখ সবসময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, বিশেষ করে যখন আমি ওভেন থেকে কিছু খাবার বের করার জন্য ঝুঁকতাম, অথবা আলমারি থেকে কোনো বাক্স নামানোর জন্য উঁচু হয়ে দাঁড়াতাম। আমি তার চাহনিতে অস্বস্তিকর কিছু খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু একই সময়ে আমি সবসময় একটু খুশি ছিলাম যে সে-ও খুঁজছে। কারণ তার অর্থ এই যে আমি একটি পাথর কিংবা কোনো জুতা অথবা ঘরের অন্য কোনো বস্তু নই। অর্থাৎ সে আমাকে এখনো ভালোবাসে।

গত কয়েক মাস ধরে বুঝতে পারছি যে জীর চোখ আমার প্রতি আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে। আমার মায়ের চোখও তাই হয়েছে। আমি যা কিছু করেছি বা করিনি, তার প্রতিটি অতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মা আমাকে আরো বকাঝকা করতে শুরু করেন। কোথাও ভুল হলে চিৎকার করে ওঠেন। যদি কোনো কিছু সঠিক হয়, তবুও তা মায়ের মনের মতো হতো না। তাই আমাকে মায়ের চিৎকার-চেঁচামেঁচি শুনতে হতো।

মা আমার পোশাকের সমালোচনা করতে শুরু করেন। আমাকে বলেন যে আমার পোশাক শরীরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে, কিংবা আমার জামার গলা খুবই নিচুতে, অথবা আমার জামা অত্যন্ত খাটো। পতিতা শব্দের অর্থ আমি জানতাম না, কিন্তু খুব শীঘ্রই জেনে যাই। 'এমন একজন মহিলা যে সবাইকে তার শরীর দেখাতে পছন্দ করে,' আমার মা চিৎকার করে বলতেন। তখন আমি পিছন ফিরে কম্পিত পা ফেলে আমার ঘরে ছুটে যেতাম। আমি আমার স্কার্ট আমার হাঁটুর ওপর টেনে দিতাম এবং আমার চোখ অশ্রুতে ভরে যেত। আর জী আমাদের দুজনকে দেখত, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরত এবং তার মুখমণ্ডলে রক্তিম আভা ফুটে উঠত।

একদিন সকালে জীর ঘুম ভাঙার আগেই আমি জেগে উঠে গোসল করি। সে আমাকে গোসলখানায় এক মুহূর্তের জন্য শান্তিতে থাকতে দিত না। গোসলখানার দরজায় জোরে আঘাত করত, চিৎকার করে আমাকে বেরিয়ে আসতে বলত, যাতে সে সেখানে ঢুকতে পারে। সেখানে সে গরম পানি মেশানো বাথটাবে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করত। গোসল সেরে সে শুকনো কাপড় পরে আয়নায় নিজের দিকে তাকাত এবং পরিপাটি করে চুল আঁচড়াত।

গোসলখানার ঝরনা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, যেখানে আমি স্বপ্ন দেখতে পারি, নিজেকে প্রতিফলিত করতে পারি, পরিকল্পনা করতে পারি এবং কোনো কিছু না ভেবে মাঝে মধ্যে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি। আমার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর, বয়সটা একবার ভেবে দেখুন তো—একটা কিশোরী। আমার ওপর এত বোঝা চাপানো আমার প্রাপ্য ছিল না: আমার বাড়ির পরিস্থিতি, অবশ্যই বলতে হয় আমার বাবার অনুপস্থিতির কথা, যা নিয়ে আমরা কখনো কথা বলিনি, তবে দ্রুতগতির কোনো জেট বিমানের চেয়েও জোরালো ছিল আমার মায়ের তীক্ষ্ণ চোখ, আমার ভাইয়ের অদ্ভুত দৃষ্টি।

সেদিন সকালে গোসলের সময় আমার মন চলে গিয়েছিল কল্পনার জগতে—একসময় আমি যখন কোনো পুরুষের স্ত্রী হব, তখন আমার জীবন কেমন হবে। আমার স্বামী কী সুদর্শন, ধনী, বুদ্ধিমান হবে? আমার ক্লাসের ছেলেদের প্রতি আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল না, কারণ আমরা বন্ধু ছিলাম না—পরিবেশ আমাদের বন্ধু হতে দেয়নি। যাহোক, আমি যখন ভবিষ্যৎ স্বামীর ছবি কল্পনা করতাম, তখন আমার মনে স্বামী সম্পর্কে বিষয়গুলো ছিল না: শক্তিশালী, রক্ষাকারী এবং দয়ালু, কমপক্ষে বিশ কিংবা পঁচিশ বছর বয়সী পুরুষ—যে রীতিমতো প্রাপ্তবয়স্ক, তাই না? আমার ক্লাসের ছেলেদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াত। এছাড়া যখন তারা গম্ভীর এবং পুরুষালি ভাব দেখাতে চাইত, তখন তাদের কণ্ঠস্বর চিৎকারের মতো শোনাত। তারা খোলা শার্ট পরে দৌড়াদৌড়ি করত। একটা ছেলে সাধারণত জিপার লাগাতে ভুলে যেত এবং ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। তার কালো প্যান্টের ফাঁক গলিয়ে দেখা যেত সাদা অন্তর্বাসের গায়ে আঁকা পতাকা। আমরা সবাই খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়তাম।

তখনই আমি খেয়াল করেছি, গোসলখানায় ঢোকার সময় দরজাটা যে বন্ধ করেছিলাম, সেটা সামান্য ফাঁকা। একটা ছায়া বারান্দা থেকে আসা আলোর পথ আটকে দিয়েছে। আমি হতবাক হয়ে হাঁপাতে থাকি, যখন বুঝতে পারলাম দরজার ওপারে কেউ আমাকে দেখছে। বুকের ভেতর খরগোশের মতো আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠে এবং আমি তোয়ালে বের করে শরীরে জড়াই। তারপর আমি পানি থেকে দ্রুত উঠি এবং আমার পা কাঁপতে থাকে। বাইরে কে আছে তা দেখার জন্য আমি এগিয়ে যাই, যদিও ছায়ার উৎস খুঁজে বের করতে ভয় পেয়েছি। মা কখন থেকে গোসলখানায় আমার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করেছেন? আজ নিশ্চয়ই তাঁর মেজাজ ভীষণ খারাপ—তাঁর খারাপ দিনগুলোকে আমি ভয় পাই, যার অর্থ আমার কাছে আরো বিরক্তিকর সময়। তিনি কী আমার ওপর রাগ করবেন—গোসলের সময় আরাম করার জন্য, পানি অপচয় করার জন্য, কিংবা সময়, অথবা ... নিজেকে স্পর্শ করার জন্য? গোসলের জন্য আমি সাধারণত পাঁচ মিনিট সময় নিই, কিন্তু আজ কেন তা নিইনি এবং দ্রুত বেরিয়ে এসেছি? কেন তিনি গোসলখানার ভেতরে ঢুকে চিৎকার শুরু করলেন না? তাঁর জন্য বিষয়টা চুপ করে থাকার মতো ছিল, কিংবা আমি তার কাছে গিয়ে আমার অন্যায় স্বীকার করব, সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করার মতো ছিল না।

কিন্তু আমি গোসলখানার দরজার কাছে পৌঁছে দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম অন্য পাশে যেই থাকুক না কেন, সে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমি করিডোরের একটি দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি দরজা বন্ধ করার শব্দ চিনতে পারি। কারণ গত পাঁচ বছর ধরে আমি আমার জীবনের প্রায় প্রতিদিনই শুনেছি, যা বিরক্তিতে আমার মুখের ওপর সজোরে বন্ধ হতো।

জীর দরজা।

'এ অবস্থায় তুই এখানে কী করছিস?' মায়ের কণ্ঠস্বর গাছের ডাল ভাঙার মতো শোনাল, তীক্ষ্ণ এবং আকস্মিক, যা কোনো ধরনের ধ্বংসের ইঙ্গিত বহন করে।

'মা, আমি—,' কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে আমি থামলাম। কীভাবে ঘটনাটি বলব, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। আমি করিডোরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার গা বেয়ে পানি ঝরে পড়ছিল পরিষ্কার মেঝেতে এবং আমার দীর্ঘ ভেজা চুল আমার পিঠ বেয়ে সাপের মতো জট পাকিয়ে ছিল। আমাকে নিশ্চয়ই করুণ দেখাচ্ছিল।

মা চোখ সরু করে মাথা কাত করেন। তার হাতে ছিল থালা-বাসন, নইলে তিনি আমার হাত ধরে গোসলখানায় নিয়ে যেতেন।

'কেউ একজন দরজার আড়ালে ছিল,' আমি ফিসফিস করে বললাম। আমি চাই না জী আমার কথা শুনুক। কিন্তু আমি জানি তখন সে তার নিজের ঘরের দরজার পেছনে ঘাপটি মেরে আছে এবং কথা শোনার জন্য কান পেতে রয়েছে।

'কী? আমাদের বাড়ির ভেতরে আর কে আছে?' মায়ের মুখ সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়। তিনি সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতেন যে আমাদের রক্ষা করার জন্য বাবা বাড়িতে না থাকলে আমরা ডাকাতির ঝুঁকিতে পড়ব।

'মা, শুনুন। না মা, অপরিচিত কেউ নয়। মা!'

মা তাড়াতাড়ি থালা-বাসন নামিয়ে রেখে দরজা-জানালা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখতে এবং জীকে ডাকতে যাচ্ছিলেন। আমি এক হাতে তোয়ালে ধরে অন্য হাত দিয়ে তার হাত চেপে ধরি। তিনি থমকে দাঁড়ান। আমি তাঁকে টেনে গোসলখানায় নিয়ে যাই এবং দরজা বন্ধ করি। তিনি আমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার মুখ অদ্ভুত এক অভিব্যক্তিতে জ্বলজ্বল করছে, ভুরু কুঁচকে গেছে, চোখ জোড়া আমার দিকে স্থির হয়ে আছে, ঠোঁট কামড়ে আছেন, যার জন্য তার মুখের চারপাশের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

'অপরিচিত কেউ নয়, মা। দরজার উল্টোদিকে জী ছিল। আমি যখন গোসল করছি, তখন সে আমাকে দেখছিল।' কথাটা বলতে আমার খুব খারাপ লাগছিল; আমি আমার প্রিয় বন্ধু ও ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি। কিন্তু মাকে কথাটা বলতেই হলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্তহীন সিনেমা দেখা, যা আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হয়, আমাদের ওপর কোনো ঘটনা ঘটে, যেমন খারাপ মানুষ যদি আমাদের অনুসরণ করে, বাজে মন্তব্য করে কিংবা শরীর স্পর্শ করে, এমনকি আমরা যদি অস্বস্তি বা অনিরাপদ বোধ করি। ঘটনাটি এক ধরনের অপরাধ এবং তাই বলতে বাধ্য হয়েছি।

আমার মা এক অদ্ভুত আওয়াজ করেন, যেন আমি তার পেটে লাথি মেরেছি। তিনি কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে স্থির রাখার জন্য টেবিলে হাত রাখেন।

'মা?' আমি নিজের দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়ে বললাম। তবে আমি আমার মায়ের জন্য ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি। 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

'না,' বলেই তিনি আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য কিংবা নিজে আশ্বস্ত হওয়ার জন্য আমার হাত থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নেন। আমাদের সংসারে এমন ঘটনা আগে কখনই ঘটেনি। আমাদের সংসার যে অদৃশ্য মায়াজালে জড়িয়ে ছিল, তা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। কিন্তু আমি অনুভব করতে পারছিলাম যে বিষয়টি আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

'আমি শুনতে চাই না।'

'কী?'

'আমি ঘটনা শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই না—এই, এই জঘন্য ঘটনা। আমি তোর কথা শুনতে চাই না। আর একটা কথাও বলবি না।'

'কিন্তু মা! আমি সত্য ঘটনাই বলছি।'

আমরা তর্কের সময় তখনো ফিসফিস করে কথা বলছিলাম, যা আমি এখন বুঝতে পারছি যে, মা জীকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন।

'অনেক হয়েছে, রূপা। এবার থামো। ...এর জন্য আমাকে নাশতা তৈরি করতে হবে।' তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে। এখনো কথাটা বলার সুযোগ আছে, আমি পাগলের মতো ভাবলাম। আরেকটি শিশুসুলভ ভুল। আমরা কখনই বিশ্বাস করতে চাই না যে আমাদের দেব-দেবীরা মানুষ, তাই না?

'প্লিজ, মা। আমার কথা শুনুন। আমি সত্যি কথা বলছি। জী কয়েক মাস ধরে আমার আশেপাশে অদ্ভুত আচরণ করছে। আমি জানি আপনি তা দেখেছেন। সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, যা আমার কাছে খারাপ লাগে। এখন সে আমাকে গোসলখানায় দেখে। প্লিজ মা, আপনাকে কিছু একটা করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আমাকে সাহায্য করতে হবে।'

মায়ের কাছ থেকে যে সান্ত্বনাসূচক ব্যবহার পাব বলে ভেবেছিলাম, এমনকি শাসন করার জন্য জীকে বকাঝকা করবেন, তার পরিবর্তে তিনি আমার ওপর খানিকটা রাগ ঝাড়েন এবং আমার প্রতি কঠোর হয়ে ওঠেন। তিনি ক্রমশ পাথরের মতো কঠিন হয়ে যান। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তাই দেখতে পেয়েছি। তার মুখ পাতলা এবং স্থির হয়ে আছে, তাঁর চোখ দুটি রাগান্বিত থেকে ঠাণ্ডা হয়েছে, তারপর কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেছে, যেন তিনি সোজাসুজি আমার অভ্যন্তরের সবকিছু দেখছেন।

'আমি আর একটিও কথা শুনতে চাই না,' আমার মা বেশ শান্ত গলায় বললেন, যেন তিনি আমাকে সময় বলছেন কিংবা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে বাইরের আবহাওয়া মনোরম ছিল কিনা। তারপর তিনি ঘুরে এক পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমি দ্রুত পোশাক পরে নিই। আমার দৃষ্টি মেঝেতে আটকে রয়েছে, কেননা আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে পারছিলাম না।

আমি যখন নাশতা খাচ্ছিলাম—ভাগ্যক্রমে জী তার নিজের ঘরে বসে খাচ্ছিল, তাই আজ আমার বিব্রতকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে না—আমার মা সেই একই একঘেয়ে সুরে ঘোষণা করেন যে আমি স্কুলে যাচ্ছি না।

'কিন্তু আমি কী করব?' আমি চমকে উঠে জিজ্ঞেস করি।

'তুই আমাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করবি,' জবাবে মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।

আমি ভাবতে শুরু করি যে মা আমাকে আর স্কুলে যেতে দেবেন না। কিন্তু তৃতীয় দিন রাতে তিনি দরজা খুলে আমাকে আমার ঘর থেকে টেনে বের করে আনেন, শক্তভাবে, তবে শক্তি প্রয়োগ করে নয়।

'এখানে আয়, রূপা।' তিনি আমাকে বসার ঘরে নিয়ে যান, যা আমরা কখনই ব্যবহার করি না, শুধু তখনই যখন আমার বাবা গেদ্রোসিয়া থেকে বাড়িতে আসতেন এবং তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য অসংখ্য অতিথির আগমন ঘটত। ঘরটি ছিল স্যাঁতসেঁতে, গন্ধে ভরা

এবং সূর্যের আলোর মাঝে মন্থরগতিতে ধূলিকণা ওড়াউড়ি করছিল। বাড়ির মধ্যে বসার ঘরটি একমাত্র ঘর ছিল, যেখানে কোনো পর্দা ছিল না। আমার বাবা বড় সাদা দেওয়ালের মাঝখানে একটি বড় পর্দা রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা তাকে সম্মতি দেননি। 'এ ঘরটি যেন একমাত্র স্থান হয়, যেখানে আমরা সত্যিই একজন অন্যজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি,' মা অজুহাতের নরম গলায় বাবাকে বলেছিলেন। এবং সেদিন আমি মায়ের সাহসিকতায় অবাক হয়েছিলাম।

'এখানে বস,' মা সোফার দিকে ইশারা করে বললেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি খুব তাড়াতাড়ি বসি এবং সোফায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই বিকট শব্দ হয়। মা আমার দিকে ঝুঁকলেন এবং আমার মুখটা নিজের দুহাতে নিয়ে শক্ত করে ধরে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালেন।

'মা ...' আমার কণ্ঠস্বর কাগজের মতো ক্ষীণ শোনালো।

তিনি রাগান্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার এমন ভয়ংকর চাহনি আমি আগে কখনো দেখিনি। 'ও রূপা,' তিনি ফিসফিস করে বললেন।

তারপর তিনি গলার সুর পাল্টে বললেন, 'নড়বে না।'

কিছু বলার আগেই মা আমার নাকের ডান দিকে বুড়ো আঙুল দিয়ে জোরে চেপে ধরেন। তিনি অন্য হাত দিয়ে আমার নাকের চামড়ায় ধারালো কিছু দিয়ে ভীষণ জোরে চাপ দেন। আমি ব্যথায় কঁকিয়ে উঠি; আমার ডান চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করে। তার ভ্রু জোড়া ছিল নিচের দিকে টানা। যখন তিনি ধারালো বস্তুটি দিয়ে আমার নাকে ছিদ্র করেন, তখন দু'পাশের ভ্রুর মধ্যে দুটি গভীর রেখা ফুটে ওঠে। আমি নড়াচড়া করতে পারিনি; আমি আঘাত এবং ব্যথায় অবশ হয়ে পড়ি। আমি চিৎকার করতে পারিনি: কেউ একজন আমাকে বলেছিল যে কাজটি এক ধরনের আদান-প্রদান, যা সম্পূর্ণ নীরবে ঘটে।

তার কাজ শেষ হলে তিনি পুনরায় আমার মুখটা শক্ত করে দুহাতে চেপে ধরে নাকের ছিদ্র পরীক্ষা করেন। নাকের যে জায়গায় ছিদ্র করা হয়েছে, সেখানে আমি রক্তের স্রোত অনুভব করি। আমার চোখ থেকে ঝরে পড়া অশ্রুতে আমার গাল ভিজে যায়। অন্য চোখ ধুলাবালির মতো শুকনো।

'দেখ,' বলেই মা আমার দিকে আয়না ধরেন। 'এখন তোর অনেক বয়স হয়েছে।'

মায়ের নাকফুল এখন আমার নাকে। নাকফুল আমার নাকের ফুটোর ঠিক ওপরের চামড়ার ভাঁজে ঝিকিমিকি করছে। ছিদ্র করার জায়গাটি লাল হয়ে গেছে এবং ফুলে উঠতে শুরু করেছে।

মা আমার হাতে একটা ছোট বরফের টুকরো দিয়ে আমার নাকে ঘষতে বললেন। তৎক্ষণাৎ সুচালো ব্যথাটা কমে যায়। ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং আমার মস্তিষ্কে ব্যথার অনুভূতি যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। একটা মিষ্টি গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। যখনই আমি নিজের ক্ষত এবং রক্ত দেখতাম, তখনই এমন গন্ধ পেতাম।

এরকমই, মা? আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। এমন করেই কি একটি মেয়ে অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুরতা এবং যন্ত্রণা নিয়ে নারী হয়ে ওঠে? রক্ত দিয়ে? কিন্তু মা আমাকে আমাদের বাড়ির সদর দরজার দিকে টেনে নিয়ে যান। তখন তার আঙুলগুলো নিষ্ঠুরভাবে আমার হাতের ওপরের নরম মাংসে ডেবে যাচ্ছিল।

'মা, দাঁড়ান। দাঁড়ান মা, দয়া করে থামুন। এখানে কী হচ্ছে, আমাকে বলুন!' আমি রীতিমতো হাঁপাচ্ছিলাম, তার ইস্পাত দৃঢ় সংকল্প আমার স্নায়ুর মধ্যে আঘাত হানতে শুরু করে। কিন্তু তিনি আমাকে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। দৈহিক গড়ন ছোট হওয়া সত্ত্বেও তার ছিল অসম্ভব শক্তি। তিনি তাড়াতাড়ি দরজা খুললেন, তারপর নিজের মাথা বাইরে বের করেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে ডানে-বাঁয়ে তাকান, যেমন করে কোনো হিংস্র জন্তু শিকারি প্রাণীদের পরীক্ষা করে।

আমার বুকের ধুকপুকানি দ্রুত হতে শুরু করে। 'মা, প্লিজ। প্লিজ ... জী সম্পর্কে আমি যা কিছু বলেছি, তার জন্য আমি দুঃখিত, সত্যি আমি ভীষণ দুঃখিত ... আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। সে ওখানে ছিল না, মা ... মা, প্লিজ!' ধাক্কা দিয়ে আমাকে দরজার বাইরে ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার গলার স্বর মৃগীরোগীর মতো তীব্র হতে শুরু করে। আমি আমার হাতের নখ দিয়ে মাকে ধরতে চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁকে প্রতিরোধ করার মতো আমার শক্তি ছিল না। আমরা দুজনে বাইরে না আসা পর্যন্ত তিনি আমাকে অর্ধেক টানেন এবং বাকি অর্ধেক ধাক্কা দেন।

'গাড়িতে উঠ, রূপা।'

'দয়া করে আমাকে দূরে পাঠাবেন না, মা। আমি দুঃখিত, ভীষণ দুঃখিত, আমি অনুতপ্ত, সত্যি অনুতপ্ত!' আমি কাঁদতে শুরু করি। আমার মনে হয়েছে ছোট্ট এক মেয়ে যেন আমার কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে, আমার কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

'তোকে যেতেই হবে, রূপা। তোর ভালোর জন্যই যেতে হবে। তোকে নিরাপদে রাখার জন্য ধুলাবালি ও মাটির গোরে কবর দেওয়ার চেয়ে আমার জন্য এ কাজ করা অনেক ভালো।'

আমি ভাবতে চাই যে আমার মা সত্যিই বিশ্বাস করেছেন। আমি সত্যিই ভাবতে চাই যে তিনি ভেবেছেন তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন, কারণ তিনি আমাকে রাস্তায় ফেলে রেখে ঘরে ফিরে যান এবং দরজা বন্ধ করে দেন। আমাদের বাড়িতে জী আমার কী ক্ষতি করতে পারে, সেই সম্ভাবনা থেকে আমাকে নিরাপদ রাখার একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি তাই ভেবেছেন এবং তিনি ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু বলেননি।

আমি রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। সেই মুহূর্তে আমাকে সাহায্য করার জন্য কিংবা আমার মাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর জন্য অথবা আমাকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কেউ ছিল না। তখন তার নাকফুল আমার মুখের ওপর তৃতীয় চোখের মতো জ্বলজ্বল করছিল, আমার হৃদয়জুড়ে আমার মায়ের চিহ্ন রয়েছে, যা আমাকে তার সন্তান এবং আমার বাকি জীবনের জন্য তার কাছে বহিষ্কৃত হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

[**গল্পসূত্র:** 'নাকফুল' গল্পটি বীনা শাহের ইংরেজিতে 'দ্য নৌজপিন' গল্পের অনুবাদ, যা ২০১৭ সালে 'দ্য আলেফ রিভিউ' ম্যাগাজিনে (প্রথম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে]

বীনা শাহ: সমসাময়িক পাকিস্তানি নারী লেখক বীনা শাহ একজন ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার ছাড়াও নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত কলামের জন্য পাঠক মহলে অত্যন্ত পরিচিত। তার হাস্যরসাত্মক লেখা, রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক এবং সামাজিক সমস্যার স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সমালোচকদের প্রশংসা এবং বিশ্বজুড়ে পাকিস্তানিদের মধ্যে একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি ১৯৭২ সালে করাচির এক সিন্ধি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং করাচি ও যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার শার্লটসভিলে বেড়ে ওঠেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজ থেকে মনোবিজ্ঞানে বিএ এবং হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এডুকেশন থেকে এডুকেশনাল টেকনোলজিতে এমএড ডিগ্রি অর্জন করেন।

বীনা শাহ পাঁচটি উপন্যাস ও দুটি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেন। তার প্রথম গ্রন্থ অ্যানিমেল মেডিসিন (গল্প সংকলন) ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রথম উপন্যাস হোয়্যার দে ড্রিম ইন ব্লু প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। দ্বিতীয় উপন্যাস দ্য ৭৮৬ সাইবারক্যাফে প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। তার দ্বিতীয় গল্প সংকলন ব্লেসিংস প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে এবং তৃতীয় উপন্যাস স্লাম চাইল্ড প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। উল্লেখ্য, উপন্যাসটি ইতালীয় ও স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার চতুর্থ উপন্যাস আ সিজন ফর মার্ট্যারস ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়, যা সমালোচকদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ উপন্যাসও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার পঞ্চম উপন্যাস বিফোর শি স্লিপস, যা নারীবাদী ডিস্টোপিয়ান উপন্যাস, ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে, যেমন নিউইয়র্ক টাইমস, আল জাজিরা, ওয়ার্ল্ড পোস্ট, ইনডিপেনডেন্ট, গার্ডিয়ান, গ্রান্টা ও হাফিংটন পোস্ট, নিয়মিত তার প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং কলাম প্রকাশিত হয়। মূলত সব লেখায় তিনি পাকিস্তানের সমাজ ও সংস্কৃতি, নারী অধিকার, নারী শিক্ষা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। তাকে ২০২০ সালে ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় 'অর্দ্রে ডেস আর্টস এট ডেস লেট্রেসে শেভালিয়া'র পদমর্যাদায় ভূষিত করেন। বর্তমানে তিনি করাচিতে বসবাস করছেন।

বি ভ্র ম

মঞ্জু সরকার

ডাক্তার যে আমার দুরারোগ্য পার্কিনসন রোগে হ্যালুসিনেশন অর্থাৎ বাস্তবে যা নেই তেমন কিছু চাক্ষুষ করার লক্ষণ খুঁজছিল, ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। অতীতে সংঘটিত ঘটনাগুলো স্মৃতিতে যখন তখন জীবন্ত হয়ে ওঠে। চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট দেখতেও পাই। সেগুলো বর্তমানের বাস্তব নয় বটে, কিন্তু মিথ্যেও তো নয়। তাছাড়া কল্পনায় কত কিছু ঘটে! নিজেও ঘটাই। যেমন বান্ধবীবিহীন যৌবনে অতি সুন্দরী এক নায়িকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। এমনই গভীর হয়েছিল যে সেই নায়িকা আমার বিছানায় বেআব্রু হতেও দ্বিধা করেনি। কল্পিত গোপন সম্পর্ক বাস্তব ঘটনার মতো শরীরে সুড়সুড়ি জাগায়নি শুধু, সুখানুভূতিও হয়েছিল। সেই নায়িকার (নাম বললে সবাই চিনবে, সেজন্য নামটা বললাম না) সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেটাকে কি হ্যালুসিনেশন বলা যাবে? না, ডাক্তার আসলে স্মৃতি-কল্পনা মিন করেনি। কারণ আমার মস্তিষ্কের এক দিকের স্নায়ুকোষ যা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলো ধ্বংস হয়েছে এবং আরো হবে। ফলে ব্রেনের নির্দেশনা ছাড়াই হাত-আঙুল অনবরত কাঁপছে। থামতে বললেও থামে না। রোগটা বাড়লে কম্পন ছাড়াও শরীর রিজিড বা অসাড় হবে অনেক সময়, হ্যালুসিনেশনও হতে পারে। কিন্তু আমার মেমোরি লস হয়নি। চিন্তাভাবনা ও কল্পনাশক্তিও ঠিক আছে। অতএব দুরারোগ্য পার্কিনসন নিয়েও নিজের সুস্থ স্মৃতি-কল্পনার ওপর নির্ভর করে ভালো থাকার চেষ্টা করছি। নিয়মিত ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও থরহরি কম্পরোগ নিয়েই যখন মরতে হবে, সুস্থ স্মৃতিকোষের ওপর নির্ভর করে একটা স্মৃতিকথাও লিখতে শুরু করেছি। কম্পমান ডান হাতে কিংবা নিষ্কম্প বাম হাতে লিখি যখন, লেখাও বেঁকে যায়। তবু লিখছি, ভাবছি—লেখাটার নাম দেব কম্পরোগীর স্মৃতিকথা। আজও সেই স্মৃতিকথা লেখার জন্য শোয়ার ঘরের শেল্ফ থেকে যখন ডায়েরিটা আনতে যাই, তখন ঘরে যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে দেখি, তাকে হ্যালুসিনেশন নয়, জীবনের রূঢ় বাস্তব সত্য বললেও কম বলা হয়। এ ঘটনা বলার আগে আমার অবস্থান ও সময়ের সঠিক বয়ান দরকার।

বদ্ধ বাসায় আজ আমি একদম একা। মিরপুর এলাকায় সাড়ে নয়শ বর্গফুটের ভাড়া বাসার স্থায়ী বাসিন্দা তিনজন। স্ত্রী মারিয়া, কন্যা সুমি ও অসুস্থ আমি। সুমির বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে। ছেলেপক্ষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হবে আজ। পিতা যেহেতু অসুস্থ মানুষ, আমার পক্ষ থেকে অগ্রজ ও অনুজ দুই ভাই-ই থাকবে। মারিয়া মেয়েকে সাজিয়ে এবং নিজেও বেশ সুজেগুজে বড় ভাইয়ের বাসায় গেছে। ছোট মহিন সেখানে আসবে রাজশাহী থেকে। তারপর সবাই মিলে যাবে চাইনিজ হোটেলে। সেখানেই ছেলেপক্ষ-মেয়েপক্ষের প্রাথমিক পরিচয় ও দেখাদেখির পর্ব (ছেলে-মেয়ের দেখাদেখি, চেনাজানা ও প্রেমপর্ব অবশ্য আগেই শেষ হয়েছে)। তারপর ডিনার সেরে ফিরতে রাত হবে। এ কারণে তালাবদ্ধ বাসায় আমাকে একাকী রেখে বেরিয়ে গেছে মা ও মেয়ে।

অতি প্রয়োজনেও একাকী বাইরে বের হতে পারি না। বাসায় এঘর-ওঘর যাতায়াতও কষ্টকর। এজন্য বসার ঘরেও আমার বিছানা পেতে দেয়া আছে। বিছানায় বা সোফায় শুয়েবসে টিভি দেখি, ইন্টারনেটযুক্ত স্মার্টফোন ও ল্যাপটপে দুনিয়া ভ্রমণ করি। কখনো-বা ইউটিউবে বিনোদনমূলক ভিডিও দেখে সময় কাটাই। বিছানায় শুয়ে-বসে, এমনকি বাথরুমের কমোডে বসলেও শরীর যদি হঠাৎ রিজিড মানে অসাড় হয়ে যায়, দড়ি ধরে হ্যাঁচকা টানলে নিজেকে সচল করতে পারি। এ কারণে মারিয়া আমার বিছানায় ও কমোডের ওপরেও একটা রশি বেঁধে দিয়েছে। আজ বেশি সময় একা থাকতে হবে বলে হাতের নাগালে খাবার, ওষুধের ঝুড়ি ও ফ্ল্যাস্কে গরম চাও রেখেছে। তার ওপর কোনো সমস্যা বোধ করলে স্ত্রী-কন্যা কিংবা ভাই-ভাতিজার ফোনে কল দিলেই ওরা ছুটে আসবে। কাজেই বদ্ধ বাসায় একাকিত্বে আমার কোনো সমস্যা নেই। বরং এনজয় করি আজকাল।

রিমোর্টে দেশী-বিদেশী নানা চ্যানেল ঘুরে টিভি দেখি বেশির ভাগ সময়। তবে টিভিতে যা দেখি ও শুনি, তাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগায়। এগুলো সত্য নাকি বিভ্রান্ত করার জন্য সত্যের মতো মিথ্যে ঘটনাপ্রবাহ? উদাহরণ দিই একটা। একদিন খবরে শুনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হম্বিতম্বি করছে। সে নাকি এবার গোটা দুনিয়াই কন্ট্রোল করবে। এ কি বিশ্বাসযোগ্য সত্য হতে পারে? নিজের সামান্য শরীর ও সংসারটুকু কন্ট্রোল করতে পারি না আমি, আর যত ক্ষমতাধরই হোক, রক্তমাংসের একজন মানুষ তো। সে নাকি একাই বিশ্বের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করবে! স্রষ্টার ওপর সামান্য বিশ্বাস থাকলে এমন অসত্য আস্ফালন করে কেউ? টিভি বোরিং লাগলে ইন্টারনেটে ইউটিউব দেখি। হাবিজাবি দেখতে দেখতে একসময় স্ক্রিনে পর্নো ছবিতে নিজ জীবনে একান্ত গোপনে সংঘটিত সত্যকে দেখার মতো বিভ্রান্ত হতাম। শরীরে শিহরণ তথা আনন্দানুভূতি হতো। এখন হয় না, ওসব মিথ্যের বেসাতি দেখিও না আর। উলঙ্গ নারী-পুরুষকেও জন্তু-জানোয়ার বলে বিভ্রম ঘটে।

টিভি বা ফোনের স্ক্রিনে তাকানো বোরিং লাগলে অনেক সময় নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যেও সপ্রাণ অনেক কিছু দেখে চমকে উঠি। যেমন দেয়ালে টাঙানো কালো টিভিটা দেখি একদিন ব্ল্যাকবোর্ড হয়ে গেছে। চক দিয়ে অংক লিখছে একজন। মুখ ফেরাতেই দেখি প্রাইমারি স্কুলের হেড স্যার। অংক শেখাচ্ছে। শৈশবে এ ঘটনা ঘটেছিল বলেই না এ রকম দেখেছি। দড়িকেও সাপ ভেবে ভয় পায় মানুষ। জীবনে সত্যি সাপ দেখেছে বলেই তো এ রকম হয়। শুধু পিডি রোগী নয়, সবারই তো এ রকম দেখার ভুল হতে পারে। শুধু চোখের দেখায় নয়, কানে শুনতেও অনেক সময় ভুল হয় আমার। আজও মারিয়া মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ৩০-৪০ মিনিট পরে বাসার মেইন গেটে কলিং বেল বাজার আওয়াজ পেয়েছি। বাইরে থেকে কেউ এলে বদ্ধ দরজা খুলে দিতে পারব না বটে, কিন্তু দরজার আতশকাচের ফুটো দিয়ে বাইরের আগন্তুককে দেখতে পাব এবং দরকারি কথাও বলতে পারব। তাছড়া কলিং বেল শুনে মহিনের কথা মনে হয়েছিল। বড় ভাইয়ের বাসায় যাওয়ার আগে সে কি তবে এখানেই এল? শরীর রিজিড হয়ে যায়নি বলে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফুটোয় চোখ রেখে দেখি। কেউ নেই (ফুটো দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির কতো গোপন নিষিদ্ধ সত্য জিনিস দেখেছি!), বাইরে সব ফাঁকা।

যা হোক, এসব ছোটখাটো দেখা কি শোনার সত্যকে ডাক্তার যদি হ্যালুসিনেশন বুঝিয়ে থাকে, সেগুলো তো সবার জীবনেই কমবেশি থাকতে পারে। কাজেই এসব বিভ্রমকে পাত্তা না দিয়ে আমি বরং অবসরে, নিষ্কম্প জীবনের শতভাগ সত্য ঘটানার স্মৃতিচারণ করেই আনন্দ পাই। আজও স্মৃতিকথা লেখার জন্য শোয়ার ঘরে যাই ডায়েরিটা আনতে। স্ত্রী-কন্যা যাতে না দেখে, সে কারণেই মাস্টার বেডরুমের বুকশেল্ফে লুকিয়ে রাখি ডায়েরিটা (কারণ সত্য বলার খাতিরে নিজের জীবনের গোপন নিষিদ্ধ সত্যের পাশাপাশি স্ত্রী-কন্যারও কিছুটা বদনামি আছে ডায়েরিতে)।

মাস্টার বেড মানে মারিয়া ও আমার শোয়ার ঘর। রাতে সে ঘরেই বিছানায় তার পাশে শুই। মারিয়া দুপুরে বিশ্রাম নেয়ার জন্য বেডরুমের বিছানায় ঘুমালে আমি বাইরের বিছানাতেই থাকি। ফলে সে বাইরে গেলে বেডরুমের দরজা চাপানো থাকে। আজও ছিল। বেডরুমে গিয়ে দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে যায়, আর ঘরের বিছানায় যা দেখি—তেমন দৃশ্য এ জীবনে কখনই ঘুমিয়ে বা জেগে স্বপ্নে দেখিনি, কল্পনাও করিনি।

দরজার মতো জানালাও বন্ধ থাকায় দিবালোকেও ঘরটা ছায়াচ্ছন্ন। ডায়েরি খুঁজতে সুইস টিপতেই আলো লাফানোর মতোই সহসা চোখে যে দৃশ্যটি লাফ দেয়, তা জীবন্ত ভূত দেখার চেয়েও ভয়ংকর। বিছনায় নগ্ন দুই নারী-পুরুষ যৌনক্রিয়ার চরম মুহূর্তে বেজায় কাঁপছে। বিছানায় শায়িত নারীর দুদিকে ছড়ানো দুই পা, তার মাঝখানে যে পুরুষ, তার অস্থির নগ্ন নিতম্ব দেখে চিনতে পারিনি প্রথমে। কারণ বয়স্ক পুরুষদের, এমনকি নিজেরটাও আগে দেখিনি। কিন্তু লাইট জ্বলতেই পশ্চাদ্দেশের কাঁপুনি থামিয়ে স্থির সে, মুখ ফেরায় আমার দিকে। চোখাচোখি হতে মুহূর্তেই চিনতে পারি—কনিষ্ঠ সৎভাই মহিন! তার নিচের নগ্ন নারী যে মারিয়া, তার উলঙ্গ পায়ের রঙ-গড়ন দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। সেও দ্রুত শোয়া অবস্থান থেকেই মুখ ফেরালে নিশ্চিত হই, শতভাগ মারিয়াই। খাটের নিচে তার জামাকাপড়, যা পরে বাইরে গিয়েছিল সে।

আমি দ্রুত লাইট নিভিয়ে দিই। ডায়েরি নেয়ার কথাও ভুলে গেছি। দরজাটা যেমন চাপা ছিল তেমনি চেপে দিয়ে আবার ড্রয়িংরুমের বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ি। জেগে জেগে এত বড় লজ্জা-বিস্ময়-উত্তেজনা হজম করার শক্তি নেই। মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজে ঘুমানোর ভান করে মৃত মানুষের মতো পড়ে থাকি। হৃৎপিণ্ড এত জোরে আগে লাফায়নি কখনো। মস্তিষ্কে চিন্তাশক্তিও বেশ সক্রিয় হয়। এটা যে হ্যালুসিনেশন, এমন সন্দেহ একবারও জাগে না। নিজের চোখে দেখা এ দৃশ্য যদি মিথ্যে হয়, তবে এতকাল ধরে পৃথিবীতে স্বচক্ষে যা যা দেখে এসেছি, সবই তো মিথ্যে। তার পরও নিজের দেখাটাকে সত্য প্রমাণ করতে মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। উত্তরও খুঁজি।

মহিনের অবশ্য আজকে আসার কথা। দেশের এক বিখ্যাত ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে রাজশাহীতে আছে এখন। মহিনের স্ত্রী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তাকেও বদলি করে রাজশাহীতে নিয়ে গেছে। ফুটফুটে ছেলেসন্তানও আছে একটি। তার বাসায় নয়ামা অর্থাৎ মহিনের গর্ভধারিণী মা বেড়াতে গেছে। কিছু আগে নয়ামাকেও সঙ্গে নিয়ে আসার কথা বলার জন্য ফোন করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সে বাসায় এল কখন? যখন কলিং বেলের আওয়াজ শুনেছি, ওই সময়ে, নাকি তার আগে বা পরে? সুমিকে একাই তার বান্ধবী বা বড় চাচুর বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে মহিনকে নিয়ে মারিয়া চুপিচুপি ফিরে এসেছে? আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে এবং ভুলেও শোয়ার ঘরে ঢুকব না ভেবেই দরজাটা বন্ধ না করেই অপকর্ম শুরু করেছে?

মহিনের সঙ্গে তার ভাবির এমন অবৈধ সম্পর্কবিষয়ক সন্দেহ আগে হয়েছিল কি, ১০ বছর আগে যখন বেশ কয়েক মাস আমার বাসায় ছিল সে? আমি ছাত্রজীবনের শেষদিকে ঢাকায় বড় ভাইয়ের পরিবারের বিশ্বস্ত সদস্য হয়ে উঠেছিলাম। ভাবির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভাই কি সাংবাদিকতার কাজে মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে গেলে আমাকেই তার সংসারের

পহারাদারের ভূমিকা নিতে হয়েছিল। কই, আমার তো ভাবির সঙ্গে এ রকম সম্পর্কে জড়ানোর কথা মনে হয়নি কখনো। বাসায় অনেক সময় একা থেকেছি, তখন একবার শুধু মনে হয়েছিল, আহা, একটি প্রেমিকা বা বান্ধবী যদি থাকত আমার। তাকে নিয়ে ফাঁকা বাসায় রাত কাটালেও হয়তো ভাবি কিছু মনে করত না। কিন্তু আমার সে রকম কেউ ছিল না। কল্পিত হবু স্ত্রী (মারিয়া নয় অবশ্যই) এবং ভালো লাগা সেই সিনেমার নায়িকা ছাড়া সঙ্গ দেয়ারও কেউ ছিল না।

মহিন বছর দশেক আগে চাকরি খোঁজার ও ওষুধ কোম্পানির চাকরির ট্রেনিং নেয়ার সময় ঢাকায় আমার বাসাতেই ছিল মাস কয়েক। তখনো সে বিয়ে করেনি। আমারও পার্কিনসন ধরা পড়েনি। ব্যাংকের চাকরি, সকাল থেকে সন্ধ্যার পরও অফিসে থাকতে হতো। এ সময়ে মেজো ভাবির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে কোনো সন্দেহ জাগেনি। চাকরিটার জন্য ওর কোম্পানিতে সিকিউরিটি মানি কিংবা ঘুস দেয়ার প্রয়োজনে ১ লাখ টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। মারিয়ার সুপারিশে আমি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ওকে টাকাটা দিয়েছিলাম। চাকরি হওয়ার পর অবশ্য কিস্তিতে সে টাকা শোধ করেছে। আমার পার্কিনসন রোগের যখন প্রাথমিক অবস্থা, ভালো ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমাকে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে গেছে। ডেপোমিন ওষুধ দেশে পাওয়া যায় না বলে ইন্ডিয়া থেকে এনে দিয়েছে। ভাবির হুকুমে বাজার করা এবং সুমিকে স্কুলে নেয়া-আনার কাজও করেছে কয়েক দিন। দেবর-ভাবির এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটার গভীরতা মাপার কিংবা গোপন স্বরূপ দেখার কৌতূহল জেগেছিল বলেই সম্ভবত একদিন মারিয়াকে বলেছিলাম, 'গ্রামের বাড়িতে আমার সহোদর ছোট দেবরটাকে দুচোখে দেখতে পাও না! কিন্তু সৎ দেবরের সঙ্গে মাখামাখি সম্পর্ক দেখে লোকে অবাক হবে।'

মহিন যে আমাদের সৎভাই, এ কথা অবশ্য আমরা কাউকে বলি না। তাছাড়া সহোদর ছোট ভাইয়ের চেয়ে মহিনই আমার পরিবারের জন্য অনেক বেশি উপকারী। দৃষ্টান্ত বহু। মারিয়ার এসব যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। সুমির ছেলে দেখা অনুষ্ঠানে এ কারণে গ্রামের সহোদর ছোট ভাই বাবলুর বদলে মহিনকেই ডাকা হয়েছে। পারিবারিকভাবে যাকে এত গুরুত্ব ও বিশ্বাস করে আসছি, বিশ্বাসঘাতক হয়ে এমন অনৈতিক সম্পর্কে জড়ানো কি তাদের উচিত কাজ হয়েছে? মহিনের বউটি মারিয়ার চেয়েও কম সুন্দর নয়। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে সংসারে অর্থেরও জোগান দেয়। একটা সুন্দর পুত্রসন্তানও দিয়েছে। তার পরও মেজো ভাবির সঙ্গে তার এমন সম্পর্ক শুধু অসুস্থ মেজো ভাই নয়, সমাজের সুস্থ কোনো মানুষই কি ভালোভাবে নিতে পারবে?

চোর ধরা পড়লে তো পালানোর পথ খোঁজে। কিন্তু আজ হাতেনাতে ধরা পড়ার পর ওদের আর পালানোর পথ নেই। মুখোমুখি হতেই হবে আমার। কী বলব তখন, দুজনেই পায়ে পড়ে ক্ষমা চায় যদি? পা দুটি যেহেতু এখনো নিষ্কম্প, বা পায়ে ফুটবলে কিক দেয়ার মতো মহিনের উদম নিতম্বে আর ডান পায়ে মারিয়ার মুখে কামানের গোলার মতো কিক দেব? অবশ্যই দেয়া উচিত। কার নাক-মুখ কতটা ফাটল, সেটা ভাবার বিষয় নয়। পেসাবও চেপে রেখেছি অনেকক্ষণ ধরে। ওরা আমার বিছানায় এলে দুজনের মুখমণ্ডলও কি মুতে ভাসিয়ে দেব? শরীরের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা যার হাতে নেই, তার জন্য এমন কাজ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার আগে এই মহা পাপ ঢাকতে যদি দুজন বুদ্ধি করে গলা টিপে ধরে আমার? যেহেতু আমার পেনশন-গ্র্যাচুইটির উত্তরাধিকারী মারিয়া, অসুস্থ স্বামী মরে গেলে তার আপদ যাবে, স্বাধীনতা ও সুখভোগ বাড়বে। তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়েটা দিতে চায় এজন্য। পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পুরোটা মা-মেয়ের নামে লিখে দিতে হবে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহিনকে কাজে লাগাতেই হয়তো শরীর ঘুস দিচ্ছে তাকে।

মুখোমুখি হলে ওদের দুজনের যৌথ পশুশক্তির বিরুদ্ধে একা লড়তে পারব না বলেই হয়তো শরীরের অস্বাভাবিক কম্পন বাড়ছে। তার চেয়ে অগ্রজ বাচ্চু ভাইকে কল দিয়ে জরুরি তলব করি। আমি ডাকলেই সে ছুটে আসবে। তারপর দুই ভাই মিলে করণীয় ঠিক করব। কিন্তু তার আগেই যদি ওরা চুপিচুপি বন্ধ বাসা থেকে বেরিয়ে যায় এবং আগের মতোই বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখে? আমি আবার মেইন গেটের দিকে চোখ রাখার জন্য পাশ ফিরে চোখ খুলি। এখান থেকে দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায় না। রশি না ধরেই আবার বিছানায় উঠে বসি। মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষার পর দরজার দিকে এগোই। সুমির রুমে ঢুকি না সাধারণত। আজ সুমি নেই বলে তার রুমেও উঁকি দিই। ফাঁকা। ড্রেসিং টেবিলটা সুমির ঘরে। বাইরে বেরোনোর আগে সাজসজ্জায় যেসব জিনিস ব্যবহার করেছে, সেগুলো অগোছালো পড়ে আছে। তবে বিছানাটা নিভাঁজ। সুমির ঘরের দরজা চেপে মেইন দরজায় গিয়ে দেখি, আগের মতোই বন্ধ। ফুটোয় চোখ রেখেও বারান্দায় কাউকে দেখতে পাই না। তার মানে ওরা নগ্নতা ঢেকে রমণক্লান্তিতে বিছানাতেই বিশ্রাম নিচ্ছে এখনো?

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমি নিজেই চোরের মতো পা টিপে টিপে শোয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই। দরজাটা আগের মতো চাপানো। গলা পরিষ্কারক মৃদু আওয়াজ তুলে যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে ডাক দিই, 'মারিয়া কি বিশ্রাম নিচ্ছ এখনো?'

মুহূর্ত কয়েকের অপেক্ষায় কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা ধাক্কা দিই—বিছানা ফাঁকা। লাইট জ্বেলে দেখি। বিছানার চাদর বালিশ যেমন গোছানো নিভাঁজ থাকে, সে রকম নয়। পষ্টই বোঝা যায় এ বিছানায় দুটি মানুষ যুদ্ধ করেছে। আর নিচে কী পড়ে আছে ওটা—সিগারেটের প্যাকেট না? মহিন সিগারেট খায়। আমি ও জিনিসের গন্ধ পর্যন্ত সইতে পারি না। বুঝলাম আমাকে বিছানায় মৃতবৎ পড়ে থাকতে দেখে কিংবা না দেখেই দুজন কেটে পড়েছে।

বিছানায় ফিরে এবার আমি বাচ্চু ভাইকে ফোন করি প্রথম, 'ভাই, মহিন, মারিয়া সুমিকে নিয়ে তোর বাসায় গেছে?'

'এখনো আসে নাই। মহিনকে নিয়েই আসার কথা।'

'মহিনও তো রাজশাহী থেকে সরাসরি তোর বাসায় যাওয়ার কথা।'

'হ্যাঁ, মহিন ফোন করেছিল। একসঙ্গেই আসবে ওরা। আমি তো মনে করলাম তোর বাসাতেই যাবে প্রথম। সন্ধ্যায় আবার সুমির বর দেখার প্রোগ্রাম। তোকেও সঙ্গে আনতে বলেছিলাম, তা তুই কি বাসায় একা আছিস?'

'দোকা আর কোথায় পাব? জেগে জেগে জীবন্ত নীল ছবি দেখছি।'

ভাই কী বুঝল কে জানে। লজ্জার অভিজ্ঞতাটি সরাসরি তার সঙ্গে শেয়ার করা কি ঠিক হবে? তবে অসুখটা হওয়ার পর আমার প্রতি ভাই-ভাবি দুজনই যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। মারিয়ার স্বভাব-চরিত্রও ওদের অজানা নয়। এ কারণেই হয়তো কঠোর সিদ্ধান্ত শোনায়, 'শোন সাচ্চু, মারিয়া-মহিন আসুক আজ, তোকে অসুস্থতা নিয়ে বাসায় যাতে একা থাকতে না হয়, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'নরকে বন্দি হয়ে আছি, আমাকে উদ্ধার করে কোথায় নিয়ে যাবি?'

'তোর ভাবিসহ আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পৈতৃক সম্পত্তি ও বাড়িভিটা ভাগবাটোয়ারার পর গ্রামে থেকেই সমাজসেবামূলক কাজ করব। তুই চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে থাকলে ভালো থাকবি। একটা হুইলচেয়ারও কিনে দেব তোকে। ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারটা ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত বাসায় একা থাকলেও যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য একজন নার্স ঠিক করার কথা বলব মারিয়াকে।'

'তার আগে তুই আমার সুমির বিয়ের ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখ ভাই। একটা বাজে ছেলেকে বিয়ে করে আমার মতো ওর জীবনটা যাতে নষ্ট না হয়, ভাবিসহ সব দেখেশুনে মতামত জানাবি।'

'অবশ্যই। ছেলে ও তার পরিবারের সব দিক খোঁজখবর নিয়ে আগামী শুক্রবারেই তোর বাসায় আসব আমরা।'

অগ্রজের সঙ্গে কথা বলে কিছুটা সান্ত্বনা পাই। ওর স্ত্রী ও সন্তান ভাগ্যের কথা ভাবলে নিজের দুরবস্থায় কখনো-বা ঈর্ষার চোরাকাঁটাও অনুভব করি। ভাতিজা সাগর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির লেকচারার,

নিজের পছন্দমতো সহকর্মীকে বিয়ে করেছে। আলাদা থাকে। ভাইঝি সীমাও বিয়ে করে কানাডায়। দুজনই নিজ নিজ সংসারে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। ওদের প্রভাবেই হয়তো আমার সুমিও ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স হওয়ার আগেই নিজের বর নিজেই ঠিক করেছে। কিন্তু বড় ভাইয়ের ছেলে-মেয়ের মতো সফল হবে, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্বমুক্ত হয়েছে বলে ভাই স্ত্রীর সরকারি চাকরির পেনশন-গ্র্যাচুইটির ওপর নির্ভর করে গ্রামের বাড়িতে থেকে সমাজসেবার চিন্তা করছে। এদিকে বিয়ের পর থেকেই আমি গৃহবধূ মারিয়ার বিষগেরোয় বাঁধা পড়ে কাঁপছি সারাক্ষণ। মেয়ের বিয়ের পর আমার অর্থসম্পদ পুরোপুরি ভোগদখল করতে স্বামীসেবার নামে স্বামীকে দ্রুত জাহান্নামে পাঠাতে চেষ্টা করবে অবশ্যই। তার আগে ভালোয় ভালোয় মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে চাকরি ও স্ত্রীর বিষগেরো থেকে মুক্ত হয়ে জন্মভূমি গ্রামে পালাব আমি। এ রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে শান্ত-স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সুমির কথা ভেবে আবার দুশ্চিন্তা হয়। মেয়েটাকে কোথায় রেখে মা তার অবৈধ সম্পর্ক স্বামীকে দেখাতে চুপিচুপি বাসায় ফিরেছিল আবার? আর বাসা থেকে বেরিয়ে গেলই বা কোথায়?

আমি এবার মহিনকে ফোন করি। রিং হয়, কিন্তু ফোন ধরে না মহিন। আমার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সাহস পায়নি। তেমনি কথা বলতেও সাহস পাচ্ছে না বোধ করি। সন্দেহটা গাঢ় হয়। এবার সরাসরি ফোন করি মারিয়াকে।

'কোথায় তুমি? তোমরা এতক্ষণেও ভাইয়ের বাসায় যাওনি কেন?'

মারিয়াও স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমি রাস্তায়। মহিন এসেছে, ওর সঙ্গে জরুরি কিছু কেনাকাটা করার জন্য মার্কেটে যাচ্ছি।'

'আর সুমিকে কোথায় রেখেছ?'

'সুমি ওর এক বান্ধবীর বাসায় গেছে। ওকেও সেখান থেকে নিয়ে বড় ভাইয়ের বাসায় যাব। তুমি চিন্তা করো না। এই শোনো, তুমি দুপুরে খাওয়ার আগের ওষুধটা মনে করে খাবে কিন্তু। আর ফ্রিজে মুরগির মাংস আছে এক বাটিতে। রাতে তোমার জন্য চাইনিজ খাবার ছাড়াও অনেক ভালো খবর নিয়ে আসব ইনশাল্লাহ।'

মহিন এখনো মারিয়ার পাশেই আছে শুনে সত্যটা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেয়েকে বান্ধবীর বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে দুজন চুপিচুপি বাসায় এসেছিল। কাজ সেরে আবার চুপিচুপি বেরিয়েও গেছে। কিন্তু মারিয়ার কথায় বিন্দুমাত্র অনুশোচনা কি লজ্জা-ভয়ের কম্পন নেই। আমার মতো অচল-অক্ষম স্বামীকে ভয়-লজ্জার কী আছে? সত্যটা স্বচক্ষে দেখার শাস্তি হিসেবে প্রকাশ্যে যে হুমকি-ধামকি দেয়নি, এই তো যথেষ্ট। রাতে আমার জন্য সে ভালো খবর নিয়ে আসবে। এমন আশ্বাসে বিন্দুমাত্র খুশি-কৌতূহল জাগে না। বরং তার ভালো খাবার ও খবরের আগাম স্বাদ পেয়ে বমি পায় যেন। একটু আগে অগ্রজের ছেলেমেয়ে দুটির মানুষ হওয়া নিয়ে যে চোরা হিংসের কথা বলেছিলাম, সেই হিংসেটাই বাড়বে বরং। তার চেয়ে ডায়েরিটা এনে কম্পরোগীর স্মৃতিকতা লিখতে শুরু করি। স্মৃতিকথায় আজকের ঘটনাটি বাসি ও পুরনো স্মৃতি হয়ে যাওয়ার আগে লিখে রাখা জরুরি।

রাতে ওদের ফেরার সময় হলে মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে আমি রাতের খাবার ও ওষুধপথ্য খেয়ে লাইট নিভিয়ে দিই। ড্রয়িংরুমের বিছানাতেই আজ ঘুমাব। ঘুমের ওষুধও খেয়েছি। কিন্তু তার পরও শরীরের মতো ঘুমও কি হুকুমমতো চলতে চায়? চোখ বুজেও ওদের ফেরার আওয়াজ শুনি। অনুমান করি, রাত ১০ কি সাড়ে ১০ হবে। লাইট জ্বেলে সুমি আমার বিছানায় এগিয়ে আসে প্রথম, 'আব্বু ঠিক আছ তো? ঘুমিয়ে পড়েছ? তোমার জন্য আমি নিজে মেনু বাছাই করে খাবার এনেছি। একটু খেয়ে ঘুমাও।'

সাড়া না দিলে মেয়ের উদ্বেগ বাড়বে। চোখ না মেলেই জবাব দিই, 'আমি খেয়ে ওষুধও খেয়েছি। ফ্রিজে রাখো, কাল খাবো। ঘুম পাচ্ছে খুব, তোমরা ঘুমাও।'

সুমি আমাকে আর বিরক্ত না করে লাইট নিভিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। মিনিট কয়েক পর আবার ঘরে লাইট জ্বলে। এবার মারিয়া পোশাক পাল্টে রেডি হয়ে এসেছে স্বামীসেবার নামে আমার যন্ত্রণা বাড়াতে।

'কই গো সুমির আব্বু, কত সুখবর নিয়ে আসলাম! না শুনেই ঘুমিয়ে গেছ? ওঠো, গরম স্যুপ আর চিকেনটা দিয়ে একটু খাও, খেতে খেতে সব খবর শোনো।'

আমার ঘুম ভাঙে না। ওদের সঙ্গে মহিনও এসেছে নাকি? আমি এখানে ঘুমালে মারিয়ার সঙ্গেই শোবে হয়তো। এ গোপন খবরটা লুকাতে আমাকে ঘুস খাইয়ে মেয়ের বিবাহসংক্রান্ত সুখবর দিতে থাকে, 'জানো তোমার বড় ভাই-ভাবিরও খুবই পছন্দ হয়েছে ছেলেকে। আর মহিন বলেছে, শুভকাজে বিলম্ব করা ঠিক হবে না। এজন্য এ মাসেই গ্রামের সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা ফাইনাল করতে বড় ভাইকে চাপ দিয়েছে।'

মারিয়া বিছানায় এসে ধাক্কা দিতে শুরু করলে ঘুমাতে পারব না। আবার তার সুখবরের খুশি মনে যে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে, তা চুপচাপ হজম করাও কঠিন। ভাবি, দুপুরে ঘটনার পর দুজনকেই নিষ্কম্প পায়ে লাথি মেরে যে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম, সেটা এখনই কার্যকর না করলে যেন ঘুমাতেও পারব না। চোখ মেলে জানতে চাই, 'মহিন কই, ডাকো ওকে।'

'সে তো রাতের কোচেই রাজশাহী ফিরে গেছে। সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে এ মাসেই গ্রামে যাবে। বড় ভাই আমাদেরও নিয়ে যাবে। ভাই-ভাবি শুক্রবার বাসায় আসবেন তোমাকে সব জানাতে।'

'আচ্ছা, মহিনের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্কটা আজ দেখলাম, তা কতদিন ধরে চলছে? ও যখন কয়েক মাস আমাদের বাসায় ছিল তখন থেকে? '

'কীসের সম্পর্কের কথা বলছ?'

'আজ তো স্বচক্ষে দেখলাম। দুজনই হাতেনাতেই ধরা পড়লে। তার পরও ভান করছ কেন? অচল-অক্ষম আমি, সত্য বলো, আমি কিছু মনে করিনি, করবও না।'

'কী দেখেছ তুমি স্বচক্ষে?'

মেয়ে শোনার ভয়ে আমি কম্পিত দুই হাতের আঙুলের সাহায্যে ক্রিয়াটি বোঝাই ওকে।

'ছি! কী বলছ এসব?'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, স্বামী ছাড়া এ রকম ঠাপাঠাপি এ জীবনে, বিয়ের আগে কিংবা পরে— আর কারো সাথে করো নাই? এমনই সতী সাবিত্রী তুমি!'

'ছি, এমন প্রশ্ন কোনো সুস্থ স্বামী ওয়াইফকে করে? এখন বুঝতে পারছি, ডাক্তার যে হ্যালুসিনেশনের কথা বলেছে, মহিন আর আমাকে জড়িয়েও আজ ও রকম কিছু দেখেছ। আর এই রোগের জীবাণু আর সন্দেহের বিষ নিয়েই জন্মেছ তুমি। হায় খোদা, এই ব্যারামি স্বামীকে নিয়ে কেমনে মেয়েটার বিয়ে দেব আমি!'

মারিয়ার কান্না ও আর্তচিৎকারে সুমি ঘর থেকে ছুটে আসার ভয়ে আমি রণে ভঙ্গ দিই। কম্পিত হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে বলি, 'সরি গো মারি, আসলে অসুখটা বাড়ায় নিজের চিন্তাভাবনাও কন্ট্রোলে রাখতে পারছি না আর। কী থেকে কী বলি, কী থেকে কী যে করি! ঘুমের দুটি বড়ি খেয়েছি, আমি এখানেই ঘুমাব আজ। তুমি যাও...

চোখ বুজে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করি। প্রার্থনাও ধ্বনিত হয় অন্তরাত্মায়—হে খোদা, হ্যালুসিনেশন হোক আর অভ্রান্ত সত্যই হোক, এসব পাপচিন্তা থেকে আমাকে মুক্ত করো। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়া পর্যন্ত সুস্থ রাখো আমাকে।

দয়াময় খোদা আমার প্রার্থনা কবুল করে। শৈশবে একদিন খুব ভয় পেয়ে ভূত দেখার ভয়ে চোখ বুজেছিলাম। মা ছুটে এসে বুকে তুলে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। মায়ের স্মৃতিটা আজ জীবন্ত হয়ে ওঠে। মায়ের মতো আমাকে সেভাবে কেউ আজ আশ্রয় দিতে চায় যেন। অসাড় শরীরে পরিচিত টান ও ধাক্কার সঙ্গে কোমল-কাতর নারীকণ্ঠে শুনতে পাই, 'ওঠো, নিজের হাতে একটু খাইয়ে দিই। তারপর ঘুমাবে।'

জুলাই গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্রের গল্প

বজলুর রশিদ শাওন

গুলি করে করে লাশ নামানো লাগছে স্যার। কিন্তু গুলি করলে মরে একটা, আহত হয় একটা, ঐ একটাই যায় স্যার। বাকিডি যায় না। এইটাই সবচেয়ে আতঙ্কের এবং দুশ্চিন্তার বিষয় স্যার।

৫ আগস্টের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, ডিএমপির এক সাবেক কর্মকর্তা ঠিক এ ভাষাতেই আন্দোলনের পরিস্থিতি বর্ণনা করছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে। একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশে পুলিশের এ ভাষ্যের যদি নির্মোহ পোস্টমর্টেম করা হয় তাহলে কি বুঝতে বাকি থাকার কথা যে কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ছিল একটা জনগোষ্ঠী? এ শাসন ব্যবস্থার মধ্যে কী ধরনের নিপীড়ন ও শোষণের মধ্যে জনমানুষকে থাকতে হয়েছে এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসতে বাংলাদেশের মানুষকে কতটা মূল্য দিতে হয়েছে? শহীদ, আহতদের সংখ্যা দিয়ে হয়তো তা কিছুটা বোঝা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ চেহারা কিংবা আদল বোঝা যায়? সম্ভবত যায় না। তবে যা ঘটেছে তার প্রতিফলন তো নানাভাবে থেকে যায়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিফলন পাওয়া যায় ঢাকাসহ দেশের জনপরিসরের দেয়ালে দেয়ালে। ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতির বাইরে এখনো দেখা মেলে প্রায় ফিকে হতে যাওয়া এ ইতিহাসের স্মারক চিহ্নগুলো। যে চিহ্নরা শুধু একটা সময়ের একটা সংগ্রামের সাক্ষ্যই দেয় না বরং মনে করিয়ে দেয় কাদের, কতটা আত্মত্যাগে আজকের এ দেশ। যারা জীবন দিয়ে গেল একটা স্বৈরাচারমুক্ত দেশের জন্য তাদের ত্যাগের প্রতি কি আদৌ সুবিচার করা হচ্ছে?

গণ-আন্দোলন আর গ্রাফিতি অনেকটা একে অন্যের পরিপূরক। আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে গ্রাফিতির ভাষার তীব্রতাও বাড়তে থাকে বললে অত্যুক্তি হয় না। মূলত 'গ্রিক গ্রাফাইন' থেকে গ্রাফিতি শব্দটি

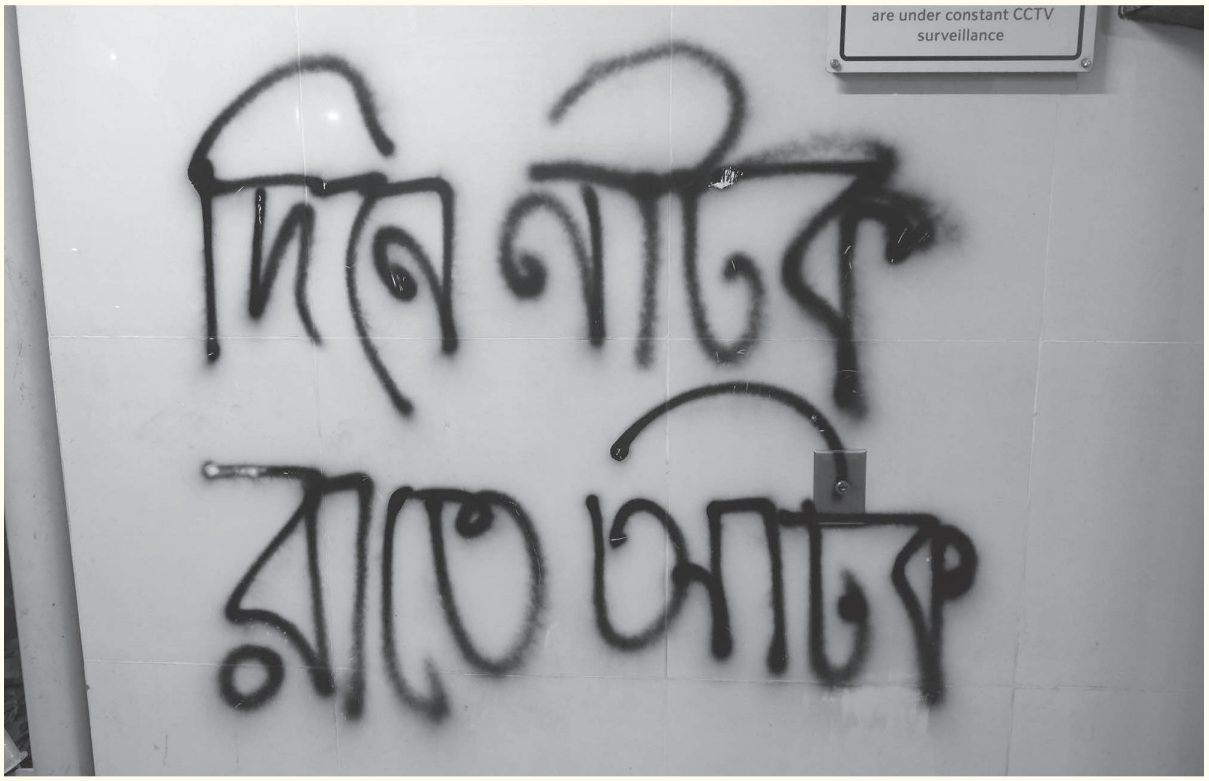

আসে যার অর্থ স্ক্র্যাচ, আঁকা বা লেখা, মোটাদাগে যা দেয়ালে করা হয়। দৃশ্য শিল্পের একটি প্রচলিত মাধ্যম হিসেবে গ্রাফিতি বেশ জনপ্রিয় এবং নানা ধরনের গ্রাফিতি আমরা দেখতে পাই আবহমানকাল ধরে। এমনকি দৃশ্য শিল্পের সবচেয়ে আদি নিদর্শন হিসেবে পরিচিত 'গুহাচিত্র'কেও শিল্পতাত্ত্বিকরা গ্রাফিতি হিসেবে বিবেচনা করেন। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ধরনটি মূলত সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে বিশ্বব্যাপী। এক্ষেত্রে শিল্পী সবসময় অলক্ষ্যে থাকেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়াবহ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলনের ছবি আমরা দেখতে পাই, তার প্রায় সবখানেই গ্রাফিতি একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত প্রায় সব আন্দোলনে গ্রাফিতির দেখা মেলে। ষাটের দশকের নারীবাদী আন্দোলন থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর আরব বসন্ত হয়ে সাম্প্রতিক ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রাফিতির গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাংলাদেশেও গ্রাফিতির প্রচলন রয়েছে। এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার দেখা যায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেয়ালে, যেখানে বামপন্থী সংগঠনের কার্যক্রম চলমান সেসব জায়গায়। এদের গ্রাফিতি বক্তব্য বা স্লোগাননির্ভর। বিশেষ করে রাজনৈতিক আদর্শের আহ্বান সংবলিত। এ ধরনের গ্রাফিতিকে সাধারণত 'চিকা মারা হিসেবে' অভিহিত করা হতো। আমাদের কৈশোরে (নব্বই দশকে) রাস্তার দেয়ালে রাজনৈতিক চিকায় ভরা থাকত, শূন্য দশকের শুরু থেকেই এ জায়গা দখল করে বিজ্ঞাপন। তবে এর মাঝেও ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিতি শহরাঞ্চলের দেয়ালে দেখা যায়, যেগুলো খুব বেশি নিয়মিত ঘটনা নয় বরং বিচ্ছিন্ন। তবে বিচ্ছিন্নভাবে এসব গ্রাফিতি করা হলেও সেখানে রাজনৈতিক ইস্যুগুলোর ইঙ্গিত টের পাওয়া যায়। ২০১৭-১৮ সালের দিকে ঢাকার রাস্তায় সুবোধ গ্রাফিতি যার অন্যতম উদাহরণ। উস্কোখুস্কো চুলের এক ব্যক্তি খাঁচায় সূর্য নিয়ে কখনো অসার ভঙ্গিতে বসে ছোট্ট বাচ্চা মেয়ের সাথে কথা বলছে, পাশে লেখা আছে 'সুবোধ কবে হবে ভোর' কিংবা পিছন ফিরে দর্শকের চোখে চোখ রেখে হেঁটে যাচ্ছে আর পাশে লেখা 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা'।

স্বৈরাচার হাসিনা এমনকি গ্রাফিতি নিষিদ্ধে আইনও করেছিলেন এবং আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় শেখ মুজিবের ছবি সবখানে একচ্ছত্রভাবে স্থাপন করতে শুরু করেছিলেন। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্র আবার জনতার হাতে ফিরে এসেছে। সম্ভবত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপক বিস্তৃত গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্র হলো জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের। যেখানে গ্রাফিতির স্লোগান একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনসংবলিত স্লোগান দিয়ে শুরু হলেও তা জনতার কালেক্টিভ কনশাস থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিপ্রায়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে

বিশ্বের শীর্ষ ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি S&P গ্লোবালের রেটিংয়ে

ব্র্যাক ব্যাংক

বাংলাদেশের সেরা

S&P Global Ratings

ক্রেডিট রেটিং: বি+
আউটলুক: স্থিতিশীল

ব্র্যাক ব্যাংক
আমরা একজন

বিবেচনা করার মতো অসংখ্য চিহ্নসমেত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়।

জুলাই গ্রাফিতির শুরু সাইবার স্পেস/ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

আমার মতে, জুলাই গ্রাফিতির শুরু মূলত সাইবার স্পেস বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, যা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের বিতর্কিত একপক্ষীয় নির্বাচনের পর থেকেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই সময় থেকেই সমাজ-রাজনীতি সচেতন নাগরিক, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকরা লেখা, আঁকার মাধ্যমে এ স্বৈরাচারী রেজিমের সমালোচনা করে আসছিলেন এবং কোনো ধরনের ঘোষণা ছাড়াই তা এতটাই তুঙ্গে উঠেছিল যে হাসিনা সরকার এসব নীরব আন্দোলন থামানোর জন্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো কালা কানুন তৈরি করেছিল। যার ভুক্তভোগী হিসেবে লেখক মুশতাকের প্রাণ যায় আর কার্টুনিস্ট কিশোরকে অন্যায়ভাবে জেলে রেখে অমানবিক অত্যাচারও করা হয়েছিল। এমনকি করোনা-পরবর্তী সময়ে ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের মিম ও হিউমার-সংক্রান্ত পেজ খোলা হয়। ইয়ার্কি, গণমজাতন্ত্র পেইজ দুটি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। মিমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রোফাইলগুলো বেশি ভূমিকা রাখে। এর মধ্যে পুন্নি কবির ও ফায়েজ আহমেদ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি পুন্নি কবীরকে তার ফলোয়াররা মিম সম্রাজ্ঞী উপাধিও দিয়েছিলেন। ফলে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ন্যায্যতা রাজনীতি সচেতন মানুষের মধ্যে অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। সেই বিবেচনায় যখনই কোনো একটা রাজনৈতিক ইস্যুতে সরকারের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতো, তখনই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ত। জুলাই অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। বরং শুরু থেকেই রাজনীতি সচেতন শিল্পীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিতি (বিশেষ করে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন করে) করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে আসছিলেন। ১৫ জুলাই শিল্পী সায়েদা শান্তার 'আগামী প্রজন্ম যে শাকচুন্নীর গল্প শুনবে' শিরোনামে আঁকা শেখ হাসিনার রাক্ষসী মুখাবয়ব ব্যাপকভাবে শেয়ার হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এমনকি ১৯৭১ সালে কামরুল হাসানের আঁকা ইয়াহিয়া খানের 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' শিরোনামে ইয়াহিয়া খানের দানবীয় মুখাবয়বের আদলে শিল্পী জাহিদ জামিল 'এই জানোয়ারদের হটাইতে হবে' শিরোনামে একই ধরনের স্বৈরাচার শেখ হাসিনার মুখাবয়ব অংকন করে ফেসবুকে শেয়ার করেন। এভাবে শিল্পীরা অনলাইনে/সাইবার স্পেসে/সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলেন, যা প্রবলভাবে বিস্ফোরিত/শুরু হয় রংপুরে আবু সাঈদের মৃত্যুর পর। আবু সাঈদের প্রসারিত ওই দুই হাতের ছবি বিভিন্নভাবে এঁকে কিংবা সফটওয়্যারের সহযোগিতায় রূপান্তর করে শিল্পীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতে থাকেন। সম্ভবত প্রথম শিল্পী হিসেবে কলকাতার শিল্পী কৌশিক সরকার আবু সাঈদের প্রসারিত হাতের ছবিটা আঁকেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করেন। এছাড়া শিল্পী মনিরুজ্জামান শিপু, সোহরাব রাব্বি, দেবাশীষ চক্রবর্তী, কার্টুনিস্ট জাহিদ জামিল, কার্টুনিস্টদের মধ্যে মেহেদী হক, মাহাতাব রশীদ, রাকিব হাসান অপু, সাফায়েত সাগর, শাহাদাত হোসেন, ফরিদুর রহমান রাজিব, এসএম রাকিবুর রহমানসহ অনেকেই তাদের চাকরির কাজের বাইরে ফেসবুকে আন্দোলনের পক্ষে নানা কার্টুন শেয়ার করেন আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে। যাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে দেবাশীষ চক্রবর্তীর পোস্টার। আন্দোলন চলাকালীন প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে দেবাশীষ দেশের বাইরে বসে সংযুক্ত থাকতেন। সাধারণত এ ধরনের আন্দোলনকে থামানোর জন্য ক্ষমতাসীনরা যে ধরনের ট্যাবুকে ইস্যু করে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে থাকে সেগুলোকে দেবাশীষ খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন। ফলে দেবাশীসের পোস্টারের মানুষেরা ছিল সব ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সেখানে হিজাবি নারীর পাশে টি-শার্ট পরা নারী, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে খুব চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন দেবাশীষ। তার পোস্টারের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো রঙের ব্যবহার। লাল, হলুদ আর কালো—এ তিন রঙকে প্রাধান্য দিয়ে দেবাশীষের করা পোস্টারগুলো জুলাই অভ্যুত্থানের মূল প্রতিরূপ হিসেবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পরবর্তী সময়ে সারা দেশের দেয়ালে দেবাশীষের পোস্টারের অনুকরণে অনেক গ্রাফিতি দেখা যায়।

সাইবার স্পেস থেকে দেয়ালে

১৫ জুলাই মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা স্বৈরাচার শেখ হাসিনার ১৪ জুলাইয়ের সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে আবাসিক হলগুলো থেকে বেরিয়ে আসে এবং ১৬ জুলাই সারা দেশে দিনভর ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের মধ্যে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সরকার সমর্থকরা হামলা চালায়, আবু সাঈদসহ এতে ছয়জন নিহত হন। এরপর থেকেই মূলত মাঠের আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং রাজপথ দখলের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা রাস্তায়, দেয়ালে গ্রাফিতি আঁকতে শুরু করেন কোনো ধরনের ঘোষণা ছাড়াই। সাইবার স্পেস থেকে গ্রাফিতি চলে আসে জনপরিসরে। বিশেষ করে যেসব রাস্তা ও এলাকা শিক্ষার্থীরা নিজেদের দখলে রাখতে শুরু করেছিলেন, সেসব রাস্তা ও আশপাশের দেয়ালে শিক্ষার্থীরা গ্রাফিতি অংকন শুরু করে দেন। পরবর্তী সময়ে ২৮ জুলাই আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হিসেবেই গ্রাফিতি বা দেয়াল লিখনের ঘোষণা আসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো স্বৈরাচার হাসিনার পতনের আগের গ্রাফিতি আর পরের, অর্থাৎ ৫ আগস্টের আগের ও পরের গ্রাফিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ৫ আগস্টের আগের ছবি/লেখা অবশ্যই গ্রাফিতি তবে ৫ আগস্টের পর যেসব ছবি আঁকা হয়েছে তা মূলত দেয়ালচিত্র।

৫ আগস্ট-পূর্ববর্তী গ্রাফিতি

স্বৈরাচার হাসিনা পতনের আগের গ্রাফিতি মূলত টেক্সটভিত্তিক। যদিও অল্প কয়েকটা স্থানে কিছু ইমোজি দেখা যায় কিন্তু সংখ্যায় তা খুবই নগণ্য। বেশির ভাগ এক রঙে (লাল, সাদা, কালো, নীল এসব রঙের প্রভাব বেশি) স্প্রে পেইন্টে খুব দ্রুততার সঙ্গে লেখা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হচ্ছে গ্রাফিতি

জুলাই গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্রের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলেছে এক অর্থে। কারণ এ বছরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের ব্যাক কাভারে জুলাই গ্রাফিতির ৪০টি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বিতর্কও কম হয়নি। একটি গাছের একেকটি পাতায় লেখা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসী আর পাশে লেখা 'পাতা ছেঁড়া নিষেধ' গ্রাফিতিটি প্রথমে পাঠ্যবইয়ে রাখলে পরবর্তী সময়ে সরকার সরিয়ে ফেলে। এ সিদ্ধান্তের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেকগুলো শঙ্কা। যে ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো, ছাত্র-জনতার সাফল্যও এল বলে ভাবা হলো, আসলেই কি সাফল্য এল?

করছে স্বয়ং আন্দোলনকারীরা। তাদের এসব গ্রাফিতির মধ্যে ছিল আন্দোলনের স্লোগান, শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়া, আন্দোলনের শুরু থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনায় সরকারি ও সরকারদলীয় ব্যক্তিদের বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া। আহত ও শহীদদের নাম, তাদের পরিবারের আহাজারি, আন্দোলনের কর্মসূচি এমনকি গত ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে নিপীড়নের ঘটনার প্রতিক্রিয়া, হাসিনাসহ সরকারি দলের নেতাকর্মীদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া। আন্দোলনে জনসাধারণকে অংশগ্রহণের আহ্বান, আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত কবিতার লাইন, গানের লাইন, ইন্টারনেট বন্ধের প্রতিবাদ, মিডিয়ায় লাশের সংখ্যা গোপন করা, আন্দোলনে মাঠের প্রতিপক্ষ হিসেবে পুলিশ, ছাত্রলীগকে কটাক্ষ ও গালিগালাজ করা ইত্যাদি। এ প্রক্রিয়া বেগবান হয় ২৯ জুলাই, যখন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দেয়াল লিখন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আশপাশের দেয়ালগুলো ভরে যায় আন্দোলনের ভাষায়। যেমন : আবু সাঈদ-মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ; আবু সাঈদের মৃত্যুর পর তার মায়ের উক্তি : তুই চাকরি দিবু না দে, হামার ব্যাটাক মারলু ক্যানে?; চালায়া দেন; লাশের সংখ্যা কত?; ইন্টারনেট বন্ধ কেনো?; লাইলাতুল গুজব; হাসিনা ভোট চোর; বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর; আওয়ামী লীগের গালে গালে, জুতা মারো তালে তালে; শেখ হাসিনার গালে গালে, জুতা মারো তালে তালে; কোটা না মেধা? মেধা মেধা; আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম; চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার; লাখো শহীদের রক্তে কেনা দেশটা কারো বাপের না; বলো বীর, বল উন্নত মম শির...; মুক্তিরও মন্দিরও সোপানো তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রু জলে; আমার ভায়ের রক্ত লাল, পুলিশ কোন চ্যাটের বাল; আমার টাকায় কেনা বুলেট আমার বুকেই চলে; লেগেছে রে লেগেছে রক্তে আগুন লেগেছে, জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে; সামনে আসছে ফাগুন, আমরা হবো দ্বিগুণ ইত্যাদি। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফার ঘোষণা আসার আগেই ছাত্র-জনতার গ্রাফিতির মধ্যে এক দফার ঘোষণা লক্ষ করা যায়।

মূলত এ পর্বের গ্রাফিতির লেখায় প্রতিক্রিয়া ও দাবি-দাওয়া প্রধান এবং লেখার ধরন খুব স্বতঃস্ফূর্ত। শিল্প সমালোচক মোস্তফা জামান এটাকে বলছেন ইমার্জেন্সি অ্যাস্থেটিক বা আপৎকালীন নন্দন। তিনি বণিক বার্তায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলছেন : 'দেয়ালচিত্র বা গ্রাফিতির কিন্তু দুটি ধরন ছিল। অর্থাৎ আন্দোলন চলাকালে এক ধরনের ইমার্জেন্সি অ্যাস্থেটিক বা আপৎকালীন নন্দন দেখলাম আমরা, যেটা অনেকটা যুদ্ধাবস্থায় খুব দ্রুত কিছু একটা এঁকে বা লিখে চলে যাওয়ার মতো ব্যাপার ছিল। এটাকে নন্দন হয়তো বলা যাবে না, বরং অ্যান্টি-নন্দন বা বিরোধী নন্দন বলা যায়, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের রাজনীতি হাজির করল। ... আমরা এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় দেয়ালে কিছু একটা লিখে খুব দ্রুত পালিয়ে যেতাম, অনেক সময় পুরোটা লিখতেও পারতাম না। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের মতো সংগঠনের কর্মীদের দেখেছি, একটা নিরাপদ জায়গায় সারা দিন ধরে খুব সুন্দর করে কিছু একটা লিখছে। তো এই ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্যটা আসলে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়কার ছাত্র ইউনিয়নের দেয়াল লিখনের সঙ্গে মিলে যায়। যেটা মোটেও ইমার্জেন্সি অ্যাস্থেটিক নয়।'

৫ আগস্ট-পূর্ববর্তী গ্রাফিতির মূল সুর হলো মাঠের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে ছাত্র-জনতার উপস্থিতির সুর ধরে রাখা। আর সেটা করতে একদিকে যেমন গালি, মকারির মাধ্যমে প্রতিপক্ষের নৈতিক জায়গাকে দুর্বল করতে চেয়েছিল এ শিল্পীরা, তেমনি সহযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা এবং জন সাধারণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও নব্বই সালের স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলন পর্বের স্লোগানও তুলে এনেছিল। একদিকে যেমন তুলে এনেছিল ভাসানী, মুজিবের রাজনৈতিক অধিকারের লাইন অন্যদিকে নজরুলের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন। এমনকি আন্দোলনের সময় তৈরি করা ব্যাপার হান্নান, সেজানের 'আওয়াজ উড়া', 'কথা ক' শিরোনামের গানের লাইনও। বেশির ভাগ এক রঙে লেখা এইসব লেখার ধরনের স্বতঃস্ফূর্তাই এর সৌন্দর্য। যেখানে কখনো কখনো আগের লেখার ওপরে আবার লেখা হয়েছে নতুন স্লোগান কিংবা বার্তা।

৫ আগস্ট-পরবর্তী দেয়ালচিত্র

৫ আগস্ট-পরবর্তী দেয়ালচিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য স্বাপ্নিক নান্দনিকতা। এবারের ক্যানভাস প্রায় সমগ্র দেশ। বিশেষত মফস্বল শহর পর্যন্ত এবং ঢাকা, চট্টগ্রামের মতো যেসব শহরে আন্দোলনের মাত্রা ছিল বেশি, সেখানকার যেসব স্থান বা দেয়াল আগে দখল করতে পারেনি, সেগুলো দখলে এল আন্দোলন সমর্থনকারী শিক্ষার্থীদের কাছে। এ পর্বের শিল্পীদের বেশির ভাগই আন্দোলনকারীরা নয়, বরং নৈতিক সমর্থনে যারা সঙ্গে ছিলেন, নানা বাধার মুখে যারা বের হতে পারেননি তারা এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়সী (স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা)। এদের ক্যানভাসও যেমন সমগ্র দেশ তেমনি এ পর্বে মূলত নতুন বাংলাদেশের রূপকল্প হাজির হলো বেশি। ছবির বিষয় : আন্দোলনে শহীদদের নাম, শহীদদের ছবি, জেন-জিদের প্রশংসা, রাষ্ট্র সংস্কার ভাবনা, পাহাড় থেকে সমতলের সবার সমান অধিকার দাবি, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবার দেশ, মুক্তিযুদ্ধ ২.০, ১৯৭১ থেকে ২০২৪-এর প্রক্ষেপণ ইত্যাদি। এ পর্বের বেশির ভাগ ছবিতে অনেক মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং অনেক রঙের ব্যবহারও দেখা গেল। কারণ এ পর্বে ছবি আঁকতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তেমন কোনো বাধা ছিল না। আর এ পর্বের ছবি আঁকার সঙ্গে অনেক শিল্পশিক্ষার্থীও জড়িত ছিলেন। অনেক ছবি সাইবার স্পেস বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয় ছবির অনুকরণে আঁকা। যেমন দেবাশীষ চক্রবর্তীর পোস্টার, রিকশাচালক সুজনের স্যালুট ইত্যাদি।

তবে দুই পর্বের গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্রের লেখার মধ্যে একটা মিল রয়েছে তা হলো লেখার উৎস। এটা খুব সহজেই অনুমেয় যে বেশির ভাগ লাইনই এ দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী কিংবা রাজনীতিবিদ যারা লম্বা সময় ধরে স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের সমালোচনা করে আসছিল তাদের বক্তব্য, লেখালেখি কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে হুবহু নেয়া, কিছু কিছু সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা। আর ছবিতে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের প্রতিকৃতি। সারা দেশের যেসব গ্রাফিতির ছবি আমরা দেখেছি তার প্রায় সবই মানুষের ফিগারসংবলিত। ফলে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চার কারণে মানুষের ছবি নেই হয়ে যাওয়ার মতো দাবি করার সুযোগ কম। কিন্তু কিছু কিছু এ রকম ছবি দেখা গেছে যেখানে মানুষের ফিগার থাকলে তাদের চোখ-মুখের অবয়ব দেয়া হয়নি। ধারণা করা যায়, এগুলো ইসলামী মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই এসেছে। কিন্তু সংখ্যায় তা খুবই নগণ্য।

এ পর্বের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ক্যালিগ্রাফি। সারা দেশের অসংখ্য স্থানে ক্যালিগ্রাফি দেখা গেল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে সংখ্যায় এত বেশি ক্যালিগ্রাফিশিল্পী রয়েছে সেটা ৫ আগস্টে স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতন না হলে হয়তো জানা যেত না। কিন্তু এসব ক্যালিগ্রাফির দৃশ্যগত সৌন্দর্য থাকলেও তার বেশির ভাগই এক ধরনের ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন শিল্পীদের স্থান দখল, নিজেদের দর্শন কিংবা উপস্থিতি জানান দেয়ার বাইরে আন্দোলনের স্পিরিটের সঙ্গে তা সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম। বরং আন্দোলনের সময় গ্রাফিতির অনেক স্থানে কোরআনের এমন সব আয়াত উঠে এসেছিল যা অনেক বেশি আন্দোলনের স্পিরিটের সঙ্গে সম্পর্কিত।

জুলাই গ্রাফিতি ও দেয়ালচিত্রের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মিলেছে এক অর্থে। কারণ এ বছরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ের ব্যাক কাভারে জুলাই গ্রাফিতির ৪০টি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বিতর্কও কম হয়নি। একটি গাছের একেকটি পাতায় লেখা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আদিবাসী আর পাশে লেখা 'পাতা ছেঁড়া নিষেধ' গ্রাফিতিটি প্রথমে পাঠ্যবইয়ে রাখলে পরবর্তী সময়ে সরকার সরিয়ে ফেলে। এ সিদ্ধান্তের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেকগুলো শঙ্কা। যে ক্ষমতা কাঠামোর বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো, ছাত্র-জনতার সাফল্যও এল বলে ভাবা হলো, আসলেই কি সাফল্য এল? নাকি আবারো অনেক প্রাণের বিনিময়ে, অনেক গ্রাফিতি তৈরি করে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হবে? নাকি এটি চলমান প্রক্রিয়া?

উপন্যাস

অ্যা মে থি স্ট

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

শীত পড়েছে কয়েক দিন যাবৎ। তাপমাত্রা দিনে দিনে কমে আসছিল। কিন্তু ঘরে হিটার চালিয়ে গায়ে লেপমুড়ি দেয়ার অবস্থা হয়নি। আজ সন্ধ্যা থেকে গাঢ় কুয়াশা। আবহাওয়ার আমেজটা অন্যরকম। তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রির নিচে নেমে গেছে হয়তো।

কিছুক্ষণ আগে তিনি এয়ারকুলার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। ঘরটা নিস্তব্ধ।

'আজ রাতে হয় তো শীত নামবে'—ভাবলেন তিনি। প্রতি বছর একটি অনির্ণেয় রাতে হেমন্ত শেষ হয়ে যায়, শীতের অভিষেক হয়।

তিনি জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানালার একটি কপাট খুলতেই একগুচ্ছ কুয়াশা ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাৎ মুখ ভিজে যাবে।

'আগামীকালই শেষ দিন।' ভাবলেন তিনি। আর তাকে অফিস করতে হবে না কোনো দিন।

অফিসের সময় বিকেল চারটে পর্যন্ত। সাধারণত চারটে পাঁচ মিনিটে অফিস ছেড়ে বের হয়ে পড়েন। আজ দেরি করছেন। আগামীকালের জন্য কোনো কাজ ফেলে রাখবেন না। তাছাড়া টেবিলের ড্রয়ারে হয়তো কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আছে। সেগুলো আজই বাড়ি নিয়ে যাবেন।

জানালার কপাট বন্ধ ক'রে তিনি চেয়ারে ফিরে এলেন: 'আমি নিশ্চিত ড্রয়ারগুলোতে কাজের কিছু নেই। তবু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রেখে যাওয়া ঠিক না।'

যিনি তার কাছ থেকে দায়িত্ব নেবেন তিনি এখনো এসে পৌঁছুননি। তবু তার জন্য ড্রয়ারগুলো পরিষ্কার ক'রে রেখে যাওয়া সমীচীন হবে।

টেবিলটা মস্ত বড়। ডানদিকে তিনটি বাম দিকে তিনটি ড্রয়ার। বাম দিকের ড্রয়ারগুলোতে তালা দেয়া। চাবি সুরক্ষিত ক'রে রেখেছেন। ভেবেছিলেন নতুন অফিসারের হাতে দিয়ে যাবেন চাবিগুলো। তা আর হচ্ছে না। তিনি আসবেন দেরিতে। কেন দেরি হচ্ছে বুঝতে পারছেন না। রাষ্ট্রদূতের হেফাজতে চাবিগুলো দিয়ে যেতে হবে। সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারে আছে অধস্তন কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন। মাঝের ড্রয়ারে আছে একটি ডায়েরি—এটা পরবর্তী কর্মকর্তার জন্য। তিনি কী কাজ কীভাবে করেছেন তার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। আর আছে 'নোটস ফর দ্য সাকসেসর'। কী করা দরকার। সম্ভাবনা কী। প্রতিবন্ধকতা কী। আগামীতে কী করা যায় সেসবেরও কিছু পরিকল্পনা লেখা আছে। একটি অধ্যায়ে লিখেছেন বিসিএস ফরেন সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলার প্রতিবন্ধকতা কী কী। তাদের ভালো দিক ও মন্দ দিক। দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর একজন প্রতিনিধি আছেন ব্রাসেলসে। তার নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়েছেন।

মিলিটারি একাডেমিতে 'সোর্ড অব অনার' পেয়েছিলেন। আশা ছিল তিনি মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু তা হলো না। ছ'বছর আগে তিনি এসেছিলেন 'ডিফেন্স অ্যাটাশে' হিসেবে। র‍্যাংক ছিল ব্রিগেডিয়ার। সাধারণত দু'আড়াই বছরের মধ্যে ডিফেন্স অ্যাটাশেদের বিদেশ থেকে ফেরত নেয়া হয় ও মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। তিনি হিসেব কষে দেখেছিলেন অবসরে যাওয়ার আগে বছর তিনেক দুই তারকা জেনারেল হিসেবে কাজ করতে পারবেন। সে আর হলো না। তিন-চার-পাঁচ ক'রে শেষ পর্যন্ত পুরো ছ'বছর কেটে গেল। ঠিক ঠিক গুনলে ছয় বছর তিন মাস। বিদেশের মাটিতেই তাকে অবসর নিতে হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে।

তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন। তবু ছ'মাস আট মাস পরপর চিফ অব স্টাফের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিন বছর আগে তখনকার চিফ বলেছিলেন তিনি খুব স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনে আছেন—তাই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে তাকে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। দু'বছর যাবৎ বলা হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধটা একটু থিতিয়ে এলেই তাকে দেশে ফিরিয়ে নেয়া হবে। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের সঙ্গে অনেক দূরে অবস্থিত ছোট একটি দরিদ্র দেশের কী সম্বন্ধ থাকতে পারে তা তিনি বুঝে উঠতে অপারগ।

তিনি সিসিটিভির দিকে তাকালেন। দুই সারিতে আটটি মনিটর। ফোকাস করলেন উল্টো পাশের রুমে। ব্যক্তিগত সহকারীর রুম। রুমে লাইট জ্বলছে। ঘরের ভেতরে নজর করলেন। ব্যক্তিগত সহকারীর সামনে তার গাড়িচালক বসা। কিন্তু তিনি আজ গাড়ি ক'রে বাড়ি ফিরবেন না। সামান্য কিছু জিনিস আছে বাসায় নেবার। গাড়িতে সেগুলো তুলে দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরবেন। এ শহরে আজই তার শেষ সন্ধ্যা। কাল লাঞ্চের সময় পর্যন্ত অফিসে থেকে বাসায় চ'লে যাবেন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিমানবন্দরে। এ বছর আর তুষারপাত দেখা হবে না।

ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো থাকে ডানপাশের ড্রয়ারে। সবচেয়ে ওপরের ড্রয়ারে পাওয়া গেল কিছু প্যারাসিটামল: মাথা ধরলে তিনি দেরি না ক'রে পাঁচশ' মিলিগ্রামের একটি ট্যাবলেট এক ঢোক পানির সঙ্গে গিলে ফেলতেন। প্যারাসিটামল খেতে দেরি করা মানে সাফার করা। কিছু টুথপিক। প্রতিটি টুথপিক আলাদা কাগজের প্যাকেটে ঢাকা। পকেট টিস্যু। দশটি ক'রে ওয়েট টিস্যুর দুটি প্যাকেট। জিপলক ব্যাগে পোরা দুটি রুমাল আর একটি পুরনো ফোনসেট। একটি আধা পরিত্যক্ত মোবাইল ফোন। সিম আছে। প্রিপেইড। কিন্তু চার্জ নেই। পাশেই চার্জার আছে। ক'মাস চার্জ দেয়া হয়নি কে জানে। অনেক দিন ব্যবহার করেছেন তিনি। তারপর এক রোববার সুইমিংপুলে সাঁতার কাটার জন্য পোশাক বদলাচ্ছেন এমন সময় হাত ফসকে পড়ে গেল সেটা। শকপ্রুফ ছিল। তবু স্ক্রিনের এক কোনা কেটে গেল। একজন উচ্চ পদবির ডিপ্লোম্যাট ভাঙা মোবাইল ফোন নিয়ে ঘুরবেন ভাবা যায় না। পরদিনই তিনি অফিস শেষে নতুন একটি ফোন কিনেছিলেন।

বাসা থেকে ছোট একটা ট্রাভেল ব্যাগ নিয়ে এসেছিলেন তাতেই সব ধ'রে গেল। টয়লেট থেকে রেজর, শেভিং ফোম, বডিস্প্রে ও আন্ডারআর্মস ডিওডোরেন্ট সব কুড়িয়ে নিলেন। ব্যক্তিগত সহকারীকে বিশেষভাবে ব'লে যাবেন যেন টয়লেটটা পরিষ্কার করিয়ে রাখে।

হাতে আরো পনের মিনিট সময় আছে। তার প্ল্যান ছিল ঠিক আটটায় অফিস ছাড়বেন। এখনো পনের-ষোল মিনিট বাকি। তিনি প্ল্যান ধ'রে কাজ করতে স্বস্তি বোধ করেন।

একদম নিচের ড্রয়ারে কয়েক প্রস্থ এ-ফোর সাইজের কাগজের ওপর তিনি খুঁজে পেলেন সেই আংটিটি, যা তিনি চার বছর আগে হারিয়ে ফেলেছিলেন। পাথর বসানো রুপোর আংটি। জলরঙা একটি পাথর। খুব হালকা বেগুনি আভা আছে। অ্যামেথিস্ট। একবার ব্যাংকক গিয়েছিলেন। সেটা প্রায় বারো বছর আগের কথা। বেশিও হতে পারে। সেখানে ঘড়ির দোকানে মালিকের কন্যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

'তুমি এ দোকানে কাজ কর?' ইতস্তত ক'রে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি। কথাবার্তায় মেয়েটিকে শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট ব'লে মনে হচ্ছিল না।

মেয়েটি কেবল সুন্দরী তা-ই নয়, তার ইংরেজি চমৎকার। এক টুকরো সলজ্জ হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে সে বলেছিল, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আজ শনিবার। তাই দোকানটা একটু সামলাচ্ছি। বাবাকে বলেছি, তুমি আজ বিকালটা ঘরে থাকো। বিশ্রাম নাও।'

'বিষয় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য?'

'ঠিক ধরেছেন। আপনার অনুমান শক্তি প্রখর।' হাসলো মেয়েটি।

থাই মেয়েদের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। কিন্তু সেটা কী কারণে? সহসা ধরা যাচ্ছে না। ভেবে দেখতে হবে। মানুষের চেহারার মধ্যে ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা থাকে।

তিনি স্ত্রীর জন্য একটি ঘড়ি কিনেছিলেন ওই দোকান থেকে। প্রায় দশ হাজার বাথ। মেয়েটি বলেছিল, 'এটি ভালো ঘড়ি। থাইল্যান্ডে তৈরি কিন্তু ভেতরের আসল যন্ত্রটা, যাকে বলে 'ক্লক' মুভমেন্ট, খোদ সুইজারল্যান্ড থেকে আমদানি করা। আপনি নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। সব সময় হাতে পরার জন্য এর তুলনা হয় না। আমার হাতের দিকে দেখুন। একই ঘড়ি।' সে নিঃসংকোচে নিজের মণিবন্ধ থেকে ঘড়িটা খুলে এগিয়ে দিয়েছিল। তার নির্ভান অকপটতা মুগ্ধ করার মতো।

'সকাল থেকে যে দোকানেই যাচ্ছি টেলিভিশনের পর্দায় একজন সেনা অফিসারের বক্তৃতা দেখানো হচ্ছে। বুকে মেডালের পসরা দেখে মনে হয় সম্ভবত জেনারেল হবেন। কোনো বিশেষ উপলক্ষ আছে?'

সলজ্জ কণ্ঠে আলিশা বলেছিল, 'তেমন কিছু না। কাল মধ্য রাতে সেনাপ্রধান ক্যু ক'রে ক্ষমতা দখল করেছেন। জেনারেল সাহেব জনগণকে বলছেন, এতে জনগণের চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। দুর্জ্জনের শাসনের অবসান হয়েছে। তিনি রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ক'রে বলেছেন, সব আগের মতোই আছে। দু'বছরের মধ্যে নির্বাচন দিয়ে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে।'

'তোমাদের কাছে এটি বড় কোনো ঘটনা নয়?'

'ছোটবেলা থেকে আসছি ৩-৪ বছর পরপর এই নাটক হচ্ছে। অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'প্রধানমন্ত্রীকে মেরে ফেলা হয়েছে?'

'না। তিনি রাজপ্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছেন। বেঁচে গেছেন বলা যায়। মিলিটারি রাজপ্রাসাদ মাড়ায় না। এক সময় তাকে কোনো একটি দূর দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। বাকি জীবন হয়তো তিনি পানামায় সমুদ্রের পাশে সুন্দর একটি কটেজে কাটিয়ে দেবেন। অনেক টাকা কামিয়েছেন। টাকার অভাব নেই।'

'আমি কাছেই হোটেল অ্যাম্বাসেডারে থাকি। দোকানের কাজ শেষ হওয়ার পর ডিনার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

মেয়েটি লাজুক হাসি হেসে বলেছিল, 'আপত্তি নেই। নতুন কারো সঙ্গে পরিচয় করতে ভালো লাগে। কিন্তু রাতের ব্যাংককের প্রতি আকর্ষণ নেই আপনার?'

'আছে বৈকি। তবে বই পড়ে জেনে নেব। আজ রাতে একলা খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'সব সময় ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন বুঝি?'

'সেনাবাহিনীর একটি কোর্সে এসেছিলাম। গতকাল শেষ হয়েছে। আগামীকাল ফিরে যাব। ধরতে গেলে ব্যাংককের কিছুই দেখা হয়নি। আমি খুব ভ্রমণপিয়াসু না।'

'শহরের এক পাশে চাও ফ্রায়া নদীর ওপর ভাসমান রেস্তোরাঁ আছে। সে রকম কোনো রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে পারি। অসাধারণ পরিবেশ। আমি নিজেই মাঝে মাঝে যাই। আপনি সীফুড পছন্দ করেন তো?'

খাওয়ার টেবিলে মেয়েটি বললো, 'আমি হাত দেখা শিখেছি। আপনার ডান হাতটি দিন। দেখি।'

সে খুব যত্ন ক'রে হাত দেখল। এক সময় তার মুখ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল। সে বলল, 'আপনি ওয়াটার কালার একটি অ্যামেথিস্ট নিন। খুব কাজ হবে মনে করি না। তবু পরে দেখুন।'

'কত লাগতে পারে?'

'সহজলভ্য কোয়ার্জ। দাম বেশি হবে না। সুকুমভিতে খাঁটি পাথরের দোকান আছে আমার চাচার। ওখান থেকে কাল সকালে কিনে দিতে পারি। ঠকবার সুযোগ নেই। রুপার আংটিতে পাথরটা লাগিয়ে নিতে হবে।'

মাথা নাড়লেন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত।

'অনুমান করি আপনার কাছে ক্রেডিট কার্ড আছে।'

'তুমি বিশ্বাস কর পাথর ভাগ্য বদলে দিতে পারে?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আলিশা নিজের বাম হাত মেলে ধরেছিল। অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে একটি রুপায় বাঁধানো অ্যামেথ্যান্ড। গাঢ় সবুজ রঙের পান্না।

'পাথর কীভাবে মানুষের নিয়তি বদলে দেবে তা আমি বুঝতে অক্ষম।'

'আমিও কার্যকারণ সূত্রটা জানি না। কিন্তু পাথর যে কাজ ক'রে তা তো দেখি?'

'দেখ?'

'হ্যাঁ। হাতের রেখার ভাষা যেমন মিথ্যে নয়—পাথরের ক্ষমতাও মিথ্যে নয়।'

'আমার হাত দেখে তুমি খানিকটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলে।'

'আমি দেখতে পেয়েছিলাম একটা মেঘ এগিয়ে আসছে। যতই এগিয়ে আসছে ততই সেটি আরো কালো হয়ে যাচ্ছে।'

'এর অর্থ বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনার দাম্পত্য জীবনের রেখাটা বেশি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। ওটা অন্তত এক সেন্টিমিটার দীর্ঘ হওয়ার কথা। অর্ধেক হয়ে গিয়েছে।'

'তুমি কেন পান্না পরেছো?'

'আমি চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ ক'রে একটা ভালো দরের চাকরি না-পাওয়া পর্যন্ত বাবা বেঁচে থাকুন। আমি চাই আমার বিয়েতে বাবা উপস্থিত থাকুন।'

পরদিন সকালের দিকে আলিশা সিনাওয়াত্রা ব্রিগেডিয়ার শাফকাতকে একটি রুপায় বাঁধানো অ্যামেথিস্ট কিনে দিয়েছিল তার আত্মীয়ের দোকান থেকে। সেখান থেকে রেস্টুরেন্টে গিয়ে বার্গার খাওয়া। সেদিন রাতেই থাই এয়ারওয়েজে দেশে ফিরেছিলেন। আর কোনোদিন আলিশা সিনাওয়াত্রার সঙ্গে দেখা হয়নি। একসময় ব্যাংকক সফর, স্ত্রীর জন্য ঘড়ি কেনা, পাথর বাসানো আংটি কেনা, ভাসমান রেস্টুরেন্টে ডিনার করা সব ভুলে গিয়েছিলেন। নতুন স্মৃতির জায়গা ক'রে দিতে পুরনো স্মৃতিকে স্বেচ্ছানির্বাসনে যেতে হয়।

অধ্যায়-২

ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসেবে বিদেশে আসার এক বছর পর আমার স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করে। খবরটা আমি পেয়েছিলাম ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে আসা চিঠিতে। চিঠিটির ছবি তুলে আমি ওয়ান ড্রাইভে আপলোড করেছিলাম। চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে ট্র্যাশ বিনে ভ'রে দিয়েছিলাম। আর অনামিকার আংটিটি খুলে একবারে নিচের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। আংটিটি আমি পরে খুঁজেছি। কিন্তু কোথায় রেখেছি মনে পরেনি।

অ্যাভিনিউ সালোমে দীর্ঘ ও চওড়া। দু'পাশে প্রশস্ত ফুটপাথ। ছোট ট্র্যাভেল ব্যাগে খুচরো জিনিসগুলো ভ'রে গাড়ি-ড্রাইভার বিদায় ক'রে আমি স্যুটের ওপর হেভি জ্যাকেট চড়িয়ে বাসার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। এভিনিউ সালোমের দুই পাশে একটু পরপর সরু রাস্তা। সেগুলো পার হওয়ার সময় অভ্যাসবশত বাম দিকে তাকাচ্ছিলাম পাছে কোনো গাড়ি আচমকা বের হয়ে আসে। খুব ধীরগতিতে রাস্তার মধ্যখানে বসানো রেলের ওপর একটি ট্রাম চ'লে গেল ধীরগতিতে। এত ধীরগতি যে তার যেন আমাকে পার হয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। ট্রামের হৃদয়ে কষ্ট! ভেতরে হালকা আলো। যাত্রীতে ঠাসা। অনেকে দাঁড়ানো। অফিস শেষ ক'রে রেস্তোরাঁতে খেয়ে যারা ঘরে ফেরে তারা এ সময়টার ট্রামের নিয়মিত যাত্রী। হেভি জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে খারাপ লাগছে না। মাদ্রিদে 'যারা' থেকে কেনা জুতোটা হাঁটবার উপযোগী।

চৌরাস্তার মোড়টা ঝলমলে। বেশকিছু দোকানপাট ও মরোক্কান অথবা তিউনিসীয় রেস্তোরাঁ এখনো খোলা। চৌরাস্তা পার হয়ে কিছুদূর এগোতেই আবার অন্ধকার নেমে এলো। রাস্তার লাইট ঘন কুয়াশায় ম্লান। আশপাশের বাসাগুলোর অনেকগুলোর বাতি নিভে গেছে। সম্ভবত অনেক ভোরে উঠে ওরা কাজে যাবে।

একটা সরু রাস্তা বামে রেখে অগ্রসর হতে যাব এমন সময় হুটোপুটির শব্দ কানে এলো। থমকে দাঁড়িয়ে একটু পিছিয়ে এলাম। সরু রাস্তায় ধস্তাধস্তি চলছে ব'লে মনে হলো। রাগত কণ্ঠের শব্দ শুনে মনে হলো আক্রমণকারীরা চীনা। কাউকে ধোলাই দিচ্ছে।

পিস্তলটা সঙ্গে আছে? কোটের ভেতর বগলের কাছে ৯ মিলিমিটার বেরেটা-৯২-এর অস্তিত্ব পরখ ক'রে এগিয়ে গেলাম।

'থামো। মারপিট বন্ধ কর।' জোরে ধমক দিলাম একটা।

'ভাগো চুপচাপ', ব'লে মারপিট বন্ধ ক'রে আমার দিকে তেড়ে এলো একজন নাক-বোঁচা। বলল, 'নিজের রাস্তা মাপো মসিউ। ঝামেলা করো না।'

'ঝামেলা তো তোমরা করছো।' আমি আবার হেঁকে উঠলাম।

সে ঝট ক'রে চাকু বের করল একটা। বড়সড় সুইস নাইফ।

গলা নামিয়ে নিরীহ ক'রে বললাম, 'আমি ঝামেলায় যাওয়ার লোক না বাপু। শুধু শুধু ভয় দেখিও না। এ গলিতেই আমার বাসা। আরেকটু ভেতরে।' কথা না-বাড়িয়ে চাকুটা বন্ধ ক'রে জ্যাকেটের পকেটে চালান ক'রে দিয়ে সঙ্গীদের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

'জনাব আমাকে বাঁচান এদের হাত থেকে।' অদূরেই একটি ঝোপ থেকে কার আর্তনাদ শোনা গেল।

আমি থমকে গিয়ে 'শুভ রাত্রি মসিউ' ব'লে নাক-বোঁচার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

নাক-বোঁচা করমর্দনের জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিতেই সেটা শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে এমন এক মোচড় দিলাম যে সে দশ সেকেন্ড মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ল। নির্দয় একটা লাথি ছাড়লাম ওর কোমর বরাবর। তীব্র ব্যথায় সে চিৎকার ক'রে উঠল। বোঝা গেল মার খেতে অভ্যস্ত নয় আদৌ। আমার দিকে দৌড়ে এল আরো দুই নাক-বোঁচা। খোলা চাকু হাতে আমি পিস্তলটা উঁচিয়ে ধ'রে বললাম, 'গুলি খেতে না-চাইলে সঙ্গীকে নিয়ে বিদায় হও। আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব। এক...।'

কাজ হলো। মাটিতে পড়ে যাওয়া সঙ্গীকে তুলে নিয়ে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। দুই কদম এগিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশে পড়ে থাকা মানুষটিকে বললাম, 'বেরিয়ে আসুন এবার। আপদ বিদেয় হয়েছে।'

SBAC BANK

মেয়াদপূর্তিতে সুরক্ষা মিলিওনিয়ার স্কিম

১০ লাখ টাকার মালিক

৩ বছর মেয়াদে
মাসিক জমার পরিমান
৳ ২৩,১৮৯.০০

৫ বছর মেয়াদে
মাসিক জমার পরিমান
৳ ১২,৩১৭.০০

৭ বছর মেয়াদে
মাসিক জমার পরিমান
৳ ৭,৭৫৬.০০

১০ বছর মেয়াদে
মাসিক জমার পরিমান
৳ ৪,৪৫৯.০০

বিস্তারিত জানতে QR ক্যান করুন

ব্যাংকেই বীমা সুবিধা

দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে ৫ লাখ টাকা এবং
স্বাভাবিক মৃত্যুতে ৫০ হাজার টাকার ইনস্যুরেন্স কাভারেজ

মুনাফার হার ১২.০০%

24/7 16327

এসবিএসি ব্যাংক পিএলসি.

* সরকার বিধি মোতাবেক কর ও আবগারি শুল্ক কর্তনযোগ্য।
* মুনাফার হার বা মেয়াদ পরিবর্তিত হতে পারে।

SBAC.Bank.PLC www.sbacbank.com

29 YEARS OF ACHIEVEMENT

PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED

আমাদের সম্মানিত বীমাগ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, শুভানুধ্যায়ীসহ
সকলকে প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষ থেকে
জানাই পবিত্র "ঈদ-উল-ফিতর" এর শুভেচ্ছা

ঈদ মোবারক

PRIME INSURANCE COMPANY CELEBRATES

THE HIGHEST CREDIT RATING

(PRONOUNCED AS TRIPLE A)

IN BANGLADESH

AAA

www.prime-insurance.net

একি এও দেখি একটা নাক-বোঁচা!

'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছ? কিন্তু কেন?'

'আমি চীনা না, তিব্বতি। চীনা গুণ্ডাগুলো আমাকে শাসাচ্ছিল। কাল ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সামনে তিব্বতিদের বিক্ষোভ সমাবেশ। আমি যেন কৌশলে তা ভণ্ডুল ক'রে দিই এই তাদের দাবি। রাজি হইনি। আমি তিব্বতিদের নেতা।'

'যাক বেঁচে গেলে। থাকো কোথায়?'

'আমি এসেছি প্যারিস থেকে। উঠেছি গার দ্যু মিদিতে হোটেল। সেখান থেকে বের হয়ে সিটি সেন্টারে ঘুরতে গিয়েছিলাম। হোটেলে ফেরার সময় ওরা পিছু নিয়েছে। ট্রাম থেকে নামার পর ঘিরে ফেলে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনি না-এলে আজ আমার খবর ছিল। স্ট্রেচারে হাসপাতালে যেতে হতো।'

'অনেক মার খেয়েছ নাকি?'

সে দাঁত কেলিয়ে বলল, 'তা কিছুটা ঝেড়েছে বটে তবে হাসপাতালে যাওয়ার মতো নয়। আপনাকে ধন্যবাদ মসিউ। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বিক্ষোভ কাল বেলা তিনটায়। রু দ্য লা লোয়ায়— ইউরোপীয় কমিশনের সামনের চত্বরে। দয়া ক'রে আসবেন। আমাদের সমর্থন দেবেন। সমাবেশের জন্য পুলিশের অনুমতি নেয়া আছে। সমস্যা নেই।'

'সে সময় পাব না। আজই আমার শেষ রাত এ শহরে। কাল বিকেলে বিমানে চড়ব।'

'ভারতীয়।'

'তা বলা যায়।'

'আপনার ঘর-ফেরা শুভ হোক। আপনার সমবেদনা ও সাহসের কথা কখনো ভুলব না। পিস্তলটা কি চোরাইমাল?'

আমি হেসে বললাম, 'অতটা সাহস আমার নেই—লাইসেন্স করা জিনিস।'

'সরকারি লোক?'

'তা বলা যায়।'

'আপনার পছন্দ ভালো।'

'মনে হয় তুমি একটা পিস্তল চাও।'

'ধরেছেন ঠিক। নিরাপত্তার জন্য একটা পিস্তল বগলের নিচে থাকলে মন্দ হয় না। চীনারা খুব উৎপাত করে। আমি বৌদ্ধ। কাউকে আঘাত করার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ভয় দেখাতে পারলে সংঘাত এড়ানো যায়।'

'তোমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ আমি আগে দেখেছি। একটি কথা বলবে, এই যে তোমরা পঞ্চাশ-ষাটজন মিলে বিক্ষোভ কর, এতে কোনো কাজ হয়?'

'হুম। প্রশ্নটা ঠিক। কিন্তু ইউরোপে এর চেয়ে বড় আয়োজন সম্ভব নয়। সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু কোনো কাজ হয় না তা না। পত্রিকাতে খবর বের হয়। ফটো ছাপা হয়। মানুষ আমাদের কথা জানতে পারে। তিব্বতিদের সমস্যা নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে সেমিনার হয়। তারা চীনা সরকারের প্রতি তিব্বতিদের দাবি বিবেচনার জন্য আহ্বান জানায়। সেটা বড় অর্জন। এর চেয়েও বড় কথা হলো, ন্যায়ের দাবিতে অটল থাকা। চীনা সরকারের আচরণ বরদাশত করার মতো নয়। আমি কি চীনভক্ত?'

হেসে বললাম, 'না, আমি চীনভক্ত না। কিন্তু তোমার কথাটা মনে থাকবে: ন্যায়ের দাবিতে অটল থাকতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।'

তিব্বতী নেতা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'ম্যাক্সি বুকু। আপনার কথা কখনো ভুলব না। দুঃখের বিষয় কালই আপনি ইউরোপ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন।'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হই।

'কিছু না-মনে করলে আমাকে পরবর্তী ট্রাম স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিন।'

'তথাস্তু।'

আমি হাঁটা শুরু করি। আমার পেছনে তিব্বতি একজন তরুণ হেঁটে হেঁটে আসছে সে কথা দ্রুত ভুলে যাই।

অধ্যায়-৩

আমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ ছিল এ রকমটি বলা যাবে না। সে ডাক্তারি পাস ক'রে আর্মি মেডিকেল কোরে যোগ দিল। সে ছিল সার্জন। পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করার সময় আমি পা হড়কে অনেকটা নিচে পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যথা পেয়েছিলাম প্রচণ্ড। তবে হাড়-হাড্ডি ভাঙেনি। গোড়ালি, হাঁটু আর নিতম্বে ঢের চোট লেগেছিল। দু'তিনদিন কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালে ছিলাম। সেখানেই ক্যাপ্টেন ফাহমিদার সঙ্গে পরিচয়।

তাকে ভালো লেগেছিল। ওর চেহারায় একটা চটক ছিল যা এড়ানো কঠিন।

আমারও বিয়ের বয়স চলে যাচ্ছিল। পারিবারিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তারপর বিয়ে হয়ে গেল।

তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার অভাব ছিল না। কিন্তু সুন্দরী ডাক্তারদের দুটি সমস্যা। প্রথমত, ডাক্তার বলে অনেক পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিন পরিচয় হতে থাকে। এটি অনিবার্য।

দ্বিতীয়ত, সুন্দরীরা বিবাহিত হলেও পুরুষ মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও প্রেম নিবেদন করে। কেউ কেউ কেবল প্রেম নিবেদন করে তা-ই নয়, রীতিমতো লেগে থাকে। উপহার পাঠায়, চিঠি লেখে। সেসব চিঠির উত্তর আসে না। কিন্তু প্রেমাক্রান্ত পুরুষপ্রবর অক্লান্তভাবে চিঠি লিখে যায়। নানা বাহানায় মুখোমুখি দেখা করে। যারা দুঃসাহসী তারা সরাসরি প্রেম নিবেদন করে। বলে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।' মেজর আখতার পাশা সে রকম একজন।

'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না' কথাটি কোনো কাজের কথা নয়। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য দরকার কিছু খাওয়া ও পানি। যদি কিছুই না জোটে তবু একজন মানুষের মরতে দিন ষাটেক লাগে বলে শুনেছি। তবু মেয়েরা সম্ভবত এ কথাটি শুনে পুলকিত হয়। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এ কথাটি যথেষ্ট শক্তিশালী। অনেক কালাকুলো অফিসারকে দেখেছি এসব কথা ব'লে সুন্দরী মেয়েদের পটিয়ে-পাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ে ক'রে ফেলেছে।

মেজর আখতার পাশা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। আমার সঙ্গে ফাহমিদার বয়সের পার্থক্য ছিল নয়-দশ বছর। আমি যখন ব্রাসেলসে এলাম তার মাস ছয় আগে আখতার পাশা ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হয়েছে। তাকে আমি সামান্যই চিনতাম। মেজর আখতার পাশার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ফাহমিদা জামানের বয়সের পার্থক্য মাত্র দু'বছরের। —পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানুষ সমবয়সীদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

আমাকে বলা হতো সুপুরুষ। কিন্তু উজ্জ্বল শ্যামলা বর্ণের আখতার পাশা ছিল ৬ ফুট লম্বা, পেটা শরীর এবং তার মুখাবয়ব ছিল আকর্ষণীয়। জেদি ও একরোখা। কথা বলত জোরে। হাসত ছাদ ফাটিয়ে। নোংরা জোকস জানত ঢের। খুব সাহসী। কিছুই পরোয়া করত না। সুতরাং সে ফাহমিদার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সেখানেই সমস্যার সূত্রপাত। আমি কখনই বলব না ফাহমিদা স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে যাওয়ার মতো মেয়ে। কিন্তু মানুষের ভুল হয়। ওরও কোথাও ভুল হয়ে থাকবে। জীবনের গতিপথ বদলে দেয়ার জন্য একটি ভুলই যথেষ্ট।

সে যে আখতার পাশাকে বিয়ে করেছে তা জানতে আমার দুই বছর লেগেছিল। বিদেশে ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসেবে পোস্টিং হলে তিন বছর পর হোম লিভ পাওনা হয়। আমার যখন হোম লিভ পাওনা হলো তখন রাষ্ট্রদূত নিজেই এক মাসের হোম লিভে গেলেন। আমি গেলাম আরো ছয় মাস পর। তার আগে আমি জানতেও পারিনি। কেউ জানায়নি—সবাই ধ'রে নিয়েছিল আমি নিশ্চিতভাবে খবরাখবর রাখি। আমাকে তালাকের নোটিস পাঠানোর কয়েক মাস পর আদালত তালাকের সিদ্ধান্ত দেয়। কিছুদিন পরই বিয়েটা হয়ে যায়। তারপর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে চাকরিচ্যুত হয় দেশের সিকিউরিটি ফোর্সে কর্মরত চৌকস অফিসার মেজর আখতার পাশা। রাজনৈতিক কারণ ছিল। সে অন্য অনেকের মতো কানাডা চলে যায় প্রাণ বাঁচাতে। কিছুদিন পর চাকরি ছাড়ে ফাহমিদাও।

কখনো বিচ্ছেদ হ'তে পারে এ রকম ভেবে আমি ফাহমিদাকে বিয়ে করিনি। আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য যে আমাদের বৃহত্তর পরিবারে

কোনো ডিভোর্সের ঘটনা নেই। আমার কাজিনদের—ছেলে ও মেয়ে কাজিনদের—কাউকে ডিভোর্সের মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। এখনো না। আমরা তিন ভাই ও চার বোন। ফাহমিদার ডিভোর্সের নোটিস আসার আগপর্যন্ত আমরা সবাই সুখে-শান্তিতে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছিলাম।

আমাদের সমাজে স্বামী-পরিত্যক্তা শব্দটি খুব প্রচলিত। আর আমি হলাম স্ত্রী-পরিত্যক্ত পুরুষ। আমাকে নিয়ে আমার পরিবার, বন্ধুমহলে কৌতূহল ছিল : প্রথম প্রশ্ন কী এমন অপরাধ আমার যে ফাহমিদার মতো লক্ষ্মী মেয়ে আমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো? ফাহমিদাকে লক্ষ্মী মেয়ে মেনে নিতে আমি রাজি আছি। তার এমন কোনো খুঁত আমার নজরে পড়েনি যে আপনাদের কানে কানে বলা যায়। কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে এ কথা বললে আমার প্রতি অন্যায় করা হবে।

সবার দ্বিতীয় কৌতূহল হলো ক্যাপ্টেন ফাহমিদা আখতার পরিত্যাগ করার পর ব্রিগেডিয়ার শাফকাতের কেমন লেগেছিল?

তখন ব্রাসেলস আসার পর প্রায় দেড় বছর হয়ে গেছে। ব্রাসেলসে আমি একাই ছিলাম। মানুষ সহজে নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

ক্যান্টনমেন্টে কিছু রাজনৈতিক নেতাকে ধ'রে লুকিয়ে রাখা হতো। কখনো কখনো বেয়াড়া টাইপের সেনা কর্মকর্তাদের। ৪ ফুট বাই ৬ ফুট কুঠুরি, জানালা ব'লে কিছু নেই। ঘরের মধ্যেই পেশাব-পায়খানা করতে হয়। দিনে একবেলা কি দেড়বেলা খাবার দেয়া হয় ছোট জানালা খুলে : 'এবার বোঝো ঘুঘু, কত ধানে কত চাল।'

এ রকম অমানবিক পরিবেশেও মানুষ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে, কারণ মানুষ মেনে নিতে জানে। মানিয়ে নিতে জানে। মানুষ জানে বদ্ধ কুঠুরির দেয়ালে মাথা কুটে মরে গেলে লাভ নেই,—কিন্তু ভবিষ্যতে কোনো একদিন কেউ এসে দরজা খুলে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে পারে। এটা ঠিক আশা না : এক ধরনের আস্থা। ভবিষ্যতে পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার ওপর আস্থা। ভবিষ্যৎ অনন্ত এবং নানা বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য সম্ভাবনায় ভরপুর। তাই সে যেনতেনভাবে হলেও প্রাণ ধারণ ক'রে থাকে।

অনুমান করতে পারি কেউ কেউ ভাবছিল আমি আখতার পাশার কাছে পরাজিত হয়েছি। আবার কেউ ভাবছিল আমি ফাহমিদাকে ধ'রে রাখতে পারিনি। প্রথমটি একেবারেই সত্য নয়। পরাজিত হওয়ার প্রশ্ন আসে না কারণ আখতার পাশার সঙ্গে আমি কোনো প্রতিযোগিতায় নামিনি।

ফাহমিদাকে ধ'রে রাখতে পারিনি একথাও অর্ধসত্য। তালাকের দুই বছর আগে ফাহমিদাকে ঢাকায় রেখে দুই-তিন বছরের জন্য ব্রাসেলস চলে আসতে হয়েছিল আমাকে। সেই দূরত্বটা একটা ফ্যাক্টর ছিল। শত্রু এবং বন্ধু দুজনকেই কাছে রাখতে হয়।

আমার পরিবারের কৌতূহল ছিল অন্যরকম। তারা আমার বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নিয়েছিল—হয়তো দুঃখিত হয়েছিল—কিন্তু তাদের প্রত্যাশা ছিল আমি বিয়ে ক'রে নতুন ক'রে সংসার শুরু করি। আমাকে যদি তিন কি সাড়ে তিন বছরের মাথায় দেশে ফিরিয়ে আনা হতো তাহলে হয়তো কিছু একটা সম্ভাবনা ছিল। আমাকে ছয় বছর তিন মাস রু জাঁক জর্দানসে রেখে দেয়া হলো। মাঝে মাঝে মনে হতো সেনা সদর আমাকে বিস্মৃত হয়েছে। তাদের খাতা থেকে আমার নাম কেটে দিয়েছে।

আমি দেশে ফিরব, মেজর জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি পাব এ রকম একটি ভাবনাই মাথায় বেশি ঘুরপাক খেত। আমি যে ব্যচেলর, একটি বিয়ে ক'রে সংসার করতে পারি সে কথা একসময় আমি পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম। সেনাবাহিনীর ডিসিপ্লিনড লাইফ আমাকে দিয়েছিল সুস্বাস্থ্য। ব্রাসেলসের চাকরিজীবন ছিল নির্ভার। আমাকে সৈনিক থেকে বাধ্যগত সেনাকর্মকর্তায় পরিণত করেছিল। সবকিছু ছকে বাঁধা। নিশ্চিন্ত। রাষ্ট্রদূতরা কখনো মিলিটারি অ্যাটাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ খাটাতে চায়। আমাকে সে রকম দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হয়নি। দূতাবাস একটা ছোট অফিস। জনা দশেক ডিপ্লোম্যাট, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ড্রাইভার, পিওন সব মিলিয়ে মাত্র আঠাশ জনের অফিস। টের পেতাম সেখানেও আছে দলবাজি, খুচরা দুর্নীতি আর কী ক'রে গোপনে ইমিগ্রেশন ভিসা পাওয়া যায় তার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা। কিন্তু এসব আমাকে স্পর্শ করত না। আর্মি চিফ নিয়ম ক'রে আমাকে ফোন করেন—এ বিষয়টি সবার মনে আমার প্রতি সমীহের ভাব গড়ে তুলেছিল।

ছেলেবেলা থেকেই বই পড়ার অভ্যাস ছিল। এখানে সিটি সেন্টারে 'ওয়াটারস্টোন' নামের বইয়ের দোকানে নানা ভাষার মর্ডান ক্ল্যাসিকের ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যেত। সপ্তাহে পাঁচ থেকে কুড়ি ইউরো বরাদ্দ রাখতাম আমি বই কেনার জন্য। তবে একটির বেশি বই আমি কিনতাম না। নতুন কেনা বইটি পড়ে শেষ না-করা পর্যন্ত আরেকটি বই কিনতাম না। সেদিন পাঁচটি কার্টনে শ' দুই বই পাঠিয়েছি কনটেইনারে।

ধরতে গেলে এক ধরনের নিস্তরঙ্গ জীবনের কাঠামোতে আমি বেশ মসৃণভাবেই বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। দুঃখ, কষ্ট, মনোযাতনা ইত্যাদি বিবর্জিত একটা জীবন—কোনো আশা ছিল না, হতাশাও ছিল। কোনো সংগ্রাম ছিল না, ব্যর্থতাও ছিল না। এক সময় খেয়াল করলাম সারা দিনে আমি খুব কম কথা বলি। আসলে আমাকে কথা বলার মতো পরিবেশে যেতেই হতো না। কম কথা বলা, মুখ খুলতে হলে ধীরে ধীরে গুছিয়ে কথা বলা, জোরে না-হেসে মুচকি হাসা, কেউ কোনো প্রস্তাব দিলে বা অনুরোধ করলে তৎক্ষণাৎ রাজি না-হয়ে যাওয়া—এ রকম নানা ভালো অভ্যাস গড়ে উঠছিল।

মানুষ স্বপ্ন দেখে : ঘুমের মধ্যে কেউ স্বপ্ন দেখে, কেউ দুঃস্বপ্ন। একদিন খেয়াল করলাম আমি বহুদিন স্বপ্ন দেখি না। কার্যত আমি স্বপ্ন দেখা ভুলে গেছি। তারপর আর একদিন মনে হলো আমি যে বিবাহিত জীবনযাপন করেছি, ফাহমিদার সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছি, ওর নগ্ন শরীর স্পর্শ করেছি, ছুটির দিনে বাথরুমে একসঙ্গে স্নান করেছি তাও ভুলে গেছি। আমি শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ, খাওয়া ও টয়লেট, অফিসে যাওয়া-আসা, সন্ধ্যায় বা রাতে খানিকটা হাঁটা-চলা করা ছাড়া সবকিছু ধীরে ধীরে ভুলে গেছিলাম। সকাল নয়টা থেকে চারটা পর্যন্ত অফিসে ব্যস্ততার মধ্যে সময় কেটেছে। কোনোদিন ডিসেন্ট্রি হয়নি, ফ্লু হয়নি, আমাকে হঠাৎ ক'রে অসুস্থ হয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরে আসতে হয়নি কোনোদিন। এমন মসৃণ একটি জীবন। পাখিদের জীবন এ রকম মসৃণ হয় নাকি?

অধ্যায়-৪

অফিস থেকে হেঁটে আসতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। বাসার সামনে রাষ্ট্রদূতের পতাকা টানানো গাড়ি দেখে খুব একটা অবাক হলাম না। অবসর গ্রহণের দিনে আজ তার সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নেয়ার কথা। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ তিনি অফিসে আসছেন না। ভেবেছিলাম অসুস্থ। অন্তত তার পিয়ন সে রকমই বলেছিল। আজ ভিন্ন কথা শোনা গেল। তিনি বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হতে চাইছেন না। আমিও মনে করি অপ্রীতিকর বিষয় যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো। তাকে সাতদিনের মধ্যে পদত্যাগের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। তাকে কেন পদত্যাগ করতে হবে বোঝা গেল না। তার চাকরি আছে দু'বছর। তিন মাস আগে পরিণত বয়সে তিনি প্রথম বারের মতো রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রথম বারের মতো অফিস প্রধান। নিরীহ মানুষ হলেও বুদ্ধিমান টাইপের। কোনো প্রয়োজন হলে তার অফিসে আমাকে না-ডেকে তিনিই আমার অফিসে চলে আসতেন।

খায়রুজ্জামান বললেন, 'এয়ারপোর্টে গিয়ে সি-অফ করার প্ল্যান ছিল। সেটা সম্ভব হচ্ছে না—কিছু মনে করবেন না। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে বাসা থেকে কাজ করছি। আপনি কি বিশেষ কোনো খবর রাখেন? এ রকম রক্তপাত ১৯৭১-এর পর আর হয়নি ঢাকা শহরে।'

'বিশেষ কিছু জানি না। আজ আমার কোর্সমেট মেজর জেনারেল খায়রুল বাশার ফোন করেছিলেন। শুধু জানতে চাইলেন আমি সময়মতো অবসর নিচ্ছি নাকি চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।'

'শুনেছি সামরিক অভ্যুত্থানের আয়োজন চলছে। একজন কর্নেল নেতৃত্ব নেবেন।'

'ও রকম খবর শুনিনি। আপনার খবর সত্য হলেও ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোন ক'রে খবরটা কেউ আমাকে দেবে না। ফোনের সব কথাবার্তা মনিটরিং করা হয়।'

খায়রুজ্জামান একটি খাম নিয়ে এসেছিলেন। খাম খুলে দুটি ফটো বের করলেন।

www.sjblbd.com

মুদারাবা মাসিক আমানত প্রকল্প

প্রতি মাসে স্বল্প সঞ্চয় এক সাথে অনেক টাকা দেবে নিশ্চয়

প্রতি মাসে ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার যে-কোনো পরিমাণ টাকা জমা করে বিভিন্ন মেয়াদে অর্জন করুন এককালীন বৃহৎ অংকের অর্থ (প্রাক্কালীন)

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

আন্তরিক সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ঈদে চাই
নতুন আকর্ষন
FANTASY KINGDOM
FANTASY KINGDOM
THEME PARK
CONCORD
ঈদের পরবর্তী ১০ দিন পর্যন্ত থাকছে
DANCE WITH
DJ
@
WATER KINGDOM
01969910100
* শর্ত প্রযোজ্য * ভ্যাটসহ * বাইরের খাবার সঙ্গে আনবেন না
www.fantasykingdom.net
Fantasy Kingdom Complex
CONCORD

'দেখুন তো ফটো দুটি।'

আমি চুপচাপ ফটো দুটি হাতে নিলাম। একজন নারীর পোর্ট্রেট টাইপের ছবি। আজকাল মেয়েরা যা করে বিউটি পার্লারে গিয়ে পুরোদস্তর মেকআপ নিয়ে তোলা ছবি। চোখের কাছে ফাউন্ডেশন পুরু হয়ে যাওয়ায় চোখটা স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে। বয়স পঁয়ত্রিশের ওপর হবে। খুব একটা সুন্দরী বলা যাবে না। তবে চেহারায় মায়া আছে। দ্বিতীয় ফটোটিতে তাকে বেটার দেখাচ্ছে। নিজের অফিসে ব'সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। একটু পাশ থেকে তোলা। বোঝা যাচ্ছে তিনি কেশবতী।

ফটো দু'টি আমি টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। কার ফটো, কেন তিনি নিয়ে এসেছেন কিছুই জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। তিনি সবই বলবেন। বলার জন্যই এত রাতে এসছেন। আমাকে ধৈর্য ধ'রে শুনতে হবে।

'মেয়েটি আমার ভাগ্নী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স-মাস্টার্স ক'রে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছে। তারপর কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে কানাডা গিয়ে পিএইচডি করেছে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে। ভ্যাঙ্কুবারে একটি স্কুলে চাকরি করছে। হাইস্কুলে ইংরেজি পড়ায়। নানা পরিবেশগত কারণে বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেলেও বিয়ে হয়নি। এখন একচল্লিশ চলছে।

'আগামী মাসের দশ তারিখে দেশে আসবে। অনেক দিন আসেনি। এবার দু'মাস থাকবে। আমার বোন থাকেন ধানমন্ডি ২৬ নম্বরে। ও বাসাতেই থাকবে।'

'পাপিয়া কি এত দিনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?'

রাষ্ট্রদূত চমকে গেলেন, 'আপনি চেনেন ওকে?'

হেসে বললাম, 'চিনি বললে ভুল হবে। তবে আপনি ব্রাসেলস আসার আগে ভ্যাঙ্কুবারে গিয়েছিলেন। ভাগ্নীর বাসায় ছিলেন। এসব গল্প করেছিলেন। ভাগ্নীর নাম বলেছিলে পাপিয়া সে কথা মনে আছে। তার পিএইচডি থিসিস সম্ভবত বই আকারে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাই না?'

রাষ্ট্রদূত প্রীত মুখে মাথা দোলালেন। বললেন, 'আপনার স্মরণ শক্তির পরিচয় পেয়ে চমকৃত হয়েছি।'

আমি বললাম, 'আমার বয়স আগামীকাল ষাট হবে। এ বয়সে বিয়ে করা কি ঠিক হবে? বিয়ের একটা প্র্যাকটিক্যাল দিক আছে। বিয়ের কথা আমি ভাবিনি। ভাবা যেতে পারে। যাই হোক আপনার বোনের ফোন নম্বর দিন। আমি ঢাকায় পৌঁছে যোগাযোগ করব।'

খায়রুজ্জামান মনে হয় কিছুটা হতভম্ব হয়েছে। সে কিছুক্ষণ স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। যে খামের ভেতরে সে ফটো দুটি নিয়ে এসেছিল তার ওপরেই লেখা :

ড. কামরুন্নাহার পাপিয়া
প্রযত্নে : মিসেস ফাতেমাতুজ্জোহরা
রোড নম্বর : ২৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

তিনি খামটি এগিয়ে দিলেন। আমি ফটো দুটি ফিরিয়ে দিলাম : 'ফটো লাগবে না। ঠিকানা যথেষ্ট। আমি পাপিয়ার সঙ্গে দেখা করব। তার পিএইচডি থিসিস নিয়ে কথা বলার অনেক কিছু আছে। বিয়েশাদির বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না।'

'খুব ভালো মেয়ে পাপিয়া। ওর চেহারায় এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে না। ওকে আপনার পছন্দ হবে।'

একটু থেমে রাষ্ট্রদূত বললেন, 'দেশে কিছু হলে কে দায়িত্ব নেবে বোঝা যাচ্ছে না। খুব একটা অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। আজও যাত্রাবাড়ীর কাছে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। আগে ছিল ছাত্রদের আন্দোলন। এখন মনে হচ্ছে এটা গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। আন্দোলনটা সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। দুটি পুলিশ স্টেশনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কয়েকটি থানা আক্রমণ ক'রে অস্ত্রপাতি লুট করা হয়েছে। এ আন্দোলন সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। আরেকটি আরব বসন্ত।'

'দুঃখজনক অবস্থা। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। পরিণতিতে কী দেখতে পাব আন্দাজ করা কঠিন।'

'দেশে পৌঁছে একটি ফোন দেবেন। যোগাযোগ রাখবেন।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'আপনি এত দিন বিয়ে করার কথা ভাবেননি?' খায়রুজ্জামানের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়।

'সবাই বলে একা থাকা খুব যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা। কিন্তু গত ছয় বছর একা থাকতে থাকতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আপনি মাথার ভেতর বিয়ের কথা ঢুকিয়ে দিলেন। দেশে ফিরে ভাবব। দেশে তো সবাই বাদশাহী পরিবেশে থাকে। রান্না করার জন্য বুয়া, ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য কাজের ছেলে, কেয়ারটেকার, ড্রাইভার, গেটে সিকিউরিটি গার্ড, প্রতি শুক্র কি শনিবারে দাওয়াত—বার্থডে, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, গেট টুগেদার, শীতে পিকনিক। সব মিলিয়ে জমজমাট অবস্থা। মনে হয় না দেশে নিঃসঙ্গ অনুভব করব।'

'সিনিয়র আর্মি অফিসাররা প্রায় সবাই চাকরি পেয়ে যান। বিভিন্ন কোম্পানিতে তারাই হেড অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের তারা কোনো না কোনো প্রকল্পে কাজ করেছেন কনসালট্যান্ট হিসেবে। একজন রাষ্ট্রদূত কোরীয় ইপিজেডের প্রধান নির্বাহী। আপনিও নিশ্চয় কোনো কাজ পেয়ে যাবেন।'

'পেনশন, গ্র্যাচুইটি এসবের কাজ শেষ ক'রে হাইবারনেশনে যাব। ঘুম ভেঙে দেখব কী করা যায়। এয়ারফোর্স কক্সবাজারে একটি পাঁচতারা হোটেল বানিয়েছে। ওটার জেনারেল ম্যানেজারের চাকরিটা পেলে মন্দ হতো না। টাকা-পয়সা থাকা-খাওয়া সব ঝামেলা এক ঢিলে শেষ।' আমি একটু হাসলাম।

'যোগাযোগ করেছেন?' রাষ্ট্রদূতের কণ্ঠে আন্তরিকতার ছাপ। তিনি আমাকে পাপিয়ার হবু স্বামী হিসেবে দেখতে শুরু করেছেন।

'একেবারেই না। কাল বিকালে আমার ফ্লাইট, আপাতত সে কথাই ভাবছি।'

'শুনেছি দেশে ফেরার আগে মস্কোতে পাঁচদিন থাকবেন।'

'সাতদিন। কোনো কাজ নেই। এমনি একটা শহর দেখে গেলাম। আপনি মস্কো গেছেন নিশ্চয়।'

'কোনো সমস্যা হলে কি প্রয়োজন হলে মস্কোতে আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলব। হেড অব চ্যান্সেরি আমার স্ত্রীর কাজিন। ওর নম্বরটা দিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে ফোন ক'রে দেব। থাকার ব্যবস্থা কী?'

'অনলাইনে হোটেল রুম রিজার্ভ করেছি।'

'ওকে বলব এয়ারপোর্টে আপনাকে রিসিভ ক'রে হোটেলে পৌঁছে দিতে।'

'একেবারেই না। প্রয়োজনে আমি যোগাযোগ করব। ওর নাম যেন কী? ভাবি একবার বলেছিলেন মনে পড়ছে। ফোন নম্বর দিন। তাতেই চলবে।'

রাষ্ট্রদূত খায়রুজ্জামান চলে যাওয়ার পর ড. কামরুন্নাহার পাপিয়ার ঠিকানা লেখা নামটা ট্রাভেল ব্যাগে রেখে দিলাম। মস্কো দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সেরি জামালুদ্দিনের ফোন নম্বর আমার ফোনে তুলে রাখলাম। কাজে লাগতে পারে।

অধ্যায়-৫

তিন-চারদিন আগে ড্রাইভারকে নিয়ে ওয়াটারস্টোনে গিয়েছিলাম। কয়েক মাস আগে শুনেছিলাম গার্সিয়া মার্কেসের উপন্যাস 'এই তো এই আগস্টে' প্রকাশ করা হয়েছে। অসমাপ্ত উপন্যাস। শেষ প্রকাশিত উপন্যাস। কিনি কিনি ক'রে কেনা হয়নি। অনলাইনে অর্ডার ক'রে বই কেনায় মজা নেই। নতুন বই হাতে নিয়ে, গন্ধ শুঁকে, ব্লার্ব দেখে, দুয়েক পাতা পড়ে কেনার স্বাদই আলাদা। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ছোট উপন্যাসটি পড়া শুরু ক'রে দিলাম। মনে করেছিলাম দু'পাতা পড়েই ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে একটা সাসপেন্স ছিল। প্রথম অধ্যায় শেষ না-ক'রে ঘুমোতে যেতে পারলাম না।

প্রথম অধ্যায়ে কাহিনী শুরু হয়েছে ১৬ আগস্ট, বেলা ২টায়। অধ্যায়টি শেষ হয়েছে অপ্রত্যাশিত একটি মোচড় খেয়ে। এ মোচড়টাই আসল। যতটুকু পড়েছি তার কাহিনীটি আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করা যায় :

কলম্বিয়ার একটি দ্বীপের ফেরিঘাটে স্টিমার আসিয়া ভিড়িয়াছে। কাহিনীর মূল চরিত্র অ্যানা মাগদালেনা এই স্টিমারের যাত্রী। তাহার বয়স বায়ান্ন হইয়াছে। কুড়ি বৎসর পূর্বে লেখাপড়ার পাট চুকাইয়া

ফেলিবার আগেই যখন তাহার বিবাহ হইয়াছিল তখনো সে কাহারো প্রেমে পড়ে নাই; তদাবধি সে অক্ষতযোনী—পাকেচক্রে কাহারো অঙ্কশায়িনী হইয়া সতীত্ব বিসর্জনের অঘটন ঘটে নাই। তাহার কুড়ি বছরের বৈবাহিক জীবন তৃপ্তিতে ভরপুর। তাহার পিতা সংগীতের শিক্ষক, মাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মৃত্যুর দিন তিনেক আগে মা বলিয়াছিলেন তাহাকে যেন কলম্বিয়া সাগরের নির্দিষ্ট একটি দ্বীপে সমাধিস্থ করা হয়। অ্যানার পিতা স্ত্রীর এই শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নাই। তবে যেই দিন মরদেহ সমাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ওই দ্বীপে লইয়া যাওয়া হয় সেই দিন অ্যানাকে সঙ্গে লওয়া হয় নাই পাছে সে তীব্র শোকে ভাঙিয়া পড়ে। তবে মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতে পিতা কন্যাকে সঙ্গে লইলেন। যন্ত্রচালিত ডিঙ্গি নৌকা আথাল-পাথাল সমুদ্রে চার ঘণ্টা আছড়াইতে আছড়াইতে পিতা-কন্যাকে ওই দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিল, সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। পিতা-কন্যার যৌথ উদ্যোগে অ্যানার মায়ের সমাধিতে নামফলক গাঁথা হইল। অনন্তের প্রতি বৎসর মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে এক তোড়া পুষ্পস্তবক লইয়া ভালোবাসা জানাইতে পরলোকগত মায়ের সমাধিতে আসিতে সে কদ্যপি ইতস্তত করে নাই। আগস্ট একই সঙ্গে অত্যধিক গরম ও ভারী বর্ষণের মাস। তথাপি সমুদ্র পাড়ি দিয়া এই দ্বীপে সে আসিত একাই। এমনকি বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইবার সময়ই সে হবু স্বামীর নিকট খোলাসা করিয়া লইয়াছিল যে প্রতি বৎসর ওই দ্বীপে গিয়া মায়ের কবরে সে একাই পুষ্পস্তবক অর্পণ করিবে; ইহা তাহার একান্তই নিজস্ব বিষয়।

ঊনত্রিশ বৎসর আগে মাতার তিরোধান হইয়াছে, আঠাশ বৎসর যাবৎ সে ব্যত্যয়হীন নিষ্ঠায় এই স্বআরোপিত কর্তব্যটি করিয়া চলিয়াছে। অপরাহ্নে ফেরি আসিয়া তাহাকে দ্বীপে পৌঁছাইয়া দেয়, ফেরিঘাটে এক গাল হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করে দীর্ঘদিনের পরিচিত ট্যাক্সিচালক, সে ওঠে এলাকার সবচেয়ে প্রাচীন জীর্ণদশা হোটেলটিতে যাহা তাহাকে ঠিক মানায় না। আঠাশ বৎসর হইতে সে একই হোটেলে উঠিয়াছে, রাত্রিবাসের জন্য একই কক্ষ বাছিয়া লইয়াছে: হোটেল হইতে পুনরায় ট্যাক্সিতে সমাধিস্থলের দিকে যাত্রা, পথে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার নিকট হইতে পুষ্পস্তবক ক্রয়। বিকাল পাঁচটার আগেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীর্ণ-করুণ সমাধিস্থলে পৌঁছাইয়া ঘাস-জঙ্গল সরাইয়া মায়ের কবরটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। গ্ল্যাডিওলাসের স্তবকটি মাতার পাদদেশে অর্পণ করিয়া সে নিঃশব্দে কথোপকথন শুরু করে: মাকে সংসারের খবরাদি দেয়, গোপন বিষয়াদিও অকপটে চাউর করে এবং কোনো পরামর্শ থাকিলে স্বপ্নে আসিয়া জানান দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করে। অতঃপর হোটেল প্রত্যাবর্তন এবং পরবর্তী দিন সকাল নয়টা অবধি ফিরতি ফেরির জন্য অপেক্ষা।

এই একইভাবে সাতাশটি বৎসর গিয়াছে; এই বার আঠাশ দফায় ১৬ আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্যতিক্রম ঘটিতে শুরু করিল। হোটেলে নিজস্ব বারে একাকী টেবিলে রাতের আহারাদি সারিতে সরিতে সে লক্ষ্য করিল অন্য একটি টেবিলে বসা একজন মধ্যবয়সী পুরুষ তাহার দিকে এক পলকে তাকাইয়া রহিয়াছে। অতঃপর যাহা হইবার তাহাই হইল। ওই ভদ্রলোকের সহিত অবিলম্বে পরিচয় হইল এবং অ্যানা মাগদালেনা অল্প সময়ে তাহার ঘনিষ্ঠ হইয়া গেল। আগন্তুক পুরুষটি এই হোটেলের বাসিন্দা নহে। অতএব হোটেলের তৃতীয় তলার অ্যানা মাগদালেনার ২০৩ নম্বর কক্ষেই অন্তরঙ্গ সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হইল। প্রথমে কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিল অ্যানা মাগদালেনা, কিছুক্ষণ পর আগন্তুক ভদ্রলোক। ইত্যবসরে অ্যানা দ্রুত পোশাক ছাড়িয়া, স্নানাগারে গিয়া পায়ের আঙুল, বগল ও যোনীদেশ ধৌত করিয়া, হালকা প্রসাধন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। পোশাক ছাড়িবার শেষ পর্যায়ে ভদ্রলোক যখন আন্ডারপ্যান্ট খুলিতেছেন তখন অ্যানা আড়চোখে ঘরের আবছা আলোয় নির্ভুল লক্ষ্য করিল ওইটি তাহার স্বামীর মতো ততটা বড়সড় নহে। মধ্যরাতের নিঃস্তব্ধতা ভাঙিয়া সারসগুলির সজোর পাখা ঝাপটানো ভদ্রলোকের অপরিচিত, অ্যানা সমুদ্রসারসের এই জন্মগত অভ্যাসটি ব্যাখ্যা করিয়া দিল। প্রথম মিলনের পর দ্বিতীয় মিলন ছিল অনিবার্য। অ্যানা ভাবিয়া অবাক হইল কী অল্প সময়ে পুরুষ মানুষটি কয়েকটি মাত্র অঙ্গুলির ক্ষীপ্র দক্ষতায় তাহার দেহে পুনর্বার উত্তেজনার বান ডাকিয়া আনিয়াছে। বাহিরেও তখন ঝড়, আকাশ ঘিরিয়া বিদ্যুতের চমকানি। কিছু কথাবার্তা, এক সময় শ্রান্ত ভদ্রলোক নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন, তাহার নাক ডাকিবার শব্দ যুগপৎ পরিশ্রম ও পরিতৃপ্তির জানান দিতে থাকিল।

প্রদোষের আধো-অন্ধকারে যখন অ্যানার ঘুম ভাঙিল তখন সে সারা জীবনের সতীত্ব বিসর্জন দিয়া পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে এই চিন্তা উদয় হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ কাতর করিয়া ফেলিল। কিন্তু তিনি কোথায়? অ্যানা শয্যায় একা, তাহার রাতের সঙ্গী ইতোমধ্যে প্রস্থান করিয়াছে। অথচ ভদ্রলোকের নামটি পর্যন্ত জানা হয় নাই। রাত্রির স্মৃতি বলিতে ভদ্রলোকের ব্যবহৃত ল্যাভেণ্ডারের মৃদু গন্ধ ঘরের বাতাসে তখনো জীয়মান। কিছুক্ষণ পর ফিরতি যাত্রার প্রস্তুতিকালে যখন সে খাটের মাথার কাছে রাখা বইটি স্যুটকেসে ভরিতে গেল তখন দেখিল ভদ্রলোক কুড়ি ডলারের একখানা নোট রাখিয়া গিয়াছেন। ওইদিন ফেরিতে করিয়া যে অ্যানা মাগদালেনা প্রত্যাবর্তন করিল সে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ।

অ্যানা মাগদালেনা যে ভিন্ন মানুষ হিসেবে ঘরে ফিরলেন এটা অনুমান করা কঠিন না। মায়ের কবর জিয়ারত করতে গিয়ে একজন সতীসাধ্বী মানুষ হয়ে গেলেন দেহপসারিনী! তাও নিজের ইচ্ছেতে! নিজের ভুলে। তার কেবলই মনে হবে এই বুঝি ধরা পড়ে গেলেন স্বামীর কাছে। এই শঙ্কায় ভুগতে ভুগতে তিনি হয়তো সত্যই একদিন ধরা পড়ে যাবে। হয়তো স্বামীর কাছে সব স্বীকার না-করা পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। হয়তো কোনো বান্ধবীর কাছে ঘটনা খুলে বলবেন নির্ভার হওয়ার জন্য। কিংবা কন্যার কাছে।

দেখা যাক গার্সিয়া মার্কেসের হাতে ঘটনা কোন দিকে মোড় নেয়। আগামীকাল বিমানযাত্রায় আবার পড়ব এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত অনেক হয়েছিল। খুব দ্রুত ঘুম এসে গেল।

অধ্যায়-৬

সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। সেনা সদর দপ্তরের ফোন। চিফের প্রধান ব্যক্তিগত সহকারী ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার জানালেন চিফ কথা বলবেন, আমি যেন ফোন কাছে রাখি। আমি বললাম, সবে সাতটা বাজে। এখনো বিছানায়। পনের-কুড়ি মিনিট সময় দরকার টয়লেট থেকে ঘুরে আসার জন্য।

'ঠিক আছে স্যার। কোনো সমস্যা না।'

কিডনিতে কোনো সমস্যা হয়েছে মনে হয়। ছয় ঘণ্টার বেশি প্রস্রাব ধ'রে রাখতে পারছি না। ঘুমাতে যাওয়ার আগে দু'ঢোক পানি খেয়ে নেয়া দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এখন পানি না-খেয়ে ঘুমাতে যাচ্ছি। অন্তত ছ'ঘণ্টা টানা ঘুম না-হলে শরীরটা জুতসই থাকে না।

চিফ আমার কোর্সমেট ছিলেন। আন্তরিক গলায় বললেন, 'দেশে ঝামেলা চলছে। তুমি আরো কিছুদিন ব্রাসেলসে থাকো।'

আমি হেসে বললাম, 'স্যার, ছ'বছর যাবৎ ডিফেন্স অ্যাটাশে। ঠিক ক'রে গুনলে ছ'বছর তিন মাস। সেটা বড় কথা না—চাকরি হলো চাকরি।'

'অন্তত আর ছ'টা মাস থাকো।'

'ব্রিগেডিয়ার করিম আজিজ আজ-কালই চ'লে আসবেন। গত সপ্তাহে তার সঙ্গে কথা হয়েছিল। এক পদে দু'জন?'

'তার মুভমেন্ট অর্ডারটা এখনই বাতিল ক'রে দিচ্ছি।'

'বস, হেমন্ত চলছে। শীতের ঘণ্টা বাজছে। গত রাতে খুব ভালো ঘুম হলো। ঠাণ্ডার মধ্যে আমার ঘুম ভালো হয়। মাসখানেকের মধ্যে তুষারপাত শুরু হবে। ঘন তুষারের সঙ্গে বৃষ্টি। ওভারকোট আর লম্বা গামবুট পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো খুবই রোমাঞ্চকর বিষয়। থাকতে পারলে ভালোই লাগত।'

'আচ্ছা, শীত আসুক, তুষারপাত হোক, তুমি ওভারকোট আর লম্বা গামবুট পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও। তুমি তাহলে ব্রাসেলসেই থাকছো আপাতত।'

'আজ সন্ধ্যায় আমার ফ্লাইট। আমি মস্কো হয়ে দেশে ফিরব। তিন মাস লম্বা ঘুম দিয়ে বিয়ে করব। ছ'বছরে আশপাশের নানা দেশে নানা শহরে গিয়েছি। মস্কো যাওয়া হয়নি। মস্কো হয়ে দেশে ফেরার টিকিট করেছি।'

'টিকেট ক্যান্সেল কর। তিন মাস পর বিয়ে না-ক'রে ছ'মাস পরে করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাব না। শোনো আর বেশিক্ষণ গফসফ করতে পারব না। সামরিক উপদেষ্টা আসবেন। জরুরি সভা আছে। কত জরুরি তোমাকে বোঝাতে পারছি না। তাহলে ব্রিগেডিয়ার

প্রিমিয়ার ব্যাংক
সেবাই প্রথম

প্রিয়জনের সাথে ইফতারের
আনন্দ এখন বহুগুণ

আপনার প্রিয়জনের সাথে পবিত্র রমজানের ইফতারের আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে শহরের ২০টির-ও বেশি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে প্রিমিয়ার ব্যাংক কার্ড দিয়ে পেমেন্টে উপভোগ করুন সর্বোচ্চ BUY1 GET3 ফ্রি অফার

RENAISSANCE DHAKA GULSHAN HOTEL	INTERCONTINENTAL DHAKA	LE MERIDIEN Dhaka	Holiday Inn AN IHG HOTEL DHAKA CITY CENTRE	CROWNE PLAZA AN IHG HOTEL DHAKA GULSHAN	Amari DHAKA
BUY1 GET2	BUY1 GET1	BUY1 GET1	BUY1 GET1	BUY1 GET2	BUY1 GET3
RS: 01704112647	RS: 01755538499	RS: 01966660091	RS: 01324717016	RS: 01966662141	RS: 01755521522
DHAKA REGENCY HOTEL & RESORT ★★★★★	SIX SEASONS	HOTEL BENGAL BLUEBERRY	Platinum Residence	THE RAINTREE DHAKA	PEARL HOTEL
BUY1 GET1	BUY1 GET3	BUY1 GET2	BUY1 GET2	BUY1 GET1	BUY1 GET1
RS: 01713332661	RS: 01987009810	RS: 01622666615	RS: 01922110975	RS: 01951177514	RS: 01894937105
HOTEL BENGAL CANARY PARK	Platinum Grand	THE WAY DHAKA	HANSA	The MIDORI	Best Western PLUS Maple Leaf
BUY1 GET1	BUY1 GET1	BUY1 GET1	BUY1 GET1	BUY1 GET1	BUY1 GET1
RS: 01622666642	RS: 01922110975	RS: 01844027405	RS: 01708800856	RS: 01978616165	RS: 01966667694
			NASCENT GARDENIA HOTELS	HOTEL SAHINA DHAKA	OMNI RESIDENCY stay in comfort
			BUY1 GET1	BUY1 GET1	BUY1 GET2
			RS: 01874057695	RS: 01701226757	RS: 01844611007

*শর্তাবলি প্রযোজ্য

thepremierbankplc.com ThePremierBankPLC

দি প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি.

করিম আজিজের অর্ডারটা বাতিল ক'রে দিচ্ছি। ও আমার অনুগত। দেশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে আশপাশে কাউকে বিশ্বাস করা, আস্থা রাখা ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে পড়েছে। কে যে কার হয়ে কাজ করছে বোঝা মুশকিল। টিকেট ক্যান্সেল ক'রে দাও তাহলে। আমি তোমার মেয়াদ বৃদ্ধি ক'রে অর্ডার পাঠাচ্ছি। করিম আজিজকে কাছে রাখা দরকার।'

'সেটা আর সম্ভব না, বস। আমি গতকাল অবসরে গিয়েছি। ই-মেইলে সে কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার মালপত্র বোঝাই কনটেইনার এখন জাভেনথাম এয়ারপোর্টে। বাসায় কেবল দুটি স্যুটকেস আর একটি ট্রাভেল ব্যাগ।'

'অবসরে চলে গেছ?'

'তোমারও তো অবসর তিন মাস পর।'

'সমস্যা দেখি না। তোমাকে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করছি। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন লাগবে অবশ্য। দিন সাতেক লাগবে। তুমি থেকে যাও।'

'আমি আগামী দিনগুলো নির্ঝঞ্ঝাটে বই পড়ে কাটিয়ে দেয়ার প্ল্যান করেছি। ব্রাসেলস আমার প্রিয় শহরে পরিণত হয়েছিল। পুরো ইউরোপকে চিরচেনা ব'লে মনে হতো। দেশে ফেরার টিকিট কেনার পর মন উঠে গেছে। এখানে থাকাটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।'

'সামরিক উপদেষ্টা এসে গেছেন। আমাকে ফোন রাখতে হচ্ছে। পরে আবার কথা বলছি। তোমার সমস্যাগুলো বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি একটু ভাব। কিছু করা যায় কিনা চিন্তা ক'রে দেখ।'

বিদেশে আরো কিছুদিন চাকরি করার প্রস্তাবটি লোভনীয়। আমি বিছানার ওপর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকলাম। ঘড়ির দিকে তাকালাম। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমার ফরাসি ড্রাইভার সুইস ঘড়ি ব্যবহার করে। তার ঘড়িতে ৭টা ৬০ মিনিটে ঠিক ঠিক আটটা বেজে যায় প্রতিদিন সকালে।

তার আগেই আমাকে রেডি হয়ে যেতে হবে। ব্যাংকের কাগজপত্র গুছিয়ে রেখেছি। সঙ্গে নিতে হবে। পাসপোর্ট। টেম্পোরারি রেসিডেন্স কার্ড আছে দুটো : বেলজিয়ামের ও সুইজারল্যান্ডের। ও দুটোও সঙ্গে নিতে হবে। কিছু মার্কিন ডলার কিনতে হবে। হেড অব চ্যান্সেরি তারেক ক'রে দেবে। অফিসে পৌঁছেই তার কাছে পাঁচ হাজার ডলার পাঠিয়ে দিতে হবে। তার লোক আছে। ভালো রেট দেবে। দূতাবাসে আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেবে। মস্কোর হোটেলে ফোন ক'রে রুম রিজার্ভেশন রি-কনফার্ম ক'রে নিতে চাই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে বলেছিলাম 'মস্কো' নামের একটা ট্রাভেল গাইড কিনে আনতে।

মোবাইল ফোন বেজে উঠল। মস্কো দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সেরির ফোন। রাষ্ট্রদূত ভাবির কাজিন জামাল। সালামের উত্তর দিয়ে বললাম, 'গাড়িতে উঠছি। মস্কো পৌঁছে ফোন করব ইনশাআল্লাহ।'

অধ্যায়-৭

অফিস থেকে যখন ব্যাংকে গেলাম তখন সকাল এগারোটা। অ্যাকাউন্টে যে টাকা ছিল তা তুলে নিয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ ক'রে দেয়া দরকার।

অ্যাকাউন্ট বন্ধ ক'রে দিচ্ছি বলার পর কাউন্টার থেকে মেয়েটি উঠে গেল। সম্ভবত অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আলাদা কাগজপত্র আছে, সেগুলো আনতে। কিন্তু না, সে ফিরে এল তার ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে। ম্যানেজার মৃদু হেসে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'মসিউ, আমার অফিসরুমে বসে এক কাপ কফি খাওয়ার মতো সময় কি হবে?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

'ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য সামান্য আনুষ্ঠানিকতা আছে। আমি দুটো ফরম দিচ্ছি। দূতাবাসে গিয়ে পূরণ করে আপনার সেক্রেটারিকে দিয়ে দেবেন। বাকিটা তিনি ক'রে নেবেন। তিনি জানেন কী করণীয়। মাদাম লিলিয়ান দীর্ঘদিন ধরে এ দূতাবাসে কাজ করছেন। এ রকম করিতকর্মা সেক্রেটারি কম পাওয়া যায়।'

'চমৎকার আপনাদের কফি। প্রায় ছয় বছর দু'মাস আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। আপনাদের দক্ষতা ও সৌজন্যবোধ দুটোই মনে রাখার মতো।'

'ধন্যবাদ স্যার, প্রশংসায় আপনি উদার। কিছু মনে না-করলে আপনাকে একটি পরামর্শ দিতে চাই।'

কফির কাপ মুখে তুলতে বললাম, 'সংকোচের কী আছে, বলুন না।'

'আপনার অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা জমা হয়েছে। প্রয়োজন না-থাকলে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করবেন না। অন্তত হাজার দশেক ইউরো রেখে যান। অ্যাকাউন্টটি বন্ধ ক'রে দিলে আপনার ক্রেডিট কার্ডটি তৎক্ষণাৎ অচল হয়ে যাবে। একটি ক্রেডিট কার্ড ছাড়া আপনি এ পৃথিবীতে চলতে পারবেন না। আমাদের ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার ক'রে পৃথিবীর যেকোনো দেশের এটিএম মেশিন থেকে টাকা তুলতে পারবেন। যখন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে তখন ইন্টারনেট ব্যবহার ক'রে নিজেই তা করতে পারবেন। পুরো টাকা দেশের অ্যাকাউন্টে নিয়ে যেতে পারবেন পাঁচ মিনিটে।'

'ইন্টারনেট ব্যবহার ক'রে এ ব্যাংকের টাকা দেশের ব্যাংকে নিয়ে যেতে পারব? নিশ্চিত আপনি।'

'একশত ভাগ নিশ্চিত, স্যার। কেবল পাসওয়ার্ডটি মনে রাখতে হবে। আপনার ফোনে আবার পাসওয়ার্ডটি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা। তাহলে আপাতত দশ হাজার ইউরো নগদ নিতে চাই।'

'ঠিক আছে স্যার। আমাদের মতো আন্তর্জাতিক একটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড থাকা আপনার মতো মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আপনি কি সেনাবাহিনীতেই ফিরে যাচ্ছেন?'

'সম্ভবত না, আমার অবসরের সময় হয়ে গেছে। মস্কোর উদ্দেশে আজই রওনা দেব আমি। সেখানে কয়েকদিন বেড়িয়ে তারপর দেশে।'

একটি ফরম এনে দিল ম্যানেজার। বলল, 'এটা সই ক'রে দিলে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ঝামেলা কমবে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের জন্য আপনার কাছে টাকা পাওনা হলে তার জন্য কিছুই করতে হবে না। তিরিশ দিন পর ব্যাংক আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা অ্যাডজাস্ট ক'রে নেবে।'

আমি ফরমটায় চোখ বোলালাম। এক পাশে ইংরেজি—অন্য পাশে ফরাসি ভাষায় লেখা অথরাইজেশন ফরম।

'আপনার ক্রেডিট কার্ডের মেয়াদ দশ বছর। ছ'বছর চলে গেছে। আমি সিস্টেমে ঢুকে মেয়াদকাল পাঁচ বছর বাড়িয়ে দিচ্ছি। নয় বছর নতুন কার্ড প্রয়োজন হবে না।'

ব্যাংক থেকে বের হতেই শীতল বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল। আমি ফোনে ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি নিয়ে আসার জন্য। দূতাবাসে ব্যাংক থেকে তুলে আনা ইউরোগুলো আলমারিতে রেখে তালা আটকে দিলাম।

দূতাবাসের কাছেই একজন বাঙালি একটি রেস্তোরাঁ দিয়েছে গত বছর। খুব একটা চলে ব'লে মনে হয় না। মালিক মধ্যবয়সী বাঙালি। অসাধারণ রান্না করেন। ১০ ইউরোতে পোলাও, চিকেন টিক্কা মাসালা আর সালাদ।

দুপুর সাড়ে বারোটা লাঞ্চের সময়। আশেপাশের প্রতিটি রেস্তোরাঁ জনমানুষে ভরপুর। কেবল 'সুন্দরবন' নামের এ রেস্তোরাঁটি ফাঁকা। বারোটি টেবিলের মধ্যে দশটিই ফাঁকা। আমি টেবিলে গিয়ে বসতেই আব্দুল জলিল পানি আর পাপড় দিয়ে গেলেন। তার মুখে হাসি নেই। কখনো থাকে না। মনে হলো সে রেস্তোরাঁ তুলে দেয়ার কথা ভাবছে। হয়তো আর তিন-চার মাস দেখবে। ক্রিসমাসের পর জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ ক'রে দেবে।

'মেন্যু আনব স্যার, না আপনার পছন্দের খাবার।'

'মেন্যু আনার দরকার নেই।'

দশ ইউরো দিয়ে আব্দুল জলিলের পোলাও, চিকেন টিক্কা মাসালা আর সালাদে পেট পুরে দূতাবাসে ফিরে নিজেকে খুব নির্ভার মনে হলো। গতকাল টেবিলের ড্রয়ারগুলো সব খালি করেছি। অ্যামিথিস্ট বসানো আংটিটা সাবান দিয়ে ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার ক'রে আঙুলে পরেছি। অফিস থেকে কিছু নেবার নেই।

কেবল শেষ একটি প্রতিবেদন দেশে পাঠাতে হবে। দ্রুত সেটার খসড়া করে ফেললাম।

ব্যক্তিগত সহকারী আমার ব্রাসেলস ত্যাগের চিঠিটা নিয়ে এল। মূল কপি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে যাবে। আর এখন ফটো তুলে ই-মেইলে দেশে পাঠানো হবে।

'খবর কিছু শুনেছেন স্যার?'

আমি চোখ তুলে তাকালাম। কোনো খবর শোনার আগ্রহ আমার নেই। গত ছ'বছর কেটেছে খবর শুনে, আর 'সারসংক্ষেপ' দেশে পাঠানোর কাজে।

ব্যক্তিগত সহকারীর গলায় উদ্বেগ: 'দেশের অবস্থা খারাপ স্যার। কঠিন আন্দোলন হচ্ছে।'

'প্রায়ই তো ও রকম হয়। ছ'মাস পর পর।'

বড় বড় চোখ ক'রে ব্যক্তিগত সহকারী বলল, 'এটা ও রকম না স্যার। সারা দেশটাজুড়ে খুবই ঝামেলা হচ্ছে। গুলি চালাতে চালাতে পুলিশের স্টক শেষ।'

'পুলিশ সবগুলো শেষ ক'রে ফেলেছে?' আমি শেষ প্রতিবেদনের খসড়া সংশোধন করতে করতে মুখ তুলে তাকালাম।

'প্রায় শেষ স্যার। আর্মি ছাড়া ভরসা নেই। গুলি করতে করতে পুলিশ টায়ার্ড হয়ে গেছে।'

'আর্মি কী করবে?'

'সরকারের অবস্থা খারাপ। আর্মি না-নামালে টিকতে পারবে না।'

দেশে ফেরার ঝক্কি অনেক। বাসা ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বাড়ির মালিকের লোক এসে দেখে গেছে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে ছয় বছরে। আমাকে দু'শ ইউরো দিতে হয়েছে গেস্ট টয়লেটের কমোড ভেঙে ফেলার কারণে। কে ভেঙেছে, কবে ভেঙেছে আমার জানা নেই। ফার্নিশড বাসা। ছেড়ে যাওয়ার সময় সবকিছুর হিসাব কড়াগণ্ডায় দিতে হয়।

কী ছিল আর কী আছে হিসাব ক'রে মিলিয়ে নিতে আধবেলা লেগেছে। দূতাবাসের প্রশাসনিক প্রধান অনেক সাহায্য করেছে। সে মালপত্র প্যাক ক'রে দেশে পাঠানোর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কোম্পানি খুঁজে বের হয়েছে।

'একটি ভিডিওতে দেখলাম স্যার পুলিশ অফিসারকে বলতে, একশ'টা গুলি করি স্যার। একটা মরে। একটাই মরে। আর একশ' জন সামনে আসে লাশ সরিয়ে নেয়। মরণের ডরভয় নেই।'

আমি অবাক হলাম। বাংলাদেশের তরুণরা একাত্তরের মতো সাহসী হয়ে উঠল নাকি আবার?

'একটু পর উঠে যাব। অ্যাম্বাসাডরের সঙ্গে দেখা করব। ফ্রি আছেন কিনা দেখ।'

'তিনি চারদিন থেকে অফিসে আসছেন না। সরকারিবিরোধী লোকজন ঘোরাফেরা করছে। ওরা তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে পদত্যাগ করার নোটিস দিয়েছে।'

'রাষ্ট্রদূত বেচারার দোষ কী? তিনি পদত্যাগ করবেন কেন?'

'দোষ কী জানি না স্যার। তবে ওদের দাবি এটাই।'

পৃথিবী একটা অদ্ভুত নিয়মে চলে। খুবই বিশৃঙ্খল পৃথিবীর জীবন—কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি শৃঙ্খলার একটা সুতা—প্রায় অস্পষ্ট—বিশৃঙ্খল জীবন ও সংসারের পটভূমিকে জড়িয়ে আছে। সে কারণে সব নষ্ট সমীকরণগুলো শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবার দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ ক'রে চারই হচ্ছে।

আমি হাতের দিকে তাকালাম। আমার বাম হাতের আঙুলগুলো সুন্দর। পুরো করতল সুন্দর। নখগুলোর আকার সুন্দর। আমি ফর্সা মানুষ না। বাদামি টাইপ। 'উজ্জ্বল গাত্র বর্ণ' যাকে বলে সে রকম। আমার হাতের কব্জিটা পর্যন্ত সুন্দর। ডান হাতের কব্জিতে আমি ঘড়ি পরতে ভালোবাসি। একটা সোনালি ফ্রেমের টিসট পরছি সাত-আট বছর যাবৎ। সাদা ডায়াল আর নীল কাঁটা দুটি মিলিয়ে ঘড়িটা দৃষ্টিশোভন।

কিন্তু ডান করতলের চেয়ে বাম করতল অনেক বেশি সুগঠিত। দুটি আলাদা ছাঁচে তৈরি। ডান হাতের করতল যেন একটু বেকুব টাইপের। বাম হাতের করতল চৌকস। ডান হাতের করতলের রেখাগুলো গভীর—সুচিহ্নিত। বাম হাতের রেখাগুলো একটু হালকা,—অগভীর, কিছুটা অস্পষ্ট।

আংটিটা গতকাল সাবান দিয়ে ধুয়ে ছিলাম। সাবান ঠিক না, চুল ধোয়ার শ্যাম্পু। তারপরও মনে হয় একটু মলিন। পড়ে থেকে থেকে মলিন, তবে বিবর্ণ নয়। ওয়াটার কালার অ্যামেথিস্ট পাথরটি যেন আমার দিকে অভিমানী চোখে তাকিয়ে আছে। পাথরের অভিমান হয় নাকি? পাথরের প্রাণ আছে?

অধ্যায়-৮

আমি ব্রাসেলস থেকে সরাসরি দেশে ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু মস্কো দেখার শখ ছিল। ব্রাসেলস থেকে ইউরোপের বহু শহর অল্প দূরত্বে অবস্থিত। মস্কো দূরে। যাওয়া হয়নি।

অনেক দিন যাবৎ বন্ধ রাখার পর ব্রাসেলস এয়ারলাইনস 'ব্রাসেলস-মস্কো রুট' আবার চালু করেছে। খুব একটি বড় আকারের বিমান নয়। ছোটও না। উঠতে উঠতে বোঝা গেল না এয়ারবাস না বোয়িং। টিকিটে নিশ্চয় লেখা আছে। দেখে নেব। ইউরোপ থেকে মস্কো সরাসরি ফ্লাইট নেই বললেই চলে। তাই এই ফ্লাইটটি খুব জনপ্রিয়। বিজনেস ক্লাস প্রায় ঠাসা। আমি যখন এয়ার হোস্টেসের পিছু পিছু আমার সিটের দিকে যাচ্ছি তখন ইকোনমি ক্লাস থেকে একটি শিশুযাত্রীর কান্নার তীব্র শব্দ, কেবল তীব্র নয় কান্নার ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে এল। আমার সিটটা দেখিয়ে দিয়ে ট্রলি ব্যাগ মাথার ওপরকার কেবিন লাগেজে রাখতে রাখতে এয়ার হোস্টেস বলল, 'অনেক বাচ্চারা প্রথমবারের মতো বিমানে উঠে ভয় পেয়ে যায়।'

আমার সিট জানালার ধারে। সেখানে বসতে বসতে সামনের সিট থেকে একজন বয়স্কা যাত্রী খুব ঠাণ্ডা সুরে যেন এয়ার হোস্টেসের কথার বিরোধিতা ক'রে বললেন, 'যেসব মায়েরা শিশুদের সঠিকভাবে যত্ন নেয় না, এ রকম পাবলিক প্লেসে চিৎকার-চেঁচামেচি ক'রে ওসব শিশুরা মাকে বিব্রত করার চেষ্টা করে। বলতে পারো এক ধরনের প্রতিশোধ। ঘরে হলে মা হয়তো জোরে ধমক দিতেন, কোলের শিশুটিও দেখেছে এবং জেনেছে পাবলিক প্লেসে মা বকাঝকা করে না।'

পাশে সম্ভবত আরেকজন নারী যাত্রী বসে ছিলেন। আমি যখন সিটবেল্ট খুঁজছি তখন তিনি বললেন, 'প্রত্যেক মায়ের উচিত জন্মের পর থেকেই সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা।'—সদ্যোজাত একটি সন্তানের সঙ্গে কী ক'রে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায় আমি বুঝে উঠতে পারলাম না।

দেখা গেল শিশুটির তারস্বর চিৎকারের জন্য মা যে দায়ী দুজনেই সে ব্যাপারে একমত।

এয়ার হোস্টেস আমার স্থির হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমি যা শুনেছি ওর কানেও সে সব কথা গেছে। সে লজ্জিত মুখে মৃদু হেসে বলল, 'কী দিতে পারি স্যার? ঠাণ্ডা পানীয় নাকি ফলের রস?'

আমি বললাম, 'যদি থাকে তবে টমেটোর জুস দিতে পারো। সঙ্গে হোয়াইট পেপার। এটা আমার পছন্দের পানীয়।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে রুপোর থালায় চ'লে এলো টমেটো জুস। সঙ্গে এক টুকরো ত্রিকোনাকার চিজ আর দুটো ক্র্যাকার্স। সম্ভবত বিজনেস ক্লাসের যাত্রীকে নিছক জুস কি পানীয় দেয়া অভব্যতার মধ্যে পড়ে।

এয়ার হোস্টেস বলল, 'আপনি জানেন মসিউ, এটা সাড়ে তিন ঘণ্টার ফ্লাইট, বিমান ছাড়ার কিছু পর আমরা ডিনার পরিবেশন করব। ডিনার মেনু সিট পকেটে আছে। তবে এখনি ক্ষুধার্থ বোধ করলে বেল বাজাবেন। আমাদের কাছে চিকেন ও ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ আছে। চাওয়া মাত্র দিয়ে যেতে পারব।'

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম যে আমি শুনেছি ও বুঝেছি। মুখে বললাম, 'ধন্যবাদ।'

মেয়েটার বুকে নাম লেখা নাদিয়া। বললাম, 'কোনো খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন কি আছে নাদিয়া? পুরনো অভ্যাস। বিমানে উঠে ভিন দেশের খবরের কাগজ পড়তে ইচ্ছে করে।'

'নিশ্চয় জনাব; এক্ষণি 'মস্কো টাইমস' এনে দিচ্ছি।'

'প্রাভদা'র কথা শুনেছি। 'দ্য মস্কো টাইমস' না পড়েছি, না দেখেছি। একটি রুশ দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাচ্ছি ভেবে উল্লসিত বোধ করলাম।

তড়িৎ গতিতে নাদিয়া কয়েকটি মস্কো টাইমস নিয়ে এল। আমাকে একটি দিয়ে অন্য যাত্রীদের কাছে গিয়ে বলতে লাগল, 'আজকের মস্কো টাইমস'। যাত্রীদের কাউকে দৈনিক পত্রিকার ব্যাপারে আগ্রহী ব'লে মনে হলো না।

আমি প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলাম: সামনের আর শেষের পৃষ্ঠার। অন্তত একটি খবর পড়া দরকার। বড় আকারে একটি শিরোনাম এ রকম: 'ইউক্রেনে আক্রমণ জীবনকে আরো খারাপ ক'রে তুলেছে, রাশিয়ানদের স্বীকারোক্তি।'

স্বাধীন গবেষণা প্রকল্প ক্রনিকলসের একটি নতুন জরিপ অনুসারে, রাশিয়ার অর্ধেকেরও বেশি নাগরিক বিশ্বাস করে যে ইউক্রেনে চলমান যুদ্ধ তাদের দৈনন্দিন জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিচালিত জরিপে বলা হয়েছে : ৫৪% উত্তরদাতা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের প্রতিকূল প্রভাবের কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে মাত্র ৯% বলেছেন যে এটি তাদের জীবনকে উন্নত করেছে। তবে ৩২% বলেছে যে তারা কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করেনি। সমীক্ষা যুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে তুলে ধরেছে। যুদ্ধ দ্বিতীয় বছর পার হয়ে এখন তৃতীয় বছরে। অর্থনৈতিক ভোগান্তি জনসাধারণের ঋণাত্মক মনোভাবের একটি মূল কারণ। জরিপে উঠে এসেছে যে ৩৬% উত্তরদাতা তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতির কথা জানিয়েছে, যে সংখ্যা ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ২৭% ছিল। চাকরি ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় রুশদের মধ্যে ৪০% বলেছে যে তারা নিজেদের সংসার চালানোর জন্য বেশি সময় ধ'রে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে মাত্র ৬% কাজের চাপ হ্রাস করার দাবি করেছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং অব্যাহত অর্থনৈতিক চাপ অনেকের জন্য জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা ক্রমেই কঠিন ক'রে তুলেছে।

এই উদ্বেগ সত্ত্বেও রুশ সমাজ যুদ্ধ নিয়ে বিভক্ত। জরিপে দেখা গেছে : ৫২% উত্তরদাতা এখনো রুশ আক্রমণকে সমর্থন করে, অন্যদিকে ৪৮% যুদ্ধের বিপক্ষে। এ নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। বিতর্কের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য অর্জন না ক'রেই রুশ সেনাবাহিনী ইউক্রেন থেকে প্রত্যাহার করা উচিত হবে কিনা। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪১% মানুষ সৈন্য প্রত্যাহারকে সমর্থন করেছিল, যা ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ছিল ৫০%।

একদিকে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে সামরিক ব্যয়ের জন্য জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে। প্রতিরক্ষা খাতে সরকারের প্রাগ্রাধিকার ব্যয় হওয়া উচিত বলে মনে করে এমন উত্তরদাতাদের সংখ্যা ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ৪৩% থেকে কমে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৩৬%-এ দাঁড়িয়েছে।

আমার পাশের সিটটি এখনো ফাঁকা। পুরো যাত্রাপথে ফাঁকা থাকবে নাকি যাত্রী আসতে দেরি করছে? অনুমান করার সুযোগ নেই। হতে পারে যাত্রী ডিপারচার লাউঞ্জে ব'সে বই পড়ছে। চূড়ান্ত বোর্ডিং কলে নিজের নাম না-শোনা পর্যন্ত সে চেয়ার ছাড়বে না। কিন্তু সে নারী না পুরুষ? শেষ পাতায় যখন রুশ প্রেসিডেন্ট নিয়ে একটা খবরের শিরোনাম পড়ছি তখন এ প্রশ্নটি আমার মাথায় খেলে গেল। আমার মাথা বলল, পুরুষ নয়—পাশের যাত্রী হবে নারী।

বয়স্কা না তরুণী?

আবার মাথার ভেতর থেকে কেউ ব'লে উঠল : বয়স্কা নয়, তরুণী যাত্রী।

আমি মনে মনে বললাম : তরুণী হলেই ভালো।

মাথার ভেতর অদৃশ্য সত্তা বলে উঠল, 'সে তো বটেই! কে না তরুণী নারীর সঙ্গ পছন্দ করে!'

ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে আমার জানার কিছু বাকি নেই। দু'বছর যাবৎ এ যুদ্ধ ঘিরে ন্যাটো, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও ইউরোপীয় কমিশনের নানা সিদ্ধান্ত ও অভিমতের বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠাতে পাঠাতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। একটি বিষয়ই কেবল বুঝে উঠতে পারিনি আর তা হলো কেন এই যুদ্ধ, কেন এ যুদ্ধ শেষ হচ্ছে না—পুতিন সাহেব ঠিক কী চায়। আর যেসব সাধারণ মানুষ এ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে, তাদের মনঃস্তত্ত্বটা কী?

বাম হাতের অনামিকায় পরা আংটিটি চোখে পড়ল। ডান হাতে ঘড়িটির দিকে তাকালাম। বিমান ছাড়তে আর মাত্র পনের মিনিট বাকি? মনে হয় পাশের সিটটি ফাঁকাই থাকবে। অনেক সময় যাত্রীরা অনিবার্য কারণে শেষ মুহূর্তে যাত্রা স্থগিত করে।

এমন সময় মাথার ভেতর থেকে শোনা গেল, 'আরে না, সে এখনি আসবে, শেষ মুহূর্তে টয়লেটে যাওয়ার কারণে এই বিলম্ব।'

আমার মাথার ভেতরে একটি পোকা আছে—জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। সে খুব ঘুমকাতুরে। আজ তাকে বেশ জাগ্রত ব'লে মনে হলো। একটু পরপর নানা মন্তব্য ক'রে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। সিটবেল্ট লাগিয়েছি কিনা চেক ক'রে জানালা দিয়ে এয়ারপোর্টের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পত্রিকাটা ভাঁজ ক'রে সিটপকেটে সেঁধিয়ে রেখেছি। মার্কেসের আনকোরা বইটিও। বিমান যাত্রায় আমার বই পড়তে আজকাল আর ভালো লাগে না। তবু হাতে ক'রে নিয়ে এসেছি আনা মাগদালেনার উদ্বেগের কথা ভেবে : তার জীবন আর আগের মতো হবে না।

তার অতিথি কাজ শেষ ক'রে সম্মানী বাবদ ২০ ডলারের নোট রেখে গেছে বইয়ের ভেতর। মার্কেস খুব রসিক ছিলেন বলে মনে হলো।

ফ্লাইট টাইম সাড়ে তিন ঘণ্টা। কিন্তু ডিপারচার লাউঞ্জে বসে থাকা, বিমানে চ'ড়ে সিটে আসন গ্রহণ করার পর অপেক্ষা করা, বিমান ল্যান্ড করার পর দরজা না-খোলা পর্যন্ত বসে থাকা, বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা, লাগেজ কালেক্ট করার জন্য কনভেয়ার বেল্টের সামনে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা—সব মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টার মামলা। কনভেয়ার বেল্ট এক পাশ দিয়ে বের হয়, তারপর ইউ-শেইপ নিয়ে আরেক পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আমার লাগেজ আসতে সবর্দা সময় লাগে। ট্রলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এপাশ থেকে ওপাশে যাই। খুব অধৈর্য লাগে এ সময়টা। সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন একই কনভেয়ার বেল্টে একাধিক ফ্লাইটের লাগেজ দিয়ে দেয়া হয়।

আমি জানালা দিয়ে এয়ারপোর্টের দৃশ্য দেখতে দেখতে কনভেয়ার বেল্টে লাগেজ আসার কথা ভাবতে থাকি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি যেন পাশের সিটের প্রতীক্ষিত যাত্রী এসে গেলে চোখে চোখ না-পড়ে। এক সময় সে এল। নতুন যাত্রী আসার বার্তা হিসেবে সুগন্ধির গন্ধ ভেসে এলো। এ গন্ধটি আমার অপরিচিত নয়। আমি ইয়ার্ডলি সাবান ব্যবহার করি। তার সুগন্ধ 'লিলি অব দ্য ভ্যালি'। নতুন যাত্রীর পারফিউমে সে রকম একটি বনজ গন্ধ। নতুন যাত্রী যে বুড়ী বা বয়স্কা কেউ নয় তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সিটবেল্ট লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল।

এবার আমি ডান পাশে মুখ ফেরাতেই মৃদু হেসে মেয়েটি বলল, 'বজু মসিউ। কী কাণ্ড! বিমানে উঠতে দেরি ক'রে ফেললাম। আরেকটু হলেই...।'

আমি যথারীতি ভদ্রতামূলক হাসি উপহার দিয়ে বললাম, 'বজু মাদমোয়াজেল।' আবার জানালায় চোখ রাখলাম।

মাথার ভেতরকার পোকাটি আজ খুবই সজাগ মনে হচ্ছে। সে বলল, 'আরে তাকাও না, আরেকবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকাও।'

আমি ঘাড় ফিরিয়ে আমার সিটপকেটের দিকে ইঙ্গিত ক'রে মেয়েটিকে বললাম, 'দ্য মস্কো টাইমস আছে। চাইলে পড়তে পারো।'

'ধন্যবাদ, পড়ব। একটু জিরিয়ে নেই। টয়লেটে ছিলাম। বোর্ডিং কলে আমার নাম নিয়ে বলেছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিমানে না-উঠলে বিমান আমাকে রেখেই আকাশে উড়াল দিতে বাধ্য হবে। কী সাংঘাতিক কথা। রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! এটা আজকের শেষ ফ্লাইট।'

পোকাটা বলল, 'কী দেখলে, চেহারাটা চেনা মনে হলো না?'

আমি চট ক'রে মেয়েটির দিকে আবার তাকালাম না। পেছনে বিমানের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। ককপিট থেকে পাইলট উড়াল দেয়ার ঘোষণা দিল। এ সময়টা আমি চোখ বন্ধ ক'রে প্রার্থনা করি। বিমান মাটিতে থুবড়ে প'ড়ে আগুন ধ'রে যাবে—আর আমি ঝলসে ঝলসে কাবার হয়ে যাব এ রকম মৃত্যু যেন না-হয়। আমি মারা যেতে চাই নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায়—শেষ নিঃশ্বাসটি যেন ঘুমের ভেতর বের হয়ে যায়। এসব ভাবতে ভাবতে আমার ঘুম এসে গেল।

অধ্যায়-৯

এয়ার হোস্টেস আমার দিকে অনেকখানি মুখ বাড়িয়ে বলল, 'স্যার, ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত। এখন ডিনার দিয়ে দেই কেমন। আমরা প্রায় অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি।'

ঘুমটা ভাঙল। বেশ খানিকটা ঘুমিয়েছি মনে হলো। কিন্তু ঘুম এসে গেল কেন? আমি কি ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম? ছয় বছর

এক বাসায় থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ঝক্কির কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি অবসরের আদেশটি পেয়েছি তিন মাস আগে। ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিয়েছি। প্যাকার্সরা এসে মালপত্র গুছিয়ে কনটেইনারে করে দিয়েছে তাও দিন পাঁচেক আগে। গত ন'দিন যাবৎ আমি দুটি স্যুটকেস আর একটি ট্রাভেল ব্যাগ নিয়ে আছি।

তিন-চারদিন প্রতি রাতেই ফেয়ারওয়েল ডিনার ছিল। খুব আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নয়। ঘরোয়া পরিবেশে, পরিচিত মুখগুলোর মধ্যেই। কেবল রাষ্ট্রদূতের দেয়া ডিনারটাই ছিল বড়—প্রায় চব্বিশ জনকে দাওয়াত করেছিলেন। এটা অবশ্য তার জন্য কোনো ব্যাপার না। অতিথি আপ্যায়নের জন্য প্রতি মাসে তিনি পাঁচশ' ইউরো পেয়ে থাকেন।

গতকালের কাজ ছিল সামান্য। আর রাতে ঘরে ফেরার সময় নাক-বোঁচার হাত মোচড়ে কোমরে লাথি ঝেড়ে কুপোকাত ক'রে ফেলা; বাসায় ফিরে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কুড়ি মিনিট কথাবার্তা; ঘুমিয়ে পড়ার আগে আনা মাগদেলানের খানিকটা গল্প। আজ ব্যাংকের সামান্য কাজ এবং সদর দপ্তরে বিদায় প্রতিবেদন পাঠানো। সকালে চিফ ফোন করেছিলেন। সে কথা তো আমি ফোনটা রেখেই ভুলে গিয়েছিলাম। তবু প্লেন ছাড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম? এয়ার হোস্টেস পুনরায় তার অস্তিত্ব জানান দিতে বলল, 'ল্যাম্ব স্টেক অথবা ভেজেটারিয়ান—কোনটি পেলে ভালো লাগবে স্যার।'

পাশের তরুণী ইতোমধ্যে ল্যাম্ব স্টেক নিয়েছে। নিয়েছে কিন্তু এখনো খাওয়া শুরু করেনি। সে যদি আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে তবে বলতেই হবে তার ভদ্রতাবোধ অসামান্য।

'ল্যাম্ব স্টেকই দিন।'

ট্রে টেবিলটা নামিয়ে নিলাম।

'আপনার বাম হাতের অনামিকায় একটি পাথর বসানো আংটি। কী পাথর জানতে পারি?'

মেয়েটির প্রশ্ন শুনে আমি সামান্য চমকে উঠি।

'অ্যামেথিস্ট।'

মেয়েটি বলল, 'সে রকমই মনে হচ্ছিল। ওয়াটার কালার অ্যামেথিস্ট। মনে হচ্ছে আপনি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার নাম শাফকাত আহমেদ।'

'আলিশা সিনাওয়াত্রা। আমাকে আলিশা ব'লে ডাকতে পারেন।'

'ভাগ্য তো আছেই। কখনো সৌভাগ্য কখনো দুর্ভাগ্য। কখনো সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্য ব'লে মনে হয়। আর দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্য। এ হচ্ছে সমস্যা।'

একটু থেমে বললাম, 'ছয় বছর দূতাবাসে ডিফেন্স অ্যাটাশের চাকরি ক'রে পরশু অবসর নিয়েছি। আজ সকালে দেশ থেকে আর্মি চিফ ফোন করেছিলেন। বললেন, আমার চাকরি এক বছর বাড়িয়ে দেবেন। আমি রাজি হইনি। এটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বুঝতে পারছি না।'

মেয়েটি হাসল।

মাথার ভেতরকার জ্ঞানী পোকাটি পাখা ঝাপটে বলল, 'কী হে, হাসিটি পরিচিত মনে হলো?'

এয়ার হোস্টেস এসে ডিনার দিয়ে গেল। সন্ধ্যার পর কিংবা রাতের বিমান যাত্রার মধ্যে অন্যরকমের একটা প্রশান্তি থাকে। মনে হয় বহুদিন নোংরা পৃথিবী থেকে মায়ের গর্ভে ফিরে যাচ্ছি স্বস্তিকর অন্ধকারে। মাটি থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছে বিমান। বাইরে ঘন অন্ধকার। বিমানের ভেতর শীতটা নিবিড় হয়ে জড়িয়ে ধরেছে। ডিনারের পালা শেষ হলে নিস্তব্ধতা নেমে আসবে। সবাই ব্ল্যাঙ্কেট টেনে নিয়ে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করবে।

আমরা যাচ্ছি পশ্চিম থেকে পুবে। পুবের অন্ধকার বিমানটাকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস ক'রে ফেলেছে।

'চলুন খাওয়া শুরু করা যাক।'

'হ্যাঁ, স্টেকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার আগেই শুরু করা উচিত।'

ক্ষুধার কারণ ছিল না। কিন্তু বিমানের রাতের ফ্লাইট ডিনার করতে ভালো লাগে। আমি ধীরে ধীরে খেতে লাগলাম। দুটো কোল্ড ডিশ ছিল: সালাদ আর কোল স্লo। সে দুটো শেষ করে নরম তুলতুলে বানরুটির মাঝবরাবর চাকু চালিয়ে পুরু ক'রে বাটার লাগিয়ে নিলাম। অনেকেই বলে ডিনারের সময় রুটি খাওয়া মানে খিদেটা নষ্ট করা। আমার সে রকম মনে হয় না। দুটো বান খেয়েও আমি আরাম ক'রেই স্টেকটা খেতে পারব। স্টেকের সঙ্গে সটিয়েড ভেজিটেবল ও এক চিমটি রাইস।

এয়ার হোস্টেস কাছেই ছিল। ইশারায় ডাকলাম: 'আমি টমেটো জুস খেতেই ভালোবাসি। কিন্তু এখন মিক্সড ফ্রুট জুস খেতে ইচ্ছে করছে। মাল্টিভ্রুখটেন। আছে?'

এয়ার হোস্টেস মেয়েটি হেসে বলল, 'নিশ্চয় স্যার।'

'আপনি ভাগ্যের কথা বলছিলেন। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার চিফকে 'না' বলে দিয়ে কি আপনার এখন কষ্ট হয়েছে? অনুশোচনা হচ্ছে?'

একটু থেমে আলিশা বলল, 'এ রকম কি ভাবছেন মস্কোতে নেমে ফোন ক'রে চিফকে বলবেন সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কথা? কাল সকালের ফ্লাইটের টিকিট কেটে ব্রাসেলস ফিরে যাবেন—এ রকম ভাবনা আসছে মাথায়?'

স্টেকটা ছিল অ্যালুমিনিয়ামের বাক্সে। ওটার ঢাকনা খুলতে খুলতে বললাম, 'একেবারেই না। বস আমার কোর্সমেট ছিল। ও যে আমাকে ফোন করেছিল সে কথা সারাদিন একবারও মনে পড়েনি। এখন প্রথমবার মনে পড়ল। না, মনের ভেতর কোনো অশান্তি বোধ করছি না। অনুশোচনার কোনো অনুভূতি নেই। একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। চাকরি মানে একটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়। বড় একটা যন্ত্রের মধ্যে ছোট একটা নাট-বল্টু হয়ে আরামেই ছিলাম। হয়তো সে কারণেই একটা শূন্যতাবোধ অনুভব করছি।'

মেয়েটি আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে আমারও সে রকম মনে হচ্ছে। আপনার মনে যে কোনো রকম ঝড় বইছে না সে আমি টের পাচ্ছি। বিমানে যখন ভ্রমণ করি বা দূরপাল্লার ট্রেনে তখন পাশের যাত্রীর মনের অবস্থাটা যেন বুঝতে পারি। আপনার মনটা প্রশান্ত। যেন জোয়ারের পানি নেমে গেছে। সমুদ্রের ঢেউ বইছে তবে কোনো গর্জন নেই।'

মেয়েটির বয়স কত হবে? পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নয়। সে কথা বলছে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতো। খেতে খেতে ওর কথা শুনতে ভালোই লাগছিল।

'শুধু তা-ই নয়, আমার এখন অন্যরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমরা অপরিচিত নই।'

'আমরা অপরিচিত নই?'

কাঁটা চামচ হাত থেকে নামিয়ে আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। মেয়েটিও আমার দিকে।

'আপনার হাতের আংটির পাথরটাকেও অচেনা লাগছে না।'

'অ্যামেথিস্ট।'

'হ্যাঁ, ওয়াটার কালার অ্যামেথিস্ট।' মনে হচ্ছে আমার জহরত ব্যবসায়ী চাচার দোকান থেকে কেনা। আপনি কি কখনো ব্যাংকক গিয়েছিলেন?'

আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম: 'বার বছর আগে' বা চৌদ্দও হতে পারে—আমি একটা কনফারেন্সে ব্যাংকক গিয়েছিলাম। একটা ঘড়ি কিনতে গিয়ে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আপনার কথায় অ্যামেথিস্ট পাথরটা পরেছিলাম।'

সে হাসতে হাসতে করমর্দন করল।

'ঠিক তাই হবে। চৌদ্দ-পনের বছর আগের কথা। আমি সাড়ে চার বছর যাবৎ রোমে বিশ্ব খাদ্য সংস্থায় সিনিয়র কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি। দু'সপ্তাহ যাবৎ ইউরোপটা দেখে বেড়াচ্ছি। আবার দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে। আপনার সুঠাম গঠন আগের মতোই আছে কিন্তু চেহারায় পরিবর্তন এসেছে। কাঁচাপাকা চুল ও গোঁফে বেশ ভারিক্কী দেখাচ্ছে। হাতে অ্যামেথিস্ট না-থাকলে নিশ্চিত হতে পারতাম না। খাওয়া শেষ হলে আপনার হাতটা একটু দেখব।'

আমি হেসে বলি, 'নিশ্চয়ই দেখবেন। জ্যোতিষবিদ্যায় আগ্রহ তাহলে কমেনি!'

'কমেছে কি? আমার তো মনে বেড়েছে বেশ। নিউমেরোলজি, জোডিয়াক সাইন এসব নিয়ে পড়াশোনা ক'রে খুব মজা পাই।'

'কোনো সন্দেহ নেই।'

দু'রকম ডেজার্ট ছিল মিক্সড ফ্রুটস আর ক্রিম ক্যারামেল। ক্রিম ক্যারামেলটা অপূর্ব লাগল।

খাওয়ার পর হাতের পাতা মেলে দিলাম আমি। খুব মন দিয়ে করতল পরীক্ষা করল আলিশা। টিপে টিপে দেখল করতলের কোনো কোনো অংশ।

'আপনার আংটিটা খুলে একটু দিন তো। দেখবেন আবার পড়ে না যায়। বিমানের ভেতর ছোট কিছু হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

আংটিটা নিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে দেখল আলিশা। বলল, 'মনে হয় অনেক দিন পরেন। খুলে রেখেছিলেন।'

আমি মুচকি হাসলাম।

'মস্কোতে একটা জহরতের দোকানে গিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিতে পারেন।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'দেশে ফিরে কী করবেন ভেবেছেন?'

'না।'

'আপনি নিয়তিবাদী হয়ে পড়েছেন। নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করা খুব ভালো একটা লাইফ স্ট্র্যাটেজি—যদিও মানুষ সংগ্রাম করতে ভালোবাসে। সংগ্রামের মধ্যেও সন্তুষ্টি থাকতে পারে—কিন্তু প্রশান্তি নেই।'

আমি চুপ ক'রে আলিশার কথা শুনি। ওর অকপট আচরণে এক ধরনের অন্তরঙ্গতার প্রশ্রয় আছে। সে অন্তরঙ্গতার উষ্ণতা আমাকে স্পৃষ্ট করে। আমি টের পাই ওর সঙ্গে কথা বলতে, ওর কথা শুনতে ভালো লাগছে। সন্দেহ নেই, ওর নৈকট্য রমণীয়।

'একটা কথা বলব? মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে শীঘ্রই আপনার দেখা হয়ে যাবে।'

চমকে গিয়ে বলি, 'তুমি কীসের ভিত্তিতে এ অনুমান করছ জানি না, তবে যতদূর মনে পড়ে ওরা এখন টরন্টো থাকে। বছর আটেক আগে সরকার কর্নেল আজিজ পাশাকে দেশছাড়া করেছিল। বিচ্ছেদের পর ও কর্নেল আজিজ পাশাকে বিয়ে করেছিল। আমার দুই ব্যাচ জুনিয়র। ভালো অফিসার। এখন ওর কাজ হচ্ছে অনলাইনে এসে সরকারের সমালোচনা করা। ওদের দেশে ফেরার কোনো সুযোগ নেই।'

অধ্যায়-১০

'আপনার সিটপকেটে একটি বই দেখতে পাচ্ছি।' আলিশা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'সিটি সেন্টারে যে 'ওয়াটারস্টোন' আছে ওখান থেকে সম্প্রতি কিনেছি। পরশু রাতে কিছুটা পড়েছি।'

'দেখতি পারি?'

আমি সিটপকেট থেকে বইটা বের ক'রে আলিশার হাতে দিলাম। আলিশা অনেক সময় নিয়ে বইটা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। আমি একটু চোখ বন্ধ করলাম। সহযাত্রীর সঙ্গে একটানা বক বক ক'রে যেতে ভালো লাগে না। তাছাড়া ডিনারের পর বিমানজুড়ে যাত্রীদের কথাবার্তা থেমে গেছে। অনেকেই ঘুমানোর চেষ্টা করছে। আরো এক ঘণ্টা পর মস্কো বিমানবন্দরে ল্যান্ডিং।

ল্যান্ডিংয়ের পর বিমান গড়িয়ে গড়িয়ে টার্মিনাল ভবনের কাছে যাবে। বোর্ডিং ব্রিজ এনে লাগানো হবে। কেবিন ক্রু দরজা খুলে দেবে। তারপর ইমিগ্রেশন লাউঞ্জ। ইমিগ্রেশনের পর লাগেজ কালেকশনের জন্য কনভেয়ার বেল্টের গায়ে অপেক্ষা। ট্রলিতে লাগেজ তুলে ঠেলতে ঠেলতে কাস্টমসের গ্রিন চ্যানেল দিয়ে টার্মিনাল ভবনের বাইরে। সব মিলিয়ে আরো ঘণ্টা দেড়েক। তারপর যাব হোটেল। হোটেল থেকে গাড়ি পাঠানোর কথা আছে। তন্দ্রা নেই। ইঞ্জিনের মৃদুমন্দ শব্দ। কখনো কারো হাঁচি বা কারো কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অজ্ঞাত কারণে বাচ্চাদের কেউ কান্নাকাটি করছে না। দু'ঘণ্টার ওপর প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা পার হয়েছে। বাচ্চারা বিমানের ভেতরকার পরিবেশটা মেনে নিয়েছে।

আলিশার প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট লাগল বইটি দেখতে। সে মনে হয় মলাটের লেখা, জ্যাকেটের ফ্ল্যাপের লেখা, গার্সিয়া মার্কেসের দুই ছেলের লেখা 'মুখবন্ধ', হিস্পানী সংস্করণের সম্পাদকের ভূমিকা সব পড়ে ফেলেছে। আর উপন্যাসের শেষে জুড়ে দেয়া হিস্পানী ভাষায় লেখা মার্কেসের মূল পাণ্ডুলিপিও ভালোভাবে দেখে নিয়েছে।

স্বগতোক্তির সুরে আলিশা বলল, 'বইটি খুব রিচ। মার্কেসের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির ফ্যাকসিমিলি পর্যন্ত আছে। আগে কখনো মার্কেসের লেখা পড়িনি।'

তারপর আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'মার্কেস মারা গেছেন ২০১৪ সালে। প্রায় দশ বছর পর বইটি প্রকাশিত হলো। ভূমিকা পড়ে মনে হলো বহুদিন পুরো পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া যায়নি। আপনি ঘুমিয়েছেন কি?'

'না। শুনছি।'

'ছোট উপন্যাস। মাত্র ছ'টি অধ্যায়। শেষ অধ্যায় নিয়ে মার্কস সন্তুষ্ট ছিলেন না। বারবার সংশোধন করেছেন। শেষ অধ্যায় চূড়ান্ত করার আগেই তার মৃত্যু হয়। আপনি কি বইটি পড়েছেন?

'গতকাল রাতে শুরু করেছি। প্রথম অধ্যায় পড়ে ফেলেছি।'

'কেমন লাগছে?'

'প্রথম অধ্যায়টা ছোট গল্পের মতো। তবে খুব ইন্টারেস্টিং। সংক্ষেপে কাহিনীটা বলা যায়। না বলাই ভালো। তাহলে আপনি যখন পড়বেন তখন মজা পাবেন না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। না-বলাই ভালো। লেখক লিখবেন এবং পাঠক পড়বেন। এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত বইটি গড়ে উঠবে। একটি বই প্রত্যেক পাঠকের জন্য আলাদা। কেবল ভালোলাগা মন্দলাগা নয়। অর্থের দিক থেকেও। কেউ তো কেবল গল্পটা পড়ে। ক্রাইম থ্রিলার তো কেবল ঠাসা গল্প। কিন্তু উপন্যাস নিছক গল্প নয়। কাহিনীর ভাঁজে নানা ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকে। একেকজন পাঠক একেক অর্থ করেন। আপনার কি মনে হয়?'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে আলিশার কথা বোঝার চেষ্টা করলাম। ভাবুক শ্রেণীর তরুণী। সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা ক'রে ডিগ্রি অর্জন করেছে কেবল তা নয়, মনে হয় সে সাহিত্য নিয়ে ভাবে।

বললাম, 'আমি পড়ি দ্রুত। বইয়ের কাছে আমার প্রথম প্রত্যাশা আনন্দ। যে বইয়ের প্রথম অধ্যায় আমাকে আনন্দিত করে না সে বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় আমাকে টানে না। পরশু রাতে ঘুমাতে গিয়ে গাসিয়া মার্কেজের এ উপন্যাসটি ধরেছিলাম। প্রথম অধ্যায় পড়ে মজা পেয়েছি। দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ার গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বই পড়া সেখানেই শেষ হয় না। কিছু বই আছে যার কোনো কোনো ঘটনা কোনো কোনো সংলাপ মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে। মনে হয় একটা গুপ্ত সংকেতের মুখোমুখি হয়েছি। তার পাঠোদ্ধার করতে হবে।'

বেশ একটু হাসল আলিশা।'

বলল, 'সত্যি বলতে কি আপনাকে আমার জেনারেল বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছিল সাহিত্যের ক্লাসে অধ্যাপকের লেকচার শুনছি। প্রতিটি ভালো উপন্যাস গুপ্ত সংকেতের ডিপো। আপনার সঙ্গে একমত। এ কথাটিই বলতে চাইছিলাম।'

লাউড স্পিকারে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে মস্কো বিমানবন্দরে নামার শুভসংবাদ দিলেন। সবাইকে বললেন সিটবেল্ট বেঁধে নিতে। জানালেন, মস্কোর আবহাওয়া আজ চমৎকার। সারা দুপুরটা সূর্যের আলোয় মস্কো ঝলমল করেছে। এখন হালকা শীত পড়েছে। মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। বেশ আরামদায়ক অবস্থা।

ক্যাপ্টেন ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে যাওয়ায় একটা নিঝুম ভাব নেমে এসেছে।

চোখ বন্ধ ক'রে পরিবেশটা উপভোগ করছিলেন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত। মস্কোয় ছয় রাত থাকা পড়বে। ৬ রাত ৭ দিন। এ সাতদিন কী করবেন ভেবে রাখেননি। তিনি ঠিক অন্য ট্যুরিস্টদের মতো মস্কো দেখতে আসেননি। কয়েকটা দিন মস্কো শহরটায় থাকতে এসেছেন। লেনিন, স্ট্যালিন, পুতিনের শহর। সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে মতদ্বৈধতার কারণে অথবা নিছক সন্দেহের শিকার হয়ে।

একটি কাগজ এগিয়ে দিল আলিশা। বলল, 'আমার হোটেলের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর। খুঁজে পেতে সমস্যা আশা করি। হয়তো-বা দেখা গেল কোনো মিউজিয়াম দেখতে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।'

'আপনি চাইলে মার্কেসের বইটি নিয়ে যেতে পারেন।'—কাগজে নিজের হোটেলের ঠিকানা লিখতে লিখতে ব্রিগেডিয়ার শাফকাত বললেন।

'অনেক ধন্যবাদ। একজন পাঠকের কাছ থেকে বই ছিনিয়ে নেয়া

ঠিক নয়। মস্কো বড় একটা শহর, নিশ্চয় এখানে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বুক শপ আছে।'

নিজের হোটেলের নাম-ঠিকানাসহ ফোন নম্বর লেখা কাগজটি বাড়িয়ে দিলেন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত।

মন দিয়ে দেখে নিল আলিশা যেন মুখস্থ করছে। বলল, 'মনে হয় রেড স্কয়ার থেকে খুব দূরে নয়। দেখবেন একদিন চমকে দিয়ে আপনার হোটেলে হাজির হয়ে যাব।'

'সে হবে আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আমন্ত্রণ জারি থাকল। একসঙ্গে ডিনার করা যাবে কোনো সন্ধ্যায়।'

অধ্যায়-১১

মস্কো বিমানবন্দরে অনেকক্ষণ কনভেয়ার বেল্টের সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও লাগেজ পেলাম না। অদূরেই থাকা ব্রাসেলস এয়ারলাইনসের অফিস জানাল তারা ব্যাপারটা জরুরি ভিত্তিতে দেখবে ও লাগেজ আসা মাত্রই আমাকে জানাবে ও তাদের খরচে তৎক্ষণাৎ হোটেলে পাঠিয়ে দেবে। বলল, 'অনেক সময় এ রকম হয়ে থাকে। হয়তো কাল সকালের ফ্লাইটে আসবে।' ওরা আমার হাতে একটি ইমার্জেন্সি কিট ধরিয়ে দিল। টুথপেস্ট, ব্রাশ, শেভিং কিটস, চিরুনি এসব আছে।

এমন দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মস্কোতে আসার আমোদটি মাটি হয়ে গেল। এ রকম দুর্বিপাকে আগেও একবার পড়েছিলাম। ডে লাইট সেভিংয়ের জন্য ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে আনতে হয়। একবার প্যারিস থেকে দেশে ফেরার দিন সকালেই ডে লাইট সেভিং শুরু হয়েছিল। যখন চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিলাম কাতার এয়ারওয়েজ গেট ক্লোজ ক'রে দিয়েছিল। অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও কখনো কখনো এ রকম দুর্বিপাক এড়ানো যায় না।

মুখ কালো ক'রে ইমিগ্রেশন পার হলাম। বিমানবন্দরের বাইরে হালকা ঠাণ্ডা। হোটেল থেকে গাড়ি পাঠানোর কথা। ড্রাইভার হোটেলের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে বা আমার নাম লেখা প্ল্যাকার্ড। ডান দিকে তাকানো শেষ—বাম দিকটা দেখতে যাব এমন সময় লম্বা ওভারকোট পরা দুজন ব্যক্তি উদয় হয়ে বলল, 'আমাদের সঙ্গে আসুন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত। আপনার জন্য গাড়ি এ দিকটায় রাখা।'

আমি খুব নিশ্চিন্ত বোধ ক'রে ওদের পেছন পেছন পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। সম্ভবত একজন শোফার আরেকজন হোটেলের অভ্যর্থনাকারী—এ রকম মনে হলো আমার।

'আউরুস কমিনদান্ট'! রীতিমতো দামি গাড়ি। কালো রঙের গাড়িটা পার্কিং লটের একবারে বাম পাশে রাখা। একজন দরজা খুলে ধরল। দ্বিতীয়জন বলল, 'আপনার লাগেজ গাড়ি বুটে রেখে দিয়েছি স্যার। দুটো সুটকেস তো? হালকা নীল ও মেরুন কালারের?

আমি বিস্মিত হয়ে মাথা নাড়লাম। যে দরোজা খুলে ধরেছিল সে বলল, 'হাতের ট্রলি ব্যাগটা সামনের সিটের কাছে রেখে দিচ্ছি।'

গাড়ির ভেরতটা অন্ধকার। ইঞ্জিন চালানো ছিল। হিটার চলছিল। গাড়ির ভেতরে এক পা সিঁধিয়ে শরীরটা টেনে নিলাম। বসতে বসতে অন্ধকারের মধ্যে কে যেন বলে উঠলেন, 'আসুন জেনারেল, আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'জেনারেল মারকোভিচ!'

'ঠিক তাই। আদি ও অকৃত্রিম। এখন ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসে কাজ করি। শুনলাম আপনি দেশে ফেরার পথে মস্কোতে চার-পাঁচদিন থাকবেন। তাই পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চ'লে এসেছি।'

'আপনি আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। আপনার লোকজন আমার লাগেজ এনে গাড়িতে রেখে দিয়েছে। কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! ওভারকোট না এনে ভুল করেনি। হাড় ফুটো ক'রে ঢুকে পড়ার মতো কড়া শীত নয়।'

জেনারেল মারকোভিচ তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একদম ভাববেন না। শীত পড়তে আরো কিছু দেরি আছে বটে তবে সামনের সিটে একটা ওভারকোটের প্যাকেট রাখা আছে! বন্ধুর তরফ থেকে সামান্য উপহার।'

করমর্দন সম্পন্ন হলে বললাম, 'জেনারেল, আপনি তো আমাকে রেখে চলে এলেন—আমাকে আরো চার বছর থাকতে হলো।'

'ব্রাসেলস শহরটা খুব ছোট। বছরখানেক থাকলেই একঘেয়েমি ধ'রে যায়। যা-ই হোক, এখন তো একঘেয়েমির অবসান হয়েছে। দেশে ফিরতে চলেছেন।'

'হ্যাঁ, দেশে ফিরছি। খুব গোলযোগ চলছে শুনতে পাচ্ছি। তবে দেশ তো দেশই! ফিরতে তো হবেই।'

'আমার কার্ডটা রাখুন। ফোন নম্বর আছে। যে নম্বরের শেষে ৭ সেটি ব্যক্তিগত: পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের জন্য। আপনি ওই নম্বরে আমাকে পাবেন।'

'হোটেলটা কি বেশি দূরে?'

'শহরের একদম মাঝে। আর পনের মিনিট। এই পাঁচ দিন কী করবেন, কোথায় কোথায় যাবেন—ঠিক ক'রে এসেছেন? আপনি চাইলে আমাদের হেড কোয়ার্টারে একদিন সকালে আসতে পারেন—সময় যদি হয়।'

'হোটেলে চলুন না, এক সাথে ডিনার করব।'

'আজ সময় হবে না। আপনাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়েই আমাকে যেতে হবে একটি দূতাবাসে। পার্টি চলছে। যাব আর পার্টি শেষ হবে।'—একটু হাসলেন জেনারেল মারকোভিচ।

'আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আগামীকাল রাতে।'

'চেষ্টা করব। ফোনে কথা ব'লে নেব।'

'আপনাকে পেয়ে খুব নিশ্চিত বোধ করছি।'

'ব্রিগেডিয়ার শাফকাত, আপনার জন্য একটি খারাপ খবর আছে। আপনার জানা থাকা দরকার।'

আমি চমকে গিয়ে ঝটিতে জেনারেল মারকোভিচের দিকে তাকালাম, 'খারাপ খবর? মানে কী?'

'না, ব্যক্তিগত কোনো খারাপ খবর না। আপনাদের বর্তমান সরকারের পতন হতে যাচ্ছে। হয়তো আগামী দু'তিনদিনের ভেতর। আপনি একটি অস্থির সময়ে দেশে ফিরতে যাচ্ছেন। ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। অনেক বিক্ষোভকারী ও সাধারণ মানুষ মারা গেছে। সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ অফিসার ও জওয়ান জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিতে অসম্মত। দাবার ছক উল্টে গেছে। খুব দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।'

'আমাদের প্রধানমন্ত্রী?'

'তাকে নিয়েই সমস্যা। তিনি মেনে নিতে চাইছেন না। তিনি মনে করেন আর কিছু গুলি চালালেই কেল্লা ফতে। কিন্তু সেনাবাহিনী অসম্মত। তারা জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাবে না।'

'শেষ পর্যন্ত কী হতে যাচ্ছে?'

'বলা মুশকিল। তবে প্রতিবেশী একটি দেশ প্রধানমন্ত্রীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছে।'

'তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন।'

'না, মানে তাকে ওদেশে নেয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা গেছে। এখন তিনি রাজি হলেই হয়।'

বাকি পথটা চুপচাপ কাটল।

হোটেলে গাড়ি ঢোকানোর পর জেনারেল মারকোভিচ আবার মুখ খুললেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ রকম অনিশ্চিত অবস্থায় আপনাকে বিশেষ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হতে পারে। দেশের ভেতরে থেকেই কিছু কাজ করতে হবে। এই খামটা ধরুন। এর ভেতর আপনার মস্কো থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে সিঙ্গাপুর ও সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকা পৌঁছানোর টিকিট আছে। দুঃখিত যে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই যাত্রাপথ পরিবর্তন করতে হয়েছে। দিল্লিতে আপনি এক রাত থাকবেন। সিঙ্গাপুরে তিন-চার রাত থাকতে হতে পারে। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর আপনি প্লেনে উঠবেন। সেটাই নিরাপদ।'

'আমাদের চিফ জানেন?'

'না, আপনার বিষয়টা জানানো হয়নি। জানানো হবে। তিনি আপনাকে কোনো একটি গোয়েন্দা সংস্থায় পদস্থ করবেন।'

'আমার আর কাজ করার ইচ্ছে নেই বন্ধু। সম্ভবত আপনার দেয়া টিকিটই আমি ব্যবহার করব। কিন্তু নতুন দায়িত্ব পালনের মনমানসিকতা একেবারেই নেই।'

পিঠে হাত রাখলেন জেনারেল মারকোভিচ। খুব আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের জীবনটা আমাদের ইচ্ছায় চলে না। আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনোদিন গোয়েন্দা বিভাগে

কাজ করার ইচ্ছা ছিল না। ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধ লাগার পর থেকে আমি সিকিউরিটি সার্ভিসে মানে কেজিবিতে। প্রায় দু'বছর হয়ে গেল। আপনার মতো আমিও ক্লান্ত।'

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ও হ্যাঁ, মস্কো থেকে দুবাই হয়ে ঢাকা যাওয়ার টাকাটা যেন ফেরত পান সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'দেখা হচ্ছে কবে? এক সঙ্গে এক কাপ কফি তো খাব?'

'কাল আর পরশু সারাদিন নিজের মতো করে মস্কো শহরটা দেখুন। তারপর দিন আমাদের সদর দপ্তরের ক্যাফেটেরিয়াতে দুপুরে একসঙ্গে লাঞ্চ করব।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'আমি প্রতি রাতে ফোন ক'রে জানাব ঢাকার খবর। রাত এগারোটার দিকে।'

'মস্কো থেকে সরাসরি সিঙ্গাপুর চলে গেলে হতো না?' আমি সন্দিগ্ধ চোখে প্রশ্ন করি।

'দিল্লির চিফ সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী। তার অনুরোধেই আমরা নাক গলিয়েছি।'

'সেটা কি কোনো ব্রিফিং সেশন?'

'ঠিক তাই।'

'আমরা হোটেলে এসে গেছি। ড্রাইভার আপনার মালপত্র নামিয়ে দিচ্ছে। আজ থেকে তৃতীয় দিনে আপনাকে নিতে এ ড্রাইভার আসবে;— দুপুর বারোটায় তৈরি থাকবেন।' করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন জেনারেল মারকোভিচ।

অধ্যায়-১২

রুমে মালপত্র রেখেই ওভারকোট চাপিয়ে বের হয়ে পড়লাম আমি। আলিশার হোটেলের নামটা কাগজে লিখে নিয়েছি। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে কাগজটা দেখালাম।

আলিশার হোটেলে যখন পৌঁছুলাম সকাল রাত প্রায় এগারোটা। রিসেপশনে পৌঁছে বললাম, 'আমার একজন সহকর্মী কিছুক্ষণ আগে চেক-ইন করেছেন। আমাদের একসঙ্গে ডিনার করার কথা ছিল। আমি একটু দেরি ক'রে ফেলেছি। দেখুন তো আলিশা সিনাওয়াত্রা ঘরে আছে কিনা।'

কম্পিউটার নাড়াচাড়া ক'রে ডেস্ক অফিসার বললেন, 'ম্যাডাম তার কামরাতেই আছে। ওই যে হাউজফোন। ০৩১৭ নম্বরে ডায়াল করুন।'

'০৩১৭'—আমি মনে মনে আউড়ে নিয়ে দেয়ালে আটকানো হাউজফোনের দিকে এগিয়ে যাই।

আমার গলা শুনে আলিশা একটু চমকে ওঠে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কোনো সমস্যা? জরুরি কোনো প্রয়োজন?'

'বিষয়টা জরুরি। তবে সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। একটু পরামর্শ করা দরকার।'

'আমি এখনো ডিনার করিনি। মনে হচ্ছে আপনিও ডিনার করার সুযোগ পাননি। আমরা এই হোটেলে বা বাইরে কোনো রেস্তোরাঁতে খেতে খেতে কথা বলতে পারি।'

রিসেপশনে গিয়ে বললাম, 'ডিনারের জন্য ভালো একটা রেস্তোরাঁর নাম-ঠিকানা দিন। ইন্টারন্যাশনাল ফুড থাকলে ভালো হয়।'

'আমাদের হোটেলের রেস্তোরাঁ রাত একটা পর্যন্ত খোলা। ইন্ডিয়ান ফুড অবশ্য নেই। 'তাজমহল' নামে বড় একটি রেস্তোরাঁ আছে— ভালো—ট্যাক্সি নিয়ে গেলে পাঁচ মিনিট লাগবে। আশা করি ওটা খোলা থাকবে।'

আলিশার জন্য লবিতে অপেক্ষা করতে থাকি। ইউরোপের হোটেল বা থাইল্যান্ড মালয়েশিয়ার হোটেলের তুলনায় মস্কোর হোটেলটিকে কিছুটা ম্লান মনে হলো। লবিতে সাজসজ্জা নেই—আলোর প্রাচুর্য নেই। নিছকই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

পোশাক পাল্টে নিয়েছে আলিশা। তাকে কিছুটা উত্তেজিত মনে হলো।

বললাম, 'বাইরে খেতে চাই। ইন্ডিয়ান ফুড আছে কাছেই। যাওয়া যায়, কী বলো?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল আলিশা। তাজমহল পৌঁছে আলিশা পোলাওয়ের সঙ্গে চিকেন টিক্কা মাসালা খেতে চাইল। আমি ভেজিটেবল বিরিয়ানি চাইলাম।

'শোনো আলিশা, আমি কেজিবি'র পাল্লায় পড়ে গেছি। উদ্ধার পাওয়া দরকার। আমাদের দেশে গোলযোগ চলছে। 'অ্যারাব স্প্রিং' বলতে পারো। যেকোনো দিন সরকারের পতন হয়ে যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় দিতে একটি দেশ রাজি। কেজিবি বলছে ওই প্রতিবেশী দেশকে সহায়তা দিতে। ওরা আমার মস্কো-দুবাই-ঢাকা টিকিট বাতিল করে মস্কো-দিল্লি-ঢাকা টিকিট কিনে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি কাল সকালেই এয়ারপোর্টে গিয়ে টিকিট কেটে অন্য কোনো দেশে চলে যেতে চাই।'

একটা পাঁপড় ভেঙে এক টুকরা মুখে পুরে আলিশা বলল, 'বুঝতে পারছি না আপনাকে দিয়ে কী করাতে চায়। কিন্তু কেজিবির হাত থেকে কি পালানো সম্ভব হবে? মনে হয় না মস্কো এয়ারপোর্ট দিয়ে ওরা আপনাকে অন্য দেশে যেতে দেবে না। অন্য কোনো টিকিটই কাটতে দেবে না। কিন্তু তারা পৃথিবীর সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকেই কেন বাছাই করল?' অবাক কণ্ঠে আলিশা জানতে চাইল।

আমি ব্রাসেলসে জেনারেল মারকোভিচের রাশিয়ার ডিফেন্স অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করার কথা বললাম। এয়ারপোর্টে গিয়ে তিনি আমাকে ধ'রে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছেন। কনভেয়ার বেল্টে আমার লাগেজ আসেনি। তার লোকজন নির্ভুলভাবে লাগেজ সংগ্রহ ক'রে জেনারেল মারকোভিচের গাড়িতে তুলে দিয়েছে।

চিন্তিত কণ্ঠে আলিশা বলল, 'কিন্তু বড় প্রশ্ন হলো আপনাকে কী কাজ করতে হবে। কেন দিল্লিতে গিয়ে আপনাকে ব্রিফিং নিতে হবে। আপনি অবসর নিয়েছেন। আপনি তো আর কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন।'

'অনুমান করা কঠিন না। আমার মনে হচ্ছে ওরা চায় আমি দেশে গিয়ে ওদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করি। এ রকম কাজ আমি কখনই করব না। নিজেকে দু'মুখো সাপ হিসেবে কল্পনা করতেও আমার লজ্জা হয়।'

'একটু দেখুন। আপনার দেশের পরিস্থিতিটাও পর্যালোচনা করা দরকার।'

'হুম। দু'একদিন অপেক্ষা করা যায়।'

অধ্যায়-১৩

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট শেষে আমি বললাম, 'রেড স্কয়ারে গিয়ে লেনিনের মামি দেখে আমাদের মস্কো সফর শুরু করলে কেমন হয়?'

'ঠিক আছে।'

'বাইরের আবহাওয়াটা চমৎকার। রোদ উঠছে, কিন্তু তাপমাত্রা খুব কম নয়। কী পরে বের হতে চান?'

'আমার একটা লাইট জ্যাকেট আছে। অফ হোয়াইট কালার। ভাবছিলাম ওটা পরব।'

'ভেতরে সিল্কের লাইনিং আছে?'

'আছে।'

'তাহলে গরম লাগবে না। তাপমাত্রা কমে গেলেও কাজে দেবে।'

মেট্রোর এক নম্বর লাইনে ক'রে আমরা পৌঁছে গেলাম অখোতনি রিয়াদ স্টেশনে। সামান্য হাঁটতেই রেড স্কয়ারের দেখা পাওয়া গেল। কাছাকাছি গিয়ে দেখি দোকানের সারি। ভাবলাম একটি এটিএম মেশিন থেকে কিছু রুবল তুলে নেব। ব্রাসেলসের ক্রেডিট কার্ড মস্কোতে ঠিকঠাক কাজ ক'রে কিনা সেটাও পরখ করা হয়ে যাবে।

এটিএম মেশিনে ক্রেডিট কার্ড ঢোকাতে যাব এমন সময় ছোটখাটো একজন মানুষ এসে ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'মানি চেঞ্জ স্যার। গুড ডলার রেট। ওয়ান ডলার হান্ড্রেড রুবল।'

ছোটখাটো লোকটির গায়ে নীল রঙা জিন্সের মলিন জ্যাকেট। চোখের নিচে গাঢ় কালি। বাম চোখের কোণে পিঁচুটি লেগে আছে। মনে হলো সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মুখ ধুতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চায়নি।

'হাউ মাচ ডলার স্যার?' সে জিজ্ঞেস করল।

ওর কথা বলার ভঙ্গির সাথে আমি পরিচিত। প্রায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাড়ি চট্টগ্রাম?

'জি বদ্দা। এক চোটে কী ভাবে ধ'রে ফেললেন? কত ডলার ভাঙাবেন?'

'বেশি না আপাতত ২০০ ডলার।'

মাত্র দুইশ' ডলার শুনে সে হতাশ হলো।

সে বলল, 'অন্তত এক হাজার ডলার ভাঙিয়ে নেন। ডলারে ১০০ রুবল দেব। কয়দিন থাকবেন? হোটেলের বিল দিতে রেস্টুরেন্টের বিল দিতে প্রতিদিন চার-পাঁচশ ডলার লেগে যাবে।'

ওর হিসাব ঠিক আছে। প্রতিদিন ও রকমই যাবে।

'বর্দ্দা অনে কি বাংলাদেশোরতুন রাশিয়া বেরাইতু এরচ্ছুনযেনা? হ-দিন থাকিবান?

'দিন সাতেক। তারপর দেশে ফিরে যাব।'

'এডে এক্কানা চায়-চিতি ঘুরাঘরি গরিবান। পকেটমারন্নার শেষ নেই। ক্রেডিট হার্ড ব্যাংকর হার্ড পাসপোর্ট এগিন হোটেলত তালা মারি রাখি আইবান। সাবধানে থাইক্কুন।'

বললাম, 'ধন্যবাদ সাবধান করে দেয়ার জন্য।'

আমি বললাম, 'ক'বছর আগে দেশে এসেছো?

'চার বছর চলছে।'

'শুধু ডলারের ব্যবসা কর?'

'না বর্দ্দা। বিকাল থেকে নানা রকম জিনিসের ছোট একটা দোকান ভ্যানগাড়িতে চালাই। সকালের দিকে ডলার বেচাকেনা করি। ট্যুরিস্টরা হোটেল থেকে বের হয়ে আগে ডলার ভাঙিয়ে রুবল করে।'

'এতে চলে যায়?'

সে জানালো বিকেলের ব্যবসাটা খারাপ না। মাস শেষে যে মুনাফা জমে তার পরিমাণ খুব বেশি না হলেও ভালো বলা যায়। সমস্যা হচ্ছে মাঝে মাঝে পকেটমার যায় এবং বছরে এক-দু'বার তার বাসায় ডাকাতি হয়। পরিচিত লোকজন মুখোশ পরে এসে টাকা-পয়সা চুরি ক'রে নিয়ে যায়। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যখন রাত বারোটার দিকে দুর্বৃত্তরা এসে দোকান থেকে মালপত্র ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এ রকম হলে পরের দিন আর ব্যবসা করা যায় না। তবে এখনো ও রকম দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়নি।

কৌতূহলোচ্ছলে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে তোমাদের কেউ নেই যে ব্যবসা ক'রে বড়লোক হয়ে গেছে?'

'রাস্তায় ব্যবসা ক'রে বড়লোক হওয়া যায় না। বিদেশী লোকজন অনেক টাকা খরচ করে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক হাজার রুবলের জিনিস তিন হাজার রুবল দিয়ে কিনে খায়। কিন্তু রাস্তা থেকে স্যুভেনির ইত্যাদি কেনার সময় খুব দর কষাকষি করে।'

সে কমল নামে একজনের কথা বলল। কমল সাত বছর আগে মস্কোতে এসেছিল। এখন বড়লোক। কিন্তু যেভাবে সে বড়লোক হয়েছে সেটা কহতব্য নয়। সেটা মানুষের কাজ নয়। কী ক'রে বড়লোক হলো কমল?—কী আর? পর্নো ফিল্মে অ্যাক্টিং ক'রে। শুয়ে-বসে মাসে ৩-৪ লক্ষ রুবল আয় করে।

'তুমি তো সারাদিন রাস্তায় কাজ কর। অনেক কষ্ট কর। শুনেছি শীতকালে মস্কোর রাস্তায় আধা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। একটা রেস্টুরেন্টে কাজ নিলে তো একটু আরামে থাকতে পারতে।'

'কথা ঠিক বর্দ্দা। কিন্তু ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে খাটো মানুষ নিতে চায় না। আমার উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। শরীরের রঙ ময়লা। চেহারাটা দেখেন। আশেপাশে তাকান। এ রকম খারাপ চেহারার আর কেউ আছে? নাই। এ রকম বেঁটে মার্কা কাউয়া টাইপের কাউকে ওয়েটার হিসেবে নিতে চায় না কোনো রেস্তোরাঁ। রান্না জানলে অবশ্য বাবুর্চি হিসেবে ভালো কামাই করতে পারতাম। কিন্তু চট্টগ্রামের মানুষের হাতে রান্না খোলে না। পোলাও-কোরমা রেঁধে দেখেছি। রুমমেটরা বলে অখাদ্য।' অকপটে তার কাহিনী বলে গেল পলাশ।

'মস্কো শহরে ধনী বাঙালি কে?'

'জহির উদ্দিন হাওলাদার। আর্মিতে সাপ্লাই দেয়। আর্মিতে সাপ্লাইয়ার ব্যবসায় অনেক লাভ। বড় বড় অফিসারদের সাথে তার ওঠাবসা। শনিবারে শনিবারে ক্যাসিনোতে গিয়ে জুয়া খেলে। দুই-তিনটা দামি গাড়ি আছে। একটা গাড়ি আছে দাম ৬ লক্ষ ডলার।'

আমি ওর গল্প শুনতে শুনতে এটিএম মেশিনে ক্রেডিট কার্ড ঢুকিয়ে ১০০ ডলার চাইলাম। পাসওয়ার্ড দিতেই মেশিন কাজ শুরু করল। ১০০ ডলারের সমান ৮,৫০০ রুবল পাওয়া গেল।

ছেলেটি হতাশ কণ্ঠে বলল, 'মেশিন থেকে টাকা তুললে লস। আমার কাছ থেকে নিতেন।'

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, 'এদেশে বিদেশী কার্ড চলে কিনা দেখে নিলাম। তুমি আমাকে দু'শ ডলার ভাঙিয়ে দাও।'

'বর্দ্দা কমসেকম ৫০০ ডলার নেন। তাইলে ভালো রেট দিতে পারব।' পলাশ একটু নিরাশ গলায় বলল।

'তোমার যা ইচ্ছা সেই রেইট দাও। আপাতত দু'শ ডলার ভাঙিয়ে নিলেই আমার চলবে। তাছাড়া আজ প্রথম দিন। পকেটে বেশি টাকা নিয়ে বের হইনি।'

পলাশ হতাশ মনে আমাকে দু'শ ডলার বানিয়ে ভাঙিয়ে দিল। ১৮ হাজার রুবল। এক ডলারে ৯০ রুবল।

'এখানকার ভাষা কিছু শিখেছো?'

'দু'একটা কথা বলতে পারি।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'দুয়ানত গেলি দরাদরি গরিবান। ন-ওলি ইতারা ৫০০ রুবলোর মাল দুই আজার রুবল চাইবু। এডে এক্কানা চায়-চিতি ঘুরাঘরি গরিবান।'

'চাঁটগার ভাষা খুব একটা বুঝি না।'

'দোকানে গিয়ে কিছু কিনলে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। আমি ভালো দরাদরি করতে পারি। ঘণ্টায় পাঁচ ডলার দেবেন। আর ফুন নম্বর ইবা রাকি দোন। দরহার লাগিলে ওগ্গো ফুন দিও।'

পলাশের নাম ও নম্বর আমার ফোনে টুকে নিলাম।

আলিশা এসে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে 'মস্কো টাইমস' কিনতে গিয়েছিল। বলল, 'এখানে কী করছেন?'

'ক্রেডিট কার্ড কাজ করে কিনা সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। এই লোক আমার দেশের লোক। ভাগ্য ফেরানোর জন্য সে রাশিয়াতে এসেছে। টুকটাক কাজকর্ম ক'রে কোনোভাবে বেঁচে আছে।'

আলিশা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'আশেপাশে কোনো ইংরেজি বইয়ের দোকান আছে?'

ছেলেটি জানাল আছে একটা: 'কী বই কিনবেন? বাংলাদেশের ওপর কোনো বই নেই। লেনিনের স্মৃতিসৌধে যাবেন না? গেলে সকাল সকাল যান। কাছেই। দশটা থেকে একটা পর্যন্ত খোলা। একটু পরেই ভিড় লেগে যাবে।'

আমরা পলাশের উপদেশ উপেক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমে লেনিনের স্মৃতিসৌধ দেখব। তারপর অন্য সব। লাঞ্চ একটায়।

একজন লোক এসে বলল, 'আমি গাইড। আমার সাথে চলুন। মাত্র দশ ডলার দেবেন। তবে স্মৃতিসৌধের ভেতরে কথা বলা নিষেধ। চুপচাপ দেখে বাইরে এসে যা জিজ্ঞেস করার করবেন। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।'

আলিশা আমার দিকে তাকাল। আমি হালকা মাথা ঝাঁকালাম।

লোকটি বলল, 'এই আমার কার্ড। আমার নাম ভিক্টর আগ্রানকোভিচ। কার্ডে আমার নাম ও ফোন নম্বর দেয়া আছে। দশ ডলার অগ্রিম দিতে হবে।'

'অগ্রিম?'

'হ্যাঁ, অনেক পর্যটক স্মৃতিসৌধ থেকে বের হয়ে গাইডের কথা ভুলে যায়।'

'আমি কিছু বলার আগেই আলিশা ১০ ডলারের নোট বের ক'রে গাইডের হাতে দিল।

'আসুন আমার সঙ্গে।'

'টিকিট কত?'

'টাকা দিতে হবে না। তবে মাথায় হ্যাট রাখবেন না, পকেটে হাত রাখবেন না, হৈচৈ করা নিষেধ। চুপচাপ দেখে চলে আসবেন। ফটো তোলা ভিডিও করা নিষেধ। ফোন সাইলেন্ট করুন দয়া ক'রে।'

স্মৃতিসৌধে ঢুকে বেরিয়ে আসতে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মতো লাগল। ঢোকার সময় গার্ডদের চেকিংয়ে অনেকটা সময় লেগে গেল। আমরা লেনিনের মরদেহের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলাম। ভিড় ছিল না। তবু গার্ডরা ঠেলেঠুলে বের ক'রে দিল।

বাইরে এসে ভিক্টর বলল, 'গার্ডগুলো বদের বদ। অমানবিক। এখনো তো লম্বা লাইন হয়ে যায়নি। একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দিলে কী হতো? এই স্মৃতিসৌধ ১৯৩০ থেকে খোলা। লেনিনের শরীরটা মামি ক'রে রাখা হয়েছে।'

আলিশা বলল, 'ঝকঝকে স্যুট, উজ্জ্বল মুখাবয়ব। ঠিক মামি ব'লে মনে হলো না। আমি মিসরে মামি দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। সে রকম না।'

'আপনারা ঠিকই বলেছেন। মামি না ব'লে বলা উচিত 'সংরক্ষিত

মরদেহ'। তবে মামি বললে সবাই চট ক'রে ধরতে পারে। ভ্লাদিমির লেনিনের মৃত্যু হয় ১৯২৪-এ। মরদেহটি নানা রকমের রাসায়নিক দিয়ে কাচের বাক্সে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে সমস্যা হয়, কখনো কখনো ত্বকে ছোপ ছোপ দাগ পড়ে যায়, বিশেষ ক'রে মুখমণ্ডলে। কেমিস্টরা সে সমস্যারও সমাধান ক'রে ফেলেছে। চামড়া কুঁচকে গেলে বা রঙ চটে গেলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও ইথাইল অ্যালকোহলের দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়। কখনো হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, ফেনল ও কুইনিনও কাজে লাগে।'

আরো অনেক ঐতিহাসিক তথ্য দিল ভিক্টর। বলল, 'ফটো তোলা নিষেধ। জ্যাকেটের পকেট থেকে ফোন বের করলেই উড়ে এসে গার্ডেরা পাকড়াও করে। তবে দশ ডলার দিলে আমি একটি ফটো দিতে পারি। আমার নিজের তোলা। লুকিয়ে তুলেছিলাম গত মাসে। আলো কম ছিল। ভালো ওঠেনি। তবু বলতে পারবেন, একটা ফটো তুলতে পেরেছিলাম।'

আলিশা বলল, 'মিথ্যা কথা বলতে চাই না। তবে আপনি ফটোটা দিন। স্মৃতি হিসেবে রেখে দেব।' সে অক্লেশে দশ ডলার বের ক'রে দিল।

'তাতেই হয়ে গেল?'

'সরকারি কর্তাব্যক্তিরা জনতার এ দাবি মেনে নিয়েছিলেন; সায় দিয়েছিলেন লেনিনের স্ত্রী, ভাই ও বোনেরা।'

'মৃত্যুর পর সমাধি লাভের ব্যাপারে লেনিনের ইচ্ছা এবং অধিকার কোনোটিই কার্যকরী হলো না। কার্যকর হয়েছে এ বিষয়ে গৃহীত একটি সামাজিক সিদ্ধান্ত। এ মেনে নেয়া যায় না। একজন মৃত মানুষের প্রতি ঘোর অন্যায়।'

ভিক্টর ম্লান মুখে বলল, 'একটা গণভোট আয়োজনের কথা শুনতে পাচ্ছি। তাকে মাটিতে সমাধিস্থ করা হবে না রেড স্কয়ারের পাহারায় চিরকাল রেখে দেয়া হবে তা নিয়ে অচিরেই গণভোটের আয়োজন করা হবে। বেশিরভাগ মানুষ দাফনের পক্ষে রায় দিলে তাকে সমাধিস্থ করা হবে।'

'সেটি হবে ঘোরতর অন্যায়। মৃত্যুর পর মাটিতে শেষ শয্যা লাভ মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। এ বিষয়ে সমাজের কোনো মত-অভিমত থাকতে পারে না।'

'এ বিষয়ে তর্ক করতে চাই না ম্যাডাম। আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। আর কিছু জানার না থাকলে এবার আমাকে বিদায় দিন।'

ভিক্টর ওর জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটি ডাটা ট্রান্সফার কেবল বের ক'রে আলিশার ফোনে লেনিনের মরদেহের ফটো কপি ক'রে দিল।

'আপনার কি মনে হয় না লেনিনকে সমাধিস্থ করা উচিত? মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে যাক।'

ভিক্টর সামান্য হেসে বলল, 'ম্যাডাম আপনার চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে পারি। লেনিন উইল ক'রে গিয়েছিলেন যেন মৃত্যুর পর তাকে সেইন্ট পিটার্সবুর্গে অবস্থিত মায়ের সমাধির পাশে সমাধিস্থ করা হয়। জনতা তা' হতে দেয়নি। তার মৃত্যুর পর হাজার হাজার লেনিনভক্ত বলশেভিক বিপ্লবী মস্কোতে জমায়েত হ'য়ে তাদের প্রিয় নেতাকে সমাধিস্থ না ক'রে চিরকালের জন্য দৃশ্যমান রাখার ব্যাপারে দাবি জানায়।'

ভিক্টর দ্রুত ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল আরেকজন ইচ্ছুক পর্যটকের খোঁজে।

আলিশা বলল, 'মৃত ব্যক্তির অভিপ্রায় সম্মান করা উচিত। গতকাল প্লেনে আসার সময় দেখলাম মার্কেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার শেষ উপন্যাসটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার দুই ছেলে রদ্রিগো ও গনযালো। এ আমি কখনই মেনে নেব না। তাদের উচিত ছিল বাবার শেষ ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানো। আমি ঠিক করেছি এ উপন্যাসটি আমি কখনো কিনব না, পড়বও না।'

আলিশার কণ্ঠের দৃঢ়তা আমাকে বিস্মিত করল। ও মনে হয় একটু রেগে গেছে। গালটা লাল হয়ে গেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। আমি জিপলক প্যাকেট বের ক'রে এগিয়ে দিলাম। আলিশা রুমাল বের ক'রে মুখটা মুছে নিল।

'চলো তাহলে কোথাও ব'সে লাঞ্চ ক'রে নেই। খুব দ্রুত ভিড় বাড়ছে।'

অধ্যায়-১৪

সকাল সাতটায় ব্রিগেডিয়ার শাফকাত যখন বিছানা থেকে উঠবেন কিনা ভাবছেন—তখন ফোনটা এল। মোবাইল ফোন না—হোটেলের ফোনসেট বেজেছে। এত সকালে হোটেলের ফোন কেন? তিনি কি সাতটায় 'মর্নিং কল' দিতে বলেছিলেন?। ভ্রু কুঁচকে তিনি হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে। সুইচবোর্ড অপারেটর পরিষ্কার ইংরেজিতে বলল, 'স্যার, এত সকালে বিরক্ত করার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত। আপনার বন্ধু মারকোভিচ সাহেব ফোন করেছেন। তিনি বললেন অত্যন্ত জরুরি খবর আছে, এখনি আপনাকে না দিলেই নয়।'

'লাইন দিন।'

'দোবরেয়ে উৎরা, ময় দ্রুগ। খবরটা খুব জরুরি।'

'বলে ফেলুন। অধৈর্য হয়ে যাচ্ছি।'

'আজ সরকারের পতন হতে যাচ্ছে।'

'আজই?'

'ঠিকই শুনেছেন।

'আপনি নিশ্চিত?'

একগাল হেসে জেনারেল মারকোভিচ বললেন, 'মান্যবর বন্ধু, আলিশা সিনাওয়াত্রা আপনার কে হয় সে আমি জানি না। কিন্তু আপনাকে আমি নিবিড়ভাবে জানি। আমার দৃঢ় ধারণ আপনি কোনো ভুল ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন না।

'এ কথা কি সহজে মেনে নেয়া যায়? আপনি জানেন জেনারেল, আপনার স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।'

'আমি বলব বিয়ের জন্য তাকে পছন্দ ক'রে আপনি ভুল করেননি। বরং তিনি ভুল ক'রে নতুন জীবন বেছে নিয়েছিলেন আপনার অবর্তমানে। তার ভুল।'

'মনে হয় আপনাদের দপ্তরে আমার নামে একটি পৃথক ডোশিয়ে আছে।'

'তা আছে। ও হ্যাঁ গাড়িতে একটি স্যুটকেস থাকবে। পরে নামালেও চলবে। সেটাতে কিছু কাপড়-চোপড় আছে, আপনার কাজে লাগবে।'

ধীরে-সুস্থে বিছানা ছাড়লেন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত। প্রথমে মেরুন কালারের স্যুটকেস খুলে পিস্তলের বাক্সটা চেক করলেন। পিস্তলটা

'প্রধানমন্ত্রী?'

'তিনি দেশত্যাগ করবেন।'

'ব্রেকফাস্ট?'

'দ্রুত রেডি হয়ে নিন। ঠিক সাড়ে নয়টায় একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব।'

'গাড়ি পাঠাচ্ছেন?'

'পাঠাচ্ছি।'

'আলিশা সিনাওয়াত্রার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করার কথা ছিল। সেটার কী হবে?'

'বিশ্বস্ত?'

'একশত ভাগ।'

'সাথে নিয়ে চ'লে আসুন।'

এমন একটি রে-প্রুফ কাগজে মোড়ানো যে স্যুটকেসের ভেতরে পিস্তল থাকলেও স্ক্যানার তা ধরতে পারে না।

সহসা কি পিস্তলটার প্রয়োজন আছে। সম্ভবত না। কবে প্রয়োজন হবে?

ব্রেকফাস্টের জন্য যেতে হবে কোনো রেস্তোরাঁয় নাকি ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের সদর দপ্তরে জেনারেল মারকোভিচের অফিসে? গাড়ি না আসা পর্যন্ত বোঝা যাবে না। আটটার দিকে আলিশার চ'লে আসার কথা। সে বলেছে ব্রেকফাস্টের পর একটি বিখ্যাত মিউজিয়াম দেখতে নিয়ে যাবে। মিউজিয়াম দেখার ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার শাফকাতের বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। সময় কাটানোর জন্য কিছু একটা করা দরকার তাই তিনি মিউজিয়াম দেখতে যেতে রাজি হয়েছেন।

প্রাতঃকৃত্য হয়ে গেলে তিনি যত্ন ক'রে শেভ করলেন। তারপর গরম পানি ছেড়ে অনেকক্ষণ শাওয়ার নিলেন। বাথরুম থেকে তোয়ালে জড়িয়ে বের হয়ে আসার সময় তার মনে হলো শরীরটা বেশ চাঙ্গা লাগছে। সাধারণ পোশাকে বের হতে চেয়ে ছিলেন; পাছে সিকিউরিটি সার্ভিসের সদর দপ্তরে যেতে হয় তাই সিদ্ধান্ত পাল্টে তিনি স্যুট পড়লেন। হালকা নীল শার্ট গাঢ় নীল স্যুট আর গাঢ় মেরুন কালারের জমিনে নীল বুটি দেয়া টাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার মনে হলো পোশাকটা তাকে বেশ মানিয়েছে।

মস্কো সফরটা ছিল নাটকীয়তায় ভরা। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি এখানে এসে ফাহমিদা কিংবা কর্নেল আজিজ পাশার সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে। রেড স্কয়ারে ফাহমিদার কথাবার্তায় তিনি খানিকটা অবাক হয়েছিলেন। ছ'বছর আগেও তারা ছিলেন বিবাহিত দম্পতি এবং একই বিছানায় রাত কাটিয়েছেন অনেক বছর—তারপর ব্রাসেলসে পদস্থ হওয়ার পর কিছু না বলে এক বছরের মাথায় একতরফা তালাকের নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছিল ফাহমিদা। রেড স্কয়ারে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে ফাহমিদা এমনভাবে কথা বললো এসব কিছুই যেন ঘটেনি কোনো কালে। সে যেন কেবল কর্নেল আজিজ পাশার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল : সেটাই প্রথম ও সেটাই শেষ—ব্রিগেডিয়ার শাফকাত নামে কেউ তার জীবনে ছিল না। মনে হয় সে ভালোভাবেই অতীতকে চাপা দিতে পেরেছে। ভালো। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অতীতকে লুকিয়ে রাখার দরকার থাকতে পারে।

কিন্তু নিঃসন্দেহে ওর চেহারার উজ্জ্বলতা হ্রাস পেয়েছে। ফাহমিদার মুখাবয়ব ছিল কমনীয় অথচ বাঙ্ময়। এখন সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিস্পৃহতা স্থান ক'রে নিয়েছে। মনে হয় গত চার বছরে সে অনেকখানি বদলে গেছে। আজ রাতে তিনি ওদের ডিনার খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। জেনারেল মারকোভিচকে জিজ্ঞেস করতে হবে কোন্ রেস্তোরাঁতে অথেনটিক রাশান কুইজিন পাওয়া যায় : অথেনটিক ও সুস্বাদু। তার অভিজ্ঞতা বলে : রেস্তোরাঁর অনেক বাবুর্চি অথেনটিক রেসিপি অনুসরণ করতে গিয়ে খাবারের স্বাদের প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে।

ঠিক সোওয়া আটটায় তার দরজায় কেউ বেল টিপল। এত সকালে হাউজকীপার?

হাউজকীপার নয়—আলিশা। লাউঞ্জে অপেক্ষা না করে ঘরে চলে এসেছে। বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এসো আলিশা, বসো। চমৎকার একটা পোশাক পরেছো, ভালো লাগছে।'

'আপনাকেও হ্যান্ডসাম ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গাঢ় নীল রঙের স্যুট আর মেরুন টাই। মানিয়েছে খুব। আমি একটু স্বাধীনতা নিতে পারি?'

ব'লে আলিশা খুব কাছে এসে বলল, 'অনুমতি দিন আপনার টাইয়ের নটটা একটু ঠিক ক'রে দেই। এ কাজটা আমি ভালোই পারি।'

আলিশা ব্রিগেডিয়ার শাফকাতের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের পেছনে হাত বাড়িয়ে শার্টের কলার উঁচিয়ে দিল; তারপর টাইটা খুলে নিয়ে নতুন ক'রে নট তৈরি করল। ওপরের বোতামটা লাগিয়ে টাইয়ের নট ঠিকভাবে সেট করল। তারপর কলার নামিয়ে এক কদম পিছিয়ে গেল। স্মিতমুখে বলল, 'এবার হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনার শরীরের কাঠামো অনুসারে সিঙ্গেল নটের পরিবর্তে ডাবল নট বেশি মানায়। ছোট ক'রে ডাবল নট ক'রে দিয়েছি।'

আশ্চর্য উষ্ণতা অনুভব করলেন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত। অনাস্বাদিত নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার উষ্ণতা তাকে স্পর্শ ক'রে গেল। আলিশা যেন অনেকদিনের পরিচিত। একান্ত আপন। কারো ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি তার মনে দীর্ঘকাল কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করেনি। সুযোগ হয়নি। তার ইচ্ছে করলো তিনি আলিশার দু'কাঁধে আলতো ক'রে হাত রেখে ওকে কাছে টেনে নেন। মাথার ভেতরকার পোকাটা জেগে উঠে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। বলল, 'এখনই নয়। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।' তিনি নিজেকে নিবৃত্ত করলেন।

'আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর'—মানে কী?' ব্রিগেডিয়ার শাফকাত ভাবনায় পড়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আলিশা। সুন্দর ক'রে টাই বেঁধে দেয়ার মধ্যে যে নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ পেলাম তা কখনো মন থেকে মুছে যাবে না।'

আলিশা আবার কাছে এসো একটু হেসে বলল, 'দাঁড়ান, নটটা সামান্য কাত হয়ে আছে। গলার সঙ্গে আরেকটু চাপিয়ে দিতে হবে।'—সে আবার ব্রিগেডিয়ার শাফকাতের দিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নটটা ধ'রে আরেকটু কষে দিল।

তার ইচ্ছে হলো তিনি আলিশাকে জড়িয়ে ধ'রে কপালে চুমু খান। করলেন না। তার ধারণা এ ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার কেবল মেয়েদেরই।

শুধু বললেন, 'ধন্যবাদ, আলিশা। অশেষ ধন্যবাদ।'

'রাখুন তো আপনার কথায় কথায় 'ধন্যবাদ'। কাজের কথাটা ব'লে ফেলুন—মনে হচ্ছে আপনি কিছু বলবেন। নতুন কোনো খবর পেলেন?'

'নতুন খবর এখনো পাইনি। ভোর বেলা জেনারেল মারকোভিচ ফোন ক'রে বললেন : আজ দেশে সরকারের পতন হবে। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ তা বলেননি। খুব অস্বস্তি হচ্ছে।'

আলিশাকে চিন্তিত দেখাল। আজ আরব বসন্তের ফুল ফুটবে? সে সোফায় গিয়ে বসল।

বলল, 'ব্রেকফাস্ট করছি আমরা এ হোটেলেই?'

'এখনই বলা যাচ্ছে না। সকালে ঘুম ভাঙিয়ে জেনারেল মারকোভিচ জরুরি তলব দিয়েছেন।'

মুখটা কালো হয়ে গেল আলিশার। বলল, 'তাহলে আমি হোটেলে ফিরে যাই।'

'তা কেন? আমি তাকে বলেছি তোমার সঙ্গে আজ ব্রেকফাস্ট করার সন্ধি আছে আমার। আমরা এক সঙ্গেই হোটেল থেকে বের হব।'

আলিশা নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল জেনারেল মারকোভিচের ওখানে যাওয়ার কথা শুনে। এখন আশ্বস্ত বোধ করল।

'তোমার ঘড়িতে ক'টা বাজে?'

'সাড়ে আটটার বেশি।'

'গাড়ি এসে যাবে এখুনি। চলো আমরা তৈরি হয়ে লবিতে নেমে যাই।'

'আপনার ঘড়ি কোথায় রেখেছেন? আংটি?

ব্রিগেডিয়ার শাফকাত ভুলে গিয়েছিলেন। মাথার কাছের ড্রয়ার থেকে তিনি ওয়ালেট, রুমাল, ঘড়ি আর আংটি বের করলেন। আলিশা বলল, 'এখানে আসুন, সোফায় আমার পাশে এসে বসুন।'

ওয়ালেটটটা প্যান্টের পকেটে পুরে আলিশার পাশে এসে বললেন তিনি। বললেন, 'মনে হয় আজকাল ভুলোমন হয়ে যাচ্ছি।'

আলিশা ব্রিগেডিয়ার শাফকাতের ডান হাতটা টেনে নিয়ে ঘড়িটা পরিয়ে দিল। তারপর বাম হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিল অ্যামেথিস্ট আংটিটা। বলল, 'খেয়াল ক'রে দেখুন, আজ পাথরটার বেগুনি আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্য দিন কেমন নিষ্প্রভ থাকে।'

ব্রিগেডিয়ার শাফকাত হাতটা কাছে টেনে আংটির দিকে তাকালেন। তার চোখে কোনো পার্থক্য ধরা পড়ল না।

হোটেলের ফোন বেজে উঠল। সোফা থেকে উঠে বিছানার পাশে থাকা ফোন ধরলেন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত। ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'গাড়ি এসে গেছে। চল আমরা যাই।'

আয়নার সামনে গিয়ে হাতের টানে পোশাকটা ঠিক ক'রে নিল আলিশা।

ব্রিগেডিয়ার শাফকাতের ইচ্ছে করছিল একটু পারফিউম স্প্রে ক'রে নেন। কিন্তু আলিশার সামনে সংকোচ বোধ করলেন। অবশ্য তিনি শেইভ ক'রে মুখে তার প্রিয় 'ওল্ড স্পাইস' আফটার শেভ লাগিয়েছেন। ওল্ড স্পাইসের সুগন্ধ তার নিজের নাকে এসেও লাগছে।

গাড়ি চলছে তো চলছে। এক সময় ব্রিগেডিয়ার শাফকাত অধৈর্য বোধ করলেন। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা লুবিয়াঙ্কা প্রাসাদে যাচ্ছি না?'

'দোমোদেদোভো এয়ারপোর্টের অদূর একটি রেস্তরাঁয় অপেক্ষা করছেন জেনারেল মারকোভিচ। গাড়ি সেদিকেই যাচ্ছে।'

ব্রিগেডিয়ার শাফকাত ডান পাশে ঘাড় ঘোরালেন। চোখে মুখে উদ্বেগ নিয়ে আলিশা তাকিয়ে আছে।

'ভেবেছিলাম ব্রেকফাস্ট হবে লুবিয়াঙ্কায়। ওখানে ব্রেকফাস্ট ক'রে স্ট্যালিনের আমলের গোপন জাদুঘরটা দেখতে যাব।'

'কথা ছিল আজ দুপুরে লাঞ্চের আগে আমরা যাবো মান্দেলতাম মিউজিয়াম দেখতে।'

'পরশু না দেখে এলাম!'

'সেদিন আর দেখা হলো কোথায়? রেড স্কয়ারে আপনার বন্ধু ও তার স্ত্রীর দেখা হলো—তারপর তো আমরা বেরিয়ে রেস্তোরাঁয় চলে গেলাম।'

'আশা করি আজ যাওয়া সম্ভব হবে।'

'আপনার বন্ধু এখনো মস্কোতে আছে?'

'জিজ্ঞেস করা হয়নি। সে ঠিক বন্ধু না। আমাদের সার্ভিসেরই অফিসার। এখন কানাডায় থাকছে। দেশে ফেরার পথে মস্কো ঘুরে যাচ্ছে।

'বিষয়টা একটু অদ্ভুত নয়? আপনাদের সব সেনা অফিসাররা দেশে ফেরার আগে ট্রানজিটের জন্য মস্কো বেছে নিয়েছে!'

একটু জোরে হেসে উঠলেন ব্রিগেডিয়ার শাফকাত: 'তোমার পর্যবেক্ষণটা খারাপ না। আজিজ পাশার সঙ্গে আবার কোথাও দেখা হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করব আরো অন্য কোনো অফিসার মস্কো হয়ে দেশে ফিরছ কিনা।'

অধ্যায়-১৫

আমাদের গাড়িটা গিয়ে থামল প্রায় খোলা প্রান্তরের মধ্যে একটা প্রশস্ত টিলার ওপরে। এত দূরে কে খেতে আসে? ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। গাড়ি থেকে নেমে আমি দরজা খুলে আলিশাকে নামিয়ে আনলাম। পার্কিং থেকে রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে যেতে যেতে পেছনে আরেকটি গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পেলাম।

রেস্তোরাঁ সদর দরজার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন জেনারেল মারকোভিচ। দরজা খুলে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তার উষ্ণ অভ্যর্থনা বিস্মিত করল। জেনারেল মারকোভিচ আলিশার সঙ্গে করমর্দন ক'রে বললেন, 'আপনাদের পূর্বনির্ধারিত ব্রেকফাস্ট পরিকল্পনা ভণ্ডুল ক'রে দেয়ার জন্য দুঃখিত।'

'ও রকমভাবে বলবেন না জেনারেল।' প্রশস্ত রেস্টুরেন্টটি ডান থেকে বামে মেপে দিয়ে আলিশা বলল, 'অন্যরকম একটা পরিবেশ। ছিমছাম আর শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এলাম সেটাও ভালো লাগছে। রাস্তার দু'পাশে এত গাছ। সবুজে সবুজে চোখ জুড়িয়ে গেছে।'

'আপনারা ইনার রিং রোড ধ'রে অনেকটা পথ এসেছেন। আজকের আবহাওয়া চমৎকার হবে টেলিভিশনে শুনেছি। দিনের আলো থাকবে তবে গরম থাকবে না। কমফোর্টেবল। আসুন আমরা জানালার পাশে ওই টেবিলটায় বসি।'

'বলুন জেনারেল মারকোভিচ, জরুরি বার্তাটি আগে শুনি।'

'প্রায় চারদিন হলো। মস্কো কেমন লাগল?' যেন শুনতে পাননি এ রকমভাবে জেনারেল মারকোভিচ প্রশ্ন করলেন।

'বরং আলিশাকে জিজ্ঞেস করুন। ওর দেখার চোখ আছে।'—আমি মৃদু হেসে চোখ নাচিয়ে বললাম।

'মস্কো প্যারিস বা জুরিখের মতো নয়—বুদাপেস্টের মতোও নয়। বুখারেস্ট কখনো যাওয়া পড়েনি। যা-ই হোক, মস্কো একেবারে অন্যরকম। একজন পর্যটক হিসেবে আমার প্রথম মন্তব্য হলো হোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলো সন্তোষজনক।'

'ধন্যবাদ।'

'কোনো বাঙালির সঙ্গে দেখা হয়েছে?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন জেনারেল মারকোভিচ।

আমার হয়ে কৌতুকের স্বরে উত্তর দিল আলিশা, 'হয়নি আবার? অনেক প্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ বছর মস্কো ঘুরে দেশে ফিরবেন। পরশুদিন মান্দেলশতাম মিউজিয়ামের কাছে ওর একজন সহকর্মী ও তার স্ত্রীর সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি!'

'রেড স্কয়ারে এটিএম মেশিনে টাকা তুলতে গিয়েছি। এমন সময় এক লোক ইংরেজিতে বলে উঠল আমার কাছ থেকে টাকা ভাঙিয়ে নিন। ভালো রেট দেব। ডলারে ১০০ রুবল। উচ্চারণের ঢং পরিচিত। বললাম দেশ কোথায়? বললো, চট্টগ্রাম।'

'কোনো ওয়েটারকে দেখা যাচ্ছে না। রিসেপশনে গিয়ে অর্ডার দিয়ে আসতে হবে?'

'এ রেস্টুরেন্টে ওয়েটাররা লুকিয়ে থাকে। টেবিলের প্রতিটি পায়ে কলিং বেলের বাটন আছে। টিপে দিন। ঝটিতে উদয় হয়ে যাবে একজন। তার আগে ঠিক ক'রে নেই আমরা কী খেতে চাই।'

'সিম্পল। বাটার, টোস্ট, জেলি, চা।'

'আমিও সিম্পল—বানানা, হট মিল্ক আর খানিকটা কর্নফ্লেক্স।'

'সঙ্গে খানিকটা অরেঞ্জ জুস নিন। ভালো লাগবে।' বলে জেনারেল মারকোভিচ ওয়েটার ডাকার বেলে চাপ দিলেন। বললেন, 'আমার জন্য বান রুটি আর অরেঞ্জ মারমালেড। সব শেষে চা বা কফি।'

অর্ডার নিয়ে ওয়েটার চ'লে যাওয়ার পর জেনারেল মারকোভিচ বললেন, 'আলিশা সিনাওয়াত্রা, বিষয়টি গোপনীয় টাইপের আবার খুব যে গোপনীয় সে রকমও না। সুতরাং আপনার উপস্থিতিতেই বলছি।'

গলা খাঁকারি দিয়ে জেনারেল মারকোভিচ বললেন, 'জেনারেল শাফকাত, সকালে যা বলেছিলাম তা ভুলে যান, যা ঘটার ঘটে গেছে। এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন—না করবেন না।'

'ঠিক আছে 'না' করব না—কিন্তু কী করতে হবে আগে শুনি!'

'গতকাল গভীর রাতে আপনার বন্ধু, সেনাবাহিনী প্রধান নিহত হয়েছেন।'

'ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'

মাথা নামিয়ে চুপ ক'রে থাকলাম। বহুদিন দেখা হয়নি। কিন্তু মিলিটারি ট্রেনিং একাডেমিতে এক বছরের বেশি একসঙ্গে ছিলাম।

'কোনো সেনা অভ্যুত্থান ঘটেনি?'

'হয়নি, তবে হতে যাচ্ছে।'

তিনি ফোন বের ক'রে একটি ভিডিও দেখালেন। রাতের অন্ধকারে এক বা একাধিক ড্রোন বা অন্য কোনো আকাশযান থেকে তোলা। একটি বড় প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছেন সেনাপ্রধান। গাড়ির দিকে যাচ্ছেন। অকস্মাৎ কেউ দ্রুতগতিতে হেঁটে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েই পিস্তল বা রিভলভার দিয়ে দুটি গুলি চালাল। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক দূরত্ব। কাঁধে প্রথম গুলির ধাক্কা খেয়ে সেনাপ্রধান ফিরে তাকিয়েছেন। তখন তার মুখাবয়ব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দ্বিতীয় গুলি খেয়ে তিনি হাঁটাপথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আরো গুলির শব্দ শোনা গেল। প্রাসাদ থেকে অনেকে বেরিয়ে এল। একজনের পরনে ইউনিফর্ম।

জুনিয়র একজন অফিসার। তিনি দৌড়ে গিয়ে সেনাপ্রধানের নিশ্চল, নিথর লাশের পাশে বসে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, 'হায় আল্লাহ, এ কী হলো, এটা কী ক'রে সম্ভব হলো।'

'এক মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিও। আরো আছে। এ মুহূর্তে আমার হাতে নেই। প্রাসাদের সিসিটিভি থেকে কিছু ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো অ্যানালাইজ করা হচ্ছে। একটু পরেই পাওয়া যাবে।'

আবার নিস্তব্ধতার সময়। নিস্তব্ধতা ভেঙে আমি বললাম, 'গুলি কে চালাল জানা গেছে?'

চোখ তুলে তাকিয়ে জেনারেল মারকোভিচ একটু সময় নিয়ে বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।'

'প্রধানমন্ত্রী সেনাপ্রধানকে গুলি করে হত্যা ক'রে ফেললেন? তাকে বাধা দেয়ার কেউ ছিল না?' আলিশার কণ্ঠে অপার বিস্ময়।

'ঘটনার পুরো বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি। সিআইএর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ওদের এজেন্ট একজন অফিসার ওখানে ছিল। সে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী সামরিক শাসন জারি করার নির্দেশ দিলে সেনাপ্রধান অসম্মত হন। বেশ কয়েকজন জেনারেল ছিলেন। গোয়েন্দা প্রধান, মিলিশিয়া প্রধান, পুলিশ প্রধান ছিলেন। জেনারেলরা প্রথমদিকে সেনাপ্রধানের পক্ষে ছিলেন। তারপর তারা বিভক্ত হয়ে যায়। কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ নেয়। এক সময় প্রধানমন্ত্রী সেনাপ্রধানকে বলেন, 'আপনি আমার অবাধ্য হচ্ছেন। আপনাকে পদচ্যুত করা হলো। আপনি এখনই চ'লে যান। কোনো কথা না বলে সেনাপ্রধান ক্যাপ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করেন ও বেরিয়ে আসেন। এ

সময় হঠাৎ প্রধানমন্ত্রী তার দেহরক্ষীর কোমর থেকে পিস্তল টান দিয়ে দ্রুত বারান্দায় চ'লে আসেন। আর ট্রিগার চেপে ধরেন।'

'তারপর?'

'ওই যে জুনিয়র অফিসারকে সেনাপ্রধানের পাশে ব'সে চিৎকার ক'রে কাঁদতে দেখলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্য। হঠাৎ তিনি দৌড়ে সভাকক্ষে ঢুকে প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করেন। তারপর তিনি গুলি করেন গোয়েন্দা প্রধানকে। গোয়েন্দা প্রধান বাম দিকে ঝুঁকে পড়াতে শেষেরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।'

'সে কি বেঁচে আছে?'

'বেঁচে আছে। তার ওপর কেউ হামলা চালায়নি। বিমানবাহিনীর প্রধান খুব কাছে ছিলেন। তিনি পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'চলে যাও। ভাগো। নিজেকে বাঁচাও।' সে দৌড়ে চ'লে গিয়েছে। জান বাঁচিয়েছে।'

আমার কাঁধের ওপর আলিশা সিনাওয়াত্রার হাত অনুভব করলাম। সান্ত্বনার এই কোমল স্পর্শ আমার অপরিচিত। নিঃসঙ্গতা মানুষকে অনেক মানবিক অভিব্যক্তির সঙ্গে অপরিচিত ক'রে তোলে। আলিশা আমার দিকে ঘেঁষে এসেছে। তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে আমাকে ভরসা দিতে চাইছে।

'একটা দুর্ভাগ্যবতী দেশ। জেনারেল মারকোভিচ, আমাকে কী করতে হবে। আমি ব্রাসেলসে ফিরে যাব?'

বিষণ্ন মুখে একটু হাসলেন জেনারেল মারকোভিচ। বললেন, 'ঠিক উল্টোটা।'

একটু চুপ থেকে বললেন, 'আপনার দেশে একটা ভয়ংকর শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে সেনাপ্রধান নেই। অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীও নেই। আপনাদের সংবিধানে উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ নেই। সেনাবাহিনীতেও একই অবস্থা। উপপ্রধানের পদ নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোর সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। তারা যেকোনো উপায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে। গত এক মাস ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ দমনে এত নিপীড়ন চালানো হয়েছে যে দেশটার জন্য সারা পৃথিবীতে সমবেদনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ায় বিক্ষোভকারীরা সন্তুষ্ট, তারা তাদের সবরকম কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে।'

'এখন তাহলে কী?'

'আপনি ব্রিগেডিয়ার হলেও সেনাবাহিনীতে আপনিই সর্বজ্যেষ্ঠ। আপনাকে দেশে ফিরে হাল ধরতে হবে। আমরা নাশতা শেষ করতে করতে একটি ভিডিও কনফারেন্স শুরু হবে। বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানসহ উচ্চপদস্থ জেনারেলদের সঙ্গে আপনি সরাসরি আলোচনা করতে পারবেন।'

'জেনারেল মারকোভিচ, আমাকে আত্মহত্যা করতে পাঠাচ্ছেন না তো?'

হতাশ কণ্ঠে আলিশা বলল, 'দেশে আর কেউ নেই দায়িত্ব নেয়ার মতো?'

'দায়িত্ব সবাই নিতে পারে না মাদাম আলিশা সিনাওয়াত্রা। জনসমর্থন থাকতে হয়। জেনারেল শাফকাত সেনাবাহিনীতে জনপ্রিয়। পরবর্তী সেনাপ্রধান হিসেবে তার নাম শোনামাত্র সবাই মেনে নিয়েছে। একদিকে তাকে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে, অন্যদিকে দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলা ও ইংরেজি দুটি প্রধান সংবাদপত্রের দুই সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারাও ব্রিগেডিয়ার শাফকাতের নেতৃত্বের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ব্রেকফাস্টের সময়টা আমরা কেউ কথা বললাম না। সবার অপেক্ষা ভিডিও কনফারেন্সের জন্য। জেনারেল মারকোভিচের ড্রাইভার গাড়ি থেকে একটি উচ্চ শক্তির ভিডিও ট্রান্সমিটার এনে দিয়ে গেল। সেটা দিয়ে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংযুক্ত হলাম ভিডিও কনফারেন্সে। সেনা সদর দপ্তর নয়—বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে সভা হচ্ছে। আমাকে মনিটরে দেখা গেলে অভিবাদন জানালেন বিমানবাহিনী প্রধান। বললেন, 'দেশের সার্বিক পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে থাকলেও নেতৃত্বের শূন্যতা রয়েছে। আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।' নৌবাহিনী প্রধান ও সেনাবাহিনীর সিনিয়র জেনারেলরাও কম-বেশি একই কথা বললেন।

মনিটরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে জেনারেল মারকোভিচ বললেন, 'আপনার হোটেলে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই। হোটেলে যা কিছু ছিল সব গুছিয়ে স্যুটকেসে ভর্তি ক'রে ইতোমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। সোভিয়েত বিমানবাহিনীর একটি বিমানে আপনি আধাঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে পারবেন।'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত টেবিলে বিছিয়ে দিলাম। আমার মাথায় ঝড় শুরু হয়ে গেছে একথা বলব না। বাম হাতের অনামিকায় আটকানো অ্যামেথিস্টের দিকে চোখ পড়ল। মনে হলো সেখানে বেগুনি নয়, মৃদু সোনালি আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ খুলে বললাম, 'জেনারেল মারকোভিচ, আমার সামনে সম্ভবত একটিই পথ খোলা আর তা হলো আপনার পরামর্শ মতো দেশে গিয়ে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। কিন্তু এমনো তো হতে পারে বিমানবন্দরেই আমাকে গ্রেফতার করা হলো।'

জেনারেল মারকোভিচ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সবই ঘটতে পারে। সব সম্ভাবনা, সব প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা ক'রে আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইরানি সেনাবাহিনীর একটি কমান্ডো দল কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছে যাবে—তারা থাকবে ফরেন সার্ভিস ট্রেনিং একাডেমিতে, প্রশিক্ষণার্থীর ছদ্মবেশে। টার্কিশরাও দ্রুত এ রকম কিছু একটা করবে। আপনার শত্রু কারা আপনার অজানা নয়। নিহত প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ও সুবিধাভোগী সব পক্ষের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অধ্যায়-১৬

ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় এগারোটা বাজে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে দেশের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে। অন্যরকম কিছু ভাবার সামান্যতম সুযোগ রাখা হয়নি।

বললাম, 'সব বুঝতে পারছি। কিন্তু অনেক দিন দেশে নেই। মনে হচ্ছে একা একটা যুদ্ধের ময়দানে পা বাড়াচ্ছি।'

জেনারেল মারকোভিচ হেসে বললেন, 'আপনি মোটেই একা নন ব্রিগেডিয়ার। আমিও আপনার সাথে যাচ্ছি। সঙ্গে ছোট একটি কমান্ডো ট্রুপ।'

'আমি যাব না?' আলিশার কণ্ঠে আর্তনাদ।

সে তার ডান হাত দিয়ে আমার বাম হাত চেপে ধরল। বলল, 'শাফকাত, আমাকে মস্কোতে ফেলে রেখে চ'লে যেও না।'

আমি মনের ভেতর প্রচণ্ড একটি ঝাঁকি খেয়ে আলিশার দিকে তাকালাম।

'আপনার হোটেলের নাম ও রুম নম্বর বলুন।' জেনারেল মারকোভিচ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

আলিশা হোটেলের নাম ও রুম নম্বর বলল।

ফোনে কারো সঙ্গে তিন সেকেন্ড কথা বললেন জেনারেল মারকোভিচ। অবিলম্বে রেস্তোরাঁতে ঢুকল তরুণ একজন রুশ সেনা কর্মকর্তা। দ্রুত গলায় তাকে কিছু নির্দেশনা দিলেন তিনি। রুশ ভাষায় কী বললেন বোঝা সম্ভব না। শেষে বললেন, 'হারি আপ।' সেটা কেবল বোঝা গেল।

আমি তাকিয়ে আছি আলিশার দু'চোখের দিকে। সেখানে গভীর মমতা ও ভালোবাসা টলটল করছে।

জেনারেল মারকোভিচ গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে হেসে বললেন, 'এ ভয়টা আমার মাথায় ছিল। ঠিক আছে। আপনিও যাবেন ম্যাডাম। সময়মতো আপনার মালপত্র বিমানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।'

আমি আলিশার কাঁধে হাত রেখে কাছে টানলাম 'খুব ঝামেলার জীবন শুরু হতে যাচ্ছে আলিশা। তুমি কি নিশ্চিত?'

দৃঢ় কণ্ঠে আলিশা বলল, 'একশত ভাগ নিশ্চিত। আমাকে তোমার পাশে থাকতে দাও।'

'আমার ষাট শুরু হলো। তোমার বয়স যেন কত?'

জেনারেল মারকোভিচ কুটিল হাসি বললেন, 'পাসপোর্টে লেখা তারিখ অনুযায়ী ১৯৯০ সালে জন্ম। এখন প্রায় ছত্রিশ। সমস্যা নেই। লম্বা স্কার্ট আর মেকআপ দিয়ে আমরা পুষিয়ে দেব।'—আপন মনে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন জেনারেল মারকোভিচ।

তারপর আমার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'শুরুটা ভালোই হলো, জেনারেল। অভিনন্দন আপনাকে। আপনি সৌভাগ্যবানদের একজন।'

মলিন বিকাল

সুহান রিজওয়ান

জানাজায় ভালোই লোক হলো। তার মাঝে একটা বড় অংশকেই দেখা গেল কবর দিতেও চলে এসেছে।

কবরে নামার পর বাইরে দাঁড়ানো ক'জন আত্মীয় লম্বা সময় ধরে চিৎকার করল তার উদ্দেশে, অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় বিধানের সূত্র টেনে জানান দিল কীভাবে লাশ নামাতে হবে। অথচ লাশ শুইয়ে দিয়ে কবর থেকে উঠে আসার পর মঞ্জু আবিষ্কার করল কে কী বলেছে—তেমন কোনো স্মৃতিই তার মাথায় নেই। আবার পাশেই দেখা গেল বেঁচে যাওয়া দুটো বাঁশের টুকরো কবরে দিয়ে দেবে কিনা তা নিয়ে কারা যেন তর্ক শুরু করেছে। প্রচণ্ড রাগ হওয়ার মতো ব্যাপার, কিন্তু মঞ্জুর তাও হলো না। ভোঁতা একটা নিস্পৃহতা আর অন্য কারো চোখজোড়া নিয়ে সে কেবল দেখে গেল সব।

কবরে গোঁজা আগরবাতির সুঘ্রাণের মাঝে আল্লাহর পাক কালাম আওড়ে মরহুমার জন্য হুজুর দোয়া পড়লেন দীর্ঘক্ষণ। আর মৃত মরিয়মকে বেহেশত নসিবের জন্য প্রার্থনা করে ইলিয়াস যখন মোনাজাত শেষ করলেন, ঠিক তার মিনিট খানেক আগে শুরু হলো বৃষ্টি। বৃষ্টি বলতে ভারি বর্ষণ নয়, টুপটাপ ফোঁটা। তবু অক্টোবরের বৃষ্টি গায়ে পড়লে হালকা শীতের অনুভূতি হয়। টুপটাপ পানি পড়তেই তাই আত্মীয়রা বাদে বাকি লোকজন দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তখন। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইলিয়াস একাই। দুই সহোদর শহিদুজ্জামান আর নুরুজ্জামানও আছে কাছাকাছি, তবে তারা নিজের মতো আড়াল খুঁজে নিয়ে কাঁদছে। যে মায়ের উপস্থিতি তাদের সবাইকে ধরে রেখেছিল, সেই মাকে আর দেখা যাবে না—চিন্তাটা মাথায় আসতেই টিপটিপ বৃষ্টির নিচে দাঁড়ানো ইলিয়াস হঠাৎ অকারণে শিউরে ওঠে। সঙ্গে ভয় হয়, জননীর চেহারা বোধহয় সে এরই মধ্যে ভুলে গেছে।

'১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টায় আমাদের প্রথম সন্তান মঞ্জুর জন্ম হইল। মঞ্জুর জন্মের আগে মরিয়মের স্বাস্থ্য অত্যধিক অবনতি ঘটিয়াছিল বলে চিন্তাযুক্ত ছিলাম।'—বাবার ডায়েরিতে লেখা ছিল এ কথাগুলো। মলাট উড়ে যাওয়া সে ডায়েরিটার লাইনহীন পাতায় কালো কালির কলমে লিখতে গিয়ে বাবা কিছু ওভার-রাইট করেছিলেন 'চিন্তাযুক্ত' শব্দটায়। বাবা কি এখন মায়ের জন্য আর চিন্তা করবে? উত্তর পাওয়া যায় না। তাই বলে মঞ্জু নিজে মায়ের জন্য চিন্তা থামাতে পারে না। বৃষ্টির ছাঁটে আগরবাতি ফোঁস শব্দে নিভে গেলে সে খেয়াল করে, পানি জমছে কবরের চারধারে।

এলাকার এ কবরস্থানে বাদ জুমা কবর জিয়ারতের সময় কে যেন বলছিল একদিন, বৃষ্টি হলেই এদিকটায় পানি জমে। চারদিকে শক্ত বাঁধ দেয়া দরকার। মায়ের কবরের গোড়ার দিকটা প্লাবিত হতে দেখে ইলিয়াসের সে কথা স্মরণ হয়, কিন্তু চোখে উঠে আসে অষ্টাশির বন্যা। লাতিন থেকে নোংরা পানি উঠে একদিন যখন উঠান ভাসিয়ে দিল, তুতুল তখন বজলু মিয়াকে ডেকে ইট, সিমেন্ট আর বালি দিয়ে উঠানের কয়েক জায়গায় বাঁধ দিয়ে দিল। অথচ রাতে খোদ আম্মার ঘরেই মেঝে ফুঁড়ে পানি বেরোনো শুরু করল। মা সেদিন উদ্বেগ নিয়ে পার্থকে বলছিল, আজ হয়তো তাদের ডুবেই যেতে হবে। কিন্তু কাণ্ড দেখো, উনিশশ অষ্টাশির কেএম দাশ লেনের বাড়িতে নয়, মাকে ডুবে যেতে হচ্ছে এই উনিশশ পঁচানব্বইয়ের বগুড়ায়। বন্যার বদলে এখন তাকে নিমজ্জিত করছে বৃষ্টির শান্ত পাত। প্রকৃতির প্রতি কি এখন তার কৃতজ্ঞ হওয়া দরকার?

দিন কয়েক পরের কুলখানিতেও মনে হয় না যে কিস্তি-টুপি শোভিত ইলিয়াস প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পেয়েছে। বরং ভিড়ের মাঝে বসে নিজের মুদ্রাদোষে তাকে সবার চেয়ে একলা লাগে।

ভিড় বলতে কুলখানি উপলক্ষে গ্রামের বাড়িতে মিলাদে আসা জমায়েত। বাইরের ঘরের পুরনো আমলের চেয়ারগুলো সরিয়ে সেখানে পেতে দেয়া হয়েছে নীল ও হালকা সবুজ চাদর। সমবেত ৩০-৪০ জন মেহমানের অধিকাংশই স্থানীয়। তবে ঢাকা থেকেও এসেছে কয়েকজন। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ থাকলেও এ ঢাকাবাসীর পাঞ্জাবিগুলোই জেল্লা বেশি দিচ্ছে। ইলিয়াসের সাদা পাঞ্জাবি আবার কয়েক জায়গায় এলোমেলো। তার মাঝেই সে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখের দৃষ্টি দূরে কোথাও জিইয়ে রেখে উচ্চৈঃস্বরে দরুদ পড়ে।

মসজিদের স্থানীয় হুজুর পরম যত্নে আরবি ভাষায় আয়াত পড়েন। আগাগোড়া লৌকিক পটভূমি সত্ত্বেও সমবেতদের বেশভূষা, আগরবাতির ধোঁয়া আর গোলাপজলের সুগন্ধ মিলেমিশে সে ধ্বনি যেন কীভাবে সবাইকে অন্য কোনো জগতের কথা স্মরণ করায়। পর্দার আড়াল থেকে মহিলাদের কেউ কেউ নীরবে চোখের জল ফেলে, সে জলীয় বাষ্প জমে ওঠা মেঘ ক্রমে ঘন হয়ে চেপে বসে বসার ঘরের প্রার্থনারত পুরুষদের গলায়। শিশিরের মতো বিন্দু বিন্দু শোক ঝরে সবাইকে ভিজিয়ে দেয়।

মোনাজাত শেষে মিলাদের মিষ্টি হাতে হাতে বিলিয়ে দেয়া হলো। ঢাকার মেহমানরা রাতে খেয়ে যাবে, তাদের রেখে বিদায় নিতে থাকে স্থানীয়রা। বাড়ির বড় বউ হিসেবে সুরাইয়া তখন পর্দার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারে। হুজুরের জন্য আলাদা করে একটা মিষ্টির প্যাকেট রাখা আছে, সেটা হুজুরের হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করাটা তার দায়িত্ব। অথচ সে দায়িত্ব পালন করার জন্য ইলিয়াসকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পার্থ আছে, নুরুজ্জামান কি খালিকুজ্জামানকেও দেখা যায়—কিন্তু ইলিয়াস বসার ঘরে নেই।

খালিকুজ্জামান তখন নতমুখে ঢাকার অতিথিদের উচ্চারিত শোক, উপদেশ কি আক্ষেপবাণী শুনে নিচ্ছিল।

'—খবরটা তো শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এক মাসও হয় নাই মানুষটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে গেছি!'

'এখন ভাই একটাই কাজ। দোয়া পড়া। চাচির আত্মাকে আল্লাহ যাতে শান্তি দেয়, সেজন্য খাস দিলে দোয়া করা!'

'এত দ্রুত ডেট্রয়েট করবে বুঝি নাই।—কী যেন হইছিল?'

'ক্যান্সার। প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার।' জবাব দেয়ার জন্য খালিকুজ্জামান মাথা তুলেই দেখতে পায় পর্দার আড়াল থেকে তুতুল ভাবি তাকে ইশারায় ডাকছে। 'আপনারা বসেন একটু, আসছি আমি!'

ভেতর ঘরে যাওয়ামাত্র সুরাইয়া মিষ্টির প্যাকেটটা খালিকুজ্জামানের হাতে দিয়ে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। 'তোমার ভাই কই?'

'এখানেই তো ছিল!' বলে পর্দা সরিয়ে বসার ঘরে চোখ বুলিয়ে অগ্রজের অনুপস্থিতিতে খালিকুজ্জামানও অবাক হয়। 'লাগবে?—আচ্ছা, দেখলে পাঠায়ে দিচ্ছি।'

সুরাইয়া ভেতর বাড়িতে ঢোকে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চেংটুর মাকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে সে নিজেই বেরোয় স্বামীকে খুঁজতে। মানুষটা খুব এলোমেলো হয়ে আছে। ঘুমের মাঝেও যে লোক বকবক করায় ওস্তাদ, সে এখন প্রায় সারা দিনই চুপ হয়ে থাকে। নীরবে কাঁদে, তারপর আবার সবার অলক্ষে হাত দিয়ে চোখের পানি মুছেও নেয়। গত কয়েক দিনে এমন বেশ কয়েকবার হয়েছে যে ভেতরের ঘরে গিয়ে সুরাইয়া আবিষ্কার করেছে মানুষটা একদৃষ্টিতে মায়ের ব্যবহার করা বালিশগুলো দেখে যাচ্ছে। এখনো হয়তো সে সবার চোখের আড়ালে মায়ের ঘরেই বসে আছে।

কিন্তু না, মায়ের ঘরে মঞ্জুকে পাওয়া যায় না। তার পরের ঘরটায়ও না। তবে খিড়কির ঘরে গেলে জানালা দিয়ে দৃশ্যমান হয় বাড়ির পেছনের পুকুরের নির্জন ঘাটে বসে আছে মানুষটা।

সুরাইয়া জানালা পথেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে। বাড়ির এ ঘরটা মূলত ব্যবহার হয় পুরনো আসবাব আর রান্নাঘরের তৈজসপত্র ডাই করে রাখার কাজে। সামনের দিকটায় মিলাদজনিত যে ব্যস্ততা, এদিকে সেটা একদম অনুপস্থিত তাই। সুরাইয়া একটু ইতস্তত করে ভেজিয়ে রাখা দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে আসে।

মাঝে মাঝে পানি তোলা বাদে পুরনো এ পুকুরটা বাড়ির কেউ আর ব্যবহার করে না। হেজে-মজে যাওয়া জলাশয়টার তিনদিক ভরে আছে কচুরিপানায়, আট ধাপের বাঁধানো সিঁড়িটাও জায়গায় জায়গায় দখল করে নিয়েছে শ্যাওলারা। সুরাইয়া এদিকে আসে না বহুদিন। তবে আজ সে শাড়ি ধরে পিচ্ছিল ধাপগুলো সাবধানে পেরিয়ে নীরবে এসে বসে স্বামীর পাশে। মঞ্জু নির্লিপ্ত চোখ তুলে স্ত্রীকে দেখে কিছুক্ষণ, তারপর ফের দৃষ্টি ছুড়ে দেয় পুকুরে।

নিষ্কম্প সেই পুকুরে খাটো হয়ে আসা বিকালের ছায়া এ মুহূর্তে শালগাছের মতো থির। শীতের হিম বাতাসে এখন স্পষ্ট। কয়েকটি নীরব মুহূর্তের পর কী এক অনিশ্চিত জীবনের মায়া গলায় মেখে মঞ্জু বলে, 'মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে কোনো লাভ হয় না তুতুল, না? বাবার সময় সেকেন্ড স্ট্রোকের পর থেকেই মনে মনে প্রিপারেশন নিছিলাম, কিন্তু ঠিকই অসহায় হয়ে গেছি।'

সুরাইয়া নীরব থাকে। তার শ্বশুরের ইন্তেকালের সময় ঘোর বর্ষা; দেশে বন্যা হচ্ছে। তার মাঝেই সন্ধ্যার দিকে যখন মৃত্যু সংবাদটা এল, ওদের ঢাকার বাড়ির সামনে তখন এক হাঁটু পানি। সে পানির মাঝেই ওরা দুজন একটা রিকশা দিয়ে মূল গলিতে উঠল, সেখান থেকে মিশুক চেপে বাসস্ট্যান্ড। সে বাসযাত্রাও পানিতে ভেসে যায় একটু পরপর। সারাটা রাত পথের দুদিকে যত চোখ যায়, দেখা যায় কেবল বন্যার জলস্রোত। ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর মুখের দিকে তুতুল যতবার তাকায়, দেখা যায় কেবল ক্লান্তি।

'এইসব অসুখবিসুখ, পেইন, মৃত্যু আমাকে এরা খুব হন্ট করে তুতুল।' মঞ্জুর গলা এখনো ক্লান্ত। 'সময়ে সময়ে ভাবছি যে এসব নিয়ে লেখালেখি করে আমার হয়তো একরকম সাইকোলজিক্যাল প্রিপারেশন হবে। হয়তো আমি লিখেই প্রস্তুত হচ্ছি শোক ঠেকাতে।'

খানিক সব চুপ। 'কিন্তু সব মিথ্যা তুতুল! শোক হয়তো কমে যায়, কিন্তু দৈবের সামনে অসহায় লাগে নিজেকে খুব!'

স্বামীর কণ্ঠ খাদে নেমে গেলে সুরাইয়ার গলার কাছেও কী একটা ভারী হয়ে ওঠে। কথা না বলে সে মঞ্জুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে শুধু। কোমল সেই স্পর্শে, কিংবা সুড়সুড়ি দেয়া শীতের বাতাসে—ইলিয়াস খানিক কেঁপে ওঠে এবার।

সুরাইয়া তখন ভারী হয়ে আসা গলায় জানায় যে মায়ের শূন্য ঘরটায় পা রাখা তার জন্য কতটা কঠিন হয়ে উঠবে ঢাকায় ফিরে। বলে, মঞ্জু তো ঘুরত বাইরে বাইরে—কিন্তু পার্থ আর তার দিনের কতটা অংশজুড়ে থাকতেন মৃত মানুষটা, তা শুধু তারাই জানে।

কথাগুলো ইলিয়াস শোনে, কিন্তু মাথার ভেতরে কী যেন ঠিক কাজ

করে না। একটা বেদনা, তার চাইতেও হেরে যাওয়ার মতো একটা অসহায়ত্বে তার চোখের শিরাগুলো কেমন ব্যথা করতে থাকে। তেত্রিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন যিশু খ্রিস্ট, মৃত্যু মুহূর্তে বলেছিলেন, হে আমার ঈশ্বর, আমি বেদনা অনুভব করছি আপনি চেয়েছেন বলেই। সেটা দুই হাজার বছর আগের কথা। পৃথিবী কত পুরনো, অথচ মানুষের মৌলিক বেদনাগুলো আজও নতুনত্বহীন। মৃত্যু-মন্থর এ দুনিয়ায় আরেকজনের বিষাদকে আমরা কি চাইলেই সহনীয় করে তুলতে পারি? ইভেন দ্যাট গাই অ্যাবাভ, ক্যান হি হেল্প?

সাহায্যের নিশ্চয়তা না পেয়ে লেখক তাই গল্প শুরু করে। 'আচ্ছা, রঞ্জুর ওই গল্পটা তোমাকে আগে বলেছি না?'

সুরাইয়া একবার পেছন ফিরে খিড়কি দরজাটা দেখে, তারপর স্বামীর কাঁধে ঘাড় এলিয়ে বলে, 'কোন গল্পটা?'

ছায়াচ্ছন্ন পুকুরের জল থেকে চোখ সরিয়ে ইলিয়াস এবার সাহস করে আকাশ দেখে। আকাশ পরিষ্কার, একটু আধটু নীল মেঘ সেখানে শিশুর অপটু হাতে আঁকা সূর্যপানে-উড়ে-যাওয়া পাখির মতো ঝুলছে। নিকট ভবিষ্যতে তারা বৃষ্টি হয়ে ঝরতে পারে, তেমনটা কিছুতেই মনে হয় না। অথচ ইলিয়াসের থেকে থেকে মনে পড়ে একটা বৃষ্টি বিঘ্নিত দিনের কথা।

'অনেক ছোটবেলার কথা, বুঝলা? রঞ্জুর বয়স তখন ধরো এই সাত-আট হবে। সেদিন খুব বৃষ্টি। বিকাল থেকে শুরু, কিন্তু দেখতে দেখতে রাত এগারোটা-সাড়ে এগারোটা বেজে গেল—বৃষ্টি আর থামেই না।

তো খেয়ে দেয়ে আমরা সবাই শুয়ে পড়েছি, তখনই কারেন্ট চলে গেল। ডিলু তখনো মায়ের কাছে শোয়, আর আমরা তিন ভাই অন্য ঘরে। সেই অন্ধকারের মাঝেই আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। রাস্তা দিয়ে হয়তো হঠাৎ কোনো গাড়ি যাচ্ছে, সেটার লাইট এসে জানালার ওপর আলো-ছায়া তৈরি করলেই আমাদের অনেক ফূর্তি হচ্ছে। আমরা ছায়া দিয়ে বইতে দেখা আইফেল টাওয়ার আঁকছি, শব্দ দিয়ে সুর করে গাইছি ছেলেবেলায় পড়া হাট্টিমাটিম-টিম। ঠিক তখন না, মিন্টু হঠাৎ করে কাজলা দিদি আবৃত্তি করা শুরু করল!'

বলতে বলতে গল্পকথক নিজেই দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পায়। হু-হু হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঠুমরি দিচ্ছে জানালার কপাটে, জানালার শিকে জমে ওঠা বৃষ্টির শিশির ঝরছে ফোঁটা ফোঁটায়। তার মাঝে মিন্টু খুব আবেগ নিয়ে বলে যাচ্ছে—ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই।

কিন্তু যে-ই না সে বলল 'মা গো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই!', তখনই রঞ্জু একেবারে শব্দ করে কেঁদে দিল! কবিতাটা শুনে আসলে রঞ্জুর দারুণ মন খারাপ হয়েছিল তখন। কিন্তু তার ওভাবে কেঁদে ফেলায় মঞ্জুরা সবাই খুব অবাক। তার মাঝেই রঞ্জু করল কী, ওদের ঘর থেকে এক ছুটে বেরিয়ে চলে গেল আব্বা-আম্মার ঘরের সামনে। ওরাও তখন শুয়ে গেছে। কিন্তু রঞ্জু সেই বন্ধ দরজায়ই ধাক্কা মেরে বারবার বলতে লাগল 'আম্মা, দরজা খোলো! ও আম্মা, দরজা খোলো!'

শুনতে শুনতে সুরাইয়ার খুব মন খারাপ লাগছিল, কিন্তু তার মাঝেই কোমর-সমান দেয়াল দিয়ে আলাদা করা পাশের বাড়ি থেকে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে উঠলে মঞ্জু গল্প থামায়। উচ্চৈঃস্বরের জবাবে এবার আরেকটি মহিলা কণ্ঠও চিৎকার করে কী যেন বলে। তারপর সব আবার চুপ, আর কোনো উত্তর-প্রত্যুত্তর শোনা যায় না।

সুরাইয়া আলতো করে স্বামীর হাতের আঙুলের ভেতর নিজের আঙুল প্রবিষ্ট করায়। 'এই গল্প তুমি আমাকে আগে বলো নাই কখনো।'

'শেষ করি নাই কিন্তু গল্পটা।'

স্ত্রীর জিজ্ঞাসাবোধক দৃষ্টি গায়ে মেখে মঞ্জু কিছুক্ষণ পর ফের বলে, 'তারপর তো আম্মা দরজা খুলল। দরজা খুলে রঞ্জুকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে কী ব্যাপার। কিন্তু রঞ্জু তো ততক্ষণে নরমাল। কাজলা দিদি মরে যাওয়ায় যে ওর খুব খারাপ লেগেছে, সেটা বলতে ওর লজ্জা লাগছে। ও তখন করল কী, প্রশ্নের জবাবে মরিয়া হয়ে বলল : আম্মা, তোমার ঘরে কী যেন ফেলে আসছি!'

মঞ্জু আবার চুপ করে যায়। সুরাইয়া এবার স্বামীর কাঁধ থেকে মাথা সরিয়ে তার চোখের দিকে মনোযোগ দেয়।

'ওই কথাটা না, আমি কখনই ভুলতে পারি নাই তুতুল। কথাটা মনে হলেই বুকের ভেতর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে : আম্মার কাছে কী যেন ফেলে এসেছি। কী যে অদ্ভুত একটা কথা!'

লোকটা এবার বোধহয় নিজের অজান্তেই হাতের মাঝে সঙ্গীর হাতটাকে শক্ত করে ধরে। 'ইদানীং মনে হয়, ওই শৈশবে কী ফেলে এসেছি, সেটা খুঁজতে খুঁজতেই আমাদের সারাটা জীবন কেটে যাচ্ছে তুতুল। খালি খুঁজছি, আর খুঁজছি। কিন্তু কী যে ফেলে এসেছি, কিছুতেই ছাই মনে করতে পারি না।'

পাশে পাশে আজ তারা কতদিন, তবু মানুষটার গলার এই কম্পাঙ্ক সুরাইয়ার অচেনা। ইলিয়াস কোথায়, তার গলায় তো আজ কথা বলে শৈশবের মঞ্জু, কিংবা মিন্টু, কিংবা রঞ্জু। সুরাইয়ার শোক হয় ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয় ভয়। মানুষটা পাগল হয়ে যাবে না তো?

সেক্ষেত্রে তার করণীয় কী হবে, তা বুঝে না পেয়ে সুরাইয়া চেষ্টা করে একেবারে স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে, 'ভেতরে চলো তো! তোমার এই পাঞ্জাবিতে শীত মানবে না। পরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'আরেকটু বসি।' মঞ্জু উঠতে চায় না।

'নাহ, আর বসতে হবে না। ঢাকার গেস্টরা আছে, ডিলু একা একা কতক্ষণ বসে থাকবে ওখানে?' প্রসঙ্গ বদলে সুরাইয়া হাত ধরে টানে। 'ওঠো তুমি। ভেতরে চলো।'

সুরাইয়া উঠে দাঁড়াতে চাইলে মঞ্জু তাকে জোর করে ফের বসিয়ে দেয়। 'যাচ্ছি দাঁড়াও। আর একটা মিনিট। একটা মিনিট চুপ করে বসে থাকব। এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে।'

বাধা দিতে গিয়েও সুরাইয়া স্বামীর চোখ দেখে থেমে যায়। তারপর শরীরে ঢিল দিয়ে তারা দুজনেই চেয়ে থাকে পুকুরের দিকে।

আকাশ তখনো হেজে-মজে যাওয়া পুকুরের জলে উল্কি এঁকে যাচ্ছে। দূরের বিকালটা ক্লদ মোনের পেইন্টিং হয়ে কেমন যেন ঝাপসা, হিম বাতাসের স্পর্শকে মনে হচ্ছে হোমিওপ্যাথির মতো অকারণ মিষ্টি। আরেকটু আয়ু কেটে নিয়ে বিকালটা ফুরিয়ে যাচ্ছে ব্যর্থ বিপ্লবের মতো।

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি. | ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

কল্যাণের জন্য সঞ্চয়

ইসলামে প্রতিটি সৎকর্ম ও সঞ্চয়ই ইবাদতের সমতুল্য, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণের পথ সুগম করে। ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ সঞ্চয় হিসাবসমূহের মাধ্যমে স্ত্রীর মোহর আদায়, বিবাহের খরচ মেটানো, হজ পালন এবং সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে ওয়াক্‌ফের মতো কল্যাণমূলক কাজ সহজেই করা যায়। এগুলো শুধু পার্থিব জীবনেই নয়, পরকালেও সম্বল হিসেবে কাজ করে। তাই সঞ্চয় করি কল্যাণে, গড়ি সুন্দর ভবিষ্যৎ।

মুদারাবা
হজ সেভিংস অ্যাকাউন্ট

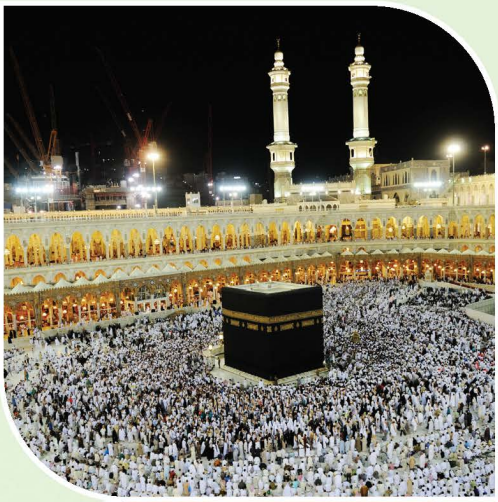

মুদারাবা
বিবাহ সেভিংস অ্যাকাউন্ট

মুদারাবা
মোহর সঞ্চয় প্রকল্প

মুদারাবা
ওয়াক্‌ফ ক্যাশ জমা হিসাব

যখন জম্বি নামে

ফজলুল কবিরী

জম্বি সত্যিই নামে এবং আমরা পালানোর আগে তাদের দেখে ফেলি; দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে কোনোরকমে জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচি। তখনো অভ্যুত্থানের গন্ধ আমাদের শরীর থেকে মুছে যায়নি; জুলাইয়ের উন্মাতাল স্মৃতির পর্দা থেকে স্বজন হারানোদের কোনো অশ্রুবিন্দু শুকায়নি। এভাবে কয়েকটি মাস তাজা নিশ্বাসের খোঁজে প্রত্যেকের ছটফটানি দেখি। তারপর নভেম্বর-ডিসেম্বরের জড়ো হতে থাকা বাতাসের শীতল শিশির ও ভোরের হাওয়া জম্বিদের প্ররোচিত করে। তারা দৃশ্যমান হতে শুরু করে। আমরা তখন মাঠ থেকে শীতের সবজি তোলার কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘদিন ধরে বুকের ওপর চেপে বসা একটা জগদ্দল পাথর সরিয়ে আমরা মুক্ত হতে পেরেছি যদিও, তাতে খুশিতে আত্মহারা হওয়ার সুযোগ ছিল না; যদিও নৈরাজ্য ও অস্থিরতার সুযোগে অস্বাভাবিক অনেক কিছুরই মুখোমুখি হতে হবে এমন একটা ধারণা সবার মধ্যে ছিল।

আগেকার নিষ্ঠুর শাসকের হুমকি কারো বুকে ভয়-ডর ধরাতে না পারলেও জম্বিদের এ আকস্মিক আবির্ভাব সবাইকে আতঙ্কিত করে। কোনো পূর্বানুমানই কাজ করে না। অথচ কোনোরকম শর্তসাপেক্ষে এই অভ্যুত্থান ঘটানো হয়নি। এখানে সবার অধিকার থাকবে সমান। স্বাধীন পাখিদের জন্য যে ধরনের অধিকার থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ঠিক একই অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ পাবে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর কিংবা গৃহস্থের পালিত পশুপখিও। কিন্তু ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট একটা দায়িত্বশীল পক্ষ থেকে মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য যে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের ধারণা এসব ঘোরানো-প্যাঁচানো কথামালা কিংবা বাক্যের পর বাক্য দিয়ে সাজানো জ্বালাময়ী প্রতিশ্রুতিগুলো স্রেফ ফাঁপা বুলি ছাড়া কিছু নয়—কোনোকিছুই তারা সামলাতে পারবে না।

জম্বিদের শাসকেরা কীভাবে সামলাবে এই নিয়ে কেউ কোনো সমাধান দিতে পারে না; আশু কোনো সমাধানও যে নেই এ ব্যাপারে কারো মধ্যে কোনো দ্বিমতও দেখা যায় না। জম্বিদের দেহ সচল কিন্তু মস্তিষ্ক মৃত। তারা জিন্দালাশ। তারা মানুষের রক্তমাংস খেতে মরিয়া। এমন অবস্থায় শীতের সবজি তোলার কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে আমরা এমন কোনো গন্তব্যে পালানোর কথা ভাবি, যেখানে এ ধরনের জিন্দালাশের অস্তিত্ব কেউ খুঁজে পায়নি। এসবের মধ্যেই রাস্তাঘাট ও রেলস্টেশনগুলো হঠাৎ করে সাধারণ মানুষের জন্য অনিরাপদ হয়ে ওঠে। আমরা এখন কী করব এসব যখন ভাবতে থাকি, তখন খেতখামারে এতদিন ধরে কাজ করতে থাকা শ্রমিকেরা হঠাৎ করে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের পেটে ভাত নেই। ঘরে চুলা জ্বলে না। বাচ্চাদের কান্নাকাটি থামানো যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু যাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার মজুদ আছে, যাদের আবাসস্থলটি নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে বাকিদের থেকে আলাদা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে এসব নিয়ে কোনো হইচই দেখা যায় না। কেবল হঠাৎ হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করে যে এভাবে মৃত মানুষের ভয়ে ছোটাছুটি না করে কীভাবে জম্বিদের সুপথে ফিরিয়ে আনা যায়, সে ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ জম্বিরা অবাধ্য; তারা কথা শোনে না, সুস্থ মানুষের সাথে তারা যোগাযোগ রাখতেও সক্ষম নয়। যেকোনো উপায়ে মানুষের গায়ের গন্ধের খোঁজে ছোটাই তাদের পছন্দের কাজ; কারণ রক্তের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাতেই তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে।

এই জম্বিরা আদতে কারা? কীভাবে তারা এ জনপদে ফিরে এল এমন প্রশ্ন সবার মনে খেলা করে। একেকজন একেকভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর বানিয়ে নেয়। কেউ কেউ বলছে এরা এ জনপদের মাটিতে শত শত বছর ধরে শায়িত থাকা ভূমিপুত্ররা; যাদের বংশধরেরাও বিভিন্ন শাসকের রোষানলে পড়ে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে বিভিন্ন কালপর্বে। এর মধ্যে আবার এদেশের ভূমিপুত্র আদতে কারা এমন সব প্রশ্নও অনেকের মধ্যে তর্কের রসদ জোগাতে থাকে। ভূমিপুত্র যারাই হোক না কেন, সত্য হচ্ছে বিভিন্ন শাসকের কাছে সাধারণ মানুষকে পদানত হতে হয়েছে বারবার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিলীন হয়েছে অথচ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। এসব বাস্তবতা মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে বিরল নয়।

নিম্নবর্ণের অচ্ছুত মানুষই শুধু নয়, একদা অরণ্যবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা কিংবা অন্যান্য আদিবাসীগোষ্ঠীর অরণ্যচ্যুত ও জীবিকাচ্যুত হওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের জনপদেই আছে এমন কথা কেউ কেউ বলে। মানুষের অভিশাপের ধকল আর সইতে না পেরে এভাবে শত শত বছর ধরে মাটিতে শায়িত থাকা মানুষগুলো ক্ষোভ-শ্লেষ-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে জনসমক্ষে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এমন বাস্তবতাকে বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে। এসব মানুষকে তাদের হিস্যা আগে বুঝিয়ে দিতে হবে। এত বছর ধরে সহ্য করে যাওয়া অন্যায়, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার ক্ষতিপূরণ না নিয়ে তারা ঘরে ফিরবে না।

তবে এই যে কাঙ্ক্ষিত নয়া বন্দোবস্তের স্বপ্ন, তা কি নিছক সোনার পাথর বাটি হয়েই থেকে যাবে? জম্বিদের এভাবে নিপীড়িত হওয়ার গল্প আদৌ পানিতে ফেলে দেওয়ার মতো নয়; যখন সত্যিই সবাই দেখে যে এখনো এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও একটা সাধারণ কারখানার শ্রমিক থেকে কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চালানো অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার-হাজার কোটি টাকার মালিক বনে যাচ্ছেন; অন্যদিকে আদিবাসীদের নিজেদের অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে বিত্তশালীদের জন্য রিসোর্ট বানিয়ে কালো টাকা সাদা করার প্রক্রিয়া সহজতর করা হচ্ছে এখনো। শাসকেরা সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনগুলো মেটানোর সুযোগ সহজ না করে, তাদের ঘাড়ে করের বোঝা বাড়িয়ে বিত্তশালীদের করের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। সেই বোঝা খেটে খাওয়া মানুষের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসে। অর্থাৎ শত শত বছর আগের পুরনো শোষণপদ্ধতির নতুন ভার্সন শাসকেরা এখনো বহাল রেখেছে।

এ কথা মনে হতেই সবাই আশঙ্কা করে কেবল শত শত বছর আগের ভূমিপুত্ররাই শুধু নয়, জীবিত নাগরিকদের বড় একটি অংশও ধীরে ধীরে জম্বি হয়ে উঠতে উৎসাহী হবে। কারণ এমন সুযোগ তো তাদের কাছে আর কখনো নাও আসতে পারে। শাসককে এভাবে ঘাড় মটকে দেওয়ার মওকা জীবদ্দশায় তারা আর নাও পেতে পারে। তারা নিজেরাও জীবনভর যে অন্যায়-অবিচার-জুলুমের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে যেতে বাধ্য হয়, এসবের সুরাহা শাসকেরা চাইলে করতে পারে; কিন্তু তারা তা করে না, উল্টা নিজেদের ভাড়াটে লোক ও বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দেওয়া দোসরদের মাধ্যমে কীভাবে সাধারণ মানুষের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে রাখা যায়, সে ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর থাকে।

এসবের মধ্যে নতুন শাসকগোষ্ঠী উদ্ভূত পরিস্থিতি কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে জানায় এবং সবাইকে শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সবকিছু পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসবে জানিয়ে আশ্বস্ত করে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোনো আলামত দেখা যায় না। উল্টা বিভিন্ন পক্ষ নিজেদের মধ্যে কৃতিত্বের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে কথার লড়াইয়ে মেতে ওঠে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করে প্রত্যেকের কথায় ও আচরণে। নয়া বন্দোবস্তে পূর্বেকার সকল অন্যায়ের বিচার ও শাস্তির দাবিতে তারা নিজ নিজ ব্যানারে সংগঠিত হতে থাকে।

এর মধ্যে নতুন করে হট্টগোল তৈরি করে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর থেকে শুরু করে বন-জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরা পর্যন্ত। তারা নিজেদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অন্যায় ও অবৈধ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে রাস্তায় নামে। জঙ্গলের প্রাণীদের অভিযোগ তাদের আবাসস্থল ছোট হতে হতে এখন মাথা গোঁজার ঠাঁইটিও আর নেই। নগরের ব্যস্ত ফুটপাতটা দখল করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। বেওয়ারিশ কুকুরদের অভিযোগ হচ্ছে, যদি জঙ্গলের সাপ-শিয়াল কিংবা বুনো মহিষের

পাল নগরের ফুটপাত দখল করে, তবে তারা কোথায় ঠাঁই নেবে?

এভাবে কুকুর-বিড়াল ও শিয়াল-সাপ শুধু নয়, জুতা কিংবা কনডম ফ্যাক্টরির কর্মচারী থেকে শুরু করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী কর্মচারীরাও নিজেদের দীর্ঘদিনের অভাব ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে রাস্তায় নামতে শুরু করে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ বার্তাযোগে সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধৈর্য ধারার আহ্বান জানান। বিভিন্ন পক্ষের মানুষের ভেতর এক পক্ষের মধ্যে এসব কথা আত্মবিশ্বাস জোগায় তো পরক্ষণে অন্যপক্ষ অবিশ্বাস নিয়ে প্রতিবাদ ও নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য রাস্তা অবরোধ করে। এসব ফ্যাসাদ ও বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের বাঁধ একবার ভাঙে তো পরক্ষণে জোড়া লাগে; কোনদিকে গেলে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে তা নিয়ে তারা ধন্দে পড়ে যায়।

কিন্তু জম্বিদের নিয়ে শাসকগোষ্ঠী এতটাই বেকায়দায় পড়ে যায় যে বাকিদের সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবার ফুরসত পায় না। রাস্তাঘাট, খেতখামার থেকে রেলস্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো জম্বিদের দখলে যেতে শুরু করে। তারা রাষ্ট্রের সবক'টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাই শুধু নয়, এমনকি আচমকা ভিন্নমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধেও হামলে পড়তে শুরু করে। একদিকে জম্বি, অন্যদিকে বিভিন্ন বঞ্চিত গোষ্ঠীর মিটিং-মিছিলের মধ্যেই আরেকটি বড় সমস্যা শাসকের রাতের ঘুম হারাম করে দিতে শুরু করে। দেখা যায় আচমকা এক শ্রেণীর উৎসাহী জনতা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা মাজার-মন্দিরের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন নিন্দাসূচক বক্তব্য দিয়ে সেসবের বিরুদ্ধে নিজেদের অনাস্থা জানিয়ে অনতিবিলম্বে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দিতে থাকে; তার পর পরই গভীর রাতে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দিনের আলোয় বিভিন্ন মাজারে কে বা কারা হামলা করতে শুরু করে।

রাষ্ট্রের পক্ষে এসব অন্যায্য আচরণ মেনে নেওয়া অসম্ভব বিধায় সংকটের আশু সমাধানের আশায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে জরুরি বৈঠক ডাকা হয় এবং সাথে সাথে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার গুরুত্বপূর্ণ মানুষের মতামতও নেওয়া হয়। তাদের দাবি ঠিক কী, তা এমনকি রাষ্ট্রপক্ষও বুঝে উঠতে পারে না। শত শত বছর ধরে সহ্য করে আসা শোষণ-বঞ্চনার জন্য তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দরদের কমতি নেই বলে জানানো হলেও সেসব সান্ত্বনার বাণীতে জম্বিদের মন গলে না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দীর্ঘ নিপীড়ন ও অত্যাচার সয়ে সয়ে তাদের মস্তিষ্ক মৃত ও অচল হয়ে পড়েছে।

একটা প্রস্তাব অনেকের কাছ থেকে আসতে শুরু করে। জম্বিদের ভরণপোষণের দায়িত্ব যেহেতু রাষ্ট্রের, তাদের জন্য একটা বিশেষায়িত অঞ্চল তৈরি করে সেখানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রপক্ষ চাইলে এ ব্যাপারে একটা প্রস্তাব দিতে পারে। এ বিষয়ে প্রকৃত জম্বিদের চিহ্নিত করতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটা স্বাধীন তদন্ত কমিটিকে কাজ করতে দেওয়ার প্রস্তাবও আসে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। তাদের কাজ হবে জম্বিরা কীভাবে বাংলাদেশে ঢুকেছে তা প্রাথমিক তদন্তের মাধ্যমে বের করে আনা এবং আদৌ কী তারা শত শত বছর ধরে এদেশের মাটিতে শায়িত ছিল কিনা তাও নিশ্চিত করা। তাদের তদন্ত রিপোর্টের মাধ্যমে মূল সমস্যা শনাক্ত করার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্ভাব্য কোনো জম্বি সংক্রমণ হয়েছে কিনা তাও জানা জরুরি।

জম্বিরা নিজেদের ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়; তাদের চালিত করে অতীতের কোনো এক দুঃসময়ের ভেতর পায়চারি করা তাদের শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের যাপিত দুঃখ, ক্লেদ ও যাতনা। তারা বর্তমানকে অনুভব করতে পারে না; ভবিষ্যৎ নিয়ে বিচলিত হতে জানে না। তারা কেবল অতীত দ্বারা চালিত হয়। ফলে সম্মুখের সকল সঞ্চরণশীল প্রাণীকে তারা শত্রু ভেবে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। অতীতের স্মৃতিতে যা কিছু খারাপ বলে প্রতীয়মান হয়, তার সবকিছুকে তারা আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ফেলে। তারা নিজেদের অজান্তে ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক স্থাপনা থেকে শুরু করে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বানানো বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজনও অনুভব করে না।

তারা কেবল সামনের দিকে ছুটতে থাকে এবং সবকিছু নিমেষে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার মতো হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। অথচ প্রথাগত যেসব জম্বিকে হলিউড সিনেমায় আমরা দেখি কিংবা কমিকস ও ভিডিও গেমসের পৃথিবীতে যেসব জম্বির সাথে আমরা পরিচিত হই, সেসব জম্বি কেবল জীবিত মানুষকেই আক্রমণ করে। কোনো ইট-পাথরের স্থাপনায় আক্রমণের আগ্রহ তারা দেখায় না। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে আবির্ভূত হওয়া জম্বিদের এই বিবর্তিত রূপ নিয়ে গভীরতর গবেষণার বিকল্প নেই বলে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তার-বিজ্ঞানীরা নিজেদের মতামত দেন।

জম্বিদের বিবর্তনের এই ধরনটি একটা মারাত্মক বিপদের আভাস দিচ্ছে বলে তারা সতর্ক করেন। অতিদ্রুত রাষ্ট্রের নারী-পুরুষ-শিশু সবাইকে একটা নিরাপদ বেষ্টনীর ভেতর নিয়ে যেতে হবে। তাদের মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি তাদের মধ্যে মানবিক মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। মনুষ্যত্বের বীজ তাদের মধ্যে বপন করার বিকল্প নেই; সাম্যের প্রতি তাদের পক্ষপাতকে সমর্থন করাও জরুরি এমনকি বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানকে প্রকৃত অর্থে মানবিক চেতনায় উদ্ভাসিত করার জন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার কোনো বিকল্প নেই বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দেন।

এতকিছু যখন ঘটতে থাকে তখনো আমরা ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে স্বাভাবিক সময়ের জন্য প্রতীক্ষারত; অথচ তখনো আমাদের প্রাণের ভয় কাটে না। তবু আমরা শান্ত থাকার চেষ্টা করি। কারণ জম্বি যে সত্যি সত্যি নেমেছে, এ কথা আমরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের বোঝাতে সমর্থ হই। শীতের সবজি তোলা বাদ দিয়ে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরতে পারা একটা দৈব ঘটনা বলে কেউ কেউ শুকরিয়া আদায় করে।

এভাবে কয়েকটা দিনই যেন কাটালাম কিংবা কয়েকটা মাস; গ্রীষ্ম তখন আমাদের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে একটা অবিশ্বাস্য সংবাদ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রচার হতে থাকে।

বলা হয় যে আজকের পর থেকে সাধারণ মানুষের ভয় ও শঙ্কার আর কোনো কারণ নেই। সবাই নিরাপদ ও নিশ্ছিদ্র নিরপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত হয়েছেন। সকল সাসপেক্টেড জম্বিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দুর্ধর্ষ সদস্যরা বিশেষ কৌশলে কব্জা করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জম্বি বলে কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিনের ট্রমা ও অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে রাষ্ট্রের এক শ্রেণীর নাগরিকেরা এ ধরনের দুর্দশায় পতিত হয়েছে। তাদের শরীর সচল কিন্তু মস্তিষ্কের কোষগুলোর মৃত্যু ঘটেছে। সুস্থতার জন্য তাদের দীর্ঘ এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

জীবদ্দশায় সেসব হতভাগ্যকে রাষ্ট্রের জীবিত সকল সুস্থ মানুষের কাছে জম্বি পরিচয় নিয়ে যাতে বেঁচে থাকতে না হয়, সে লক্ষ্যে যেকোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে সবাইকে পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়।

রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্যে আমরা স্বস্তি পাই। জম্বি নামের কোনোকিছুর অস্তিত্ব আপাতত নেই জানতে পেরে আশ্বস্ত হই। ছোটাছুটি থামিয়ে পুনরায় শীতের সবজি তোলার কাজে মনোযোগী হতে পারব ভেবে পুলক অনুভব করি। বিবর্তনের এমন গল্পে মানুষ ও জম্বিকে আলাদা করার এই নয়া বন্দোবস্তকে স্বাগত জানানো ছাড়া অন্যকোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।

স্বস্তি নিয়ে অনুভব করি একটা তীব্র অনিশ্চয়তা। তবু আমাদের অস্তিত্বকে চোরা স্রোতের মতো একটু পরপর ভেতর থেকে টানতে থাকে।

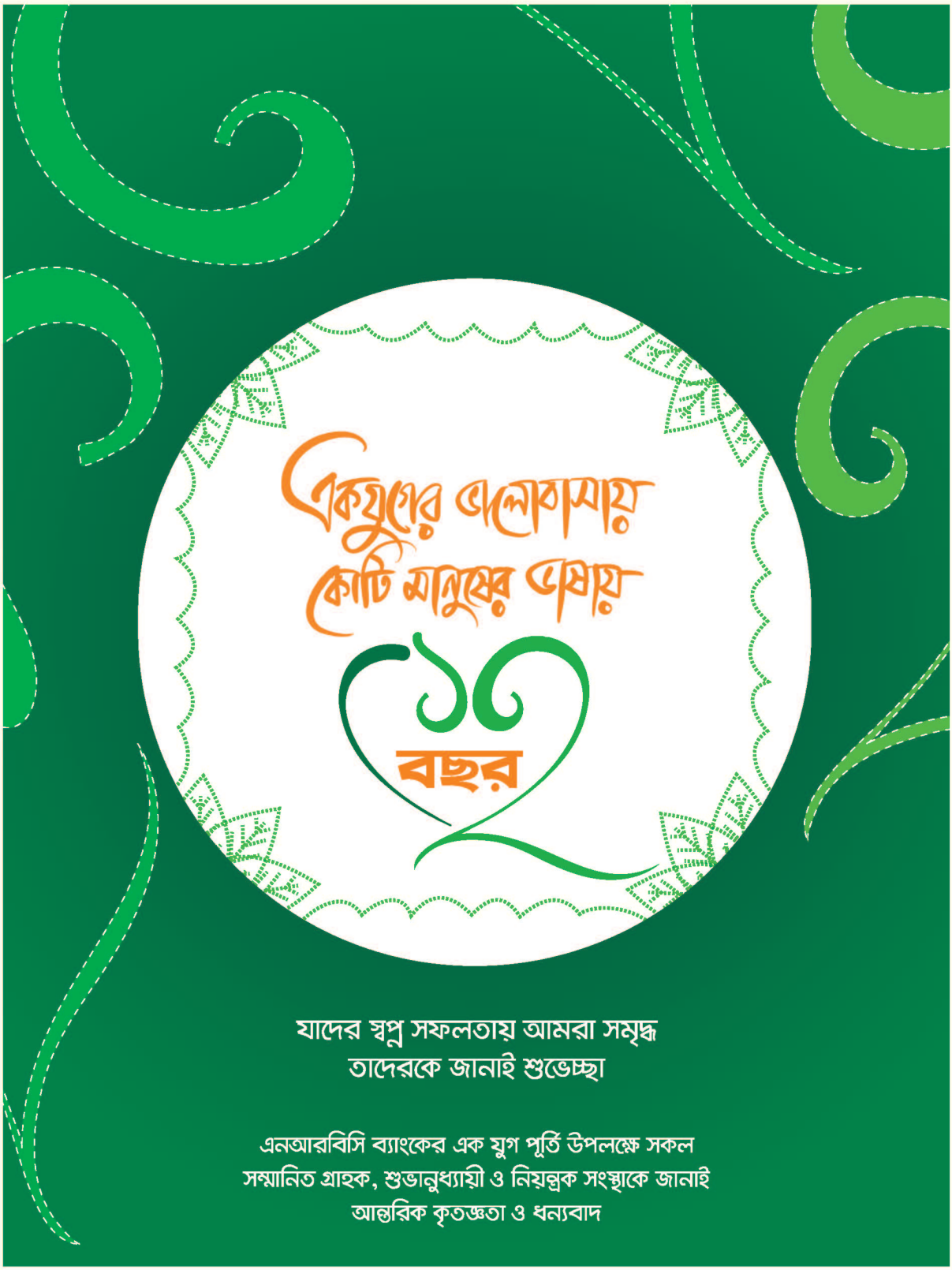
একযুগের ভালোবাসায়
কোটি মানুষের ভরসায়
১২
বছর
যাদের স্বপ্ন সফলতায় আমরা সমৃদ্ধ
তাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা
এনআরবিসি ব্যাংকের এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে সকল
সম্মানিত গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানাই
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ
প্রবাসীর স্বপ্ন
NRBC BANK

এক্সিম স্মার্ট রিসিট

মান্থলি প্রফিট মুদারাবা ডিপোজিট স্কিম

ব্যাংকিং হবে স্মার্ট কার্ডে

*মূল বৈশিষ্ট্য:

- স্মার্ট কার্ডে মান্থলি প্রফিট
- প্রতি মাসের মুনাফা কার্ডে ব্যালেন্স আকারে যুক্ত হবে
- মুনাফার টাকা কার্ডের মাধ্যমে ATM থেকে উত্তোলন, কেনাকাটায় কিংবা বিল পরিশোধে POS এর মাধ্যমে ট্রানজ্যাকশন করা যাবে
- কার্ড অ্যাক্টিভেশনে তাৎক্ষণিক ৫০০ টাকা বোনাস
- মূল টাকার ৯০% পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা

EXIM BANK
শরী'আহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ পিএলসি.

*শর্ত প্রযোজ্য

সব ধরনের ব্যাংকিং তথ্যের জন্য 16246

www.eximbankbd.com

বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের গল্প

মাহবুব সরকার । রকিবুল ইসলাম

রক্ষণশীলদের হুমকি, হামলার চোখ রাঙানি, অপ্রীতিকর ঘটনার শঙ্কা—সবই ছিল দেশের নারী ফুটবলের সূচনালগ্নে। মেয়েরা জার্সি-শর্টস পরে ফুটবল খেলবে—এমনটা মেনে নেয়া তো দূরের পথ; কল্পনা করাই যেন ছিল পাপ! বিংশ শতাব্দীর সূচনার ওই চিত্রটা এখন অতীত। বর্তমান চিত্রটা বেশ উজ্জ্বল—বাংলাদেশের মেয়েরা খেলছেন, দেশে-বিদেশে সাফল্যও পাচ্ছেন। টানা দুবারের সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা। যদিও সাফল্যের রঙটা বিবর্ণ হচ্ছে নানা হট্টগোলে।

জাতীয় দলে আসার আগে ২০১৪ সালে বাফুফের প্ল্যান অ-১৫ ইয়ুথ ক্যাম্পে ট্রায়াল দেন নীলা

কলসিন্দুরের কোচ জুয়েল মিয়ার সঙ্গে সাফজয়ী দলের সানজিদা, মারিয়া, শামসুন্নাহার, তহুরা

শুরুর চ্যালেঞ্জ

এখন দেশের প্রতিটি কোণে, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও হচ্ছে নারী ফুটবল প্রতিযোগিতা। তাই বলে দেশে মেয়েদের ফুটবল এখন শতভাগ নিরাপদ—এমনটাও হলফ করে বলা যাচ্ছে না। জানুয়ারির শেষ ভাগে জয়পুরহাট ও দিনাজপুরে প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল নারী ফুটবল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরপর নারী ফুটবলের ওপর দু-একটি আঘাত আসে। তবে একটা সময় দেশে নারী ফুটবলসংক্রান্ত যেকোনো আয়োজন ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এখন জয়পুরহাট-দিনাজপুরের ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন। চিত্রটা যে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে ঘুরে গেল, তার পেছনে ছিল অনেক শ্রম-ঘাম। বর্তমান সময়ে ফুটবলের নানা অর্জন ও চটকদার নানা খবরের ভিড়ে সে শ্রম-ঘামের গল্পের স্থান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রাপ্য সম্মানটুকুও দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু আপনি বিকৃত করার যত চেষ্টাই করুন, ইতিহাস তো নিজের পথ ধরেই চলবে।

রক্ষণশীলদের রক্তচক্ষু

রক্ষণশীলদের চোখ রাঙানিতে ম্যাচ আয়োজনের সঙ্গে জড়িতরা হত্যার হুমকিও পেয়েছেন। দেশের নারী ফুটবল বিকাশে যারা হুমকি উপেক্ষা করেছেন, তাদের অন্যতম কামরুন নাহার ডানা। সাবেক এ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থায় যুক্ত ছিলেন। দেশের নারী ফুটবলের সূচনায় তার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গোড়ার দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক দলকে ঢাকায় আনা হয়েছিল। ফিরতি সফরে দেশটির বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে খেলে এসেছে বাংলাদেশ। একসময় যারা প্রতিবেশী দেশের প্রদেশের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারত না, সেই বাংলাদেশ এখন ভারতকে হারাচ্ছে। গত দুটি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপেই গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতকে হারানোর কৃতিত্ব দেখান বাংলাদেশের মেয়েরা। আর টানা দুই ফাইনালে সাবিনা, সানজিদারা হারান নেপালকে।

যেমন ছিল শুরুর সময়

কামরুন নাহার ডানা দেশের নারী ফুটবলের সূচনা সম্পর্কে বলছিলেন, 'মেয়েদের ম্যাচ আয়োজন করব—শোনার পরই একাট্টা হয়েছিলেন রক্ষণশীলরা। স্টেডিয়ামে একটা ম্যাচ আয়োজন করা হবে—জানার পর প্রতিরোধ গড়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। নিরাপত্তা ইস্যুতে বিকল্প ভেন্যুতে চলে আসার পরও নিস্তার ছিল না। নানা ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছিল। নানা হুমকি-ধমকি আসছিল। হামলার প্রস্তুতির খবরও জেনেছি বিভিন্ন মাধ্যমে। কিছুতেই আমরা হাল ছাড়িনি। নিরাপত্তার জন্য এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ছুটে গিয়েছি। সহযোদ্ধা হিসেবে অনেকেই পাশে ছিলেন, যার অন্যতম প্রয়াত ফুটবল তারকা বাদল রায়। বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনে নেতৃস্থানীয়দের সহায়তা চেয়েছি। অনেকেই এগিয়ে এসেছেন।'

প্রতিকূলতা ও মেয়েদের মাঠে নামা

দেশে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা আয়োজনের আগে ২০০১ সালে মিরপুর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা একটি দল এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নারী একাদশের মধ্যে এক প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বাফুফে একাদশ ছিল মূলত বিভিন্ন ক্রীড়া ডিসিপ্লিন থেকে নেয়া খেলোয়াড়দের একটি দল, যাদের ফুটবলে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে মাঠে নেমেছিল দলটি। জোড়াতালি দিয়ে মাঠে নামলে যা হয়, তাই হয়েছিল—বাফুফে একাদশ ম্যাচটি বাজেভাবে হেরে যায়। হারলেও ওই ম্যাচ কিন্তু স্থানীয় আয়োজকদের মেয়েদের খেলাধুলার গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে উৎসাহিত করেছিল।

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল শুরু

তিন বছর পর ২০০৪ সালে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সহায়তায় বাফুফে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক নারী ফুটবল আসর আয়োজন করে। এ ফুটবল আসরে অংশগ্রহণ করতে ছয়টি দল গঠনের জন্য অন্যান্য ক্রীড়া ডিসিপ্লিন থেকে নারীদের খুঁজে বের করে আনা হয়। ছয় দলের একটি ছিল বাফুফে একাদশ। পাশাপাশি জেলা দল এবং সার্ভিসেস দলও ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরু হলে সমাজের একটি রক্ষণশীল অংশ বাধার দেয়াল তুলে দাঁড়ায়।

ফুটবল খোলা মাঠে খেলা হয়। খেলোয়াড়দের শর্টস পরে খেলতে হয় বলে একটি গোঁড়া গোষ্ঠী নারী ফুটবলকে 'নগ্ন প্রদর্শনী' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে ভেন্যুর কাছে রাস্তায় নেমে প্রতিযোগিতা যেকোনো উপায়ে বন্ধ করার হুমকি দেয়। অবশ্য আয়োজকরা নমনীয় হননি। পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনেকের কাছে এটি ছিল বাংলাদেশে নারী ফুটবলের সবচেয়ে বড় সাফল্য, নারী ক্ষমতায়নের একটি প্রতীকী বিজয়।

চ্যালেঞ্জ ও সাফল্য

শুরুর বাধা দূর হয়েছে, প্রতিকূলতা জয় করা গেছে। কিন্তু নারী ফুটবল এগিয়ে নেয়ার পথে আরো অনেক বাধা ছিল। যার অন্যতম

IFI PLC. Your Partner in Business

ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট পিএলসি.
Islamic Finance and Investment PLC.

Based on Islamic Shariah, the first of its kind in Bangladesh

এসো সঞ্চয় করি

মুদারাবা দেড়গুণ ডিপোজিট স্কীম

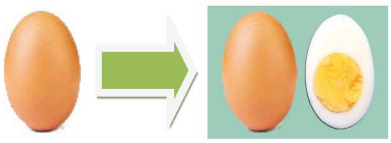

* আকর্ষণীয় মুনাফায় ৩ বছর ৩ মাস ৩ দিনে দেড়গুণ।

মুদারাবা দ্বিগুন স্কীম (সম্ভাব্য)

* আকর্ষণীয় মুনাফায় ৫ বছর ৫ মাস ৫ দিনে দ্বিগুণ।

মুদারাবা তিনগুন স্কীম (সম্ভাব্য)

* আকর্ষণীয় মুনাফায় ৮ বছর ৮ মাস ৮ দিনে তিনগুণ।

মুদারাবা ডক্টরস' ডিপোজিট স্কীম

* আকর্ষণীয় মুনাফায় গ্রাহক ইচ্ছামতো যেকোন সময় যেকোন পরিমান অর্থ জমা করতে পারবেন।

মুদারাবা 'মুহূসিনাত' (শুধুমাত্র নারীদের জন্য)

* আকর্ষণীয় মুনাফায় মাসিক মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত যার জমার পরিমাণ সর্বনিম্ন ১ লক্ষ টাকা, সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা ।

মুদারাবা হজ্জ ও ওমরাহ্ ডিপোজিট স্কীম

* আকর্ষণীয় মুনাফায় মাসিক আমানতের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১ হাজার টাকা থেকে শুরু যার বিপরীতে অর্থ উত্তোলনের সুবিধা শতকরা ৮০ ভাগ।

মুদারাবা আসান ডিপোজিট স্কীম

* আকর্ষণীয় মুনাফায় গ্রাহক ইচ্ছামতো যেকোন সময় যেকোন পরিমান অর্থ জমা করতে পারবেন যার বিপরীতে অর্থ উত্তোলনের সুবিধা শতকরা ৮০ ভাগ।

bKash নগদ বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে লেনদেন আপনার এসকল সঞ্চয় উদ্যোগকে আরো সহজ করে দিয়েছে।

প্রধান কার্যালয়ঃ ইস্পেটাস সেন্টার (৪র্থ তলা), ২৪২/বি, তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
ফোনঃ ০২-২২৬৬০৩২৭০-৭৬, ফ্যাক্সঃ ০২-২২৬৬০৩২৭৯, ই-মেইলঃ info@ifilbd.com ওয়েবঃ www.ifilbd.com

প্রধান শাখা	চট্টগ্রাম শাখা	উত্তরা শাখা	বগুড়া শাখা	নারায়ণগঞ্জ শাখা	গাজীপুর শাখা	চৌমুহনী শাখা
ফোনঃ ২২৩৩৮৫৬০৪	ফোনঃ ২৩৩৩৩২৩৬৮৩	ফোনঃ ৪৮৯৫২৭৩৪	ফোনঃ ৫৮৯৯০৫৪৩৫	ফোনঃ ২৪৭৬০১৯৬	ফোনঃ ৯৬৩৯৮৪৮৩৮৪	ফোনঃ ৩৩৪৪৯২৫১১

বেশি পাওয়ায় বেশি খুশি

এই রমজানে ১টি কিনলে ৩টি ফ্রি*

লা-রিবা ইসলামিক প্লাটিনাম ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে উপভোগ করুন ইফতারসহ ডিনার

Le MERIDIEN DHAKA	INTERCONTINENTAL DHAKA	Radisson BLU CHATTOGRAM BAY VIEW	Radisson BLU DHAKA WATER GARDEN	The Peninsula Chittagong (Best Business Hotel in Town)
Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 1
01766673443 01966660090	01713047698	01777701164	01730089130	01755554555
Amari DHAKA	Holiday Inn	CROWNE PLAZA HOTELS & RESORTS	SIX SEASONS HOTEL	RAMADA BY WYNDHAM COX'S BAZAR KOLATOLI BEACH
Buy 1 Get 3	Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 3	Buy 1 Get 1
01777796444	01324717025	01966662152	01955393291	01896100030
****FARS	GRAND | SYLHET HOTEL & RESORT	#buffet | #Café	THE RAINTREE DHAKA	Beyond Buffet
Buy 1 Get 3	Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 3	Buy 1 Get 1	Buy 1 Get 1
01798418363	01321201600	01977222287	01951177515	01998400500 Gulshan 01780808062 Mirpur

*শর্তাবলি প্রযোজ্য

16434
বিস্তারিত জানতে
কল বা ক্ল্যান করুন

*অফারটি চলবে শেষ রমজান পর্যন্ত

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

aib
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.
Al-Arafah Islami Bank PLC.

ছিল তৃণমূল পর্যায়ে খেলা আয়োজকদের জন্য মেয়েদের বাড়ি থেকে বের করে আনা। সে বাধার দেয়ালও টপকানো গেছে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে। জাতীয় পর্যায়ে নারী ফুটবলে খুব একটা আবেদন ছিল না। এ কারণে পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। বাফুফে নিজস্ব যোগাযোগের প্রভাব ব্যবহার করে কিছু পৃষ্ঠপোষক পেয়ে যায়। পথচলা অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ২০০৯ সালে নারীদের জন্য জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ চালু করা হয়েছিল। এ চ্যাম্পিয়নশিপের তিন সংস্করণ আলোর মুখ দেখেছে। আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকাভিত্তিক ক্লাব লিগও। সেটা গত মৌসুমেও মাঠে গড়িয়েছে। কিন্তু পেশাদার ভিত্তি পায়নি দেশের নারী ফুটবল।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ভূমিকা

শৌখিন কার্যক্রম দিয়ে এগোলেও সাফল্যের পথটা কিন্তু ঠিকই খুলে গেছে। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। ২০১০ সালে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ' নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করে অধিদপ্তর। পরের বছর শুরু হয় 'বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ' নামে মেয়েদের স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা। দুটি আসরের নাম বদলে এখন নামকরণ হয়েছে 'প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক ও বালিকা)'। স্কুল পর্যায়ে মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতাই দেশের নারী ফুটবলের চিত্রটা বদলে দিয়েছে। কয়েক লাখ খুদে নারী ফুটবলার প্রতি বছর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এ আসরের সাফল্যের মোহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে নারী ফুটবল একাডেমি। একদিকে একাডেমি কার্যক্রম, অন্যদিকে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা—দুয়ের যোগফলে তৈরি হয়েছে নারী ফুটবলের মজবুত পাইপলাইন।

সাফল্যের সূচনা

বাংলাদেশের নারী ফুটবলের সাফল্যের সূচনা বয়সভিত্তিক দলগুলোর হাত ধরে। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েরা এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রথম সাফল্য আসে ২০১৪ সালে। তারপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দুবার এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ; যার অর্থ হচ্ছে, অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায়ে এশিয়ার শীর্ষ আটে ছিল লাল-সবুজরা। এছাড়া সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সাফ) অঞ্চলে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ দল এবং অনূর্ধ্ব-১৮ দল চ্যাম্পিয়ন হয়। সাফ অঞ্চলে বয়সভিত্তিক সম্ভাব্য সব শিরোপাই জয় করা হয়েছে।

তবে বয়সভিত্তিক দল ও সিনিয়র দলের মধ্যে লম্বা একটা সময় পর্যন্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। বয়সভিত্তিক দলগুলো সাফ ও এশিয়া অঞ্চলে প্রশংসা অর্জন করলেও সিনিয়র পর্যায়ে তা অনূদিত হয়নি। প্রতিভাবান ফুটবলার সংকটের কারণে লম্বা একটা সময় পর্যন্ত সিনিয়র দলে বেশির ভাগ বয়সভিত্তিক খেলোয়াড়ের প্রাধান্য ছিল। ২০১৬ সালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নাম লেখানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বার্তা দিয়েছে। যদিও ফাইনালে ভারতের কাছে হারতে হয়েছে ৩-১ গোলে। অনূর্ধ্ব-১৪ এএফসি আঞ্চলিক পর্ব, এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাইয়ে যাদের হাত ধরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ, ২০১৬ সালের সাফ ফাইনালে উঠেছে সেই কৃষ্ণা রানী সরকারদের মাধ্যমে।

সিনিয়র পর্যায়ে সাফল্য

২০১৬ সাফ ফাইনাল হারলেও তৎকালীন কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটন দৃঢ় কণ্ঠে বলছিলেন, 'আমাদের মেয়েরা উঠে আসছে। আরেকটু পরিণত হলে তাদের হাত ধরেই সাফল্যের রঙে রঙিন হবে বাংলাদেশ।' টাঙ্গাইল থেকে উঠে আসা সাবেক এ ফুটবলারের ঘোষণা বাস্তবে রূপ নিয়েছিল ২০২২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর, কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায়। স্বাগতিক নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সাফল্যের রঙে গোটা দেশ রাঙিয়েছেন মেয়েরা। আক্ষরিক অর্থেই গোটা দেশ রাঙিয়েছিলেন নারী ফুটবলাররা। কারণ নিকট অতীতে দেশের কোনো ফুটবল দলকে ঘিরে সবচেয়ে বড় উৎসবটা হয়েছিল মেয়েদের সাফ জয়ের পরই। ছাদ খোলা বাসে করে বিমানবন্দর থেকে রাজসিক সংবর্ধনায় মেয়েরা মতিঝিলে এসেছিলেন। তাদের বরণ করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল লাখো মানুষ। নানা টানাপড়েন ও জটিলতার মাঝে ২০২৪ সালেও সাফল্য ধরে রাখে বাংলাদেশ। কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় সাফ মুকুট মাথায় তোলেন ঋতুপর্ণা, সাবিনা ও কৃষ্ণারা।

ফুটবলে ভাগ্য বদল

বয়সভিত্তিক দল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দেশের ফুটবলকে মুঠোভরে সাফল্য এনে দিয়েছেন নারী ফুটবলাররা। এ ফুটবলই আবার তাদের ভাগ্য বদলের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছনের জীর্ণ কুটিরের সামনে কালাসোনা চাকমার (রুপনা চাকমার মা) ছবি নেট দুনিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে দেখে সাফ জয়ের পর সরকারের তরফ নতুন চকচকে ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী কলসিন্দুরের ফুটবল কন্যাদের দুর্গম গ্রামে বিদ্যুতের আলো পৌঁছানোর মাধ্যম ছিল এ ফুটবল। খেলাটি ফুটবলারদের জীবনযাত্রার মানে এনেছে বড় পরিবর্তন। একটা সময় যাদের তিন বেলা খাবারের নিশ্চয়তা ছিল না, তাদের হাতেই এখন শোভা পায় নিত্যনতুন মডেলের আইফোন। ফুটবলের কল্যাণে রাতারাতি তারকা খ্যাতিও পেয়েছেন জাতীয় দলের অধিকাংশ সদস্য। সামাজিক

গত বছর নেপালে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৬ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয় করে বাংলাদেশের কিশোরীরা

বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টে রানার্সআপের মেডেল হাতে শিশু ঋতুপর্ণা চাকমা

যোগাযোগমাধ্যমে তাদের হাজারো-লাখো অনুসারী। তাদের এ তারকাখ্যাতির কারণেই অনেকের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকও মিলছে। দেশকে সাফল্য এনে দেয়ার বিপরীতে এমনটা তাদের প্রাপ্যও ছিল।

বাংলাদেশের নারী ফুটবলের প্রাণভোমরা এখন ঋতুপর্ণা চাকমা। সর্বশেষ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তার বাম পায়ের জাদুকরী এক গোল বাংলাদেশকে শিরোপা পাইয়ে দেয়। সেই থেকে তিনি সবার আকর্ষণের কেন্দ্রে। রাঙ্গামাটির কাউখালীর প্রত্যন্ত মগাইছড়ি থেকে উঠে আসা এ তারকা তার ফুটবলজীবনের যাত্রা নিয়ে *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'ফুটবলে আমার শুরুটা ২০১২ সালে, তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা গোল্ড কাপ থেকেই উঠে এসেছি আমি। আমার উঠে আসার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমার কোচ বীরসেন চাকমা, যিনি আমার জ্যাঠা হন। ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা গোল্ড কাপ খেলি এবং ২০১৫ সালে বিকেএসপিতে ট্রায়াল দিই। ২০১৬ সালে আমি বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। ২০১৭ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৫ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য আমি বাফুফের ক্যাম্পে ডাক পাই। ওখান থেকেই আমার যাত্রা মূলত। এরপর আর পেছন ফিরে তাকানো হয়নি আমার। ২০১৭ সাল থেকে আমি বাফুফের ক্যাম্পেই আছি, এখন পর্যন্ত।'

এখন তো সর্বত্র তারকাখ্যাতি। নিজ গ্রামেও সবার মধ্যমণি। এ নিয়ে তিনি বলেন, 'গ্রামে আগের দিন আর এখন অনেক অনেক তফাত। আমিও বড় হয়েছি, এখানের সবকিছু বদলে গেছে। একটা সময় অনেকে অনেক কটু কথা বলত, এখন বলে না। আমাকে যারা চেনে তারা আমাকে নিয়ে গর্ব করে। এটা আমার জীবনে অনেক পাওয়া আরকি।'

সাফজয়ী দলের ডিফেন্ডার কুষ্টিয়ার মেয়ে নীলুফা ইয়াসমিন নীলা বয়সভিত্তিক অনূর্ধ্ব-১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯ দলে নিয়মিত খেলেছেন। নীলার বয়স যখন সবে আড়াই বছর তখন বিচ্ছেদ হয় মা-বাবার। তার ছোট বোনের বয়স তখন দেড় মাস। কিন্তু দমে যাননি মা বাছিরন আক্তার। কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় মায়ের বাড়িতে ওঠেন। স্থানীয় এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চাকরি নেন। সামান্য বেতনে চলতে থাকে সংসার। এমন পরিস্থিতিতে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুই মেয়েকে বড় করেছেন বাছিরন। এখন সংসার চলে নীলার অর্থে। শৈশব ও কৈশোরের দুঃসহ যন্ত্রণার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, '২০-২১ বছর আগে মাকে তালাক দেয় আমার বাবা। এরপর আমরা আশ্রয় নিই নানির বাড়িতে। নানি বাড়িতেই বড় হয়েছি। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ১০ লাখ টাকা দিয়ে জমি কিনি, এরপর বাড়ি করি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নীলা বলেন, 'পড়াশোনা ও খেলাধুলা নিয়েই থাকতে চাই। পড়াশোনা শেষে খেলাধুলা নিয়েই কাজ করতে চাই। আমি আমার ফ্যামিলির দেখভাল করছি। সারা জীবন আমি আমার ফ্যামিলিটাকে ঠিকমতো চালাতে চাই।'

উঠে আসা নিয়ে নীলা বলেন, 'ফাত্তাহ ভাই (বাফুফের সাবেক কর্মকর্তা আহমেদ সাইদ আল ফাত্তাহ) ২০১২ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুষ্টিয়ায় মেয়েদের ফুটবল খেলা শেখাতে যান। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। ফাত্তাহ ভাই ঢাকা থেকে কুষ্টিয়ায় এসে পাঁচ-ছয়জন মেয়েকে ডেকে ফুটবল খেলা শেখান। প্রতিদিন দুই বেলা অনুশীলন করাতেন। একবেলা থানাপাড়া মাঠে আর একবেলা গড়াই নদী বালুর চরে। অল্প সময়ের মধ্যে ফুটবল খেলার দক্ষতা অর্জন করালেন। ফাত্তাহ ভাই জার্সি, বুট, বল কিনে দিতেন। পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতেন। তিনি শুধু মেয়েদের খেলা শেখানোর জন্য কুষ্টিয়ায় এসেছিলেন। তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বসবাস করতেন। আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তাকে বেহেশতবাসী করুক।'

বয়সভিত্তিক ফুটবল ও জাতীয় দলে এক দশক ধরে আধিপত্য করে আসছেন ময়মনসিংহের কলসিন্দুর থেকে উঠে আসা ফুটবলাররা। সানজিদা আক্তার, মারিয়া মান্ডা, তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার, শামসুন্নাহার জুনিয়র, শিউলি আজিমরা দাপটে খেলে যাচ্ছেন জাতীয় দলে। জাতীয় দলে উঠে আসার আগে যে কোচের হাতে গড়ে ওঠেন সানজিদারা তিনি হলেন কোচ জুয়েল মিয়া। তিনি বলেন, 'ফুটবলের কল্যাণে কলসিন্দুরকে এখন সবাই চেনে। এটা আমাদের জন্য অবশ্যই গর্বের।'

এরপর পেছনে ফিরে গেলেন তিনি। সানজিদা, মারিয়াদের শুরুর গল্প নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি সম্পৃক্ত হওয়ার আগে মূলত তাদের যাত্রা বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল দিয়ে। ওই টুর্নামেন্ট না হলে হয়তো তাদের আজ এ পর্যায়ে যাওয়া হতো না। কারণ এই টুর্নামেন্ট খেলেই তারা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি পায়, খেলার সুযোগ আসে। সানজিদাদের মতোই মনিকা চাকমা, ঋতুপর্ণা চাকমা কিংবা কৃষ্ণা রানী বলেন—সবাই কিন্তু বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ খেলে উঠে এসেছে।'

ফুটবলই জীবন পাল্টে দিয়েছে কলসিন্দুরের এই মেয়েদের। জুয়েল মিয়া বলেন, 'হ্যাঁ, এখন সবাই ভালো আছে। সবাই বাড়তি কিছু টাকা পেয়েছে, যা দিয়ে তারা কেউ বাড়ি-ঘর তুলেছে, কেউবা জমি বন্ধক রেখেছে।' তিনি জানান, সানজিদা ও তহুরার পরিবার আগে থেকেই ভালো ছিল, টাকা-পয়সা ছিল; বাকিরা ছিল একটু গরিব। এখন সবাই মোটামুটি সচ্ছল।

ফুটবলই আলো জ্বালিয়েছে অন্ধকার কলসিন্দুরে, তেমনি রাঙ্গামাটির মগাইছড়িতে।

তবে আলোর নিচেই থাকে অন্ধকার। যে ফুটবল দিয়ে গোটা জাতিকে উৎসবের উপলক্ষ এনে দিয়েছিলেন সাবিনা, ঋতুপর্ণা, মনিকা, কৃষ্ণা, সানজিদা, মাসুরা, মাতসুশিমা; সে ফুটবলই রাতারাতি কাঠগড়ায় তুলেছে নারী ফুটবলারদের। ব্রিটিশ কোচ পিটার বাটলারকে সিনিয়র ফুটবলাররা বয়কট করলে রুগ্‌ণ দশা পরিষ্কার হয়। যার সূচনা হয়েছিল ২০২৪ সালের মে-জুনে চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের সময়। বাফুফে এলিট একাডেমির কোচ বাটলারকে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য নারী জাতীয় দলের আপৎকালীন দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সে সময় জটিলতার সূত্রপাত হলেও বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০২৪ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের মাঝপথে। সিনিয়র খেলোয়াড়দের অনেককে বাদ দিয়ে নতুনদের নিয়ে একাদশ গড়েন। ফল খারাপই হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ড্র করে বসে বাংলাদেশ। তা-ও শেষ মুহূর্তে সিনিয়ররা বদলি হিসেবে নামায় বড় লজ্জা থেকে রক্ষা পায় দল। পরের গল্পটা সবার জানা। সমালোচনার জন্ম হলেও সহকারীদের পরামর্শে পরের ম্যাচগুলোয় আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে যাননি বাটলার। ফলে টানা জিতে শিরোপা নিয়ে দেশে ফেরেন সাবিনা ও তার সতীর্থরা।

শিরোপা উদযাপন চলতে থাকলেও কোচ ও খেলোয়াড়দের মধ্যকার বৈরিতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অথচ এ জটিলতার লাগাম না টেনেই বাটলারকে আরো দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ নারী দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেয় বাফুফে। নতুন বছরে বাটলার দায়িত্ব নিতে আসার পর বেঁকে বসেন জাতীয় দলের ১৮ সিনিয়র ফুটবলার। যাদের বাদ দিয়ে আরব আমিরাতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে পাঠানো হয়েছিল বয়সভিত্তিক ফুটবলারদের মাধ্যমে গড়া জাতীয় দলকে। দুটিতেই ৩-১ গোলে হেরে বসে বাংলাদেশ দল।

শেষের কথা

লড়াই ও সংগ্রামের সূচনা। এরপর নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সাফল্যের সোপানে পা রাখা দেশের নারী ফুটবল হঠাৎই এখন উল্টোরথ ধরেছে। ইংরেজ কোচের বিরুদ্ধে সাবিনাদের বিদ্রোহের মাধ্যমে অনেকে উল্টোরথের সূচনা দেখছেন বটে, জটিলতা কিন্তু উঁকি দিয়েছে আরো আগেই। সেটা ২০২৪ সালের নারী ফুটবল লিগ দিয়ে। কথিত আছে, জাতীয় দলের সিনিয়র ফুটবলাররা জোট বেঁধেছিলেন ন্যূনতম পারিশ্রমিক ১৫ লাখ টাকা করে দিতে হবে। এ দাবির কারণে বসুন্ধরা কিংসের মতো সফল দল নারী ফুটবল লিগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দেশের নারী ফুটবল এমনিতেই নড়বড়ে ছিল, অবস্থা নাজুক হয়েছিল বসুন্ধরা কিংসের পিঠটানে। এখানে দায় কার খুঁজতে যাওয়া বোধকরি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিলেই বরং সেটা দেশের নারী ফুটবলের জন্য ইতিবাচক হবে।

বড় গল্প

বাবলি

ফয়জুল ইসলাম

বাবলিকে জামান বলল, 'তোমাকে দেখতে অন্য রকম লাগছে!' সারা মুখে কৌতুক ফুটিয়ে তুলে, হাসতে হাসতে বাবলি বলল, 'বুঝতে পেরেছি, আপনি বলতে চাইছেন, আমি বুড়িয়ে গেছি!' জামান আসলে বলতে চেয়েছিল, গেল দুই যুগে আরো ভরভরন্ত হয়েছে বাবলির শরীর। আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে, কিছুটা মোটার ধাত জেগেছে সেখানে। তবে এটা কখনই বলা সংগত হবে না যে বাবলির ফর্সা ত্বকে আগের মতো দ্যুতি আর অবশিষ্ট নেই! আটত্রিশ কি উনচল্লিশ বছরের নারীদের ত্বক সাধারণত উজ্জ্বলতা হারায় না। কিন্তু এত কথা কি আর দূরতমাকে ভেঙে বলা যায়? তখনই হয়তো বাবলির মনে প্রশ্ন উঠতে পারে—ও বাবা! দু মিনিটেই সব মাপা হয়ে গেল! এই না সে কেবল কালনী এক্সপ্রেসের 'খ' নম্বর বগিতে উঠল; ভিড় ঠেলে এসে বসল জানালার পাশের সিটে, আর অবাক হয়ে দেখল, তাদের পাড়ার জামান ভাই বসে আছে ঠিক তার সামনেই! মনের ভেতরে এসব সাতপাঁচ ভাবনা আসাতে সংকুচিতই হয়ে গেল জামান। নিবুনিবু স্বরে বাবলিকে সে কেবল বলতে পারল, 'আরে না! আমি মোটেই সে কথা বলতে চাইনি!' তারপর একটা শুকনো হাসিতে একেবারেই থেমে গেল সে। কার্তিক মাসের সেই বিকালে কমলাপুর স্টেশন থেকে গড়াতে গড়াতে সিলেটের দিকে বেরিয়ে গেল রেলগাড়িটা।

জামানের মনে হামলে পড়ল ফেলে আসা পাবনা শহর, শহরের কেন্দ্রে তাদের পাড়া—গোপালপুর, গোবিন্দবাড়ি মন্দিরের কাছেই। তাদের বাসার ঠিক উল্টো দিকে তার বন্ধু খুকুমণিদের লাল রঙের একতলা বাসা। সেই খুকুমণির ছোট বোন এই বাবলি। জামান আর খুকুমণির চেয়ে বাবলি বছর চারেকের ছোট। হাফ প্যান্ট আর ফ্রক পরা এক শিশু সেই লাল বাসাটার লম্বা বারান্দা আর সামনের ছোট একটা মাঠে খেলতে খেলতে বড় হয়ে গেল; গার্লস স্কুল পার হয়ে ঢুকল মহিলা কলেজে। ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেই তার বিয়ে হয়ে গেল ঢাকা শহরের শান্তিবাগ এলাকার জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে।

বাবলির বিয়ে হয়ে গেল বলে জামানের হৃদয়ে কি ব্যথা জাগেনি তখন? না বলা প্রেমকে কি সে কবর দেয়নি, বুকের ভেতরের অন্ধকারে, সংগোপনে। খুকুমণির কাছে সে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তখন বলেছিল, এত অল্পবয়সী একটা মেয়ের বিয়ে না দিলে হয় না? বাবলির শ্বশুরবাড়ির মানুষজন যদি তাকে পড়াশোনা চালাতে না দেয়? তুই তো ঠিকই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিস! বাবলিকে কেন সে সুযোগটা তোরা দিবি না?

খুকুমণি তাকে নিরস্ত করেছিল এই বলে, ভালো সম্বন্ধ এসেছে বাবলির। সবসময় তো আর মালদার পাত্র আসে না! এটাও তো ভেবে দেখতে হবে।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে জামান খুকুমণিকে বলেছিল, মালদার পাত্র দিয়ে কী হবেটা শুনি? মৌচাক মার্কেটে কসমেটিকসের দোকান থাকলেই হয়ে গেল? আরাফাত না কী যেন নাম ভদ্রলোকের, সে নাকি ডিগ্রি পরীক্ষাও উতরাতে পারেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তো দূরে থাক! পড়াশোনা জানা পাত্রের কি অভাব পড়েছে এ দেশে?

খুব বিজ্ঞের মতো উত্তর করেছিল খুকুমণি, মালদার পাত্র হলে মেয়েদের জীবন সহজ হয়, বুঝলি তো গাধা?

প্রশ্ন করেছিল জামান, সেটাই যদি হবে তবে খুকুমণি নিজে কোনো মালদার আদমিকে বিয়ে করেনি কেন? কে আটকেছিল তাকে? খুকুমণির স্বামী, জনতা ব্যাংকের একজন জুনিয়র অফিসার, ক'টাকাই বা বেতন পায়? তো খুকুমণির স্বামী কি পাত্র হিসেবে খারাপ?

এ কথার পর বাবলির বিয়ের সপক্ষে যুক্তি দেয়া বন্ধ করেছিল খুকুমণি। একটু ভেবে সে জামানকে বলেছিল, আব্বা মত দিয়ে বসেছে। পাত্রপক্ষ বিয়ের জোগাড়যন্ত্র শুরু করেছে। তো এখন কি আর কথা ঘোরানো যাবে নাকি?

সেটা বোঝার পরও নিজের যুক্তিতে অটল ছিল জামান। সে বলেই চলেছিল, তাই বলে এত কাঁচা বয়সের একটা মেয়েকে এখনই জটিল জীবনে ঢোকাতে হবে? খুকুমণির নিজের তো বিয়ে হয়েছে কুড়ি পার হওয়ার পর। আর ক'টা দিন অপেক্ষা করে বাবলিকে বিয়ে দেয়া যায় না?

তা ঠিক! বয়স হিসাবে সতেরো একটু কমই হয়ে যায়!

আর ক'টা দিন বাদে বাবলি তো কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবে। কী ভালো ওর মাথা! এসএসসিতে সায়েন্স গ্রুপ থেকে লেটার মার্কস পেল চারটা সাবজেক্টে। সোজা কথা নাকি? বিয়ের পরে এত ভালো একজন ছাত্রীর ভবিষ্যৎ যদি নষ্ট হয়ে যায়? তখন কী করবি তোরা?

তা বটে! বিয়ের পরে বাবলি পড়বে নিশ্চয়। তা নিয়ে আগে থেকেই দেনদরবার করে রাখবে কন্যা পক্ষ। তাহলে তো হলো, নাকি?

সেসব যুক্তি-প্রতিযুক্তি আর ভালো লাগছিল না জামানের! খুকুমণিকে সে বলতেও পারছিল না যে সে বাবলিকে খুব পছন্দ করে। সেই মুহূর্তে জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র বলে বিয়েথার মতো দায়িত্বপূর্ণ একটা কাজ করাটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে মাস্টার্স পাস করার পর একটা চাকরিবাকরি পেলে তো তার সঙ্গে বাবলির বিয়ের ব্যাপারে বড় কোনো বাধা থাকছে না। সে পর্যন্ত বাবলির বিয়েটা আটকাতেই হবে বলে বদ্ধপরিকর হয়েছিল জামান। তাই সে জোর খাটিয়েই খুকুমণিকে বলেছিল, 'এতসব কথা এবার বাদ দে! এই বিয়ে তুই আটকাবি। ব্যস!'

'আব্বা যে রাগী মানুষ! আমার কথায় রাজি হবে না কিছুতেই!' অস্বস্তি নিয়ে উত্তর করেছিল খুকুমণি।

তবু একবার তো চেষ্টা করে দেখা যেতেই পারে! এমন হতে পারে যে খুকুমণির আব্বা বাবলির বিয়ে বন্ধ করে দিলেন!

আচ্ছা! আম্মাকে বলে দেখব।

জামান জানে, বাবলির বিয়ে বন্ধ করতে জোর চেষ্টা চালিয়েছিল খুকুমণি। কিন্তু তাদের বড় বোন, বড় দুলাভাই আর তাদের আব্বা—জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী পরিদর্শক—ঢাকা শহরের সেই মালদার পাত্রের সঙ্গে বাবলির বিয়ে দিয়েই ছাড়ল! ঢাকায় চলে গেল বাবলি। একই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের ছাত্র জামানের সঙ্গে তার আর দেখা হলো না—মানে, জামান তার সঙ্গে দেখা করল না। বাবলিও তাকে খোঁজেনি কখনই। খুঁজবেইবা কেন? বাবলি তো আর তার প্রেমে পড়েনি কখরো! বাবলির প্রেমে মজেছিল জামান, নিজে থেকেই। সে কথা বাবলি জানেনি, খুকুমণিও জানেনি কোনোদিন।

এবার প্রশ্ন আসছে, কেন শেষ মুহূর্তেও খুকুমণির কাছে বাবলির প্রতি তার দুর্বলতার কথাটা খুলে বলেনি জামান? জামান ভেবে দেখেছে, তখন তার মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা ভালোভাবে নাও নিতে পারে খুকুমণি—হয়তো সে ভাববে, দুধকলা দিয়ে তোকে পুষলামরে হারামখোর! আমার মা তোকে নিজের ছেলে বৈ ভাবেনি আর কিছুই! আর তুই কিনা বাবলিকে ফুসলানোর ধান্দা নিলি? এমন চাঁচাছোলা কথা বলতেই পারত খুকুমণি। রেগে গেলে ওর মুখের লাগাম থাকেনি কোনোদিন। এভাবে নিজের অনুভূতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল জামানকে। সে কষ্টটা কখনই সে ভোলেনি, এমনকি পম্পার সঙ্গে বিয়ের পরেও নয়, পম্পার ভালোবাসা আর করুণাস্পর্শের পরও নয়! তবু যে পাখি উড়ে গেছে তার পাখনার পালক আর গুনে দেখেনি জামান। এই যে রেলগাড়ির জনাকীর্ণ বগিতে বাবলি আর সে এই মুহূর্তে সামনাসামনি বসে আছে, নিচুস্বরে কুশলাদি বিনিময় করছে, দু যুগ পরে—এখন এক লহমায় ফিরে এসেছে অতীতের ব্যর্থতা আর অনুশোচনা আর বিচ্ছেদের ভার। তুমি তা না জানিলে বাবলি।

গত দু যুগে খুকুমণির সূত্রে বাবলির যেসব খবর পেয়েছে জামান তার ভেতরে মাত্র দুটো খবর জামানের মনে আছে: এক. বাবলির দু সন্তান—দুজনেই ছেলে; আর দুই. বছর দশেক আগে শান্তিবাগের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পেছন থেকে তাকে ধাক্কা দিয়েছিল একটা রিকশা, তখন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিল বাবলির বাম পার পাতার নিচের দিকের অস্থি। এর বেশি কিছু জামান জানে না। খুকুমণি সপরিবার কানাডায় বাস করতে শুরু করার পর থেকে জামানের সঙ্গে খুকুমণির যোগাযোগও কমে গেছে অবশ্য। গত বছর চারেক জামানের কাছে খুকুমণির মারফত বাবলির কোনো খবরই আর আসেনি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জামানও খুকুমণিকে জিজ্ঞাসা করেনি কিছুই। সেটা কেন করেনি জামান? সময় তো সব ব্যথাই কমিয়ে দেয়, কেবল পড়ে তাকে স্মৃতির পালক। সবার বেলায় এটাই ঘটে থাকে বলে জামান দেখেছে। এ মুহূর্তে বাবলির সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর্যায়ে বেরিয়ে এল কিছু কিছু খবর। জানা গেল, বাবলির দু ছেলেই বড় হয়ে গেছে—বড়টার বয়স উনিশ, ছোটটার ষোলো। আর বাবলির ব্যবসায়ী স্বামী আরাফাত নিজের ব্যবসার পরিধি আরো বাড়িয়েছে—মৌচাক

মার্কেটের কসমেটিকসের দোকান তো ছিলই, এখন মালিবাগ মোড়ে একটা মাঝারি আকারের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দিয়েছে সে, এছাড়া সে একটা রেন্ট-এ-কার কোম্পানিও চালায়। আরো জানা গেল, বাবলিরা এখনো শান্তিবাগেই থাকে। শান্তিবাগ থেকে ভেতরে ঢুকে যাওয়া রাস্তাটা বেশ সরু। তার ওপর মহল্লায় রিকশার সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক! তাই এখন বাসায় গাড়ি ঢোকাতে অসুবিধাই হয়। তবু শান্তিবাগের আদি বাড়ি ছেড়ে গুলশানের বাসায় চলে যায়নি তারা। ভাড়া দেয়া আছে গুলশানের বাসাটা।

জামানের খবরই বা কি? বলার মতন তেমন কিছুই নেই জামানের—গেল চৌদ্দ বছর ধরে সে বন অধিদপ্তরের অর্থবিষয়ক অনুবিভাগের সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক হিসেবে কাজ করছে; পম্পা আর তার সন্তান একজনই; তাদের মেয়েটা ক্লাস ফোরে পড়ে শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে; আর তারা ভাড়া থাকে মধ্য পীরেরবাগের শিমুলতলায়। এই আরকি!

ব্যক্তিগত বিষয়ে খোঁজখবর নেয়ার পরে বাবলির মনে প্রশ্ন জাগে, 'তো জামান ভাই, সিলেট যাচ্ছেন যে? অফিসের কাজে নিশ্চয়!' ব্যাপারটা তেমনই—সিলেট শহরে বন বিভাগের যে রেস্ট হাউজ আছে তার রেনোভেশনের কাজ চলছে, সেটার অগ্রগতি দেখতে যাচ্ছে জামান।

আর তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবলি? শায়েস্তাগঞ্জে বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাচ্ছে সে। পাবনা শহরের চারতলা এলাকার রত্নার কথা মনে আছে না জামানের? জামান মনে করতে পারে, রত্না বাবলির সঙ্গে গার্লস স্কুলে পড়ত। বাবলি জামানকে জানায়, রত্নার স্বামী সমবায় কর্মকর্তা, তার পোস্টিং এখন শায়েস্তাগঞ্জে। বাবলি বেড়াতে যাচ্ছে সেখানে; থাকবে তিন-চারদিন।

বাবলি বলে, রেলগাড়িতে কি আর গল্প করে আরাম হয়? সারাটা ক্ষণ শব্দ হচ্ছে ঝিকঝিক! ঝিকঝিক! এই ভালো যে আপনি আমাদের শান্তিবাগের বাসায় আসুন। তুর্কি চা খাওয়াব আপনাকে।

নিশ্চয়! সময় করে যাব কোনো দিন।

জামান আর বাবলিকে বলে না: তাহলে তুমি বোম্বের নায়িকা মাধুরী দীক্ষিতের মতো মিষ্টি করে আবারো হাসবে তো? তোমার বাদামি চোখের তারায় লেখা থাকবে কি অজস্র বুনো ফুলের কবিতা? পড়তে দেবে তো কবিতাগুলো, চুমুতে? একটু ধরতে দেবে তোমার বাঙময় আঙুলগুলো? তোমার চাঁপাকলি আঙুল তো কোনোদিন ছুঁয়ে দেখাই হলো না আমার! কিংবা ধরো...। নাহ্! থাক। আর কিছু চাইব না। জামান ভাবে, এসব চাইলেই বা কী ফায়দা? সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে—বুঝলে বাবলি! জীবনানন্দ দাশের এ কবিতাটা আমার রুমমেট পূর্ণেন্দু আবৃত্তি করত, অনেকটা শম্ভু মিত্রের পাঠের কায়দায়। হারিয়ে গেছে পূর্ণেন্দু। হারিয়ে গেছো তুমিও দূরতমা! তুমি জানলেও না, তুমি যখন ক্লাস এইটে আর আমি এডওয়ার্ড কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে, তখন আমি তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। দুদিন আমার পড়ার টেবিলে একটা খাতার ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিলাম চিঠিটা। তোমাকে দেব বলে পণ করে চিঠিটা প্যান্টের পকেটে নিয়ে বাসা থেকে বেরও হয়েছিলাম একদিন। কিন্তু সাহসে কুলায়নি আর—তোমাদের বাসার পাশ দিয়ে যে সরু ড্রেনটা মহিলা কলেজের দিকে চলে গিয়েছিল, সেখানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম চিঠিটা শেষ পর্যন্ত। আমার কেবল মনে হচ্ছিল, চিঠিসুদ্ধ আমি ঠিক ধরা পড়ে যাব খুকুমণির হাতে! তুমি তো জানলে না এসব; জানলে না আরো অনেক কথা যা রয়ে গেছে সংগোপনে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও জানতে পারেনি তা!

গল্পে গল্পে জামান আর বাবলি দু রাউন্ড চা খায়। শায়েস্তাগঞ্জে নেমে যায় বাবলি। রেলগাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার আগে সে জামানের মোবাইল ফোনে তার ফোন নম্বর সেভ করে দিয়ে যায়।

কমলগঞ্জ-কুলাউড়ার দিকে রওনা দেয় কালনী এক্সপ্রেস। তখন কার্তিকের অন্ধকারে আদিগন্ত মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে।

২. একদিন মেসেঞ্জারে : আজি হৃদয় আমার

হুট করেই বাবলির বিয়ে হয়ে গেল ২০০৩ সালে। তারপর বাবলির বড় বোন খুকুমণির গ্রিন রোডের বাসায় যাতায়াত কমিয়ে দিল জামান। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নতুন সব সঙ্গ খুঁজে নিল সে। ক্যাম্পাস শেডো, মল চত্বর বা লাইব্রেরির সামনে দেখা হলে সে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাই করছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু খুকুমণিকে। বারবারই তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিল খুকুমণি! কখনো ক্ষিপ্ত হয়ে খুকুমণি অনুযোগ জানাচ্ছিল, রঙিন চশমা চোখে দিয়েছ, তাই নয়? এখন আর বাল্যবন্ধুকে ভালো লাগছে না তোমার! টিনা-মিনা-রিনাদের সঙ্গে গোল্লায় যা গা তুই। রোকেয়া হলে কি তোর জন্য একটা সিট ম্যানেজ করে দেব? হলের গেটে কাকাতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে না থেকে হলের বোর্ডারই হয়ে যা বরং! ফেলিরে ফেলি! বুঝবিরে দিন গেলি! খুকুমণির সেসব খোঁচানো কথাবার্তা গায়ে মাখছিল না জামান। কখনো কখনো সে আঘাতও করে বসছিল খুকুমণিকে। যেমন সে খুকুমণিকে বলছিল, বিয়েশাদি করেছিস, তো জানালার পর্দা কিনতে তোর জামাইকে নিয়ে নবাবপুর যা না! নাপিত দেখলেই তোর নখ বাড়ে কেনরে ছেরি?

জামানের কেবলই মনে হচ্ছিল, কলেজপড়ুয়া বাবলির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পেছনে খুকুমণিরও জোগসাজশ ছিল নিশ্চয়। বাবলির স্বামী মালদার আদমি বলে কথা! তো তোরা থাক গা তোদের 'কাকের গলায় গজমতি' বোনজামাই নিয়ে। দাঁত কেলিয়ে হাসতে তোর বোনজামাইয়ের শান্তিবাগের বাসায় গিয়ে তুই মুরগিমুসাল্লাম খা গা! আমি এসব খেতে যাচ্ছি না বাবলির বাসাতে, জীবন চলে গেলেও নয়! আমাদের সূর্য সেন হলের ডাইনিংয়ে অনেক ভালো রান্না হয়, নীলক্ষেত মোড়ের বিরিয়ানির স্বাদ কি কম কিছু? এভাবে জামানের দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল তার জানের বন্ধু খুকুমণির সঙ্গে। খুকুমণিদের শতবর্ষী লাল বাসায় জামানের আর পা পড়ল না। বাসাটা আরো জরাজীর্ণ হয়ে গেল তার চোখের সামনে। এমনকি পাবনায় গেলে জামান আর খুকুমণির আম্মার সামনে গিয়েও বসছিল না। খুকুমণির মা তাকে অনেকবার খবর পাঠিয়ে চুপ হয়ে গেল একসময়। বাবলির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নিজের ভেতরে এসব অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখে নিজেই অবাক হচ্ছিল জামান! একসময় কানাডার আলাবার্টাতে দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে চলে গেল ফলিত রসায়ন বিভাগের ছাত্রী খুকুমণি। কালেভদ্রে খুকুমণির সঙ্গে ফোনে কথা বলা ছাড়া এভাবে আর কোনো যোগাযোগই অবশিষ্ট রইল না বাবলিদের পরিবারের সঙ্গে। জামানের বেলায় চাকরিবাকরি আর ঘর-সংসারের চাঁদোয়া তীব্রতর হয়ে উঠল দিনকে দিন। বিস্মরণের পাকে পাকে অনেক কিছুই ভুলে গেল জামান। মনঃকষ্টের জগদ্দল পাথরটা পর্বতের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে হারিয়ে গেল নিচে কোথাও। জামান ভাবে, ভালোই হয়েছিল সেটা।

কিন্তু দু যুগ পর একজন কানার পা আবার সেই খালে গিয়েই পড়ল! ব্যাপারটা এমন: সিলেট শহরের শাহি ঈদগাহর কাছে বন বিভাগের রেস্ট হাউজে উঠেছিল জামান। রেস্ট হাউজের রেনোভেশনের কাজ দেখে তার পরের দিন সে গিয়েছিল কমলগঞ্জের লাওয়াছড়ার সংরক্ষিত বন পরিদর্শনে। কমলগঞ্জের পথে যখন তার জিপ চলছে তখন ফেসবুকে বন্ধুতা পাতানোর অনুরোধ পাঠিয়েছিল বাবলি। সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিয়েছিল জামান। তখনই মেসেঞ্জারে বাবলির বার্তা এসেছিল, 'কী করছেন বনবাবু?'

'কী আর? কাজে যাচ্ছি।'

'লাউয়াছড়া খুব পছন্দের জায়গা আমার।'

'হ্যাঁ! বনটাতে অনেক দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ আছে। খেয়াল করেছ নিশ্চয়!'

'বনের মাঝে রেস্ট হাউজ আছে একটা।'

'রাতে ওখানেই থাকব।'

'লাউয়াছড়ায় অজগর সাপ আছে কিন্তু!'

'তা জানি। রেস্ট হাউজের দরজা-জানালা তাই সবসময় আটকানো থাকে। ভয় নেই।'

'ঠিক আছে। কাজ করেন তবে। পরে কখনো কথা হবে।'

পরে কথা হবে? কখন? সেটা আর বলে গেল না বাবলি। জামান দেখতে পায়, প্রায়ই মেসেঞ্জারে সবুজ হয়ে আছে বাবলি। কিন্তু বাবলির মেসেজ বা ফোন আসে না! এদিকে জামানের মনে উঁকিঝুঁকি মারে দূর অতীতের অনেকগুলো ছায়া—মহিলা কলেজ থেকে হেঁটে হেঁটে গোপালপুরের বাসায় ফিরছে কালো কামিজ, সাদা সালোয়ার আর সাদা ওড়না পরা দীর্ঘাঙ্গের সদ্য তরুণী; তার পিঠে পড়ে থাকা বাদামি রঙের ঘন চুলের প্রান্ত উড়ছে মৃদু হাওয়ায়। মনে হয়, তার চুলে ডাবল বেণি করে দিই! জামান নিজেদের বাসার সামনের রকে বসে তখন আড্ডা দিচ্ছে রেজা, সুলতান, তুষার, খোকা, সোলেমান—এদের সঙ্গে।

আর আড়চোখে সে লক্ষ করছে সেই তরুণীর ভারী বুক আর সুগোল নিতম্বে ছড়িয়ে থাকা আন্দোলন। জামানের মনে হয়, এ আন্দোলন যেন কোনোদিন না থামে, যেন ছন্দে ছন্দে ভস্ম হয়ে গেলে জামানের কিছু যায় আসে না! তুমি তো এসব গোপন কথার কিছুই জানলে না বাবলি; জানলে না, লাহিড়ীপাড়ায় আড্ডা দিয়ে রাতের বেলা বাসায় ফেরার পথে কেন খুকুমণির সঙ্গে দেখা করতে আমি তোমাদের বাসায় যেতাম! আসলে তোমাকেই খুঁজতাম আমি নানান ছলে।

বাবলির সঙ্গে কথা হলো সপ্তাহ দুয়েক পরে। অগ্রহায়ণের এক দুপুরে জামান যখন তাদের বন অধিদপ্তরের আগারগাঁওর অফিসের ছোট একটা ঘরে বসে আছে চুপচাপ, তখন ফেসবুক মেসেঞ্জারে ভেসে উঠল বাবলির টেক্সট। দীর্ঘ টেক্সটে বাবলি যা লিখেছে তার সারমর্মটা এমন : খুকুমণি আপা আর আপনি কত ভাগ্যবান—বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন আপনারা! আমার ফাটা কপালে সেসব জোটেনি। রোশনি আপা, মানে মেজো আপা, যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, তখন একবার মনুজান হলে আপার সঙ্গে দুদিন ছিলাম আমি। আমার বিয়ের পরের ঘটনা সেটা। আমাদের পাড়ার তিরা আপা আর আমার ছোট ভাইও সে সময়টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। ওরা আর ওদের বন্ধুরা মিলে আমাকে ক্যাম্পাসটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। আমার তখন খুব কান্না পেয়েছিল; আমার মনে হচ্ছিল, আমিও তো আপনাদের মতো করে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাড়তাম! আমার রেজাল্ট তো আর খারাপ কিছু ছিল না! কী দুঃখজনকভাবে কম বয়সে বিয়ে হয়ে গেল আমার! বিয়ের পরে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিলাম; লেটার মার্কস পেয়েছিলাম পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর অংকে। বড় ছেলেটা পেটে এল। আশপাশের মানুষের মনোযোগের অভাবে, অসহযোগিতায় পড়াশোনা থেকে মনই উঠে গেল আমার! কেন অতটা সংসার-অন্তঃপ্রাণ হয়েছিলাম সেটা ভেবে এখন মেজাজ খারাপ হয় নিজের ওপরই। ছোট থেকে কেন আমি মন দিয়ে পড়েছিলাম, সেটা আর বুঝতে পারি না আমি! আপনাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের নতুন বিল্ডিংটার ডিজাইন খুব ভালো লেগেছে আমার! ওখানে বেড়াতে গেলেই আমার মনে হতো, চারদিকে পড়ে আছে খুকুমণি আপা আর আপনার পায়ের ছাপ। আমার বন্ধু রত্না যখন কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে পড়ত, তখন আমি প্রায়ই কার্জন হলে যেতাম। কী সুন্দর সেখানকার পরিবেশ। আমার মনে হতো, দুপুরবেলাটায় কোনো বড় গাছের নিচে ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে যাই!

পরিতাপ আর আশাভঙ্গের এসব কথাই সেদিন মেসেঞ্জারে লিখেছিল বাবলি। বাবলি কেন সেসব কথা তাকে লিখতে গেল, তা আর কখনো মেলাতে পারেনি জামান! জামান কেবল ক'লাইন লিখেছিল বাবলিকে, মন খারাপ কোরো না! বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নিশ্চয় মানুষকে বিপুলা পৃথিবীর হৃদয়ের খুব কাছে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু দেখ, একটা সুখী পরিবার গড়েছ তুমি। সেটা ক'জনে পারে, বলো?

সে প্রশ্নের উত্তর করেনি বাবলি।

আসলে তলে তলে বাবলির জন্য মন খারাপ হয়েছিল জামানের। সেটা অবশ্য তার স্ত্রী পম্পা ধরতে পারল না। জামানের কেবল অনুশোচনা হতে লাগল এই ভেবে যে বাবলির আশাভঙ্গের জন্য সেই আসলে দায়ী! তার উচিত ছিল বাবলির পরিবারের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলা—বাবলিকে আমি পছন্দ করি। তাকে এখনই বিয়ে দেয়ার দরকার নেই। আপনারা ভেবে দেখেন, আর বছর দুয়েক পরই আমার মাস্টার্স শেষ হয়ে যাবে। আমি বেকার থাকব বলে মনে হয় না! এমন কিছু আশাজাগানিয়া কথা তো বাবলির পরিবারকে জামানের বলা উচিত ছিল তখন! এর জন্য কি তার কাপুরুষতা দায়ী নয়? সাহস করে মনের কথা বলতে পারলে হয়তো বাবলির বিয়েটা আটকানো যেত! আর বাবলির সঙ্গে বিয়ে হলে জামান কি বাবলিকে ঘরে বসিয়ে রাখত নাকি; তাকে এগিয়ে দিত পড়াশোনায়।

মাস দুয়েক বাদে এক সকালে ফোন এল বাবলির। সে জানাল, জলদিই তার গলব্লাডার ফেলে দিতে হবে। ল্যাপারোস্কোপি করে গলব্লাডার থেকে পাথর সরানো হয়েছিল বছর তিনেক আগে। সেখানে আবার জন্মেছে পাথর। পাথরের সঙ্গে এবার অনিয়ন্ত্রিত ইনফেকশন দেখা দিয়েছে, ওষুধে আর অসুখ সারছে না কিছুতেই। তাই তার সার্জন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবার সার্জারি করে কেটেই ফেলতে হবে তার গলব্লাডার। বাবলি মনে করে, সেটাই ভালো, শরীরের এ ব্যথা আর সহ্য হয় না! বাবলি মজা করে বলে, গলব্লাডার কাটা হয়ে গেলে পর সে তার ফেসবুক আইডি পরিবর্তন করে লিখবে—নো গল। এই বলে হাসতে থাকে বাবলি।

গম্ভীর কণ্ঠে বাবলিকে জিজ্ঞাসা করে জামান, 'ভয় লাগছে তোমার?'

একটু ভয় তো করছেই! বাবলির মনে হচ্ছে, জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া থেকে যদি তার জ্ঞান আর না ফেরে? ধরা যাক, পোস্টঅপারেটিভে থাকার সময় তার হার্ট অ্যাটাক হলো অথবা জ্ঞান ফেরার পরে দেখা দিল অ্যালঝেইমার বা পারকিনসন্স ডিজিজ! তখন কী হবে তার?

'আরে ধুর! এমন ঘটনা লাখে একটা ঘটে বলেই আমার ডাক্তার বন্ধুরা বলে। কিছু হবে না তোমার!' বাবলিকে ভরসা দেয় জামান।

'সেটাই যেন হয়! বেঁচেবর্তে বাসায় ফিরতে পারলে একটা মস্ত বড় পার্টি দেব। আপনি আসবেন তো?' হাসতে হাসতে বাবলি বলে।

'নিশ্চয় যাব!'

'জামান ভাই শোনেন, আসলে একটা জরুরি কথা বলতে ফোন করেছি আপনাকে।'

কথাটা এমন: কৈশোর থেকেই জামানকে খুব ভালো লাগত বাবলির। সত্যি বলতে কী বাবলির তারুণ্যের শুরুতে সেই ভালো লাগার সঙ্গে যৌথ জীবনের প্রত্যাশাও যোগ হয়েছিল। তবে সে কথাটা সে কখনই জামানকে জানাতে পারেনি, তার যখন বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তখনো নয়! স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করেছিল জামান, কেন তার কাছে ভালো লাগার কথা প্রকাশ করেনি বাবলি? তখন বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল বাবলি। তার কেবল মনে হচ্ছিল, ভালো লাগার কথা উন্মোচিত হলে তাকে পিটিয়ে বাসা থেকে বের করে দিতে পারে তাদের বাসার মানুষজন, এমনকি জামানের প্রিয় বন্ধু খুকুমণিও! তাদের আব্বার রাগের বহর নিশ্চয় জামানের মনে আছে! কখনো কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পেরেছে নাকি?

'তবু তুমি আমাকে বলতে পারতে!'

বলা হয়নি আরকি! আর এও ঠিক, তখন বাবলিকে বিয়েতে বসতেই হতো—শান্তিবাগের আরাফাত না হলেও অন্য কারো সঙ্গে। জামানের নিশ্চয় মনে পড়বে, বাবলির মেজো আপা তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড ইয়ার অনার্সে পড়ছিল। বাবলিদের ভাইবোনদের ভেতরে রোশনির গায়ের রঙই কেবল চাপা ছিল কিছুটা। সেজন্য রোশনির ভালো কোনো বিয়ের সম্বন্ধ আসছিল না। এদিকে গোপালপুরের এক নম্বর সুন্দরী বাবলির বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছিল দেদারসে। ব্যাপারটা নিয়ে যে রোশনি মন খারাপ করেছিল, তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল বাবলি। বাবলি যদি তখন বিয়ে না করত তবে তার মেজো বোন রোশনির বিয়ে হতো নাকি সহজে? হতো না।

বাবলির দীর্ঘ কথা শেষ হলে চুপ করে গিয়েছিল জামান। তারপর একটা গভীর শ্বাস নিয়ে সে তার বুকে হাজার বছর ধরে জমে থাকা একটা সত্যকে উন্মোচন করেছিল বাবলির কাছে, 'তোমাকেও আমার খুব ভালো লাগত বাবলি!'

'এবার বলি, তবে আপনিই বা আমাকে সে কথা বলেননি কেন?'

'আমার মনে কেবল ভয় হতো, তোমার বোন খুকুমণি আমার সঙ্গে তবে বন্ধুত্ব ত্যাগ করবে। ওরও তো রাগ ভীষণ, তোমার আব্বার মতোই!'

এ কথা শোনার পর একটু থমকে যায় বাবলি। টেলিফোনের ওপারে অকস্মাৎ নীরবতা নামে। সে নৈঃশব্দ ভাঙতে চায় না তারা কেউই। উত্তেজনার ঘোরে একটা সিগারেট ধরায় জামান। এক মিনিট, নাকি এক যুগ পরে, টেনে টেনে বাবলি বলে, 'যা ঘটে, তা ভালোর জন্যেই ঘটে।'

'আমার জীবন হয়তো অন্য রকম হতে পারত!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিক্রিয়া জানায় জামান।

'এটাই আপনার জীবন। পৃথিবী আপনার জন্য এ জীবনটাই নির্ধারণ করে রেখেছে। আমিও নিজেকে এসবই বুঝিয়েছি।'

'আমি এসব অদৃষ্টবাদ বিশ্বাস করি না!'

'সেটা আপনার অভিরুচি! তবে আমি আপনাকে বলতে পারি, আমার জীবনে অনেক কিছুই ঘটেনি—এটা সত্য, কিন্তু আমি এ জীবনটাকে খুব ভালোবাসি।'

'সত্যি তো?'

'হ্যাঁ! তিন সত্যি। আপনার সঙ্গে থাকা হয়নি জন্য বিয়ে হয়ে যাওয়ার প্রথম দিককার দিনগুলোতে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল আমার। তারপর মানিয়ে নিয়েছি। আমার স্বামী তো আর খারাপ কোনো মানুষ নয়! এখন আর আমি আপনার কথা ভেবে কাঁদি না; আজও কাঁদব না। যাহোক, যেটা বলতে চেয়েছিলাম আমি—একসময়ে আপনার প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। ব্যাপারটা জানা থাকল আপনার। সার্জারির সময় আমি যদি মারা যাই তবে তো আর আপনাকে এ কথা জানানো হবে না!'

একদা বাবলি তাকে পছন্দ করত—এ কথা জানার পরমুহূর্ত থেকেই মনের ভেতরে অশান্তি ছেয়ে গেছে জামানের। আর এদিকে বাবলি কিনা বলছে, বিবিধ অপূর্ণতার পরও সে তার স্বামী-সন্তান নিয়ে মোটেই অসুখে নেই! জীবন সম্পর্কে দুজন মানুষের বোধ তবে দুই বিপরীত মেরুতেই রয়ে গেল! তবে এখন কী করবে জামান? অতৃপ্তি তো যায় না? সে কি তবে দখল করতে চেষ্টা করবে হালকা বাদামি চোখের মেয়েকে, যে কিনা শীতের রোদে উঠানে মোড়া পেতে বসে চুল শুকাত আর শুনত সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান। কীভাবে করা যাবে সেটা?

এসব ভাবতে ভাবতে ছাতিমের সৌগন্ধে বৃথাই ভেসে গেল অগ্রহায়ণ।

৩. তুমি কি সৌগন্ধ হবে?

পিজি হাসপাতালে বাবলির গলব্লাডার ফেলে দেয়ার সার্জারি হয়ে গেল। পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড থেকে কেবিনে ফেরার তিনদিন পরে জামানকে ছোট্ট একটা টেক্সট মেসেজ পাঠাল বাবলি—আমি ভালো আছি। ভাববেন না। ব্যস! তারপর থেকে আর যোগাযোগ করেনি বাবলি। তাকে কল করতে বাধো বাধো লাগে জামানের। কোনো উপায় না দেখে হালচাল জানার জন্য তাই জামান চুপিসারে ফেসবুকে অনুসরণ করে চলে বাবলিকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়: বাসার ছাদে বাবলি তার স্বামীর সঙ্গে রোদে বসে চা খাচ্ছে, জমকালো কোনো রেস্তোরাঁয় সপরিবার লাঞ্চে গেছে তারা, বাবলির শান্তিবাগের বাসায় বেড়াতে গেছে পাবনা গার্লস স্কুলের তার সহপাঠীরা, রাজেন্দ্রপুরের কোনো একটা রিসোর্টের মাঠে খালি পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে বাবলি আর তার স্বামী—এসব। বেশির ভাগ ছবিতেই শ্রীময়ী সালোয়ার-কামিজ পরেছে, কামিজের হাতা কব্জি সমান লম্বা, আর সে মাথায় ঘোমটার মতো করে পেঁচিয়ে রেখেছে ওড়না, চশমাও লাগিয়েছে চোখে। বাবলি এখন চশমা পরে নাকি? চোখের সমস্যা হয়েছে তার? সেকি? জামান লক্ষ করে, চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই এই বয়সেও রূপের কোনো কমতি হয়নি বাবলির! তবে এ পরিণত বাবলিকে সে চেনে না। পাবনা শহরের গোপালপুরের একজন উচ্ছল কিশোরীকে বা তরুণী হয়ে উঠতে থাকা এক মেয়েকেই তার বেশি চেনা মনে হয়, বেশি আপন মনে হয়। এখন আর কোথাও সেই অল্প বয়সী মেয়ের চিহ্ন মিলছে না! জামান ভাবে, কোন উপঢৌকন দিলে বাবলির সঙ্গে নিভৃতে কথা বলা যাবে দুদণ্ড? তা ভেবে পায় না জামান! বাবলির সঙ্গে তো তার মীমাংসা বাকি আছে এখনো! বুকের ওপর অস্বস্তি চেপে বসে থাকলে কীভাবে সমুখে আগাবে জামান? সে তো ভেবেছিল যে বাবলিকে সে ভুলেই গেছে, আসলে তো ভোলেনি!

এসব ভাবতে ভাবতে ফাল্গুনের একদিনে বাবলিকে মেসেঞ্জারে টেক্সট মেসেজ পাঠায় জামান। কোনো ভণিতা না করে বাবলিকে সে বলে, 'দেখা করতে চাই।'

'আমাদের শান্তিবাগের বাসায় চলে আসেন না! খুব খুশি হব।'

'আসলে একান্তে একটু কথা বলা প্রয়োজন।'

'একান্তে? ধেৎ! কীভাবে সেটা সম্ভব? লুকিয়ে দেখা করতে পারব না আমি!'

'কিছু কথা বলার ছিল যে!'

'তো ফোন করি?'

'নাহ্! ফোনে এসব কথা বলা যাবে না। আমি বলি কী, তোমার যদি খুব না অস্বস্তি হয়, তবে রমনা পার্কে হাঁটতে গেলেই তো পারো!'

'নাহ্! পারব না ভাই!'

'পার্কে গেলে তোমার অসুবিধা কোথায়, শুনি? আমি কি তোমাকে স্বপনের ফ্ল্যাটে নিয়ে যেতে চেয়েছি নাকি?'

'কোন স্বপন?'

'আমাদের পাড়ার স্বপন স্যানাল!'

'না! না! সে কথা বলছি না! আচ্ছা! তবে আগামী শুক্রবার সকাল ন'টাতে রমনা পার্কে চলে আসবেন। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না কিন্তু—আগেই বলে রাখছি। কফি খাব, জুস খাব—এসব বায়নাটায়না ধরে দয়া করে সময় নষ্ট করবেন না আমার!'

'ওকে! আমি রাজি।'

বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাবলি বলে, 'আমি আর আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না! তার চাইতে চলেন, পার্কে একটু হাঁটি। মেলাদিন পরে এলাম এদিকটাতে।' তারপর সে মাঠ ভেঙে রওনা দেয় দক্ষিণ দিক বরাবর। তার পিছু ধায় জামান। তারা দুজনে চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটতে থাকে; হাঁটতে হাঁটতে তারা পৌঁছে যায় ঝিলের ধারে। ওখানে গণপূর্ত বিভাগ সম্প্রতি কাঠের ব্রিজ বানিয়েছে একটা। সেই ব্রিজ ধরে তারা সমুখে হেঁটে যায়; ফিরেও আসে নীরবতার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। হেয়ার রোডের মূল গেট অভিমুখে যেতে যেতে বাবলি জামানকে জানায়, 'আমাদের পাড়ার সোলেমান ভাই যে মারা গেছেন, সেটা কি আপনি জানেন?'

কিন্তু নিভৃতে দেখা হলে কোন কথাটা সে বলবে বাবলিকে? 'বাবলি! তোমাকে আমি ভালোবাসি!' এমন জলো কিছু? ধেৎ! এই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে এসব হালকা কথাবার্তা বলাটা কি আর মানাবে? তাহলে কীভাবে সে বাবলিকে বোঝাবে যে বাবলি ছাড়া এ জীবন আজকাল অচল বলে মনে হচ্ছে তার? আগে তো এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেনি কখনো? বাবলিকে সে কোন কথাগুলো বলবে বা কোনটা বলবে না, তা নিয়েই চালু থাকে তার চিন্তাভাবনার বেশি অংশটা। কিন্তু ভাবনাগুলো স্থির হয়ে দাঁড়ায় না কোথাও! মাঝখান দিয়ে এলোমেলো হয়ে যায় দিনের সব কাজ।

শুক্রবারে মধ্য পীরেরবাগের শিমুলতলা থেকে রমনা পার্কে পৌঁছে যায় জামান। তখন ঘড়িতে সময় সকাল সাড়ে আটটার মতো। পার্কের পুবদিকের গেটের কাছের একটা কংক্রিটের বেঞ্চে বসে থাকে সে। সে অনুমান করে নেয়, শান্তিবাগ থেকে বেইলি রোড ধরেই হেঁটে হেঁটে পার্কে আসবে বাবলি। হেয়ার রোডের এদিকটাতে এখন আর রিকশা চলে না। সকাল ন'টায় নয়, সাড়ে ন'টার দিকে বেইলি রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে পার্কে ঢোকে বাবলি; এদিক-ওদিক চেয়ে, জামানকে বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে সেদিকে সে এগিয়ে যায়। জামানের পাশে বসেই সে অভিযোগ জানাতে শুরু করে, বলি, আমি কি আপনার প্রেমিকা নাকি যে আপনি আমাকে একান্তে পার্কে ডাকবেন? এসব ফালতু কাজ আর কক্ষনো করবেন না!

মিনমিন করতে করতে জামান বলে, 'নাহ্! আর হবে না এসব। আসলে তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল!'

অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানায় বাবলি, 'এটা কেমন কথা জামান ভাই? আপনাকে আমি বলিনি যে আমি আমার জীবন নিয়ে সুখী? আমি কেন নিজের জামাই ফেলে রমনা পার্কে বসে বসে আপনার সঙ্গে বাদাম খাব, আইসক্রিম খাব? কেন এভাবে আমার মনের ভেতরে আপনার নিজের সম্মানের জায়গাটা নষ্ট করবেন? এটা ভালো লাগছে না আমার! আপনি তো জানেন না যে বুকের মাঝে আপনাকে কোথায় সংগোপনে রেখেছি আমি!'

এসব ভর্ৎসনা শুনতে শুনতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল জামান। সে ভাবল, বাবলি তো ভুল কিছু বলেনি। তার মনে হতে থাকে, এভাবে আসলে বাবলিকে একান্তে ডাকাটা উচিত হয়নি মোটেই! যুদ্ধংদেহী বাবলিকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন পারলে তার পিঠে চেলাকাঠ ভাঙবে এবার! জামানের মনে হয় এ ভুলের জন্য নিজের চুল সবগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পারলে ভালো হতো!

বাবলি জ্বলছে রাগে! কীভাবে তাকে ঠাণ্ডা করা যায়? এত ক্ষেপে গেলে তো বিপদ—কোনো কথাই বলা যাবে যাবে না তার সঙ্গে! কী কথা যেন বলার ছিল? গত তিন-চারদিনে যেসব কথা ভেবে রেখেছিল বলবে বাবলিকে, সেগুলোকে এখন ফালতু ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না! কাজেই চুপ করে বেঞ্চে বসে রইল জামান।

একটু বাদেই বাবলি তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিছু একটা বলবেন, বলেছিলেন সেদিন?'

মুখে কথা সরে না জামানের।

'আহা! বলে ফেলেন। বাসায় ফিরতে হবে আমাকে।'

তবুও কথাগুলো জমে বরফ হয়ে আছে কোথাও!

'প্লিজ! সময় নষ্ট করবেন না আমার!' গনগনে দৃষ্টিতে জামানের দিকে তাকিয়ে হুমকি দেয় বাবলি। জামান ভাবতে থাকে, বাবলি তো এমন খিটমিটে মেজাজের মানুষ ছিল না কখনো! একদা কী মিষ্টি করেই না সে জামানকে বলত, 'খুকুমণি আপার ফিরতে একটু দেরি হবে। বসেন না, চানাচুর-মুড়ি মাখাই। তাড়া কিসের?' তখন হয়তো নিউমার্কেটে কোনো কাজে গেছে খুকুমণি অথবা সে বেড়াতে গেছে কোনো বন্ধুর বাসায়। সেই নম্র মেয়েটা কোথায় হারিয়ে গেল? এসব ভাবতে ভাবতে চুপ করেই থাকে জামান।

'শোনেন মিস্টার, এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব আমি। এর ভেতরে যদি কোনো কথা না বলেন, তবে আমি সোজা উঠে চলে যাব এখান থেকে!'

এক...দুই...

তখনই অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে জামান, 'ঠিক আছে, বলছি, তোমার সঙ্গে আমি এভাবে সময় কাটাতে চাই।'

'না। সম্ভব নয়।'

'চলো, তবে কন্যাকুমারীকাতে বেড়াতে যাই। আর কিছু চাইব না। সত্যি!'

'আরেকটা বেকার কথা বললেন! ব্যাপারটা কি শুনি? আমি কেন আপনার সঙ্গে ভারতভ্রমণে যাব? আমার স্বামীর কী প্রতিক্রিয়া হবে তখন, ভেবেছেন সেটা?'

'আচ্ছা, তবে ওটাও বাদ। এবার তবে বলি, আমি তোমাকে চুমু খেতে চাই।'

'এর মতো ফালতু কথা ইহজীবনে কেউ আমাকে বলেনি!'

'আচ্ছা! মাত্র একটা। তারপর আর বিরক্ত করব না তোমাকে।'

এবার হেসেই ফেলে বাবলি। সে বলে, 'এ ছড়াটা মনে আছে আপনার, "আলনা কাঠের চালনা, শিমুল কাঠের খড়ি, ছেঁড়ারে তোর ফরফরানিতে মরি!" ছোটকালে আমরা এ ছড়াটা কাটতাম।'

'মনে আছে!'

খোঁচা খেয়ে আবারো চুপ করে যায় জামান। নাহ্! বাবলিকে তার একেবারেই অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন! কীভাবে এত রূঢ়তা এল বাবলির ভেতরে? এ প্রশ্নের কোনো কূলকিনারা মিলছে না আর! এর সঙ্গে তো কথাই চলে না।

বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বাবলি বলে, 'আমি আর আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না! তার চাইতে চলেন, পার্কে একটু হাঁটি। মেলা দিন পরে এলাম এদিকটাতে।' তারপর সে মাঠ ভেঙে রওনা দেয় দক্ষিণ দিক বরাবর। তার পিছু ধায় জামান। তারা দুজনে চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটতে থাকে; হাঁটতে হাঁটতে তারা পৌঁছে যায় ঝিলের ধারে। ওখানে গণপূর্ত বিভাগ সম্প্রতি কাঠের ব্রিজ বানিয়েছে একটা। সেই ব্রিজ ধরে তারা সমুখে হেঁটে যায়; ফিরেও আসে নীরবতার সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। হেয়ার রোডের মূল গেট অভিমুখে যেতে যেতে বাবলি জামানকে জানায়, 'আমাদের পাড়ার সোলেমান ভাই যে মারা গেছেন, সেটা কি আপনি জানেন?'

'জানি! প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সার হয়েছিল।'

'শিলাদের বাসা ভেঙে ছয়তলা বিল্ডিং উঠেছে, জানেন!'

'দেখেছি।'

এরপর আর কথা আগায় না। তারা দুজনে পার্ক থেকে বেরিয়ে বেইলি রোড ধরে পুবে এগিয়ে যায় অফিসার্স ক্লাবের দিকে। রাস্তা পার হয়ে শান্তিবাগ যাওয়ার জন্য ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সামনে থেকে রিকশা নেয় বাবলি। রিকশায় ওঠার আগে জামানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে সে বলে, 'ঠিক আছে! আপনি আমাকে চুমু খেতে পারবেন। তবে একটা শর্ত আছে—দাবা খেলায় আমাকে হারাতে হবে। রাজি?'

জামান ভাবে, এসব কী বলছে মেয়েটা? বিমূঢ় হয়ে বাবলির চোখে চেয়ে থাকে জামান। সত্য এই যে জামান কোনো কালেই দাবায় ভালো ছিল না, খুকুমণির সঙ্গে দাবা খেলতে বসে সে হেরেছে বেশুমার, বাবলির সঙ্গে জিতেছে বড়জোর দু-একবার, ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় একবার সূর্য সেন হলের দাবা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে সে লাড্ডু খেয়েছিল এত্তবড় একটা! এতসব ব্যর্থতার পরও কি বাবলির শর্ত মেনে নেয়া যায়? কিন্তু বাবলির শর্ত না মানলে তো বাবলিকে কখনই চুমু খাওয়া হবে না জামানের! মেজাজটা চড়ে যায় তার!

এমন একটা উভয় সংকটে পড়ে গিয়ে জামান যখন খাবি খাচ্ছে, তখন তাকে উদ্ধার করতে মাঠে নামে স্বয়ং বাবলি। বাবলি তাকে হাসতে হাসতেই বলে, 'শোনেন জামান ভাই! দাবা খেলায় বসতে আপনার যদি আগ্রহ থাকে তবে আমাকে জানিয়ে দিয়েন। এতে লজ্জার কিছু নেই। আমরা দুজনেই তো অ্যাডাল্ট! আর আপনি যদি না জানান তবে আমি বুঝে নেব, আপনি আপনার প্রস্তাব থেকে সরে গেছেন। সেটাই অবশ্য সবচেয়ে ভালো কাজ হবে। আমি এসব ফালতু কাজে নিজেকে জড়াতে চাই না! অবশ্য আপনি কী করবেন, না করবেন সে এখতিয়ার তো সম্পূর্ণ আপনারই!'

বেইলি রোডের পুব মাথার দিকে বাবলিকে নিয়ে এগিয়ে যায় রিকশাটা। অনেক কষ্টে বিধ্বস্ত নিজেকে বেবিট্যাক্সিতে তুলে পীরেরবাগের দিকে রওনা করতে পারে জামান।

পরের দিনগুলো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, কেননা জামান বুঝে যায়, বাবলি তাকে নির্মম একটা জুয়াখেলায় ঢুকিয়ে নিতে চাইছে! বাবলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হলে তাই তাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। সেই জুয়াখেলার

পরিণতি যে কোন ধ্বংসস্তূপের ভেতরে তাকে নিয়ে ফেলবে সেটা আর বোঝা যাচ্ছে না অবশ্য! এটুকুই কেবল পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে এই নির্মম খেলায় রক্তপাত ঘটবেই এবং সম্ভাবনার অংকের নিয়মে সেই রক্ত ঝরবে জামানের বুক থেকেই। হতবাক করা ব্যাপার এই যে দাবার ম্যাচে জামানের পরাজয়ই কাম্য হবে বাবলির। নইলে তো জামানকে চুমু খেতে দিতে হবেই, সেটা বাবলির ভালো লাগুক বা না লাগুক। হার আর জিতের এসব সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দিশে হারায় জামান। সে এটুকু বোঝে যে দাবার বোর্ডে তার অনুকূলে কিছুই থাকবে না। কিন্তু দিশে হারালে চলবে না, বাবলিকে তো জানাতে হবে নিজের ফয়সালাটা যে বাবলির বিরুদ্ধে সে দাবা খেলবেই, যা হয় হোক। তবু সে বাবলির সঙ্গে যোগাযোগ করার সাহস সঞ্চয় করতে ব্যর্থই হয়। পরিস্থিতি এমন যুদ্ধমুখর হয়ে উঠেছে যে ভয়েই আর বাবলিকে ফোন করা যাচ্ছে না, টেক্সট মেসেজ পাঠাতেও ভয় করছে খুব! সব মিলিয়ে অনতিক্রম্য একটা অস্বস্তি গেড়ে বসেছে জামানের বুকের ভেতরে!

সাত-আটদিন পর মেসেঞ্জারে বাবলিকে টেক্সট মেসেজ পাঠাতে পারে জামান। সে লেখে, তোমার শর্ত মেনে নিলাম। দাবা খেলব আমি।

'গুড! তাহলে কাল থেকেই দাবা খেলা শুরু হতে পারে। আমার শান্তিবাগের বাসার ঠিকানা দিচ্ছি। বিকাল-সন্ধ্যায় আমাদের বাসাতে চলে আসবেন তবে।' খুবই যান্ত্রিক একটা উত্তর দেয় বাবলি।

আচ্ছা! এ কথাই রইল।

মনে মনে তখন প্রমাদ গুনছে জামান, কেননা সে তো ভালো দাবা খেলতে জানে না, তার হার অনিবার্য! তার মনে হয়, একটা সুযোগ নেয়াই যেতে পারে, যদিবা কোনো ভুলভাল চাল দিয়ে বসে বাবলি! বলা তো যায় না। তবে এটা বলতেই হবে, বাবলি তাকে এমন বাজিতে না ঢোকালেই পারত! জামান তো তার দূরের কেউ নয়! জামান ভাবে, পৃথিবীর মানুষজনকে এত জটিল হতে হবে কেন!

৪. মুখোমুখি

মালিবাগ মোড় থেকে শান্তিবাগ মোড়ে ঢুকে একটু হাঁটতে হলো। হাতের বামে পয়লা গলিতে ঢুকে সহজেই পাওয়া গেল বাবলিদের বাসা। তখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। দোতলার বসার ঘরে জামানকে বসতে দেয়া হলো। একটু পরে এক সঙ্গে বসার ঘরে এসে ঢুকল বাবলি আর তার স্বামী আরাফাত। বাবলির স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো এই প্রথম (শালার বাচ্চার চেহারা তো কিম্ভূতকিমাকার—একটু হাসলেই বেরিয়ে পড়ছে উঁচু দাঁতগুলো, মুখের গঠন চওড়া, ঠেলে বের হয়েছে গণ্ড; সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, বিবর্তনের ক'টা ধাপ এখনো পার হতে পারেনি সে! আচ্ছা! এ জগতের সব সুন্দর মেয়ের কেন বেমক্কা চেহারার পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হতে হবে?)। কুশলাদি বিনিময়ের পরে আরাফাতকে বাবলি জানায়, জামান তার সঙ্গে দাবা খেলতে এসেছে। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিত হয়ে আরাফাত বাবলিকে জিজ্ঞাসা করে, 'গ্যারি কাসপারভ ১৯৯৫ সালে যেভাবে বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়েছিলেন, সে চালগুলো কি উনি জানেন? তাহলে তোমাদের গেমটা বসে দেখতাম।'

'জামান ভাই আসলে অতটা অ্যাডভান্সড কোনো খেলোয়াড় নন। কাজেই তুমি দোকানে যেতে পারো।' হাসতে হাসতে কথাটা খুবই স্বাভাবিকভাবেই বলে বাবলি।

'তাহলে ভাই, আমি উঠি। মৌচাক মার্কেটে আমার একটা দোকান আছে, বুঝলেন? সন্ধ্যাবেলায়, সেখানে আমাকে বসতে হয়। পরে দেখা হবে। আর বাবলি শোনো, উনাকে আজ সিসিলিয়ান ডিফেন্সের কায়দা শিখিয়ে দিয়ো।'

এই বলে দোতলা থেকে দ্রুত পায়ে নেমে যায় আরাফাত। ভেতর থেকে দাবার বোর্ড আর গুটি নিয়ে আসে বাবলি। বসার ঘরের নিচু টেবিলটায় দাবার বোর্ডটা বসাতে বসাতে জামানকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'বোর্ডে গুটিগুলো কীভাবে সাজাতে হয়, তা কি মনে আছে আপনার?'

'তুমিই সাজাও ভাই! ভুলে গেছি অনেক কিছুই। গুটিগুলো কীভাবে আগাবে, সেটাই কেবল মনে আছে আমার।' সত্য কথাটাই বলে জামান।

মাঝারি একটা ম্যাগনেটিক বোর্ডে সাদা আর কালো গুটি বসাতে থাকে বাবলি। সেই ফাঁকে তাকে জামান জিজ্ঞাসা করে, 'বিশ্বনাথন আনন্দ আর গ্যারি কাসপ্যারভের ম্যাচটা কি তুমি পারো?'

'হ্যাঁ! পারি। কুড়ি গেমের ম্যাচে কাসপ্যারভ জিতে যান। আমার স্বামীর সঙ্গে সেটা প্র্যাকটিস করেছিলাম একবার।'

'তুমি কি ন্যাশনাল মাস্টার নাকি?' আতঙ্কের ভেতরে পড়ে গিয়ে প্রশ্ন করে জামান। গ্যারি কাসপ্যারভের চাল যে জানে তার সঙ্গে দাবা খেলতে বসা তো আত্মহত্যারই নামান্তর!

'আরে না! আমি একজন টিম মাস্টার মাত্র। টিম মাস্টার অনেক নিচের দিকের ধাপ ভাই! আমার রেটিং এখন ১৭০০-এর কাছাকাছি। এর পরের ধাপ হলো গিয়ে ক্লাব মাস্টার।' মৃদু হেসে উত্তর দেয় বাবলি।

রেটিংয়ের কথা শুনে আরো ঘাবড়ে যায় জামান! সে বলে, 'এসব কথা তো সেদিন বলোনি তুমি? কী ভয়ংকর কথা এটা?' জামান আরো বলে, তাহলে আর খামোখা যুদ্ধ করে ফায়দা কী? সে তো দাবার এ-বি-সি-ডিও ঠিকঠাকমতো জানে না! কাজেই বাবলির বিরুদ্ধে জিততে পারার কোনো কারণ দেখছে না সে!

মুচকি হেসে বাবলি তাকে আশ্বস্ত করে, সে কোনো জটিল চাল দেবে না। একজন বিগিনার হিসেবে জামান নিঃসংকোচে খেলতে পারে। আর এও তো ঠিক, যুদ্ধে না নামলে জামান কীভাবে বুঝবে যে সে জিতবে কি জিতবে না? কম রেটিংয়ের দাবাড়ুদের হাতে পাকা খেলোয়াড়দের পরাজয়ের মেলা রেকর্ড আছে। সেসব সম্ভাবনাও তো জামানকে হিসাবের ভেতরে ধরতে হবে!

সেটা ঠিক বটে! বাবলিকে তখন জামান জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বাবলি! তুমি এমন প্রফেশনাল দাবা খেলা শিখলে কী করে?'

'আমার স্বামী শিখিয়েছিল।'

'এবার বুঝলাম, তুমি কেন দাবাতে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছ! তুমি হিসাব কষে দেখেছ যে আমার মতো একজন ব-কলম তোমাকে হারাতে পারবে না কখনই। তাই না?' গম্ভীর কণ্ঠে বাবলিকে প্রশ্ন করে জামান।

বাবলি যুক্তি দেয়, জামানের কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। দাবা কৌশলের খেলা বটে, আবার অনেক সময় এখানে হিসাবের বাইরেও অনেক ঘটনা ঘটে যায়। ১৯৯২ সালে ম্যানিলাতে কী ঘটেছিল জানেন? অলিম্পিয়াড উদ্বোধন করতে গিয়ে রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি ক্যাসপারভের বিরুদ্ধে এমনি এমনি খেলতে বসলেন মিসেস কোরাজন অ্যাকুইনো। কোরাজন অ্যাকুইনো তো আর পেশাদার কোনো দাবাড়ু ছিলেন না! তো যেটা হলো তিনি গ্যারি ক্যাসপারভকে খুবই অদ্ভুত একটা চাল দিয়ে বসলেন। তাতে করে কিস্তিমাত হয়ে গেল। মজার ব্যাপার হলো কোরাজন অ্যাকুইনো কিন্তু না বুঝেই গুটি চেলেছিলেন। তাই বাবলি বলছে, এমন অভাবিত ঘটনাও ঘটতে পারে দাবার জগতে। আবার কত ম্যাচ ড্র হয়, নানান কারণে পরিত্যক্তও হয় হরহামেশাই! হতোদ্যম না হয়ে এসব আকস্মিক পরিণতির কথাও তো ভাবতে হবে জামানকে!

জামানকে বাবলি বলে, অনেক সময় এমনও হয়, পারব না, পারব না কিছুতেই, কিন্তু ধৈর্য নিদান দেয় তখন। ঠাণ্ডা মাথায় দাবার বোর্ডে বসে থাকাটাই তখন বড় কথা হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার ববি ফিশার একবার স্রেফ চাল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে রোমানিয়ার ফ্লোরিন গিওরগিউয়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন! ফ্লোরিন ড্রয়ের প্রস্তাব দিলেও ববি ফিশার তা গ্রহণ করেননি। তিনি নিজের পরাজয়ের ঘোষণাই দিয়েছিলেন। দাবা খেলতে বসে এমন কত অভূতপূর্ব ঘটনাই না ঘটে যায়! তাহলে বিগিনার হিসাবে জামানই বা কোনো গেম শুরুর আগেই হতোদ্যম হয়ে পড়বে কেন?

জামান যা চাইছে বাবলির কাছ থেকে সেটা পেতে হলে জিতে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই আগুনে তাকে ঝাঁপ দিতেই হবে। কাজেই আবারো ভয় ধরে যায় জামানের। বাবলিকে সে বলে, সে আর দাবা খেলায় আগ্রহী নয়। বাবলি যে এত বড় মাপের দাবাড়ু তা জানলে যে কখনই বাবলির প্রস্তাবে রাজি হতো না!

আবারো জামানকে ভরসা দেয় বাবলি, সে জটিল কোনো চালই দেবে না! ভয়ের কিচ্ছু নেই এতে।

আর কথা বাড়ায় না জামান। হাতি খেদাতে পড়লে চিৎকার করেও কি লাভ হবে কোনো?

বাবলি বলে, জামানের সঙ্গে সে তিন রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে। তিনটা গেমের ভেতরে যে দুটো গেম জিতবে, ম্যাচে জয় হবে তারই। জামান চাইলে তিন দিন ধরে চলতে পারে ম্যাচটা। বাবলির দিক থেকে কোনো

তাড়া নেই। একটু ভেবে জামান উত্তর দেয়, 'শুরু তো করা যাক।'

'এবার বলেন, কোন গুটি কীভাবে চলবে, তা মনে আছে আপনার?'

'তা আছে! গুলিয়ে ফেললে তুমি একটু দেখিয়ে দিয়ো।'

'ওকে।'

এক টাকার একটা কয়েন টস করল বাবলি। সাদা গুটি পেল সে। নিয়মমাফিক কালো গুটি পড়ল জামানের ভাগে। যেহেতু সাদা গুটির দল নিয়েছে বাবলি, কাজেই প্রথম চালটা সে-ই দিল—রাজার সামনের বোড়েটাকে সে সরাল সোজাসুজি চতুর্থ ঘরে। দাবার ভাষায় এ ঘরটাকে বলে ই-চার। তার রাজার সামনের কালো বোড়েটা নিয়ে এসে সাদা বোড়েটার মুখোমুখি বসাল জামান। জামানের মনে পড়েছে যে প্রথম চালে বোড়ে এগোবে দু ঘর করে। তারপরে বাবলি তার সাদা রাজার ডান দিকের হাতিটাকে কোনাকুনিভাবে নিয়ে গেল বামের হাতির সামনের চার নম্বর ঘরে। জামানকে সে বলল, আন্তর্জাতিক আইনকানুন অনুসারে তিন থেকে প্রায় চার মিনিটের ভেতরে একেকটা চাল দিতে হয়। জামান যেন পাঁচ মিনিটের বেশি সময় না নেয়! ঘরোয়া খেলায়ও বেশি সময় না নেয়াটাই দুপক্ষের জন্যই ভালো।

বোর্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে এদিকে জামান কেবল নিজেকে সাবধান করছে—তার নিজের বোকামির ফলে যেন কোনো গুটি খাওয়া না যায়! তাহলে অরক্ষিত হয়ে পড়বে তার রাজা। তাই ভেবেচিন্তে জামান এবার তার কালো মন্ত্রীর ডানে এক ঘর পরে বসে থাকা ঘোড়াটাকে আড়াই চালে সামনে বাড়িয়ে দিল। প্রত্যুত্তরে বাবলি তার সাদা মন্ত্রীকে কোনাকুনিভাবে নিয়ে গেল সর্বডানের নৌকার সামনের পাঁচ নম্বর ঘরে।

এবার ভাবতে বসল জামান। বাবলির চালগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না সে! কোন দিক দিয়ে তার রাজাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে বাবলি? বাবলির মতো একজন পেশাদার দাবাড়ু কি মতলব ছাড়া কোনো চাল দেবে? আবার তাই বোর্ডের চারদিকে নজর দিতে বসে জামান। বাবলির সাদা মন্ত্রী ওখানে দাঁড়িয়ে কী পাঁয়তারা কষছে? মন্ত্রীকে নিয়ে ভাবতেই হয়, কেননা সে ডানে-বাঁয়ে যেকোনো সংখ্যার ঘর অতিক্রম করে যেতে পারবে; আবার হাতির মতো কোনাকুনিও চলবে যেকোনো ঘরে। এতই ক্ষমতাধর এই মন্ত্রী! কাজেই জামান তার অরক্ষিত রাজার সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তার রাজার বাম দিকের যে ঘোড়াটা রয়েছে তাকে আড়াই চালে নিয়ে আসে বামের হাতির সামনের দ্বিতীয় ঘরে। জামান বুঝে নেয়, এবার আর কালো ঘোড়াকে না খেয়ে বাবলির সাদা মন্ত্রী কোনাকুনিভাবে বা সোজাসুজিভাবে জামানের রাজাকে কিস্তি দিতে পারবে না। হাহ্! এবার তুই কী করবি বাবলি? আমার কালো রাজাকে পাহারা দিচ্ছে আমার একটা ঘোড়া!

জামান এ চালটা দিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে তাকায় বাবলির দিকে। বাবলির চোখে চকচক করতে থাকে কৌতুকের হাসি। বোর্ডের দিকে তাকায় বাবলি; কী যেন ভাবে। তারপর সে তার ডান হাতের তর্জনী রাখে বোর্ডের সর্বডানের কলামের মাঝামাঝি দিকে বসিয়ে রাখা সাদা

মন্ত্রীটার ওপরে। তারপর জামানের বাম দিকের কালো হাতিটার ঠিক সামনের ঘরে সে তার মন্ত্রীকে নিয়ে যায়। কাটা পড়ে জামানের রাজার বাম দিকের হাতির সামনের কালো বোড়েটা। বাবলি বলে ওঠে—চেক!

জামান আশ্চর্য হয়ে দেখে, তার রাজার কোনাকুনি দাঁড়িয়ে আছে বাবলির সাদা মন্ত্রী! এর মানে হলো এই যে কালো রাজা তার ঘরে বসে থাকলে আর বাঁচবে না। ঘর থেকে বের হয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কালো রাজার বেলাতে খোলা রয়েছে কেবল একটা মাত্র পথ। এখন যদি জামান তার কালো রাজাকে ঠিক সামনে একঘর মাত্রায় সরিয়ে নিয়ে যায়, তবে তা পড়বে গিয়ে বাবলির সাদা মন্ত্রীর ঠিক পাশে। সাদা মন্ত্রী তখন কেটে দিতে ছাড়বে না।

মুচকি হেসে বাবলি জামানকে বলে, 'জামান ভাই! এখন আর লাফালাফি করে আপনার কোনো লাভ হবে না। আপনার পথ আটকে গেছে। এটাই হলো গিয়ে চেকমেট সিচুয়েশন। রিজাইন করা ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই। বুঝতে পারছেন এবার?'

তো প্রথম গেমে এভাবে বাবলির কাছে হেরে যায় জামান।

বাবলির চালে হেরে গিয়ে আরো গম্ভীর হয়ে পড়ে জামান। তার মনে হতে থাকে, অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলা শেখার পিছে সময় দিয়ে তার কোনো লাভই হলো না! এর চেয়ে দাবা খেলার আরো গভীরে ঢুকতে পারলে ভালো হতো! সেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পর থেকে সে আর দাবার বোর্ড ছুঁয়েও দেখেনি। কাজটা যে ঠিক হয়নি তা বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছে এখন! আসলে তার বয়স চল্লিশ পার হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, অদ্যাবধি জীবন নিয়ে সে যা যা করেছে, ভুলে পর্যবসিত হয়েছে তার সবই। বাবলিকে মুগ্ধতার কথা বলে আবারো ভুল করল সে! নিজের পরাজয়ে তাই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তার।

এ মুহূর্তে জামান আর বুঝতে পারছে না যে এখন সে বাবলির বিরুদ্ধে আরো একটা রাউন্ড খেলবে কিনা! এমন হতে পারে যে রেস্ট অব থ্রি-র রুলে বাবলির হাতে তার পরাজয় ঘটে গেল আজই! বাবলি তখন তাকে আর চুমু খেতে দেবে না! তবু সে ভাবে, ঝুঁকি না নিলে এ যুদ্ধে তার জিতে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই! সে সম্ভাবনাটা শূন্যের কাছাকাছি হলেও বাজি ধরতে চায় জামান। বাবলিকে সে প্রস্তাব দেয়—আরেক রাউন্ড হয়ে যাক!

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বাবলি। বাবলি জামানকে জিজ্ঞাসা করে, 'হেরে গিয়ে জেদ উঠেছে আপনার। তাই না?'

সে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করে না গম্ভীর হয়ে বসে থাকা জামান।

বাবলি তাকে বোঝায়, রাগের মাথায় খেললে দ্বিতীয় বারেও জামানের পরাজয় অবধারিত! এই ভালো যে জামান যেন আগে নিজের মাথা ঠাণ্ডা করে নেয় আগে, তারপরে ফের খেলতে বসে। এ বাদে বলতেই হয়, প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য চালগুলো মাথায় না নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে এগোনো ঠিক নয়! এই যেমন প্রথম রাউন্ডে মাত্র চার দানে কিস্তি খেয়েছে জামান। বাবলি মনে করে, এর কারণ একটাই—তেমন একটা আগুপিছু চিন্তা করেনি জামান, আর তাই কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই কিস্তিমাত হয়ে গেছে তার। এমন বোকার মতো খেললে তো ম্যাচে জেতা যাবে না কখনই! বাবলি আরো বোঝায়, প্রথম রাউন্ডের খেলায় বিভিন্ন গুটি সামনে সাজিয়ে কালো রাজাকে সুরক্ষা দেয়ার দরকার ছিল জামানের। সে কাজটা কীভাবে করা যাবে, জামান সেটা ধরতেই পারেনি। তাই চাল দেয়ার আগেই ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখা উচিত প্রতিপক্ষের উপর্যুপরি আক্রমণ কোন কোন দিক থেকে আসতে পারে! বোকার মতো চাল দিলে তো আর চলবে না!

জামান বুঝতে পারে, ঠিকই বলেছে বাবলি, তাড়াহুড়া করলেই বিপদ! জিততে হলে বোর্ডে মনোযোগ লাগাতে হবে। সেটা যে কীভাবে করা যাবে সে সম্পর্কে জামানকে বাবলি পরামর্শ দেয় দুটো : প্রথমত, আগামী কিছুদিন জামান মেডিটেশন করে দেখতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, তার উচিত হবে দাবার কৌশল নিয়ে কিছু বইপত্তর পড়ে ফেলা। ইন্টারনেটে দাবাবিষয়ক মেলা ওয়েবসাইটের এন্ট্রি খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে ইন্টার‍্যাকটিভ মুভগুলোর ছবি দেয়া থাকে। এছাড়া বাজার থেকে বইও কেনা যায়। তবে সাবধানতা এই যে বাজারে যে ক'টা বাংলা বই মিলবে সেগুলো প্রিন্টিং মিসটেকে ভরা। বাবলি বলে, ইন্টারনেট সাইটগুলোয় ঘুরতে পারলেই শিক্ষানবিশদের জন্য সবচেয়ে ভালো হয়।

আচ্ছা! ঠিক আছে। তবে বাবলি কিছু টিপস দিলে তো মন্দ হয় না!

বাবলি তাকে বোঝায়, মনে রাখতে হবে খামোখা বোড়ে সামনে ঠেলা যাবে না। বোড়ে কিন্তু রাজার প্রতিরক্ষায়ই কাজে লাগে বেশি। তাই যেটা করতে হবে—ক্ষমতাধর গুটিগুলো, যেমন মন্ত্রী, নৌকা আর হাতিকে সঙ্গে নিয়ে জামানকে সমুখে এগিয়ে যেতে হবে মাঝবোর্ড বরাবর। আর এও ঠিক, ব্যাকআপ ছাড়া কোনো গুটি চালা যাবে না কোনো অবস্থায়ই। আপাতত এটুকুই বলে থামে বাবলি।

প্রশ্ন তোলে জামান, আমাকে এতকিছু ভাবতে হবে এই এক দাবায় জেতার জন্য?

হ্যাঁ স্যার! আর যেটা আপনাকে করতে হবে, বোর্ডে সামনাসামনি আর কোনাকুনিভাবে ফাঁকা জায়গা তৈরি করে রাখতে হবে যাতে কোনো বাধা ছাড়াই সামনে এগিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা যায়। সোজা ফাইলে খেলবে নৌকা, আর কোনাকুনিভাবে আক্রমণ করবে হাতি—এটা নিশ্চয় জামান আর ভোলেনি!

তা কীভাবে ফাইল আর কোনা খোলা যাবে, তা আর মনে পড়ছে না!

সে ক্ষেত্রে বোর্ডে বোড়ের পজিশন অদলবদল করতে হবে। দরকার পড়লে দু-একটা বোড়ে বলি দেয়াটাও ভালো কৌশল। এভাবে ফাইল আর ডায়াগোনাল উন্মুক্ত করে ফেলতে হবে পয়লা দিকেই। মাঝবোর্ডে খেলার শুরুর আগেই এ কাজটা করলে পরে উপকার পাওয়া যায়।

এতসব তথ্য একবারে হামলা করেছে বলে মাথার ভেতরটায় জট পাকিয়ে যায় জামানের। একটু খোলা হাওয়ায় হাঁটবে বলে সে বাবলিকে বলে, 'আজ তবে উঠি! কাল সাঁঝবেলায় আসব।'

এমন প্রস্তাব শুনে আবারো সকৌতুকে হেসে ওঠে বাবলি। সে হাসতে হাসতে বলে, 'তাহলে দাবার মুভগুলো নিয়ে পড়বেন কখন আর ভাববেনই বা কখন? আপনি এক কাজ করেন—তিন-চারদিন সময় নেন বরং। ব্যাপারগুলো বুঝতে আলবত সময় লাগবে আপনার। নইলে তো আবারো আমার কাছে হেরে যাবেন আপনি! আমার কাছে হারলে তো আপনার লস!' এই বলে আরো জোরে হাসতে থাকে বাবলি।

'আচ্ছা! তোমাকে জানাব।' এই বলে সেদিনের মতো বাবলির শান্তিবাগের বাসার সোফা থেকে উঠে পড়ে জামান। তার মেজাজ চড়ে গেছে বাবলির ওপরে—এত হাসির কী হলো, শুনি? তুমি যে কায়দা করেছ তাতে জীবন চলে গেলেও তোমার হাতের আঙুলগুলোও ধরা হবে না! এমনই নির্মম মানুষ তুমি!

শান্তিবাগ মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে পণ করে জামান, দাবা খেলাটা ভালোমতো শিখতে হবে এবার! পুঁচকে একটা মেয়ের কাছে হেরে যাওয়াটা সে মেনে নিতেই পারছে না! তবে এটা সে বুঝতে পারে, এত কম সময়ে দাবা খেলা মকশো করাটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। এদিকে এও ঠিক যে বাবলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হলে এ কঠিন কাজটায় ঢোকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এসব শর্তটর্ত তুলে নিলেই কি ভালো করত না বাবলি? জ্ঞানত সে তো কোনো ক্ষতি করেনি বাবলির!

৫. আলো ক্রমে নিভছে

সেদিন বাবলিদের শান্তিবাগের বাসা থেকে বের হয়ে জামান নিউমার্কেটে গিয়ে দাবা খেলার একটা সস্তা ম্যাগনেটিক বোর্ড কিনল। দাবার বোর্ড হাতে নিয়ে বাসায় ঢুকতেই মুচকি হেসে বলল তার স্ত্রী পম্পা, 'গাছে কলম দেয়ার নেশাটা তবে এবার শেষ হয়ে গেল?'

'আবার চালু হবে সেটা। আপাতত একটু দাবায় হাত পাকিয়ে নিই। ভুলে গেছি নিয়মকানুন। তোমার মনে আছে কিছু?' পম্পার চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল জামান।

নাহ! পম্পা অংকে খুবই কাঁচা। স্ট্র্যাটেজিক গেম তার ধাতে নেই। জামান বরং তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দাবা খেলার অনুশীলন করতে পারে বলে মন্তব্য করল পম্পা।

তা ঠিক! একা একা খেললে তো আর দাবা শেখা যাবে না, তার জন্য চাই মিথস্ক্রিয়া। এটুকুর পর জামান পম্পাকে জানাল যে তার সঙ্গে বাবলির দেখা হয়েছে সম্প্রতি। তখন প্রশ্ন ওঠে, এই বাবলিটা আবার কে? জামান বলে, অনেক আগে বাবলির ছোটকালের একটা ছবি পম্পাকে দেখিয়েছিল সে—ছবিতে জামানদের বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে খুকুমণি, জামান আর ছোট একটা মেয়ে। সেই ছোট মেয়েটাই বাবলি। বাবলি হলো গিয়ে তাদের পাড়ার মেয়ে—তার জিগরি দোস্ত খুকুমণির ছোট বোন! পম্পা হয়তো তা ভুলে গেছে! মোদ্দা কথা হলো, দুর্দান্ত দাবাড়ু এই বাবলি। সে এখন টিম মাস্টার, মানে নিচের দিকের

পেশাদার একজন দাবাড়ু সে। জামান মনে করে, ফিদে মাস্টার হতে বাবলির আর দেরি নেই। বাবলি তাকে দাবার কৌশলগুলো শেখাতে রাজি হয়েছে। ক্ষান্তি দিয়ে পম্পা তাকে এমনটা বলল তখন, 'তুমি বাপু থাকো তোমার দাবা নিয়ে। আমি অংকে কাঁচা!'

বাবলি ঠিকই বলেছিল, দাবার কৌশল শেখার জন্য ইন্টারনেটে অজস্র পেজ আছে। শিক্ষানবিশদের জন্য বিভিন্ন টিপসের পাশাপাশি সেখানে রয়েছে অনেকগুলো গেমের নমুনা, ইন্টার‍্যাকটিভ গেমও রয়েছে অনেক। জামান যেটা করে, বোর্ডে গুটি সাজিয়ে নমুনা গেম ধরে ধরে নিজের সঙ্গে নিজে খেলতে শুরু করে দেয়। সহজ-সরল নমুনা গেমগুলোর ধারা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না তার। তবে সে ঝামেলায় পড়ে যায় প্রাগ্রসর পর্যায়ের খেলাগুলোর নমুনা নিয়ে। সেগুলো বুঝতে মেলা সময় লেগে যায় তার। সে দেখতে পায়, ইন্টারনেটে এসব ক্ল্যাসিক গেমের উদাহরণ বেশি জনপ্রিয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় গ্র্যান্ডমাস্টার, আন্তর্জাতিক মাস্টার আর ফিদে মাস্টাররা পরস্পরের বিরুদ্ধে চৌদ্দ গেমের ম্যাচ খেলছে, তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলছে একেকটা ম্যাচ। এই যেমন, রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার আনাতোলি কারপভ যুদ্ধে নেমেছে স্বদেশী গ্র্যান্ডমাস্টার ভিক্তর করচনয়ের বিরুদ্ধে; রাশিয়ার আনাতোলি কারপভ আর তার স্বদেশী গ্যারি কাসপ্যারভ খেলছে চ্যাম্পিয়নশিপ টাইটাল জেতার জন্য; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যান্ডমাস্টার ববি ফিশার রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার বোরিস স্পাস্কিকে ধসিয়ে দিতে চেষ্টা করছে, রাশিয়ার আরেক গ্র্যান্ডমাস্টার বরিসোভিচ সসোনকোর বিরুদ্ধে নেমেছে বাংলাদেশের গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ; এদিকে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার রানী হামিদ এক ইঞ্চি ছাড় দিচ্ছে না ডাচ গ্র্যান্ডমাস্টার ভ্যান ডার উইলকে। জামান লক্ষ করে দেখে, এমন সব বিশ্বখ্যাত দাবাড়ুদের প্রতি গেমের দুপক্ষের মোট চালের গড় সংখ্যা হবে চল্লিশ মতো। সাংকেতিক চিহ্ন অনুসরণ করে এ চালগুলোকে দাবার বোর্ডে ফেলে বুঝতে যাওয়াটা কঠিনই মনে হয় জামানের কাছে। তবু সে ভাবে, দাবা খেলার চালগুলোর ভেতরে যে যুদ্ধের দামামা রয়েছে, সেটা সবার আগে নিজের মাঝে জাগিয়ে তোলা দরকার। নিশ্চয় তাহলে প্রসারিত হবে তার নিজের অন্তর্দৃষ্টি! বাবলি তাকে এমনটাই বলেছিল।

এভাবেই দাবা খেলার বিষয়-আশয় আবিষ্কারের নেশায় ইন্টারনেটে পড়ে থাকে জামান। প্রতিদিন অফিস থেকে বাসায় ফেরার পর শুরু হয়ে যায় দাবা নিয়ে জামানের পড়াশোনা আর নানান অনুশীলন। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢুকে সে পাজলের সমাধান করে চলে; যেমন এবার কালো দলের চাল—দুটো কালো বোড়ে পাশাপাশি এসে মাঝবোর্ডে অবস্থান নিয়েছে। ডাবল চেক না হয়ে যায় এবার! সাদা দলের গুটিগুলো কী করবে এখন? কিংবা সাদা ঘোড়া আর হাতি একসঙ্গে আক্রমণ করে বসেছে কালো রাজাকে। কিস্তি এড়ানোর জন্য কালো রাজা তবে কোন ঘরে সরে যাবে এখন? এছাড়া সে দাবার বোর্ডটাতে সাদা আর কালো গুটিগুলো বসিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে খেলতেও নেমে যায়। এভাবে দাবায় ডুবে থাকার কারণে তার আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া পড়ে না। বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ফোন করে খুঁজলে সে একই কথা বলতে থাকে বারবার—এ মাসটা বেজায় ব্যস্ত থাকব দোস্ত! তারপরে দেখা হচ্ছে, কেমন? বন্ধুদের ওজর-আপত্তি আটকাতে হচ্ছে, কেননা দাবায় মনোযোগ না দিলে চলছে না আর। বাবলির বিরুদ্ধে এর পরের গেমে তাকে জিততেই হবে! আর যদি সে একান্তই জিততে নাই পারে, তবে যেন চার-পাঁচ চালে তার কিস্তিমাত না হয়ে যায়! ক'টা গেমে সম্মানজনক পরাজয়ই বা কম কী? জান চলে গেলে, গেল; চোখটা তো বাঁচল অন্তত! এই ভেবে নিজের মনে হাসে জামান। বাবলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য কত কিছুই না করতে হচ্ছে তাকে! এটা মানতেই হবে, জামানকে ভীষণ রূঢ় একটা পরিস্থিতিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে এই বাবলি। বাবলি এতটা কঠোর না হলেই পারত! জামান তো বাবলিকে চুমু খেতে চেয়েছে মাত্র! এর বেশি তো সে কিছুই দাবি করেনি; ধাপ্পা মেরে, গুলতাপ্পি ছেড়ে সে বাবলির সঙ্গে আড়ালে-আবডালে ঘনিষ্ঠ হতেও চায়নি! তাহলে বাবলি কেন এর ভেতরে শর্তটর্ত নিয়ে এল? এটা কেমন কথা যে জামান যদি দাবার গেমে না জেতে তবে বাবলি তাকে চুমু খেতেই দেবে না! না বলা সম্পর্কেরও কি কোনো দায় থাকে না?

জামান ভাবে, এই চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা এত অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে কেন বাবলির চোখে? এ কথা কেন বাবলি ভাবছে না, চুমুর ঘটনা তো তাদের কৈশোরে বা তারুণ্যেই ঘটার কথা ছিল। তারা তখন পরস্পরের কাছে নিজের হৃদয় প্রকাশ করতে পারেনি জন্যই তো বিপত্তিটা ঘটেছে আজকে। বাবলি কেন বুঝতে পারছে না যে 'সম্পর্ক হতে পারত' এমন মানুষের জন্যও দায় থাকে আমাদের! অতীতের মুগ্ধতার পাত্রও তো আসলে দূরের কেউ নয়! মুগ্ধতা থাকার পরও দুজন মানুষের ভেতরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি নাই হতে পারে! তার পেছনে কাজ করতে পারে নানান বাস্তব পরিস্থিতি—এই যেমন, জামানের বন্ধু খুকুমণিকে দুঃখ দেবে না বলেই সে খুকুমণির ছোট বোন বাবলির কাছে তারা ভালো লাগা মেলে ধরেনি; শারীরিক উষ্ণতাও বিনিময় করতে যায়নি কখনই! সব সময় জামানের মনে হয়েছে, খুকুমণি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলে মহা কেলেঙ্কারি বেঁধে যাবে। দুই যুগ মতো পরে আজ জামান মানছে, এ না বলাটা নিশ্চয় তার ভুল ছিল। আবার এও তো ঠিক যে সামাজিক চাপ নেবে না জন্য বাবলি তার ভালো লাগাকে পত্তনি দিতে পারেনি, যেমনটা বাবলি তাকে জানিয়েছে। এসব কাপুরুষতার কারণে এখন তাদের দুষতেই পারে মানুষজন। কিন্তু তাই বলে তারা পরস্পরের প্রতি রূঢ় হতে যাবে কেন? এ ব্যাপারটা ঠিক করছে না বাবলি!

কিন্তু বাবলিকে তো এতসব কিছু ভেঙে বলা যাচ্ছে না। সেটা কেন বলা যাচ্ছে না, তারও কারণ রয়েছে বটে: তারা দুজনেই অনেকদিন ধরে নিজেদের মুগ্ধতাকে ছাঁটতে ছাঁটতে বনসাই বানিয়ে ফেলেছে! তো বনসাই কি আর মনের আনন্দে ডালপালা মেলে দিয়ে আকাশ ছুঁতে পারবে নাকি? তা হয় না কখনই! এ সীমাবদ্ধতা জেনেও জামান খর্বাকার একটা পাকুড়গাছকে বলতে লেগেছে—চল, পৃথিবীর আলো-বাতাস ছাড়িয়ে চলে যাই, কেবল একবারের জন্য হলেও; তারপর না হয় আবার বন্দি হব যার যার সুরম্য টবের সীমানায়। দুঃখের ব্যাপার এই যে এখন বিশুদ্ধতার প্রতীক হয়ে তার সামনে বাবলি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

জামান ভাবে: আচ্ছা বাবলি! নিজের বুকে হাত দিয়ে বল তো, তুমি কখনো নৈতিকতাকে গারবেজ বিনে ফেলে দাওনি? নিজের ভেতরে তুমি কি সে অহংকার করতে পারবে? বুকে হাত দিয়ে বলো! জীবন চালানোর জন্য, নিজের সুবিধার দিকটা বুঝে নেয়ার জন্য আমরা সবাই হরহামেশা মিথ্যা বলছি, অবলম্বন করছি অনৈতিকতাকে। তুমি যদি তা না করে থাকো তাহলে তোমার এই দৃঢ়তাকে ক্ষমা করে দিতে রাজি আছি আমি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো বিশুদ্ধ নৈতিকতার স্তাবনা করতে পারিনি কখনো, কোনো সম্পর্কের বেলায় নয়, কার্যক্ষেত্রেও না!

এসব অনুযোগ-অভিযোগের কথা বাবলিকে আর বলা হয় না। প্রথম রাউন্ড দাবার পরাজয়ের পর বাবলিকে আর ফোন করেনি বা টেক্সট মেসেজ পাঠায়নি জামান। নির্মম বাবলিকে তার শত্রু বলেই মনে হচ্ছে আজকাল। তো তার সঙ্গে বেশি দহরম-মহরমের প্রশ্নই ওঠে না। তার সঙ্গে জামানের কাজ বলতে একটা ব্যাপারই অবশিষ্ট রয়ে গেছে—দ্বিতীয় রাউন্ড দাবা খেলার একটা তারিখ নেয়াটা। যত জলদি তারিখ পড়ে ততই ভালো। বাবলি তাকে চুমু খেতে দেবে কি দেবে না এ ব্যাপারটার একটা এসপার-ওসপার হয়ে যেতে যেন খুব বেশি সময় না লাগে। ফালতু ফালতু সে বাবলির সঙ্গে ঝুলবে নাকি?

জামানের এও মনে হচ্ছে, আসলে এই বাবলি দুই যুগ আগেকার সেই সরল মনের বাবলি নয়। সেই তরুণী হারিয়ে গেছে কোথাও! এমন নির্দয়-নিষ্ঠুর মানুষের পিছে সময় দেয়া যেতেই পারে, কিন্তু তাতে বড় কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। তো আমরা কি কোনো মানুষের প্রতীক্ষায় জেগে বসে থাকি না, সময় নষ্ট করি না? নিশ্চয় করি। কিন্তু জামানের চল্লিশোত্তীর্ণ বয়সের গুরুত্বপূর্ণ একটা শিক্ষা এই যে সদাহাস্যময়, সদাবিনয়ী মানুষেরও দ্বিতীয় রূপ থাকতে পারে, যাকে বলে নিষ্ঠুরতা। ঘোড়ার পিছে যদি না দাঁড়ানোর নীতিবচন থাকে, তবে নিষ্ঠুর মানুষের পাশে কখনই বসতে নেই! চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মানুষের পেটে ছুরি মেরে দিতে পারে তারা! জামানের নিজের অভিজ্ঞতা সেটাই বলছে। জামান ভেবে পায় না কীভাবে এত নিষ্ঠুরতায় ভরে গেল বাবলির মন! এমন কাঁটা, এমন বিষ তো কখনো ছিল না তার মনে? তাই জামান মনে মনে অনুযোগ জানায়: বাবলি! বাবলি! আমি তোমার নিষ্ঠুর চেহারা আর নিতে পারছি না! নিজের মনে অজস্রবার এ কথাটা উচ্চারণ করে জামান, পারলে দেয়ালে কপাল ঠোকে। বাবলিকে তা বলা হয় না। টেক্সট মেসেজে সে কেবল

দ্বিতীয় রাউন্ড দাবা খেলার একটা তারিখ নিতে পারে, মানে, কাজের কথা ছাড়া আর কোনো অনুভূতি বাবলিকে খুলে বলা যায় না। বাবলি বলে, আজ থেকে দুদিন পরে আগামী বৃহস্পতিবার দাবা খেলতে বসা যেতে পারে। সামনের দিনগুলোয় একটু ব্যস্ত থাকবে বাবলি। বিয়ে লেগেছে তার চাচাতো ননদের। এ কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় জামানের। মনে মনে সে বলে : ও বাবা! চাচাতো ননদের জন্য এত পীড়া তোর! ভালো! দাঁড়া! ছেরি। যদি এরপরের দুটো রাউন্ডে জিতে যাই, তবে তোকে একবার চুমু খেয়ে দূরে সটকে পড়ব আমি! তবে এটাও ভেবে দেখার ব্যাপার, বাবলিকে একবার চুমু খাওয়ার জন্য কেন এত নিষ্ঠুরতা সহ্য করছে জামান? এ বৃত্তের ভেতরে জামানের ঘুরপাক খাওয়ার কী প্রয়োজন? উত্তর খুঁজে পায় না জামান। অথবা এমনও হতে পারে, সে আসলে কোনো সমাধানেই পৌঁছাতে চায় না—ঝুলিয়ে রাখতে চায় ব্যাপারটাকে। কিসের এত দুর্বলতা বাসা বেঁধে আছে জামানের মনের ভেতরে? নির্দয় এক মানুষের সঙ্গে এত ঝোলাঝুলি তো ভালো কথা নয় বাপু!

দ্বিতীয় দিনে অফিসের শাটলে চেপে মালিবাগে নামল জামান; তারপর শান্তিবাগ রোড ধরে খানিকটা হেঁটে সে ঢুকল গিয়ে বাবলিদের বাসায়। তখন বিকাল সাড়ে ছয়টা মতো বাজে, ফাল্গুনের সন্ধ্যা নামেনি। ঘরের ভেতরটায় আলো কম বলে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে টিউবলাইট। বাবলিদের বসার ঘরে পয়লাতে চা খেল জামান, বাবলি আর বাবলির স্বামী। বাবলির স্বামী বাজে বকল অনেক। সহ্য করল জামান। আড়চোখে তাকিয়ে জামান দেখল, লাল ইটের রঙের আটপৌরে সালোয়ার-কামিজে জ্বলজ্বল করছে বাবলির ফর্সা ত্বক। এবার কোনো এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের কথা জামানের স্মরণে আসে : পাবনা শহরের গার্লস স্কুল থেকে বন্ধুদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছে বাবলি; রোদের তীব্রতায় জ্বলছে মেরুন রঙের সালোয়ার-কামিজ আর সাদা ওড়না পরা সেই কিশোরী; তার ফর্সা মুখমণ্ডল রোদের তাপে পুড়তে পুড়তে লাল হয়ে আছে, তার থুতনিতে জমে আছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটিতে পাবনায় গেছে জামান। তখন অলস দিন মুচড়ে উঠছে জামানের শরীরে। অনেক কষ্টে বাসা থেকে বেরিয়ে সে অসিতের খড়ির দোকানের ভাঙা টুলে বসে সিগারেট ধরিয়েছে একটা। তার পাশে খড়ির গাদার পাশের জরাজীর্ণ একটা বেঞ্চে বসে আছে সুলতান, রেজা, খোকা আর তুষার। সোলেমান বন্ধুকে ডাকতে খড়ির দোকানের বাইরে যেতেই মূর্ছা গেল জামান—কী আশ্চর্য! বাবলিকে আজ এত লম্বা দেখাচ্ছে কেন? বাবলি লম্বায়ও বেড়েছে অনেক—পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি তো হবেই, খুকুমণির চেয়েও এখন সে মাথায় বড়! আর কিশোরীর ফর্সা ত্বক জ্বলছে, যেন বনেতে ফেটে বের হয়েছে হাজারও শিমুল। এমন সজীব একটা ছবি আর কোনো দিন দেখতে পায়নি জামান, কোথাও নয়। আর কি কোনোদিন এভাবে পাবনা শহরের মহিলা কলেজ রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাড়ায় ঢুকবে অপূর্ব এক তরুণী, হাওয়ায় ভেসে ভেসে? না মনে হয়! তবে সেখানেই ফিরে যেতে চাইছে জামান। এখন এমন একটা গতিক হয়েছে যে বাবলিকে এসব কষ্টের কথা বলাও যাচ্ছে না! গভীরতম কথা কাকে বলা যায়? বাবলি তো আর তেমন কাছের মানুষ রইল না!

বাবলির স্বামী আরাফাত বলল, আজ সে জামান আর বাবলির দাবা খেলা দেখবে। মৌচাক মার্কেটের দোকানে রাত করে গেলেও তার কোনো অসুবিধা হবে না। জামানের আপত্তি নেই তো? না, না, সেকি? আপত্তি থাকবে কেন? তবে কথা এই, আমি মোটেই ভালো দাবা খেলতে পারি না। আমার চালের ধরনধারণ দেখলে আপনি হাসবেন। কৌতুকে হাসতে হাসতে আরাফাত বলে, অসুবিধা নেই, জামান আটকে গেলে আরাফাত সাহায্য করবে তাকে। আজ আরাফাত জামানের পক্ষের মানুষ।

ডাইনিং টেবিলেই দাবার বোর্ড ফেলে বাবলি। তার পাশে বসে বোর্ডে গুটি বসায় আরাফাত। বাবলি আর কয়েন টস করে না। জামানকে সে জিজ্ঞাসা করে, কোন দিকটা নেবে জামান—কালো না সাদা?

জামান বলে, 'তোমার যেটা পছন্দ!' বাবলি বলে, 'বুঝতে পারছেন না যে সাদা নিলে আপনি ফার্স্ট মুভারস অ্যাডভান্টেজ পাবেন?'

'হোক গা! তুমি সাদাই নাও।' প্রতিক্রিয়া জানায় জামান।

কাজেই সাদা রাজার দল নেয় বাবলি। প্রথমে সে তার সাদা রাজার সামনের সাদা বোড়েটাকে সম্মুখে দু ঘর সরায়। জামান তার কালো রাজার সামনে বসে থাকা বোড়েটাকে সেটার মুখোমুখি নিয়ে যায়। বাবলি তাকে বলে, 'এই যে বোড়ে দুটোকে কাজে লাগানো হলো পয়লায়, এটাকে বলে রুই লোপেজ ওপেনিং। পড়েছেন তো?' মাথা ঝাঁকিয়ে জানায় জামান : হ্যাঁ! সে জানে ব্যাপারটা। এবার আড়াই চালে ডান দিকের হাতিটার এক ঘর সামনে বাবলি বসায় তার রাজার ডানের ঘোড়াটাকে। জামান তার রাজার বাম দিকের কালো হাতিটার সামনে যে কালো বোড়ে আছে, সেটাকে সোজাসুজি নিয়ে যায় একঘর সামনের ঘরটায়। বাবলির ডান পাশের সাদা ঘোড়াটা এবার খেয়ে দেয় জামানের রাজার তিন ঘর সামনে অবস্থান নেয়া কালো বোড়েটাকে। কাজেই জামান কাছের আরেকটা কালো বোড়ে দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে আসতে থাকা ঘোড়াটাকে চটজলদি কেটে দেয়। বাবলি হাসতে হাসতে বলে, 'তাহলে আপনিও খাওয়াখাওয়ি শুরু করলেন! উন্নতি হচ্ছে। গুড!'

মৃদু হাসে জামান। বাবলির পরের চাল কী হতে পারে, সেটা ভাবতে বসে সে ভয়ে সিটকে যায়। কিছুই সে আন্দাজ করতে পারছে না আর। এবং কী আশ্চর্য! বাবলি তার সাদা মন্ত্রীকে ডান দিকে কোনাকুনি চার ঘর সরিয়ে সোজা কিস্তি দিয়ে বসে জামানের কালো রাজাকে! মহাবিপদ! এবার রাজাকে নিয়ে কোথায় পালানো যাবে? কিস্তি খেয়ে মাথার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যাওয়ার পরও বাবলির সম্ভাব্য চাল নিয়ে ভাবতে বসে জামান।

আরাফাত জামানকে একটা সূত্র দেয় তখন : তাকিয়ে দেখেন, কোন কোন ঘরে ভেগে যেতে পারবে আপনার রাজা—সমুখে, ডানে, বামে?

'ও! তাই তো!' এই বলে জামান তার কালো রাজাকে ঠিক সামনে এক ঘর সরিয়ে ফেলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবলির সাদা মন্ত্রী তিন ঘর বামের কালো বোড়েটার পজিশন দখল করে নেয়। আবারো কিস্তিতে পড়ে যায় জামানের কালো রাজা।

মুচকি হাসিতে বাবলি বলে, 'সাবধান জামান ভাই!'

পাল্টা মুচকি হাসিতে জামান তার কালো রাজাকে এক ঘর বামে সরিয়ে নেয়।

'ব্রাভো! এবার আর আমার মন্ত্রী আপনার রাজাকে সোজাসুজি খেতে পারবে না!' খুশি হয়ে বলে ওঠে বাবলি। এবং সে তার ডান দিকের সাদা হাতিটাকে কোনাকুনি তিন ঘর সরিয়ে নতুন জায়গায় বসায়। আবারো জামানের কালো রাজা কিস্তির ফাঁদে আটকে পড়ে।

কালো রাজার মাথায় হাত রেখে জামান ভাবতে থাকে—ভেগে যাই। কিন্তু কোথায়ই বা যাব?

তেড়ে ওঠে আরাফাত, 'শোনেন! শোনেন! আপনার কালো মন্ত্রীকে কাজে লাগালেও কিন্তু সে কাটা পড়বে। তার চেয়ে রাজার চারপাশে প্রতিরক্ষা তৈরি করা যায় কিনা, ভেবে দেখেন। সব গুটির অবস্থানের দিকে তাকান এবার।'

রাজার প্রতিরক্ষা? হুম।

জামানকে বাবলি বরং পরামর্শ দেয় কালো মন্ত্রী সরিয়ে অন্য কোনো পজিশনে নিয়ে যেতে। তবে বাবলির পরামর্শ না শুনে মন্ত্রীর সামনের কালো বোড়েটাকে সে দু ঘর সমুখের ঘরে প্রতিস্থাপন করে নেয়।

'আয় হায়! ভুল চাল দিলেন?' আর্তনাদ করে ওঠে বাবলি এবং সে তার সাদা হাতিটাকে কোনাকুনি এক ঘর বাড়িয়ে জামানের বোড়েটাকে শুইয়ে দেয়। জামানের কালো রাজা আবারো কিস্তি খায়। জামান গুনে দেখে, তার তিনটা বোড়ে কাটা পড়ল। বাবলির কেবল একটা ঘোড়া গেছে! এবার চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে জামানের কমসংখ্যক গুটি কাটা যায়। তাই সে কোনাকুনিভাবে সমুখে এক ঘর সরিয়ে নেয় তার রাজাকে।

বাবলি তার দিকের বোর্ডের সর্বডানের সাদা নৌকার সামনের সাদা বোড়েটাকে দু ঘর সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক তার মুখোমুখি একটা কালো বোড়ে বসায় জামান। সে ভাবতে বসে, এবার কোন দিক দিয়ে হামলা আসতে পারে! একটু ভেবে মাঝবোর্ড থেকে তার সাদা হাতিটাকে কোনাকুনিভাবে চালে বাবলি। তারপর সে খেয়ে ফেলে জামানের মন্ত্রীর ডান দিকে বসে থাকা ঘোড়ার ঠিক সামনের কালো বোড়েটাকে। কোনো কিছু না ভেবে জামান তার কালো হাতিটাকে কোনাকুনিভাবে এক ঘর বাড়িয়ে দখল করে নেয় তার নিজের রাজ্যে ঢুকে পড়া সাদা হাতিটাকে।

মুচকি হেসে মাঝবোর্ডে বসে থাকা তার সাদা মন্ত্রীকে এক ঘর ডানে নিয়ে গিয়ে বসায় বাবলি। আবার কিস্তির ফাঁদে ধরা পড়ে জামানের কালে মন্ত্রীটা। কী মুশকিল! জামান ভাবে, বাবলি তো তাকে স্বস্তিতে থাকতেই দিচ্ছে না! এতবার কিস্তিতে পড়ছে জন্যই তো তাকে কেবল পালাতে হচ্ছে এদিক-ওদিক! বাবলির দিলে আসলেই কোনো রহম নাই! রহম থাকলে সে জামানকে এতসব কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে যেত না!

'এবার ভাবেন, কোথায় সরবে আপনার রাজা—সামনে, ডানে নাকি বামে?' বলে ওঠে বাবলি।

বোর্ডের দিকে আবারো নজর দেয় জামান। একটু ভেবে কিস্তি এড়ানোর জন্য সে তার রাজাকে এক ঘর বামে বোর্ডের একেবারে মাথার দিকে সরিয়ে ফেলে। কিস্তি থেকে এ যাত্রায় বেঁচে যায় তার কালো রাজা। তবে অবস্থা সুবিধার মনে হয় না, কেননা তার রাজাকে পদে পদে অনুসরণ করে চলেছে বাবলির বিভিন্ন মানের গুটিগুলো।

জামানের দুর্ভাবনাই এবার সত্যি হলো—বাবলি তার বাম পাশের সাদা হাতির ঠিক সামনের সাদা বোড়েটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল দু ঘর এবং সে হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'চেক'!

চেক? কোথায়? বোর্ডে তাকিয়ে জামান দেখতে পায়, বাবলির সাদা হাতি এবার জামানের কালো রাজাকে কোনাকুনিতে পাঁচ ঘর এগিয়ে খেয়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছে।

'তুমি না তোমার বোড়ে সরালে! সেদিকে তাকিয়ে আছি আমি।' অবাক হয়ে বাবলিকে বলে জামান।

বাবলি জামানকে বোঝায়, এটাকে বলে ডিসকভারড চেক। এর মানে হলো বোড়েকে সামনে ঠেলে দিয়ে বাবলি তার সাদা হাতিকে উন্মুক্ত করেছে আক্রমণ চালানোর জন্য।

মনে মনে বাবলিকে গাল দেয় জামান, 'শয়তান ছেরি! এত প্যাঁচ ছিল তোর মনে? বোড়ে ঠেলে চুপি চুপি আমাকে কিস্তি মারলি তুই?' অবশ্য জামান জানে, খেলাতে এসব আস্ফালনের কোনো ফায়দা নেই; জরুরি হলো, রাজাকে এ যাত্রায় নিরাপদে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা বা রাজার চারপাশে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে ফেলা। তা নিয়েই ভাবতে বসে জামান। সে তার বাম পাশে ঘোড়ার সামনের কালো বোড়েটাকে চটজলদি সমুখে দু ঘর ঠেলে দিয়ে বসায় বাবলির সাদা হাতির গতিপথের মুখে। 'খাও দেখি আমার রাজাকে এবার তুমি!' এই বলে দর্পে বাবলিকে একটা খোঁচা মারে জামান।

'ও! এই কথা!' এই বলে হো-হো করে হেসে ওঠে বাবলি। তার সঙ্গে সুর মেলায় আরাফাত এবং আরাফাত জামানকে বাহবা দিয়ে বলে, 'এই বোড়ের চালটা কিন্তু খুবই ভালো চাল হয়েছে!' মনে মনে আরাফাতকে গাল দেয় জামান—দাঁড়াও শালা! তোমাকেও একদিন দাবার বোর্ডে ঘোল খাওয়াব আমি! কানের কাছে কাঁচা পয়সার ঝনঝনি শুনিয়ে বিয়েতে রাজি করিয়েছিলে তুমি বাবলির আব্বাকে! তোমার সেই পাপের বিচার তো হবেই কোনো না কোনো দিন!

এবার বোর্ডের দিকে চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বাবলি। এর অর্থ এই যে জামানকে ল্যাং মারার জন্য সে ফান্দি আঁটছে কোনো। যতই ফান্দি আঁটিস তুই ছেরি, এবার সহজে আমি ধরা দিচ্ছি না! প্রথমবার আমার মতো দুর্বল প্রতিপক্ষকে এখন হারিয়ে ডাঁট বেড়েছে তোর, নাকি? তোর ডাঁট আমি ছুটিয়ে দেব।

কিছু একটা ভাবতে ভাবতে বাবলি তার সাদা মন্ত্রীকে মাঝবোর্ড থেকে ঢুকিয়ে ফেলে জামানের রাজধানীর ভেতরে—ঠিক জামানের ডানদিকের কালো হাতিটার মুখোমুখি। এ চালের ফায়দা যে কী, তা বুঝে উঠতে পারে না জামান। খুব একটা না ভেবেই সে তার কালো মন্ত্রীকে কোনাকুনি এক ঘর সরিয়ে বসায় বাবলির সাদা মন্ত্রীর ঠিক সামনে। জামানের উদ্দেশ্য এখন একটাই—বাবলির সাদা মন্ত্রীকে এবার শেষ করে দিতে হবে তার কালো মন্ত্রী অথবা কালো হাতি দিয়ে! কোথায় এখন তোমার সবচেয়ে শক্তিশালী গুটিটাকে সরাবে তুমি বাবলি? পিছিয়ে যাবে? পিছিয়ে গেলে আক্রমণের নীতি থেকে তুমি সরে যাচ্ছ আপাতত। ব্যাপরটা এমন হবে যে ছেঁচড়ে দৌড়ে পালাল তোমার পেয়ারের সাদা মন্ত্রী। এটাও তো তোমার একটা পরাজয়!

এবার একটু ব্যাকফুটে এসে মাঝবোর্ডের সর্বডানের সাদা বোড়েটা এগিয়ে নিল বাবলি। তারপর সে জামানের রাজার সামনের প্রতিরক্ষা লাইনের একটা কালো বোড়েকে গিলে নিল। আবারো কিস্তি খেল জামানের রাজা! তবে এ সমস্যার সমাধানটা জামান করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গেই—জামান তার দলের মন্ত্রী দিয়ে নস্যাৎ করে দিল বাবলির চাল। দর্পে ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসল জামান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাবলি তার লাইনের সর্বডানের এক নম্বর ফাইলে উন্মুক্ত করে রাখা সাদা নৌকা এগিয়ে নিয়ে এসে জামানের রাজার ঠিক সামনে পাহারারত কালো নৌকাটাকে বসিয়ে দিল এবার। সে বলে উঠল, 'চেক।'

'এবার ঝামেলাটা দেখলেন ভাই?' জামানকে জিজ্ঞাসা করল বাবলি। জামান কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে বসল বাবলি—জামানের কালো রাজা যদি এবার সাদা নৌকা খায় তবে পরের চালে পেছন থেকে এসে রাজাকে খাবে সাদা মন্ত্রী। এবার কালো রাজা পেছনে বা পাশে এক ঘর করে যেদিকেই ভেগে যাক না কেন সাদা মন্ত্রী তাকে খাবেই খাবে। তবে এবার চেক এড়াতে কোথায় সরবে জামানের কালো রাজা?

কী ভয়ংকর অবস্থা! ফের ভাবতে বসল জামান।

'সময় নেন আপনি! তবে পাঁচ মিনিটের বেশি নয়। তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই কিন্তু!' জামানকে আয়েশ করে খেলার জন্য এভাবে সুযোগ করে দিল বাবলি।

জামান এবার তার কালো রাজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসতে থাকা সাদা ঘোড়াটাকে তার রাজাকে পাহারা দিতে থাকা কালো মন্ত্রী নিয়ে নির্মূল করবে নাকি? সর্বনাশ! তাহলে তো এবার বাবলির রাজধানীতে সাদা রাজার বাম দিকে বসে আছে যে হাতিটা, সেটা কোনাকুনিভাবে এগিয়ে এসে ধ্বংস করে দেবে কালো রাজাকে! এর অর্থ এই যে চেকমেট হয়ে গেছে!

'চেকমেট হয়ে গেল নাকি?' সবিস্ময়ে বাবলিকে জিজ্ঞাসা করে জামান।

'হু! এজন্যই তো আমার সাদা হাতির কোনাকুনি চলার পথটা আমি আগে থেকেই খুলে রেখেছিলাম। সেটা বুঝতে পারেননি আপনি।' হাসতে হাসতে বাবলি জামানকে বলে।

এভাবে দ্বিতীয় রাউন্ডেও বিজয়ী হলো বাবলি। হেরে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যায় জামান।

বাবলি জামানকে স্মরণ করিয়ে দেয়, জামান অনেকগুলো সোলজারকে বলি দিয়েছে। সেটা ঠিক হয়নি। আর বলতেই হয়, প্রতিপক্ষের কমপক্ষে পাঁচ-ছটা চাল জামানকে আগাম ভেবে ফেলতে হবে। হতাশ হওয়ার কিছু নেই! কোনো না কোনো সময়ে নিশ্চয় সেটা করতে পারবে জামান।

তাহলে এবার দেখা যাচ্ছে, বেস্ট অব থ্রি গেমে পরপর দু রাউন্ড জিতেছে বাবলি। আর একটা রাউন্ডে জামান যদি-বা জেতেও তবুও তার পরাজয়ই অবধারিত। এমন একটা অবস্থায় জামান কি থার্ড রাউন্ড খেলতে চায়? জামানকে জিজ্ঞাসা করে বাবলি।

জামান তখন বাবলিকে প্রস্তাব দেয়, বাবলি যদি কিছু মনে না করে, তবে পাঁচটা রাউন্ড খেলা হোক। মোট তিনটা গেমে যে জিতবে জয় হবে তারই।

এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বাবলি। সে বলে, 'আমার মনে হচ্ছে, আসলে আপনি আপনার পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না; ভাবছেন, আরো ক'টা রাউন্ড খেলা হলে আমার বিরুদ্ধে আপনার জিতে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাই নয় কি?'

'তোমার কথা ঠিক। আমি একটা সুযোগ চাই। প্লিজ!' অনুরোধ জানায় জামান।

বাবলির স্বামী আরাফাত বাবলিকে পরামর্শ দেয়, 'উনি যখন এত করে বলছেন তবে তুমি রাজি হয়ে যাও! বেস্ট অব ফাইভে তুমি হেরে গেলেই বা তোমার ক্ষতি কী?'

'কী যে বলো না তুমি! কিছুতেই আমাকে হারলে চলবে না! জিততেই চাই আমি।' খুবই আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাবলি তার প্রত্যাশা জানায়!

আরাফাত জামানকে বোঝাতে বসে, তাহলে কী করবে জামান? বেস্ট অব ফাইভে সে যে এরপরের তিনটা রাউন্ড লাগাতারভাবে জিতবেই তেমন সম্ভাবনা আসলেই কম। এটা মানতে হবে, এখন পর্যন্ত বাবলি তাকে শিক্ষানবিশ হিসেবেই ভেবে নিয়েছে। বাবলি যদি গ্র্যান্ডমাস্টার বা আন্তর্জাতিক মাস্টার বা ফিদে মাস্টার, এমনকি জাতীয় মাস্টারদের চালের ধরন অনুসরণ করে নিজের চাল দেয় তবে তাকে কীভাবে পরাস্ত করবে জামান? সংশয়ের ব্যাপার এটাই। তবে এও ঠিক

যে একটু সময় নিয়ে দাবার চাল সম্পর্কে আরেকটু পড়লে, আরেকটু ভাবলে নিশ্চয় জামানের অনুমানের ক্ষমতা আর অন্তর্দৃষ্টির পরিধিটা বেড়ে যাবে। এ কারণেই মায়েস্ত্রোরা বলেন, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে দাবা নিয়ে ভাবতে হয়। এমন একটা অবস্থায় নিশ্চয় কোনো না কোনো দিন পৌঁছে যেতে পারবে জামান।

এভাবে উৎসাহ দেয়ার জন্য আরাফাতের প্রতি জামান তার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তবে সে আর আরাফাতকে বলে না যে বাবলির সঙ্গে ম্যাচে হেরে গেলে ক্ষতিটা হবে তারই! বাবলির নিষ্ঠুরতায় সে বলি হবে তখন।

বাবলিকে জামান আবারো অনুরোধ করে বলে, সে আরো তিন রাউন্ড দাবা খেলতে চায় বাবলির বিরুদ্ধে, বাবলি যেন রাজি হয়ে যায়!

'বেশ তা-ই হবে। তবে প্লিজ তাড়াহুড়া লাগিয়ে দিয়েন না আবার! মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। বই পড়া আর প্র্যাকটিস ছাড়া আর কোনো পরামর্শ নেই। ভাবি সাহেব দাবা খেলতে পারেন?'

নাহ! তিনি পারেন না।

'কী আর করা! তাহলে আপনি নিজের বিরুদ্ধেই খেলবেন না হয়! এভাবে নিজের কনফিডেন্স বাড়লে আবারো আমরা খেলতে বসব। সময় নিন আপনি।' এই বলে মুচকি হাসে বাবলি।

বাবলির হাসি দেখে পিত্তি জ্বলে যায় জামানের। পুঁচকে একটা মেয়ের কাছে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে সে!

৬. তোমাকে আমি চিনি না বাবলি!

বাবলিকে জামান একটা চিঠি লেখে। চিঠিটার সারমর্ম এমন : আমাদের একসঙ্গে থাকা হয়নি, হবেও না—মেনে নিলাম এ কথা। তো বাবলি তুমি বলো, যে সম্পর্ক গভীর হয়নি কখনই, হয়তো কাপুরুষতায়ই, সে সম্পর্কে কি দেনাপাওনার হিসাব রয়ে যায় না, সামান্য হলেও! তোমাকে তো আর আমি এমনি কাছে ডাকিনি! আমার মনে হয়, অবশ্যম্ভাবী ছিল তোমার-আমার ঘনিষ্ঠতা। এসব অবশ্যম্ভাবিতারও একটা চাপ আছে কিন্তু—সম্ভাবনা নাই জেনেও তারা খোঁচাতে থাকে! ভেবে দেখো, সেই বাইশ-তেইশ বছর আগে আমি যখন কলেজপর্ব শেষ করেছি আর তুমি পড়ছ নাইন-টেনে, তখন তো তোমার আমার মাঝে আলিঙ্গন হতে পারত, চুমুর মতো সুন্দর কোনো ঘটনা ঘটতে পারত, তা থেকে হয়তো ছড়িয়ে যেতে পারত পুষ্পপল্লব। সেটা হয়নি। আর তা হয়নি বলেই কিন্তু না হওয়া সম্পর্কেরও কিছু দেনা-পাওনা রয়ে গেল, দায় রয়ে গেল। সেসব দায়কে তুমি অস্বীকার করতেই পার—তা তোমার অভিরুচি। এবার বলো, আজ থেকে দু যুগ মতো আগে আমরা পরস্পরের কাছে আমাদের হৃদয় উন্মোচন করিনি বটে, কিন্তু মুগ্ধতা তো ছিলই। মুগ্ধতাতে কি পরস্পরের কাছে ঋণ তৈরি হয় না? আমার তো আজকাল সেটাই মনে হচ্ছে। যে মুগ্ধতার কথা বলছিলাম সেটা কি যার যার মনে নিভৃতে আকুলতা জাগায়নি, কামনায় ডাকেনি, বিরহ তোলেনি মনে, অথবা জাগতিক পরিণতি চায়নি কোনো? এ বাস্তবতাকেও কি তুমি আজ অবজ্ঞায় ছুড়ে ফেলে দেবে? নাকি তুমি মুগ্ধতার কথাও ঝেরে ফেলতে চাও এখন? বলা তো যায় না! তোমার কোনো কথাই আমি আর বিশ্বাস করতে পারছি না, জানো? তুমি এবার বলতেই পারো, মনের নিভৃতে যা ঘটেছিল তখন সেগুলো সম্পর্কের বড় কোনো নির্ধারক ছিল না, তাই নিভৃত আলোড়ন কোনো জাগতিক ছকেই পড়ছে না। তোমার এ যুক্তি যতই অকাট্য হোক না কেন তা নস্যাৎ করে দেয়া সম্ভব। তুমি কি মনে করো জাগতিক ছকে যা পড়বে না, সেটাই মূল্যহীন? ভেবে দেখো, আসলে বৈচিত্র্যই মানুষের জীবনকে, সভ্যতাকে মহিমান্বিত করে তোলে!

ভাবছ, আমি লম্পট বলে নিজের ইচ্ছার সাফাই গাইছি? সেটা তুমি বলতেই পারো! তো এই যে তুমি আমাকে ঘনিষ্ঠ হতে দিতে রাজি হচ্ছ না, কুকুর-বেড়ালকে নির্দয় মানুষেরা যেভাবে তাড়ায়, তাড়াচ্ছ সেভাবে, সে নিষ্ঠুরতা দিয়ে কি তুমি তোমার নিজের আদর্শবাদী অবস্থানকে সংহত করছ না? আমি জানি, এ সমালোচনা তুমি নেবে না। তবু বলি, তোমার চোখে আমি যদি লম্পট হয়ে থাকি, তবে তুমি আগাগোড়া একজন স্বার্থপর মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। বুঝলে তো, এত নিজ মতলবে চলাটা ঠিক না—এবার তোমার দানধ্যানে নামা উচিত। এই উদার পৃথিবী তো তোমাকে কম কিছু দেয়নি বাবলি? এমন সুন্দর একটা সংসার, সংসারের যোগ্য পুরুষ, দুজন সুস্থ সন্তান, সহায়-সম্পত্তি—এসবই তো তোমাকে এ পৃথিবী হাত ভরে দিয়েছে! এবার পৃথিবীকে তোমার কিছু ফেরত দেয়ার পালা এসেছে আমি মনে করি। আমার আকাঙ্ক্ষাগুলোকে তুমি এমন উদারভাবেও সম্মান দিয়ে দেখতে পারো বাবলি। আর তুমি যদি সেটা না করো তবে যেন তোমার সঙ্গে আর কখনই আমার দেখা না হয়! আপাতদৃষ্টিতে যতই ছ্যাঁচড়া বলে মনে হোক না আমাকে, আমারও কিন্তু মানসম্মানবোধ আছে! সেসব আমি বিকিয়ে দেব না কিছুতেই!

এভাবেই শেষ হয় চিঠিটা। জামান ভাবে, সুযোগ বুঝে চিঠিটা সে বাবলিকে ঠিক গছিয়ে দেবে। জামান তার স্ত্রী পম্পাকে লুকিয়ে এই চিঠিটা লিখেছিল, অফিসে বসে; তারপর সে তার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিল চিঠিটা। তিন-চারদিন ধরে ফেলে রাখা চিঠিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়তে থাকে সে। তার মনে হয়, এমন এসপার-ওসপার করে দেয়ার মতো একটা চিঠি লিখে আসলে কী হবে! মানুষ কি সহজে অনুশোচনায় পড়ে যায়; তার অবস্থান বদল করে, নতুন একটা জায়গায় যেতে পারে কখনে? তা তো মনে হয় না! বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, পরিস্থিতিকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা আর জাড্যতাই আসলে এ জগতের নিয়ম! সেখানে জামানের এসব নিজস্ব অভিমান আর অনুযোগ বাবলিকে জানানোটা অর্থহীন নয় কি? মানুষ যা বোঝে তা সে নিজে থেকেই বুঝে নেয়—কখনো কখনো অন্যের সঙ্গে সে শলাপরামর্শ করে বটে, কিন্তু চাল দেয় নিজের সুবিধা সংহত করার জায়গা থেকেই। কাজেই বাবলিকে এসব চিঠিচিঠি লিখে লাভ হবে না কোনো। এ তো গেল তার এখনকার অনুধাবন। চিঠিটা যখন সে লিখতে মনস্থ করে তখন তার ভাবনাটা ছিল অন্য রকম—তার মনে হচ্ছিল জ্বালাময়ী একটা চিঠি লিখে সে ভেগে যাবে বাবলির সামনে থেকে। তুই ছেরি যখন আমার চেহারাই দেখতে চাস না তো আমি চলে যাচ্ছি! চরম ভাবনাটা এখন অনাবশ্যক বলেই ঠেকছে নিজের কাছে। চিঠি পড়ে যে বাবলির মাঝে একটা পরিবর্তন আসবে, এমনটা আর সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই জামান ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলল বাবলিকে লেখা চিঠিটা। এভাবে চিঠি নাশ করে ফেলাটা জামানের জীবনে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বাবলি যখন পাবনা মহিলা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্বে ঢুকল তখন জামান সূর্য সেন হলের রুমে বসে আরো দুটো চিঠি লিখেছিল বাবলিকে; চিঠিগুলো সে বয়েও নিয়ে গিয়েছিল পাবনা পর্যন্ত; তবে সেগুলোও আর বাবলির হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়নি জামানের। শেষ মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল, কথাগুলো বরং বাবলিকে সে সামনাসামনিই বলবে। সে কাজটা আর করা হয়নি অবশ্য। ক'দিন পরেই বাবলির বিয়ে হয়ে গেল।

আজ মনে পড়ছে, বাবলির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাবলির বোন খুকুমণির সঙ্গে যখন জামানের বন্ধুত্বের অবনতি ঘটেছিল; তারপর জামান তার সহপাঠী শামসুন্নাহার হলের চিনিকে দীর্ঘ একটা প্রেমপত্র লিখেছিল। চিঠিটা সে চিনিকে পাঠিয়েছিল ডাক বিভাগ মারফত। তার এক সপ্তাহ মতো পরে চিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, 'হারামজাদা! তোর কি মাথার ইসকুরু ঢিলা হয়ে গেছে? শোন, তোকে আমি প্রেমিক হিসাবে ভাবি না।' আর তাছাড়া এও সত্যি যে চিনির সঙ্গে প্রেম ছিল তার খালাতো ভাইয়ের, যে কিনা তখন চাকরি করত বেসরকারি একটা ব্যাংকের ঢাকা শহরের কোনো শাখায়। তো দেখো বাবলি, চিনি কি আমার চিঠি পড়ে উজ্জীবিত হয়েছিল? মোটেই তা নয়! আমার এসব বেকার চিঠিফিঠি তোমাকেও কাঁপাবে না—জানি। তাই বলছি, তোমাকে লেখা চতুর্থ চিঠিটাও ছিঁড়ে ফেলাতেও আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। অপাত্রে চিঠি ছাড়তে আমি আর আগ্রহী নই! তার চেয়ে এই ভালো, দাবায় হারজিত নিয়ে তুমি যে বাজি ধরেছ আমার সঙ্গে সেটাই চালু থাকুক। বলা তো যায় না, থার্ড রাউন্ডে তোমাকে আমি হারিয়ে দিতেই পারি! তুমিই তো বলেছ, দাবায়ও অনেক হিসাবের বাইরের ঘটনা ঘটে যায়! দুর্ঘটনাকেই তবে আহ্বান জানানো যাক!

শেষ পর্যন্ত অনলাইনে জামান শিক্ষানবিশদের জন্য বাংলায় সহজ করে লেখা একটা দাবার বই কিনে ফেলে। সেই বইতে প্রতিপক্ষকে হারানোর কৌশল নিয়ে উদাহরণ দেয়া আছে অনেকগুলো। দাবার বোর্ড সাজিয়ে সে প্রাথমিক পর্যায়ের দাবাড়ুদের জন্য রচনা করা চালগুলো বুঝতে চেষ্টা করে। প্রিন্টিং মিসটেকের কারণে সবগুলো উদাহরণ বুঝে ওঠাটা সম্ভব হয় না অবশ্য। ইন্টারনেট পেজগুলো বাদে সে বইটা উপকারেই লাগে খানিকটা। তবে সে তো জানে, বিপদটা আসে অন্য জায়গা থেকে—দাবার লাইভ গেমের সময় হাজারটা অনিশ্চিত

অবস্থা তৈরি হয়, যেগুলো একজন শিক্ষানবিশের মাথায় গণ্ডগোল লাগিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট! তো কথা হলো এই যে বাবলি যেমন বলেছে—একমাত্র অনুশীলনই দাবা খেলার বেলায় প্রতিপক্ষের গোপন ভাবনাকে বুঝতে শেখায়। কাজেই এক মাস মতো সময় ধরে দাবা খেলার অনুশীলন জারি রাখে জামান, অবশ্য নিজের সঙ্গেই নিজেকে খেলতে হয় তাকে—বাসার কারো বা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কারোরই আগ্রহ নেই দাবা খেলায়। তারা সবাই একই কথা বলে, এর চেয়ে ক্যারম অনেক গতিময় খেলা—স্ট্রাইকের সঙ্গে সঙ্গেই ধপাধপ গুটি পড়ে যাচ্ছে বোর্ডের পকেটে। জামান ভাবে, ঠিকই তো বলেছে তার কাছের মানুষেরা! বাবলি তাকে দাবার চক্করে না ঢোকালে সেও কি কোনোদিন দাবার মতো একটা ধীরগতির খেলায় বসত? নিশ্চয় নয়।

জামান তার পরিচিত একজন ফিদে মাস্টারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। ফিদে মাস্টার আবিদ তাকে বলে, 'আপনার বন্ধুর যেহেতু পেশাদার র‍্যাংকিং আছে, কাজেই আপনার মতো বিগিনারের পক্ষে তাকে হারানোটা কষ্টকরই হবে!'

তাহলে কী করবে জামান? জিততে তো তাকে হবেই! আবিদ তাকে তখন একটা চাল শেখায়। চালটার নাম সিসিলিয়ান ডিফেন্স, যেখানে পয়লায় সাদা দল তাদের রাজার সামনের বোড়েটাকে দু ঘর সামনে বসাবে এবং প্রত্যুত্তরে কালো দল তাদের মন্ত্রীর ডানদিকের হাতির সামনের বোড়েটাকে এগিয়ে দেবে দু ঘর। দাবার বোর্ডে গুটি সাজিয়ে আবিদ জামানকে সাদা পক্ষ নিতে বলে এবং নিয়ম অনুযায়ী আবিদের ভাগ্যে পড়ে কালো। সিসিলিয়ান ডিফেন্সের সূত্রমতে চালটা কী হবে তা জামানকে বলে দিতে থাকে আবিদ। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাখ্যা করে চলে চালগুলোর পেছনের যৌক্তিকতাও। আবিদ তাকে জানায়, একটা ম্যাচে সিসিলিয়ান ডিফেন্সের এমন একটা গেম খেলেছিল আনাতোলি কারপভ ও গ্যারি কাসপ্যারভ, ১৯৮৪ সালে। টসে সাদা পক্ষ পেয়েছিল কারপভ। পয়লা চালটা দিয়েছিল সেই। বেঁধে দেয়া সময়ের ভেতরে তেইশ নম্বর চালে এসে গেমটা স্টেলমেট হয়ে যায়, মানে, কোনো চালেই কেউ কাউকে আঘাত করতে পারছিল না এবং তাই তারা পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নেয় শেষপর্যন্ত। এমন তেইশটা চালই তাকে দেখিয়ে দেয় আবিদ। জামানকে আবিদ পরামর্শ দেয় : আপনার বন্ধুর সঙ্গে পরের রাউন্ড দাবা খেলার সময় সাদা নেবেন আপনি : খেলা শুরু করবেন সিসিলিয়ান ডিফেন্সের রুল ধরে। যদি দেখেন, কৌশলগত জয় হচ্ছে না, গেমটাকে পণ্ড করে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে দুটো কাজ করতে পারেন আপনি : আত্মরক্ষামূলক চাল দিতে দিতে প্রতিপক্ষকে নাচিয়ে দিতে পারেন অথবা কাটাকুটি করে এমন একটা অবস্থায় গেমটাকে নিয়ে যেতে পারেন যেখানে কৌশলগত চাল দেয়ার জন্য বোর্ডে তেমন কোনো গুটিই আর অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন ধরেন বোর্ডে রয়ে গেল সাদা রাজা আর সাদা হাতি, অন্যদিকে রইল কালো রাজা। এবার তো খেলা এগোবেই না! এভাবে খেলাটা ড্র হয়ে যাবে, মানে দুপক্ষের দিক থেকেই আর কোনো চাল দেয়াটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কাসপ্যারভ আর করচনয় ১৯৭৮ সালে একটা ম্যাচে এভাবে ড্র করেছিলেন। তখন বোর্ডে গুটির সংখ্যা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছিল পাঁচে—তিনটা সাদা, দুটা কালো। সেই পাঁচটা গুটির অবস্থান এমন দূরে দূরে ছিল যে কোনো কৌশলগত চালই দেয়া যাচ্ছিল না! আবিদ এও বলে, আর যদি বন্ধুর বিরুদ্ধে খেলতে খেলতে জামানের সাদা দল জিতেই যায়, তাহলে মন্দ কী? কে না জিততে চায়, বলেন?

দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে যাওয়ার এক মাস মতো সময় অতিক্রান্ত হলে বাবলিকে ফোন করে জামান। মাঝের সময়টায় তারা পরস্পরকে ফোন করেনি বা মেসেঞ্জারে টেক্সটও পাঠায়নি। জামান বাবলির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি স্রেফ মেজাজ খারাপ করেই। আর বাবলি কেন তার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি, তার কারণটাও আর বুঝতে বাকি নেই জামানের—বাবলি আসলেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই আগ্রহী নয়! এতে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না, কেননা কথাবার্তায় আর আচরণে এ ব্যাপারটা বাবলি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে হাজারবার। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, লুকোচুরি করার মানুষই নয় বাবলি! তা না হলে সে হয়তো জামানের সঙ্গে ছল করে চুকামিঠা কথায় নামতে পারত; মিথ্যা করে হলেও আশ্বাসের কথা শোনাত। এসবের ধারকাছ দিয়েও বাবলি যায়নি।

জামানের ফোন পেয়ে বাবলি মোটেই উচ্ছ্বসিত হয় না। জামান তাকে থার্ড রাউন্ড দাবা খেলার তারিখ ও সময় স্থির করতে বললে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সে। হাসতে হাসতে সে মন্তব্য করে, 'আমি তো ভেবে নিয়েছি যে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথাটা আপনি নিজেই ভুলে গেছেন!'

'কী বলো! ভুলব কেন। তোমার বিরুদ্ধে এ ম্যাচে আমাকে জিততেই হবে। আরো তিনটা গেম না খেললে তো ফলাফলটা বোঝা যাচ্ছে না!' গম্ভীর হয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানায় জামান।

'বেস্ট অব থ্রির রুলে পরাজয় মেনে নিলেই পারতেন! তাহলে দাবার চালটাল নিয়ে আপনাকে আর ভাবতে হতো না, ঘুমও হারাম হতো না; বউয়ের সঙ্গে মাস্তি করে বেড়াতেন! হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি জেনেও আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সোজা হয়ে। সেলাম করি ভাই আপনাকে।' এই বলে হাসিতে ভেঙে পড়ে বাবলি।

'কবে যাব তোমাদের বাসায়, সেটা বলো এবার।' অসহিষ্ণু হয়ে এবার জিজ্ঞাসা করে জামান।

তার রায় জানায় বাবলি, 'আগামীকালই চলে আসেন তবে।'

নিজের মনেই ঘোঁতঘোঁত করে জামান—ও হ্যাঁ! তোমার রায় তো আমাকে মেনে নিতেই হবে বাবলি! নইলে দেখা গেল যে তুমি পুরো ম্যাচটাই বাতিল করে দিলে! কী অসম্ভব ক্ষমতা তোমার! মানুষকে বাতিল করতেও তোমার বাঁধে না! তোমার এসব নির্মমতা দেখাটাই বাকি ছিল আমার।

পরদিন বিকালে আগারগাঁওয়ের অফিস থেকে সোজা বাবলিদের শান্তিবাগের বাসায় যায় জামান। বাবলি তাকে বসার ঘরে বসতে দিয়ে ভেতরে যায়। সামুসা আসে, শিঙাড়া আসে, সঙ্গে চা। চা খাওয়ার পরে সিগারেটের তেষ্টা পায় জামানের। বাবলিদের বসার ঘরের লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সে ভাবতে থাকে। তার মনে হয়, স্রেফ এসব দাবাটাবা খেলে কোনো লাভ হবে না আসলে! বাবলি খুবই শক্ত ধাতের মেয়ে। বাবলি তাকে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দেবে না কখনই। তো বাবলি আসলে তাকে মনের কথাটাই খুলে বলেছে—জামানের দিক থেকে এবার পরাজয় মেনে নেয়াটাই উচিত। জামানের এখন মনে হচ্ছে, সেটাই ভালো। বাবলির বিরুদ্ধে দাবা খেলতে বসে সে জিততে পারছে না, জিততে যে পারবে—এমন সম্ভাবানাও সুদূর; মাঝখান থেকে নিশ্চয় এমন বেকার একজন শিক্ষানবিশের সঙ্গে বসে এসব সহজ-সরল গেম খেলতে বসে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে টিম মাস্টার বাবলি। কাজেই এই ভালো যে জামান এখন পালিয়ে যাবে এখান থেকে। বারান্দা থেকে বসার ঘরে গিয়ে তাই জামান যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, তখনই ভেতরের ঘর থেকে এসে দৃশ্যে ঢোকে বাবলি। তার হাতে দাবার বোর্ড।

'কোথায় চললেন?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে বাবলি।

'ভাবছিলাম, সিগারেট কিনে নিয়ে আসি।' আমতা আমতা করতে করতে জামান গুল মারে একটা।

'চাইলে সিগারেট আনিয়ে দেয়া যাবে।' এই বলে সোফার সামনের ছোট টেবিলটায় দাবার বোর্ড বসায় বাবলি; গুটি সাজায়। জামানকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'টস করব নাকি?'

'নাহ্! আমি আজকে সাদা নেব।'

দাবার বোর্ডটাকে ঘুরিয়ে কালো গুটির রাজধানী নিজের দিকে টেনে নেয় বাবলি। ফিদে মাস্টার আবিদের পরামর্শ অনুযায়ী পয়লা চালটা মারে জামান—সাদা রাজার সামনের বোড়েটাকে সে দু ঘর সামনে ঠেলে দেয়।

'চমৎকার ওপেনিং! এটার নাম জানেন?' তার ডান দিকের হাতির সামনের বোড়েটাকে দু ঘর সামনে চাল দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে বাবলি।

'সিসিলিয়ান ডিফেন্স!' উত্তর দেয় জামান।

সকৌতুকে বাবলি বলে, 'আরে বাপস! ভালোই তো পড়াশোনা করছেন বলে মনে হচ্ছে!'

'তার মানে, এবার ডিফেন্সিং খেলবেন আপনি। তাই না?'

'হু!' খুব সংক্ষেপে উত্তর সারে জামান। বাবলিকে সে আর বলে না যে একবার কারপভ এ চালটা দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে কাসপ্যারভ তার বোড়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এভাবেই। খেলাটা ড্র হয়েছিল সেবার। তবে তখনই তার মনে এল, তার মনে হলো এই যে তার টিম মাস্টার প্রতিপক্ষ সহজেই জামানের পরের চালগুলো ধরে ফেলবে এবার। তা ধরুক! তবুও ফিদে মাস্টার আবিদের পরামর্শ মতো জামান আজকে তার রাজার আশপাশে শক্ত প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করবে।

এসব ভাবতে ভাবতে জামান তার দ্বিতীয় চাল দেয়—সে আড়াই চালে তার সাদা ঘোড়াকে নিয়ে যায় তার ডান দিকের হাতির একঘর আগে। তখনই বাবলি তার কালো মন্ত্রীর সামনের বোড়েটাকে এক ঘর এগিয়ে দেয়। সপ্তম চালে গিয়ে জামান একবার তার সাদা রাজা আর ডান দিকে বসে থাকে স্বগোত্রীয় নৌকার মাঝে অবস্থানের অদলবদল করে নেয়।

খুব খুশি হয়ে চিৎকার দিয়ে বাবলি বলে ওঠে, 'ওরে বাবা! ক্যাসলিংও শিখে গেছেন আপনি? শাবাশ! এই তো চাই! উন্নতি হচ্ছে আপনার। বলেছিলাম না?'

কৌতুকে মুচকি হাসে জামান। মনে মনে সে বাবলিকে খোঁচা দিয়ে বলে আরো কত চাল আমি শিখেছি, এবার তুমি তার নমুনা দেখবে পাতকী! আজ যদি নাও জিতি আমি, ড্র করবই করব।

নয় নম্বর চাল থেকে দেখা যায়, তারা দুজনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যার যার রাজার আশপাশে বিভিন্ন গুটি নিয়ে গিয়ে প্রতিরক্ষা দেয়াল তোলার কাজে। এভাবে নয় থেকে সতেরো নম্বর চাল পর্যন্ত কেউ কাউকে আক্রমণ করে না, উল্টো যার যার ডিফেন্স বাড়াতে থাকে। ক্রমেই খুবই রক্ষণাত্মক হয়ে ওঠে গেমটা। আঠারো নম্বর চাল থেকে শুরু করে একুশ নম্বর চাল পর্যন্ত গুটি কাটাকুটি করে তারা—সাদা দলের কাটা পড়ে মোট চারটা গুটি, কালোর দলেরও তা-ই। পঁচিশ নম্বর চালটাতে তারা খামোখাই তাদের গুটি আগুপিছু করে।

এবার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বাবলি দুটো পরিস্থিতি বর্ণনা করে: প্রথমত, সাদা ও কালো দলের মন্ত্রী দুজন বোর্ডের পূর্ব কোণে অনড় হয়ে বসে আছে, যাদের পাহারা দিচ্ছে একগাদা সৈন্য আর ক্ষমতাধর গুটি এবং দ্বিতীয়ত, কালো মন্ত্রী এখন কোনাকুনি এগিয়ে পাঁচ ঘর দূরের সাদা বোড়েটাকে খেয়ে, সাদা রাজাকে কিস্তি দিতে পারে সহজেই, কিন্তু তাকে তখন কেটে দেবে সাদা রাজার প্রতিরক্ষাব্যূহে বসে থাকা সাদা মন্ত্রী। বাবলি জামানকে আরো বোঝায়, জামান এখন কেবল একটা গুটিই চালতে পারবে—সাদা নৌকা। জামানের আর সব সাদা গুটি নিশ্চল হয়ে পড়েছে। তবে সাদা নৌকা সামনে এক ঘর এগিয়ে বাবলির কালো বোড়েটাকে কাটতে যাবে না, কেননা তাহলে পেছন থেকে আরেকটা কালো বোড়ে কোনাকুনি এসে খেয়ে ফেলবে সাদা নৌকাকে। কাজেই সাদা নৌকার যৌক্তিক চলন হবে আক্রমণ না করে নিজের রাজধানীর দিকে পিছিয়ে চলে যাওয়া।

বাবলির পরামর্শমতো জামান তার সাদা নৌকাকে সঙ্গে সঙ্গেই পিছিয়ে নিয়ে যায়!

বাবলি তাকে বোঝায়: এবার ভালো করে তাকান বোর্ডের দিকে। মাঝমাঠের দুদিকে এবার অবস্থান নিয়ে ফেলল দু দল। এখন আর কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। এর মানে এই যে দু দলই তাদের লোকক্ষয় ঘটাতে মোটেই আগ্রহী নয়। এ পরিস্থিতিতে খেলাটা স্টেলমেট হয়ে গেল।

এবার মনে মনে খুব খুশি হয় জামান। সে তো আসলে এমন একটা ড্র-ই কামনা করেছিল আজ! ফিদে মাস্টার আবিদের পরামর্শে তবে ড্র হলো তৃতীয় গেমটা।

এভাবে বাবলি আর জামান আধাআধিভাবে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নেয়। আজ পর্যন্ত ম্যাচের ফলাফল দাঁড়ায় এমনটা: প্রথম আর দ্বিতীয় গেম জিতল বাবলি; তৃতীয় গেম পর্যবসিত হলো ড্র-তে। রইল বাকি আর দুটো গেম। এখন যদি পরের এ দুটো গেম লাগাতারভাবে জামান জিতে যায় তাহলে বেস্ট অব ফাইভ ম্যাচের মোট ফলাফল ড্র-ই হবে। আর যদি যেকোনো গেম জেতে বাবলি তবে ম্যাচে জিত্তি হবে তারই।

চতুর্থ আর পঞ্চম গেম কি তবে জামান খেলতে চায়? জিজ্ঞাসা করে বাবলি।

আলবত খেলতে চাই আমি! জিততে না পারলে চরম ক্ষতি হয়ে যাবে আমার!

এ কথা শুনে শুনে কৌতুকে হো-হো করে হেসে ওঠে বাবলি। একটু চুপ থেকে ম্রিয়মাণ বাবলি জামানকে বলে: তাহলে এবার জামান ভাই বলেন, আপনার 'হতে পারত প্রেমিকা'-কে কেন এখন চুমু খেতে চান আপনি? দু যুগ আগে সেই মেয়েটাকে আপনি কোনো ফাঁকা ঘরে অথবা অন্ধকার বারান্দায় অথবা ছাদে পানির ট্যাংকের কোনায় জড়িয়ে ধরতেন, চুমু খেতেন, আর যা যা করতে মন চাইত তা করতেন! কেউ তো তখন আপনাকে বাধা দিত না, খুশিই হতো বরং। সেটা করেননি কেন আপনি?

ভুল হয়ে গেছে বাবলি!

এখন সেই কিশোরী বা তরুণীর পায়ে পায়ে শেকড় গজিয়েছে কত, তা কি জানে কেউ? দু যুগ উজিয়ে গিয়ে অল্প বয়সের মতো করে আকাশে রংধনু আঁকতে যাওয়া কি সহজ কোনো কাজ, বলেন!

'চেষ্টা করেই দেখি না!' একটু থেমে বাবলিকে অনুরোধ জানায় জামান।

'তা আর হয় না জামান ভাই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবলি উত্তর দেয়। তার মুখমণ্ডল নিচুই হয়ে থাকে—সে আর জামানের চোখে তাকায় না।

ম্রিয়মাণ বাবলির সামনে চুপ করে বসে থাকে জামান। সে দেখে, গেল ক'দিনে এই প্রথম মন মরে গেল উচ্ছল মেয়েটার! এ কথা তো জামানকে মানতেই হবে, বাবলির অপারগতা তো আসলে স্বাভাবিক! তাই বলে কি মিইয়ে যেতে হবে নাকি বাবলিকে? জামানকে সে চুমু খেতে না দিলেই জামানের খুব বড় ক্ষতিটা হবে কি? তা মনে হয় না জামানের। তাছাড়া বাবলির জন্য কি তার দরদটুকু মিলিয়ে যাবে তখন? মোটেই তা নয়। পরস্পরের সীমাবদ্ধতাকে তো শেষ অবধি মেনে নিতেই হয়! এসব ভাবতে ভাবতে বাবলির অধোমুখ দেখতে ভালো লাগে না জামানের। সে বুঝে উঠতে পারে না যে কী করলে ভালো লাগবে বাবলির! তাকে তো জিজ্ঞাসাও করা যাচ্ছে না এত কিছু! সেই ছোটবেলার সহজ সম্পর্কটা এখন আর অবশিষ্ট নেই!

'আরেক রাউন্ড দাবা খেলবেন?' বেশ খানিকক্ষণ পরে জামানকে প্রস্তাব দেয় বাবলি।

'এখন? কালকে খেললে হয় না?' হকচকিত হয়ে জামান উত্তর দেয়।

'না! আজই ফোর্থ রাউন্ড গেম খেলতে হবে।'

'আমার কিন্তু আর এনার্জি নেই আজকে! তুমি যখন বলছ, তখন খেলব নিশ্চয়।'

'চা খাবেন?'

'আচ্ছা, খাব।'

'রাতে খেয়ে যাবেন? খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা আপনার প্রিয় খাবার ছিল!'

'নাহ্! আজ আর খাব না কিছু। তাহলে বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।'

চা বানিয়ে দিয়ে যায় কেউ একজন। চা খেতে খেতে ফের দাবার বোর্ড সাজায় বাবলি। জামানকে সে বলে সাদা গুটির বাহিনী নিতে। তাহলে সুবিধা এই যে জামান ফার্স্ট মুভারস অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায়! মন্দ কী?

প্রথম চালটা দেয় জামান—সে তার সাদা রাজার সামনের বোড়েটাকে দু ঘর সামনে ঠেলে দেয়। প্রত্যুত্তরে বাবলি তার কালো রাজার সামনের বোড়েটাকে এগিয়ে দেয় দু কদম। এবার একই ফাইলে দুপক্ষের দুটো বোড়ে দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। তারা কেউ কাউকে খেতে পারবে না, কেননা বোড়েরা কাটাকুটি করে কোনাকুনিভাবে।

জামান ভাবতে বসে, এবার তবে কোন চাল দেয়া যাবে! এটুকু সে স্থির করেই নিয়েছে, তাকে খুবই আক্রমণাত্মক গেম খেলতে হবে এ যাত্রায়। নইলে সে বাবলির বিরুদ্ধে ম্যাচে জিততে পারবে না। জিততেই তো সে চায়!

জামানের ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটে যখন খুব নিচু স্বরে বাবলি তাকে বলে, দু যুগ আগের সেই মেয়েটাকে নিয়ে নিশ্চয় অনেক গল্প জমে রয়েছে আপনার কাছে! তেমন একটা গল্প শোনান আমাকে যে গল্পটা আপনি কখনই ভোলেন না।

জামান বলে, তেমন একটা অবিস্মরণীয় গল্প আছে বটে। কিন্তু সেটা একটা অনুভূতির গল্পমাত্র, যদিও সুন্দর একটা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে অনুভূতিটার জন্ম হয়েছিল। অনুভূতিই সেখানে মুখ্য ছিল বলে সে ঘটনাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়া অসম্ভব!

'অতশত বুঝি না! আপনে চেষ্টা করেই দেখেন না!' জামানকে অনুরোধ জানায় বাবলি।

জামান গল্প বলতে শুরু করে: সেই মেয়েটার নাম 'ব' অক্ষর দিয়ে শুরু। মেয়েটা তখন কেবল ভর্তি হয়েছে মহিলা কলেজে। একদিন দুপুর দুটোর দিকে লাল রঙের একটা বাসায় মেয়েটার বড় বোন খুকুমণিকে খুঁজতে গিয়েছিল জামান। বারান্দার কোনার রান্নাঘরে ঢুকে জামান খুকুমণি আর ব-আদ্যক্ষরের মেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,

'খুকুমণি কোথায় চাচি আম্মা?'

চাচি আম্মা উত্তর দিয়েছিল, 'ও তো মিতাদের বাসায় বেড়াতে গেছে। ভেতরে গিয়ে দেখো তো, ও ফিরল কিনা!'

কাজেই বারান্দা থেকে চাচার স্টাডি রুম পার হয়ে জামান এগিয়ে গিয়েছিল খুকুমণির ঘরের দিকে। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। খুকুমণিকে মিনু বউদির বানানো আমসত্ত্ব উপহার দিয়ে চমকে দেবে বলে দরজার কাছাকাছি গিয়ে সে মেঝেতে পা ফেলছিল খুবই সন্তর্পণে। নিঃশব্দে ভেজানো দরজাটা একটু ঠেলতেই স্থাণু হয়ে গেল জামান!

'কেন? কী হয়েছিল তখন?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে বাবলি।

ব-আদ্যক্ষরের সেই দুধে আলতা তরুণী তখন পূর্ণ প্রসারিত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল নগ্ন হয়ে। জলে সিক্ত ছিল তার চুল।

বলেন কী? পুরো নগ্ন!

না, মানে প্যান্টি পরা ছিল মেয়েটার, কচুরিপানা রঙের। তার গুরুভার নিতম্ব যেন প্যান্টিতে আর বন্দি হয়ে থাকতে চাইছিল না! বিস্কিট রঙের একটা ব্রা ঝুলছিল তার বাম হাতে। হয়তোবা ব্রা পরার আগে দীর্ঘাঙ্গিনী নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল আয়নায়—নিজের রূপ দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ থেকে তখন মেয়েটার স্ফীত বক্ষ, সুরম্য নাভি আর মেদহীন তলপেটের প্রতিবিম্বের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল জামান।

'ছি! ছি! একজন মেয়ের নগ্নতা দেখলেন আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে?' জামানকে প্রশ্ন করে অস্বস্তিতে পড়ে যাওয়া বাবলি।

জামান উত্তর দেয়, লুকিয়ে না দেখলে কি আর ব-আদ্যক্ষরের মেয়েটা কোনো দিন তাকে তার ফুল্লিত শরীর দেখতে দিত নাকি?

এটাকে বলে—কারো প্রাইভেসির ওপরে হামলা করা! বুঝলেন তো?

সত্যিই তাই! সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত। হুট করে আমি দৃশ্যপটের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম সেদিন! সেখানে তো আমার থাকার কথা ছিল না!

তো জামান বলে, সেই প্রথম ব-আদ্যক্ষরের সুন্দর তরুণীকে চুমু খেতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। গল্পটার শেষ এখানেই।

'তো তখনই তাকে চুমু খেলেই পারতেন?' নিজের লজ্জাকে সামলে নিয়ে প্রশ্নটা করে বসে বাবলি; বলেই মিটিমিটি হাসতে থাকে।

'ভুলই হয়েছে বাবলি!' আবারো একই উত্তর।

'এবার তবে বোঝা গেল, মেয়েটাকে কখনই আপনার চুমু খাওয়া হয়নি বলে সেই না পাওয়াটা এখনো রয়ে গেছে আপনার মনের ভেতরে। তাই তো?' ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করে গম্ভীর বাবলি।

'আসলেই তাই!' ছোট করে উত্তর দেয় জামান।

'তার মানে, একবার চুমু খাওয়া হলেই আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে? ব্যাপারটা তো এমন মনে হচ্ছে না যে মেয়েটাকে ভালোবাসতেন আপনি!' মুচকি হাসিতে জামানকে জিজ্ঞাসা করে বাবলি।

জামান বুঝতে পারে যে এবার তাকে বেকায়দায় ফেলতে যাচ্ছে বাবলি। তাই একটু চুপ হয়ে যায় জামান। খুব বিষণ্ন হয়ে সে মন্তব্য করে, 'ভালোবাসাহীন স্পর্শ আমার জন্য নয় বাবলি!'

'থাক এসব কথা। এবার আপনি আপনার চাল দিন।' একটা ধাক্কা মেরে অন্যমনের জামানকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে বাবলি। ফিরেও আসে জামান। একটু ভেবে সে একটা চাল দেয়—সে তার সাদা ঘোড়াকে তার রাজার দু ঘর সামনে এগিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বাবলি তার কালো ঘোড়াকে আড়াই চালে বসায় তার ডান দিকের হাতিটার সামনে।

'আপনি কি জানেন, আমরা যেভাবে গেমটাকে ওপেন করলাম, সেটাকে বলে স্কচ ওপেনিং?' জামানকে জিজ্ঞাসা করে বাবলি।

সেটা অবশ্য জামান জানত না।

শেষের দিকে গিয়ে, মানে তেইশ নম্বর চালের দিক থেকে, উত্তেজনায় ছেয়ে যায় গেমটা! এবার বোর্ডে জামানের সাদা রাজার কোনাকুনি এক ঘরে দাঁড়িয়ে আছে বাবলির কালো মন্ত্রী; সাদা মন্ত্রী লম্বালম্বিভাবে তিন ঘর দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো রাজার অবস্থান থেকে। রক্ষা এই যে কালো রাজার সামনে পাহারা দিচ্ছে একটা কালো সৈন্য। অর্থাৎ জামানের সাদা রাজাকে কিস্তি মেরে বসেছে বাবলির কালো মন্ত্রী! এবার জামানের চাল দেয়ার পালা। সাদা রাজাকে এখন না সরালে তো আর চলছে না! কাজেই জামান তার সাদা রাজাকে ডানে একঘর সরিয়ে দেয়—বোর্ডের ঠিক শেষ প্রান্তে। প্রত্যুত্তরে বাবলি তার কালো মন্ত্রীকে এক ঘর সামনে নিয়ে যায়। এবার ডাবল কিস্তি খায় জামানের সাদা রাজা—তার দু ঘর বামে তলোয়ার ঘোরাচ্ছে কালো মন্ত্রী আর আর তিন ঘর সামনে একটা কালো নৌকা দাঁত বের করে হাসছে। কাজেই কিস্তি মাত হয়ে গেল চতুর্থ রাউন্ড গেমের। হেরে গেল জামান।

এ রাউন্ডে হেরে যাওয়ায় ম্যাচের ফলাফল দাঁড়াল এমন: বাবলি জিতল তিনটা গেম ও ড্র হলো একটাতে। কাজেই পাঁচ নম্বর গেম খেলার আর প্রয়োজন পড়ছে না তাদের।

বিমূঢ় হয়ে দাবার বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে জামান। তাহলে শেষপর্যন্ত সে বাবলির কাছে হেরেই গেল! সে বুঝতে পারে, পরাজয়টা নির্ধারিতই ছিল আসলে। তবু বাবলির দাবা খেলার প্রস্তাবে তাকে রাজি হতেই হয়েছিল! সে ভেবেছিল, বাবলির মতো পেশাদার টিম মাস্টার যদি কোনো ভুল চালটাল দিয়ে বসে, তবেই সে গেমে জিততে পারবে। সে সম্ভাবনা ছিল বড়জোর পাঁচ শতাংশ। এত কম সম্ভাবনা নিয়ে বাবলির বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে নামতে হয়েছে জামানকে! কেন? বাবলির সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য!

এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে জামান মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে। তার সামনে বসে থাকা বাবলি ধীরে ধীরে তাকে বলছে, 'আপনি যে যুদ্ধের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন, সেটা আমি প্রথম দিন ভাবিইনি, জানেন?'

কোনো উত্তর দেয় না জামান।

'শোনেন জামান ভাই! আপনি চাইলে আমি আপনার সঙ্গে আরেকটা বেস্ট অব ফাইভ ম্যাচ খেলতে পারি।' শুকনো একটা হাসিতে জামানকে প্রস্তাব দেয় বাবলি।

জামান গনগনে চোখে বাবলির দিকে তাকায়, যেন সে এখনই পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে বাবলিকে! জামান বাবলিকে বলে, আবারো দাবা খেলার প্রসঙ্গ উঠছে কেন? জামানকে হারিয়ে আবারো একটা পৈশাচিক আনন্দ নিতে চায় বাবলি? সেটা আর হবে না। জামান তো আর সুপারম্যান নয়—সে খুবই সাধারণ একজন মানুষ যার শৌর্য নাই, বীর্য নাই, চৌকস মস্তিষ্ক নাই, অধ্যবসায়ও নাই। সে তো এ রূঢ় জগতে ঠিকমতো চলেফিরেও বেড়াতে পারে না। আর তাকে কিনা দাবা খেলার মতো কঠিন একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল বাবলি! বাবলি তো জানতই যে জামান তার মতো পেশাদার একজন দাবাড়ুর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। ফলাফল সেটাই হয়েছে—বাবলির চালে জামান ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এমন নিষ্ঠুর একটা পরিস্থিতিতে নিজেকে আর ঠেলে দিতে চায় না জামান।

জামানকে বোঝাতে বসে বাবলি, 'তা মানলাম। কিন্তু আপনি তো জানেন যে দাবা খেলার সময় অনেক অনিশ্চয়তা এসে পড়ে। কাজেই আপনি যে আবারো হারবেন, সেটা তো আর আগেভাগে অনুমান করে নেয়া যায় না! আর তাছাড়া আপনি নিজে ভেবে দেখেন, এখন কি দাবা খেলার সেন্স আপনার ভেতরে বেশি আসেনি?'

'নাহ্! তোমার সঙ্গে কখনই আর দাবা খেলব না আমি। তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর মানুষ। এত নিষ্ঠুর মানুষের সঙ্গে চলা যায় না বাবলি!' এই বলে সোফা থেকে উঠে, দুরদার পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল জামান। রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে নিজেকে শাসাল, 'তোমার শরম করা উচিত এবার!'

তো দিল টুটে গেল, কোনো আওয়াজ উঠল না! অথচ একটা কাচের শিশি খান খান হয়ে ভেঙে গেলে কতই না আওয়াজ ওঠে!

৭. পাথরে পাথরে বাগান

গত মাস চারেক ধরে জামান আর দাবা খেলে না। দাবার যে বোর্ডটা সে কিনেছিল, সেটা সে প্রবল আক্রোশে ফেলে দিয়েছে পথের পাশের জঞ্জালের ভেতরে। সে এখন তারা ক্লাস ফোরে পড়া মেয়ের সঙ্গে অরিগামি নিয়ে ব্যস্ত। রঙিন কাগজ বিভিন্নভাবে ভাঁজ করে তারা সারস পাখি, প্রজাপতি, নৌকা, মাছ, উড়োজাহাজ, বই, ফুল, শেয়াল, কাঠবিড়ালি—এসব বানায়।

কাগজের ভাঁজ শেখার জন্য তারা বইও কিনেছে একটা, এছাড়া ইউটিউবেও ঘুরে বেড়ায় তার দুজন মিলে। অরিগামি নিয়ে বাবা-মেয়ের উদ্দীপনা দেখে জামানের স্ত্রী পম্পা হাসতে হাসতে জামানকে বলে, 'দাবা খেলা গিয়ে এবার তোমার মাথায় নতুন ভূত চাপল! কতদিন চলবে এটা তাই ভাবছি।'

'দেখি না! ভালোই তো লাগছে আমার!' নিজের প্রতিক্রিয়া জানায় জামান।

শান্তিবাগের বাবলির সঙ্গে জামান আর যোগাযোগ করেনি; বাবলিও তাকে মেসেঞ্জারে টেক্সট মেসেজ পাঠায়নি অথবা ফোনও করেনি কখনো। মাঝে মাঝে তারা ফেসবুকে পরস্পরের পোস্টে বিভিন্ন রকমের ইমো বসায় মাত্র। বাবলি প্রায়ই ফেসবুকে নিজের আর তার পরিবারের মানুষজনের ছবি পোস্ট করে। সেসব ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জামান। এই যেমন, পরশুদিনে বাবলি ক'টা ছবি পোস্ট করেছে। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে বঙ্গোপসাগরের বালুকাবেলায় একাকী দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় সবুজ সালোয়ার-কামিজ পরা বাবলি। আরেকটা ছবিতে রৌদ্রোজ্জ্বল সাগরবেলায় দাঁড়িয়ে পুবদিকে তাকিয়ে আছে সে। তার চোখে চশমা। তার মুখমণ্ডলের ওপরে, হলুদাভ শাড়ির ওপরে ঠিকরে পড়েছে সকালের তীব্র রোদ। জ্বলজ্বল করছে বাবলি, যেন আগুন ধরে গেছে সমুদ্রের ধারটায়! তার পায়ে লুটিয়ে পড়ছে বেয়াড়া সব ঢেউ। আরেকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সাগরে হুটোপুটি করছে বাবলি, তার স্বামী আরাফাত আর তাদের দু ছেলে। জামান ভাবে, আসলে সুখী মানুষদের কথাই আলাদা! সাগরবেলায় তোলা তার নিজের এমন কোনো সুন্দর ছবিই নেই। সেটা না হয় গেল, কিন্তু বিপত্তিটা বেধেছে অন্য জায়গায়, বাবলিকে সে আর চিনতে পারছে না! পাবনা শহরের গোপালপুরে, গোবিন্দবাড়ির কাছে, যে একটা শতবর্ষী লাল রঙের একতলা বাসা আছে, সে বাসায় যে মেয়েটা বেড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে আজকের বাবলির কোনো মিল নেই! দূরে চলে যেতে যেতে সবকিছু ভুলে গেছে বাবলি, এমনকি নিজেকেও! জামান নিশ্চিত, এই নির্মম মেয়েটাকে সে কখনই আকাঙ্ক্ষা করেনি!

এর মাঝে একদিন ফেসবুক মেসেঞ্জারে বাবলি একটা ছোট্ট টেক্সট মেসেজ পাঠায়। তাতে লেখা আছে—আমাদের বাসায় চলে আসেন না! অনেকদিন দেখা হয় না আপনার সঙ্গে। চায়ের দাওয়াত রইল। বাবলির আগ্রহের পেছনে কোনো নেতিবাচক কারণ লুকিয়ে আছে কিনা তা নিয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে জামান। এমন তো আবারো ঘটতে পারে যে বাবলি তাকে বলে বসল, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য আপনার যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা মেনে নেব আমি, তবে গুনে গুনে ত্রিশবার আপনাকে বলতে হবে—পাখি পাকা পেঁপে খায়। বাবলির মতো হৃদয়হীন মানুষের পক্ষে এসব নির্মম উৎপীড়ন খুবই সম্ভব, ইতিহাস সেটাই বলে। কাজেই বাবলির টেক্সট মেসেজের কোনো উত্তর করে না জামান। দুদিন পর মেসেঞ্জারে একই অনুরোধ জানিয়ে দ্বিতীয় টেক্সট মেসেজ পাঠায় বাবলি। তারও কোনো সাড়া দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না জামান। পাঁচদিন পরে, এক দুপুরে, ফোন আসে বাবলির—আমাদের বাসায় আসেন না একবার! দাবা খেলবেন আমার সঙ্গে?

নাহ্! জামান আর দাবা খেলাটেলায় আগ্রহী নয়।

বাবলি বলে, 'আচ্ছা! দাবা খেলতে হবে না। চা খেতেই আসেন না হয়!'

অনেক ভেবেচিন্তে বাবলিদের শান্তিবাগের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জামান। তবে সে নিজেকে শর্ত দেয় যে সে আর বাবলির সঙ্গে কোনো হ্যালহ্যাল ক্যালক্যাল করবে না বা তার মিঠা মিঠা কথার ফাঁদেও পড়বে না।

শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় বাবলিদের দোতলার বসার ঘরে বসে চা খায় বাবলি আর জামান। কুশল বিনিময় করতে করতে ভেতরের ঘর থেকে পুরনো একটা অ্যালবাম নিয়ে আসে বাবলি। ছবিগুলোয় আটকে আছে উচ্ছল এক কিশোরী আর সদ্য তরুণীর অবয়ব, যে অবয়বটা জামান হারিয়ে ফেলেছে মেলা আগে; দুই যুগ ধরে সেই অবয়বের টুকরো টুকরো অংশ সে আর খুঁজে পায়নি। বাবলির পুরনো অ্যালবামে একটা ছবিতে দেখা গেল—তাদের পাবনার বাসার বাইরের বারান্দার সিঁড়িতে হালকা গোলাপি কামিজ, সাদা সালোয়ার আর সাদা ওড়না পরে বসে আছে বাবলি। তার বাম হাতের কনুই বসানো নিজের বাম হাঁটুর ওপরে, বাম হাতের করতলের ওপরে সে ছেড়ে রেখেছে তার থুতনি আর বাম গালের ভার, তার কপালে ভেঙে পড়েছে একগাদা চুল। মেয়েটা ঠোঁট টিপে হাসছে। জামান দেখে সেই দু যুগ আগের বাবলি এটা!

বাবলিকে জামান জিজ্ঞাসা করে, 'কে তুলেছিল এই সুন্দর ছবিটা?'

'আমাদের পাড়ার জীবনদা।'

'ও, জীবন স্যানাল? তুমি যখন ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউটে গান গাইতে, জীবন তোমার সঙ্গে তবলা বাজাত।'

'জীবনদা এখন রেডিওর বড় আর্টিস্ট।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে জামান বাবলিকে বলে, সে একটা সিগারেট খেতে চায়, যদি অনুমতি দেয় বাবলি। বাবলি বলে, বেশ তো! তবে ছাদে যাই চলেন। সন্ধ্যা নামাটা দেখা যাবে।

'যে মেঘ করেছে! বৃষ্টি না নামে আবার!' আশঙ্কা প্রকাশ করে জামান।

'তো ভিজলেন! ক্ষতি কী?' হাসতে হাসতে বাবলি বলে।

চুপ করে থাকে জামান। সে নিশ্চুপ হয়ে বাবলির পিছুপিছু সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে পাঁচতলা বাসাটার ছাদে উঠে যায়। ছাদে উঠেই চমৎকৃত হয় সে, তাকে স্বাগত জানাচ্ছে মস্তবড় একটা ছাদবাগান।

'তোমাদের বাগান এটা? নাকি ভাড়াটিয়াদের কারোর?'

'নাহ্! আমি বাগান করি, নিজের হাতে।'

ছাদের পশ্চিম কোনায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় জামান। তারপর সে চুপচাপ সিগারেট টানতে টানতে আলো জ্বলে উঠতে থাকা শহরটার চেহারা দেখতে বসে।

তার পাশে দাঁড়িয়ে বাবলি বলে, মেঘ গুড়গুড় করছে, আকাশ ভেঙে জাগছে বিদ্যুতের সরু রেখা, শীতল বাতাস জাগছে। এর মানে এই যে বৃষ্টি নামবে এখনই!

বাবলির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। জামানের সিগারেট তখনো শেষ হয়নি। পানি লাগলে নির্ঘাৎ নিভে যাবে সিগারেটটা। জামান ভাবে, বিপদ হবে তাহলে কেননা তার পকেটে আর সিগারেট নেই। তাই সে জ্বলন্ত সিগারেটটা বাঁচাতে এক দৌড়ে ছাদের উত্তর পশ্চিমের শেডে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দৌড়াতে দৌড়াতে শেডে ঢুকে পড়ে বাবলিও। অ্যাসবেসটোসের ছাদ দেয়া শেডের আশপাশে ফুটেছে মালতীলতা, অ্যারোমেটি জুঁই, রজনীগন্ধা, বেলি, টগর, কামিনী, পারুল আর নানান ধরনের লিলি। কী আশ্চর্য! বাবলির মতো একজন হৃদয়হীন মানুষ কিনা এ পৃথিবীতে ফুল ফোটাচ্ছে! তার নির্মমতার সঙ্গে তো এসব কুসুম যায় না!

সিগারেট শেষ হয়ে যায় জামানের। বৃষ্টির গতিক বাড়ে, ঝাপটা মারে জোর বাতাস। পাশে দাঁড়ানো বাবলি তার ডান কানের কাছে ঠোঁট এনে জোরে জোরে বলে, 'ঢাকার নিউমার্কেট থেকে আপনি আমাকে বাদামি রেক্সিনে মোড়ানো একটা ডায়েরি কিনে দিয়েছিলেন—মনে আছে?

'ও হ্যাঁ! তুমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছ কেবল। ভুলেই তো গিয়েছিলাম সে কথা।' অপরাধবোধ নিয়ে একটু হেসে উত্তর করে জামান।

সেই ডায়েরি কোথায় রেখেছে বাবলি? বাবলি জামানকে জানায়, ওটা পাবনার বাসায়, আম্মার ঘরের একটা ট্রাঙ্কের ভেতরে রাখা আছে। কখনো সুযোগ ঘটলে ডায়েরিটা জামানকে দেখাবে বাবলি।

'কী লিখতে তুমি ডায়েরিতে? বলা যাবে?' ঝড়বাদলের জোর আওয়াজের ভেতরে বাবলির কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে জামান। বাবলির চুল থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠে এসে দখল করে নেয় জামানের অস্তিত্ব।

আহা! কী সুন্দর গন্ধ বাবলির চুলে! দু যুগ আগে বাবলির শরীরের গন্ধ সে কেন নিতে চায়নি? ওর ঘামের গন্ধ কেমন—বুকের ভাঁজের? তলপেটের? নাভির? কে জানে?

জামানকে বাবলি বলে, সেই দু যুগ আগে ডায়েরিতে সে একটা গল্প লিখতে শুরু করেছিল। গল্পটা আর শেষ করা হয়নি। সেখানে এমন এক ঝড়ো সন্ধ্যার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল—পাবনা শহরের গোপালপুরের একতলা লাল বাসাটার সিঁড়িঘরে দাঁড়িয়ে তুমুল বৃষ্টি দেখছে একজন তরুণ আর একজন তরুণী।

একটু চুপ থেকে জামান বাবলিকে জিজ্ঞাসা করে, শ্রাবণের কালো মেঘ আর দিগ্বিদিক বৃষ্টির ছাঁটে কি অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল সিঁড়িঘর? বিদ্যুচ্চমকে কি তারা পরস্পরের চোখে তাকিয়ে ছিল তখন?

বাবলি বলে, সেই গল্পটাই তো সে বলতে চায় জামানকে! মেলাদিন ধরে বুকের গুমটিতে গল্পটাকে কবর দিয়ে রেখেছে সে।

গল্পটা বলতে শুরু করে বাবলি।

[কথাসাহিত্যিক ফয়জুল ইসলাম ২১ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। সিন্ধুরুট ঈদ সংখ্যায় তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। তার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা। —শা.অ.]

কার্ড এক ছাড় অনেক

ঈদের আনন্দ পরিপূর্ণ হোক ওয়ান ব্যাংক কার্ডের সাথে!

Bay · ARTISAN · BELMONTE FABRICS LTD · অরণ্য সজ্জনস · বাংলার মেলা · দিশাল · নিয়ন · নগরদোলা Nogordola · রঙ বাংলাদেশ · সাদাকালো SADAKALO · সৃষ্টি SRISHTY · Ecstasy · GENTLE PARK · FOREIGN BRANDS · le reve · MBRELLA · MYTH · noir · prem's collections · sailor · SaRa · VIVA CREATIONS · Ascott Palace Dhaka · Ascott The Residence Dhaka · Best Western PLUS Maple Leaf · CANARY PARK · EMPYREAN™ HOTEL · Grand Palace · HOTEL BENGAL BLUEBERRY · HOTEL SARINA · Lakeshore Heights · LA VINCI HOTEL · OMNI RESIDENCY stay in comfort · PEARL HOTEL · Platinum Hotels · THE RAINTREE DHAKA · THE WAY DHAKA

*শর্ত প্রযোজ্য

প্রধান কার্যালয়ঃ এইচআরসি ভবন, ৪৬ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন: + ৮৮ ০২ ৫৫০১২৫০৫, ফ্যাক্স: + ৮৮ ০২ ৫৫০১২৫১৬
ক্লিক: www.onebank.com.bd কল সেন্টার: ১৬২৬৯

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড

অগোচর

নাহার মনিকা

তানিশা নিখোঁজ!

এই অতিক্রান্ত দুপুরের আগে এমন কিছুর সম্ভাবনা ওরা ভাবতে পারেনি।

বাসি ছাইয়ের মতো তন্ময়ের মুখ, হাঁটুর ওপর কনুই রেখে ফুডকোর্টের চেয়ারে উবু হয়ে বসে থেকে থেকে নিজের চুল মুঠি করে টানছে, তারপর সোজা হয়ে বসে নিজের সন্দিগ্ধ চোখ ধারালো করে দেখতে চেষ্টা করছে, বোনকে কোথাও দেখা যায় কিনা।

সবগুলো টেবিল ভর্তি মানুষের সরগরম আওয়াজের ভেতর তন্ময়ের সামনে বসে নায়লা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। অপরাধবোধ প্রবল জ্বরের মতো জাপ্টে ধরছে। ২১ বছর বয়সী বোনকে খুঁজে পাওয়া না গেলে তার পিঠেপিঠি ছোট ভাইকে কী বলা যায়! কয়েক মিনিটের জন্য হলেও কেন তানিশাকে একা ছাড়ল সে?

কোত্থেকে যেন একটা মাছি উড়ে এসে টেবিলের ওপরে বসল, হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে নায়লার মনে হচ্ছে, একে উড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতাও তার নেই।

কটা চোখের মণি, লালচে চুল, দিঘল গড়ন আর জিন্স-ফতুয়া বাদ দিলেও তানিশার সামান্য ঘাড় কাত করে হাঁটার মধ্যে দলছুটপনা আছে, বেশির ভাগ মানুষ ওকে দ্বিতীয়বার ঘুরে দেখেছে। সারা দিনে তেমন করে দেখা মানুষের মুখ মনে করতে চাইল নায়লা, কিন্তু হিংস্র, কুটিল, দুরভিসন্ধিময় কারো মুখ ভেসে উঠছে না। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে কোথায় নাই হয়ে যেতে পারে মেয়েটা!

ছোট চাচার ছেলেমেয়ে তানিশা-তন্ময় দেশে এসেছে আজকে তিনদিন। ওদের ঘোরাঘুরি আর কেনাকাটায় সারাক্ষণ সঙ্গে থাকতে বললে প্রথমে না করতে চেয়েছিল নায়লা। পরে ভেবে দেখল, নানা কারণে ছোট চাচাকে মানা করা যায় না। ছাদের যে ফ্ল্যাটে সে বিনাভাড়ায় থাকে, তা ছোট চাচার। বাবার চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে কিছু টাকা আসে তার কাছ থেকে।

সুতরাং ঘোরাঘুরিতে অনীহা থাকলেও নিজেকে ঠেলাধাক্কা দিয়ে রাজি করিয়েছে সে। গত কিছুদিন থেকে অবশ্য নিজেকে একটু বাহিরমুখী করতেও চাইছিল। ছুতো হিসেবে চাচাতো ভাইবোন সামনে এসে গেল।

তানিশারা এলে নিজের দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে নিচতলায় বাবার কাছে শিফট করেছিল। বাবার ঘরের সোফার হাতলে, টিভির স্ক্রিনের অবষণ্ণতায় কিছুক্ষণ থাকলে হাঁপ ধরে যায় ওর।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তবু নিজেকে জোর করে উঠিয়ে ওপরে এসেছিল। তানিশা-তন্ময়কে নিয়ে বেরোতে হবে।

ছাদে বড় দুটো ঘর, বাথরুম, সামনে ছাদে ফুলের বাগান দেখে তানিশা উচ্ছ্বসিত ছিল—'নায়াপু, ইউ লিভ ইন এ স্প্লেন্ডিড পেন্টহাউজ! রেন্ট অব দিস কাইন্ড ইন টরন্টো ক্যান বি মিনিমাম থ্রি থাউজ্যান্ড ডলার!'

'নো, অ্যাট লিস্ট ফোর'—তন্ময় গম্ভীর মুখে ওর মতামত দিয়েছে।

এই ছাদবাগান নায়লার নিশ্বাস নেয়ার জায়গা। অজস্র, বেলি, চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে টবে এমনকি কামিনী আর শিউলী ফুলের গাছও

লাগিয়েছে সে। ফুলের গন্ধে ইট-কংক্রিটের শহরেও এত প্রজাপতি আর পাখি উড়ে এসে বসে! দিন-রাতের স্রোতে ভেতরের তরঙ্গহীন শূন্যতা উড়িয়ে দিতে দিতে নায়লার মনে হয় এই চৌখোপ একান্তই তার। অথচ তার নয়!

নায়লা নাকি ছাদের ফ্ল্যাটটা গিলে ফেলছে, মেজো চাচা বলে। ২৪ ঘণ্টায় গুনে ঘণ্টা দুয়েক সময় নিচে ওর বাবার সঙ্গে কাটায়, তাও ভেঙে ভেঙে। দরকার শেষ হলেই দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে ফিরে আসে। ছাদের চাবি সহজে কাউকে দিতে চায় না। এ নিয়ে মেজো চাচার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা কম হয়নি।

তানিশাদের প্রশংসা শুনে গাল ভরে হাসলেও বুকের মধ্যে একটু খচখচ করেছে। হঠাৎ মনে হচ্ছিল, চেয়ে বসবে না তো! থেকে যাবে না তো!

পরক্ষণেই অবশ্য মনে মনে হেসেছে। এ দুজন তাজা লাউডগার মতো স্পর্শকাতর অথচ সহজ।

জেটল্যাগে চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে বলে দুজনে অ্যালার্ম দিয়ে সকাল ৯টার মধ্যে উঠেছিল। জোর করে ঘুম থেকে উঠে পড়া নাকি এর মহৌষধ। মেঝেতে ওদের আধখোলা স্যুটকেস। টেবিলে অর্ধেক পড়ে উল্টে রাখা বই, বিমানযাত্রায় পড়তে পড়তে এসেছে। ওপরে এসে চোখ পড়েছিল নায়লার। কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসে, ওর শখ কী, এসব নিয়ে গল্প করার মতো আলস্যভরা সময় সকালবেলা ছিল না। বরং দুই ভাইবোনের ইংরেজি কথোপকথনে আরবি বাক্য এসে পড়ায় কান খাড়া হয়েছিল।

ছোট চাচা তার মরোক্কান সহকর্মীকে বিয়ে করেছিল। মোনা সালহি নামের এ নারী যে কত চালবাজ, চাচাকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে, সে কথা শুনতে শুনতে তার ছবির সঙ্গে সেসব মেলাতে মেলাতে দাদির কাছ থেকে বিকালের নাশতা খেয়েছে নায়লা। চাচার কাছ থেকে বাংলা শিখে দাদির সঙ্গে ফোনে টুকটাক কথাও বলেছেন মোনা চাচি। তার উচ্চারণ নিয়ে হাসাহাসি হতো। চাচার নিয়ে যাওয়া শীতলপাটিকে বলতেন শীতলবার্টি। পরে জানা গেল যে তার মাতৃভাষা আরবি, যেখানে 'প' বর্ণ নেই। আরবিতে কথা বলতে পারে শুনে অবশ্য দাদির মন নরম হয়েছিল। তবে অত দূরে থাকা পুত্রবধূর প্রতি মন নরম হলেই বা কী!

দুই সন্তান স্কুলে যাওয়া শুরু করলে মোনা একদিন তাদের রেখে রাবাতে বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে আর ছোট চাচার সঙ্গে থাকেনি। শোনা কথা, সে নাকি তার হাইস্কুলের প্রেমিককে ফিরে পেয়েছিল। ছেলেমেয়েরা কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো এক সপ্তাহ বাবা, পরের সপ্তাহ মায়ের কাছে থেকে নিজেদের ১৮ বছর পার করেছে।

ইত্যবসরে এক ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক ছোট চাচার দীর্ঘ বিমানযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

যদিও ওদের একা কোথাও যাওয়ার কথা না, তবু গতকাল সন্ধ্যায় তানিশার ফোনে একটা গ্রামীণের সিম ঢুকিয়ে দিয়েছিল নায়লা। কিন্তু এ মুহূর্তে তা তো তানিশার সঙ্গে নেই! দিনে দুপুরে কোনো অপরাধী চক্রের হাতে পড়ে গেল? কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে রাস্তায় নিয়ে একটা কালো কাচের জানালাওয়ালা মাইক্রোবাসে তুলে মুখে কাপড় গুঁজে দিল—নাহ্! এসব ভাবনা নায়লার রক্ত হিম করে দিচ্ছে।

এখন কার কাছে যাবে, কাকে জানাবে? পারকিনসন্সের রোগী, হাঁটুতে সার্জারি হওয়ায় হাঁটাচলা সীমিত হয়ে পড়া বাবাকে? মেজো চাচাকে? নাকি টরন্টোতে ছোট চাচাকে?

তন্ময় বাবা-মাকে ফোন করতে চাইছে। ঢাকার সময়ে এখন টরন্টোতে ভোর রাত। ওরা নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। নায়লা বলল, 'আরেকটু অপেক্ষা করি।' হয়তো এখনই তানিশা ফিরে আসবে, শুধু শুধু হাজার মাইল দূরে থাকা বাবা-মাকে দুশ্চিন্তায় রাখার কী দরকার।

তানিশার মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ আর ইনস্টাগ্রামে তন্ময় অনেকবার কল করেছে। আঙুলে ঝড় তুলে একের পর এক মেসেজ পাঠিয়েছে। কোনো উত্তর নেই, নো সিন। তবু যদি কোথাও কোনোভাবে লগ-ইন করে!

'আমাদের দূতাবাস থেকে জরুরি সহযোগিতা চাওয়া যায়, লেটস ফাইন্ড দ্য নাম্বার ফ্রম দেয়ার ওয়েবসাইট, লেটস কল অটোয়া'—মাছের ঝাঁকে নাড়া পড়ার মতো হঠাৎ তন্ময় উঠে দাঁড়ায়।

ওরা সকাল ১০টার দিকে বেরিয়েছিল।

উবার ড্রাইভার শপিং মলের উল্টোদিকে কফিশপের সামনে নামিয়ে দিয়েছে। তিনজনই চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়েছে। সাড়ে ১১টায় সিনেমা দেখে, তারপর কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে লেট লাঞ্চ কিংবা আর্লি ডিনার সেরে, কিছু কেনাকাটা করে বাসায় ফিরবে এমন প্ল্যান ছিল।

রাস্তার ওপরে কফি শপ থেকে শপিং মলের সিনেপ্লেক্সে হেঁটে যাওয়া যায়। গরমের দেশের আকাশ-বাতাস সব উপভোগ করবে, কৌতূহলে তানিশার চোখ রাতের হরিণের মতো জ্বলজ্বল করে। বহুদূরে বেড়ে ওঠা কাজিনের সঙ্গে হঠাৎ করে নৈকট্য অনুভব করে নায়লা।

শুক্রবারের ফুটপাতে বেশ ভিড়। সামনে তানিশাকে রেখে, পেছনে তন্ময়ের হাত ধরে ওরা লাইন করে হাঁটে। বিপরীত দিক থেকে আসা নারী-পুরুষ ওদের দেখে, তাদের চোখ প্রথমেই তানিশার ওপরে পড়ছে। গা বাঁচাতে ওদের ফুটপাতের দেয়ালঘেঁষে থাকতে বলে নায়লা। (হায়, তখন যদি সেই মুখগুলো স্ক্যান করে রাখত!)

মলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে হাতের বাঁ দিকে ফুলের দোকানটায় ঢুকতে চায় তানিশা। তাজা ফুল ওর খুব প্রিয়। টরন্টোতে যা দাম! বলতে বলতে অলস পায়ে ঢুকে পড়ে। ভেতরে তেমন কিছু পছন্দ হয় না। শেলফে কয়েকটা লাকি ব্যাম্বু প্লান্ট শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। কিনতে চাইলে তন্ময় বিন বিন করে বোনকে ক্ষ্যাপায়—'হোয়াই আর ইউ সো ক্রেজি অ্যাবউট লাক? আর'ন্ট ইউ অলরেডি লাকি?'

তানিশা উত্তরে চোখ কুঁচকে কী কী যেন বলে, ওদের নিচুলয়ে দ্রুত কণ্ঠস্বরের ইংরেজি অর্ধেক বুঝতে পারে না বলে নায়লা এই ফাঁকে ওর বাবাকে ফোন করে তার ওষুধ খাওয়ার খবর নেয়। কথা শেষ হলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে তানিশার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে ও কাঁদছে! ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে ঝটপট মুছে চোখে চোখ পড়লে হাসল। কিছু জিজ্ঞেস করতে নিলে তানিশা ওর হাত টেনে নেয়। টরন্টোতেও এই বাঁশগাছের চারা পাওয়া যায় বলে না কিনেই বেরিয়ে আসে।

পথে বেলিফুলের মালা হাতে একটি মেয়েশিশু তন্ময়কে পাকড়ে ফেলে। ফুলের গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দেয়। ও একবার মেয়েটিকে, আরেকবার নায়লার দিকে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকায়।

'এসবে পারফিউম মেশায় এরা জানো?'—নায়লা বলে।

ভাইবোনের চোখে মেয়েটির জন্য মায়া।

'চাইল্ড লেবার'—বলে আহারে ধরনের শব্দ করে তানিশা।

দুটো মালা নিয়ে একটু বেশি টাকা দেয় নায়লা। তানিশা ফুলের মালা চুলে আটকাতে চায়, কিন্তু সেটা পিছলে নেমে নেমে আসে। ছবি তোলে তিনজন। ফুলের মালা বেচা রুক্ষ চুল, মলিন মেয়েটি ছিল তো সে ছবিতে!

মলের পেছন দিকে সিনেপ্লেক্স ভবনের লিফট। সিনেমা হল আর ফুডকোর্ট চতুর্থ তলায়। পৌঁছাতে পৌঁছাতে সিনেমার সময় হয়ে গেছে। দ্রুত টিকিট কিনে প্রায় দৌড়ে সিটে গিয়ে বসেছিল তিনজন। তখন বিজ্ঞাপন চলছিল। মাঝের সারির কোনার দিকের তিন সিট। তন্ময় ভেতরে ঢুকে গেল, মাঝখানে নায়লা, একদম কিনারের সিটে তানিশা। বিজ্ঞাপনের আওয়াজ গমগমে হলেও কানে অসুবিধা করছে না।

তানিশা তন্ময় কী কী করবে তার একটা লিস্ট পাঠিয়েছে ছোট চাচা।

আগামীকাল পদ্মা সেতু দেখে মাওয়া ঘাটে গিয়ে ইলিশমাছ খাওয়া হবে। পরেরদিন সাভারের স্মৃতিসৌধ আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ছোট চাচা সেখানে অ্যানথ্রোপলজি পড়েছে।

ফতুয়া-শাড়ি-পাঞ্জাবির শপিংয়ের মধ্যে মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে।

সামনের শুক্রবার নায়লাদের গ্রামের বাড়ি যাওয়ার কথা।

দাদি মারা যাওয়ার পর তাদের তিন বাপ-চাচা গ্রামের সম্পত্তি আর রাখতে চায় না। ছোট চাচার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হিসেবে মেজো চাচা বিক্রি করে দেয়ার লোক ঠিক করেছে।

গ্রামের বাড়ি, জমিজমা বিক্রির আগে তানিশা তন্ময় নিজের চোখে দেখে, ছবি-ভিডিও করে বাবার জন্য নিয়ে যাবে। হাজার মাইল দূরে বসে সন্তানকে নিজের শেকড় দেখানোর সাধ পূরণ হবে ছোট চাচার।

ছেলেমেয়েদের বাংলা সিনেমা দেখানো—এটা লিস্টে 'যদি সম্ভব হয়'-এর পাশে লেখা ছিল।

সিনেমার নাম কাজলরেখা। এ চলচ্চিত্র দেখবে ঠিক করে গতরাতে ওদের মৈমনসিংহ গীতিকার কথা বলেছে নায়লা। গল্পটা জানা থাকলে ওদের বুঝতে সুবিধা হবে।

পর্দায় কিশোরী কাজলরেখার নিষ্পাপ অবয়ব ভেসে উঠল, মনোযোগী হতে শুরু করে নায়লা। কতকাল বাদে হলে বসে সিনেমা দেখছে!

সোনালী ব্যাংক পিএলসি

বিশ্বস্ত ও স্মার্ট

দিন রাত ২৪ ঘন্টা Sonali e-wallet আপনার সেবায়

প্রবাসীরাও বিদেশে বসেই Sonali e-wallet এ লেনদেন করতে পারবেন

ডিপিএস জমা করা যায়

সোনালী ব্যাংকের যেকোন একাউন্টে বা ওয়ালেটে টাকা ট্রান্সফার

একাউন্ট থেকে ওয়ালেটে ওয়ালেট থেকে একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার

BEFTN / NPSB / RTGS এর মাধ্যমে যেকোন ব্যাংকের একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার

সোনালী ব্যাংকের যেকোন শাখা ও এটিএম বুথের লোকেশন জানা যায়

Cheque Book এবং Debit Card রিকোয়েস্ট

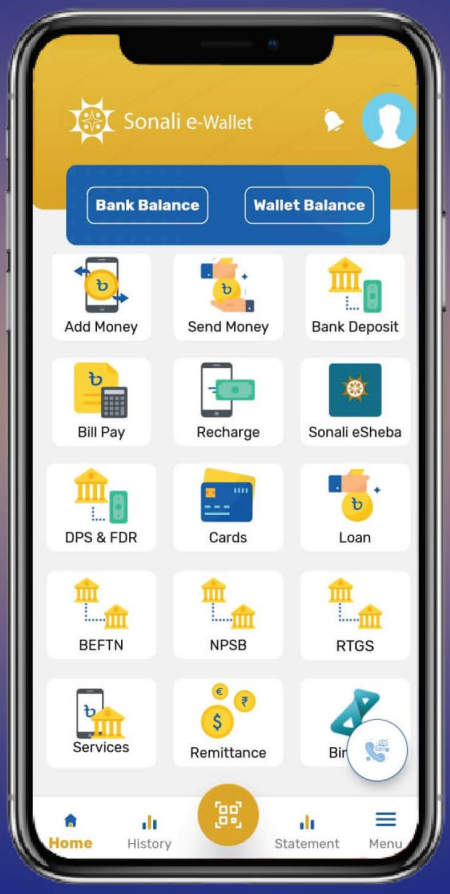

একাউন্ট ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্ট দেখা

কেনাকাটায় QR পেমেন্ট এবং ব্যাংকের যে কোন শাখায় ক্যাশ আউট সুবিধা

ইউটিলিটি বিল-পে

মোবাইল রিচার্জ

সোনালী ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের বিল জমা

DPS এবং FDR একাউন্ট ওপেন

ঘরে বসে ব্যাংকিং সেবা পেতে ডাউনলোড করুন Sonali e-Wallet

Google Play | App Store

২৪/৭ হটলাইন
১৬৬৩৯
+৮৮০৯৬১০০১৬৬৩৯

www.sonalibank.com.bd

Local: 16639 Int'l: +8809610016639

সিটিজেন্স ব্যাংক
আজ · আগামী · একত্রে

প্রতিটি নাগরিকের সঞ্চয়ের শতভাগ সুরক্ষার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের এই পথচলা

প্রতিটি নাগরিকের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচনের প্রতিশ্রুতিতে আমাদের এই প্রয়াস।

CITIZENS মাসিক আয় সংস্থান

- ১ বছর ও ৩ বছর মেয়াদে প্রতি লাখে আকর্ষনীয় মাসিক মুনাফা ১,০০০ টাকা।
- জমাকৃত টাকার বিপরীতে সহজ শর্তে আনুপাতিক হারে ঋণ সুবিধা।

CITIZENS আর্থিক উৎকর্ষতা

- মাসিক জমা ৫০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত।
- জমার মেয়াদ ৩ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত।
- জামানতের বিপরীতে আপনি পাবেন আকর্ষণীয় মুনাফার হার ১১.৫০%।
- জমাকৃত টাকার বিপরীতে সহজ শর্তে আনুপাতিক হারে ঋণ সুবিধা।

CITIZENS মিলিওনিয়ার

- ৩ বছর থেকে ১২ বছর মেয়াদান্তে প্রতি মাসে নির্ধারিত জমাকৃত অর্থের পুঞ্জিভূত উত্তোলনযোগ্য আমানতের পরিমাণ দাড়াবে ১০ লক্ষ টাকায়।
- জমাকৃত টাকার বিপরীতে সহজ শর্তে আনুপাতিক হারে ঋণ সুবিধা।

www.citizensbankbd.com Call 16757

একটু পরে নায়লার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে তানিশা জানাল যে ওর বাথরুমে যেতে হবে। সে চিনবে কিনা, সঙ্গে আসতে হবে কিনা জানতে চাইলে ও হাত নেড়ে আশ্বস্ত করে।

তন্ময় পাশ থেকে বলে ওঠে যে তার বোন কি পপকর্ন আর কোল্ড ড্রিংকস নিয়ে আসতে পারে!

'নিশ্চয়ই! আই ক্যান গো অ্যালোন।' তুমি বরং আমাকে টাকা দাও।

নায়লা ব্যাগ খুলে দুটো ৫০০ টাকার নোট তানিশার হাতে দিয়েছিল। টাকাটা জিন্সের পকেটে ঢুকিয়ে ও শরীর আড়াআড়ি করে চেয়ার ধরে ধরে বের হয়ে সিঁড়িতে নেমে গিয়েছিল।

ততক্ষণে হলের ভেতরের অন্ধকার চোখ-সওয়া হয়ে গেছে, পর্দায় কাজলরেখার বাবা তাকে বন্ধ মন্দিরের ভেতরে রেখে চলে যাচ্ছে। গান শুরু হলো। সারা শরীরে সুচ গাঁথা রাজকুমারকে দেখা যাচ্ছে। 'চোখের ওপর থেকে দুটি মাত্র সুঁই তোলা বাকি, নায়কের বন্ধ চোখ।' কাজলরেখা স্নানে যাচ্ছে, ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করছে। 'কাঁকনদাসীর আগমন। তাকে কংকন দিয়ে কেনা হচ্ছে। ঘটনা বাঁক নিচ্ছে।' পর্দার গল্পে বুঁদ হয়ে পড়ছিল নায়লা।

এক ফাঁকে তন্ময়ের মনোযোগী চোখ আড়চোখে দেখে নেয়। ওর কি ভালো লাগছে? তবে মনে হচ্ছে যে ভালো না লাগলেও সে মুখ ফুটে বলবে না।

বাবার দেয়া টু-ডু লিস্ট দেখে তানিশা বলেছে, 'আব্বু ইজ ওভারডুইং তো মেক আস ভেরি বাঙালি!' শুনে তন্ময় হেসেছে, কিছু বলেনি। দেখতে ছোট চাচার ফটোকপি এ ছেলের বাংলা শব্দ কম, তাই কথা বলতে গিয়ে থেমে যায়।

নায়লার পাশের সিটে তানিশার হাতব্যাগ, ভেতরে ফোন, গান শোনার এয়ারপড, টুকিটাকি প্রসাধনী, হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ছোট্ট শিশি নিয়ে তখনো শান্তভাবে বসে আছে!

আরে, ও তো অনেকক্ষণ হয় বাথরুমে গেছে! এতক্ষণে পপকর্ন আর পানীয় কিনে ফিরে আসার কথা! ও কি এই প্রেক্ষাগৃহ খুঁজে পাচ্ছে না? ওর কি এ সিনেমা দেখা অপছন্দ? এমন কিছু তো বলেনি! তন্ময়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে তানিশার প্রশ্ন শুনে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শুধু বলল, শি শুড বি ফাইন!

তবু নায়লার মনের মধ্যে খচখচ করছে। দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে উঠে গিয়ে দেখবে, নাকি অপেক্ষা করবে, এমন একটা ভাবনার চাপ অবচেতনে নিয়ে বিরতি পর্যন্ত বসে থাকা কঠিন। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়কে উঠতে বললে ও বসে থাকতে চাইল। ফোনের স্ক্রিনে কাজলরেখা নিয়ে ইংরেজি কাগজের রিভিউ দেখিয়ে বলল, 'এটা পড়তে চাই।'

নায়লা একাই বেরিয়ে আসে। টিকেট কাউন্টার ফাঁকা, পাশের ফুড কোর্টে বেশকিছু লোকজন খাচ্ছে, কথা বলছে। দোকানগুলোর সামনে, আশপাশে কোথাও তানিশা নেই।

আচ্ছা, ওর শরীর খারাপ করেনি তো! হয়তো পেট কামড়াচ্ছে, আবার টয়লেটে গেছে! দ্রুতপায়ে সেদিকে যায় নায়লা। ভেতরে ঢুকে জোরে জোরে তানিশার নাম ধরে ডেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে আসে। আবার টিকেট কাউন্টারের ছেলেটির কাছে খোঁজ করে, তানিশার মতো কাউকে, সে জানাল দেখেনি।

প্রায় দৌড়ে দৌড়ে দ্বিতীয়বার ফুডকোর্টের প্রতিটা দোকান, কোনা, চারপাশের দেয়াল, মানুষ বসে থাকা প্রতিটা টেবিলে খোঁজে। বিরতির পর ছবি শুরু হয়ে গেছে। তানিশা কি ভেতরে ফিরে গিয়েছে!

অন্ধকার হলে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেতে খেতে সামলে নেয় নায়লা। পর্দায় তন্ময়ের মনোযোগী চোখ। কাঁকনদাসী কাজলরেখাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, ধর্মমতী শুকপাখি বাতলে দিচ্ছে কাজলরেখার ভাগ্য।

তানিশার সিট খালি।

নায়লা ওর বাহু ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এলে এবার হকচকিয়ে যায় তন্ময়। ওর প্রশ্নবিদ্ধ চোখে তানিশার খোঁজ নেই শুনে অবিশ্বাস।

ও কি কিছু কিনতে দোকানগুলোয় ঢুকেছে? সিনেপ্লেক্সের নিচে অন্য সবতলায় মার্কেট। কাপড়চোপড়, গয়না আরো নানা রকম জিনিস। হতে পারে সেসব দেখে কৌতূহলী হয়ে দোকান থেকে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

তন্ময় বলল, তানিশা মলে ঘুরে ঘুরে শপিং টাইপ না। অনলাইন শপিং করে, দরজা থেকে ডেলিভারি নেয়। তবু হয়তো এখানে এত হরেক পসরা দেখে মন্ত্রমুগ্ধ সে।

তন্ময়কে নিয়ে প্রতিতলায় সব দোকান খুঁজে দেখল নায়লা। অচেনা লোকজনকে ফোনে তোলা তানিশার ছবি দেখাবে কিনা বুঝতে পারছিল না। এমন ঝকঝকে দিনের আলোয় ও কোথায় যাবে! আবারো সিনেমা হলের কাছে ফিরে এল ওরা। ততক্ষণে কাজলরেখা শেষ হয়েছে। নতুন দর্শকদের লাইন।

তানিশাকে খোঁজার অস্থিরতায় বাবাকে ফোন করতে ভুলে গিয়েছিল নায়লা।

আচ্ছা, এমনও কি হতে পারে যে ও বাসায় ফিরে গেছে। কাউকে বিরক্ত করেনি, সোজা ছাদের ঘরে গিয়ে ঘুম দিচ্ছে! আবোলতাবোল ভেবে নিজেকে বেকুব মনে হচ্ছে ওর।

সবাইকে জানাবে কিনা তন্ময়কে জিজ্ঞেস করতে ও বলল, 'তার আগে এই মলের অথরিটিকে ইনফর্ম করা যায় না?'

তাই তো! এতক্ষণ নিজেরা পাগলের মতো তানিশাকে খুঁজেছে, এখানে ম্যানেজমেন্টকে জানালে ওরাও খুঁজত, নিদেনপক্ষে কোনো উপায় বলে দিত।

ম্যানেজারের অফিস পাঁচতলায়। সুনসান, ফাঁকা করিডোর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মনে হচ্ছে, তানিশা হয়তো এ ফ্লোরেই কোথাও আছে। জোরে ডাকলেই বেরিয়ে আসবে।

চাপদাড়ি, চশমা পরা মাঝবয়সী ম্যানেজারের নাম শফিউজ্জামান। পরিচয় দিতে দিতে ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিলেন। সব শুনে ভদ্রলোক টেবিলে পেতে রাখা হাত উঠিয়ে মাথার পেছনে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন—'এই বয়সের মেয়ে কি হারায়? শিশুরা হারায়, বাচ্চা। তাদের জন্য আমরা মাইকিং করি, মলের সেন্ট্রাল সাউন্ড রুম থেকে লাউড স্পিকারে অ্যানাউন্স করি। কেউ একজন তখন বাচ্চাটাকে বাবা-মায়ের কাছে এনে দেয়। এই পর্যন্ত কোনো মিসিং কেস নাই আমাদের এখানে। আপনারা কি চান যে একুশ বছরের যুবতীর নিখোঁজ সংবাদ মাইকিং করি?'

যুবতী শব্দটা নায়লার মাথায় কাঠ খোদাইয়ের ঠুকঠুক শব্দ করতে থাকে।

'থানায় যান, এফআইআর করেন, ওরা খুঁজে বের করবে।'

শফিউজ্জামান তানিশার ছবি দেখতে চাইলেন। তন্ময় ইনস্টাগ্রাম থেকে দেখাল। দুটো ছবিতে ওর পরনে টপ ট্যাং, ডার্ক লিপস্টিক। বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে।

লোকটার চোখের কোনা সামান্য কুঁচকে গেল, ঠোঁটে একটা 'অ' ভঙ্গি দৃশ্যমান হলো।

এসব ছবি দেখিও না—বলতে গিয়ে থেমে গেছে নায়লা, তন্ময়কে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর সময় এটা না।

'দরকার হলে আমি বলে দিতে পারি, থানার ডিউটি অফিসার আমার পরিচিত'—সামনে বসে থাকা নায়লার মাথার ওপর দিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা বলে ভদ্রলোক।

থানায় যাওয়ার কথায় পারদের মতো ভারী আতঙ্ক ঘিরে ধরতে থাকে নায়লাকে। ফোনে ম্যানেজারের দেয়া থানার নম্বর সেভ করতে গিয়ে আঙুল কাঁপে।

শফিউজ্জামান ফোন করতে থাকেন। ওরা চুপচাপ বসে থাকে। দেয়ালে কালো সোনালি কারুকাজ করা কাবা শরিফের বড় কার্পেট ঝোলানো। ঘরের মেঝেটা ঠাণ্ডা। ডিসেম্বরেও কেন এসি চলছে কে জানে! এসির বিজবিজ আওয়াজ হঠাৎ প্রকট হয়ে কানে লাগে।

এক কোণে তিনটা মনিটরে অনেকগুলো ক্যামেরায় মলের বিভিন্ন অংশের চলমান ছবি দেখা যাচ্ছে। ঢোকার মুখে নারী-পুরুষের ভিড়, আনাগোনা। পেছন দিকের কম আলোকিত পথ, কিছু দোকানের অংশ।

সিনেমা হলের ভেতরে না থাক, বাইরে নিশ্চয়ই ক্লোজড সার্কিট টিভি ক্যামেরা আছে!

প্রথমবার ম্যানেজার সাহেব শুনলেন না বলে মনে হলো। আরেকবার অনুরোধ করে নায়লা।

এইবার ভদ্রলোক চোখের দিকে চাইলেন, হাসিমুখে বললেন, 'আপনারা আগে থানায় গিয়ে মামলা করেন, কোর্ট অর্ডার ছাড়া তো আমাদের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর নিয়ম নাই।'

এরপর তন্ময়ের দিকে ফিরে সে কোথায় কী পড়ে এসব আলাপ জুড়ে দিলে নায়লা বোঝে যে লোকটা তাদের কথা সবটা বিশ্বাস করছে না!

তন্ময় দু-এক কথায় জবাব দিচ্ছে। নায়লা উঠে দাঁড়ায়।

'আমার ফোন নম্বর তো রাখলেনই, যেকোন দরকার লাগলে জানাইয়েন আপা। আইসেন আপা।' যেন নায়লা ক্রেতা, কোনো কিছু কিনতে এসে দামে, গুণ-মানে পছন্দ হচ্ছে না বলে ফিরে যাচ্ছে।

পুলিশকে জানানোর আগে মেজো চাচাকে জানানো দরকার। দোতলার ভাড়াটে রুবেল ভাই সদরঘাটে জজ কোর্টের উকিল, তাকেও জিজ্ঞেস করা দরকার।

যত সময় যাচ্ছে নায়লার আত্মবিশ্বাস ততই শুকনো গাছের ছালের মতো পড়ে যাচ্ছে।

তার আগে কি ছোট চাচাকে জানাবে? এবার তন্ময় আপত্তি করে, 'ড্যাডকে এখনই না। হি উইল নট বি হেল্পফুল, মামকে কল করবে, বোথ অব দেম উইল বি ডেভাস্টেটেড'।

বছর খানেক ধরে মেজো চাচার অপটিক নার্ভ কাজ করছে না, দেশী চক্ষুবিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভালো হওয়ার সম্ভাবনা পাঁচ ভাগও না। হাতড়ে হাতড়ে কাজ করে। তবু দেখা হলে হাতে গোনা হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া কথা বলে না নায়লা। মেজো চাচাও না।

ইমতিয়াজের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি তার একদম পছন্দ ছিল না। সম্বন্ধটা নিজের আনা বলে তার এক কথা—'নায়লা কেন একটু অ্যাডজাস্ট করছে না?'

ছোট চাচাকেও ফোন করে হয়রান করেছে—'তুই নায়লাকে বোঝা! ও তো গায়ে ডিভোর্সি ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে!'

'যার কাছে অভিযোগ করছো সে নিজেও তো একই ট্যাগ লাগানো'—ছোট চাচা তাকে বোঝালেও কাজ হয় না। নায়লার বিয়ে ভাঙার হার-জিতে নিজেকে পরাজিত পক্ষ মনে করে মেজো চাচা।

অথচ ইমতিয়াজের সঙ্গে নায়লার পক্ষ-বিপক্ষ কিছু ছিল না। অদৃশ্য সুতোর মতো কিছু একটা মাপে মেলেনি। সেটা যে কী নায়লা নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারে না। ইমতিয়াজের সঙ্গে শোয়া-খাওয়া সবই রুটিন মেনে হতো। ইমতিয়াজ যদি বলত, 'নায়লা আজকে আমরা একটা মঞ্চনাটক দেখি, তুমি সোজা বেইলি রোডে চলে আসো।'

নায়লা গিয়ে যদি দেখে ওর দেরি হচ্ছে, ১০ মিনিট, ২০ মিনিট। নাটক শুরুর সময় হয়ে গেছে। তার রাগ-অভিমান কিছু হতো না। টিকিট কিনে প্রবেশপথের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। ইমতিয়াজ যখন শান্ত ভঙ্গিতে রিকশা থেকে আরো ধীরেসুস্থে ভাড়া দিত, নায়লা কোনো উচাটন অনুভব করত না। যেন সবকিছু অফিস ডেকোরাম, গলা উঁচিয়ে কথা বললে অভদ্রতা হবে। কোনো রকম বেচাল নেই, অভদ্রতা জিরো টলারেন্স। ইমতিয়াজের জন্য সে অথবা তার জন্য ইমতিয়াজ কখনো কোনো কথা জমিয়ে রাখত না।

তারপর, কবে থেকে, কীভাবে যে ছাদের বাগানের মতো বিষয়কে ইমতিয়াজের কাছে খাপছাড়া মনে হতে লাগল! খোলা আকাশ নিয়ে নায়লার ঘোর, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিকস পড়ানো মানুষ, পদার্থবিদ্যার সঙ্গে মহাবিশ্বের যোগসূত্রের মতো বিরাট কিছু নিয়ে ভাবতে পারার মতো লোক নায়লার ভালোবাসার বিষয়গুলো বিষচক্ষে দেখতে শুরু করল।

আট মাস আগে একটা স্কলারশিপ পেয়ে মেলবোর্ন চলে গিয়ে আর ফিরতে চাইছে না ইমতিয়াজ।

মেজো চাচা সম্ভবত ভাতঘুম দিয়ে উঠেছে। অনেকদিন পর ফোনে নায়লার গলা শুনে হকচকিয়ে গেল—'তোর বাবা ঠিক আছে?'

—'তানিশাকে খুঁজে পাচ্ছি না!'

'কারো কেন কোনো ধারণা নেই যে নারী ও শিশু পাচারকারী নেটওয়ার্ক এই সাউথ এশিয়ায় কত শক্তিশালী। এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করা ঠিক হয়নি, এক্ষুনি যেন ছোট চাচাকে ফোনে সব জানায়। যার মেয়ে নিখোঁজ সে জানবে না, এটা হতে পারে না!'—যেন নায়লা নয়, অনুপস্থিত কারো উদ্দেশ্যে এসব বলে মেজো চাচা ফোনে চিৎকার করতে থাকে।

মেজো চাচা এখনই বাবা আর ছোট চাচাকে ফোন করে বলবে, 'যে মেয়ে একটা বিয়ে টিকিয়ে রাখতে পারছে না, বিদেশে থাকা দুজন ছেলেমেয়েকে তোমরা তার জিম্মায় দিয়ে দিয়েছো!'

তার কখনই মনে থাকে না যে নায়লার বয়স ৩৮, একটি বেসরকারি কলেজে ইংরেজি পড়ায়।

শফিউজ্জামানের অফিস থেকে বেরিয়ে লিফটে উঠতেই আবার ফোন বাজল। মেজো চাচা।

—'পেয়েছিস?'

চারতলায় এসে লিফট ভরে গেল মানুষে। নিশ্চুপ লোকজনের মধ্যে চাচার কথা বেশ স্পষ্ট।

ফোন কানে চেপে বেরিয়ে আসে নায়লা। সবকিছু শুনে মুহূর্তকে দীর্ঘ করে দিয়ে চাচা থম ধরে থাকলেন।

—'থানা পুলিশ করবি? দাঁড়া, আমি নাজমুলকে ফোন করি। সাংঘাতিক কথা!'

নাজমুল আংকেল মেজো চাচার ভায়রা, ঢাকা দক্ষিণের কমিশনার। চাচা হাতড়ে হাতড়ে মোবাইলে নম্বর খুঁজছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, তার চিন্তিত কণ্ঠ শুনে শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে আসে নায়লার।

নাজমুল আংকেল পরিবার নিয়ে ঢাকার বাইরে, ছুটিতে। থানায় গিয়ে জিডি করার পরামর্শ দিলেন ফোনে। দোতলার ভাড়াটে রুবেল ভাইকেও ফোনে পাওয়া গেল। এখন দেখা করতে পারবেন না, উনিও থানায় গিয়ে জিডি করতে বললেন।

বিকালবেলার আলো মরে গেছে। শপিং মলের গেটে দাঁড়িয়ে রিকশা খোঁজে নায়লা। মলের উজ্জ্বল আলো আর রাস্তার ট্রাফিক লাইটে নারী পুরুষ শিশুদের মুখে ম্যাড়মেড়ে জন্ডিসের রঙ। একেকজনের একেক চেহারা। সবগুলো মুখ ধরে দেখতে ইচ্ছে করছে। এদের মধ্যে তানিশা থাকলে সবার আগে চোখে পড়ত!

থানার বারান্দায় উঠে তন্ময়কে লুকিয়ে নিজের চোখ চেপে ধরল নায়লা। ছেলেটার চেহারায় এখনো কী হচ্ছে বুঝতে না পারার বিভ্রান্তি।

ডিউটি অফিসারের টেবিলে কম্পিউটার, আধখাওয়া চায়ের কাপ। পেছনে ব্যানারে থানার নাম লেখা। শপিং মল থেকে শফিউজ্জামান সাহেব পাঠিয়েছেন বলায় কোনো হেলদোল হলো না। ভাবলেশহীন মুখে একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন—'এইটা পূরণ করেন। সবকিছু বিস্তারিত লেখেন, সঙ্গে আইডির কপি দেবেন। ফটো থাকলে ফটো দেবেন।'

হাতে বলপয়েন্ট কলম নিয়ে স্থবির হয়ে বসে থাকে নায়লা।

—'কাউকে সন্দেহ হলে সেটাও লিখবেন।'

কাকে সন্দেহ করবে! তাদের, বিশেষ করে তানিশার শত্রু কে? কাউকে না। অথবা কফি শপের ওয়েটার ছেলেটি, শফিউজ্জামান থেকে শুরু করে এ থানার ডিউটি অফিসার সবাইকে সন্দেহ হচ্ছে নায়লার। প্রায় অন্ধ মেজো চাচাকে সন্দেহ হচ্ছে হয়তো—হয়তো তানিশার এই হারিয়ে যাওয়ার পেছনে তার হাত আছে। নিজেকে—নিজেকেও সন্দেহ হচ্ছে। তার চোখের সামনে দিয়ে কী করে মেয়েটা উধাও হয়ে গেল! নিজেকে নিজের লেজ গিলতে শুরু করা সাপের মতো মনে হচ্ছে নায়লার।

পূরণ করা ফর্মে সিল দিয়ে জিডি নম্বর দিয়ে বলা হলো নায়লারা যেন বাসায় ফিরে যায়।

তানিশাকে না নিয়ে বাসায় ফিরে যাবে?—নায়লার বয়সী নারী এই শিশুতোষ প্রশ্ন করে ফেললে পুলিশ অফিসার গম্ভীর হয়ে যায়।

—'চাইলে হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিতে পারেন। আমরাও নেব।'

থানা থেকে বেরিয়ে কানাডিয়ান হাইকমিশনের ইমার্জেন্সি হেল্প ডেস্ক অটোয়ায় কথা বলেছে তন্ময়। ওরা সম্ভবত খুব দ্রুত সরকারি যোগাযোগ করবে।

রিকশা ডেকে ওকে শক্ত করে ধরে বসার কৌশল শেখায় নায়লা।

রিকশা অপেক্ষাকৃত শব্দহীন রাস্তায় এলে তন্ময় আনমনা গলায় বলে, 'নায়াপু, কাজলরেখা মুভিতে ওই যে বার্ড, ধার্মামতী শুকপাখি, যে সব বলতে পারে, সেটা পাওয়ার কোনো উপায় নেই? যে বলতে পারত তান কোথায় আছে?'

হাসপাতালে খোঁজাখুজির কথায় ভড়কে থাকা নায়লা খানিকটা চমকে যায়। পুরো সিনেমা তো তন্ময় দেখেনি। এই পাখির কথা মনে করছে!

—'ওই শুকপাখি তো শুধু গল্প সিনেমায় থাকে তন্ময়!'

রাস্তার দুদিকের জ্বলে থাকা আলো ঠাণ্ডা হাওয়ার ভেতর কাটাকুটি খেলে।

স্পিডব্রেকারে রিকশা ধাক্কা খেলে বসে থাকা শরীরকে খানিকটা আলগা করে উঁচুতে নিতে হয়, সদ্য শেখা এ বিদ্যা তন্ময় ভালোভাবেই প্রয়োগ করে।

তানিশাকে খুঁজতে হাসপাতালেও যেতে হবে, এর ভয়াবহতা ও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে।

গলায় আটকে থাকা তন্ময়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চুপ করে যায় নায়লা।

শয়নং হট্টমন্দির
নিয়াজ মেহেদী

উপন্যাস

শেষ রাতের ট্রেন চলে গেছে অনেকক্ষণ। ভোরের আগে আর কোনো ট্রেন প্লাটফর্মে থামবে না। বাইরে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষমাণ রিকশা ও সিএনজি অটোরিকশাগুলো যাত্রী নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেছে। শুধু দাঁড়িয়ে আছে একটি রিকশা। অন্ধকার, সোডিয়াম বাতির আলোয় মলিন, রাজ্যের আবর্জনা, নেশাখোর ও নেড়ি কুকুরের ভিড়ে সে কার অপেক্ষায় আছে সে-ই ভালো জানে। স্টেশনের অয়েলিং করা দেয়ালঘড়ি বারোটার কাঁটা ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং কম্পার্টমেন্ট থেকে এক তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছরের যুবক একটি ট্রাভেল ব্যাগ হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

যুবকের গায়ের রঙ ফর্সা। মাথাভর্তি ইতালিয়ানদের মতো ঘন কালো চুল। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির কম হবে না। দোহারা শরীরে মেদের লেশমাত্র নেই। পরনে কালো চামড়ার জ্যাকেট, ভেতরে টকটকে লাল সোয়েটার। গলায় ফ্যাশনদুরস্ত ভঙ্গিমায় বাঁধা ধূসর মাফলার। পায়ে সাদা স্নিকার। দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারকয়েক এদিক-সেদিকে তাকিয়ে সে একটিও বাক্য খরচ না করে অপেক্ষমাণ রিকশায় উঠে বসল।

রিকশাওয়ালা স্টেশনের বাইরে এক পানের দোকানে সিগারেট ধরাতে গিয়েছিল। রিকশার দিকে তার ঠিক মনোযোগ ছিল না। ফিরে এসে রিকশার সিটে এক আগন্তুককে বসে থাকতে দেখে তার পিলে চমকে গেল। বুকে একদলা থুতু দিয়ে বলল, 'আপনে দেখি আমারে ডরায়ে দিছেন। কখন আইসা বসলেন?'

যুবক জবাব দিল, 'এই তো। এইমাত্র।'

ঘণ্টাখানেক আগে স্টেশনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেছে। সুবেশী এক প্রৌঢ় পাগল, যে কিনা শহরে একা একা ঘুরত আর বিড়বিড় করে কথা বলত, শেষ ট্রেনে কাটা পড়ে দুই টুকরো হয়ে গেছে। রিকশাওয়ালা পাগলের বীভৎস লাশ দেখেছে। মাঝেমধ্যে সেই ভয়ানক দৃশ্য স্মরণ করে তার শরীর গুলিয়ে উঠছে। পুলিশ লাশ নিয়ে যাওয়ার পর কৌতূহলী মানুষ যার যার গন্তব্যে চলে গেছে। শুধু রেললাইনের ওপর তাজা রক্তটুকু পড়ে আছে। রিকশার সিটে আচমকা এক যাত্রীকে বসে থাকতে দেখে রিকশাওয়ালার মনে সেই ভয় ফিরে এসেছে। বোধহয় নিজেকে সামলানোর জন্য সে জোরের সঙ্গে বলল, 'তা ঠিক আছে। এখন কন, যাবেন কই?'

যুবক ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'শহরে।'

রিকশাওয়ালা আর কোনো কথা না বাড়িয়ে চালকের সিটে উঠে বসল।

শহর কথাটার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। এই জনবহুল দেশে কোনো শহরই নেহাত হেলাফেলা করার নয়। এই শহরের নামের আগেপিছে বিভাগীয় বা মেট্রোপলিটনের মতো বিশেষণ না থাকলেও আকার, জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানে এটি দেশের অন্যতম প্রধান শহর। শুধু পৌর এলাকাতেই পাঁচ লাখের বেশি মানুষ থাকে। সুতরাং, শহরটি কোনো আধা শহর বা গঞ্জ নয় যে শহর বললে রিকশাওয়ালা কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারবে। তারপরও রিকশাওয়ালা কথা না বাড়িয়ে রিকশা চালাতে শুরু করল।

পৌষ মাস মাত্র পড়েছে। শীত বেশ জাঁকিয়ে নেমেছে। কুয়াশা ও হিমশীতল বাতাসের ভয়ে লোকজন যার যার আশ্রয়ে অনেক আগেই ঢুকেছে। বাইরে কেবল নেশাগ্রস্ত মানুষ, পুলিশ ও নেড়ি কুকুরের দল নির্জীবের মতো রাস্তায় পড়ে আছে।

ছিনতাইকারীদের স্বর্গরাজ্য হিসেবে এ শহরের বেশ দুর্নাম আছে। দূরপাল্লার বাস কিংবা ট্রেনের যাত্রীরা অপরাধীদের সহজ শিকার। তাই যুবক বেশ তটস্থ হয়ে ব্যাগের হাতল চেপে বসে আছে। ঠাণ্ডায় তার দুই হাতের আঙুল অবশ হয়ে আসছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাতাসের ঝাপটা থেকে কান দুটো রক্ষার উদ্দেশ্যে সে মাফলারটা গলা থেকে খুলে দুই কান ঢেকে নিল।

রেলস্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব কমপক্ষে পাঁচ কিলোমিটার। বহু বছর আগে ব্রিটিশরা এদেশে রেলপথ বসানোর সময় মূল শহর থেকে দূরে প্রায় পাণ্ডববর্জিত এক গ্রামে রেলস্টেশনের গোড়াপত্তন করেছিল। দেড়শো বছর পরও রেলস্টেশনটি জমজমাট হতে পারেনি। শহরটির বুক চিরে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক সন্ধ্যাশশী নদী আজও শহরের মূল সূত্র হয়ে টিকে আছে। বহু বছর আগেই সন্ধ্যাশশী মরে হেজে গেছে। শহরের শরীরজুড়ে রক্তনালির মতো ছড়িয়ে থাকা অগভীর নর্দমাগুলো সৃষ্টির শুরু থেকে নদীতে গিয়ে মিশেছে। পয়োনিষ্কাশনের দুর্গন্ধময় বর্জ্য ও সেই সঙ্গে আকারে ছোট কিন্তু দূষণে ওস্তাদ কারখানাগুলোর রাসায়নিক বর্জ্যের প্রভাবে সন্ধ্যাশশীর তীরে দম নেয়ার মতো অবস্থাও নেই। তারপরও শহরের মানুষ কী এক অদম্য উৎসাহে নদীকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

জমির প্লটগুলো যত ছোট হচ্ছে, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ততই বাড়ছে মানুষ। আশপাশের আট-দশ জেলা থেকে কী এক অমোঘ আকর্ষণে পঙ্গপালের মতো মানুষ এখানে আসছে। শহরের সামান্য সুবিধাটুকু চেটে খাওয়ার জন্য কী নিষ্ঠুর হাভাতের মতো জীবন তারা বেছে নিচ্ছে। বাচ্চাদের স্কুল, কী সরকারি ছোটখাটো চাকরি, কী খুচরা ব্যবসা, কী অপরাধ করে দুটো পয়সা রোজগারের টানে মানুষ নন্দনগড়ে আসে। নন্দনগড়, হ্যাঁ এটাই শহরটির নাম। শুনে স্বর্গোদ্যান বলে ভ্রম হলেও আসলে এটি মূর্তিমান নরক। নন্দনগড়ের লাখো বাসিন্দার কাছে এ নরকটিই পরম প্রার্থিত। এখানকার জগদ্দল ভিড়ে ঠাসাঠাসি করে এক চিলতে জায়গা জোটাতে পারলে মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে ভাবে, 'আহ, এতদিনে স্রষ্টা মুখ তুলে তাকিয়েছে।' অথচ তাদের ফেলে আসা গ্রামের বাড়ির উঠোনে তখন পুরু ধুলোর আস্তর জমা হয়। পূর্বপুরুষের কবর আগাছায় ভরে যায়।

রিকশাওয়ালা বয়সে তরুণ। বয়স বাইশ কি তেইশ। পরনে সস্তা জিন্সের প্যান্ট, তার ওপরে ইংরেজি ফন্টে লেখা 'পাগলু।' ঊর্ধ্বাঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা এক ওভারকোট। কানে ইয়ারফোনের মতো হাইলাইটার পেন রঙের লেডিজ কানটুপি। টুপিটার লোমশ কেশরগুচ্ছের জন্য যুবকের মনে হলো, ছেলেটা দুই কানে শিরীষ ফুল গুঁজেছে।

তরুণটি আকারে ছোটখাটো ও স্বাস্থ্যে সরু বলে বয়সের তুলনায় তাকে অনেক কমবয়সী লাগে। নন্দনগড়ের রাস্তায় রাতে বেরিয়ে কমবয়সী দেখানোর মতো দুর্ভাগ্যের আর কিছু নেই। মতলববাজরা সহজেই টার্গেট করে ফেলে। বোধহয় এ কারণে, চেহারায় ভারিক্কি ভাব আনার জন্য ছেলেটা ঠোঁটের ওপর চিকন গোঁফ রেখেছে। সিগারেট খাওয়ার সময় সে কায়দা করে সিগারেট টানে যেন মানুষ তাকে সমীহের চোখে দেখে।

রিকশা চলতে চলতে গলাকাটার মোড়ে আসে। কুয়াশায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। স্ট্রিট লাইটগুলো দুষ্কৃতকারীরা ঢিল ছুড়ে ভেঙে রেখেছে যাতে ছিনতাই করতে সুবিধা হয়। এখানে রাস্তার দু'পাশে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের জায়গা। বীজ উৎপাদন ও মজুদের কাজে ব্যবহার হয় বলে লোকজনের বসতি এখানে নেই। মাঝে কিছু হতভাগ্য মানুষের গলাকাটা লাশ এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে নন্দনগড়ের রসিক মানুষ নাম দিয়েছিল গলাকাটার মোড়। বন্দুকযুদ্ধে কয়েকজন ছিনতাইকারী নিহত হওয়ার পর গলাকাটা বন্ধ হলেও নামটি আর পরিবর্তন করা হয়নি।

স্থানীয় থানা এখানে নিয়মিত পাহারা বসায়। আজ তাদেরও দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার, কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে যুবক অস্বস্তি বোধ করল। সে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে পুলিশ আর টহল দেয় না?'

রিকশাওয়ালা যাত্রীর গলায় আতঙ্কের ছায়া দেখে মুচকি হেসে বলল, 'যে শীত নামছে হ্যারা কী আর রাস্তায় আছে? দেখেন গিয়া বাড়িতে লেপের তলায় সান্ধাইছে না হয় কুনোহানে আগুন জ্বালাইয়া তাপাইতাছে।'

রাস্তার দুইপাশে বড় বড় রেইনট্রি, গগন শিরীষ, দেবদারু ও শিশু গাছগুলো কালের সাক্ষী হয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে। পুরনো গাছের কোটর থেকে উঁ উঁ করে ডাকছে লক্ষ্মীপ্যাঁচা। নিশাচর পাখিদের ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনে কাঁপন জাগছে মনে। এই বুঝি ঝোপের আড়াল থেকে টিপ চাকু হাতে ছিনতাইকারী বেরিয়ে আসবে। মালপত্র তো নেবেই, যাওয়ার সময় গলায় পোঁচ দিয়ে মেরেও ফেলবে।

এরই মাঝে প্যাডেল চাপতে গিয়ে খট করে রিকশার চেইন পড়ে গেল। যাত্রীর শরীর অজানা শঙ্কায় শক্ত হয়ে উঠল। সে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কী হলো?'

রিকশাওয়ালা হেসে বলল, 'ডরাইয়েন না। চেইন পড়ছে মাত্র। এটু ঠিক কইরা আসি? কেমন?'

যুবক গাঁট ধরে রিকশায় বসে রইল। কুয়াশায় চারপাশে আধিভৌতিক দৃশ্যপট রচিত হয়েছে। গাছগুলো যেন নুয়ে এসেছে রাস্তার ওপর। বকের মতো যেন অপেক্ষা করে আছে অসতর্ক মাছ কখন নাগালে আসবে। আসামাত্র টুপ করে গিলে ফেলবে।

হাওয়া শিরশির করে বইছে। অনাবৃত পেয়ে নাকের ভেতর সুড়সুড়ি দিচ্ছে। হাঁচি হতে চেয়েও হচ্ছে না। উদ্বেগ ও অস্বস্তির মধ্যে রিকশাওয়ালা চেইন নিয়ে খুটখাট করছে। সময়ের কাঁটা যেন ধীরে চলছে। শীতের রাতের আলস্যে সেও বুঁদ হয়ে আছে। রিকশাওয়ালার যেন কোনো তাড়া নেই। যতটা গতি যুবক চাইছে, তার সঙ্গে তাল মেলানোর কোনো ইচ্ছাই যেন তার নেই। ভাড়া বাড়িয়ে নিতে চায়? নাকি সে কারো জন্য অপেক্ষা করছে? এমন কেউ যে এই নিরিবিলি রাস্তায় শিকারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে।

তরুণের দেরি দেখে যুবক বলল, 'কী হলো? এত সময় লাগছে কেন?'

যাত্রীর কণ্ঠে ভয়ের অস্তিত্ব ঠাউরে উঠতে কষ্ট হলো না রিকশাওয়ালার। সে হেসে বলল, 'ক্যান? ডরান?'

যুবক নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল, 'ভয় পাব কেন? তোমার এতক্ষণ সময় লাগছে কেন সেটা বলো?'

রিকশাওয়ালা কোনো জবাব দিল না। আরো কিছুক্ষণ চেইন ধরে খুটখাট করে ফিরে এসে বলল, 'চেইনের ভিত্রে পলিথিন ঢুকছিল। ঘুরতে ঘুরতে এমুন প্যাঁচ লাগছে যে ক্যারাব্যারা লাইগা গেছে গা।'

যাত্রী আর কোনো কথা শুনতে আগ্রহী নয়। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন ঠিক হয়েছে?'

রিকশাওয়ালা কোনো জবাব না দিয়ে আগের মতোই মন্থরগতিতে রিকশা চালাতে শুরু করল। প্রতি প্যাডেলে শীতের আড়মোড়া ভেঙে রিকশা চলছে। কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে শহরের দিকে এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে নীলবাগানের স্ট্রিটলাইট দেখা যাচ্ছে। আলো দেখে যাত্রীর সাহস ফিরে এল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

নীলবাগানে ঢুকতেই দেখা গেল, টহল পুলিশের দল রাস্তার পাশে কাগজ পুড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছে। একলা রিকশা দেখে এক কনস্টেবল হৈ হৈ করে উঠল। তরুণ ইশারা পেয়ে রিকশা থামাল। শুকনোগোছের এক মাঝবয়সী কনস্টেবল একরাশ উৎসাহ নিয়ে রিকশার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এত রাতে কোনো বাতি ছাড়া নির্জন রাস্তায় চলার জন্য প্রথমেই সে রিকশাওয়ালাকে ধমকাল। তারপর ধীরেসুস্থে রিকশার পাদানির কাছে এসে চালকের সিটের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত রাতে কোথায় থেকে আসছেন?'

যুবক জবাব দিল, 'রেলস্টেশন থেকে।'

'কোথায় যাবেন?'

'শহরে।'

কনস্টেবল বাঁ হাতের কনিষ্ঠা আঙুল দিয়ে কান চুলকে বলল, 'এটা কিন্তু আমতলা-জামতলা নয়। এটা নন্দনগড় শহর। এত ছোট জায়গা নয়। ঠিক ঠিক বলেন কোথায় যাবেন?'

'এখনো ঠিক করিনি কোথায় যাব। দেখি কোথায় যাওয়া যায়।'

কনস্টেবলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'ঠিক না করেই চলে এসেছেন? তাও আবার নন্দনগড়ের মতো জায়গায়? ভালো ভালো। তা হাতে কী আছে? ব্যাগ? কী আছে ওখানে?'

এবার যুবকের গলার স্বর কঠোর হলো। সে বলল, 'যা-ই থাকুক না কেন, আপনার কাজে লাগবে এমন কোনো বস্তু নেই।'

কনস্টেবল যাত্রীর ঠোঁটকাটা মন্তব্যে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। সে জোরের সঙ্গে বলল, 'ব্যাগ খুলে দেখান বলছি।'

যাত্রী ট্রাভেল ব্যাগের প্রতিটি চেইন খুলে ব্যাগের আগাপাশতলা দেখাল। লুঙ্গি, গামছা, ডায়েরি, ফোনের চার্জার, চাবির রিং, একখানা ইংরেজি উপন্যাস, টুথব্রাশ, স্যান্ডেল, রেজর, শেভিং জেল, আফটার শেভ লোশন, বডি স্প্রে, চিরুনি ও কয়েকটি জামাকাপড় ছাড়া সন্দেহজনক কিছুই নেই।

কনস্টেবল মাথা নেড়ে বলল, 'আপনাকে দেখে ভদ্রলোক মনে হচ্ছে। আপনি এ শহরে নতুন বলে সাবধান করে দিচ্ছি, রাতের বেলা নন্দনগড় জঙ্গলের চাইতে ভয়ংকর। হিংস্র প্রাণীরা রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। সুযোগ পেলে সবকিছু কেড়ে নিয়ে ঘাড় মটকে মেরে ফেলে। যত দ্রুত পারেন কোনো হোটেলে উঠে যান। রাতের বেলা দরজাও খুলবেন না। আর হ্যাঁ, হোটেল তিলোত্তমায় ওঠার দরকার নেই। ওখানে ভদ্রলোকেরা যায় না।'

শেষ বাক্যটি বলে কনস্টেবল একবার চোখ মেরে যুবককে বিদায় জানিয়ে ফিরে গেল আগুন পোহাতে। পিচ উঠে যাওয়া অমসৃণ, স্পিড ব্রেকার বহুল রাস্তায় চলতে চলতে যুবকের মনে হলো আজকের রাত বিপদ ছাড়া শেষ হওয়ার বোধহয় কোনো চান্সই নেই।

দুই

নীলবাগান থেকে শহরের কাঠামো বোঝা যাচ্ছে। রাস্তার দুইপাশে রুল টানা খাতার মতো একই সমান্তরালে একতলা অসংখ্য দোকানঘর। দুইপাশে দশ-পনেরোটা করে একই ধরনের দোকান। কিছু লেদ মেশিনের, কিছু মেশিন পার্টসের, কিছু লোহা-লক্করের, কিছু ওয়েল্ডিংয়ের আবার কিছু অ্যাকুয়ারিয়াম ও পোষা পাখির দোকান। মনে হয় দোকানদাররা যুক্তি করে একসঙ্গে দোকানগুলো বসিয়েছে। অবশ্য সবগুলো দোকানই এখন বন্ধ। শুধু সোডিয়াম বাতির আলোয় সেগুলোর সাইনবোর্ড পড়া যাচ্ছে।

রাস্তায় আর কোনো মানুষ নেই। দোকানগুলো বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন মানুষের এই রাস্তা ব্যবহারের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এমনকি কোনো রিকশা বা মোটরসাইকেলও চলছে না। শীতল হাওয়া মাঝে মাঝে ঝাপটা মারছে রিকশায়। তারই ভেতর সাঁতার কেটে তরুণ রিকশা চালাচ্ছে। তার পিঠে সওয়ার হয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে যুবক।

কিছুদূরে যাওয়ার পর তরুণ প্রশ্ন করল, 'কই যাইবেন ভাই?'

যুবক কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। সে রিকশাওয়ালার কথা যেন শুনতেই পেল না। কিন্তু রিকশাওয়ালা কিছু একটা বলছে বুঝতে পেরে কান থেকে মাফলার সরিয়ে বলল, 'কিছু বললে?'

'কই যাব ভাই?'

'যাবে? শেফালীর গ্যারেজ চেনো? তিলুপাড়ায়?'

তরুণের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। সে নিঃশব্দে হেসে বলল, 'তাই বলেন। তিলুপাড়ার শেফালীর গ্যারেজ কে না চেনে? অখনি যাইতাছি।'

রিকশাওয়ালার প্যাডেল মারার গতি বেড়ে গেল। গন্তব্য জানতে পেরে হঠাৎ যেন অজানা জোশ তার শরীরে ভর করেছে। শীতের হিমশীতল চুম্বন উপেক্ষা করে বোধহয় শরীর গরম করার উদ্দেশ্যেই সে পুরনো রিকশার প্যাডেলে সর্বোচ্চ বল প্রয়োগ করতে শুরু করল।

তিলুপাড়ায় পৌঁছাতে লাগল পাঁচ মিনিট। এদিকে শহর ঘনবসতিপূর্ণ। বাড়িঘরের অবস্থা শ্রীহীন। এলাকায় একটা সবুজ গাছও আছে কিনা সন্দেহ। নর্দমা উপচে বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গায়ের সঙ্গে গা লাগানো তিন-চারতলা বাড়িগুলো দেখে ভয় হয় সামান্য ভূমিকম্প হলে কেমন দক্ষযজ্ঞ হতে পারে এখানে।

তিলুপাড়ার শেফালীর গ্যারেজ চেনে না এমন কোনো মানুষ বোধহয় নন্দনগড়ে নেই। শেফালী একজন নারী হয়েও গ্যারেজের ব্যবসা করে পুরুষ চালকদের অটোরিকশা ভাড়া দেয়। মফস্বল শহরে এটা নিঃসন্দেহে চমকে যাওয়ার মতো ব্যাপার। তবে শেফালীর পরিচিতি শুধু প্রথাবিরোধী ব্যবসার কারণে নয়, নন্দনগড়ের অন্ধকার জগতের অন্যতম কুশীলব সে। তিলুপাড়ার শ্বাসরুদ্ধকর গলিগুলোতে সে মাদক ব্যবসার বিশাল সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। সেখান থেকে পুরো শহরে পানি বা বিদ্যুৎ বা ডিশের লাইনের মতো মাদক ছড়িয়ে যায়। শেফালী সেই দুর্ধর্ষ নেটওয়ার্কের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী।

তবে শেফালীর খ্যাতির কারণ শুধু এসব নয়, সে নন্দনগড়ে পরিচিতি পেয়েছে তার নারী বাহিনীর কারণে। তিলুপাড়ার অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণে শেফালীর এক থেকে দেড়শো জনের বিশাল নারী বাহিনী আছে। এরা মাদকের চালান আনা-নেয়া, বিপণন ও টাকা-পয়সার পুরো ব্যাপারটাই সতর্কতার সঙ্গে দেখভাল করে। নারী বলে তাদের চেকপোস্টের মুখোমুখি কম হতে হয়। তাছাড়া পুরুষদের যতটা মাদক সেবনের অভ্যাস আছে, মেয়েদের ততটা নেই। তারা ঠাণ্ডা মাথায়, শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করে শেফালীকে নন্দনগড়ের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত করেছে। শেফালীর অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও বাস্তবজ্ঞান একেবারে টইটম্বুর। সে অনুগত নারী বাহিনী ও তার কূটকৌশল মিলিয়ে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে একে একে নন্দনগড় ছাড়া করেছে। যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের জায়গা হয়েছে লাল দালানে। কিংবা সন্ধ্যাশশীর দুর্গন্ধেভরা বুকে তাদের মৃতদেহ চিরদিনের মতো শয্যা নিয়েছে।

তরুণ বলল, 'আমি কিন্তু ভিতরে ঢুকবার পারুম না। হ্যারা পুরুষ মানুষরে ভিতরে যাবার দেয় না। আপনে পাশ নিছেন কি? নাইলে আপনেরেও কিন্তু আটকাইবো।'

যুবক একটু থমকে গিয়ে বলল, 'গ্যারেজে যেতে পাস লাগবে কেন?'

তরুণ হা হা করে হেসে বলল, 'রাইতের বেলা হ্যারা জুয়া খেলতে বহে। হগগলে বেডি মানুষ। ব্যাডা মানুষরে আশেপাশে যাইবার দেয় না। গলির মইদ্যে বেডিরা পাহারা দেয়। পুলিশ কি পুরুষ মানুষ দেখছে তো আটকায় দেয়। ক্যারফা করলে ধইরা লইয়া যায়।'

তরুণ শেষ বাক্যটি বলে কণ্ঠে একরাশ দুঃখ মিশিয়ে। বোঝা গেল, ধৃত পুরুষের পরিণতি ভালো হয় না। যুবক বিস্মিত হয়ে বলল, 'মহিলারা জুয়া বসায়? মহিলারা খেলে?'

তরুণ জোরের সঙ্গে বলল, 'হ। তিলুপাড়ায় এইডাই সিস্টেম। এই যে বেডিরা আইছে হ্যারা কেউ সাধারণ বাড়ির বউ না। হ্যারা এই

বীমা শিল্পে ন্যাশনাল লাইফের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গৌরবময় অর্জন

জাতীয় বীমা দিবস সম্মাননা স্মারক-২০২৪

জাতীয় বীমা দিবস সম্মাননা স্মারক-২০২৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের শীর্ষ করদাতার সম্মাননা

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের শীর্ষ করদাতার সম্মাননা

সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস-সাফা গোল্ড অ্যাওয়ার্ড-২০২৪

সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস-সাফা গোল্ড অ্যাওয়ার্ড-২০২৩

আইসিএবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড-২০২৩

আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড গোল্ড-২০২২

আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড গোল্ড-২০২৩

আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গোল্ড-২০২২

আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড-২০২৩

এফবিবিসিআই বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৩

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য জন্য ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ থেকে ন্যাশনাল লাইফের সিইও মোঃ কাজিম উদ্দিন ও সিএফও প্রবীর চন্দ্র দাস এফসিএ ২৪তম আইসিএবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও আইন-কানুন যথাযথ পরিপালনের জন্য ১৪ নভেম্বর ২০২৪ অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন থেকে ন্যাশনাল লাইফের সিইও মোঃ কাজিম উদ্দিন ও সিএফও প্রবীর চন্দ্র দাস এফসিএ ১৪তম আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড গোল্ড গ্রহণ করেন।

১৯৮৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ন্যাশনাল লাইফের অর্জন

সর্বমোট বিক্রিত বীমা পলিসি	৭০ লক্ষাধিক
সর্বমোট প্রিমিয়াম আয়	১৮,০৪১ কোটি টাকা
লাইফ ফান্ড	৫,৬৯০ কোটি টাকা
বিনিয়োগ	৫,৬২৩ কোটি টাকা
মোট সম্পদ	৬,৩৮৯ কোটি টাকা
সর্বমোট দাবী প্রদান	১০,৬১২ কোটি টাকা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী

শীর্ষ করদাতা প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসি

নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী

ক্রেডিট রেটিং AAA

Chartered Life
Secured Life

ব্যাংক + ইন্স্যুরেন্স = ব্যাংকাস্যুরেন্স
সুরক্ষিত জীবনের অ্যাসুরেন্স

আপনার ও আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক সুরক্ষায় এখন থেকে
ব্যাংকের মাধ্যমেও ক্রয় করতে পারেন চার্টার্ড লাইফ এর পরিকল্প সমূহ

চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ইসলাম টাওয়ার, লেভেল-০৮, ৪৬৪/এইচ, ডি.আই.টি রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২-৫৫১২৮৯৫৭-৮, ফ্যাক্স: ৮৮ ০২-৫৫১২৮৯৫৬
কাস্টমার সার্ভিস: +৮৮০-১৭৭৭-৭৭০৯৯০, ই-মেইল: mail@charteredlifebd.com, ওয়েবঃ www.charteredlifebd.com

নন্দনগড়ের বড় বড় বাড়ির বউ। এগোর স্বামী বড় ব্যবসায়ী, সরকারি অফিসার, রাজনৈতিক নেতা, সুদখোর-ঘুসখোর-মাগীবাজ। বউরে সময় দিবার পারে না বইলা টাকা দিয়ে সামাল দেয়। বেডিরা কী করব? এগো স্বামীরা অন্য মাইয়া নিয়া ফুর্তি করতাছে। মদ খাইতাছে, জুয়া খেলতাছে। হ্যারাও খেলা শুরু করছে। শেফালী এগোর খেলার ব্যবস্থা কইরা দিছে।'

রিকশা একটা গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে একটি পান-বিড়ির দোকান এই মধ্যরাতেও খোলা। দোকানের ভেতরে একজন মাঝবয়সী মহিলা গলা বাড়িয়ে আগন্তুকদের দেখছে। বাইরের বেঞ্চে বসে আছে দুইজন তরুণী। তারা বেঞ্চে বসে পা দোলাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি সরাসরি আগন্তুকের চোখের দিকে।

যুবক বলল, 'তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে? আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। এই যাব আর আসব।'

রিকশাওয়ালার চোখে সন্দেহ ঘন হয়ে উঠল। সে মাথা নেড়ে বলল, 'আমার থাইকা কাজ নাই। ভাড়া দিয়া দেন। আমি যাইগা।'

যুবক আশেপাশে তাকিয়ে একটা পাঁচশো টাকার নোট মানিব্যাগ থেকে বের করে রিকশাওয়ালার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না। গ্যারেজে গিয়ে কিছু কথা বলে চলে আসব। তুমি থাকতে পারবা না? এতরাতে দ্বিতীয় কোনো রিকশা পাব বলেও মনে হচ্ছে না।'

রিকশাওয়ালা তরুণ দোকানের তিন নারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বইতাছি এইহানে। আপনে জলদি কাজ সাইরা আসেন। যদি আইসা আমারে না পান, ধইরা নিবেন ইচ্ছা কইরা যাই নাই। আমারে খেদানো হইছে।'

যুবক মাথা নেড়ে গলির দিকে যাত্রা করল। সে ভেবেছিল দোকানের তিন নারী তাকে আটকাবে। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। তিন নারী যেমন ছিল তেমনি দোকানে বসে রইল। শুধু তাদের দৃষ্টি যুবকের পেছনে আঠার মতো সেঁটে রইল।

গলির মুখ থেকে শেফালীর গ্যারেজে যেতে দুই মিনিটের বেশি সময় লাগে না। যুবক ত্রিশ সেকেন্ড হাঁটার পরই লাল ছাপা কাপড়ের সালোয়ার-কামিজ পরা দুইজন নারী যুবককে ডেকে বলল, 'কই যাইবেন?'

মহিলা দুজন ছোটখাটো শরীরের। গায়ে-মাথায় ঘিয়ে রঙের চাদর দিয়ে ঢাকা। যুবক এদের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা মাত্র মহিলা দুজনের শরীর থেকে চাদর ঝাপ করে খসে পড়ল। তাদের হাতে চকচক করে উঠল উদ্যত কালো পিস্তল। এবারে তাদের একজন হুমকির সুরে বলল, 'ওই খাড়া। প্রশ্ন করলে জবাব দিস না ক্যান?'

যুবক তাদের পিস্তল ধরার ভঙ্গি দেখে সতর্ক হয়ে বলল, 'আমি শেফালী আপার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মহিলারা পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করে বলল, 'কেন? শেফালী আপার লগে কী দরকার?'

যুবক ট্রাভেল ব্যাগটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে বলল, 'সেটা ওনাকেই বলব।'

মহিলাদের মুখে উপহাসের হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। তাদের মধ্যে বেঁটে মহিলাটি দুই কদম সামনে এসে বলল, 'তুই কি পুরুষ মানুষ? নাকি ভেজাল আছে? জানোস না, রাইতের বেলা এই গলিতে পুরুষ মানুষের ঢোকা নিষেধ?'

যুবক তাদের আক্রমণে একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, 'আমি আপনাদের এই নিয়ম জানি না। নন্দনগড়ে আমার থাকা হয় না। বহুদূর থেকে একটা জরুরি কাজে শেফালী আপার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না। আপনারা আমাকে আপার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।'

বেঁটে মহিলাটা পিস্তলের মাজল বিপজ্জনকভাবে ঘুরিয়ে বলল, 'দেখা হইব না। যা ফোট। এহ, কৈথাইকা আইছে চৌধুরী সাহেব, হ্যার কথামতো আপার লগে দেখা করান লাগবো। আপার টাইম আছেনি তোর লগে ফালতু প্যাচাল পাড়নের? দূর হ কইতাছি। নাইলে জান লইয়া ফিইরা যাইতে পারবি না।'

যুবক আপত্তি করতে যাচ্ছিল এমন সময় লম্বা মহিলাটি এসে মাথায় পিস্তল চেপে ধরল। মুখে একটি আওয়াজও না করে যুবকের কাঁধে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। বেঁটে জন বলল, 'এইডা শেফালী আপার এলাকা। ভাবিস না আমরা গুল্লি মারতে ডরামু। তোগো লাইগা সারা শহর খালি আছে। সেখানে রংবাজি কর গিয়া। কিন্তু তিলুপাড়ায় পাও দেয়ার আগে হগগল রং বাইত্তে রাইখা আহিস। এইখানে শুধু শেফালী আপার অর্ডার চলে। বুঝছস?'

যুবক অস্বস্তি নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এমন সময় রাস্তায় আরো দুজন মহিলাকে আসতে দেখা গেল। তারা প্রথম দুজনকে থামার ইশারা করে যুবকের ব্যাগ ও সমস্ত শরীর তন্নতন্ন করে তল্লাশি করল। কুঁচকিতে তল্লাশির সময় একটু বেশিই সময় নিচ্ছিল বলে প্রথম মহিলা দুটি খিলখিল করে হেসে কুটি কুটি হলো। তল্লাশিকারী মহিলা একটা ধমক দিয়ে তাদের চুপ করিয়ে দিল।

আপত্তিকর কিছু না পেয়ে তারা যুবককে সঙ্গে নিয়ে শেফালীর গ্যারেজের দিকে হাঁটা শুরু করল। যুবক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনারা সময়মতো না আসলে ওনারা বোধহয় আমাকে গুলিই করে বসতেন। এত করে বললাম আমি কোনো ঝামেলা করতে আসিনি। কথাটা ওনারা কানেই তুললেন না। আচ্ছা, আমি যে এসেছি আপনারা বুঝলেন কী করে?'

মহিলাদের একজন পিস্তলের নল দিয়ে দু'পাশের দেয়ালের দিকে নির্দেশ করে বলল, 'দেয়ালেরও চোখ আছে।'

যুবক তাকিয়ে দেখল দুইপাশের দেয়ালে কিছুদূর পর পর সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে। সে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

শেফালীর গ্যারেজের সামনে এসে মহিলা দুটো একটা কলিংবেল চাপল। কিছুক্ষণ বাদে পকেট গেট খুলে দুজন মহিলা বেরিয়ে এসে যুবককে সঙ্গে আসার জন্য ইশারা করল।

বাইরে থেকে শেফালীর গ্যারেজের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। মফস্বল শহরের আর দশটা অটোরিকশার গ্যারেজের মতো এটাও একটা গ্যারেজ। বাইরের দেয়ালে বাংলা সিনেমা, ওয়াজ মাহফিল ও রাজনৈতিক দলের পোস্টার লাগানো। মরচে পড়া লাল রঙের লোহার গেটে মলিন সাদা অক্ষরে লেখা 'শেফালী গ্যারেজ।' বলে না দিলে বাইরের কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না যে, নন্দনগড়ের সবচেয়ে বড় মাদক সম্রাজ্ঞীর আস্তানা এখানে।

গ্যারেজের ভেতর হলদে রঙের বাতি জ্বালানো। ভেতরে অনেক বড় জায়গাজুড়ে গ্যারেজটি। দুটো কি তিনটি অটোরিকশা ভেতরে পড়ে আছে। তার মধ্যে একটার দশা ভয়াবহ। নির্ঘাত ট্রাক বা ওই জাতীয় কোনো বিশালাকার যানবাহনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। অটোরিকশাটির সম্পূর্ণ কাঠামো তাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে।

যুবক ভয়ের দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলে মহিলাদের একজন বলল, 'শেফালী আপা ওই ট্রাকওয়ালারে ধইরা হোলের বিচি কাইটা নিছে। ওইটাই হালার শাস্তি।'

যুবক মহিলার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল। কিন্তু মহিলার কোনো হেলদোল নেই। সে একটা কাঠের দরজায় গিয়ে নক করতেই খট করে ডোর নব খুলে গেল। মহিলা দুজন তাকে ভেতরে যাওয়ার জন্য ইশারা করল।

এই ঘরের আলো নেভানো বলে প্রথম অবস্থায় এর বিশালতা বোঝা যায় না। আয়তনে গ্যারেজটির সমান হবে ঘরটা। ঘরজুড়ে ধূপকাঠির গন্ধ। পূজার ঘরের মতো চারপাশে গোলাপি রঙের ডিমলাইট জ্বালানো। শুধু এক কোণে ছাদ থেকে নেমে এসেছে একটি হলদে আলোর বাল্ব। তার নিচে বসে সাত-আটজন মহিলা ডাব্বু খেলছে। ছয় গুঁটির ডাব্বু খেলা জুয়াড়িদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। যুবক এই প্রথম মহিলাদের খেলাটি খেলতে দেখছে।

মহিলারা সবাই মাঝবয়সী। তাদের কারো পরনে শাড়ি, কেউ সালোয়ার-কামিজের সঙ্গে হিজাব পরেছে। কেউ আবার বোরকা পরা। শুধু মুখটা বেরিয়ে আছে। সাজ-পোশাক দেখে বোঝা যায় এরা সবাই ধনাঢ্য পরিবারের।

মহিলাদের সঙ্গে যুবক জুয়ার বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলে মহিলারা একবার আগন্তুকের দিকে চাইল। তারপর কী একটা ব্যাপার নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আশ্চর্যের বিষয়, এখানে বোর্ডে খেলা পরিচালনা করছে একজন তরুণী। তার বয়স কুড়ি কি বাইশের বেশি হবে না।'

যুবক বোর্ডের কাছে গিয়ে হাঁ করে মহিলাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শেফালী কেমন দেখতে সে জানে না। শুধু তার নামই শুনেছে।

মহিলারা একবারের বেশি দুবার যুবকের দিকে তাকাল না। তাদের সমস্ত মনোযোগ বোর্ডে। প্রতিজনের সামনে মোটা টাকার বান্ডিল শোভা পাচ্ছে। দামি সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে কেউ কেউ ধূমপান করছে।

যুবক তন্ময় হয়ে মহিলাদের খেলা দেখছিল। ঘরের এক কোণ থেকে সেটা লক্ষ্য করে শেফালী বলল, 'এই ছ্যারা, এদিকে আয়।'

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে যুবক এগিয়ে গেল। এখানেও মাথার ওপর থেকে নেমে এসেছে গোলাপি ডিমলাইট। তার আলোতে নিচে আধিভৌতিক ছায়া পড়েছে। শেফালীর পুরো ঘরের মতো এখানেও কোনো আসবাবপত্র নেই। সে শুয়ে আছে একটা তোশকের ওপর। এক তরুণীর কোলে মাথা রেখে গায়ে লেপ জড়িয়ে শুয়ে আছে। পেছনে নিঃশব্দে চলছে সিসিটিভি ক্যামেরার মনিটর। পুরো তিলুপাড়ার চিত্র শেফালীকে জানাচ্ছে ২৪ ঘণ্টা।

যুবক তোশকের সামনে দাঁড়াতেই শেফালী বলল, 'এখানে আইছস ক্যান? আমার লগে কী কাম?'

শেফালীর দিকে ভালো করে তাকাল যুবক। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কম হবে না। পৃথুল দেহ। মাথায় চুল নেই বললেই চলে। গোলগাল চেহারা এককালে লাস্যময়ী ছিল বোঝা যায়। মহিলার চোখজোড়া মারাত্মক রকম নিষ্প্রভ। যেন কোনো কঠিন অসুখে ভুগছে।

যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। সে বসার অনুমতি চেয়ে বলল, 'আপনার কাছে পাঁচ মিনিট সময় নেব।'

শেফালী যুবককে বসার জন্য ইশারা করল। একই সমতলে দুজনে নেমে এলে শেফালীর দৃষ্টি অনেকটাই নরম হলো। সে পরিচর্যাকারী তরুণীকে বলল, 'তসলিমা, মাথাটা বালিশে নামায়া রাইখা এহান থাইকা যা।'

দলনেত্রীর আদেশ মেনে তসলিমা চলে গেলে শেফালী বলল, 'কেন আইছো আমার কাছে?'

যুবক বলল, 'একটা বিষয়ে আপনার সাহায্য দরকার। প্রথমে আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম আবরার আহমেদ। আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। পুলিশ নই কিন্তু।'

শেফালী হেসে বলল, 'পুলিশ না এইডা বুজছি। হ্যারা এইহানে আইব না।'

আবরার বলল, 'আমার এক ক্লায়েন্ট, সাদিক মাহবুব এককালে আপনাদের নন্দনগড়ের বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ঠিকাদারি কাজ করতেন। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে ওনার মাথায় কিছু সমস্যা দেখা দেয়। ঠিক পাগল হননি। কিন্তু মনোবিকৃতির কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। সাদিক সাহেবের ছেলেপুলে নেই। স্ত্রী রাগ করে ভাইয়ের কাছে কানাডায় চলে যান। একাকী থাকার কারণে সাদিক সাহেবের অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। এদিকে এই সময় হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে ওঠে নন্দনগড়ের পৌরসভা। সন্ধ্যাশশী বাঁচাও আন্দোলনের চাপে পড়ে নদীর পাড় দখলমুক্ত করতে শুরু করে তারা। আমাদের সাদিক সাহেবের বাড়িও নদীর পারে। তাঁর ডুপ্লেক্স বাড়ির অর্ধেক বুলডোজারের আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে বাড়ির নিরাপত্তা একেবারে হুমকির মুখে পড়ে।'

শেফালী স্টিলের বাক্স খুলে একটা খিলি পান মুখে দিয়ে বলল, 'এখন কী করন লাগব? মেয়ররে টেলিফোন কইরা দিমু?'

আবরার মাথা নেড়ে বলল, 'না ম্যাডাম। ঘটনা এখনো শেষ হয়নি। বাড়িটা ভেঙে অর্ধেক হওয়ার কারণে নিরাপত্তা বলে কিছু রইল না। বেডরুমের বাইরে শুধু একটা নকশা কাটা কাঠের দরজা ছিল। সাদিক সাহেব অসুস্থ হওয়ার কারণে ভাঙা কাঠামো মেরামতের চিন্তা করেননি। এই সুযোগে কেউ একজন বাড়িতে ঢুকে স্টিলের আলমারি খুলে ৫২ লাখ টাকা লুট করে নিয়েছে।'

শেফালী পান চিবানো বন্ধ করে কিছুক্ষণ চোখ পিট পিট করে বলল, 'মালিকরে রাখছে না ফালাই দিছে?'

আবরার মাথা নেড়ে বলল, 'সৌভাগ্যবশত উনি তখন বাসায় ছিলেন না। ফিরে এসে দেখেন আলমারির তালা খোলা। ভেতরে টাকা নেই।'

'তালা খোলা না ভাঙা?'

'খোলা। তালা ভাঙার প্রয়োজন হয়নি। উনি তোশকের নিচে চাবি রেখে গিয়েছিলেন।'

'পুলিশরে জানাইছো?'

'সাদিক সাহেব থানায় গিয়েছিলেন। একটা লিখিত অভিযোগ দিতে বলেছিল থানা থেকে। উনি ঝামেলা মনে করে দেননি।'

শেফালীর মুখে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল। সে আলস্য ভরা কণ্ঠে বলল, 'অহন আমারে কী টাকা তুইলা দিবার কও?'

আবরার বলল, 'হ্যাঁ। টাকাটা ওনার সারাজীবনের সঞ্চয় ছিল। চুরি হওয়ার পর একেবারে পথে বসে গিয়েছেন। আপনি যদি টাকাটা উদ্ধার করে দিতে পারেন তাহলে বড্ড উপকার হয়।'

শেফালী তেতো হাসি হেসে বলল, 'মাইনষের উপকার কইরা আমার লাভ কী? আমি আর আমার মাইয়ারা এইসব লোকের হাতেই পুন মারা খাইছি। এগো কারণেই রাস্তায় নামা লাগছে। অহন অরা মারা খাইলে আমার কী?'

আবরার মনে মনে প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল। সে সরাসরি প্রস্তাব পাড়ল, 'আপনি পঁচিশ লাখ পাবেন। ক্যাশ।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই শেফালী বলল, 'তিরিশ লাখ। এক টাকাও কম না।'

আবরার মাথা নেড়ে বলল, 'আমি সাদিক সাহেবের ওয়াইফকে বলে দেখব। উনিই আমাকে নিয়োগ করেছেন। আশা করি সম্মতি পাওয়া যাবে।'

শেফালী যেন আবরারের কথা শুনতেই পেল না। অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'তিরিশ লাখ টাকা কেন চাইছি জানো? ছুড়ু বেলায় টেলিভিশনে লটারির বিজ্ঞাপন দেখাইত। পরথম পুরস্কার আছিল তিরিশ লাখ টাকা। আমার আব্বায় আছিল দুইন্যার অলস লোক। হ্যায় চায়াচিন্তা প্রতিবার লটারি কিনত। মেলা টাকার লটারি কিনত। মায়ে যদি বকাবকি করত, কইত তিরিশ লাখ টাকা পাইলে সব ভুইলা যাবি। সেই থাইকা তিরিশ আমার প্রিয়।'

আবরার একটা ফরমাল হাসি হেসে বলল, 'আপনি অনুমতি দিলে এখান থেকে বিদায় নিতে চাই।'

শেফালী আবারো চোখ পিট পিট করে বলল, 'টাকা কবে লাগবে?'

আবরারের মুখের একটা পেশিও কাঁপল না। সে নির্বিকারভাবে বলল, 'আজকেই। সূর্য ওঠার আগেই টাকাটা লাগবে।'

শেফালী আবরারকে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। তসলিমাকে ডেকে বলল, 'অহন আর আমার মাথা টিপা লাগব না। তুই যা, দল গোছায়া রাস্তায় নাইমা পড়। সূর্য উডনের আগে টাকা উদ্ধার কইরা লইয়া আইবি। কেউ বাধা দিলে ডায়রেক্ট ফালায় দিবি। বাকিটা পরে দেখমুনে।'

তিন

রিকশাওয়ালা গলির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে আবরার ফুর্তিতে আটখানা হয়ে শিস বাজিয়ে বলল, 'আরে পাগলু! তুমি তাহলে আছো?'

রিকশাওয়ালা তরুণ আবরারের পাগলু সম্বোধনে একটুও চমকালো না। সে একবার প্যাডেল ঘুরিয়ে বলল, 'একবার ভাবছিলাম চইলা যাই। শেফালীর আস্তানায় রাইতের বেলা কুনো পুরুষ মানুষ ঢুকলে আস্ত বাইর হইতে পারে না। শুধু শুধু আপনের লাইগা বইসা থাইকা কাম নাই। কিন্তু মনে হইলো আপনের মধ্যে একটা গায়েবি ব্যাপার আছে। সাইধা গিয়ে যে বাঘের ঘরে ঢুকে হ্যায় হয় ঘোগ না হইলে বাঘ শিকারি। সাধারণ লোক না। এর লাইগা যাই নাই।'

পাগলুর প্রশংসা শুনে আবরার খুশি হয়ে হাসল। সে বলল, 'তোমার প্ল্যান কী? কতক্ষণ ভাড়া মারবে?'

তরুণ রিকশাওয়ালা কোনো চিন্তা না করে জবাব দিল, 'আপনে আমার পরথম কাস্টমার। আমি রাইতেই রিকশা চালাই। দিনের বেলা ঘুমাই। আপনের লাগলে সারা রাইত রিকশা চালামু। লাগবে?'

আবরার বলল, 'মনে মনে তোমার মতো কোনো রিকশাওয়ালাকেই চাইছিলাম। আল্লাহ মিলিয়ে দিয়েছে। আজকের রাতটা আমার সাথে থাকো। যেখানে যেখানে যাব, নিয়ে যাও। ভাড়া নিয়ে সমস্যা হবে না।'

পাগলু বলল, 'এহন কই যাইবেন ঠিক করছেন নাকি দুই চোখ যেহানে লয়া যায় ওইদিকে যামু?'

মিডল্যান্ড ব্যাংক
সালাম
ইসলামী ব্যাংকিং
midlandbank
bank for inclusive growth
এমডিবি
হোম লোন
আপনার স্বপ্নপূরণে একধাপ এগিয়ে
সাশ্রয়ী ১১.৭৫% রেটে
*শুধুমাত্র নতুন লোনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
*অফারটি ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে
৩০ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য
24/7 16596 www.midlandbankbd.net

আবরার বলল, 'ঠিক করেছি। তুমি সাধন কমিশনারের অফিস চেনো?'

পাগলু বলল, 'আপনে কি পুলিশের লোক? নন্দনগড়ে বাস কইরা এগোরে চিনে না এমন কুনো বাপের ব্যাটা নাই। সাধন এই এলাকার টপ টেরর।'

আবরার বলল, 'হ্যাঁ, ওই টেররের কাছেই যেতে চাই। চলো।'

পাগলুর রিকশা চলতে শুরু করল। শীত ইতিমধ্যে জেঁকে বসেছে। আবাসিক এলাকার নাইটগার্ড ও দারোয়ানরা আগুন জ্বালিয়ে পোহাতে বসেছে। তাদের পাশে উষ্ণতার লোভে যোগ দিয়েছে শহরের নেড়ি কুকুররা। গাদাগাদি হয়ে বসে তারা অগ্নিদেবের সেবা গ্রহণ করছে।

পাগলু বলল, 'নন্দনগড় চিরকাল এমন ছিল না। ভালা মানুষ বেশি আছিল শহরে। কুনো অন্যায় হইলে মাইনষে একজোট হইয়া প্রতিবাদ করত। সমস্যা শুরু হইল মোবাইল আওনের পর থেইকা। মানুষে মানুষে যোগাযোগ যত সহজ হইল, ততই কঠিন হইল মনের কথা কওয়া। কেউ আর কারো লাইগা বইসা নাই। আড্ডা নাই, দাওয়াত নাই, মাইনষে মাইনষে মিলামিশা নাই। রাস্তাঘাটে, দোকানঘাট, বাড়িঘরে সবার চোখ খালি মোবাইলে। কী যে মজা পাইছে! এখন চোখের সামনে কুনো দুর্ঘটনা দেখলেও কেউ আগায় আসে না। বেশি ভালো লোক হইলে ট্রিপল নাইনে কল করে। খারাপ লোক দুর্ঘটনার সুযোগ নেয়। এই কারণে শেফালী, সাধনগো উৎপাত বাইড়া গেছে। হ্যারা ধীরে ধীরে শহরটারে গিলা খাইছে। প্রতিটা পাড়ায় গুণ্ডাবাহিনী আছে। এমন কোনো ক্রাইম নাই করে না। ঘরবাড়ি বানাইবেন, জমি কিনবেন, ব্যবসা করবেন, মাইয়ার বিয়া দেবেন, ঈদ-পূজা-বিজয় দিবসে এগোরে চান্দা না দিয়া থাকতে পারবেন না।'

আবরার বলল, 'এদের মধ্যে মারামারি হয় না?'

পাগলু পেছনে ফিরে যাত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ, খুব হয়। মারামারি-কাটাকাটি লাইগা আছে। আপনে না পুলিশের লোক। আপনের জানার কথা। নন্দনগড়ের মতো বাংলাদেশের আর কুনো থানায় এত মার্ডার মামলা হয় না।'

আবরারের নাক ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিল। কেন যে আসার সময় ট্রাভেল ব্যাগে বাঁদর টুপিটা ভরে নেয়নি। এখন বড়ো আফসোস হচ্ছে। সে মাফলার খুলে নাকের ওপর প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল, 'আমি পুলিশের লোক নই। অপরাধ নিয়ে কাজ করি আরকি।'

পাগলু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনে সম্বাদিক? দুলাল সম্বাদিক আমার মায়ের চাচতো ভাই লাগে। দালালি কইরা হ্যায় আইজ প্রচুর ট্যাকার মালিক। আমার রিকশা কেনার সময় পাঁচ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করছিল।'

আবরার বলল, 'আমি সাংবাদিকও নই। অপরাধ নিয়ে টুকটাক কাজ করি আরকি। কেউ চাকরি দিলে করি।'

পাগলু বলল, 'তাইলে আপনে আমার মতো স্বাধীন। ইচ্ছা হইলে কাজ করেন। না হইলে নাই।'

আবরার হেসে বলল, 'হ্যাঁ। এটা ঠিক বলেছ। কাজের বেলা আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এইজন্য আমার পেশাটাকে খুব ভালোবাসি।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রিকশাটা গিয়ে একটা সিনেমা হলের সামনে দাঁড়াল। দোতলা পুরনো সিনেমা হলো। দেখে বোঝা যায়, এখানে শেষ শো বহুদিন আগে হয়েছে। তারপর থেকে সিনেমা হলটা অব্যবহৃত পড়ে আছে। ঠিক অব্যবহৃত বলা ঠিক হলো না। সিনেমা হলের নিচতলার একটা অংশ দখল করে সাধন কমিশনার অফিস বানিয়েছে।

রিকশা থেকে নেমে আবরার বহুকষ্টে সিনেমা হলের সাইনবোর্ড থেকে নামটা উদ্ধার করল। পয়সা টকিজ। নন্দনগড়ের মানুষের এককালের প্রিয় বিনোদনের স্থান।

পাগলু বলল, 'আমি ছুটবেলায় এই হলে সিনেমা দেখছি। তবে এর রমরমা আছিল আমাগো বাপের জমানায়। রাজ্জাক-শাবানা, জাফর ইকবাল-ববিতা, ওয়াসিম-রোজিনা, মান্না-মৌসুমী, সালমান শাহ-শাবনূরের সিনেমা আব্বারা ব্ল্যাকে টিকিট কাইটা দেখত। নন্দনগড়ের পতনের পিছে এই সিনেমা হল উইঠা যাওয়া একটা কারণ। উইঠা যাওয়ার কারণও সেই মোবাইল ফোন।'

আবরার মাথা ঝাঁকিয়ে হলের দিকে পা বাড়াল। পুরো এলাকা গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে। হলের বাইরে বট-পাকুড় গাছের ছানাপোনা দেয়ালে ঝুলে বংশবিস্তারের চেষ্টা করছে। অন্ধকার প্রজেকশন রুমে ডানা ঝাপটাচ্ছে নিশাচর লক্ষ্মী প্যাঁচা। শুধু নিচতলার এক জায়গায় এখনো পড়ে আছে পুরনো ৩৫ মিলিমিটার ফিল্মের প্রজেকশন মেশিন। তার পেছনে এক খুপরি মতো ঘরের সামনে অপারেশন চেম্বারের মতো আলো জ্বলছে। আবরার সেই ঘরের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে বাজখাঁই গলায় আওয়াজ এলো, 'কে?'

আবরার গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করে জবাব দিল, 'আমি ঢাকা থেকে এসেছি। সাধন বাবু আছেন?'

দরজা খুট করে খুলে গেল। সামান্য ফাঁক গলে যে বেরিয়ে এলো তাকে দেখলে দিনের বেলাতেই মানুষের পিলে চমকে যেতে পারে। লোকটা যেমন লম্বা, তেমনি পেশিবহুল। সাত ফুটের কম হবে না। ব্যায়ামদুরস্ত হাত দুটো শরীরের দুই পাশে বিপজ্জনকভাবে দুলছে। পরনে জ্যাকেট, জিন্স ও বুট জুতা। দেখে মনে হয়, ফ্রান্সিস ফোর্ড কাপোলার সিনেমা থেকে নেমে আসা সিসিলির কোনো সাক্ষাৎ যমদূত। লোকটার কণ্ঠস্বর খুব কোমল। মার্জিত কথা বলার ভঙ্গি। সে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?'

আবরারকে পুনরায় তার পরিচয় দিতে হলো।

বিশালদেহী একবার রিপিট করল, 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর?' তারপর বোধহয় বসের কাছে খবর দেওয়ার জন্য আবারো ঘরে ঢুকল। খানিক বাদে ফিরে এসে বলল, 'আসুন। বস ভেতরে আসতে বলেছে।'

দরজার উইন্ড চাইম সরিয়ে ভেতরে ঢুকল আবরার। সিনেমা হলের পরিত্যক্ত অফিস ঘরে দিব্যি অফিস পেতে বসেছে সাধন। একটা প্রকাণ্ড মেহগনি কাঠের টেবিলের ওপর প্রান্তে সাধনের বসার চেয়ার। তার বিপরীত দিকের একটি কালো রেক্সিনে মোড়ানো সোফায় চারজন লোক বসে আছে। তাদের সামনে হাতে ও পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কের ছাপ তাদের চোখেমুখে।

আবরার ঘরে ঢুকতেই সবাই একযোগে তাকাল। শুধু সাধন তাকাল না। সে ঠোঁটের কোণে ঝুলন্ত পাইপে তামাক ভরে দিয়াশলাই ঠুকে আগুন ধরাল।

পুরো ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা। আবরারই প্রথম কথা বলল, 'অসময়ে এলাম না তো?'

সাধন এবারে চোখ তুলে আগন্তুককে লক্ষ্য করল। আপাদমস্তক দেখে ঠোঁটের অন্যপাশ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সময় অসময়ের ব্যাপারটা নির্ভর করছে আপনি কে তার উপরে। যদি ফ্রেন্ড হন তাহলে ইটস ওকে। এনিমি হলে, ইউ নো সময়টা ঠিক ভালো হয়নি।'

আবরার ভালো করে সাধনকে দেখে নিল। নন্দনগড়ে সবচেয়ে ঝানু রাজনীতিবিদ বলা হয় সাধন চক্রবর্তীকে। দেখতে একেবারে সাধাসিধে ভালো মানুষ। যেন স্কুলে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা পড়ায়। ব্যাকরণ ও সংস্কৃতে ভালো দক্ষতা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' চোখ বুজে আবৃত্তি করতে পারে। একেবারে সাত চড়ে রা নেই টাইপের নিরীহ চেহারা।

চোখের দেখা সবসময় সঠিক হয় না। সাধন চক্রবর্তী নন্দনগড়ের সবচেয়ে ধূর্ত লোকটির নাম। চাইলে মেয়র হতে পারত। কিন্তু পাদপ্রদীপের নিচে থাকার চাইতে আড়ালে থেকেই কার্যসিদ্ধি করা তার পছন্দ। ঠিক যেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের গুরু চাণক্য। নাম শুনে তাকে যে দলের সদস্য মনে হয়, আসলে সে সেই দল করে না। সে করে দলটির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর রাজনীতি। ফলে প্রতিপক্ষ তো বটেই, নিজ দলের নেতারাই তাকে সমঝে চলে। সরকারে যে-ই আসুক তার গদি টলে না। যৌবনের শুরু থেকে সে ৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনার। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও একইরকম দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রয়ে গেছে। সন্ধ্যাশশী তীরের আমতলি শ্মশানের চিতায় ওঠার আগ পর্যন্ত সাধন চক্রবর্তী কমিশনারের পদ ছাড়বে বলে মনে হয় না।

আবরার কিছু একটা বলবে এমন সময় হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সাধন। আবারো জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ফ্রেন্ড না এনিমি?'

আবরার মুচকি হেসে বলল, 'ফ্রেন্ড। নিঃসন্দেহে।'

সাধন সোফায় বসে থাকা লোকদের দিকে নজর দিল। তাদের মধ্যে নেতা গোছের একজন লোক বলল, 'দাদা, তিলুপাড়া ব্রিজের গেটে ডিউটি করতে আছিলাম। তখন দেখি হ্যারা সামনে দিয়া যাইতে আছে। রাইত বাজে বারোটা। এলাকায় কাকপক্ষীও নাই। এর ভিতরে হেইয়া আইলো কেমতে? ভালো কইরা চাইয়া দেহি ডাণ্ডাবেড়ি পরানো।

এর লাইগা ভালোমতো হাঁটতে পারতেছে না। কইলাম, এই বাপুরে, থামো থামো দিহি। হ্যারা করল কি, আমার কথা না শুইনা দৌড় দিল। ডাণ্ডাবেড়ি পইরা কি আর দৌড়ানো যায়? এরা একে-অন্যের লগে উষ্টা খাইয়া গড়াইয়া পড়ল নদীর পানিতে। এই রাত্তিরে কেদো-পাঁকের ভিতর থাইকা এগোরে তুইলা আনতে আমগো জানডা বারাইয়া গেছে। গাও থিকা অহনও খারাপ একটা বাস আইতে আছে। গোসল না করা পর্যন্ত শান্তি হবে না।'

ডাণ্ডাবেড়ি পরা লোক তিনটার দিকে সাধন তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কারা বাপজান? কোথায় থেকে পলাইয়া আসছো? কেউ টর্চার সেলে আটকায়া থুইছিল? নাকি জেলখানার তালা ভাইঙ্গা বীরের মতো বাইর হয়া আইছো?'

লোকগুলো ভয়ে কাঁপছিল। শীতে না ভয়ে কে জানে। অনেকক্ষণ সময় যাওয়ার পরও তারা মুখ খুলল না। শুধু ডাঙায় তোলা মাছের মতো শুধু খাবি খেতে লাগল।

সাধন পাইপ মুখ থেকে না সরিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমরা ফ্রেন্ড হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তোমাদের জন্য পানিশমেন্টের ব্যবস্থা আছে। পিছনের ওই রুমে নিলে তোমরা নিশ্চিতভাবে মুখ খুলবা। জীর্ণশীর্ণ জীবনে যত পাপ করছো সব ফাগুনের ধারার মতো গলগল করে বের করে দিবা। কী, ওই ঘরে যাবা না এমনিতেই মুখ খুলবা?'

ডাণ্ডাবেড়িদের একজন হাতজোড় করে বলল, 'দাদা, ওই ঘরে আমাদের পাঠাবেন না। আমরা সব সত্যি কথা বলছি। একটু ধৈর্য ধরে শোনেন প্লিজ।'

সাধন আবরারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার গল্প শুনতে আপত্তি আছে?'

আবরার মাথা নাড়ল। আপত্তি নেই। সাধন চোখের ইশারায় ডাণ্ডাবেড়িওয়ালাকে গল্প শুরু করতে বলল। সে অন্য দুইজনের দিকে একবার তাকিয়ে বলতে শুরু করল, 'কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারতেছি না। আপনি বোধহয় নাম বললে আমাকে চিনবেন। আমাকে না চিনলেও আমার আব্বাকে চিনবেন। আমার আব্বা জসিম চেয়ারম্যান। এরশাদ সরকারের আমলে উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। হ্যাঁ, সেই জনদরদী নেতা জসিম উদ্দিনের কুলাঙ্গার সন্তান আমি। আব্বা মারা যাওয়ার পর আমি তার লাইনে যাই নাই। এমন এক দলে যোগ দেই যাদের মুখে এক কাজে আরেক। কথা শুনলে মনে হবে এরা খোদ আল্লাহর ওলি। বাস্তবে তাদের মতো ভয়ানক, রক্তপিপাসু আর কোনো দল বাংলাদেশে নাই। তো সেই দলের একজন হিসেবে আমি একটা পলিটিক্যাল মার্ডার করে ফেলি। ছেলেটার নাম ছিল পলাশ। খুব সুন্দর চেহারা ছিল। এতদিন পরও আমি তার চেহারা বিন্দুমাত্র ভুলতে পারি নাই। অনেক চেষ্টা করেও পারি নাই। যা হোক, পলাশকে খুন করার পর লোয়ার কোর্টে আমার ফাঁসির আদেশ হয়। ভেবেছিলাম হাইকোর্টে আমাদের বড় বড় উকিল আছে। ওরাই আমাকে বের করে আনবে। কিন্তু কে যেন খুনের সময় ভিডিও করেছিল। আপিল শুনানির সময় ওই ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেলে কোর্ট মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখে। আমি অবশ্য শেষ চেষ্টা হিসেবে রিভিউ আবেদন করেছি। যা-ই হোক, ফাঁসির রায় হওয়ার পর আমাদের জেলের কনডেম সেলে রাখা হয়। নন্দনগড়ের জেলখানা দেখেছেন তো?'

সাধন একবার চোখ বুজে বলল, 'গোসলখানার সামনে ডালিম

গাছটা এখনো আছে? আমার হাতে লাগানো।'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি সবই জানেন দাদা। পুরাতন জেল। চুন-সুরকি-বালি ঝুরঝুর করে পড়ে। আমাদের তিনজনকে রাখা হলো একসাথে। আমি আর মহব্বত নিয়তিকে মেনে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম রিভিউ শেষ হওয়া পর্যন্ত যতদিন বেঁচে আছি সব বোনাস। সমস্যা হলো এই আশেক আলী গাঁটুকে নিয়ে। এর বয়স কম। মাত্র বাইশ বছর। এই বয়সে ফাঁসির আদেশ সে মেনে নিতে পারে নাই। কারো পক্ষে মানা সম্ভব মনে হয় না।'

সাধন দুটো আঙুল দুইজনের দিকে তাক করে বলল, 'কী করছে এরা?'

মহব্বত বলল, 'আমি প্রবাসে আছিলাম স্যার। দেশে ফিরা্যা দেখি বউ এক মাস্টারের লগে প্রেমের সম্পর্ক করে। একদিন হাতেনাতে পাইলাম দুইটারে। মাছ কাটার বঁটি দিয়া দুইটারে জবাই দিছি।'

সাধনের মুখে একটা হাসি তৈরি হয়ে মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সে বলল, 'বাহ বাহ। বেশ করেছ। এই ছোকরা, তুই কেন জেলে গেছিলি?'

আশেক আলীর আচরণে কেমন যেন লজ্জা লজ্জার ভাব আছে। তার মুখটা সবসময় হাসি হাসি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে তামাশার মুডে আছে। বাস্তবে সেরকম কিছু নয়। সে দেখতেই অমন। পাঁচ ফুট উচ্চতার আশেক আলী দেখতে একেবারে লিকলিকে ধরনের। পরনের কয়েদির পোশাক খুললে নির্ঘাত পাঁজরের হাড্ডি গোনা যাবে। সাধনের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'আমার খুব ডাণ্ডি খাওয়ার নেশা। ছুড্ডুবেলা থাইকা রাস্তায় বড় হইছি। বাপ-মা কেডা খবর পাই নাই। বাড়ি-উড়ির খবরও জানি না। রাস্তার রাস্তায় ঘুরছি আর বন্ধুগো লগে ময়লা টোকাইছি। খিদা পাইলে হ্যারা পলিথিনে গুলু ঢাইলা গন্ধ শুঙত। খুব ভালো লাগত শুইঙ্গা। কিন্তু খালি ময়লা টোকাইয়া ডাণ্ডি কিনার পয়সা জুটে না। হ্যার লাইগা শুরু করলাম ছোটখাটো চুরি। পরে হাড্ডিপট্টির এক ওস্তাদের হাতে পইড়া দেয়াল-পাইপ-গাছ বাইয়া উডার ট্রেনিং লইছি। অখন যেকুনো বিল্ডিংয়ে উইঠা জানালা-ছিটকিনি-ঘুলঘুলি খুইলা ঢুকতে পারি। এই করতে গিয়া একটা বাড়িতে একটা মার্ডার কইরা ফালাই। বিচারে আমার ফাঁসি হয়। পুলিশে পরথমে আমারে ধরবার পারে নাই। রায় হওয়ার পরে ধইরা ফালায়। সেই থাইকা কনডেম সেলে রাখছে।'

সাধন মাথা নেড়ে প্রথম কয়েদির দিকে তাকাল। ভুরু নাচিয়ে বলল, 'তারপর? আমার কিন্তু বেশি সময় নাই, যা বলার ঝটপট বলে ফেল। কম-বেশি হলে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলব।'

লোকটা হাত জোড় করে বলল, 'আশেক আলী যোগ হওয়ার পর থেকে বলে, যে করেই হোক জেল থেকে পালাতে হবে। দরকার হলে ঢাকায় গিয়ে ফ্লাইওভারের নিচে খোপের মধ্যে লুকায়া থাকবে তবুও এই বয়সে মরতে প্রস্তুত নয়। আমরা কেউই আসলে প্রস্তুত নই। মরতে কে চায়? আশেক আলী এরই মাঝে টিকটিকির মতো দেয়াল বেয়ে কড়ি-বর্গা দেয়া উঁচু ছাদ স্পর্শ করে দেখল পলেস্তারা খসে একেবার ভঙ্গুর হয়ে গেছে। ব্যাপারটা আমি আগেই খেয়াল করেছিলাম। বৃষ্টি হলে ছাদ বেয়ে গলগল করে পানি বের হতো। তিনজনে বুদ্ধি করলাম, এই কনডেম সেল থেকে পালাতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ, সেলের ভেতরে তিনটা চা চামচ ছিল। শুধু ওই তিনটা চামচ দিয়ে আমরা

আস্ত ছাদ ফুটো করেছি। কয়েকদিন ধরে কারারক্ষীরা আমাদের সন্দেহ করছিল। মাঝরাতে খুটখাট শব্দ শুনে ওরা আমাদের ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু খোদার কী ইচ্ছা, এরপরও আমরা জেল ভেঙে পালিয়ে আসি।'

সাধন হেসে বলল, 'ধুর ব্যাটা! পালানোর আর রাস্তা পেলে না? তিলুপাড়া ব্রিজে এরা ডিউটি করে। এদের চেনো? ছিনতাইকারী। এদের সালাম না দিয়ে ওই পথে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

সোফায় বসা লোকটা বলল, 'এগোর পকেট চেক কইরা আড়াইশো টাকা আর এক প্যাকেট ডার্বি সিগারেট পাইছি। জেলখাটা কয়েদি, ভাবলাম আমনের কাছে লইয়া আইলে ফায়দা অইবার পারে। পুলিশে ধরাই দিলে ভালা বকশিশ মিলবার পারে। যদি আপনে আদেশ করেন।'

সাধন খানিক চিন্তা করে বলল, 'দাঁড়া, সে ব্যাপারে বলতেছি। আগে এনার কথা শুনে নেই। তো বন্ধু, বলেন এত রাতে কেন সাধন কমিশনারের শরণাপন্ন হয়েছেন?'

আবরার তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের পরিচয় দিলে সাধন নড়েচড়ে বসল। পাইপের তামাক ঝেড়ে একটা নারিকেলের মালায় ফেলতে ফেলতে বলল, 'গোয়েন্দাগিরি করে বাংলাদেশে কেউ চলতে পারে নাকি? আপনি আসল গোয়েন্দা তো? লাইসেন্স আছে?'

আবরার বলল, 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর পেশাটা বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃত নয়। এজন্য কনসালট্যান্ট হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হয়েছে। আমি মূলত বিয়েশাদি, পরকীয়া, ডিভোর্স নিয়ে কাজ করি। আপনাদের নন্দনগড় শহরের ব্যবসায়ী সাদিক সাহেবের ওয়াইফ আমাকে একটা চুরির ঘটনা তদন্ত করতে দিয়েছেন। তাদের বাড়িতে একটা চুরি হয়েছে। চোর ঘরে ঢুকে কাঠের আলমারি খুলে ৫২ লাখ টাকা নিয়ে গেছে। সারাজীবনের সঞ্চয় হারিয়ে ভদ্রলোকের মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। টাকাটা উদ্ধার করে দিতে হবে। সেটা আজ রাতেই। পরশু তাদের ফ্লাইট। টাকা পেলে স্বামীকে একেবারে কানাডায় নিয়ে যাবেন।'

সাধন কমিশনার মাথা নেড়ে বলল, 'কোন সাদিক মাহবুব? ঠিকাদার না? চিনি তো। ঘটনাটা খুলে বলুন দেখি।'

আবরার ঘটনা আগাগোড়া বর্ণনা করলে সাধন মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে বলল, 'আপনি চাইছেন আমি আপনাকে সাহায্য করি। টাকাটা উদ্ধার করে দেই। টাকা পেলে সাদিক সাহেব ও তার স্ত্রী ভালোয় ভালোয় বিদেশে চলে যাবেন। তাই না?'

আবরার বলল, 'হ্যাঁ। ভদ্রলোকের অনেক দিন ধরে মানসিক সমস্যা। সারাক্ষণ বিড় বিড় করে টাকার কথা বলেন। ওনার সারাজীবনের সঞ্চয়, উদ্ধার না হলে বোধহয় মারাই যাবেন।'

সাধন এবারে পাল্টা প্রশ্ন করল আবরারকে, '৫২ লাখ টাকা থেকে আপনাকে কত দেবে?'

কমিশনারের চাঁচাছোলা প্রশ্নে আবরার একটু অপ্রস্তুত হলো। সাধনের সঙ্গে কী রকম কথোপকথন হতে পারে এ নিয়ে আসার সময় সে অনেক ভেবেছে। কিন্তু সাধন গভীর জলের মাছ। প্রশ্ন করেছে একেবারে সিলেবাসের বাইরে থেকে। সে বলল, 'আমি শুধু আমার ফিস নেব। এমনিতে রেট ৫০ হাজার টাকা। আমার ক্লায়েন্ট ১ লাখ টাকা দিতে চেয়েছেন।'

সাধন কমিশনার তিন-চারবার তালি বাজিয়ে বলল, 'কী মজা। চোরের কব্জা থেকে টাকাটা আমি তুলে দেব। বসে বসে আপনি ১ লাখ টাকা পাবেন। পয়সা রোজগার কি এতই সোজা?'

আবরার আবারো অপ্রস্তুত হলো। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার সোর্স বলছে টাকাটা নন্দনগড় শহরেই আছে। চোর কিছু টাকা বেহিসেবি খরচও করে ফেলেছে। সেটা দেখে সোর্সের সন্দেহ হয়েছে। এটা আপনার মতো ক্ষমতাশালী মানুষের জন্য ইজি মানি। যদি জায়গামতো হিট করতে পারেন টাকাটা আপনিই তুলে আনতে পারবেন। এক রাতের অভিযানে ত্রিশ লাখ টাকা নেহাত কম নয়।'

সাধন বলল, 'আপনি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন না। আমি চোর-ডাকাতের সর্দার নই, জনপ্রতিনিধি। আমি কীভাবে টাকা উদ্ধার করে দেব?'

আবরার বুঝল, সাধন মুলোমুলি করে দর বাড়িয়ে নিতে চাইছে। হয়তো সুযোগ বুঝে পুরো টাকাটাই আত্মসাৎ করতে চায়। সে সতর্কতার সঙ্গে বলল, 'আপনি সে রকম লোক নন আমি জানি। ভালো করে খোঁজ নিয়েই এসেছি। কিন্তু নন্দনগড়ে যারা অপরাধ করে প্রত্যেকেই আপনাকে মানে। আপনার ইশারায় অনেক কিছু হতে পারে। যেমন এনাদের কথাই ধরুন না, জেল পলাতক আসামিদের ধরে এরা যা ইচ্ছা করতে পারত। কিন্তু সেটা না করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। আপনাকে মান্য না করলে কী এ রকম হতো?'

সোফায় বসা লোকটা তর্জনী তুলে চিৎকার করে উঠল, 'অই, মুখ সামলায়ে কথা কইবি। অপরাধী আবার কিরে? কারে কস অপরাধী? এ শহরে ভালো আছে কুন হাউয়ার নাতি?'

সাধন প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে লোকটাকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার সামনে আমার অতিথিকে অপমান করার দুঃসাহস দেখাবি না। বেয়াদবির পরিণতি খুব খারাপ হবে বলে দিলাম।'

লোকটার মুখের ভয়ের ছায়া গাঢ় হয়ে ফুটে উঠল। বার কয়েক ঢোক গিলে সে ক্ষমা চাইল সাধন ও আবরার দুজনের কাছেই।

সাধন আবারো পাইপে তামাক ভরে রসিয়ে রসিয়ে আগুন ধরিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চিন্তে ধূমপান করে বলল, 'এই কয়েদিগুলোকে কী করা যায়? এরা কোনো কাজের না। বাতিল মাল। টাকা-পয়সাও নেই। জেলের ভাত খেতে খেতে গায়ের জোর বলতে কিছু নাই। নিজেরা নিজেরা পুন্দাপুন্দি করে পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এদের বস্তায় ভরে নদীতে ফেললে নদীর মাছ কিছু খাবার পাবে।'

কয়েদিরা আতঙ্কে শিউরে উঠল। হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইল বারবার। সাধন আশেক আলীর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। এবারে তার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সাধন বলল, 'তুই যদি একটা কাজ করে দিতে পারিস তাহলে তিনজনের মুক্তির বিষয়টা বিবেচনা করব। তোকে এখনই ছেড়ে দেব। বাকি দুজন জামিন থাকবে আমার ফুটোস্কোপ ঘরে। ফুটোস্কোপ বুঝিস তো? শরীরে ড্রিল মেশিন দিয়ে ফুটো করা হয়। আজ ভোরের মধ্যে যদি সাদিক মাহবুবের চুরি যাওয়া ৫২ লাখ টাকা উদ্ধার করে দিতে পারিস তাহলে তিনজন জানে বেঁচে যাবি। জেলখানাতেও আর ফেরত যেতে হবে না। তোদের হাতে টাকা-পয়সা দিয়ে, হান্নানের মোরগ-পোলাও ভরপেট খাইয়ে বিদায় দেব। পারবি?'

আশেক আলী অন্য দুই কয়েদির মুখের দিকে তাকাল। তাদের মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেছে। তারা জানে জেলের বন্ধু ও রেলের বন্ধু আসলে কোনো বন্ধুই নয়। আশেক আলীর সঙ্গে তাদের দোস্তি হয়েছে জেলে। কারাগারের দরজা থেকে বেরোনোর পর যার যার রাস্তা আলাদা। আশেক আলীর কোনো ঠেকা নেই তাদের জন্য ফিরে আসে। মুক্তি পাওয়া মাত্র সে হয়তো পাখির মতো ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবে। নাম-নিশানাহীন এমন কোনো শহরে গিয়ে আশ্রয় নেবে যেখানে সাধনের লম্বা হাত পৌঁছাবে না।

আশেক আলী জোর দিয়ে বলল, 'এরা আমার আপন ভাইয়ের চেয়ে কম না। তিনজনে একই স্বপ্ন দেখে কয়েদ ভাইঙ্গা পলাইছি। আবার জেলে যাওনের চাইতে আমাগো মরণও ভালো। আমি আপনের কামডা নিলাম। কথা দিলাম, আইজ ভোরের মধ্যে টাকা উদ্ধার কইরা আমার ভাইগো ছাড়ায়া লইয়া যামু।'

সাধন বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইল। তুই ভোরের আগে আগে চুরির ৫২ লাখ টাকা উদ্ধার করে এদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাবি। এক মিনিট দেরি হলেও এদের আর জীবিত দেখতে পাবি না।'

আশেক আলী সাধনের কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল, 'আমার একখান কথা আছে ওস্তাদ।'

সাধন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার কী কথা?'

আশেক লজ্জাশীল হয়ে হাত-পায়ের ডাণ্ডাবেড়ির দিকে ইশারা করে বলল, 'এট্টু ডাণ্ডাবেড়ি ছুটায়া দিলে ভালো হইত। এই লয়া কাম করন যায় না। এইহানে আপনাগো হাতে পড়ছি, অন্য এলাকায় অন্য কারো হাতে পড়তে পারি। এমনে কী আর চলা যায়!'

সাধন সেই দীর্ঘদেহী লোকটাকে ডেকে বলল, 'এই একে ফুটোস্কোপ ঘরে নিয়ে যা। ওর হাত-পায়ের বেড়ি কেটে দে।'

লোকটা আশেক আলীকে সেই পেছনের ঘরটিতে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছেনি-হাতুড়ির ঠোকাঠুকির শব্দ পাওয়া গেল। হাতের কবজি কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এলো আশেক আলী। সাধন দেয়াল

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর হাতে খুব বেশি সময় নেই। জলদি কাজটা সেরে আয়। নইলে ওদের কপালে খারাবি আছে।'

আশেক আলী 'যে আচ্ছা' বলে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাধন আবরারকে বলল, 'আপনি এখন কী করবেন? রাতটা আমার মেহমান হিসেবে থেকে যান।'

আবরার মাথা নেড়ে বলল, 'ফুটোস্কোপে? মাথা খারাপ? আমার কিছু কাজ আছে। অনুমতি দিলে বের হতে চাই।'

নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিতে ফেটে পড়ল সাধন। হাসতে হাসতে বলল, 'ভোরবেলা তাহলে দেখা হচ্ছে। আমি ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিচ্ছি।'

আবরার বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো।

চার

'এবারে কই যাইবেন?' আবরার রিকশায় উঠে বসলে জিজ্ঞেস করল পাগলু। নিথর অবশ শীতে সে কী করে রিকশায় গাঁট হয়ে বসে ছিল আবরার ভেবে পায় না।

সে হেসে বলল, 'তোমাদের শহরে ভদ্রলোকের কোনো পাড়া নেই?'

পাগলু বলল, 'আছে তো। শশীগড়। শহরের যত বড় বড় ব্যবসায়ী, সরকারি অফিসার, ডাক্তার, প্রিন্সিপাল, ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার সবাই ওইখানে থাহে। তাগো বউগো লাইগা মার্কেট আছে, বাচ্চাগো লাইগা পার্ক আছে, ব্যাডাগো লাইগা কেলাব আছে। ইয়ং পোলা-মাইয়াগো লাইগা দামি দামি রেস্টুরেন্ট আছে। হাইফাই জায়গা।'

আবরার বলল, 'শশীগড়ের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু ওখানে নয়। আমি যেতে চাই শশীগড়ের ঠিক পাশে হাড্ডিপট্টি নামের একটা জায়গায়।'

পাগলুর শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে প্যাডেল করতে গিয়ে একটা হোঁচট খেল। আচমকা ব্রেক কষে থেমে গেল মাঝরাস্তায়। আবরার জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো পাগলু? তুমি ঠিক আছ?'

পাগলু কাঁপা গলায় বলল, 'সত্যি কইরা কন তো আপনের মতলবডা কী? রেলস্টেশন থাইকা প্রথমে গেলেন শেফালীর গ্যারেজে, সেইখান থাইকা সাধন কমিশনারের অফিসে। সেই পর্যন্ত ঠিক আছিল। বিপদে পড়লে মানুষ নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে। জায়গা-অজায়গায় গিয়া তদবির করে। এডি সবই ঠিক আছে। কিন্তু হাড্ডিপট্টিতে কেন যাইবেন এত রাইতে? কী এমন কাজ আপনের?'

আবরার রিকশায় গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। পাগলুর কথা শুনে সে হা হা করে হেসে বলল, 'কেন হাড্ডিপট্টিতে গেলে কী হয়? যতদূর জানি শেফালী ও সাধন দুইজনই খারাপ মানুষ। হাড্ডিপট্টিও খারাপ জায়গা। কিন্তু কতটা খারাপ যে তুমি নাম শুনে ওভাবে আঁতকে উঠলে?'

পাগলু ধীরে ধীরে প্যাডেল মারতে শুরু করেছে। আবরারের প্রশ্নের উত্তরে সে অনেকক্ষণ কিছুই বলল না। তারপর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আল্লাহ খারাপ মানুষরে শাস্তি দেওয়ার জন্য দোজখ বানাইছে। দোজখ কিন্তু একটা জায়গা না, হ্যার সাতটা আলেদা তলা আছে। দুইন্যার মধ্যে যারা সবচেয়ে বড় পাপী তারা যাইব দোজখের সবার নিচের তলা হাবিয়ায়। সেইহানে আগুনের ভিত্রে তারা জন্মের মতো জ্বলব। অহন নন্দনগড়রে যদি দোজখ হিসেবে ধরেন তাইলে হাড্ডিপট্টি হইল হাবিয়া। এইখানে পাপের কুনো তল নাই। তিনশো ঘর খালি পকেটমার আছে। ক্যামনে পকেট কাইট্টা লইয়া যাইব টেরই পাইবেন না। বাকিরা অজ্ঞানপার্টি, ছিনতাইকারী, ডাকাইত, মাদক ব্যবসায়ী, জুয়াড়ি। পুরুষ-মহিলা কেউই কারো চাইতে কম না। সবাই ক্রাইম কইরা খায়।'

পাগলুর বর্ণনা শুনে আবরার কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। থুতনিতে হাত দিয়ে কী যেন ভেবে বলল, 'এ রকম একটা এলাকা নন্দনগড়ে টিকে আছে কীভাবে? সরকার বা স্থানীয় ভদ্রলোকেরা কোনো ব্যবস্থা নেয় না?'

রিকশার গতি ইতিমধ্যে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। পাগলুর হতবিহ্বল ভাবটা কেটে গেছে। সে জোরসে প্যাডেল মেরে বলল, 'হাড্ডিপট্টির লোকেদের সাথে শহরের মানুষের একটা চুক্তি আছে।'

আবরার কথাটা শুনে বেশ মজা পেল। এ রকম অদ্ভুত কথা সে আগে কখনো শোনেনি। বিদ্রুপের ছলে সে বলল, 'চুক্তি আছে? কী রকম চুক্তি?'

পাগলু যাত্রীর শ্লেষ অগ্রাহ্য করে বলল, 'চুক্তি আছে যে, কেউ কাউরে দিস্টাব দিবো না। নন্দনগড়ের লোক হাড্ডিপট্টিরে শান্তিতে থাকতে দিবো। বিনিময়ে হাড্ডিপট্টির লোকও শহররে শান্ত রাখবো। কেউ কারো বাড়া ভাতে ছাই দিবো না। কেউ কাউর পায়ে পাড়া দিয়া কাইজ্জা করবো না।'

আবরার বলল, 'তুমি বলছো এতগুলো চোর, পকেটমার, ছিনতাইকারী কেউ শহরে অপরাধ করে না? তাহলে করে কোথায়?'

'বাইরের ডিস্টিকে যায়। বাংলাদেশে শহরের অভাব হইছেনি? ওইসব জায়গায় গিয়া কামধাম সারে। যেকোনো মেলা, পূজা, ঈদের জামাত, ওয়াজ মাহফিলে এরা হাজির থাকে। মহিলাগো কাম মহিলারা করে। বড় বড় পকেটমারেরা পাসপোর্টে ভিসা লাগাইয়া ইন্ডিয়ায় যায়। কিছু কিছু বেশরম, নাউজুবিল্লাহ, কইতেও ঘিন্না লাগে, ইজতেমার সময় টঙ্গী গিয়া পকেট কাইটা আসে।'

আবরার বলল, 'তাই বলো! শহরে এরা কোনো অপরাধ করে না। যা করার বাইরে গিয়ে করে। আচ্ছা, পুলিশ এদের কিছু বলে না?'

পাগলু বলল, 'কী কইবো? বাইরের ডিস্টিকে হ্যাগো কুনো পাওয়ার আছেনি?'

আবরার মাথা নাড়ল। কুয়াশায় পথঘাট পুরো অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তায় বাতি নেই বলে সরু পথগুলো ভালো বোঝা যাচ্ছে না। স্পিড ব্রেকার ও রাস্তার পটহোলে রিকশার চাকা পড়ে দুর্বিষহ ঝাঁকি খেতে হচ্ছে। ঝাঁ চকচকে রাস্তায় এতক্ষণ চলার পর পথের এই দুর্দশা দেখে আবরার বুঝল হাড্ডিপট্টি বেশি দূরে নয়।

পাগলুও সে কথাই বলল, 'আমরা কাছাকাছি চইলা আসছি। হাড্ডিপট্টি কার কাছে যাইবেন?'

আবরার বলল, 'লেদু মেকারের দোকান চেনো? ওখানে?'

'লেদুর দোকান কে না চেনে। লেদু হইল পকেটমারগো ওস্তাদের ওস্তাদ। এমন কোনো তালা নাই হ্যায় খুলবার পারে না। এমন কুনো লোক নাই যার চোখে ধুলা দিবার পারে না।'

আবরার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আচ্ছা। আমি সাবধানে থাকব।'

অন্ধকার হাতড়ে পাগলুর রিকশা যখন লেদু মেকারের দোকানে গিয়ে থামল ততক্ষণে রাত তিনটা বেজে গেছে। রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলোও যেন কুণ্ডলীর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গাঢ় কুয়াশার চাদরে রহস্যময় হাড্ডিপট্টির রহস্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। এরই মাঝে এখনো লেদু মেকারের দোকান খোলা।

দোকানে যে মাঝবয়সী লোকটা বসে বসে একটা তিন ব্যান্ডের রেডিও মেরামত করছে সে নিশ্চয়ই লেদু। লোকটার দোকানে চল্লিশ ওয়াটের হলুদ বাতি জ্বলছে। সেই যৎকিঞ্চিৎ আলোর মধ্যে বসে সে কাজ করছে। তার টেবিলে কয়েকটা আধখোলা রেডিও, টেলিভিশনের পিকচার টিউব ও কম্পিউটারের মনিটর। লেদুর বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। চোখে কালো ফ্রেমের পুরু কাচের চশমা। গায়ে ঘিয়ে রঙের কাশ্মীরি চাদর। নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি ও পায়ে পশমি পুরু মোজা। মাথায় টেরিকাটা মাঝারি চুল। নাকের ওপর পাতলা গোঁফ। দোকানের সামনে রিকশা থামতে দেখে লেদু অবাক হয়ে তাকাল। একটা অ্যান্টিক মারফি রেডিওতে হিন্দি গান বাজছিল, 'মুসাফির হুঁ ইয়ারো, না ঘর না ঠিকানা...'

আবরারকে দোকানের দিকে আসতে দেখে লেদু মেকার ভলিউম কমিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। লোকটার চশমার পাওয়ার বোধহয় মাইনাস সাত কি আট। বড় বড় চোখে কোন দিকে তাকিয়ে আছে সেটা ভালো করে বোঝা যায় না। আবরার টেবিলের সামনে দাঁড়ালে লেদু হেসে বলল, 'আপনি আমার কাছে টেলিভিশন সারাইতে আসেন নাই, তাই না?'

আবরার মাথা নাড়ল। একটা ছোট্ট বসার টুল দেখিয়ে লেদু বলল, 'এখানে বসুন। বসে কথা বলি।'

হাতঘড়িতে একবার সময় দেখে আবরার বলল, 'আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না। একটা কাজ আছে আপনার জন্য। তিন ঘণ্টার মধ্যে করে দিতে পারলে ৩০ লাখ টাকা পাবেন। করবেন?'

লেদু মেকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনার হাতে সিটিজেন অটোমেটিক ঘড়ি। মার্কেটে যার মূল্য ৩৫ হাজার টাকা। শার্ট-প্যান্ট-জ্যাকেট-জুতা মিলে দশ-বারো হাজার টাকার বেশি হবে না। মোবাইলটা আইফোন। কিন্তু সেটাও ছয়-সাত বছরের পুরনো

মডেলের। দাম এতদিনে অর্ধেক হয়ে গেছে। পেছনে ফেরেন নাই, নাহলে মানিব্যাগ দেখে আন্দাজ করতাম ভেতরে কত টাকা আছে। তবে রাত তিনটায় হাড্ডিপট্টিতে যেহেতু আসছেন, মনে হয় না ৫ হাজার টাকার বেশি আছে। অর্থাৎ সব মিলায়ে আপনার দাম এক লাখ টাকাও হবে না। সেই আপনে আমাকে ৩০ লাখ টাকার কাজ দিচ্ছেন, কেমন অস্বাভাবিক লাগতেছে না?'

আবরার রহস্য করে বলল, 'এমনও তো হতে পারে আমার হাতের ট্রাভেল ব্যাগটাতে পুরস্কারের টাকা রাখা আছে। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে আপনাকে আপনার প্রাপ্য এখান থেকে বুঝিয়ে দেয়া হবে।'

লেদু মেকার চেয়ারের হাতলে দুই হাত রেখে পেছনে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'আপনার ব্যাগে দুইটা ক্রেডিট কার্ড ছাড়া দামি কোনো বস্তু নাই। আপনি বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান লোক কখনো সাথে করে অতগুলো টাকা বহন করে না। তারা টাকাটাকে গোল্ড বা ডায়মন্ডে কনভার্ট করে। আপনার ব্যাগে একটা নীল মখমলের পোঁটলা আছে, কিন্তু সেটা যমুনা সেতুর ছবিওয়ালা ৫ টাকার কয়েনে বোঝাই।'

আবরার আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এয়ারপোর্টের এক্স-রে মেশিন আপনার চোখে লাগানো আছে নাকি? এতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কীভাবে বললেন?'

লেদু মেকার হেসে টেবিলের ওপর দুটো ভিসা ও আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড এবং নীল মখমলের একটা পাউচ বের করে রাখল।

আবরার বিস্মিত হয়ে ব্যাগে হাত রেখে বলল, 'কখন করলেন?'

লেদুর চোখেমুখে গর্বের ঝিলিক ফুটল। সে আলগোছে জিনিসগুলো আবরারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ভয় নাই। আপনার কোনো জিনিস খোয়া যায় নাই। কথা বলতে বলতে কাজটা করছি। চোখের পলক ফেলতে ফেলতে হয়ে যায়। আপনি কিছু টের পান নাই, না?'

'একদম না।' আবরারের কণ্ঠে চূড়ান্ত বিস্ময়ের সুর। সে অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'মাই গড! এ রকম স্মুথলি কাজ করতে আমি কাউকে আগে কখনো দেখি নাই।'

লেদু যেন লজ্জা পেয়েছে। চোখের দৃষ্টি টেবিল ছেড়ে উপরে উঠছে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর তাই না? গোয়েন্দা?'

'কীভাবে বুঝলেন? নাকি চেহারা দেখে অনুমান করেছেন?'

লেদু মেকার মাথা নেড়ে বলল, 'আইডি কার্ড খুব দামি জিনিস। একবার হারাইলে আর পরিচয় নাই। আপনার মানিব্যাগ খুলে দেখেন তো আইডি কার্ডটা আছে না নাই?'

আবরার মানিব্যাগ খুলে দেখল আইডি কার্ডটা সেখানে নেই। অথচ তার মনে আছে সাধন কমিশনারের অফিস থেকে বের হওয়ার সময়ও আইডি কার্ডটা ছিল। সে নিজে চেক করেছিল। সে ঠোঁট কামড়ে বলল, 'এটাও আপনি হাত সাফাই করেছেন?

এইবার লেদুর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে গলায় দরদ ঢেলে বলল, 'খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন। হাত সাফাই। লোকজন এই গুণের কদর বোঝে না। পকেটমার বলে গালি দেয়। আমি বলি এটা একটা ম্যাজিক। ম্যাজিশিয়ানরা স্টেজে উঠে যেমন খেলা দেখায়, এটাও তেমন একটা খেলা। এই খেলা খেলে আমাদের হাড্ডিপট্টির অনেকের সংসার চলে। ম্যাজিশিয়ানদের সবাই কত সমীহ করে। টেলিভিশনে তাদের খেলা দেখায়। পিসি সরকার, জুয়েল আইচ, ডেভিড কপারফিল্ডদের কত নামডাক। তারা ভুল করলেও মানুষ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। অথচ হাটে-বাজারে একজন পকেটমার ধরা পড়লে কী হয়? লোকজন মারতে মারতে হাড়গোড় ভাইঙ্গা দেয়।'

আবরার বলল, 'ম্যাজিশিয়ানরা কিন্তু কারো গাঁট কাটে না।'

লেদু মেকার আপত্তি করে বলল, 'কাটে। একেবারে মুফতে কেউ ম্যাজিক দেখায় না। ওটা ওদের পেশা। হাত সাফাই আমাদের পেশা। এভাবেই আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে আছি।'

আবরার আইডি কার্ড নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'আপনি কিন্তু আমার অফার নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। আপনি কাজটা না করলে অন্য কারো কাছে যেতে হবে।'

লেদু মেকার হা হা করে হেসে বলল, 'নন্দনগড়ে আমরা কোনো কাজ করি না। এটা চুক্তির বরখেলাপ হবে। সেজন্য কোনো মন্তব্য নাই।'

'আপনি কী করে বুঝলেন কাজটা নন্দনগড়ে?'

লেদু মেকার ধীরে কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'এই শহরে আমার হাজারটা চোখ, হাজারটা কান আছে। শহরের কোনো মহল্লায় পাতা পড়ার আগেও আওয়াজ আমার কানে আসে। আপনার ট্রেনের টিকিটটাও কিন্তু আমার কাছে আছে।'

আবরার পুনরায় টিকিট নেয়ার জন্য হাত পাতলে লেদু মেকার ফিরিয়ে দেয়ার কোনো আগ্রহ দেখাল না। সে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'তিন ঘণ্টায় তিরিশ লাখ খুব ভালো অফার। কিন্তু আমার একটা নীতি আছে, সাগরেদদের ভাগে কখনো হাত লাগাই না। এতে হাত নোংরা হয়। আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে হেল্প করতে পারছি না।'

আবরার বলল, 'আপনি হাত সাফাইয়ের জাদুকর। শহরের সমস্ত ক্রিমিন্যাল আপনাকে মন থেকে সম্মান করে। একমাত্র আপনি চাইলে আমার ক্লায়েন্টের টাকাটা উদ্ধার হবে।'

লেদু মেকার সামনে ঝুঁকে একেবারে আবরারের মুখের কাছে এসে বলল, 'পারব না। আমি নন্দনগড়ে কাজ করি না।'

আবরার আপত্তি করে বলল, 'আপনার কোনো না কোনো সাগরেদ চুক্তি ভেঙেছে। তার শাস্তি দেবেন না?'

লেদু কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে বলল, 'সেটা তার ব্যাপার। শাস্তি দেয়ার লোক আমি না। সেজন্য পুলিশ আছে, নেতারা আছে। আমি পিঁপড়াকে পর্যন্ত মারি না। কাউকে শাস্তি দেয়া দূরের কথা।'

আবরারের চোখ-মুখ এবারে শক্ত হয়ে এল। সে কঠোর গলায় বলল, 'সাগরেদদের কারো হাতে একটা খুন হয়েছে। আমার ক্লায়েন্ট সাদিক মাহবুবকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুন করেছে। আপনি এখনো বলবেন শাস্তি দেবেন না?'

লেদু মেকারের মুখ মুহূর্তের মধ্যে রক্তশূন্য হয়ে গেল। কথা বলার জন্য মুখ খুললেও কথা বের হলো না। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'সাদিক খুন হয়েছে? কই, আমি তো জানি না।'

'শুধু খুন নয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে শ্বাসনালি কেটে খুন করেছে। মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন একটা লোককে খুনি একটুও দয়া দেখায়নি।'

লেদু মেকার চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখল। চশমা পরতে অভ্যস্ত লোকদের চশমা ছাড়া দেখলে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে। লেদু মেকারকেও ঠিক তেমনি দেখাল। সে কিছুক্ষণ আঙুলে চোখের কোণ ধরে নিশ্চুপ বসে রইল। তারপর চোখ না খুলেই বলতে লাগল, 'সাদিক আর আমি সমবয়সী। আমরা মামাতো-ফুফাতো ভাই। দুজন একই সঙ্গে বড় হয়েছি, একই ক্লাসে পড়েছি। আমার জীবনের প্রথম বন্ধু সে।'

আবরার নিঃশব্দে লেদু মেকারের দিকে তাকিয়ে রইল। সে জানে লেদু এবারে মুখ খুলবে। এমন অনেক কথা বলবে যা জীবনেও কাউকে বলেনি।

পাঁচ

লেদু বলতে শুরু করল—

মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৭২ সালে আমার জন্ম হয়। সাদিক মাহবুবের জন্ম তার ঠিক ছয় মাস পর। আমার মা শামসুন্নাহার ও সাদিকের বাবা নুরুল আলম আপন ভাই-বোন। আমাদের বাড়িও ছিল পাশাপাশি, এখনকার হাড্ডিপট্টিতে। তখন অবশ্য হাড্ডিপট্টি নাম ছিল না। তখন এই এলাকার নাম ছিল গুলবাগিচা। নন্দনগড় শহরের বিহারিদের বাড়ি ছিল এখানে। বড় বড় বিহারি ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ খান, আলী আফতাব, চৌধুরী সিবগাত উল্লাহ এদের বাড়ি ছিল গুলবাগিচায়। পার্টিশনের পর এরা এদেশে এসে সুজি, বিস্কুট ও ডালডার কারখানা বসিয়ে প্রচুর টাকা-পয়সা ইনকাম করেছিল। আমাদের বাঙালিরা ব্যবসা বোঝে না। করতেও চায় না। ওদিকে বিহারিরা জাত ব্যবসায়ী। সামান্য তহবিল সঞ্চয় করে, ছোটখাটো ব্যবসা করতে করতে তারা বড় ব্যবসা দাঁড় করিয়ে ফেলে। একেবারে মরুভূমির বুকে মরূদ্যান তৈরি করার মতো।

স্বাধীনতার পর বিহারিদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল। তারা কারখানা বিক্রি করে পাকিস্তানে যাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। বড় বড় ব্যবসা ততদিনে সরকার জাতীয়করণ করতে শুরু করেছে। পাটকল, সার, সিমেন্ট কারখানা সবই চলছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। নন্দনগড়ের

কারখানাগুলো অবশ্য সরকারের চোখে পড়ার মতো অত বড় ছিল না। তবে ঠিকই বাঙালি প্রভাবশালীদের নজরে পড়েছিল। তারা নামমাত্র মূল্যে কারখানাগুলো কিনে চালাতে শুরু করল।

কিন্তু বাঙালি চাইলেই কী আর ব্যবসা করতে পারে? আমাদের রক্তে আছে দাসত্বের মানসিকতা। নতুন মালিকরা ঋণগ্রস্ত হয়ে অচিরেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলল। ঠিক সে সময় পর্দায় আগমন ঘটল নোয়াখালীর এক উঠতি ব্যবসায়ী সুরুজ উদ্দিনের।

সুরুজ প্রথম জীবনে ছিল জাহাজের খালাসি। পশ্চিম পাকিস্তানের জাহাজ এমভি কেহেরমানে চাকরি করত। বেলুচিস্তান প্রদেশের এক বড় ব্যবসায়ী আজিজ ইকবাল ছিল ওই জাহাজের মালিক। সুরুজ অল্পদিনের মধ্যে আজিজ সাহেবের আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিল।

শিপিং কিন্তু আজিজ সাহেবের মূল ব্যবসা ছিল না। ওটা ছিল তার চোরাচালান ব্যবসার কাভার। সুরুজ দ্রুত বিশ্বস্ত লোকে পরিণত হলে আজিজ তাকে স্মাগলিংয়ের কাজে লাগিয়ে দেয়। সুরুজের মূল কাজ ছিল ইরান থেকে আফিম এনে পাকিস্তানের দুই অংশে সাপ্লাই দেয়া। এ কাজ করতে গিয়ে ইরান, পাকিস্তান, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ায় তার বিরাট নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাকিস্তান দুই টুকরো হলেও সুরুজের নেটওয়ার্কে টান পড়েনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুরুজের আর পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। তার মনিব আজিজ ইকবালকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সরকার ফাঁসি দিলে সুরুজ বাংলাদেশেই থিতু হওয়ার উপায় খুঁজতে থাকে। এই সময় তার নজরে পড়ে ক্রমেই পতনশীল নন্দনগড় শহর।

নন্দনগড়ের ইতিহাস জানেন তো? এককালে এটা নন্দনগড় নামের রাজ্যের রাজধানী ছিল। মাটির উপরে যে ইট-কাঠ-পাথরের নন্দনগড় শহর দেখেন, তারচেয়ে অনেক বড় শহর মাটির নিচে ঘুমিয়ে আছে। আমাদের ছোটবেলায় বাড়ির ভিত্তি দেয়া বা কুয়া খোঁড়ার সময় পুরনো ইট, খোলা বা মূর্তি পাওয়া যেত। এখনো পাওয়া যায়।

আমরা নন্দনগড়ের মানুষ যখন রাজ্য চালাতাম, বাংলাদেশের অন্য এলাকা তখনো জনশূন্য ছিল। লোক থাকলেও তারা পশুর চামড়ার লেংটি পরে বেড়াত। এই কারণে বুদ্ধি ও চিন্তায় অন্যদের চাইতে আমরা অগ্রসর। এই ব্যাপারটা সুরুজ উদ্দিনের মাথায় ধরল। সে কারখানা চালানোর আড়ালে নন্দনগড়কে ব্যবহার করে মাদকের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফন্দি আঁটল।

যেই ভাবা সেই কাজ। সুরুজের হাতে কাঁচা পয়সা ছিল। সে পরিত্যক্ত কারখানাগুলো কিনে চালু করে ফেলল। দিনের বেলা ডালডা, সুজি, বিস্কুট বানানো হতো, রাতের বেলা চলত হেরোইনের ব্যবসা। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে জাহাজে করে আনা হেরোইন সুরুজের কারখানায় এনে ডালডা, সুজি, বিস্কুটের সঙ্গে লুকিয়ে জাহাজ ও বিমানযোগে দেশের বাইরে পাচার করা হতো। এই করে সুরুজের অবস্থা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল।

মাদকের ব্যবসা নিঃশব্দে করা যায় না। লোক জানাজানি হয়। লোকের মুখ বন্ধ করার জন্য, নির্বিঘ্নে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সুরুজ উদ্দিনের লোক পোষার প্রয়োজন হলো। সে পয়সা দিয়ে গড়ে তুলল এক বিরাট গুণ্ডাবাহিনী।

বাংলাদেশের মতো জায়গায় রাজনৈতিক ছত্রছায়া ছাড়া ভালো বা মন্দ কোনো কাজেই সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। গুণ্ডামি করার জন্যও রাজনৈতিক আশকারার প্রয়োজন হয়। তখনকার ক্ষমতাসীন দলের সমর্থন সহজেই পাওয়া গেল। নন্দনগড়ের পতনের সেই শুরু।

সময়টা আশির দশক। দেশে তখন জেনারেল এরশাদ সাহেবের শাসন। হলিউড-বলিউডের ডিস্কো বিট মফস্বল শহরকেও নাড়া দিচ্ছে। ভিসিআর ও রঙিন টেলিভিশন মানুষের বর্ণান্ধ চোখে আলো ফোটাল। আদর্শবাদী রাজনীতি ঝেড়ে ফেলে প্রতিক্রিয়াশীল নানা গোষ্ঠী রাজনীতিতে শক্তিশালী হচ্ছিল। দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মারামারি লেগেই ছিল। সমাজের পচনের সেই ভঙ্গুর সময়ে নন্দনগড়ে এল ফেনসিডিল নামের এক নতুন ড্রাগ। এসেই একেবারে বাজিমাত করল। পিরামাল ফার্মা নামের এক ভারতীয় কোম্পানি কাশির সিরাপ হিসেবে ফেনসিডিল তৈরি করত। সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে এসে এটা হয়ে গেল নেশার দ্রব্য। ফেনসিডিলের রমরমা ব্যবসা সুরুজের নজর এড়াল না। সে হেরোইনের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসার জায়গায় ফেনসিডিলের ব্যবসায় অর্থ লগ্নি করতে শুরু করল। নন্দনগড় অচিরেই ফেনসিডিলে বোঝাই হয়ে গেল। ছেলে-বুড়ো সবাই হাত বাড়ালেই ফেনসিডিলের বোতলের নাগাল পেল। নতুন মাদকের রমরমা দেখে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে মাদক ব্যবসায়ীরা এখানে জড়ো হতে শুরু করল। মাদকের হাত ধরে শহরে পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে পড়ল সহিংস নানা অপরাধ। নন্দনগড়ের আইন-শৃঙ্খলার তখন টালমাটাল দশা। কিন্তু রাজনৈতিক ছত্রছায়া থাকায় সুরুজ উদ্দিনের কিছুই হলো না।

আমরা তখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করে সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এরশাদবিরোধী আন্দোলনের হাওয়া তখন জোরেশোরে বইছিল। আমাদের মফস্বল শহরও এর বাইরে ছিল না। কলেজে একসঙ্গে ভর্তি হলাম আমি, সাদিক মাহবুব ও সাধন চক্রবর্তী। সাদিকের রাজনীতি নিয়ে তেমন আগ্রহ না থাকলেও আমার ও সাধনের ছিল। আমি যোগ দিলাম সরকারি দলে। সাধন বিরোধী দলে। যদিও এতে আমাদের বন্ধুত্বে কোনো প্রভাব পড়েনি।

আমি ও সাধন বরাবরই ডানপিটে ছিলাম। খেলাধুলায় যেমন, তেমনি মারামারিতেও সামনের সারিতে থাকতাম। সুরুজ উদ্দিনের ছিল জহুরির চোখ। আমাদের দুজনকে চিনে নিতে তার সময় লাগল না। মারামারি করে আমাদের নামে ততদিনে থানায় দুই-তিনটা অভিযোগ পড়েছে। সুরুজ উদ্দিন প্রস্তাব দিল, তার সঙ্গে কাজ করলে থানা-পুলিশের ব্যাপারটা সে দেখবে। সুরুজ উদ্দিনের অর্থ ও ক্ষমতার কথা নন্দনগড়ের কারো অজানা ছিল না। আমাদের আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে। হাসতে হাসতে সুরুজের দলে নাম লেখালাম। সাদিক রইল এসব থেকে দূরে। সে আমাকে সুরুজের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু সৎ পরামর্শ শোনার মতো অবস্থা আমার তখন ছিল না।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ছোটবেলা থেকে আমার ম্যাজিক নিয়ে খুব আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে চমৎকার পামিং করতে পারতাম। পামিং জানেন তো? হাতের মুঠোয় পয়সা বা এ ধরনের কোনো ছোট বস্তু রেখে চোখের পলকে উধাও করে দেয়ার খেলা। হাত সাফাই। সুরুজ উদ্দিন কীভাবে যেন জেনে গেলেন আমার আগ্রহের কথা। একদিন ডেকে নিয়ে আমাকে ম্যাজিক দেখাতে বললেন। বসের মন জয়ের সুযোগ পেয়ে আমিও নিজের সর্বস্ব দিয়ে সেদিন ম্যাজিক দেখালাম। সুরুজের বজ্রকঠিন মুখে সেদিন হাসির রেখা ফুটেছিল।

সেদিনের পর থেকে সুরুজের নির্দেশে আমি শহরের পকেটমারদের সর্দার খলিলের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলাম। খলিল বয়সে প্রবীণ। এককালে পকেটমারদের সমাজে আঙুলের জাদুকর হিসেবে খুব নাম করেছিলেন। তার কাছে শুরু হলো আমার ট্রেনিং। সেসবের বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না। শুধু এটুকু বলছি, অচিরেই আমি খলিল ওস্তাদকে ছাড়িয়ে গেলাম। শখের হাত সাফাই থেকে শুরু করে আমি পুরোদস্তুর 'আঙুল শিল্পী' হয়ে উঠলাম। মারামারির জগতের চাইতে এ জগৎটাই আমার বেশি ভালো লাগল। আমি শহরের উঠতি পকেটমারদের ট্রেনিং দিতে শুরু করলাম। এরাই হয়ে উঠল নন্দনগড়ে আমাদের চোখ ও কান।

সাধন চক্রবর্তী ছিল সিনেমার পোকা। সুরুজ উদ্দিন ধাত বুঝে নিজের মালিকানাধীন পয়সা টকিজের ম্যানেজারির কাজে সাধনকে লাগিয়ে দিল। মুফতে বাংলা সিনেমা দেখার সুযোগ পেয়ে সাধনও তুমুল উৎসাহে পয়সা টকিজ চালাতে আরম্ভ করল। প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার তাকে পয়সা টকিজের বাঁধা রিকশায় মাইক ও পোস্টার নিয়ে ক্যানভাসিং করতে দেখা গেল। দলের সশস্ত্র ছেলেদের সামলানোর পাশাপাশি সিনেমাই হয়ে উঠল সাধনের ধ্যানজ্ঞান।

দেশব্যাপী আন্দোলনের মাঝেও আমাদের কাজ দিব্যি চলছিল। সুরুজ লোকের কদর করতে জানত। শিক্ষিত ছেলে বলে আমাদের যথেষ্ট সম্মান ও স্বাধীনতা দিত। সেই সুবাদে আমরা তখন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছিলাম।

তবে সব সুসময়েরই শেষ আছে। আমাদের সুখের সংসারে প্রথম দোলা দিল শেফালী। পয়সা টকিজের পেছনে বিশ-পঁচিশটা ঘর নিয়ে ছিল নন্দনগড়ের বিখ্যাত পাড়া। রসিক লোকেরা বলত নন্দনকানন। সেখানকার সর্দারনি আছিয়ার মেয়ে ছিল শেফালী। অমন ডাকসাইটে সুন্দরী নন্দনগড়ের ইতিহাসে আজ অবধি জন্ম নেয়নি। আমাদের বসের

চারিত্রিক দোষের মধ্যে একমাত্র ছিল নারীলিপ্সা। আছিয়ার সুন্দরী কন্যাকে সে রক্ষিতা বানিয়ে ফেলল।

শহরের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর লোকটির বাহুডোরে বাঁধা পড়েও শেফালী সুখী ছিল না। তার মনেপ্রাণে ছিল সিনেমার নেশা। স্বপ্ন ছিল রুপালি পর্দার নায়িকা হবে। তবে নন্দনগড় থেকে এফডিসির পথ তখন অত সোজা ছিল না। তাছাড়া সুরুজ তার প্রিয় পাত্রীটিকে কেন ফসকে যেতে দেবেন? শেফালীর ইচ্ছার ফুল তাই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। ফোটার অবকাশ পেল না।

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর ইচ্ছায় শেফালীর পা ঘন ঘন পয়সা টকিজে পড়তে আরম্ভ করল। অবধারিতভাবে সেরা সুন্দরীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তরুণ ম্যানেজার সাধনের। কাছাকাছি বয়সের দুজন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে প্রেম জমাট বাঁধতে সময় লাগল না। কর্তা কিছু অনুমান করার আগেই দুজন দুজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বিপজ্জনক পথে পা দিয়েছিল সাধন। সুরুজ সাহেব টের পেলে তাকে আস্ত রাখবে না। সঙ্গে শেফালীকেও কেটে টুকরো টুকরো করবে। আমি বুঝতে পেরে সাধনকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভালো পরামর্শ শোনার মতো ঠাণ্ডা রক্ত তখন তার শরীরে ছিল না। এক ফুৎকারে সে সব উড়িয়ে দিতে চাইল। বিপদের খড়্গ গলার ওপরে ঝুলিয়ে রেখে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেল শেফালীর আলিঙ্গনে।

এভাবে কেটে গেল দুই বছর। বসের চোখ এড়িয়ে তারা এতদিন কীভাবে প্রেম করল কে জানে। তবে আমার ধারণা বসকে কেউ সাহস করে কথাটা বলতে পারেনি। সাধনকে সে খুব বিশ্বাস করত। শেফালীকেও জান দিয়ে ভালোবাসত। বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র থাকলেও শেফালী ছিল তার সবচেয়ে কাছের মানুষ। যার সঙ্গে কাগুজে বিয়ে না করেও দাম্পত্য জীবন ভাগ করে নিয়েছিল।

হাত সাফাই নিয়ে আমি যতই ব্যস্ত হলাম, ততই সাদিক মাহবুব আমার জীবন থেকে দূরে সরে গেল। অনেক দিন ওর কোনো খবর পাই না। মামার কাছে শুনেছি, সে কুষ্টিয়ায় কোন কারখানাতে গিয়ে চাকরি নিয়েছে। চিঠিও লেখে কালেভদ্রে। আমি আর মাথা ঘামাইনি। দলে দলে যুবক তখন আমার কাছে ট্রেনিং নিচ্ছে। তাদের কাছে আমি ওস্তাদ। হাত সাফাইয়ের মহান শিল্পী। ট্রেনিং শেষ করে তাদের বড় বড় শহরে পাঠিয়ে দেয়া হতো। শহরের অলিগলি, বাস-ট্রেন-লঞ্চে দিন-রাত খেটে তারা অসতর্ক মানুষের যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নিত। তবে এ লাইনে একা কাজ করে খাওয়ার উপায় নেই। সুরুজ সাহেবের ভাগ ছিল। আমাকেও ভালোবেসে গুরুদক্ষিণা দিত। এক রেডিও মেকানিকের যন্ত্রপাতিভর্তি ক্যাম্বিসের ব্যাগ উপহার পেয়ে আমার ইলেকট্রনিক পণ্যের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল।

এরই মাঝে শুরু হলো দেশে আন্দোলনের ঝড়। আট বছর ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার পর গণ-আন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতন হলো। দেশে শুরু হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন। বহু বছরের রাজনৈতিক খুঁটিটা আমাদের সামনে থেকে সরে গেল। প্রশাসন আর আমাদের কথা শুনছিল না। উল্টো চোখ রাঙাতে শুরু করল। আমাদের উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে প্রতিনিয়ত বাধা দিতে শুরু করল। এতদিন যে জিনিসটা দেখিনি, সেটাই দেখলাম সুরুজ সাহেবের চোখে-মুখে। শঙ্কা।

নন্দনগড়ে নতুন নতুন মাথা গজিয়ে উঠল। তারা বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষের লোক ছিল। এতদিন কব্জে পায়নি বলে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে আমাদের কার্যক্রমে আক্রমণ করে বসল। ঠিক এ সময় সুরুজ সাহেব চূড়ান্ত ধাক্কাটি খেলেন। সাধনের সঙ্গে শেফালীর প্রেমের সম্পর্ক ফাঁস হয়ে গেল। রাগে-দুঃখে সুরুজ উদ্দিন সাধনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। আমাদের নির্দেশ দিলেন, সাধনকে যেখান থেকে হোক ধরে আনতে হবে। জীবিত কী মৃত তার পরোয়া নেই।

সাধন পালিয়ে গেল। শেফালীর প্রতি সুরুজের তীব্র মোহ ছিল। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার পরও তাকে শাস্তি দিতে পারেন নাই। মাফ করে দিলেন। সেটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

ঠিক এ সময় নন্দনগড়ে আবির্ভাব হলো সাদিক মাহবুবের। একী অবস্থা হয়েছে সাদিকের। সেদিনের সেই হ্যাংলা, ভীতু ছোকরাটি আর নেই। তার ত্বক রোদে পোড়া, চোখের দৃষ্টি বরফশীতল, চলাফেরায় সামরিক শৃঙ্খলা। কোমরে একটা পিস্তল রেখে সব সময় চলাফেরা করে। সাদিককে দেখে নানাজন নানা রকম মতামত দিতে শুরু করল। কেউ বলল, সে শ্রীলংকায় গিয়ে তামিল টাইগারদের কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। কেউ বলল, নেপালের মাওবাদীদের হয়ে যুদ্ধ করে এসেছে। কেউ কেউ তাকে আফগানিস্তান ফেরত মুজাহিদ বলেও সন্দেহ করল। আসলে সে কোথায় গিয়েছিল কেউ জানে না। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করলেও উত্তর পাইনি।

সাদিক আমাদের প্রতিপক্ষের এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কাজ করতে শুরু করল। তবে রাজনীতি নয়, ওই নেতার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ধ্বংস করা। আমাদের ব্যবসা, সরবরাহ, বিপণন ব্যবস্থায় তারা স্যাবোটাজ করতে শুরু করল। নন্দনগড় সিন্ডিকেটের জন্য সে এক করুণ সময়।

প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের মুখে আমি গা-ঢাকা দিলাম। একের পর এক ধাক্কা খেয়ে সুরুজ সাহেবের অবস্থা নড়বড়ে। আন্ডারগ্রাউন্ডে পালিয়ে থাকার সময় সাদিক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। হাজার হোক, আমরা মামাতো-ফুপাতো ভাই। রক্তের টান আছে। সে প্রস্তাব দিল, আমাকে পলিটিক্যাল ব্যাকআপ দেবে। বিনিময়ে সুরুজের সঙ্গে কাজ করা ছেড়ে দিতে হবে।

আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম। একটা লোক শূন্য থেকে আমাকে এতদূরে এনেছে। তারই নুন দীর্ঘদিন খেয়েছি। এখন কী করে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি?

এ সময় আমার সঙ্গে দেখা করল সাধন। কিছুদিন ওপারে পালিয়ে থেকে আবার দেশে ঢুকেছে। নন্দনগড়ে পা রেখেছে প্রতিশোধ নেয়ার বাসনায়। সুরুজকে সে খতম করতে চায়। সেই সঙ্গে শেফালীকে নিজের করে পাওয়ার উদগ্র বাসনা তার চিন্তাশক্তিকে ঝাপসা করে দিয়েছিল।

সাদিকের প্ররোচনায় সাধন ও আমি এক হলাম। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে শহরের দখল টিকিয়ে রাখব সেটাই আমাদের মূল ভাবনা।

সাদিক-সাধনের ইশারায় এরই মধ্যে শেফালী পালিয়ে চলে এল। সুরুজ উদ্দিনের এতদিনের অহংকার নিমেষে চুরমার হয়ে গেল। সে আহত বাঘের মতো যন্ত্রণায় গজরাতে লাগল। সময়-সুযোগ বুঝে টোপ ফেলল সাদিক। সুরুজের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলল, শেফালীকে ফিরিয়ে আনতে সে সাহায্য করতে পারে।

এতগুলো ধাক্কা খেয়ে সুরুজের মতিভ্রম হয়েছিল। সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নইলে শহরের ক্রিমিন্যাল মাস্টারমাইন্ড হয়েও সাদিকদের প্ল্যান ধরে ফেলতে পারে নাই।

আসলে সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতিই পরিবর্তন আনে। এটাই ধ্রুব সত্য। নন্দনগড়ের মসনদে অন্য কাউকে বসানো হয়তো অবধারিত ছিল।

সাদিকের প্ল্যানটা এমন ছিল যে, শহরের বাইরে একটা মাজারে তারা মীমাংসায় বসবে। সেখানে সাধন ও শেফালী উপস্থিত থাকবে। সাধন ও শেফালী কেঁদেকেটে সুরুজের কাছে মাফ চাইবে। সুরুজ মাফ করে দিলে ভালো। শেফালী তার সঙ্গে যাওয়ার নাটক করবে। তখন সাদিক গুলি করে সুরুজকে খুন করবে। পথের কাঁটা সরলে সাদিক-সাধন-শেফালী ও আমি মিলে শহরের নিয়ন্ত্রণ নেব। মাফ না করলেও সুরুজকে গুলি করবে সাদিক। অর্থাৎ মীমাংসায় বসার আগেই আমরা সুরুজের মৃত্যুদণ্ডে দস্তখত করে রেখেছিলাম।

এতদিন পরও সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ওইদিন সকাল থেকে ছিল টিপটিপ বৃষ্টি। তারিখ ছিল ২৯ এপ্রিল। তখনো জানতাম না আর কিছুক্ষণ পর বঙ্গোপসাগরের তীরের জেলাগুলোতে ঘূর্ণিঝড়ের কী ভয়ানক তাণ্ডব ঘটে যাবে। লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারাবে।

আমাদের মীমাংসার জন্য বসার কথা ছিল বিকালে। মাজারটা শহর থেকে দূরে, সন্ধ্যাশশী নদীর একেবারে তীর ঘেঁষে অবস্থান। একপাশে কবরস্থান, আরেক পাশে আমতলি মহাশ্মশান। আশপাশের দুই-চার মাইলের মধ্যে কোনো জনবসতি নেই।

খাদেমের ঘরে আমাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। আমি, সাদিক, সাধন ও শেফালী। পাঁচটা নাগাদ ঝেড়ে বৃষ্টি এলো। তুমুল বর্ষণের মধ্যে সাদা মাইক্রোবাসে করে মাজারে এলো সুরুজ উদ্দিন। সঙ্গে ড্রাইভার ও বহুদিনের বিশ্বস্ত বডিগার্ড চান

মিয়া। তাকে দেখে সাদিক ফিসফিস করে সাধনকে বলল, 'তুই ওকে সাইজ করিস।'

সাধন একবার চোখ টিপে হেসে সুরুজ উদ্দিনের আসার পথে তাকিয়ে রইল। সুরুজ এল। তার মুখ থমথমে। আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে বলল, 'নিমকহারামের দল।'

শেফালী ও সাধন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। মাফ চাওয়ার কথা থাকলেও ওদের চোখভরা অনুশোচনাহীন প্রেম সুরুজের নজর এড়াল না। সে আর দেরি না করে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই সাদিকের রিভলবার দুইবার গর্জে উঠল। একেবারে নিখুঁত হাতের টিপ সাদিকের। বারুদের গন্ধ, সুরুজ উদ্দিনের স্বাস্থ্যবান শরীর থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারা ও বাইরের বৃষ্টির ঘ্রাণ মিলিয়ে যেন খাদেমের ঘরে নরক গুলজার হলো। সাধন হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। সেই সুযোগে চান মিয়া পিস্তল বের করে সাদিকের দিকে তাক করল। সাদিক রিভলবারের ঘোড়া পাগলের মতো টিপে যাচ্ছিল কিন্তু গুলি বের হলো না। জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি জিহ্বার নিচ থেকে ব্লেড বের করে চান মিয়ার গলায় পোঁচ মারলাম। ব্যাস, জবাই করা মুরগির মতো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে করতে চান মিয়ার প্রাণ গেল। সাদিক ততক্ষণে সাধনকে কষে থাপ্পড় মেরেছে। সেই সঙ্গে চলছে গালিগালাজ। হতভম্ব সাধন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাতে হাত রেখেছে শেফালী। ঠিক সেই দিন, ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ের দিনে নন্দনগড়ের ওপর দিয়ে প্রবল ঝড় সবার অলক্ষ্যে বয়ে গেল। সুরুজ উদ্দিনের এতদিনের সাম্রাজ্যের অবসান ঘটল এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে। নন্দনগড়ে শুরু হলো নতুন প্রজন্মের রাজত্ব। সেটা আমাদের।

গল্পটা শেষ করে লেদু মেকার থামল। টেবিলের নিচ থেকে এক বোতল পানি বের করে ঢক ঢক করে পান করল। তারপর ভারী চশমাটা চোখে দিয়ে আবরারের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে রইল।

আবরার বলল, 'আপনারা তখন এক ছিলেন। পরে আলাদা হলেন কী করে?'

লেদু বলল, 'বয়স আমাদের অনুকূলে ছিল না। ঝোঁকের মাথায় একটা বড় কাজ করে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম এক থাকলে নন্দনগড়ে কেউ আমাদের কাজে বাগড়া দিতে পারবে না। আসলে ভুল চিন্তা করেছিলাম। সুরুজ উদ্দিনকে মারার ব্যাপারে সবাই একজোট হলেও ঘটনার পেছনে সবার আলাদা স্বার্থ ছিল। কিছুদিনের মধ্যে সেসব বেরিয়ে আসতে লাগল। শেফালীর সঙ্গে সাধনের ছাড়াছাড়ি হলো। শেফালী চলে গেল নন্দনকাননে। সাধন পয়সা টকিজের নিয়ন্ত্রণ নিল। আমি থেকে গেলাম এই গুলবাগিচা অর্থাৎ হাড্ডিপট্টিতে। শুধু সাদিকটা কেমন যেন বদলে গেল। সে অপরাধের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে ঠিকাদারি শুরু করল। বিয়ে করল বড় ঘরের এক মেয়েকে। ভাবির বাড়ির সবাই আমেরিকা-কানাডায় থাকে। ভাবিরও বোধহয় কানাডার নাগরিকত্ব ছিল। সেই সুবাদে আটানব্বই-নিরানব্বই সালে সাদিক কানাডায় পাড়ি জমাল।'

আবরার মাথা নেড়ে বলল, এখান থেকে বাকিটা আমি জানি। উনি কয়েক বছরের মধ্যে ফিরে এসে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারের লাইসেন্স নিয়েছিলেন। তারপর বিদেশে আর যাননি। দেশেই থিতু হয়ে ব্যবসা করেছেন। শেষের দিকে একেবারে একলা হয়ে গিয়েছিলেন। আপনারা কেউ খোঁজও রাখেননি।'

লেদু মেকার মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আসলে আমাদের রাস্তা ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া কাজের চাপও নেহাত কম ছিল না। হাড্ডিপট্টির এতগুলো মানুষ আমার ওপর নির্ভর করে, তাদের রেখে বাইরে সময় দেয়া খুব কঠিন। বিশেষ করে সেই লোকটার যদি মানসিক সমস্যা থাকে।'

আবরার বলল, 'আচ্ছা সুরুজ সাহেবের স্ত্রী-পুত্রের কী হলো? এমনও তো হতে পারে ছেলে বাবার খুনের প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় ছিল। সাদিক মাহবুবকে মওকা মতো পেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে।'

লেদু খানিকটা অবাক হয়ে বলল, 'তাদের আর খোঁজ রাখিনি। যতদূর জানি সুরুজ উদ্দিনের শ্বশুরবাড়ি নন্দনগড়েই ছিল। ছেলেটা তখন ছোট। এখন কোথায় আছে জানি না। মনে হয় না, এতদিন আগের ঘটনার সূত্র ধরে আবার নন্দনগড়ে এসে একটা মার্ডার করার সাহস পাবে। বাইরে নন্দনগড়ের কেমন দুর্নাম আপনি তো জানেন।'

আবরার মাথা নাড়ল। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, 'রাত চারটা বেজে গেছে। আমার হাতে আর মাত্র দুই ঘণ্টা সময় আছে। আপনি এখনো জানাননি কাজটা নেবেন কিনা।'

লেদু মেকার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সাদিক শুধু আমার ভাই না ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ছিল। নন্দনগড়ে এসে ওকে কেউ খুন করে যাবে এটা মানতে পারছি না। আমার টাকার প্রয়োজন নেই। এতগুলো বছরে যথেষ্ট টাকাকড়ি করেছি। আমি খোঁজ নিচ্ছি কাজটা কে করেছে। তাতে যদি চুক্তি ভেঙেও যায়, কিছু করার নেই।'

লেদুর জবাব শুনে আবরার খুব খুশি হলো। সে বলল, 'তাহলে খুবই ভালো হয়। সত্যি বলতে কি, টাকা উদ্ধার করতে না পারলে আমার হয়তো পারিশ্রমিক পাওয়া হবে না। নন্দনগড়ের মতো শহরে এতটা ঝুঁকি নিয়ে আসার পর খালি হাতে ফিরতে হলে সেটা লজ্জার ব্যাপার হবে। আপনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই কাজ হবে।'

আবরারের কথা শুনে লেদু মৃদু হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'এতই যদি আমার ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে শেফালী আর সাধনের কাছে কেন গিয়েছিলেন? আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি?'

আবরার চমকে উঠল। সে যন্ত্রের মতো নির্বাক হয়ে লেদুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লেদু বলল, 'বলেছি তো নন্দনগড়ে আমাকে না জানিয়ে গাছের পাতা পর্যন্ত পড়ে না। সমস্ত খবরাখবর আমার কানে চলে আসে। আমার হাত অত লম্বা না হলেও কান কিন্তু ইয়া বড়।'

লেদু দুইবার তালি দিয়ে বলল, 'বরকত, আছিস? এদিকে আয় তো।'

কুয়াশার ঘন জাল ছিঁড়ে যে ছোকরাটি হাজির হলো আবরার তাকে পাগলু নামে চেনে। সে অবাক হয়ে বরকত ওরফে পাগলুর দিকে তাকিয়ে রইল। লেদু বলল, 'শেফালী আর সাধনের কাছে কেন গিয়েছিল?'

পাগলু জিভ কেটে বলল, 'অত কী আর জানি কাকা। তবে লোকটাকে খারাপ মনে হয় নাই। বিদেশী লোক, আপনি বিবেচনা করে দেখেন।'

লেদু মেকার হা হা করে হাসতে লাগল। বড় হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর তার হাসির শব্দ। বলল, 'চার ঘণ্টাতেই তোকে বশ করে ফেলেছে, তাই না? তোর ট্রেনিং বোধহয় ভালো হয় নাই। আবার ট্রেনিং দিতে হবে।'

পাগলু লজ্জা পেয়ে বলল, 'আপনি আমার মালিক। যা ভালো মনে করেন করবেন।'

আবরার এবারে প্রস্তাব দিল, 'সাদিক মাহবুবের বাড়িটা একবার দেখে আসবেন নাকি? লোকটার লাশ এখনো বিছানায় পড়ে আছে।'

লেদু শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আবরারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। চলুন। গিয়ে দেখে আসা উচিত। হাজার হলেও ভাই তো। আজ যা কিছু হয়েছে তার পেছনে সাদিকের অবদান আছে। শেষ দেখা হলেও দেখে আসব। না হলে হাশরের মাঠে দেখা হলে ওকে কী জবাব দেব?'

পাগলু ওরফে বরকতের রিকশায় চেপে ওরা তিনজন রওনা হলো সাদিক মাহবুবের বাড়ির দিকে।

ছয়

সাদিক মাহবুবের বাড়িটার অবস্থান হাড্ডিপট্টির একেবারে সীমানা ঘেঁষে। নব্বইয়ের দশকের স্থাপত্য ধাঁচের তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি। সন্ধ্যাশশী নদীর অবস্থান একেবারে বাড়িটার কোলে। বাড়িটার নদীসংলগ্ন অংশটুকু বুলডোজারের আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত। দেখে লেদু মেকার স্মৃতিকাতর হয়ে উঠল। অনেকদিন এই এলাকায় তার পা পড়েনি। তারই মাঝে কত পরিবর্তন হয়েছে। লেদু নিজেই বলল, 'এই বাড়িটার ভিত্তি দেয়ার দিনে মিলাদ মাহফিলে আমি হাজির ছিলাম। বিরিয়ানি রান্না করেছিল নন্দনগড়ের বিখ্যাত দেওয়ান বাবুর্চি। খুব স্বাদ হয়েছিল বিরিয়ানির। এখনো মুখে লেগে আছে।'

লেদু মেকার রিকশা থেকে নেমে বাড়িটা ভালোভাবে ঘুরে দেখল। যেন অতীতের গলিতে স্বপ্নচালিতের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। আনমনে বিড়বিড় করে বলল, 'এদিকের সবাই ভাবিদের আত্মীয় ছিল। বিয়ের পর সাদিকের শ্বশুর জমিটা ওর নামে লিখে দিয়েছিল। বাড়ি বানানোর টাকা সে নিজেই উপার্জন করেছিল। তখন আমাদের ভরা যৌবন। কত রকম স্বপ্ন ছিল মনে।'

শেষ বাক্যটির সঙ্গে লেদু মেকারের গলায় হাহাকার ঝরে পড়ল।

সে নদীর পাড়ে গিয়ে ভাঙা অংশটুকু ভালো করে খেয়াল করল। দোতলায় একটিমাত্র কাঠের দরজা বাইরের পৃথিবী থেকে বাড়িটাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। দরজায় নবলক লাগানো দেখে লেদু মেকার মাথা নেড়ে বলল, 'আমার সবচেয়ে আনাড়ি সাগরেদটাও এই লক ভাঙতে পারবে। সাদিক কীভাবে এত বেখেয়াল হলো জানি না।'

আবরার বলল, 'ওনার মানসিক সমস্যার কারণে ব্যাপারটাকে অত পাত্তা দেন নাই। আলমারিতে টাকা রেখেছিলেন সেটাই বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন।'

লেদু মাথা নেড়ে বললেন, 'চলুন। ভেতরে গিয়ে দেখি কী অবস্থা।'

নিচতলার কাঁচি গেট খুলে আবরার লেদুকে ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। সিঁড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। লেদু বলল, 'ভাবি থাকতে বাড়িটা এ রকম ছিল না। খুব জমজমাট ছিল। ওই যুগে সবাই বাড়ির মেঝে মোজাইক করত। ভাবি কিন্তু সেটা করেন নাই। রাজস্থান থেকে মার্বেল পাথর এনে মেঝেতে লাগিয়েছিলেন। ভীষণ সৌখিন মানুষ ছিলেন।'

লেদু এমনভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠল যেন এটা তার নিজের বাসা। আবরার বলল, 'সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আপনার পা একবারও ফসকালো না। অনেকবার এই বাড়িতে এসেছেন, তাই না?'

লেদুর মুখে হাসি খেলে গেল, 'হ্যাঁ, তা তো এসেছিই। মাঝে অনেকদিন আসা হয়নি। এখনো দেখছি সবই আগের মতো আছে। কিছুই বদলায়নি। ভাবি চলে যাওয়ার পর এই অবস্থা হয়েছে। সাদিকটা কখনই নিজে থেকে কিছু করার লোক নয়। ওর ভাগ্য ভালো যে ওইরকম বউ পেয়েছে।'

আবরার তালা খোলার জন্য দরজায় হাত দিতেই লেদু বলল, 'পুলিশ জানে?'

মাথা নাড়ল আবরার। জানানো হয়নি। বলল, 'আমি বাইরের লোক হয়ে খুনের ব্যাপারটা পুলিশকে কীভাবে জানাই বলুন? ওরা উল্টো আমাকে সন্দেহ করে বসবে। তারচেয়ে বরং আপনি জানালে ভালো হয়। একে তো সাদিক সাহেব আপনার নিকটাত্মীয়। অন্যদিকে শহরে আপনার প্রভাব আছে। আপনি বললে সন্দেহ করবে না।'

তালা খুলে দুজনে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। বহুদিনের পুরনো গুমট একটা গন্ধ বাড়ির ভেতরে। পুরো বাড়ি অন্ধকার। লেদু পকেট টর্চ বের করে সুইচবোর্ডের দিকে ধরতেই আবরার লাইট জ্বালিয়ে দিল। বসার ঘর যেমন ছিল তেমনই আছে। নব্বইয়ের দশকের পুরনো সোফাসেট। তার সামনে মেহগনি কাঠের সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপরে একটা অ্যাশট্রে রাখা। নিচে লালচে হয়ে আসা অনেকগুলো বাসি খবরের কাগজ বোধহয় তেলাপোকা ও নেংটি ইঁদুরের বাসায় পরিণত হয়েছে। দেয়ালে হাতের কাজ করা ওয়ালম্যাট। একপাশের দেয়ালে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক বিদেশী শিশুর ছবি। দেখে মনে হয় বাসিন্দাদের সন্তানের খুব শখ ছিল। একপাশে কাচের ট্রলির ওপর রাখা একুশ ইঞ্চি সনি টেলিভিশন। সময় প্রযুক্তিকে মেদহীন করলেও টেলিভিশনটির আর সমতল রক্ষা হয়ে ওঠা হয়নি।

লেদু মেকার স্তম্ভিত হয়ে ঘরের প্রতিটা অংশের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার ভঙ্গি দেখে আবরারের মনে হলো, মনে মনে লোকটা টাইম ট্রাভেল করছে। অতীতে ফিরে গিয়ে বর্তমানের ঘরটির প্রতিটি আসবাব মিলিয়ে দেখছে সেই সময়ের সাপেক্ষে। লেদু বিড় বিড় করে বলল, 'সবকিছু ঠিক আগের মতোই আছে। কিছুই বদলায়নি।'

সে আবরারের দিকে হঠাৎ ফিরে বলল, 'আপনাকে কে কেসটা দিয়েছে বললেন?'

আবরার শোয়ার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। মুখে কিছুই বলল না।

ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই লেদু মেকারের মুখে বিস্ময়ের ধ্বনি ফুটল। সবুজ ডিমলাইটের আলোয় সে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে গেল। বিছানার ওপরটা একেবারে শূন্য। ঘরের ভেতর কেউ নেই। এমন সময় পেছন থেকে রিভলবার কক করার শব্দে লেদু আড়ষ্ট হয়ে গেল। আবরারের শান্ত কণ্ঠ শোনা গেল, 'নড়াচড়া করার কথা চিন্তাও করবেন না।'

...

তসলিমা যখন অভিযানে যাওয়ার জন্য দল সাজাতে ব্যস্ত তখন শয্যা থেকে উঠে বসল শেফালী। অনেকদিন ধরে তার শরীর খারাপ যাচ্ছে। জ্বর সারছেই না। ডাক্তার নানারকম পরীক্ষা করেও কোনো অসুখ খুঁজে পায়নি। এখন কবিরাজি চিকিৎসা চলছে।

ধীর পদক্ষেপে জুয়ার বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়াল শেফালী। দুই হাত কোমরে রেখে খেলা দেখতে লাগল। খোদ শেফালীকে উঠে আসতে দেখে খেলা পরিচালনাকারী মেয়েটি তটস্থ হয়ে উঠেছে। সে পরবর্তী চাল দিতে ইতস্তত করছে। শেফালী তাকে বলল, 'বহুদিন পর মনডা চাইতাছে খেলি। আমারে খেলায় নিবি?'

বোর্ডের মহিলারা নড়েচড়ে শেফালীকে বসার জায়গা করে দিল। নন্দনগড়ের মেয়রের স্ত্রী সুলতানা বললেন, 'তোমাকে তো বহুদিন খেলতে দেখিনি শেফালী। আজ হঠাৎ কী মনে করে শরীরে জোশ এল? ওই গোয়েন্দা ছোকরাকে দেখে নাকি?'

শেফালীর ঠোঁটে একটা হাসি খেলে গেল। সে বলল, 'আল্লায় কপালে বিয়াশাদি রাখলে এতদিন ওর সমান একটা পোলা থাকত। অরে দেইখা পিছলা খাওনের মতো মন অহন আর নাই। এখন খালি টেকার গন্ধ পাইলে মন-মিজাজ ভালা থাহে।'

তরুণীকে পরের দান শুরু করার নির্দেশ দিয়ে শেফালী বলল, 'বড় দানের খেলা হইব। ছোটখাটো বান্ডিল চলব না। বুঝছস?'

তরুণী মাথা নাড়ল। সেই সঙ্গে সুলতানাসহ বোর্ডের অন্য সদস্যরাও। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে তাদের কাউকে কাউকে মোটা টাকার বান্ডিল বের করতে দেখা গেল।

ডাব্বু ছয়টি পাশার খেলা। হরতন, ইস্কাপন, রুইতন, চিড়া, ঝান্ডি ও জাহাজ মিলে পাশার ছয়টি দিক। এর সঙ্গে মিলিয়ে বোর্ডে বড় বড় ছয়টি প্রতীকের ছবি আঁকা। শেফালী ইস্কাপনে এক লাখ টাকার পাঁচটি বান্ডিল রেখে বলল, 'এই গেল আমার পাঁচ লাখ, আমার ইস্কাপনে।'

বাকিরা রুইতন, হরতন, ঝান্ডি, জাহাজ ও চিড়ায় টাকা ফেললেও ইস্কাপনের ঘরে কেউ ফেলল না। তরুণী একবার শেফালীর মুখের দিকে তাকিয়ে গুটিসমেত চামড়ার বাক্সটি জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল।

শেফালী একটা পান মুখে দিয়ে বোর্ডের অন্যদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সুলতানা বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি শেফালী। আজকের দিনে মনে হচ্ছে ইস্কাপন অপয়া। একবারও ওঠে নাই। তুমি টাকাটা অন্য বোর্ডে ধরলে মনে হয় ভালো করবে।'

তাদের কথোপকথনের মধ্যে তরুণীর ঝাঁকানোর গতি মন্থর হয়ে এসেছিল। সুলতানাকে কোনো জবাব না দিয়ে তরুণীকে একটা ধমক দিয়ে শেফালী বলল, 'তুই ঝাঁকানি বন্ধ করলি ক্যান? শেফালীর বন্দুকের গুল্লি একবারই বাইর হয়। দুইবার বারানির কাম নাই। ইস্কাপনে ধরছি, ধরছি। অহন টাকা মাইর গেলে যাইব। বাচ্চা মাইয়াগো মতোন কান্দুম না আমার টাকা ফেরত দেও।'

তরুণী নীল মখমলের কাপড়ের ওপর সাদা গুটিগুলো ছেড়ে দিতেই গুটিগুলো নড়েচড়ে স্থির হয়ে গেল। চামড়ার বাক্স সরাতেই দেখা গেল ছয় গুটির তিনটিতেই ইস্কাপন উঠেছে।

শেফালীর মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল। তার চোখেমুখে যেন গর্ব ঠিকরে বেরোতে লাগল। আত্মবিশ্বাসের পুলকে শিউরে উঠে শেফালী বলল, 'আল্লায় কপাল দিছে একখান। এত পাপ করছি জীবনে, তবুও কপালে দাগ পড়ে নাই।'

বোর্ডের সমস্ত টাকা শেফালীর হাতে উঠে এলো। সে আনন্দে বিমোহিত হয়ে বলল, 'মনে হয় আইজ নসিবডা ভালা। তসলিমা, আইজ মনডা চাইতাছে বাইরে যাই। তর লগে যামু?'

তসলিমা ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলছিল। সে ফোনের মাইক্রোফোনে হাত রেখে বলল, 'আমাগো সোর্স কইতে পারে না চুরির কথা। অন্য কারো লোক করল কিনা। লেদু মেকারের লোক যদি কইরা থাকে?'

শেফালী বলল, 'সাদিক মাহবুবের লগে আমার হিসাব-কিতাব আছে। আমার হওয়া বিয়াটা ওর লাইগা ভাইঙ্গা গেছে। যে আমারে জান দিয়া ভালোবাসছে, তারেও হ্যায় কাইড়া নিছে।'

তসলিমা বলল, 'ওর বাড়ি গিয়া দেখা যায়। গেলে একটা না একটা ক্লু পাওয়াই যাইব। আপনি যাবেন?'

শেফালী হেসে বলল, 'বম্বের সিনেমা দেখতে দেখতে পুলিশের লাহান কথা কওন শুরু করছস দেহি। যাই গিয়া চল।'

দল গুছিয়ে আধাঘণ্টার মধ্যে শেফালীরা রওনা দিল সাদিক মাহবুবের বাড়ির উদ্দেশে। শেফালী গ্যারেজের সিএনজি অটোরিকশা

ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনে ওঠে না। ওর সিএনজি অটোরিকশা চালায়ও মহিলা চালক। ছোটবেলা থেকে পুরুষদের প্রবঞ্চনার ফাঁদে পড়ে জগতের সব পুরুষের ওপর থেকে ওর মোহমুক্তি ঘটেছে। নতুন করে বিশ্বাস অর্জনের মতো মহৎ কোনো পুরুষকেও সে পায়নি। তারা পুরনো ক্ষত সারিয়ে তোলার বদলে খুঁচিয়ে বারবার রক্তাক্তই করতে দেখেছে। এজন্য শেফালীর গুডবুকে কোনো পুরুষ মানুষ নেই। তাদের তার প্রয়োজনও নেই। আর্থিক, মানসিক, শারীরিক সমস্ত প্রয়োজনই নারীরা চমৎকার মেটাতে পারে।

সাদিকের বাড়ির কাছাকাছি এসে সিএনজি অটোরিকশা থেকে তড়াক করে নামল তসলিমা। গলির মুখে একটা রিকশাওয়ালাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল। শেফালী বলল, 'সাদিক মাহবুবের লগে আমার মেলাদিনের পরিচয়। প্রথম যেদিন দেখা হইছিল, তখন আমার বয়স ছিল কাঁচা। মাঝে বহুদিন ওর কুনো খোঁজপাত্তা পাই নাই। শুনছি ঠিকাদারি কইরা বহু মালপাতি কামাইছে। ৫২ লাখ টাকা খুব বেশি না। কিন্তু সাদিকের মতো লোকের টাকা উদ্ধার কইরা দিয়া কাম নাই। পুরাটাই কাইড়া নিতে পারলে আরাম। তোরা ভিত্রে গিয়া ভালামতোন খুঁইজা দেখ। হয়তো পাগলায় টাকা বাড়িতে রাইখ্যাই সারা দুনিয়ায় খুঁইজা বেড়াইতাছে।'

শেফালীসহ দলের সদস্য সংখ্যা ছয়। সবাই নারী, চালক ছাড়া সবাই সশস্ত্র। সন্ধ্যাশশী নদীর কূল ঘেঁষা বাড়িটিতে ঢোকার সময় তাই আলাদা করে সতর্ক থাকার প্রয়োজন মনে করেনি। সেটাই ছিল বিরাট ভুল। গেটে পা রেখেছে কি রাখে নাই, এমন সময় শেষ রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল। দুই-তিনবার নলটা ডানে-বামে ঘুরতেই নারীদের দলটা স্রেফ উড়ে গেল। তীব্র আক্রমণে হতবিহ্বল কেউ অস্ত্র বের করার সুযোগও পেল না। সাদিক মাহবুবের বাড়িতে যাওয়ার লাল সুরকি বিছানো পথে মুখ থুবড়ে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায়, মৃত্যুর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চোখগুলোতে একসঙ্গে নেমে এলো নির্জলা শূন্যতা।

...

সাধন চক্রবর্তীর চোখে ঘুম আসা আর ব্যাঙের সর্দি হওয়া একই কথা। বহু বছর ধরে সাধনের চোখে ঘুম নেই। ডাক্তার-বদ্যি কম দেখানো হয়নি। কিন্তু সাধনের অনিদ্রা রোগের চিকিৎসা কারো কাছেই নেই। ঘুম না হওয়ার কষ্টের সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। সাধন জানে সেটা। অনেক সাধ্যসাধনার পর যদি আধো তন্দ্রামতোও আসে, সেটাকেই বিরাট স্বস্তি বলে ধরে নেয় সাধন।

আবরার বিদায় নেয়ার পর ফুটোস্কোপ ঘরে শুয়েছিল সাধন। বাড়ি ফেরার ফুরসৎ না মিললে এখানেই রাতটা কাটানোর বন্দোবস্ত আছে। পাশে আরেকটা রুমে আছে জেল পলাতক দুই দুর্ধর্ষ কয়েদি। তারা আশ্চর্যরকম নীরব। নিঃশব্দের মাঝেও যথারীতি সাধনের ঘুম আসেনি। মাথার ভেতর ঘুণপোকার মতো শব্দ করেছে পুরনো অনেক স্মৃতি। সাদিক মাহবুব! সবকিছুর জন্য সেই দায়ী।

সাদিকের সঙ্গে সেই কলেজ জীবন থেকে সাধনের বন্ধুত্ব। অবশ্য লেদুর সঙ্গে তার যতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, সাদিকের সঙ্গে ততটা ছিল না। তবে তার জীবনের মোড় ঘোরানোর ঘটনাটিতে সাদিক ছিল মুখ্য ভূমিকায়। সুরুজ উদ্দিনকে সে নিজ হাতে নিকাশ না করলে হয়তো কখনই আজকের অবস্থানে থাকতে পারত না সাধন। ৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনারের বদলে বড়জোর পয়সা টকিজে ম্যানেজারির কাজটাই চালিয়ে যেতে হতো। নন্দনগড় শহরে এত প্রভাব তৈরি করার সুযোগ পেত না।

দুই ঘণ্টাও হয়নি শোয়ার, এমন সময় দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। ফুটোস্কোপ ঘরটা সাউন্ডপ্রুফ। বাইরে বা ভেতরে থেকে শব্দ যাতায়াতের উপায় নেই। কেউ দরজায় নক করলেও শব্দ হয় না। সাধন জেগেই ছিল। আলগোছে শয্যা ত্যাগ করে দরজার ফুটোয় চোখ রেখে দেখল দীর্ঘদেহী দেহরক্ষী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেমুখে উদ্বেগের ছায়া।

দরজা খুলে সাধন ঘুমজড়ানো গলায় বলল, 'কী চাই?'

দেহরক্ষী বলল, 'সেই কয়েদি, সে এসেছে দাদা। বলছে আপনার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে। কথাটা শুধু আপনাকে বলবে, অন্য কাউকে নয়। আমি জানার অনেক চেষ্টা করেছি। সে মুখই খুলল না।'

সাধন আসছি বলে ভেতরের বাথরুমে গেল ফ্রেশ হওয়ার জন্য। সাদা লুঙ্গি খুলে জিন্সের প্যান্ট পরল। গায়ে চাপালো টার্টল নেক সোয়েটার, গতবার শীতে দার্জিলিং থেকে আনিয়েছিল। তার ওপরে লেদার জ্যাকেট ও পায়ে কেডস পরে সাধন যখন বের হলো, দেহরক্ষীও তখন যেন ভিরমি খেল। সাধনকে কখনো এই পোশাকে দেখেনি সে। সাধনের ঋজু দেহের গঠন, দেহের পেশি এখনো সবল, শুধু সাদা চুল-দাড়ি না থাকলে বোঝারই উপায় নেই পঞ্চাশটি বসন্ত দেখে ফেলেছে সে।

সাধন বলল, 'কেন যেন মন বলছে আজ বাইরে বেরোতে হবে। এজন্য রেডি হয়ে নিলাম। শীতের কাপড়গুলো অনেকদিন আলমারিতে পড়েছিল। আজ পড়তে ইচ্ছে হলো। ভালো করেছি না?'

এই প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দেয়ার প্রশ্নই আসে না। দেহরক্ষী মাথা নেড়ে বলল, 'খুবই ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

অফিস রুমে আশেক আলী দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে নখ কামড়াচ্ছিল। সাধনকে দেখে থেমে গেল। দেহরক্ষীকে পেছনে দেখে বলল, 'একটা জরুরি খবর দেয়ার আছিল দাদা। কথাটা একলা পাড়তে পারলে ভালা হইত।'

সাধন বলল, 'যা বলার ওর সামনেই বলো। অত ভণিতা করার দরকার নেই।'

আশেক আলী হাসি হাসি মুখে বলল, 'আপনের অফিস থাইকা বাইর হইয়া সোজা গেছি সাদিক মাহবুবের বাড়ি। গিয়া দেখি তিনতলা বাড়ির অর্ধেক ভাইঙ্গা ফালাইছে। এটু বাতাস জোরে বইলে পুরা বাড়ি ধইসা পড়ব। একটা নারিকেল গাছ বাইয়া দোতলায় উঠলাম। ভিত্রে উঁকিঝুঁকি মাইরা মনে হইল কেউ বিশেষ থাহে না। আমি সময় নষ্ট না কইরা নাইমা আইলাম। এরপরের কথাটা কইলাম শরমের, কমু কি?'

সাধন শ্লেষের সঙ্গে বলল, 'আহারে কী নাটক! তোর আবার লজ্জা-শরমও আছে নাকি? চুরি কইরা খাস, তোরও শরম আছে? বাহ বাহ।'

আশেক বলল, 'আমার ঘরনী শেফালীর গ্যারেজে কাম করে। খারাপ কিছু করে না। বড় ঘরের বেডিরা অইহানে গিয়া জুয়া খেলে। আমার ঘরনী জুয়ার বোর্ডে ম্যানেজারি করে। হ্যারে এট্টু ফোন করছিলাম...'

কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না আশেক আলী। সাধন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, 'তোর বউ খারাপ কিছু করে না। শুধু জুয়ার বোর্ড চালায়? হা হা হা।'

আশেক আলী লজ্জিত হয়ে বলল, 'পড়ালেখা শিখি নাই ছার। অত ভুল ধরলে ক্যামনে কথাডি পাড়ি? আমারে আর লজ্জা দিয়েন না।'

সাধন বলল, 'আচ্ছা। আর বাগড়া দেবো না। বল, কী বলতে চাস।'

'বাড়িওয়ালি আমার ফোন পাইয়া অবাক। হ্যায় আশাও করে নাই ফোনে কুনোদিন আমার আওয়াজ শুনতে পারব। আমাগো কনডেম সেলে মোবাইল এক্কেরে হারাম। যখন কইলাম আমি জেল ভাইঙ্গা ফুটুস হইছি, সে আরো খুশি হইল। আমি জিগাইলাম, বউ, তোমাগো দলের কেউ সাদিক মাহবুব নামের কারো টাকা চুরি করছে কিনা? হ্যায় কইল, চুরি করে নাই। করতে যাইতাছে। আমি দেখলাম সর্বনাশ। আইসা আমারে পাইলে শেফালীর মাইয়ারা কাইটা ফালাইব। তাড়াতাড়ি গাছ বাইয়া নাইমা আপনের কাছে চইলা আসছি। মনে হয় ওরা এখনো বাইর হইতে পারে নাই। আমরা আগেভাগে গিয়া অ্যাটাক দিলে ওগো হাত থেইকা পয়সাডি উদ্ধার করবার পারমু। আরেকটা উপায় আছে অবশ্য, মারামারিতে না গিয়া টাকা নিয়া আমরা ভাইগা যাইতে পারি। এহন আপনে যেইটা হুকুম দেন।'

সাধনের গলা অতটা শীতল হতে পারে তা আশেক আলী বা দেহরক্ষী ধারণাও করতে পারে নাই। সে যেন সুমেরু ও কুমেরুর সমস্ত হিম নিজের কণ্ঠে ধারণ করে বলল, 'না।'

শুধু ওই এক শব্দ উচ্চারণে আশেক আলী ও দেহরক্ষীর মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। তারা হতচকিত হয়ে সাধনের দিকে তাকিয়ে রইল। সাধন নিশ্চুপ থেকে দেহরক্ষীকে বললেন, 'হাতের কাছে হাতিয়ার আছে কিছু?'

দেহরক্ষী সতর্ক হয়ে বলল, 'আছে স্যার। আপনি হুকুম করলেই রেডি হয়ে যাবে।'

সাধন বললেন, 'ওর দুই সঙ্গীকে মুক্ত করে দেও। সবার হাতে একটা করে অস্ত্র দাও। আজ সাদিক মাহবুবের বাড়িতে একটা হেস্তনেস্ত হবে।'

শেফালীর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সাধনের বুকে একটা গোপন ব্যথা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এককালে দুজন একই স্বপ্ন দেখেছিল। মাথার ওপর সুরুজ উদ্দিন নামক খড়্গের ভয়ও তাদের প্রেমের পথ থেকে আলাদা করতে পারেনি। কিন্তু শেফালী সাধারণ মেয়েমানুষ নয়। আলাদা ধাতুতে তৈরি। সুরুজের বাহুডোর থেকে সাধনের বাহুডোরে ভ্রমণ তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। সে স্বপ্ন দেখেছে বড়, সম্রাজ্ঞী হয়ে একদিন নন্দনগড় শাসন করবে। সুরুজ উদ্দিনের শাসনের লাগাম উঠে আসবে তার মেহেদি রাঙা হাতে। সাধনকে পাশে নিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণের উপায় ছিল না। ধর্মের একটা বাধা ছিল। তাছাড়া সাধন নিজেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। একই সংসারে থেকে দুজনে শহরের সর্বেসর্বা হতে পারে না। শেফালী তাই নির্দয়ের মতো সাধনকে পরিত্যাগ করেছে। সুরুজের ব্যবসার লাইনঘাট সবই তার জানা ছিল। পুরনো সব কানেকশন পুনর্জীবিত করে তিলুপাড়াকে নন্দনগড়ের অন্যতম ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছে।

প্রত্যাখ্যানের ক্ষত সাধনের হৃদয় থেকে কখনই মিলিয়ে যায়নি। আকণ্ঠ বারুদ গিলে সে ঠারেঠোরে হয়ে উঠেছে বিস্ফোরণোন্মুখ। শেফালীর পর আর কোনো মানবীর প্রেম সাধন কখনো ভিক্ষা করেনি। নারী অনেক এসেছে গেছে, কিন্তু কাউকেই হৃদয়ের সুউচ্চ চূড়ায় বসাতে পারেনি। এতগুলো বছর ধরে জমে থাকা ক্রোধের যে কারণেই হোক প্রস্ফুটন ঘটেনি। আজ সুযোগ এসেছে হিসাব বরাবর করে নেয়ার। শেফালীকে সে অনেক ছাড় দিয়েছে, আর না।

সাধনের নির্দেশে দেহরক্ষী ও তিন কয়েদি সাদিকের বাসার উঠোনে হাঁটুসমান প্রাচীরের পেছনে অবস্থান নিল। শীতের রাত। বহুদূরের শব্দও কান পাতলে শোনা যায়। তাদের সতর্ক কানে দূর থেকে ক্রমেই এগিয়ে আসা সিএনজি অটোরিকশার আওয়াজ এল। সাধন নিচু গলায় নির্দেশ দিল ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করতে।

সবুজ সিএনজি অটোরিকশাটা লাল সুরকি বিছানো রাস্তা ধরে একেবারে সাদিক মাহবুবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে নামল পাঁচ নারী। সবশেষে বেরিয়ে এল শেফালী। সাধন কাঁচিগেটের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে বসেছে। স্ট্রিটলাইটের ম্লান আলোয় শেফালীকে দেখে তার হৃদয়ের একটি স্পন্দন যেন হঠাৎ থমকে গেল। শরীরে পারদের উত্তাপ বাড়ল চড় চড় করে। এখনো শেফালীর মোহ তার বুকের কোনো অন্ধকার প্রকোষ্ঠে টিক টিক করে বেজে চলেছে। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন করার আগে শেফালীর ভূত তার কাঁধ থেকে নামবে না। ভালো হয় কোনো দুর্বল মুহূর্তের ফাঁদে পড়ার আগে আগাছাটিকে ছেঁটে ফেললে।

আশেক আলীরা নির্দেশের জন্য সাধনের দিকে তাকিয়ে আছে। সাধন কিছু বলছে না। তাকাচ্ছেও না কারো দিকে। বিমোহিত হয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে আসা নারীদের কুচকাওয়াজ দেখছে। দেহরক্ষী অবাক হয়ে তার বসের দিকে তাকিয়ে আছে। সাধন কিছু বলছে না। শেফালীরা সাধারণ আলাপ করছে। কী একটা বলে খিলখিলে হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসিটা যেন সাধনের বুকে বুলেটের মতো আঘাত করল। চাপা অথচ কর্কশ কণ্ঠে সে নির্দেশ দিল, 'ফায়ার!'

অটোমেটিক রাইফেলের মাজল একসঙ্গে জ্বলে উঠল। রাতের নীরবতা ভেঙে খানখান হলো রাইফেলের প্রচণ্ড বজ্রনিনাদে। আশপাশের গাছগুলোতে আশ্রয় নেয়া পাখিরা প্রাণভয়ে অসময়ে উড়ে পালাল। প্রতিবেশীদের কারো ঘরে নবজাতক শিশু চিৎকার করে কেঁদে উঠল। সাধন দমবন্ধ করে আগুয়ান দলটির দিকে তাকিয়ে রইল।

সাধন জানে এরা সশস্ত্র। সুযোগ পেলেই বিষের সম্পূর্ণ কোটা পূর্ণ করে ছোবল বসাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না। নন্দনগড়ের অনেক মানুষ জীবন দিয়ে শেফালীর বিরোধিতা করার শিক্ষা পেয়ে গেছে।

আকস্মিক আক্রমণে টুঁ-শব্দটি করার সুযোগ পেল না শেফালীরা বা আওয়াজ করলেও রাইফেলের জান্তব শব্দে তা ঢেকে গেছে। বজ্রপাতে নিহত মানুষ কি আর্তনাদ করার সুযোগ পায়? ওরাও পেল না। বৃষ্টির মতো ধাতব সিসাতে বিদ্ধ হয়ে রক্তের পুকুরে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে রইল লাল সুরকির রাস্তায়।

ম্যাগাজিন খালি হলে সাধন ওদের থামার নির্দেশ দিল।

সাত

রাইফেলের আওয়াজে পুরো বাড়ির সঙ্গে লেদু মেকারও কেঁপে উঠল। একটানা গুলির শব্দে যেন নরক নেমে এসেছে সন্ধ্যাশশী নদীর এ প্রান্তে। ধ্বংসের প্রান্তসীমায় থাকা বাড়িটা যেন প্রচণ্ড ভূ-আলোড়নে তলিয়ে যাচ্ছে নরম চোরাবালির মাঝে। নরকের দুয়ার খুলে পুরো নন্দনগড় শহর যেন ডুবছে বাড়ির সঙ্গে।

লেদুর শুকনো মুখে আবরারের দিকে তাকাল। আবরার লেদুকে খাটের ওপর বসতে দিয়ে নিজে বসেছে একটা টুলের ওপর। পেছনে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় লেদুর পেছনটা দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছা করেই লেদুকে এখানে বসিয়েছে আবরার। তার মতো ধড়িবাজ লোককে এক সেকেন্ডের জন্য বিশ্বাস করা যাবে না। সামান্য অসতর্ক হলে লেদু আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করবে না। আবরার জানে লেদু এতক্ষণ বসে বসে সুযোগ খুঁজেছে।

গুলির শব্দ থামলে লেদু বলল, 'কারা গোলাগুলি করছে জানেন কিছু?'

আবরার মাথা নেড়ে বলল, 'আপনার শহর, আপনিই ভালো জানেন। একটা শান্ত, মফস্বল শহরকে আপনারাই অপরাধের স্বর্গ বানিয়েছেন মানুষের লাশ পড়েছে আর আপনাদের লোভী জিভ লকলক করেছে। আজ খেসারত দেবেন না?'

লেদু কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করে বলল, 'আপনার সাথে এই শহরের একটা সম্পর্ক আছে বুঝতে পারছি। আমার প্রতি অনেক রাগও আছে। কিন্তু সেটা কী ধরতে পারছি না। আপনি খুলে বললে হয়তো ক্ষতিপূরণ করতে পারি।'

আবরার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, 'আর একটা কথাও বলবেন না।'

সিঁড়িতে কাদের যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আবরার সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। লেদুর দিকে দুই পা এগিয়ে বলল, 'যে-ই আসুক কোনো চালাকি করবেন না। আমি গুলিভর্তি পিস্তল নিয়ে তামাশা করছি না। সিধা ম্যাগাজিন খালি করে দেব।'

বাইরের দরজা খুট করে খুলে গেল। বসার ঘরের মেঝেতে শোনা গেল অনেক জোড়া জুতার শব্দ। সাধনের কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'বাড়ির কী অবস্থা করেছে সাদিক। দেখে তো মনে হয় কেউ এই বাড়িতে থাকে না। এখানে চুরি হবে না তো আমার বাসায় হবে?'

সাধনের গলা লেদু চিনতে পেরেছে। দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধুর আওয়াজ শুনে তার চোখ চকচক করে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'বন্ধু! সাধন?'

সাধন বেডরুমে কারো গলা শুনে সবাইকে রাইফেল রেডি পজিশনে ধরার জন্য ইশারা করল। দরজার আড়ালে লুকিয়ে বলল, 'কে? কে কথা বলে?'

লেদু মেকার কাঁপা গলায় জবাব দিল, 'আমি লেদু। তোমার বন্ধু।'

গলা শুনেও সাধন একটু অসতর্ক হলো না। দরজার আড়াল থেকেই বলল, 'আচ্ছা। লেদু? ওখানে কী করছো?'

লেদু আর কোনো জবাব দিল না। আবরারের পিস্তলের নল তার চিবুক স্পর্শ করেছে। শান্ত অথচ আগ্রাসী দৃষ্টিতে আবরার যেন লেদুকে ব্যবচ্ছেদ করছে। সামান্য নড়লেও ট্রিগার চেপে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

সাধন জিজ্ঞেস করল, 'কথা বলো বন্ধু। কী হলো তোমার?'

সাধনের ইশারায় কয়েদি তিনজন ও দেহরক্ষী দরজায় এক লাথি দিয়ে বেডরুমে ঢুকে পড়ল প্রশিক্ষিত বাহিনীর মতো। সঙ্গে সঙ্গে লেদুর চিৎকার, আবরারের কঠোর হুমকি ও কয়েদিদের চেঁচামেচিতে সাধনের কান ঝালাপালা হয়ে গেল। সে আড়াল থেকেই বলল, 'আহা, চারজন লোক নিয়েও ওদের সামলাতে পারছিস না?'

আশেক আলী বলল, 'আপনি হুকুম দিলে দুইটারে ফালায় দেই।'

সাধন আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও, দুইজন? দাঁড়া এসে কথা বলছি।'

ভেতরে ঢুকে আবরারের পিস্তলের মুখে লেদুকে দেখে সাধন একগাল হেসে উঠল। আশেক আলী দেয়ালের টিউবলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই পৌষের শীতেও লেদুর কপাল ঘামে চিকচিক করছে। ভারী ফ্রেমের চশমার ভেতরে তার চোখজোড়া এখনো শান্ত। সে বলল, 'বন্ধু, একেবারে ঠিক সময়ে এসেছো।'

সাধন আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, 'ঠিক সময়ে এসেছি। দারুণ মজা, দারুণ মজা।'

আবরারকে অনড় অবস্থায় দেখে সাধন বলল, 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আবরার সাহেব, আপনি এখন লেদুর মাথা থেকে পিস্তল সরাতে পারেন। সিচুয়েশন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।'

লেদু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল আবরার সাধনের আদেশ পালন করল। কিন্তু অন্যদের হাতে আগের মতোই রাইফেল শক্ত করে ধরা। লেদু বলল, 'বহুদিন পর দেখা হলো বন্ধু। শেষ কবে দেখা হয়েছিল মনেও নেই।'

সাধন হেসে বলল, 'ওসব কথা বাদ দাও। শহরের মানুষের সঙ্গে তোমাদের হাড্ডিপট্টির লোকের চুক্তি হয়েছিল তোমরা শহরের মধ্যে কোনো কুকর্ম করবে না। এই তোমার চুক্তি মানার নমুনা?'

লেদুর শরীর একবার কেঁপে উঠল। সে বুঝতে পারল ফাঁদে পড়েছে। সাধনের দুরভিসন্ধি সে ধরতে পারেনি। লেদু জবাব দিল, 'প্রশ্নটা আমাকে না করে তোমার এই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে করো। সে কেন আমাকে এখানে প্রলোভন দেখিয়ে এনেছে সেটা জিজ্ঞেস করো।'

সাধনের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে লেদু মেকারের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বলল, 'পকেটমারকে আবার প্রলোভন দেখাতে হয় নাকি? আমি কখনো শুনিনি তো। এই, তোরা কখনো শুনেছিস?'

সাধনের প্রশ্নের জবাবে কয়েদিরা কাঠের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। তারাও শোনেনি।

লেদুর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। যেন শিগগির ঝড় উঠবে। সে দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করে তুমি নিজের বিপদ ডেকে এনেছ সাধন। আমি একা নই। নন্দনগড় শহরে শত শত মানুষ আছে যাদের আমি রুটিরুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারা আমাকে দেবতার মতো সম্মান করে। আমাকে খুন করে তুমি শান্তিতে থাকতে পারবে না। ওরা আজ হোক, কাল হোক প্রতিশোধ নেবেই।'

সাধন যেন এক ফুৎকারে লেদুর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধুর, আর কে দাঁড়ানোর মতো আছে আমার সামনে? একটু আগে গুলির আওয়াজ পাও নাই? শেফালীর গ্যাংকে উড়িয়ে দিয়েছি। শেফালীসহ ছয়জন শেষ। খতম।'

সাধনের রক্তপিপাসু অঙ্গভঙ্গি দেখে লেদু মেকার শিউরে উঠল। সে চশমা খুলে হাতে নিয়ে বলল, 'তোর মতো বেইমানের মুখ দেখাও পাপ। শুধুপুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে আমি তোকে সাবধান করে দিলাম, নন্দনগড়কে একলা ভোগ করার স্বপ্ন দেখে তুই বড্ড ভুল করেছিস।'

লেদুর হয়তো আরো কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। থেমে গেল সাধনের ইশারায়। কমিশনারের আঙুলের ইশারায় আবার রাইফেল চারটি গর্জে উঠল। এবার অল্প সময়ের জন্য। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে বেশি গুলি খরচেরও প্রয়োজন পড়ে না। লেদু মেকারের ছোটখাটো মুখটি ছিন্নভিন্ন হয়ে রক্তে ভেসে গেল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো তীক্ষ্ণ গোঙানি। খানিক ছটফট করে চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল নন্দনগড়ের অপরাধ জগতের অন্যতম কুশীলব লেদু মেকার।

লেদুর শরীরের ছটফটানি থেমে গেলে সাধন পকেট থেকে তামাকের পাউচ বের করে পাইপে ভরল। দিয়াশলাই ঠুকে পাইপ জ্বালিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ধূমপান করতে করতে বলল, 'শেফালী ও লেদুর সাথে আমার অনেক দিনের বোঝাপড়া ছিল। কিন্তু ব্যাটে-বলে কিছুতেই মিলছিল না। ইনভেস্টিগেটর সাহেব, আপনি হঠাৎ করে আমার কাছে না এলে নন্দনগড় কখনো অপরাধীমুক্ত হতো না।'

আবরার হেসে বলল, 'আপনি বলছেন নন্দনগড়ে আর কোনো অপরাধ হবে না?'

সাধন চক্রবর্তী বলল, 'আমি তা বলিনি। কিন্তু শেফালী ও লেদুর মতো কীট নিশ্চিহ্ন হওয়ায় অপরাধ নিশ্চিতভাবে কমবে। ওরা ছিল নর্দমার মতো, যেখান থেকে অপরাধীরা জন্ম নিত।'

আবরার সরাসরি সাধনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় না নন্দনগড় অত সহজে পরিষ্কার হবে। এতদিন শেফালী ও লেদু ছিল, এখন অপরাধের সাম্রাজ্য আপনার নিয়ন্ত্রণে যাবে। পুরো নন্দনগড় আপনার কথায় উঠবে-বসবে। ক্রিমিন্যালদের জন্য সুবিধা হবে। তাই না?'

সাধনের মুখ থমথমে হয়ে উঠল। সে ভুরু কুঁচকে বলল, 'বাইরের লোকের নন্দনগড় নিয়ে অত না ভাবলেও চলবে। আমি একজন জনপ্রতিনিধি। জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাজনীতিবিদ। কীসে জনগণের ভালো হয় আমার চাইতে কেউ ভালো জানে না।'

আবরার সাধনের দিকে দুই পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমি বাইরের লোক নই সাধন বাবু। নন্দনগড়ে আমার নাড়ি পোঁতা আছে। ছোটবেলায় এখানেই বেড়ে উঠেছি।'

সাধন বিস্মিত হয়ে বলল, 'তার মানে? কে আপনি?'

আবরার আরেকটু এগিয়ে একেবারে সাধনের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'আমাকে আপনি নামে চিনবেন না। তবে আমার বাবাকে চেনেন। এককালে তার হয়ে কাজ করেছেন।'

সাধনের মুখ দেখে মনে হলো শরীরে বজ্রাঘাত হয়েছে। সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুলল, 'আপনি সুরুজ উদ্দিনের ছেলে?'

'জি।' আবরার মাথা নাড়ল। তার হাতের পিস্তলটি বিপজ্জনকভাবে সাধনের মুখের ওপর দুলছে। সাধন চমকে উঠে বলল, 'পাগলামি করছেন কেন? ওটা সরান বলছি।'

আবরার যেন সাধনের কথা শুনতেই পায়নি। সে পিস্তলটি ধরল সাধনের কপাল থেকে সামান্য দূরে। সাধন চিৎকার করে বলল, 'ভুল করছেন আপনি। আমাকে গুলি করলে আপনিও রেহাই পাবেন না। পেছনে তাকিয়ে দেখুন চার-চারটি রাইফেল আপনার দিকে তাক করা। আপনি আরেকটু কাছে এলেই ওরা গুলি চালিয়ে দেবে। ভালো প্রস্তাব দিচ্ছি। যা হওয়ার হয়েছে। আপনাকে আমি অনেক টাকা দেব। নিরাপদে নন্দনগড় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। এখন আর পাগলামি করবেন না।'

সাধনের কাকুতি-মিনতি শুনে আবরার হেসে বলল, 'চারটি কই? আমি দেখছি তিনটি রাইফেল তাক করা আছে। তাও আমার দিকে নয়, আপনার দিকে।'

আবরারের কথা শেষ হওয়া মাত্র আশেক আলীর রাইফেল গর্জে উঠল। সিঙ্গেল শট। গুলি বিঁধল দেহরক্ষীর মাথায়। একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। দেহরক্ষীর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল লেদু মেকারের লাশের পাশে। রক্ত ছিটকে পড়ল চুনকাম করা সাদা দেয়ালে।

আবরার ধীর অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'ওরা আমার লোক। বিশ্বাস করে ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ভুল করেছেন। যেমন আমার বাবা একদিন ভুল করেছিল আপনাকে বিশ্বাস করে। জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।'

সাধন আতঙ্কে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'বাবারে, তোমাকে আমি ছোটবেলায় দেখেছি। আদর করেছি অনেক। বিশ্বাস করো, তোমার বাবাকে খুন করেছে সাদিক। আমি কিছু করিনি।'

আবরারের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। কোনো মানুষকে কখনো অমন বিদ্রুপের হাসি হাসতে দেখেনি সাধন। সে হাতজোড় করে আবরারের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইল। আবরার সাধনের চোখে চোখ রেখে দুই পা পিছিয়ে এল। ঘরের ভেতরের অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে ঠিক সে সময় গর্জে উঠল তিনটি রাইফেল। সাধন চক্রবর্তী, ৪ নং ওয়ার্ডের কমিশনার, নন্দনগড়ের অপরাধ সিন্ডিকেটের অন্যতম চূড়ামণির দেহ গুলির আঘাতে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। অতগুলো গুলি হজম করে সামান্যতম আর্তনাদ করারও সুযোগ পেল না সাধন। রক্তের পুকুরে ডুবে শুয়ে রইল চিরনিদ্রায়।

আবরার একবার লেদু, আরেকবার সাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে আশেক আলীদের বলল, 'তোরা শহরের আবর্জনাগুলো সাফ করলি। কিন্তু শহরটা আসলেই পরিষ্কার হবে কিনা সময়ই বলে দেবে।'

হাতঘড়িতে সময় দেখে আবরার বাইরে বেরিয়ে এল। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। পৌষের রাত বলে বাইরে এখনো গাঢ় অন্ধকার। পাখিদের সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। সাদিক মাহবুবের বাড়ির বাইরে শেফালীদের লাশগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেসব ডিঙিয়ে লাল সুরকির পথে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় পৌঁছাল। গিয়েই তার মনটা খুশি হয়ে উঠল। মোড়ের ওপর রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাগলু। আবরারকে দেখে সে বলল, 'আমার মনডা কইতাছিল আপনে আইবেন। এত রাইতে রিকশা কই পাইবেন, এই ভাইবা খাড়ায়া আছি। আর কোথাও যাবেন কি?'

আবরার হেসে বলল, 'স্টেশনে যাব। ছয়টার ট্রেন ধরতে হবে।'

আবরার সিটে বসলে পাগলু রিকশা চালাতে শুরু করল। নন্দনগড় শহরকে পেছনে ফেলে যেতে যেতে পুবের আকাশ ক্রমেই ফর্সা হয়ে উঠতে লাগল।

যখন সন্ধ্যা নেমেছিল

পিওনা আফরোজ

ঘুঙুর তার কথা বলতে চেয়েছিল। রায়ান শোনার কোনো আগ্রহই প্রকাশ করেনি। এমনকি জানতেও চাইল না, কী বলতে চেয়েছিল সে। শুধু তার প্রয়োজনটুকুই জানাল।

সেদিন বিকালের ম্লান আলোয় জানালার সাথে রাখা সোফায় বসে পুরনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল ঘুঙুর আর মাঝে মাঝে ম্যাগাজিন থেকে চোখ সরিয়ে দূরে কোথাও তাকিয়ে ছিল অপলক। তখন গোধূলিবেলার সূর্যের আভা ছড়িয়ে ছিল ঘাসের ওপরে, পথে পথে। অফিস শেষে কেউ কেউ বাসায় ফিরে যাচ্ছিল কংক্রিটের রাস্তা ধরে। হইহুল্লোড়ে মত্ত কিছু শিশু। সেসব দৃশ্য ঘুঙুর তাকিয়ে দেখছিল আর জীবনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে বেদনার্ত হয়ে উঠছিল সে। একটা কলরবহীন বিষণ্নতা চেপে বসেছিল বুকের ওপর। হঠাৎ রিঙটোন শুনে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখল রায়ানের কল। ঘুঙুর ভেবেছিল, হয়তো তাকে মনে পড়ছিল, হয়তো আর ভুলে থাকা সম্ভব হচ্ছে না বলেই সব অভিমান দূরে সরিয়ে আজ এতগুলো দিন পর ফোন করেছিল। কিন্তু না, রায়ানের গলার স্বরে কোনো উদ্বেগ কিংবা অনেকগুলো দিন কাছে না পাওয়ার, প্রিয় মানুষকে না দেখার যে অন্তর্গত আর্তি তার কিছুই সে টের পায়নি। তাই ঘুঙুর ভাবল, তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। দিলে হয়তো রায়ানকে এতদিন ধরে না দেখতে পাওয়ায় যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করছিল, তা সে লুকাতে পারত না। তবু মনে ক্ষীণ আশা নিয়ে ভেবেছিল সেই আগের মতো রায়ান আজও পাগলামো করবে, যেমনটা বিয়ের পরপর করত। ওর সাথে রাগ করে বাবা বাড়ি এলেই ও বারবার ফোন করে রাগ ভাঙাতে চাইত আর ফোনে না পেলে আফিস শেষে সরাসরি বাড়ি গিয়ে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কারণে বা অকারণে স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে ঘুঙুরের রাগ ভাঙাত। তাকে ছাড়া নিজ বাড়ি ফিরত না রায়ান, কখনই। তাই হয়তো ঘুঙুরের ধারণা ছিল অনেক দিন পর ফোন করলেও রায়ান তার ভুল বুঝতে পেরে বলবে, সন্ধ্যায় তৈরি থেকো, অফিস শেষ করে তোমাকে নিতে আসব। যদিও তার এ প্রত্যাশাটা অমূলক ছিল। কেননা গত কয়েক মাসে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে রায়ান অফিসের কাজের পর অবসর সময়টুকু সোশ্যাল মিডিয়াতেই কাটায়। এ নিয়ে ঘুঙুর শুরুর দিকে কিছু না বললেও সময়ের সাথে সাথে তার বুকেও অভিমান জমতে থাকে। ধীরে ধীরে সে ভাবতে শুরু করে, হয়তো তার সঙ্গে পথ চলতে চলতে রায়ানের এক ধরনের ক্লান্তি এসে গেছে। সম্পর্কের পরতে পরতে ছড়ানো ভালোবাসা কুড়াতে কুড়াতে একঘেয়েমি এসে গেছে তার। কথাগুলো ভাবলেই ঘুঙুরের বুকের ভেতরটায় তোলপাড় শুরু হয়। তবু শুরুর দিকে তার আত্মবিশ্বাস ছিল, মোহ কেটে গেলে কিংবা ভালো লাগা ফুরালে রায়ান ফিরে আসবে। ঘুঙুরের ভালোবাসার কাছে ধরা সে দেবেই। কিন্তু দিনের পর দিন পেরিয়ে গেলেও রায়ান

তার অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্রও সরে আসে না। রায়ানের দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা কখন যে ফুরিয়ে যেত সে টেরও পেত না। মেসেঞ্জারে চ্যাটবক্সে কথার ঝড় বয়ে যেত, যতক্ষণ সে চাইত। কার সঙ্গে কথা বলছে কিংবা কী নিয়ে এত ব্যস্ততা তার, এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে ঘুঙুরের ভালো লাগত না। তাছাড়া রায়ানের বিষয়ে কেউ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করুক, এটা রায়ানেরও পছন্দ নয়। কেবল নিজের ব্যাপারেই নয়, অন্যের ব্যাপারেও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কাউকে বিরক্ত করে না রায়ান। তার কোনো খারাপ লাগা কিংবা ব্যক্তিগত সমস্যাও সহজে অন্যের সঙ্গে শেয়ার করে না, খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঘুঙুরের সঙ্গেও না। প্রচণ্ড রকমের অন্তর্মুখী একজন মানুষ সে। তাই তো বুকে প্রশ্নের পাহাড় জমিয়েও চুপ করেই থাকত ঘুঙুর। কোনো কারণেই সংসারে অশান্তির ঝড় নেমে আসুক তা সে চাইত না। তবু ঝড় আসার প্রাক্কালে প্রকৃতিতে যেমন গাঢ় অন্ধকারের সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, রায়ান আর ঘুঙুরের সংসারেও সে রকমই থমথমে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসত আচমকাই। এ রকমই এক ছুটির দুপুর গড়িয়ে যখন বিকালও যায় যায় করছিল, রায়ানের অপেক্ষায় থেকে থেকে না খেয়ে টেবিলে রাখা সব খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই রায়ানের ঘরে ঢুকে নরম স্বরে ঘুঙুর জানতে চাইল, 'তুমি খাবে না?'

প্রশ্ন শুনেই রায়ান ক্ষেপে গিয়ে উত্তর দেয়, 'এখান থেকে যাও তো। সারাক্ষণ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর ভালো লাগে না।'

রায়ানের এমন জবাবে ঘুঙুরের আলো ঝলমলে মুখটা মুহূর্তেই যেন সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে ঢেকে গেল। ফুরিয়ে যাওয়া দিনের বেদনার মতোই বিষাদ ছুঁয়ে গেল তাকে। হৃদয়ভরা অভিমান নিয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ঘুঙুর। রায়ান তা জানতেও পারেনি।

শুধু সেবারই প্রথম নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় জড়িয়ে যাওয়ার পর থেকে তাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় কথোপকথন ছাড়াও সংসারে প্রয়োজন এমন কিছুর কথা বললেও রায়ান বিরক্ত হতো, অকারণেই দুর্ব্যবহার করত ঘুঙুরের সঙ্গে।

মাসের শেষের দিকে বাজার ফুরিয়ে গেলে ভীরু ভীরু পায়ে এক সকালে রায়ানের ঘরে ঢুকে নিচু স্বরে ঘুঙুর বলেছিল, 'শোনো না, বাসায় কিছু বাজার লাগবে, মাসের শেষ তো। অনেক কিছুই শেষ হয়ে গেছে...'

ঘুঙুরের কথা শেষ হলো কি আরো কিছু বলার বাকি আছে তা না ভেবেই রায়ান বলে ওঠে, 'বাজার নাই তো আমাকে বলতেছ ক্যান? আমি কী করব? তোমার কাজটা কী শুনি?' রেগে গিয়ে চোখ বড় বড় করে আরো বলে, 'তুমি এইখানে আছটা কী করতে?'

'ঘরের কাজও তো কম নয় রায়ান। ঘর-বাহির দুই দিক সামলাইতে আমার কষ্ট হয়ে যায়।'

'কষ্ট হয়ে যায়, না? আজাইরা প্যাঁচাল পাড়ার জায়গা পাও না? টাকা দিয়া রাখছি, নিজে গিয়া পছন্দ কইরা বাজার আনবা, সেইটাতেও কষ্ট? যাও তো এখান থেইকা যাও। বিরক্ত কইরো, না।' ঝাঁজ দেখিয়ে বলে রায়ান।

'আচ্ছা, যা-ই বলি তুমি বিরক্ত হও। আমি করেছি টা কী?'

'শোনো, আমারে আমার মতো থাকতে দাও। আমার লাইফের কোনো বিষয়ে তুমি ইন্টারফেয়ার করতে আসবা না।' মিনিট খানেক পর ডান হাতের তর্জনী উঁচু করে চোখ বড় বড় করে বলল, 'মাইন্ড ইট।' তখন রাগে হাত কাঁপতে থাকে তার।

রায়ানের কথা শুনে সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর প্রচণ্ড অভিমান বুকে নিয়ে সেই রাতেই তার বাসা ছেড়ে চলে আসে বাবার বাড়ি।

সেদিনের পর আজ প্রায় এক মাস তিনদিন পর রায়ান ফোন দিয়েছে। তাও ব্যাংকের কিছু কাগজপত্র খুঁজে না পেয়ে সেগুলো কোথায় রাখা আছে তা জানার জন্যই কেবল সে ঘুঙুরকে ফোন করেছিল। একবারের জন্যও জানতে চাইল না ঘুঙুর কেমন আছে? যদিও ওর এই জানতে না চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক, ঘুঙুর অন্তত এ রকমটাই ভাবে। আর কখনো তাকে যে ফিরে চাইবে না রায়ান, এটা জেনেই তো ঘুঙুর তার ছোট্ট বারান্দা, অনেকগুলো মানিপ্লান্ট, শখের বাগানবিলাস, পরিচিত রান্নাঘরের প্রিয় ক্রোকারিজের ঝনঝন শব্দ, একটু একটু করে জমানো টাকায় কেনা কফি চেয়ারের সেটটা, সবকিছু রেখে চলে এসেছিল। প্রতি সন্ধ্যায় যে চেয়ার দুটোয় বসে, দুজনে জানালার স্বচ্ছ কাচের ওপারে তাকিয়ে থেকে আর কফির মগে চুমুক দিতে দিতে রাত্রির বুকে সন্ধ্যার হারিয়ে যাওয়াকে দেখত, কিচিরমিচির শব্দ তুলে পাখির নীড়ে ফেরা দেখত, সেই সবকিছুতে তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে বলেই তো আজ এ আলাদা আলাদা থাকা। বেদনাকে দোসর করেই সময়গুলো কেবল অতিক্রম করে চলা। আর তাই এখনকার উজ্জ্বল সকালটাকেও কেবলই কুয়াশায় মোড়ানো চুপসে যাওয়া নীরব সকালের মতোই মনে হয় ঘুঙুরের। এই সকালের আলোয় কোনো উজ্জ্বলতা খুঁজে পায় না সে। দুপুরটাও কেটে যায় কেবল কাটাতে হবে বলেই। অন্তর্গত কোনো তাড়না অনুভব করে না, সময়ের হাত ধরে চলার। বিকালের আলোতেও আগের মতো ঔজ্জ্বল্য নেই। মনে হয় সর্বত্রই পরিবর্তনের আয়োজন। চেনা যে সময় ছিল তা যেন বহুদূরে গেছে সরে। তবু ফুরিয়ে যাওয়া সেসব সময়ের কিছু মায়া থেকে যায় দিনান্তে। হৃদয়ের একান্তে, নিভৃতে। পুরনো স্মৃতি আর বর্তমানের মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ ঘুঙুর শুনতে পায়, তার কানে রিমঝিম রিমঝিম শব্দ বাজছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে সন্ধ্যা নেমেছে এই শহরে। টাপুরটুপুর শব্দে ছন্দ তুলে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। মাধবীলতা দুলছে মৃদুমন্দ হাওয়ার দোলায়। অন্ধকার জড়ানো মায়াবি এই সন্ধ্যায়, ঘরের সব বাতি নিভিয়ে বসে আছে সে জানালার পাশে। এ রকমই এক মায়াবি ক্ষণে মনে পড়ে তার ফেলে আসা সেই সন্ধ্যাকে, যে সন্ধ্যার আঁধারে কেউ একজন প্রথম দুহাত পেতে চেয়েছিল তাকে, ঠিক এমনই বৃষ্টিঝরা এক সন্ধ্যায়। সেদিনই প্রথম দেখেছিল ঘুঙুর, আঁধারের রূপ কতটা মায়াবি আর কতটা মনোহর হয়! সেদিনের সেই আঁধার রায়ানের হৃদয়েও আলো হয়ে জ্বলেছিল। ক্ষণিকের তরে সে আলো জ্বলে আবার তা ফুরিয়েও গেছে। তাই তো ঘুঙুরের স্বাভাবিক আচরণেও রায়ান বিরক্ত হতো। এই তো কয়েক দিন আগেই রাতে ঘুঙুরের ঘুম ভেঙে গেলে দেখে রায়ান পাশে নেই। বিছানা ছেড়ে একটু এগিয়ে আসতেই চোখে পড়ে ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে সে লিভিং রুমের সোফায়। ঘুম জড়ানো চোখে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই ঘুঙুর তখন জানতে চাইল, 'তুমি এখানে কেন? এত রাতে ল্যাপটপে কী করছ?'

তার কথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে আড়চোখে একবার ঘুঙুরের দিকে তাকিয়ে আবার ল্যাপটপের দিকে তাকায় রায়ান। পাশে গায়েঁষে সোফায় বসে ঘুঙুর আদুরে গলায় বলে, 'এ্যাই, চলো না, ঘরে চলো। তুমি পাশে না থাকলে আমার ঘুম আসে না।'

'আজাইরা আহ্লাদ দেখাইতে আইসো না তো। যাও তো এখান থেইকা যাও। আমার পিছে পইড়া থাইকো না।' বিরক্তির স্বরে তাড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে ডান হাত নেড়ে নেড়ে বলে রায়ান।

তবু রায়ানের সেই আচরণকে উপেক্ষা করে মিষ্টি হেসে খানিকটা থেমে ঘুঙুর আবারো বলে, 'আজাইরা না রায়ান। সত্যিই তুমি পাশে না থাকলে আমার ঘুম আসে না। বিছানাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। চলো।'

'শোনো, তোমার এইসব ফালতু ভালোবাসায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।' এ কথা বলার পর পরই আরো রেগে গিয়ে জোরালো গলায় বলে, 'এই যা তো, এখান থেকে যা।'

মুহূর্তেই ঘুঙুরের চোখ-মুখ বিবর্ণতা গ্রাস করে। বিষাদে আচ্ছন্ন হয় মন। অপমান আর তাচ্ছিল্যে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। নিঃশব্দে ঝরতে থাকে অশ্রুফোঁটা। অথচ একটা সময় ঘুঙুরের ভালোবাসা পাওয়ার আশায়, তাকে অন্তত একটিবার দেখার অপেক্ষায় থেকে থেকে রায়ান সারাটি দিন কাটিয়ে দিত। সেই কিশোরীবেলায় ঘুঙুর বিকাল হলেই আনমনে দাঁড়িয়ে থাকত ছাদের কিনারায়। বহু চেনা মুখ, সেসব বিকালে ছাদে উঠত। নানা রকম গল্পে মুখর হতো বিকালের শরীর। ঘুঙুর চেয়ে থাকত দূর আকাশের দিকে..., আনমনে, আশপাশের সকল ভিড়, সকল কোলাহলকে ছাড়িয়ে...।

আসন্ন সন্ধ্যা যখন ধীরপায়ে পৃথিবীর বুকে নামত, ঘুঙুরও নেমে আসত ছাদের বুক থেকে। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে, যখন সে ছাদে ফুলের টবে পানি দেয়, পাশের ছাদ থেকে বিভোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে তাকে, একটি ছেলে। ঘুঙুরের তাতে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। সে প্রতিদিনের মতোই পানি দেয়া শেষে ছাদ থেকে নেমে আসে। এর কিছুদিন পর লক্ষ করে, স্কুলে যাওয়া-আসার পথেও সেই ছেলেটি দূর থেকে দাঁড়িয়ে ঘুঙুরের ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে রয়। যেন এই পথের দিকে চেয়ে থাকাতেই তার আনন্দ। উদাস দুপুর আর অবসর ক্ষণগুলোতেও তৃষ্ণার্ত নয়নে দাঁড়িয়ে থাকে জানালায়, তাও ঘুঙুরেরই অপেক্ষায়।

এত এত অপেক্ষা, দূর থেকে এই দাঁড়িয়ে থাকা আর সারাক্ষণ অশান্ত মনকে কিছুটা শান্ত আর স্থিরতা দিতেই বৃষ্টিভেজা এক সন্ধ্যায় রায়ান ছুটে যায় ঘুঙুরের কাছে। কী যেন কী ভেবে সেই সন্ধ্যায় ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল ঘুঙুর। হয়তো বা রায়ানেরই অপেক্ষায়। যদিও সে জানত না ছেলেটি আসবে কিনা! তাছাড়া জানবে কী করে? তার সঙ্গে তো ছেলেটির কখনো কথাই হয়নি; কেবল দৃষ্টি বিনিময়টুকু ছাড়া। ওই অতটুকুতে কি আর অবশ্যম্ভাবীভাবে বলা যায়, সে আসবে? তবু আশা আর

নিরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে ছেলেটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে সে। বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশ মেঘকে আড়াল করে মৃদু হাসিতে হেসে ওঠে। শীতল, মায়াময় বাতাস আলগোছে পরিপাটি বিলি কাটছিল চিরল পাতায়।

হঠাৎ ছাদের দরজা খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হলো। কারো পায়ের শব্দও কানে এল। তখন ঘুঙুর ছাড়া ছাদে ছিল না অন্য আর কেউ। সে পেছনের দিকে ঘুরে তাকাতেই দেখে রায়ান তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে এসে মিষ্টি হেসে বলল, 'আমি রায়ান। নাম নিশ্চয়ই জানো না।'

ঘুঙুর মাথা নাড়ে, মুখে কিছু বলে না।

'কখন এসেছ তুমি?' এমনভাবে জানতে চাইল যেন রায়ান আগে থেকেই জানত, ঘুঙুর আজ এখানে আসবে।

'এই তো কিছুক্ষণ আগেই।'

'কী ভাবছিলে? আমি কী করে জানলাম, তুমি এখানে?' ঘুঙুরের একদম কাছঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ করে তাকিয়ে থেকে জানতে চাইল রায়ান।

ঘুঙুর নীরবে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মৃদু হেসে রায়ান বলে, 'তুমি যখন ছাদে উঠছিলে, আমি দেখেছিলাম।'

তখন রায়ানের উজ্জ্বল গহিন চোখ দুটি ছিল অস্থির। ঠোঁটের ওপর গাঢ় কালো তিলটায় ঘুঙুরের দৃষ্টি কিছুটা সময়ের জন্য ছিল স্থির। তারপর ঠোঁট থেকে চোখ সরিয়ে একে অপরের দৃষ্টি ছুঁয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। ততক্ষণে ঘুঙুরের হৃদয়ের বন্ধ সব তালা যেন একে একে খুলে যাচ্ছিল। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল কাঁপা কাঁপা নিশ্বাস। সরল, সহজ প্রশ্রয়ের হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল রায়ানের মুখজুড়ে। তার পরই মৃদু হেসে ভ্রুজোড়া কপালে তুলে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই জানতে চাইল, 'আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলে, তাই না?'

হতবাক হয়ে নিষ্পলক রায়ানের দিকে তাকিয়ে থাকে ঘুঙুর। যেন নরম আলোর ঘোর নেমেছিল তখন দুচোখজুড়ে। রাত্রির শেষভাগের স্পর্শে বিকশিত অপ্রতিরোধ্য শিউলির প্রস্ফুটিত হওয়ার মতো হৃদয়ে ভালোবাসাও প্রস্ফুটিত হচ্ছিল রায়ানের জন্য।

'কী, কথা বলছ না যে, হ্যাঁ-না কিছু তো বলো। হ্যাঁ অথবা না।'

চমকে উঠে একপলক রায়ানের দিকে তাকিয়ে লজ্জা জড়ানো হাসিতে হেসে ওঠে ঘুঙুর।

রায়ানও মৃদু হেসে চেয়ে চেয়ে দেখে ঘুঙুরের মুখে খেলে যাওয়া ভালো লাগার অভিব্যক্তি। সেদিনের পর দুজনের কাছে আসা-যাওয়ায় কেটে যায় বেশ কয়েকটি বছর। রায়ান পড়াশোনা শেষ করে একটি চাকরিতে জয়েন করে দুই পরিবারের সম্মতি নিয়ে তারা বিয়ে করে। আনন্দ আর খুশিতে ভালোই কাটছিল তাদের দিনগুলো। তখন কথা ছিল দুজনের প্রিয় বিষয়গুলো পাল্টে গেলেও, দুজনের মনের অমিল হলেও দুজন দুজনকে কোনোদিনও ছেড়ে যাবে না। যদিও এ প্রতিশ্রুতিটুকু এখন কেবলই বাতাসে উড়ে উড়ে ফুরিয়ে যাওয়া কতগুলো টুকরো টুকরো শব্দ।

কেননা রায়ান আর ঘুঙুর একসঙ্গে থেকেও তাদের দূরত্ব তৈরি হয়েছে যেন যোজন যোজন দূর। বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া রায়ানের ঘরেও ঢুকত না ঘুঙুর। অপ্রয়োজনে কোনো কথা বলত না। শেষ কবে একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে তারা তাও এখন আর মনে পড়ে না ঘুঙুরের। শুরুর দিকে এ নিয়ে খুব মন খারাপ করত সে, নির্ঘুম রাত কাটাত চোখের জল ফেলে ফেলে। মনে করত হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। এই দুর্ব্যবহার, মন খারাপের সময়, অবিরত ঝরে যাওয়া চোখের জল সবকিছুরই অবসান হবে। কিন্তু কীভাবে? এ প্রশ্ন বারবার নিজের কাছে জানতে চেয়েও এর উত্তর কখনো পায়নি ঘুঙুর। কখনো কখনো এও ভাবত, হয়তো কোনো জাদুর বলে একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে মানুষের আশপাশে যখন শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তখন মানুষ ম্যাজিকে বিশ্বাস করতে চায়। খড়কুটোর মতো কিছু একটাকে আঁকড়ে ধরে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। বাঁচতে চায়। ঘুঙুরও হয়তো তাই চেয়েছিল। কিন্তু না, গত কয়েক মাসেও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বা কোনো জাদুর বলে তাদের ভালোবাসা আর পুনরুজ্জীবিত হয় না। একের পর এক নির্ঘুম রাত কাটিয়ে, বিষাদের ভার বয়ে চলাটা ঘুঙুরের জন্য একটা সময়ে অসহনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া মন যাকে আর চায় না তার সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত এই সংসার সংসার খেলা বা একসঙ্গে থেকে যাওয়াটাও তো নিজের এবং অন্যজনের জন্যও একধরনের শাস্তি বলেই ভেবে নেয় ঘুঙুর। তবু অজানা কোনো কারণে কিংবা নিজের কাছে হেরে যেতে চায় না বলেই হয়তো তার বারবারই মনে হয়, রায়ান আজও ভোলেনি তাকে। যা কিছু ঘটেছে হয়তো কোথাও বোঝার ভুল ছিল। হতে কি পারে না এমনটা? হতেই তো পারে। এসব কিছু ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার দৃষ্টি বাঁধা পড়ে পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া বিড়ালটির দিকে। এ বাড়িতেই থাকে সে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে ওর শরীরে হাত বুলাতে বুলাতে জানতে চাইল, 'কী রে পুষি তুই বল না, সত্যিই কি আমায় ভুলে গেছে রায়ান?'

হঠাৎ কলিং বেল বাজলে চমকে ওঠে ঘুঙুর। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। কোল থেকে বিড়ালটাকে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দেখে, করিডোরের রেলিংয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রায়ান। চোখের নিচে কালো দাগ, গালে-চিবুকে ফুটে উঠেছে নির্ঘুম রাতের চিহ্ন। আচমকা তাকে দেখতে পেয়ে কিছু সময় হতবাক হয়ে চেয়ে রইল, অজান্তেই চোখ উপচে পানি আসছিল। সে চোখের পানি যেন গোপন থাকে তাই ঘুঙুর তার হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে তা মুছে নিল। যেন রায়ানের প্রতি তার ভালোবাসার এ বহিঃপ্রকাশটুকু রায়ানের কাছে অপ্রকাশিতই রয়। দরজাটা বন্ধ করে ঘরের ভেতরের দিকে ধীরপায়ে হাঁটতে হাঁটতে খোলা চুলগুলো বেঁধে নিল হাতের সাহায্যে। লম্বা ছিপছিপে শরীরটা সোফায় এলিয়ে দিল। তার ঠিক পাশেই বসে রায়ান ঘুঙুরের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল—

'কী অবস্থা? বেড়ানো শেষ হলো?'

'কেন? আর বেড়াতে এসেছি, সেটাও বা কেন মনে হলো তোমার?' রায়ানের দিকে না তাকিয়েই সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে রিমোর্টটা তুলে নিতে নিতে বলে ঘুঙুর। রায়ান চুপ করে তাকিয়ে রয় তার দিকে। যেন বহুদিনের তৃষ্ণার্ত প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দেখছে দুচোখ ভরে।

রায়ানের সেই মায়াভরা চাহনিকে উপেক্ষা করে ঘুঙুর আবারো অভিমানের স্বরে বলে ওঠে, 'সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে তুমি তো ভালোই আছ।'

এবার রায়ান তার জায়গা থেকে সরে এসে ঘুঙুরের কাছঘেঁষে বসে। তার হাতটি নিজের হাতের মুঠোয় ভরে অপরাধীর স্বরে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'ঘুঙুর, আসলে গত কয়েক মাস আমি জবলেস ছিলাম। তুমি চিন্তা করবে ভেবে তোমাকে কিছুই জানাইনি। এমনকি চাকরি যে নেই, সেটাও যেন বুঝতে না পারো তাই প্রতিদিন সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে পার্কে গিয়ে বসে থাকতাম, শপিং মলগুলোয় ঘুরে বেড়াতাম। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে যতক্ষণ জেগে থাকতাম, পুরোটা সময় অনলাইনে জব সার্চ করতাম। পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে টাকা উপার্জন করার কী কী উপায় আছে, যা আমাকে দিয়ে সম্ভব, সেটাও খুঁজতাম অনলাইনেই।'

হতবাক হয়ে কথাগুলো শুনতে থাকে ঘুঙুর, রায়ানের দিকে তাকিয়ে থেকে। আর অজান্তেই তার চোখ ভিজে ওঠে। হাতখানিও জড়িয়ে রয়েছে তখনো রায়ানের হাতে। কান্না ভেজানো স্বরে সে বলে ওঠে, 'আমাকে বলতে তো পারতে।'

'তোমাকে এসব পেইন দিতে চাই নাই। তাই তো সংসারেও যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, আমি সবই পূরণ করার চেষ্টা করেছি তোমাকে না জানিয়ে ব্যাংক থেকে জমানো টাকা তুলেই।'

এবার রায়ানের মুঠো থেকে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অভিমান জড়ানো স্বরে বলে, 'তার চেয়েও বেশি পেইন তুমি দিছ, খারাপ ব্যবহার করেছ আমার সঙ্গে।'

'আমার মাথা ঠিক ছিল না। ইচ্ছে করে কিছু করিনি ঘুঙুর।'

'হুম, বুঝলাম। কিন্তু আমি যদি এখন তোমার সঙ্গে বাসায় যাই, তুমি তো জব না হওয়া পর্যন্ত দুর্ব্যবহারই করবা।'

রায়ান দুহাতে আলতোভাবে ঘুঙুরের গাল ছুঁয়ে, চোখে চোখ রেখে বলে, 'আর কখনো করব না। তাছাড়া জব কনফার্ম হয়ে গেছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও হাতে পেয়েছি।'

গাল থেকে হাত দুটি সরিয়ে দেয় ঘুঙুর। রায়ান একটু থেমে আবারো বলে, 'শোনো, এই শুক্রবারের টিকিট কনফার্ম করা আছে। হোটেলও বুকড করা আছে। আমরা সমুদ্র দেখতে যাচ্ছি।'

'আমরা? আমি কেন যাব তোমার সাথে? আমার ভালোবাসায় তো তোমার দম বন্ধ হয়ে আসে।'

বলতে বলতে আবারো চোখ দুটো থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল ঘুঙুরের। জমে থাকা ব্যথার পুরনো স্মৃতিকে মনে করে আবার যেন উসকে দিল সে নিজেই, নতুন করে।

'আহা। এমন করো না তো।' এক হাতে ঘুঙুরের চিবুক তুলে ধরল, চোখ মুছে দিল অন্য হাতে। কাঁধ জড়িয়ে বলল, 'তোমার ভালোবাসা ছাড়া সত্যিই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। চলো না প্লিজ, বাসায় চলো। ব্যাগ গুছিয়ে নাও...।'

আক্কেল আলীর গল্পের নায়িকা যেভাবে পালিয়ে বেড়ান

সাখাওয়াত টিপু

কোনো ব্যথা-বেদনা ছাড়া আক্কেল আলীর সামনের সারির দাঁতগুলো উঠেছিল। দাঁতগুলো ওঠার সময় শুধু মাড়ির হালকা চামড়ায় মৃদু শিরশিরে ভাব ছাড়া তেমন কিছু অনুভব হয়নি। প্রথম সারির দাঁতগুলো দেখতে ইঁদুরের দাঁতের মতো সুন্দর। কিছুটা ধারালো, তীক্ষ্ণ ও ধবধবে। শিশুকালে প্রথম নড়বড়ে সামনের দাঁতটি যখন তুলেছিলেন মা, তখন তিনি ইঁদুরের গর্তে ফেলেছিলেন। ফেলতে ফেলতে মা বলেছিলেন, ছেলের দাঁতগুলো যেন ইঁদুরের দাঁতের মতো শক্ত হয়। যেন চকচকে দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেন তেলতেলে সুন্দর হয়। যেন হাড্ডি-মাংস ও মাছের কাঁটা কুরকুর করে খেতে পারে। মায়ের বিশ্বাসকে আলী সাহেব সারাজীবন কখনো ভুলতে পারেননি। লোকালয়ে না বললেও দাঁত নিয়ে মায়ের যে সংস্কার, সেটা যুবক বয়সেও তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

সেদিন সন্ধ্যা নেমেছিল লিপিয়ারের বছরে। বিশেষ দিন—২৯ শে ফেব্রুয়ারি। চার বছর পর একবার আসে এমন বাড়তি দিন। এমন দিনে পড়ালে ছেলেও বাড়তি জ্ঞানের অধিকারী হয়। এটাই বাড়তি দিনে প্রথম জ্ঞান আহরণের সুযোগ। মা ভাবলেন, বিশেষ দিনে আলীকে বর্ণমালা শেখাবেন। রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা সামনে নিয়ে ছেলেকে বসলেন। নিউজপ্রিন্টের ফিনফিনে ধুসর রঙের পৃষ্ঠায় মোটা ব্লকের ছাপা কালো কালো বর্ণমালা। অক্ষরগুলো গোটা গোটা, দেখতে খুব উজ্জ্বল সুন্দর। মা পড়াচ্ছেন, ছেলে আলীও সমস্বরে বর্ণমালা উচ্চারণ করছে। হঠাৎ রান্নাঘরে চুলোর দিকে মায়ের চোখ পড়ল। দেখলেন, চুলায় তরকারির পাতিলটা পুড়ছে। আলীকে রেখে রান্নাঘরে গেলেন মা। এরই মধ্যে শিশু আলী অবাক কাণ্ড করে বসল। বর্ণমালা লেখা পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে মুখের কিছুটা অংশ পুরে দিল। ভাঁজ করা পৃষ্ঠাটা দেখতে এমন—মুখের ডানপাশে আ-এর অর্ধেক, মধ্যখানে প-ল-য় বর্ণের অর্ধেক আর বামপাশে বাল্যশিক্ষা-৪ লেখার অর্ধেক লালায় ভিজে গেছে।

রান্নাঘর থেকে ফিরে আলীর কাণ্ড দেখে মা-তো হতবাক। ছেলের বাল্যশিক্ষার পৃষ্ঠা খাওয়া দেখে মা আঁতকে উঠে চিৎকার করেছিলেন—না জানি বইয়ের কালো কালিতে ছেলের পেটে পীড়া হয়! মা বইয়ের পাতাকে এমনভাবে টান দিলেন, তাতে পৃষ্ঠার বর্ণমালাগুলোর অর্ধেক মুখের ভেতরে রয়ে গেল। বাকি অর্ধেক মায়ের হাতে থাকল। ভীত-সন্ত্রস্ত মায়ের চিৎকারে আলী ভয়ানক ভয় পেল। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে শিশুটি আধেক পৃষ্ঠা গিলে ফেলল। ছেলের মুখ খুলতে গালের দুদিকের চাপায় মা চাপ দিয়ে দেখলেন, পৃষ্ঠার বাকি অর্ধেক আছে কিনা! দেখেন—মুখের শূন্য গহ্বরে পৃষ্ঠার অবশিষ্ট কিছুই নেই। ততক্ষণে আলীর পাকস্থলীতে আধা পৃষ্ঠা হজমের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ছেলের বিমার নিয়ে মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। পরদিন সারাবেলা গেল, ভাগ্য ভালো ছেলের কোনো বিমার হয়নি। মা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন—সব মাবুদের দয়া!

বইয়ের পৃষ্ঠা হজমের পর আলীকে নিয়ে মায়ের স্বপ্ন বেড়ে গেল। মা ভাবলেন—ছেলে একদিন না একদিন বড় কিছু হবে। অক্ষরের অক্সিলারিস খেয়ে যে ছেলের কোনো বিমার হয়নি, সে তো সাধারণ কেউ নয়। শরীরের তাগদ আছে। নিশ্চয় তার ভেতরে খোদাতালার অশেষ কোনো রহমত আছে। কোনো মহৎ গুণ আছে। ছেলে মহৎ মহৎ বই লিখবেন। জ্ঞান-গরিমায় অনেক সুনাম হবে। মা আলীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলবেন—'খোদা তোমারে রহম করুক। অনেক বড় কিছু হও বাবা।' বলতে বলতে মায়ের দু'চোখ অশ্রুতে ছলছল করে উঠল। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন মা। মায়ের ক'ফোটা অশ্রু ছেলের কপালে পড়ল। মায়ের চোখের অশ্রু আলীর বাদামি কপালে অদ্ভুত শিহরণ জাগাল। আলীও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল মায়ের আদরমাখা দয়ার্দ্র মুখের দিকে। ঘটনাটা তার মনে ভীষণ দাগ কাটে। তো বত্রিশ বছর বয়সে আলী সাহেবের দাঁত নিয়ে এটুকু স্মৃতি মনে আছে।

আক্কেল আলী যেবার বত্রিশ বছরে পা দিলেন, সেবারও ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিন হলো। লিপিয়ারের এই দিনটিতে মায়ের অতীত স্মৃতি তাকে ঘিরে রাখে। বছর ছয়েক আগে গত হওয়া মা যেন আলীর সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ান। বাতাস বয়ে যাওয়ার ধ্বনি অথবা কোথাও কোনো শব্দ হলে মায়ের কণ্ঠ শুনতে পান। এমনকি কোথাও কোনো ছায়া নড়লে কিংবা নিজের ছায়ার ভেতর মায়ের ছায়া নড়তে দেখেন। বারবার মনে হতে থাকে—মা তাকে আগলে আছেন অনন্ত আকাশ যেভাবে নক্ষত্রকে আগলে রাখে ঠিক সেভাবেই। অবুঝ শিশুর কতশত ভীতিকর কাণ্ডের জন্য সামান্য বকে আদর করে বুকে আগলে নিয়েছেন মা। যেন শিশুর গায়ে পিঁপড়ের আঁচড় না লাগে। সেদিন ২৮ শে ফেব্রুয়ারি—রাতে আধখোয়া চাঁদ উঠেছিল কিনা টের পায়নি আলী। আবছা নীলাভ আকাশের নীহারিকা দেখে কিছুটা ক্লান্ত। চোখের দু'জোড়া পাতা ক্রমশ কাছাকাছি হলে আলী ঘুমিয়ে পড়েন সটান বিছানায়।

লিপিয়ারের সেই বাড়তি রাতে আরেক ঘটনা ঘটল। রাতের সপ্তম প্রহরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আলী সাহেবের। কানের নিচে দুপাশের ইউ-সাইজের চাপার ওপরে মাড়ির শেষপ্রান্তে কেমন জানি খুব ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন তিনি। মাথাটাও টনটন করছে তার। মাড়িতে যে ব্যথা বাড়ছে সেটা টের পেলেন। তারপর মুখ হা করে মাড়ির শেষ মাথায় শাহাদাত আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। বুঝতে আর দেরি হয়নি, আলী সাহেবের নতুন আক্কেল দাঁত গজাচ্ছে। ব্যথা ক্রমশ বাড়ছে, অস্থির অবস্থা। কিন্তু সমস্যা হলো এত রাতে ব্যথানাশক ওষুধ পাবেন কই! আলী সাহেবের চিন্তা—ভোর নাগাদ কোনো রকম কাটাতে পারলে কেটেরোল ডিটি খেয়ে ব্যথা কিছুটা উপশম করা যাবে। হঠাৎ মনে পড়ল তার—বাসায় তো মাউথওয়াশ আছে! মুখে হালকা গড়গড় করলে তো ব্যথা কিছুটা উপশম হয়। জরুরি অবস্থায় তাই করলেন আলী সাহেব।

ব্যথা কিছুটা উপশম হলে আবার বিছানায় সটান হলেন তিনি। শুয়ে শুয়ে মায়ের কথা ভাবলেন—দাঁত নিয়ে শিশুকালে মা কি কাণ্ডটাই না করলেন! ভেবে পুলকিত বোধ করছেন—আক্কেল দাঁতের সঙ্গে বুদ্ধির একটা সংযোগ আছে। মা বলেছিলেন—যার আক্কেল দাঁত ওঠে তিনি পরিপূর্ণ সজ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। বারবার মায়ের কথা মনে পড়ছে তার। আর ভাবছেন—মা তো বলেছিলেন একদিন লেখক হব আমি। নাম-যশ হবে। আরো কত কি ভাবলেন তিনি! সকাল হতে হতে এদিকে দাঁতের ব্যথা বেড়ে যেতে লাগল আলী সাহেবের। বাসার কাছে ডিসপেন্সারি থেকে কেটেরোল ডিটি ওষুধ আনলেন। সকালের নাস্তা সেরে ওষুধ খেলেন। আজ আলী সাহেবের ভালো লাগছে না কিছুই। ভাবলেন—অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিই। অসুখের কথা বলে একদিনের ছুটির দরখাস্ত মেইলও করলেন প্রশাসনিক কর্তার কাছে। একদিন সাপ্তাহিক ছুটি যোগ করে তিনদিনের একটা অবসর পেলেন তিনি। কিছুটা চিন্তা মুক্ত হলেন, দাঁতের ব্যথা সারলে অফিসে করতে পারবেন। এই যা স্বস্তি!

ছুটির প্রথম দিন শুক্রবার। দাঁতের ব্যথা কমায় আগের রাতের চেয়ে গতকাল রাতে ঘুম ভালো হয়েছে। শরীর ফুরফুরে লাগছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে সামান্য নাস্তা সেরে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লেন আক্কেল আলী। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তিনি ধানমন্ডি লেকে হাঁটতে যান। ইটের জঙ্গলের শহরে ধানমন্ডি লেক খুব পছন্দ। বত্রিশ নম্বর ব্রিজ পেরিয়ে আলী সাহেব দক্ষিণ দিকে বায়ে মোড় নিয়ে লেকের দিকে গেলেন। সামান্য এগিয়ে মসজিদের আগে কলাক্সিবল গেট দিয়ে লেকের রাস্তায় প্রবেশ করলেন। ঢুকতেই বামপাশে গোসল ঘাটের সিঁড়ি, ডানপাশে মসজিদ। লেকের পাড় ধরে হাঁটার পথ। আলী সাহেব হেঁটে হেঁটে লেকের পানির ভেতরে আকাশের নাড়াচাড়া দেখছেন। পানির গভীরে লেকের আকাশমুখী গাছের মাথাগুলো হালকা দুলছে। আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘ উড়ে যাচ্ছে এমনভাবে, যেন মেঘের সঙ্গে পানিও উড়ে যাচ্ছে অচিন দেশে। লেকের কোথাও কোথাও পানির ওপর দুয়েকগাছি লাল শাপলা ভাসছে। শান্ত পরিবেশ, ঝিরঝিরে কোমল বাতাস। প্রশান্তির এক মায়া আলী সাহেবকে জড়িয়ে ধরল।

হেঁটে হেঁটে মাঝে মাঝে আরামদায়ক শ্বাস ফেলছেন আলী সাহেব। মসজিদের ওপাশ থেকে আট নম্বর ব্রিজ পর্যন্ত দুবার হাঁটলেন। একবার ও-মাথায় গেলেন, আরেকবার এ-মাথায় আসলেন। তারপর আবার হাঁটা শুরু করলেন। ঘেমে-নেয়ে একাকার আলী সাহেব কিছুদূর যাওয়ার পর থমকে দাঁড়ালেন। ভাবলেন—একটু জিরিয়ে নিই। আলী সাহেব গিয়ে বসলেন মাঝবয়সী অশ্বত্থগাছের নিচে, ইট-সিমেন্টে শানানো বেঞ্চিতে। অশ্বত্থগাছের শিকড়ের ফাঁকা ভাগে মাটিতে দু-তিনটা গর্ত। সাপ, বেজি নাকি ইঁদুরের বাস করে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। তবে অনুমান আছে। আর যে বেঞ্চির ওপর তিনি বসে আছেন, তার নিচে বাতাস আসা-যাওয়া করছে। আলী সাহেব বিশ্রাম নিতে নিতে ভাবেন—'জীবন আনন্দদায়ক না হলে কত না করুণ হয়ে উঠত। মানুষ তো এক পায়ে খাড়িয়ে থাকতে পারে না। ফলে হাঁটার তালে তালে নিজের জীবনটাই বয়ে বেড়াতে হয়।'

আহা জীবন কত সুন্দর ভাবতে ভাবতে এমন সময় তার দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে একটি ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে লেকের পানিতে ঝাঁপ দিল। পানিতে কি মাছ শিকার করল? নাকি অন্য কোনো কিছু? এক রহস্যময় চোখে তিনি ইঁদুরের দৌড়ঝাপ ফলো করছিলেন। ইঁদুরটি কী যেন মুখে পুরে আবার লেকের পাড় ঘেঁষে খানিক দূরে আরেকটা গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে আলী সাহেবের এক দার্শনিক উপলব্ধি হয়। বিড় বিড় করে বলতে থাকেন—'কী শেখার আছে ইঁদুরের এই কাণ্ড থেকে!

আসলে প্রতিদিন সকলের এমনভাবে কাটানো উচিত, যেন আজই জীবনের শেষ দিন।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন আলী সাহেব—'মানুষের প্রতিদিনই তো নতুন দিন। কাল যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে নতুনভাবে শুরু করতে হয়। যে সূর্যটা একবার ডুবে যায় সেই সূর্যটা আবার নতুন করে জাগে। নতুন রূপে আলো দেয়।'

সামনে মা নেই, তবুও ইঁদুরের গর্তের দিকে তাকিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল প্রথম দাঁত তোলার কথা। ইঁদুরের গর্তে দাঁত ফেলার কথা। আহা! স্মৃতি এমনই উশৃঙ্খল যে কাউকে যখন-তখন এলোমেলো করে দেয়। লেকের পানির দিকে তাকিয়ে মায়ের স্মৃতি ভেসে উঠল—'আহা মা ছিলেন জলের মতো সহজ মানুষ। আর কাচের মতো স্বচ্ছ মন।' আবার বলেন—'আসলে তাও না। কোনো রূপকের তুলনা দিয়ে মা-কে বোঝানো যাবে না। চেনানো যাবে না। মা আরো আরো অনেক অনেক বড়।' আলী সাহেব এবার বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি পেছন থেকে মায়ের ডাকের মতো কণ্ঠ শুনতে পেলেন। কেউ একজন বলছেন—'আক্কেল দাঁত তো উঠেছে। এবার তুমি লেখালেখি শুরু করো।' মায়ের মতো নারী কণ্ঠ, অথচ পেছনে তাকিয়ে কোথাও কেউ নেই।

অশরীরী কণ্ঠে আলী সাহেবের গা ছমছম করে উঠল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে হালকা গরম অনুভব করলেন। নানা প্রশ্ন আলী সাহেবের মনে দানা বাঁধল। মনে মনে বললেন—তাহলে কি মায়ের পবিত্র আত্মা আমাকে গল্প লিখতে প্ররোচণা দিচ্ছে? ভাবনার নানা জট মাথায় নিয়ে বাসায় এসে গোসল সারলেন। দুপুরের লাঞ্চ শেষে ব্যথানাশক ওষুধ খেলেন। বিছানায় শরীর এলিয়ে আলী সাহেব ভাবছেন—লেখালেখিটা শুরু করবেন। কিন্তু কীভাবে শুরু করবেন? কবিতা নাকি গল্প দিয়ে? জীবনের এত ঘটনা কবিতা দিয়ে শুরু করলে প্রতীকের ভেতর অনেক কিছু হারিয়ে যাবে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলো তো গদ্যের ঢঙে গল্পে ধারণ করা সম্ভব। মায়ের কথার ধ্বনি মনে বেজে উঠল। ছোটবেলায় তো মা-ই বলেছিলেন—ছেলেটা একদিন জ্ঞান-গরিমায় সুনাম কুড়াবে।

মায়ের কথা আলী সাহেবের মনে আনন্দ ভর করেছে। এলানো শরীরে ঘুমটা বেশ আরামে এল। তার ঘুম সাধারণত পাতলা হয়। সামান্য বাতাসে দরজা বা জানালায় টু শব্দ হলেও তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এবার একদম ঘটেনি। বহুদিন পর নিশ্ছিদ্র নিদ্রায় মগ্ন হলেন আলী সাহেব। আসর গড়িয়ে মাগরিব আসে, ঘুম ভাঙে না তার। মাগরিবের পর এশা পেরিয়ে মধ্যরাত হলো, কিন্তু ঘুমের চোটে চোখ খুলতেই পারছেন না তিনি। ঠিক রাতের তৃতীয় প্রহরে ঘুম ভাঙল তার। সময় তখন ছুটির দিন শনিবার। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়া সারলেন তিনি। জীবনে এত ফুরফুরে মন আগে কখনো অনুভব করেননি। খুব আয়েশ করে সোফায় বসলেন। চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে আনলেন। আর কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি লেখক হিসেবে আবির্ভূত হবেন।

থিতু হয়ে আলী সাহেব লেখার টেবিলে বসলেন। টেবিলটা এতদিন ছিল অফিসের বাড়তি কাজ, নয়তো নানা ধরনের বই পড়বার স্টেশন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিবিড়ভাবে বই পড়ার অভ্যাস তার অনেক আগে থেকেই। আজ সেই টেবিল একজন গল্পকারের দখলে। সিনেমার পর্দার মতো জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনাগুলো আলী সাহেবের চোখে ভেসে উঠছে। কিন্তু বেশির ভাগ ঘটনা নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িত। তিনি সেটা লিখতে চান না। নতুন কিছু লিখতে চান। কীভাবে গল্প লেখা শুরু করবেন—ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল গতরাতের গভীর নিদ্রায় তিনি অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নের ঘটনাগুলো সাধারণত অতীতের ঘটনা বা কল্পনার কোনো না কোনো ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এবার সে রকম কোনো ঘটনা তার স্বপ্নে ধরা দেয়নি। একদম অচেনা এক গল্প।

স্বপ্ন নিয়ে আলী সাহেবের একটা খটকা রয়ে গেল—অচেনা দেশের পশু-পাখিরা কেন বাংলায় কথা বলে। শ্যামা থেকে দোয়েল, শেয়াল থেকে বাঘ, বাঘাইর মাছ থেকে কেঁচো—সবাই বাংলায় কথা বলে। গানও গায় বাংলায়। কাঁদেও বাংলার সুরে। ঝগড়াও করে বাংলায়। শুধু গালি দেওয়ার সময় তারা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। আজব লাগল ব্যাপারটা তার কাছে। তো আলী সাহেব গল্প লেখা শুরু করবেন। প্রথম বাক্যে তিনি পাঠককে চমকে দিতে চান। শুরুর বাক্যটা কী হবে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। দেয়ালে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন তখন ভোর ছয়টা কাঁটায় কাঁটায়। তারপরও ক্লান্তি নেই কোনো। আজ তাকে গল্প পেয়ে বসেছে। গল্পে প্রবেশ না করে আর কিছু করবেন না। গল্পের রসনায় তার মুখে রোশনাই ভাব।

আলী সাহেব আবার স্বপ্নের কাহিনীতে ঢুকে পড়লেন। গল্পের শুরুর বাক্যটা স্বপ্ন থেকে নেবেন। লিখলেন—'অচেনা মানুষের কোনো স্মৃতি নেই। অচেনা মানুষ শুধু বর্তমানে থাকেন।' তারপর থমকে গেলেন তিনি। ভাবলেন—'দার্শনিকতা তো গল্প নয়, গল্পে গল্প থাকা চাই।' আগের বাক্য কেটে আবার লিখতে শুরু করলেন—'গেলবেলায় স্বপ্নে অচিন দেশের মার্গারিটার সঙ্গে দেখা। সে যক্ষপুরীতে সোনার ডিম হাতে বসেছিল। ডিম থেকে নক্ষত্রের মতো তীক্ষ্ম আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল। আলো এতই উজ্জ্বল তার শরীরের শাড়ি ভেদ করে সবকিছু দেখা যাচ্ছিল। ঠোঁট তার আপেলের মতো কমনীয় গোলাপি-বর্তুল। ডাগর চোখের নীল মনিটি নীলপদ্মের মতো ভাসছিল। দীর্ঘ চুলের সাদারেখা শরতের মেঘের মতো উড়ছিল। স্তন জোড়া যেন হিমালয়ের চূড়ার স্ফটিকতুল্য ঝিলিক। দুইপা যেন পাথরে খোদাই করা ভাঁজকাটা অবিচল সুন্দর নকশা। এতো সুন্দর শ্রেয়সী, অথচ কথা বলে না। যখনি ধরতে যাই—দেখি, কোনো ধ্বনি নাই, দেহ বলে কিছু নাই, হাড়-মাংস নাই, কেবল অনুভূতি আছে। অনুভূতি তার দেহের বাহার, তবে অব্যক্ত পুলকের রহস্যময় রস।'

আজব ব্যাপার—একশ শব্দের অনুগল্প লিখে আলী সাহেব থামলেন। গল্পের শিরোনাম দিলেন 'সুন্দরের ছায়া'। খানিকটা ক্লান্তিও অনুভব করছেন। সুন্দরের এক চিলতে বর্ণনা করতে পেরে মন কিছুটা উৎফুল্ল। 'হান্ড্রেড পাইপার' ম্যাগাজিনের নিয়মিত পাঠক আলী সাহেব। তবে কি ওই ম্যাগাজিনের কথা ভেবে গল্পটা সমাপ্তি টেনেছেন তিনি! ওদের নিয়মাবলিতে একশ শব্দের গল্প সাবমিশন করা যায়। ফলে আলী সাহেবের গল্পটি ওই ম্যাগাজিনের জন্য একদম খাপের খাপ। কিন্তু গল্পে না লিখতে পারা বাক্যের জন্য তার মন উশখুশ করছে। গল্পে যদি—'মার্গারিটা নৌকার গলুইয়ের মতো হাঁটু গেড়ে, উরু বাঁকিয়ে ঢেউ খেলানো কলসির মতো এমন এলিয়ে বসেছে, যেন দূরের আকাশের ছলছল মেরুন রঙের মেঘ অসীম সমুদ্রের সঙ্গে রসলীলায় মেতেছে'—এবাক্য জুড়ে দেওয়া যেত, তাহলে অবয়বের সৌন্দর্য্য আরেকটু নিখুঁত হতো। তবে 'সুন্দরের ছায়া' গল্পে তার সেই সুযোগ নেই।

প্রথম গল্প লেখার আনন্দে আলী সাহেব ছুটির দ্বিতীয় দিনে ফুরফুরে মেজাজে নেয়ে-খেয়ে-শুয়ে কাটালেন। দাঁতের ব্যথাও তেমন নেই। কিন্তু সমস্যা বাধল ছুটির শেষদিন নিয়ে। কীভাবে কাটাবেন বাড়তি ছুটির দিন! ঠিক করলেন—আরেকটি অনুগল্প লিখবেন। নতুন গল্পের অভিজ্ঞতার জন্য নতুন স্থানে যাবেন। ছুটির তৃতীয় দিন রবিবার ভোরে তিনি আর ধানমন্ডি লেকে গেলেন না। এবার ভাবলেন ঠিক—মানিক মিয়া এভিনিউ হয়তো গল্পের জন্য জুৎসই। হালকা নাস্তা সেরে রবিবার ভোরে তিনি এভিনিউর পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের দিকে হাঁটা ধরলেন। মানিক মিয়া এভিনিউয়ের পুবের মাথায় এসে তিনি হৃদয় খালি খালি অনুভব করলেন। কিছু কি হারিয়ে ফেলেছেন? না তো তেমন কিছু হয়নি! তবুও কী যেন শূন্যতা তাকে আঁকড়ে ধরেছে। হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে আনমনে বলে উঠলেন—ওহ মার্গারিটা!

পুব থেকে পশ্চিমে বার-তিনেক হেঁটে ফুটপাতের লনে বসলেন আলী সাহেব। দশ কদম দূরে পশ্চিমে কাঠগোলাপ গাছ। মৃদু সুবাস মিহি বাতাসে অপূর্ব মাদকতা ছড়াচ্ছে। তার পেছনে প্রশস্ত রাস্তা, আর সামনে কিছু দূরে কয়েকটি মহাশূন্য আঁকা দেয়াল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সংসদ ভবন। শূন্যের ওপর ভর করা ছাদে প্রাচীন গহ্বরের মতো অর্ধ-মিনার। চতুরভূজের ওপর সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ। ত্রিভূজের তল ছোট। ছাদের উপর বাঁকা চাঁদের ফালি ফালি টুকরোগুলোর মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে শুয়ে আছে বক্রাকারে। সামনের অব্যারিত সবুজ কার্পেট ঘাসের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ বলে উঠলেন আলী সাহেব—এই সবুজ এত যে সবুজ, এই সবুজ ঈর্ষাকাতুর অসহ্য সুন্দর। যদিও রঙের জগতে নীল আর হলুদ ছাড়া সবুজ অচল। প্রশ্ন জাগে তার মনে—যদি হলুদ আর নীলের অভেদ চিহ্ন সবুজ কার্পেট ঘাস মাড়িয়ে মার্গারিটা হেঁটে যেত, তাহলে কেমন হতো? ভাবনার আরেক নতুন গল্প মাথায় নিয়ে বাসায় ফিরলেন তিনি।

বারান্দায় বসে উদোম গায়ে বসন্তের বাতাস লাগাচ্ছেন আলী সাহেব। বাতাসে ঘামটা শুকালে পরে গোসলে যাবেন। এমন অবসরে ভাবছেন পরের গল্পের কথা। তার মনে পড়ে গ্রিক ভাস্কর প্রাক্সিতেলেসের কথা। কীভাবে আফ্রোদিতির শরীরের ভাষাকে নিপুণ সৌন্দর্যে রূপান্তর করেছিলেন। আজও কত জীবন্ত সেই ভাস্কর্য। সুন্দর আসলে দেখার চোখ আর বলবার ভাষা, যা অন্তরের সংবেদনায় অনুভূত হয়, তাই সৌন্দর্য্য আকারে মানুষের মাঝে মানুষ বেঁচে থাকে। সৌন্দর্য্য নির্দিষ্ট কোনো রঙের নয়, সাদা কিংবা কালোও নয়। যেকোনো রঙেই সৌন্দর্য্য থাকতে পারে। সৌন্দর্য্য এমন আলো, যা অন্তরাত্মার বাহার। আলো আর অন্ধকারের প্রতিফলন, যা নিজের আয়নায় অপরকে দেখতে পায়। আত্মার এমন সঞ্জীবনী রূপের কারণে মানুষের জীবন সুন্দর। এমন নানা কিছু ভাবাভাবি হলো আলী সাহেবের। তারপর বস্তুগত জীবনে ফিরে এলেন তিনি।

প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম সেরে একটু জিরিয়ে নিলেন আলী সাহেব। কাল থেকে তো অফিস, আজ যদি আরেকটি অনুগল্প লেখা যেত মন্দ হয় না। বিছানা থেকে উঠে তিনি লেখার টেবিলে বসলেন। শুরুর বাক্যটা পেয়ে গেছেন তিনি। লিখতে থাকলেন—'প্রিয় মার্গারিটা, আজ তুমি আমার কলমের উপর ভর করে চলেছো। সাদা কাগজে অক্ষরের মতো তোমার চিহ্নগুলো—সাদা, কালো, লাল, বাদামি, হলুদ নাকি নীল—সেই গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা আমার কাজ নয়। কোথাও নেই, অথচ বর্ণমালার রেখাগুলোতে তোমার স্পর্শ পাই। হয়তো এটুকুই আনন্দ আমার। দেখো, খাঁজকাটা বর্ণের রেখাগুলো—কখনো বর্তুল, কখনো সরল, কখনো গরল, কখনো বৃত্ত, কখনো অর্ধবৃত্ত, কখনো সমবাহু, কখনো বিষমবাহু, কখনো উত্তল, কখনো সমতল—নানা অবয়বে গড়া। সংবেদনার যে হাত দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করতে চাই, সে আমার জীবনের সীমাবদ্ধতা। জানি না—আমার কল্পনায় যে মার্গারিটাকে আমি দেখি, সে কি জগতের কোথাও আছে? ঠিক এই বাক্যটাই যখন লিখছি, তখন টেবিলের বামপাশে এক অবয়ব এসে হাজির। মার্গারিটা দেখতে ঠিক তার মতো।

লেখা ফেলে যখনই তাকে স্পর্শ করতে পাই, তখন হাওয়াই অবয়বের রূপ ধারণ করে। সে অনুভবের উপস্থিতি আছে, দৃশ্যমান কাঠামো নেই। একবার মনে হয় তাকে দেখছি, আবার দেখি নাই। আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়ি। মার্গারিটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজি—টেবিলে আশপাশে, বুক শেল্ফের ফাঁকে, পর্দার আড়ালে, দরজার ফাঁকে, পেছনের রান্নাঘরে, শোবার ঘরে, আলনার ফাঁকে, ড্রয়িং রুমে, বারান্দার ফুলের টবে, ডাইনিং টেবিলে, শোকেসের চারপাশে, আলমিরার কোনায়, হ্যাঙারে ঝোলানো পোশাকের ভেতর, বাল্বের আলোতে, বাতি নেভানো অন্ধকারে—নানা জায়গায়। একবার মনে হয় দেখি, আবার দেখি নাই। যখনই কাছে যাই, মার্গারিটা কোথায় যেন চলে যায়। বুঝতে পারি, আমার লেখায় শুধু সে আছে মূর্ত অবয়বে। সে অবয়ব সম্পূর্ণ যে মার্গারিটার, সেটাও আমি হলফ করে বলতে পারি না। হয়তো যতদিন বেঁচে আছি, অবয়বহীন এক রহস্যের ডোরে বেঁচে আছি। জীবন কখন কাকে বেছে নেয় বলা মুশকিল। প্রিয় মার্গারিটা, কোথায় কীভাবে আছো জানি না, তবে মাঝে মাঝে কলমের উপর ভর করে এসো।'

'সুন্দরের ছায়া'র তুলনায় এবার গল্পের বেড় দেড়গুণ। পদ সংখ্যা ২৫০ শব্দের বেশি। এবার ফ্ল্যাশ ফিকশনে পৌঁছলেন আলী সাহেব। কোনো থামাথামি ছাড়া একটানে লিখেছেন গল্পটি। পড়তে কোনো হোঁচট খেতে হয় না। গদ্যেরও চলন সুন্দর। ভাষা খানিক বশে এসে গেছে। তিনি গল্পের শিরোনাম দিলেন 'মার্গারিটার খোঁজে'। খুব তৃপ্তি নিয়ে তিনি গল্পটি আরেকবার পড়লেন। বললেন, শান্তিই সুন্দর! দুপুরের লাঞ্চ সেরে একটু ঘুমিয়ে নিলেন। সন্ধ্যায় ইসাবেল্লা আয়েন্দের উপন্যাস 'আ লং পেটেল অব দ্য সি' নিয়ে বসলেন। ঘণ্টা তিনেক বেশকিছু পাতা পড়লেন। আর ভাবলেন—লেখার সময় তো চোখ, কান, নাক, মন ও হৃদয়—এমনকি সব ইন্দ্রিয় খোলা রাখতে হয়।

পরদিন অফিস খোলা। ফলে যথাসময়ে ঘুমাতে হবে। আলী সাহেব তাই ডিনার সারলেন। তৃপ্তিদায়ক ঘুমও দিলেন। সকালে উঠে বারান্দার পাতাবাহার ও ফুলগাছের টবে পানি দিলেন। বাসার সব কর্ম শেষে অফিসের পথে রওনা হলেন। রিকশায় উঠে মনে পড়ল আক্কেল দাঁতের কথা। মুখের ভেতরে শেষ মাথায় মাড়ির দাঁতে হাতের তর্জনী বুলালেন। বুঝলেন—ব্যথার বিপদ কেটে গেছে। পকেটে রাখা টিস্যু দিয়ে মুখ আর তর্জনী মুছলেন। আক্কেল আলী রাস্তার ড্রেনে টিস্যু ফেলতে যাবেন এমন সময় সামনের রিকশার পেছনে বডিতে চোখ পড়ল। সুন্দর হস্তাক্ষরে তাতে লেখা—মায়ের দোয়া...ধন্যবাদ, আবার আসিবেন...

Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders round as raven's claws.

—Jim Morrison

জিম মরিসন

জীবন-মৃত্যুর দরজা পেরিয়ে

ড. এস এম সাইফুল ইসলাম

রক সংগীতের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা রকস্টার তিনি। স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল ও চিরস্মরণীয়। চলনে-বলনে-গানে-কথায়-জীবনযাপনে-প্রেমে-উন্মাদনায় একদম আলাদা। অদ্ভুত মানুষ বটে। যেন ঝড়ের ভেতর ধাবমান এক অশ্বারোহী। তিনি কবি। কিংবদন্তি রক আইকন। হ্যাঁ, তার নাম জিম মরিসন।

জিমের পূর্ণ নাম জেমস জগলাস মরিসন। ১৯৪৩ সালের ৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মেলবোর্নে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মা ক্ল্যারা ভার্জিনিয়া (১৯১৯-২০০৫ খ্রি.) ও বাবা জর্জ স্টিফেন মরিসন (১৯১৯-২০০৮ খ্রি.)। জর্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অফিসার ও একজন শৌখিন পিয়ানো বাদক। তার সামরিক পদবি রিয়ার অ্যাডমিরাল। জিমরা তিন ভাইবোন। জিম সবার বড়। তার ছোট বোন অ্যান রবিন ১৯৪৭ সালে নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট ভাই অ্যান্ড্রু লি মরিসনের জন্ম ১৯৪৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার লস আল্টোসে।

১৯৪৭ সাল। জিমের বয়স তখন চার। ওই ছোট্ট বয়সে জিম একদিন মরুভূমিতে সড়ক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। ঘটনাস্থলে একটি ট্রাক উল্টে যায়। সেখানে বেশ ক'জন আদিবাসী আমেরিকান গুরুতর আহত অবস্থায় এলোপাতাড়ি পড়ে থাকে। এ দুর্ঘটনার সামগ্রিক ইমেজ চিরদিনের জন্য জিমের কচি মগজে বসে যায়। পরবর্তীকালে জিম তার *দ্য ডোরস*-এর 'মরিসন হোটেল' অ্যালবামে (১৯৭০ সালে প্রকাশিত) 'পিস ফ্রগ' গানে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'অ্যান অ্যামেরিকান প্রেয়ার' অ্যালবামে (জিম মরিসনের মৃত্যুর সাত বছর পর ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত) 'ডন'স হাইওয়ে' ও 'ঘোস্ট সং' শীর্ষক আবৃত্তিভিত্তিক গান দুটোয় ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু জিম তার কবিতা, গান ও সাক্ষাৎকারে বারবার তা গুরুত্বের সহিত বয়ান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মৃত ভারতীয়দের আত্মা তার আত্মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। একটি স্পঞ্জের মতো, ঘটনাস্থলে বসেই তিনি তা শোষণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

দ্য বেস্ট অব দ্য ডোরস-এর ক্যাসেট

জিমের পড়াশোনা ও বেড়ে ওঠা

জিম মরিসনের বাবার সামরিক চাকরিতে কর্মস্থল পরিবর্তন ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এ কারণে জিমের শৈশব-কৈশোর কাটে অনেকটা মুসাফিরের মতো বিভিন্ন শহরে ঘুরে-ঘুরে। ফলে তার স্কুলও পরিবর্তন করতে হয়েছে বেশ ক'বার। জিমের জীবনের প্রথম স্কুল ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্স প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারপর টেক্সাসের কিংসভিলের চার্লস এইচ ফ্ল্যাটো প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিউ মেক্সিকোর আলবুকার্কের সেন্ট জনস মেথোডিস্ট স্কুল, সান দিয়াগোর লংফেলো স্কুল, ক্যালিফোর্নিয়ার আলামেডা হাই স্কুল এবং উত্তর ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুল প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জিম অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালে জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুল থেকে তিনি স্নাতক হন। ফ্লোরিডার ক্লিয়ার ওয়াটারে জিম তার দাদা-দাদির সাথে থাকতেন। সেখানে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ জুনিয়র কলেজ ও ফ্লোরিডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই জিম মরিসন ছিলেন অন্যদের থেকে অনেকটা আলাদা ও স্বতন্ত্র। খুব পড়ুয়া ছিলেন তিনি। বইয়ের জন্য তার বিশেষ দরদ ছিল। শিল্প-সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে জিমের অসামান্য পঠনপাঠনের কিছু দৃষ্টান্ত মেলে। ফ্রিডরিখ নিৎশের (১৮৪৪-১৯০০ খ্রি.) নান্দনিকতা ও নীতিজ্ঞান এবং অ্যাপোলোনিয়ান ও ডায়োনিসিয়ানের দ্বৈততা সম্পর্কে নিৎশের দৃষ্টিভঙ্গি জিমের আলাপ-আলোচনা, কবিতা ও গানে প্রকাশিত হয়েছে। প্লুটার্কের 'প্যারালাল লাইভ্স' এবং ফরাসি প্রতীকবাদী কবি জাঁ নিকোলা আর্তুর র‍্যাঁবোর (১৮৫৪-১৮৯১ খ্রি.) কবিতা জিম মরিসনের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীকালে জিমের গদ্য কবিতার ভেতর সেই প্রভাব অনুধাবন করা যায়।

লেখক ইউলিয়াম এস বারোজ, জ্যাক কেরোয়াক, অ্যালেন গিন্সবার্গ, লুই-ফার্দিনান্দ সেলিন, লরেন্স ফেরলিংহেটি, চার্লস বোদলেয়ার, ভ্লাদিমির নাবোকভ, মলিয়ের, ফ্রানৎস কাফকা, আলবেয়ার কামু, অনরে দ্য বালজাক, জাঁ ককতো প্রমুখ অধিকাংশ ফরাসি অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের দ্বারা জিম মরিসন প্রভাবান্বিত ছিলেন। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের চেয়েও গ্রন্থাগারের শিল্প-সাহিত্য, কবিতা ও দর্শনের বইগুলোর প্রতি জিমের আগ্রহ ছিল বেশি। কৈশোরের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যু অবধি কবিতা, উদ্দামতা ও দ্রোহ তাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল। প্রবল শিল্পীসত্তা দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন নিজের কথা। জীবন ও মৃত্যুর কথা। চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতিও তার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায়। সর্বশেষ প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার জন্য জিম লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি তুলনামূলক সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

বাবার ইচ্ছে ছিল জিম মরিসন সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন। পিতার মতো পুত্রও সামরিক অফিসার হবেন। কিন্তু জিম একদমই তা চাননি। ফলে পিতা জর্জ স্টিফেন ভীষণ কষ্ট পান। পিতা-পুত্রের মধ্যে একপ্রকার নীরব অভিমান ও দূরত্ব তৈরি হয়। সংগীতের প্রতি পুত্রের দুর্নিবার ভালোবাসা পিতা কোনোদিন মেনে নিতে পারেননি। পিতার এরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও কবিতা ও গানের প্রতি জিমের প্রেম কখনো ম্লান হয়নি। আদতে জিম মরিসন জন্মেছিলেন রকস্টার হয়ে দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবেন বলে। ইতিহাস তা-ই সাক্ষ্য দেয়।

দ্য ডোরস ব্যান্ড গঠনের গল্প (১৯৬৫-১৯৭১ খ্রি.)

১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময় চলছে। এরই মধ্যে জিম মরিসন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েছেন। বোহেমিয়ান জীবনযাপন করছেন তিনি। রে ম্যানজারেক ও জিম ফিল্ম স্কুলে একসাথে পড়তেন। তারা সহপাঠী ও বন্ধু।

১৯৬৫ সালের জুলাই মাস। গ্রীষ্মের একদিন জিম ও ম্যানজারেক—দুই বন্ধু মিলে লস অ্যাঞ্জেলেসের ভেনিস সমুদ্রসৈকতে তুমুল আড্ডায় মেতে ওঠেন। আলাপের এক পর্যায়ে জিম ম্যানজারেককে জানান, তিনি গান লিখছেন। ম্যানজারেক তার গান শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। জিম মরিসন আবেগ ঢেলে গাইলেন 'মুনলাইট ড্রাইভ'। জিমের গীতিকবিতা (lyrics) ম্যানজারেককে মুগ্ধ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ জিমকে প্রস্তাব দেন 'দোস্ত, চলো; আমরা একটা ব্যান্ড গঠন করি'।

অন্যদিকে ড্রামার জন ডেনসমোর ও ম্যানজারেকের মধ্যে আগে থেকেই জানাশোনা ছিল। তারা একসাথে ধ্যানচর্চা ক্লাস করতেন এবং 'রিক অ্যান্ড দ্য র‍্যাভেনস' ব্যান্ডে বাজাতেন। আগস্টের (১৯৬৫) শেষ দিকে জিম ও ম্যানজারেকের সাথে ডেনসমোর যুক্ত হন। তারপর মাস দুয়েকের মধ্যে ব্যান্ডে যোগদান করেন গিটারিস্ট রবি ক্রিগার। এমতাবস্থায় ব্যান্ডের একটি সুন্দর নাম ঠিক করার জরুরত দেখা দেয়। ইংরেজ লেখক অ্যালডাস হাক্সলি রচিত আত্মজৈবনিক বই 'দ্য ডোরস অব পারসেপশন' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যান্ডের নাম ঠিক করা হয় *দ্য ডোরস*। উল্লেখ্য, হাক্সলির বইটির পরিকল্পনার মূল

উৎস ছিল চিত্রশিল্পী ও কবি উইলিয়াম ব্লেকের গ্রন্থ 'দ্য ম্যারেজ অব হ্যাভেন অ্যান্ড হেল'। এ বইটির একটি উদ্ধৃতি থেকে অ্যালডাস হাক্সলির চিন্তার ভিত্তি তৈরি হয়। ব্লেকের সেই উদ্ধৃতি হচ্ছে: 'উপলব্ধির দরজা যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে মানুষের যা কিছু আছে, সবকিছুই অসীম মনে হবে।' *দ্য ডোরস*-এর লাইন-আপ চূড়ান্ত রূপ পায় এভাবে—

জিম মরিসন : প্রধান কণ্ঠ, হারমোনিকা, পারকাশন
রে ম্যানজারেক : কি-বোর্ড, নেপথ্য কণ্ঠ
জন ডেনসমোর : ড্রামস, পারকাশন ও নেপথ্য কণ্ঠ
রবি ক্রিগার : গিটার ও কণ্ঠ।

ব্যতিক্রম ব্যাপার হচ্ছে, ব্যান্ড লাইন-আপে কোনো বেস গিটার প্লেয়ার নেই। তবে তা পুষিয়ে দিত কি-বোর্ডিস্ট ম্যানজারেকের ইলেকট্রিক অর্গানের অসাধারণ কাজ। ১৯৬৬ সালে *দ্য ডোরস*-এর সাথে ইলেকট্রো রেকর্ডসের চুক্তি হয়। সেই চুক্তি মোতাবেক ১৯৬৭ সালে ইলেকট্রো রেকর্ডসের প্রযোজনায় *দ্য ডোরস*-এর প্রথম অ্যালবাম মুক্তি পায়। ব্যান্ডের নামেই প্রথম অ্যালবামের নামকরণ করা হয়। প্রথম অ্যালবামটি বাজারে এসেই দুনিয়া কাঁপিয়ে দেয়। এর 'ব্রেক অন থ্রু', 'লাইট মাই ফায়ার', 'দি এন্ড', 'অ্যালাবামা সং' প্রভৃতি গান অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। আশ্চর্যের ব্যাপর এই—গানগুলো তখনকার মতো এখনো ভীষণ জনপ্রিয়। ১৯৬৬ সালে 'লাইট মাই ফায়ার' গানটি বিলবোর্ড হিট লিস্টের এক নম্বরে স্থান পায়। প্রথম অ্যালবামের অভাবনীয় ও বিস্ময়কর সাফল্য *দ্য ডোরস*কে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়। একই বছরে তাদের দ্বিতীয় অ্যালবাম 'স্ট্রেঞ্জ ডেজ' মুক্তি পায়। এবারো দারুণ সফল হলো *দ্য ডোরস*। 'লাভ মি টু টাইমস', 'পিপল আর স্ট্রেঞ্জ', 'হোয়েন দ্য মিউজিক'স ওভার' প্রভৃতি গান শ্রোতাদের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয় এবং বিলবোর্ডে হিট গান হিসেবে স্থান পায়। পর পর দু'টো অ্যালবামের অসামান্য সাফল্যের পর *দ্য ডোরস*-এর কর্মোদ্যম বেড়ে যায় দ্বিগুণ। ১৯৬৮ সালে তাদের তৃতীয় অ্যালবাম 'ওয়েটিং ফর দ্য সান' মুক্তি পায়। এই অ্যালবাম সারা বিশ্বে তাদের ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলে। 'হ্যালো, আই লাভ ইউ' গানটি বিলবোর্ডে এক নম্বর হিট গান হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া 'লাভ স্ট্রিট' ও 'ফাইভ টু অন' গান দুটো শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়।

দ্য ডোরস অদম্য গতিতে এগিয়ে যায়। এর পরের তিন বছরে তারা আরো তিনটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন। 'দ্য সফট প্যারেড' ১৯৬৯ সালে, 'মরিসন হোটেল' ১৯৭০ সালে এবং 'এল এ ওম্যান' ১৯৭১ সালে মুক্তি পায়। এই অ্যালবাম তিনটিও পূর্বের ন্যায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সব অ্যালবাম সুপারহিট হওয়ার মতো রেকর্ড পৃথিবীর অপরাপর ব্যান্ডের নেই বললেই চলে। থাকলেও তা অত্যন্ত বিরল। জিমের জীবৎকালে *দ্য ডোরস*-এর উল্লিখিত ছয়টি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ গান জিমের লেখা। তিনি কবি বলেই গানগুলোয় কাব্যরস, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও দার্শনিক বয়ানের সংমিশ্রণে বিশেষ মাত্রা তৈরি হয়েছে। ১৯৭০-এর দিকে জিমের কণ্ঠ আগের থেকে কিছুটা ভারি হয়ে ওঠে। খানিকটা রুক্ষতাও আসে। জিমের সাতাশ বছরের জন্মদিনে *দ্য ডোরস* 'অ্যান আমে রিকান প্রেয়ার' রেকর্ড করে। এই অ্যালবামে জিম মরিসন তার কিছু নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করেছেন। প্রথাগত অ্যালবামের মতো নয়

দ্য ডোরস-এর সদস্যরা

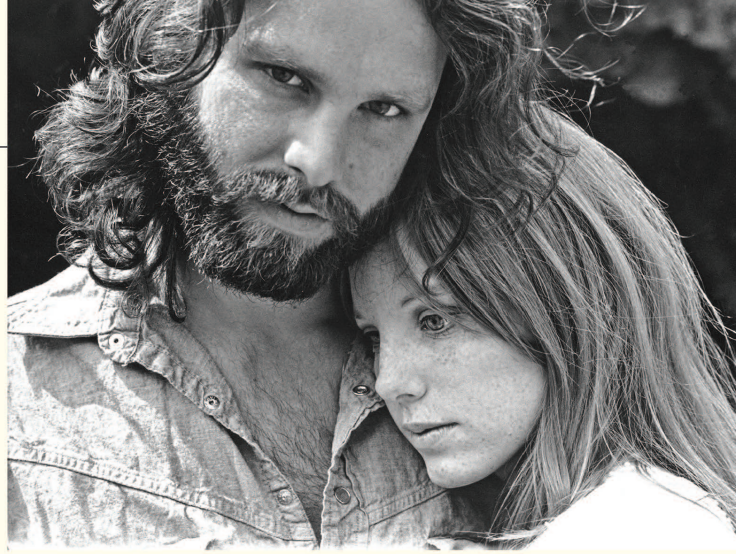

এটি। এখানে কবিতাগুলোয় কোনো সুর দেয়া হয়নি। জিমের দরাজ কণ্ঠের কবিতা আবৃত্তির সাথে এখানে সংমিশ্রিত হয়েছে ব্যান্ডের বাকি তিন সদস্যের বাজানো ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক। বাস্তবিক অর্থেই এখানে একদম ভিন্ন এক জিমকে খুঁজে পাওয়া যায়। যিনি শান্ত, আধ্যাত্মিক ও অনুভূতিপ্রবণ। জিম মরিসনের মৃত্যুর সাত বছর পরে ১৯৭৮ সালে 'অ্যান অ্যামেরিকান প্রেয়ার' অ্যালবামটি প্রকাশিত হয়। এটি *দ্য ডোরস*-এর সপ্তম ও শেষ অ্যালবাম। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই অ্যালবাম প্রকাশের পাশাপাশি *দ্য ডোরস*-এর নিয়মিত কনসার্টে অংশগ্রহণ ছিল। দেশে (আমেরিকা) ও বিদেশে দুশর অধিক কনসার্টে তারা সংগীত পরিবেশন করেছেন। জিমের শক্তিমান ভরাট কণ্ঠে গাওয়া অসাধারণ গীতিকবিতার সাথে ম্যানজারেকের দুর্দান্ত কি-বোর্ড, রবি ক্রিগারের ফ্ল্যামেঙ্কো ও ক্ল্যাসিক্যাল ব্লুজ গিটার এবং ডেনসমোরের উদ্দাম ড্রামবিট সত্যি অতুলনীয়। রক মিউজিকের দুনিয়ায় আক্ষরিক অর্থেই বিপ্লব এনেছে *দ্য ডোরস*। পরাবাস্তবতার সাথে অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তা, মৃত্যু-বাস্তবতা ইত্যাদি অনুষঙ্গের মেলবন্ধনে জিমের গীতিকবিতাগুলোও হয়েছে অনবদ্য। আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো সেই সময় মিউজিক ভিডিওর আদি রূপ নির্মাণ করে *দ্য ডোরস*। 'ব্রেক অন থ্রু টু দ্য আদার সাইড'-এর প্রোমো ডকুমেন্টারির পাশাপাশি 'আননোন সোলজার'কে ধরা যেতে পারে রক অ্যান্ড রোলের প্রথম মিউজিক ভিডিও।

সাইকেডলিক, ব্লুজ ও এসিড রকের জন্য *দ্য ডোরস* ও 'দ্য লিজার্ড কিং' খ্যাত জিম মরিসনের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কবি জিম মরিসনের প্রকাশিত বইপত্র

জিম গোড়া থেকেই ছিলেন বাঁধনহারা, বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ও দুর্বিনীত। তার ভেতরে কবি ও রকস্টারের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। কবিতায়ও তিনি ছিলেন উচ্চকিত ও বিপ্লবী। বারো বছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। তার কবিতায় নিজস্ব শিল্পবোধ, বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনা ও দর্শন দারুণভাবে প্রতিভাত হয়েছে। রকস্টার জিমের চেয়ে কবি জিম কোনো অংশেই কম নন। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অসঙ্গতি, বৈষম্য, প্রেম, দ্রোহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ তার কবিতা। ১৯৬৯ সালে জিম মরিসনের দুটো কবিতার বই প্রকাশিত হয়। একটি হচ্ছে 'দ্য লর্ডস : নোটস অন ভিশন', অন্যটি 'দ্য নিউ ক্রিয়েচারস'। তার মৃত্যুর পর ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় 'দ্য লস্ট রাইটিংস অব জিম মরিসন'। এ বইতে তার অপ্রকাশিত লেখাগুলো ছাপা হয়েছে।

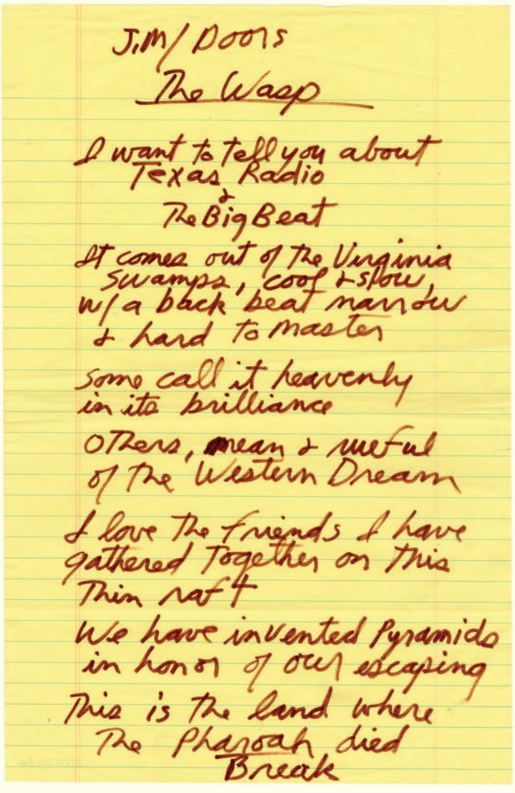
Jim/ Doors
The Wasp
I want to tell you about
Texas Radio
& The Big Beat
It comes out of the Virginia
Swamps, cool + slow
w/a back beat narrow
& hard to master
Some call it heavenly
in its brilliance
Others, mean & fearful
of The Western Dream
I love the friends I have
gathered together on this
Thin raft
We have invented Pyramids
in honor of our escaping
This is the land where
The Pharoah died
Break

জিমের হাতের লেখা দ্য ডোরসের গীতিকবিতা 'দ্য ওয়াস্প'

কবি বা লেখক হিসেবে তিনি যতটা সমাদৃত হতে পারতেন, বাস্তবে তা হননি। এতসত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় তিনি অসামান্য মেধাবী একজন কবি ছিলেন। 'উইথ আউট আ ট্রেস', 'স্টোনড ইনম্যাকুলেট', 'পাওয়ার', 'দ্য মুভি', 'দ্য ওয়ার্ল্ড অন ফায়ার', 'আ ফিস্ট অব ফ্রেন্ডস' প্রভৃতি কবিতায় জিমের দুর্দান্ত কবিত্বশক্তি অনুধাবন করা যায়।

জিম মরিসনের ব্যক্তিজীবন, প্রেম ও উন্মাদনা

অত্যন্ত সংবেদনশীল, জেদি, রাগী ও অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলেন জিম মরিসন। তিনি সুদর্শন যুবক ছিলেন, বলাই বাহুল্য। জীবন ও যৌবন ইচ্ছেমতো খরচ করেছেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন খুবই রোমান্টিক ও রোমাঞ্চপ্রিয়। প্রেমিক পুরুষ হিসেবে বন্ধুমহলে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। জিমের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রকস্টার-ইমেজ, পারফরম্যান্স, গায়কী-হিম্মত সবকিছুর জন্য নারীকুল মুগ্ধ ছিলেন। তার জীবনে প্রথম প্রেম হয়ে আসেন ম্যারি ওয়েরবেলো। ফ্লোরিডার সমুদ্রসৈকতে জিমের সাথে ম্যারির প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটে। তারপর তাদের বন্ধুত্ব প্রেমে রূপলাভ করে। পরবর্তীকালে সেই প্রেম ভেঙেও যায়। জিম প্রথম প্রেমিকাকে বিদায় জানিয়ে লেখেন 'দি এন্ড' এর মতো অসামান্য গান।

তারপর পামেলা কার্সন (১৯৪৬-১৯৭৪ খ্রি.) আসেন জিমের জীবনে। পামেলা ও জিমের পরিচয় ঘটে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় অধ্যয়নকালে। কবিতা লেখার জন্য জিমকে পামেলা সবসময় উৎসাহ দিতেন। অনুপ্রেরণা জোগাতেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত পামেলাই ছিলেন জিমের প্রকৃত প্রেমিকা। অভিন্ন হৃদয় জীবনসঙ্গী।

অ্যালকোহল ও হেরোইনের প্রতি তীব্র আসক্ত ছিলেন জিম মরিসন। কবিতা ও গানের জন্য প্রতিনিয়ত তিনি নিজেকে দগ্ধ করেছেন। মহাকালের কাছে শিল্পের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। শিল্পীর জীবন ও শিল্প কোনো আলাদা বিষয় নয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ জিম। নিজের ব্যক্তিজীবনের মতো তার কবিতা ও সংগীতজীবনও অপ্রথাগত। প্রেমেও তিনি প্রথার বাইরে। একদম নিজের মতো। প্রেমও তার কাছে শিল্পের মতোই অন্য একটি মরমি আশ্রয়। তাই তো তিনি প্রেমিকার কাছে দু'হাত পেতে চেয়েছেন একটুখানি বেঁচে থাকার আলো। গভীর আকুতি নিয়ে গেয়েছেন 'কাম অন বেবি লাইট মাই ফায়ার ...'।

জিমের ফ্যাশন সচেতনতা ও শামান নৃত্য

জিম মরিসনের কথা বলতে গেলে তার কবিতা ও গানের পাশাপাশি আরেকটি বিষয় প্রসঙ্গত এসে পড়ে। তা হচ্ছে জিমের ফ্যাশন ও স্টাইল। তিনি ছিলেন সময়ের চেয়েও অনেক এগিয়ে। কবিতা, গান, পারফরম্যান্স, ফ্যাশন সবক্ষেত্রেই তিনি যেন আদ্যন্ত সমসাময়িক। সত্যি, বিস্ময়জাগানিয়া।

১৯৬৭ সাল। জিম তার বিখ্যাত 'লাইট মাই ফায়ার' গানটি এডি সুলিভানের জনপ্রিয় টিভি শোতে এসে সরাসরি পরিবেশন করেন। সেই সময় তিনি লেদারের প্যান্টের সাথে মিলিয়ে পরেছিলেন

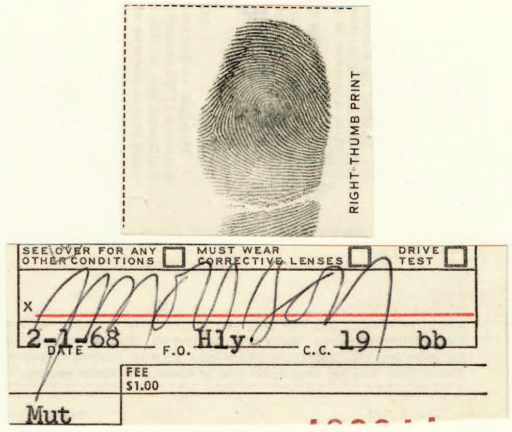

জিমের ডান বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ ও স্বাক্ষর, ১৯৬৮ সাল

লেদারের জ্যাকেট, বুকখোলা শার্ট ও বেল্ট। সত্তর থেকে আশির দশকে এই বোহেমিয়ান ধাঁচের ফ্যাশন সারা দুনিয়ায় তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। আশ্চর্য ব্যাপার, জিম মরিসন পুরনো হননি। লম্বা চুল রাখার ক্ষেত্রেও জিম ট্রেন্ডসেটার। তার ঝাঁকড়া কালো চুল, ডেনিম শার্টের সাথে লেদারের প্যান্ট, এভিয়েটর সানগ্লাস ও ন্যাটিভ আমেরিকান বেল্ট সবকিছুই নজরকাড়া। প্রাত্যহিক জীবনে ভি-নেক ও গোল-গলার টি-শার্টের সাথে তিনি ক্যাজুয়াল প্যান্ট বেশি পরতেন। জিমের পোশাক-পরিচ্ছদে ন্যাটিভ আমেরিকান স্টাইলের অনেক প্রভাব ছিল। হাতে বোনা ভিনটেজ রাগ-চাদর-পঞ্চো তাকে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করতে দেখা গেছে। আধুনিকতার সাথে পুরনো ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ জিমের স্টাইলের একটি বিশেষ দিক বলা যায়। সত্যিকার অর্থেই জিম ছিলেন একজন দুর্দান্ত ফ্যাশন আইকন।

জিম মরিসন যখন স্টেজ পারফরম্যান্স করতেন, তখন প্রায়ই তিনি শামান নৃত্যে (Shamanic dance) মশগুল হতেন। শামান হলো এমন এক ব্যক্তি, যিনি ভালো ও মন্দ আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম। শামানবাদ (Shamanism) মূলত এক প্রকার আধ্যাত্মিক ধর্মচর্চা। বিশেষত উত্তর এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার লোকজনের কাছে শামানবাদীরা বিশেষ ক্ষমতাধারী হিসেবে বিবেচিত। অনেকের মতে, তারা ভবিতব্য জানাতে পারেন। অনেক কিছু আগাম বলার ক্ষমতা রাখেন। মানুষের ব্যথা উপশম করতে পারেন। আমাদের দেশেও এ ধরনের ব্যক্তির দেখা মেলে। তারা আধ্যাত্মবাদ চর্চা করেন। জিম মরিসন যেন সেই শামান ব্যক্তি। যার প্রভাব রয়েছে ভালো ও মন্দ আত্মার ওপর। যিনি গানে ও নৃত্যে মানুষের দুঃখ-ব্যথা উপশম করতে পারেন।

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে বলা যায় জিমের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও অতীন্দ্রিয়বাদের চর্চা ছিল। তিনি অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা এক পুরুষ ছিলেন বটে।

পেরে-লাশেইজে জিমের সমাধিস্থলে প্রার্থনিক

প্যারিসের জন্য জিমের ভালোবাসা ও মৃত্যু-দরজা

১৯৭০ সালের শেষ ভাগ। জিম মরিসন গভীর বিষাদে ডুবে আছেন। নানাবিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। মন বসছে না কোথাও। *দ্য ডোরস* নিয়েও অনেক চিন্তা। জিম না থাকলে ব্যান্ডের কী হবে! সাংঘাতিক আত্মদহনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছেন তিনি। ১৯৭১ সালের শুরুর দিক। বসন্তকাল চলছে। *দ্য ডোরসের* 'এল আ ওম্যান' অ্যালবামের গানের ট্র্যাকগুলো সম্পন্ন হয়েছে। মিক্সিংয়ের একটু কাজ বাকি। ড্রামার জন ডেনসমোরের কাছে জানা যায়, 'এল আ ওম্যান'-এর চূড়ান্ত সংস্করণ নিয়ে জিম খুশি ছিলেন। এ সময় জিমের মদ্যপান নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রতিদিন তিনি এক ডজনের অধিক বিয়ার পান করতেন। তার কণ্ঠেও সমস্যা হচ্ছিল। এত বিষাদ ও হতাশার মূল কারণ হচ্ছে মিয়ামিতে একটি কনসার্টে জিম মরিসনের অভব্যতা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। এর সূত্র ধরে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে *দ্য ডোরস*-এর নির্ধারিত সব কনসার্ট বাতিল করে দেয়া হয়। এমন দুর্দিনের মধ্যে হঠাৎ জিমের মাথায় আসে প্রিয় প্যারিসের কথা। প্যারিস তার স্বপ্নের শহর। ভালোবাসার শহর। জিম প্যারিস যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। ব্যান্ডমেটদের জানান তার সিদ্ধান্তের কথা। সাত-পাঁচ ভেবে ব্যান্ডের অন্য তিন সদস্য জিমকে প্যারিস যাওয়ার জন্য সম্মতি দিলেন। এক সপ্তাহ পর প্যারিসের উদ্দেশে উড়াল দেন জিম। ১১ মার্চ ১৯৭১ সাল। এক মেঘলা দিনে জিম মরিসন এসে পৌঁছান প্যারিসে। প্রেমিকা পামেলা কার্সনের সাথে একটি ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ওঠেন তিনি। ঠিকানা :

১৭ রু বিউট্রেইলিস, তৃতীয় তলা,
লা মারাইস, ৭৫০০৪ প্যারিস, ফ্রান্স।

প্যারিস শিল্পের শহর। ছবি ও কবিতার শহর। শার্ল বোদলেয়ার, আর্তুর র‍্যাঁবো, অস্কার ওয়াইল্ড, মলিয়েরসহ অসংখ্য কবি-শিল্পী-দার্শনিকের শহর এই প্যারিস। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ, ক্লোদ মোনে, এডগার দেগা, তুলুজ লুত্রেক কে না ছিলেন এই প্যারিসে!

জিম মরিসনও প্যারিসের প্রেমে পড়েন। পামেলা ও জিমের এ শহরে এসে ভালোই দিন কেটে যাচ্ছে। দীর্ঘ পথ হেঁটে-হেঁটে, শহর ঘুরে-ঘুরে, ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁয় মজাদার খানাদানা খেয়ে, কাজের চাপহীন অবকাশযাপনে সব মিলিয়ে দারুণ সময় কাটছে। বন্ধুদের

জিমের এপিটাফ

প্যারিসে জিম ও পামেলা এখানে বসবাস করতেন। ১৭ রু বিউট্রেইলিস অ্যাপার্টমেন্ট।

জিমের মৃত্যু-সংবাদ, ওয়ার্ল্ড ডেইলি নিউজে

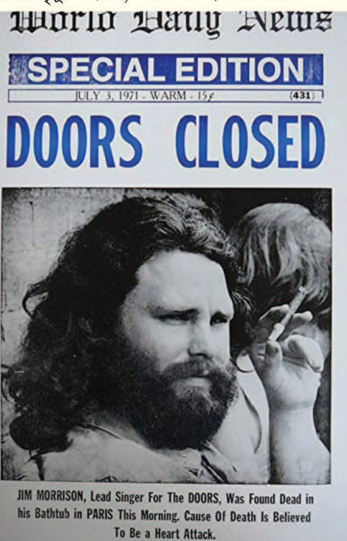
World Daily News
SPECIAL EDITION
JULY 3, 1971 - WARM - 15¢ (431)
DOORS CLOSED
JIM MORRISON, Lead Singer For The DOORS, Was Found Dead in his Bathtub in PARIS This Morning. Cause Of Death Is Believed To Be a Heart Attack.

চিঠি লিখে তিনি এসব কথা জানান। এই সময় জিম তার দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেন। শরীরের ওজনও কিছুটা কমিয়ে নেন। একদিন ডেনসমোরকে ফোন করে জিম জিজ্ঞেস করেন 'এল অ্যাম্যান' অ্যালবামটি বাণিজ্যিকভাবে কেমন চলছে। উল্লেখ্য, ব্যান্ড সদস্যদের মধ্যে ডেনসমোরের সাথেই জিমের শেষ কথা হয়।

এভাবে অনেকটা নির্বিঘ্নে জিম ও পামেলার মাস কয়েক সময় কেটে যায়। আতঙ্কের কথা হলো নতুন শহরে এসে অ্যালকোহল ও হেরোইনের প্রতি জিমের আসক্তি আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যায়। একই সাথে দেহের ওজনও বাড়ে। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। বাতাসে ভেসে আসে এক অজানা-অশুভ সংকেত!

তারপর যন্ত্রণাদগ্ধ একটি রাত আসে চূড়ান্ত নিয়তির মতো। জিম সেই রাতে মাত্রাতিরিক্ত হেরোইন সেবন ও অ্যালকোহল পান করেন। ঘরের মধ্যে বাথটাবে শুয়ে থাকেন। ৩ জুলাই ১৯৭১ আনুমানিক সকাল ছটার দিকে প্রেমিকা পামেলা কার্সন জিমকে বাথটাব থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেন। চিকিৎসকরা ছুটে আসেন অ্যাপার্টমেন্টে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে জিমের মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা অভিমত দেন। ফ্রান্সের পুলিশ এই মৃত্যু সহজভাবে নিতে পারেনি। তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটি চাঞ্চল্যকর ও ঘোলাটে মনে হয়। ফরাসি আইন অনুসারে জিমের মৃতদেহের ময়নাতদন্তও করা হয়নি। ফলে জিমের মৃত্যুর কারণ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নানাবিধ বিতর্ক, সন্দেহ ও জনশ্রুতি তৈরি হয়। রক এন রোল সার্কাস নামক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপক সাম বার্নেট জানান, রাত দুটোর দিকে মাত্রাতিরিক্ত হেরোইন সেবনের পর ক্লাবের বাথরুমে জিমকে তিনি অচেতন অবস্থায় পান। জিমের মৃতদেহকে মাদক ব্যবসায়ী বলে ধারণা করে অজ্ঞাত দুই ব্যক্তি ক্লাব থেকে তুলে নিয়ে যায়। তবে ময়নাতদন্ত না হওয়ায় এই বিবৃতিগুলো কখনো নিশ্চিত করা যায়নি। জিমের মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখা হয়েছিল কোনো এক ঊর্ধ্বতন মহলের নির্দেশে। সাংবাদিকদের কাছেও সঠিক তথ্য দেয়া হয়নি। অনেকের মতে, জিমকে পরিকল্পিতভাবে খুন করানো হয়েছে। ফলে তার মৃত্যুর কারণ এখনো রহস্যের চাদরে ঢাকা রয়ে গেছে। সত্যি কী যে হয়েছিল, আল্লাহ মালুম। পামেলা কার্সন বলেন, বাথটাবে ঢুকে করার সময় জিমের শেষ কথা ছিল 'প্যাম, তুমি কি এখনো ওখানে আছো'?

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে জিম মৃত্যুবরণ করেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান এটিই আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুর কারণ হিসেবে নথিভুক্ত হয়। দুনিয়ার মানুষ এটি জেনে আসছে ঠিকই, কিন্তু রহস্য রয়েই গেছে। প্যারিসের সবথেকে বড়, বিশ্ববিখ্যাত পেরে-লাশেইজ কবরস্থানে জিম মরিসনকে সমাধিস্থ করা হয়। কবরের ঠিকানা: ডিভিশন-৬, প্লট নম্বর-৩০, মেমোরিয়াল আইডি-৭৪০।

দ্য ডোরস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ড্রামার জন ডেনসমোরের (জন্ম: ১৯৪৪) সাথে আমার যোগাযোগ রয়েছে। তার বয়স এখন আশি চলছে। এ লেখাটি লেখার সময় তিনি আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশের শ্রোতাদের জন্য *দ্য ডোরস*-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গত বছর গ্রীষ্মে (জুলাই ২০২৪) অসলো থেকে আমি প্যারিসে ছুটে আসি। প্রিয় অনুজ চৌধুরী মারুফ অমিতের ওভারভিলার ডেরায় আমার আস্তানা হয়। শহরের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রণোচ্ছলতা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। একদিন (২৯ জুলাই ২০২৪), পেরে-লাশেইজ কবরস্থানে গিয়ে জিম মরিসনের সমাধির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করি। অবলোকন করি জিমের সমাধি। তার এপিটাফে তিন লাইনের একটি টেক্সট আছে—

JAMES DOUGLAS MORRISON
1943-1971

KATA TON DAIMONA EAYTOY

প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন দুটোয় জিমের পুরো নাম এবং জন্ম-মৃত্যু সাল উল্লিখিত রয়েছে। তৃতীয় লাইনটি একটি গ্রিক প্রবাদ। এর বাংলা ভাবানুবাদ দাঁড়ায় 'তার নিজ আত্মার প্রতি সত্য'।

১৯৯০ সাল। জিমের কবর ভক্ত স্টিফেন মরিসন সান দিয়েগো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিকস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজের অধ্যাপক ই নিকোলাস জেনোভেসের সাথে পরামর্শের পর জিমের কবরের ওপর একটি সমতল পাথর স্থাপন করেন। সেখানে ব্রোঞ্জের ফলকে নির্মিত এই এপিটাফটি সংযুক্ত করা হয়।

পেরে-লাশেইজ কবরস্থানটি খুব সুন্দর। মেলানকোলিক ও মায়াময়। দুনিয়ার সব নীরবতা যেন এখানে নেমে এসেছে। জিমের সমাধির দিকে তাকাতে-তাকাতে আমি বিষণ্ন হয়ে পড়ি। তার কণ্ঠ, গান, কনসার্ট মাথার ভেতর ঘুরপাক খায়। পড়ন্ত বিকেলের তির্যক সূর্যালোকে জিমের কবর এক অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। তার কিছু কথা গভীরভাবে আমার মনে পড়ে যায়—

'মানুষ যন্ত্রণার চেয়েও মৃত্যুকে বেশি ভয় পায়। এটি অদ্ভুত ব্যাপার যে তারা মৃত্যুকে ভয় পায়। জীবন মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক। মৃত্যুর সময় সকল যন্ত্রণা শেষ হয়ে যায়...' বেলা দ্রুত ফুরিয়ে আসে। জিমকে রেখে সন্ধ্যা নামার আগেই আমি সেমেট্রি দ্যু পেরে-লাশেইজ ছেড়ে আসি। আমাকে পৌঁছতে হবে মোমার্ত ছুঁয়ে মুলঁ রুজের দরজায়...

ফ্রাঙ্কফুর্টের এক কনসার্টে
স্টেজে জিম, ১৯৬৮

উয়ারী-বটেশ্বরে হস্ত কুঠার। ছবি : অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান

ইতিহাসের পাদপ্রদীপে বাংলাদেশ

স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র ধারায় গড়ে ওঠা জনপদ

ড. মিজানুর রহমান

জনপদ ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা

দুনিয়ায় মানুষের ইতিহাস অভিবাসন আর অভিযোজনের। পৃথিবীর আদি থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা বহমান। বাংলা মুলুকেও এমনটিই ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। তবে সেই ইতিহাস এখনো অবগুণ্ঠিত। এখনো এই জনপদের ইতিহাসচর্চার প্রধান ধারা রাজবংশনির্ভর রাজনৈতিক ইতিহাস। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখব কীভাবে সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় সমকালীন বৃহত্তর আঞ্চলিক কিংবা বৈশ্বিক রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে আদি বাংলাদেশের মানুষ তাদের নিজস্ব ইতিহাসের নির্মাতা হয়ে উঠেছিল, যা আদতে স্থানীয় ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

আজকের বাংলাদেশ একসময় ছিল গভীর এক সমুদ্রের তলদেশ। এই ভূখণ্ড 'বেঙ্গল বেসিন'-এর অংশ। বেসিন হলো এমন ভূমিরূপ, যা তিন-চার পাশে উঁচু ভূমি দ্বারা বেষ্টিত। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে ছোট নাগপুর মালভূমি, পূর্বে আরাকান ইওমা ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এই ভূভাগটিকে আকৃতি দান করেছে। ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জি মোতাবেক প্রায় ১৯৪ মিলিয়ন বছর আগে, ক্রেটাসিয়াস পিরিয়ডে, এ এলাকায় বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কালক্রমে পলায়নের মাধ্যমে এ বিপুল সমুদ্র তলদেশ ভরাট হয়ে যে ভূমিরূপ গঠিত হয়েছিল, সেখানেই গড়ে উঠেছে আজকের বাংলাদেশ। এখানে প্রধানত তিন ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায় যা সৃষ্টি হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। তন্মদ্ধে পাহাড় শ্রেণী এবং মধুপুর ও বরেন্দ্র ভূমি কয়েক লাখ বছরের পুরনো। এতদসত্ত্বেও সাধারণে প্রবল ধারণা যে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড অতি নবীন তাই এখানে মানুষের বসতিও বেশি পুরনো নয়। অধুনা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এ এলাকায় মানুষের বসতির বয়স কমপক্ষে প্রায় তিন হাজার বলে মনে করছেন গবেষকরা। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং চায়নার মিলনস্থলে অবস্থিত, যা মূলত এ তিনটি ভৌগোলিক ইউনিটের 'প্রান্তভাগ'। এ এলাকার মানুষের ইতিহাস বুঝতে মধ্যযুগের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর রিচার্ড ইটন প্রথম এই 'প্রান্তভাগ' (frontier) টার্মটি ব্যবহার করেন। ভৌগোলিক এই বৈশিষ্ট্যই মূলত এতদঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

বাংলাদেশ একটি জাতিরাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের আগে 'বাংলাদেশ' নামে কোনো দেশের অস্তিত্ব পৃথিবীর মানচিত্রে ছিল না। কিন্তু এই ভূখণ্ডে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের ধারাবাহিক বসতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এ দীর্ঘ সময়ে এ এলাকার রাজনৈতিক সীমানা বারবার পরিবর্তন হয়েছে এবং পুরো দেশ নানা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে পুরো এলাকাটিকে বোঝাতে 'আদি বাংলাদেশ' প্রপঞ্চটি ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বলা হয়ে থাকে। আদি বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা আঞ্চলিক ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও এর একটি কমন বৈশিষ্ট্য ছিল আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য।

কৃষ্ণ-এবং-রক্তিম মৃৎপাত্র

ইতিহাসে বাংলার রাজনৈতিক স্বতন্ত্রতা বুঝতে এ অঞ্চলের ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতার ভরকেন্দ্র সম্পর্কে কিঞ্চিত হলেও ধারণা থাকা দরকার। প্রাচীন ভারতের প্রথম ক্ষমতার ভরকেন্দ্র ছিল 'মগধ', যার রাজধানী ছিল পাটালিপুত্র। বর্তমানে এর অবস্থান ভারতের বিহার। ৩২২ প্রাক-সাধারণ অব্দে মৌর্য রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠা হয়, যা গুপ্ত রাজবংশের শাসন, ৬শ শতক, অবধি টিকে ছিল। মাঝখানে বেশ কয়েক শতাব্দী উত্তর ভারতকেন্দ্রিক এই কেন্দ্রটি দুর্বল হয়ে গেলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে (১২০৬) তা দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। 'দিল্লি' এ অঞ্চলের ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভরকেন্দ্র হিসেবে এখনো ক্রিয়াশীল, যা আদতে 'মগধ'-এর সাংস্কৃতিক হেজিমনিকে ধারণ করেই নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছে। 'মগধ' ও 'দিল্লি' রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক দিয়ে যতটা না শক্তিশালী ছিল 'সাংস্কৃতিক হেজিমনি'র উৎপাদক হিসেবে তা অধিকতর শক্তিশালী। বিগত প্রায় আড়াই হাজার বছরে বাংলা 'মগধ' ও 'দিল্লি'কে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করলেও তাদের সাংস্কৃতিক হেজিমনি মোকাবেলায় এখনো দুর্বল। এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে বাংলাদেশের স্বাধীন-স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

মানবেতিহাসের নানা সময়ে এ ভূখণ্ডে নানা স্থান থেকে মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলেছে। সাধারণ অভিবাসী, বণিক, ধর্ম প্রচারক, কিংবা রাজশক্তি হিসেবে তাঁরা ইতিহাসের নানা পর্বে এ ভূখণ্ডে এসেছিল। নানা সময়ে আসা এসব মানবগোষ্ঠীর কেউ কেউ এখানে স্থায়ী হিসেবে থেকে গেছেন, এই দেশের মানুষের সাথে মিশে গেছেন এবং এ দেশের মাটি ও মানুষের কল্যাণে তাদের সামর্থ্যকে উজাড় করে দিয়েছেন। তারা এ দেশ থেকে আর ফিরে যাননি, তাদের কবর হয়েছে এখানে এবং তাদের পরবর্তী বংশধরেরা এখানকার স্থানীয় মানুষের সাথে মিশে গেছেন, বৈবাহিক সূত্রে ও সামাজিকভাবে এখানেই একাত্ম হয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদরা তাদেরকে স্থানীয় ইতিহাসের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। বাংলায় আসা এ রকম একটি উল্লেখযোগ্য পরিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব পুরুষ যারা সুদূর ইরাক থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মধ্যযুগে বাংলায় এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে এ পরিবারের অধস্তন পুরুষ হিসেবে তিনি আধুনিক স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

বাংলাদেশের কমপক্ষে ১০টি স্থান (location) থেকে ফসিলউডের তৈরি মসৃণ সেল্ট ও হাতলযুক্ত সেল্ট বা বাটালি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এ হাতিয়ারগুলো নবপলীয় (Neolithic) সংস্কৃতির পরিচায়ক, যা এতদঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসতির সাক্ষ্য বহন করে। গবেষকদের মতে নবপলীয় মানুষের এই বসতি আনুমানিক ৩৫০০-৩০০০ বছর আগে গড়ে উঠেছিল।

প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের প্রাপ্তিস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায় এই হাতিয়ার ব্যবহারকারী মানুষেরা বঙ্গীয় বদ্বীপের আদিম অধিবাসী ছিল এবং কালক্রমে এদের বংশধরেরাই পুরো বদ্বীপজুড়ে বসতির বিস্তার ঘটিয়েছিল। প্রথম দিকে এরা পাহাড়ে বসবাস করলেও ধীরে ধীরে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিল এবং কৃষিকাজের পত্তন করেছিল। কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন এই আদিম জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষদের শহর, বন্দর ও শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ, স্বাধীন রাজ্য, মুদ্রাভিত্তিক বিনিময় ও বাণিজ্য চালু করতে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। খুব সম্ভবত আদি বাংলাদেশের নিম্ন ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকাজুড়ে ধান-কাউন-কালাই ডাল চাষাবাদকে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বলয় গড়ে উঠেছিল, যা মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন ভারতীয় ও প্রাচীন চৈনিক সংস্কৃতি থেকে আলাদা ছিল।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রার ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও বুলবুল আহমেদ মনে করেন যে এ অঞ্চলে আদি-ঐতিহাসিক যুগে একটি স্বাধীন রাজ্য/রাষ্ট্র বিকশিত হয়েছিল। এই রাজ্যগুলোকে বলা হতো জনপদ। প্রত্নতাত্ত্বিকদ্বয় মহাভারতের সূত্র উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব করেছেন যে উয়ারী-বটেশ্বরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদের নাম ছিল 'লৌহিত্য'। সমসাময়িক সময়ে আদি ভারতীয় অঞ্চলগুলোতেও এ রকম স্বাধীন রাজ্য/জনপদ গড়ে উঠেছিল। এ রকম ১৬টি প্রাচীন জনপদের নাম নানা ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায় যাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় জনপদগুলোর মুদ্রার ছাপ আর উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত মুদ্রার ছাপ আলাদা থাকায় এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি স্বতন্ত্র নগর ও জনপদের কেন্দ্র। খুব সম্ভবত প্রাচীন কৃষির উদ্বৃত্ত বঙ্গীয় বদ্বীপের পূর্বাংশে মানবসভ্যতার একটি স্বতন্ত্র ধারা সূচিত করেছিল।

উয়ারী-বটেশ্বর ছাড়াও আদি বাংলাদেশে আরো বেশকিছু নগর ও জনপদ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ শতাব্দীগুলোয় গড়ে উঠেছিল। নিম্ন ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত এসব কেন্দ্রগুলোর সাথে প্রাচীন

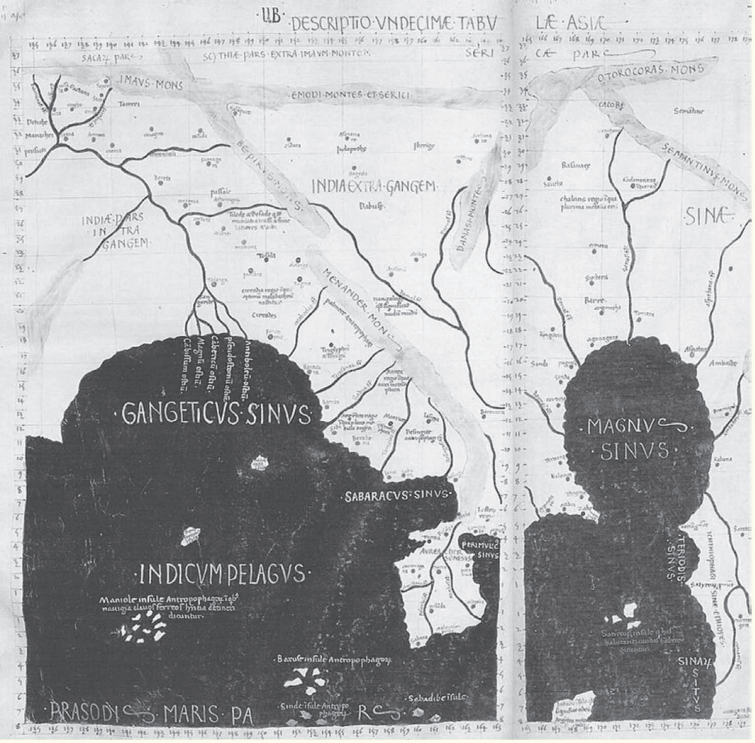

টলেমির *জিওগ্রাফি* গ্রন্থে গাঙ্গেয় বদ্বীপের মানচিত্র

বিহারের বৈশালীতে অশোক স্তম্ভ। ছবি : ব্রিটিশ লাইব্রেরি

ভারতীয়, চৈনিক ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান দেশগুলোর যোগাযোগ ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। উয়ারী-বটেশ্বরের সাথে বহির্বিশ্বের এ যোগাযোগ নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক আলামতের (প্রত্নবস্তু/বাস্তুবস্তু) ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে আদি বাংলাদেশের অন্যান্য প্রত্নস্থানে আদি বিশ্বায়নের এ বিষয়গুলো নিবিড় অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

৩২৭ সাধারণ পূর্বাব্দে (BCE) গ্রিক সেনাপতি আলেক্সান্ডার প্রাচীন ভারতে আক্রমণ করেছিলেন। হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো অধিকার করে তিনি পাঞ্জাবের বিপাশা নদীর তীরে পৌঁছেছিলেন। ভারত অভিযানের এ পর্যায়ে ক্লান্ত বাহিনীর কমান্ডাররা আলেক্সান্ডারের কাছে জানালেন যে তারা আর সাম নে অগ্রসর হবেন না। কারণ তারা জানতে পেরেছেন যে পূর্ব দিকে একটা দেশ/জাতি রয়েছে যারা গঙ্গারিডাই নামে পরিচিত। এই গঙ্গারিডাইরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুর্ধর্ষ। তাদের রয়েছে বিশাল হস্তীবাহিনী। এ বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় আলেক্সান্ডারের সাথে আসা ইতিহাসবিদদের লিখিত বিবরণী থেকে। আধুনিক ইতিহাসবিদরা প্রায় সবাই একমত যে প্রাচীন এই গঙ্গারিডাই জাতির বসবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশে। প্রত্নতাত্ত্বিক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ লোহার তৈরি যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য নিদর্শনের ভিত্তিতে মনে করেন যে স্থানটি হতে পারে গঙ্গারিডাই জাতির বসতি এলাকা। পরবর্তীকালে গবেষক মোয়াজ্জেম হোসেন তার পিএইচডি গবেষণায় উয়ারী-বটেশ্বর এলাকাকে প্রাচীন গাঙ্গারিডাই জাতির আবাসস্থল হিসেবে শনাক্ত করেছেন। ধারণা করা যায়, এ গঙ্গারিডাই জাতির লোকেরা ছিল আদি বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের পরবর্তী প্রজন্ম, যাদের উত্তরপুরুষ বর্তমানে বাঙালি/বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত।

সম্ভবত মহাস্থানগড় ছিল পুণ্ড্র নামক জনপদের কেন্দ্র, যা কিছু সময়ের জন্য উত্তর ভারতীয় রাজবংশ মৌর্যদের শাসনাধীনে এসেছিল। এখানে প্রাপ্ত মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এমনটাই মনে করা হয়। মৌর্য শাসনের বিস্তৃতি নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য একটি উপাত্ত হলো 'অশোকের স্তম্ভ'। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্য অধিকতর ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক মনিকা এল স্মিথ অশোক স্তম্ভের প্রাপ্তিস্থানের ওপরে ভিত্তি করে দেখিয়েছেন আফগানিস্তানের কান্দাহার থেকে বিহার ও ওড়িশা পর্যন্ত এ সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোনো প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পাওয়া গিয়েছে বলে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে আদি বাংলাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি কিছু সময়ের জন্য পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত হলেও হতে পারে। তবে সম্ভবত তা ছিল সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকতা বিহীন।

মৌর্যদের পরে উত্তর ভারতের ক্ষমতার বদল হয়, শুঙ্গ রাজবংশ ও তারপর কুশানরা ক্ষমতায় আসে। আদি বাংলাদেশে এদের শাসন বিস্তৃতির কোনো আকর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুঙ্গ ও কুশান শিল্পরীতির কিছু টেরাকোটাজাতীয় প্রত্নবস্তু বিভিন্ন প্রত্নস্থানে পাওয়া যায়, যা সম্ভবত সাংস্কৃতিক কিংবা বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে।

কুশানদের পরে উত্তর ভারতের ক্ষমতায় আসে গুপ্ত রাজবংশ। গুপ্তদের শাসনকে প্রাচীন ভারতের উজ্জ্বলতম সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশেষত গুপ্তদের নির্মিত মন্দির স্থাপত্য, শিল্প-সংস্কৃতিতে অগ্রগামিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এছাড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারেও তাদের ছিল অগ্রগণ্য ভূমিকা। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে গুপ্ত শাসকদের প্রায় ১০টি ভূমিদানপত্র পাওয়া গেলেও মধ্য ও উত্তর ভারতের মতো কোনো স্থাপত্যিক ও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (৩৩৫ সাধারণ অব্দ) 'সমতট' জয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লিখিত 'সমতট'কে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতির সমতট জনপদ বলে উল্লেখ করেছেন। কেবল এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে 'সমতট' নাম উল্লেখ ব্যতীত আর কোনো ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে লিপি সাক্ষ্যে প্রাপ্ত তথ্যকে পুনর্নিরীক্ষণ করে বিষয়টির প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। উপরন্তু লালমাই-ময়নামতিতে সপ্তম শতাব্দীর আগের কোনো সাংস্কৃতিক নিদর্শনও পাওয়া যায় না। উত্তরাঞ্চলে তাম্রশাসন প্রাপ্তি নিশ্চিতভাবেই আদি বাংলাদেশের কিছু অংশে গুপ্তদের প্রভাব থাকার সাক্ষ্য বহন করলেও তার রাজনৈতিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে পাওয়া যায় না। গুপ্তদের পরে পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের জারীকৃত মুদ্রা পাওয়া যায় প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান মাগুরা ও গোপালগঞ্জসহ বেশকিছু এলাকায়। খুব সম্ভবত এগুলো উত্তর ভারতের সাথে বঙ্গ জনপদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে।

আধুনিক ইতিহাস গবেষকদের মতে, উত্তর ভারত থেকে একাধিক পর্বে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটেছিল প্রাচীন বাংলায়। বলা হয়ে থাকে, গুপ্তদের সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণদের বড় একটি অংশ বাংলায় এসেছিল। অনেকেই এদের আর্য বলেন আবার ভাষাভিত্তিক পরিচয়ে এরা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা পরিবারের সদস্য হিসেবেও পরিচিত। আর্যরা বাংলায় আসার পরে স্থানীয় আদি অধিবাসীদের সাথে বিরোধ তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘ এ বিরোধের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব

এখনো বিদ্যমান, বিশেষত, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মাঝে এর কার্যকারিতা দেখা যায়। বর্তমানে ভারতে যে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর বিকাশ লক্ষ করা যায় এদের আদি 'মূল' হলো এই বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ। বাংলায় জাতিভেদ প্রথার প্রচলন এবং স্থানীয় আদি অধিবাসীদের ভাষা, বর্ণ, ও জীবনযাপন নিয়ে বিদ্রূপ ও তাদের ওপরে নিপীড়নের মতো নানা ঘটনা বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা ঘটেছিল বলে নিহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ' গ্রন্থে নানা ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক ও তারপরে পাল রাজবংশ বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল। বরেন্দ্র অঞ্চলকে বলা হয় পালদের জনকভু বা পিতৃভূমি। পাল শাসকেরা কেবল বাংলাই শাসন করেনি, বরং সুদূর উত্তর ভারতেও বাংলার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলো থেকে জানা যায়। বলা যায়, এ সময়ে বাংলা উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে একটি সুসংহত রাজনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীতে সেন বংশ বাংলায় শাসন শুরু করেছিল। এদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার দেওপাড়া নামক গ্রামে সেন রাজা বিজয় সেন রাজধানী স্থাপন করে বাংলায় সেন শাসনের ভিত্তি দিয়েছিলেন বলে লিপিসাক্ষ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়। ইতিহাসের নানা সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা যায়, সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী হওয়ায় সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোর প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। ফলত, স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া যথাযথ হয়নি। এখানকার আদিবাসী বৃহত্তর কৃষিজীবী সম্প্রদায়সহ নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাদের সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল অধীনতামূলক। ফলে অন্তর্গতভাবেই সেন শাসন বাংলায় শেকড় গাড়তে পারেনি। বাংলায় সেনদের শাসনকে 'স্বতন্ত্র সত্তা' হিসেবে গণ্য করা গেলেও তারা মূলত ছিল উত্তর-ভারতীয় ক্ষমতা কাঠামোর সাংস্কৃতিক হেজিমনির অংশ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ এলাকার মানুষ এই হেজিমনিক আগ্রাসনকে গ্রহণ করেনি।

পরবর্তীকালে বাংলায় বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর আগমন, মুসলিম সুফি-সাধকদের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আন্তরিক মিথস্ক্রিয়া, ইসলাম ও মুসলিম শাসনের বিস্তার ও এর স্থায়ী ভিত গড়তে মুখ্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক সময়গুলো দিল্লি সালতানাতের অধীনে থাকলেও প্রায় সময়েই দিল্লি থেকে প্রেরিত শাসকরা বাংলায় আসার পর দিল্লির অধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং স্বাধীনভাবে দেশ শাসনের অবতারণা করেছেন। বাংলা থেকে দিল্লিকে বারবার চ্যালেঞ্জ করার কারণেই ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারানী তার বিখ্যাত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলে উল্লেখ করেছিলেন। 'বুলগাকপুর' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'বিদ্রোহের নগর' হলেও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় আমরা এটাকে 'বিদ্রোহের দেশ' বলে গ্রহণ করতে পারি।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইলিয়াস শাহি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম 'শাহ-ই-বাঙ্গালা'/শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান উপাধি ধারণ করে লখনৌতি-সাতগ্রাম-সোনারগাঁকে একত্র করে স্বাধীন বাংলা সালতানাতের সূচনা করেন। এই প্রথম 'বাংলা' নামটি ভৌগোলিক স্বকীয়তায় ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হলো এবং সেই সময়ের দিল্লির অধীনতাকে অস্বীকার করেই তার নবযাত্রার উদ্বোধন হলো। পরবর্তী ২০০ বছর ছিল এই বাংলা সালতানাতের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার কাল। এই সময়ে কখনো কখনো দিল্লির শাসকেরা বাংলা আক্রমণ করলেও তারা সফল হতে পারেননি। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালে বাংলা আক্রমণ করলে স্বাধীন সুলতানি বাংলার প্রতিষ্ঠাতা সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ও তার পুত্র সিকান্দার শাহ একডালা নামক দুর্গে অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং বাংলার স্বাধীনতা দিল্লির কাছ থেকে পরবর্তী ২০০ বছরের জন্য নিরাপদ রাখতে পেরেছিলেন। একডালা দুর্গের অবস্থান নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। অধুনা, প্রত্নতাত্ত্বিক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান গাজীপুরের কাপাসিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত একটি দুর্গের অবশেষকে একডালা দুর্গ হিসেবে শনাক্ত করলেও এটা নিয়ে আরো নিবিড় অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর কৃতিত্ব বিবেচনায় তাঁকে বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লির শাসক মোগলরা পুনরায় বাংলা আক্রমণ করে এবং স্থানীয় শাসকদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও সাময়িক বিজয় অর্জন করেছিল। মোগল বিজয়-পরবর্তী দিল্লির প্রেরিত শাসকদের অধিকাংশই সুলতানি শাসকদের মতো বাংলায় আসার পর পরই স্বাধীনতা ঘোষণা করত। ফলে এ পর্বেও দিল্লির হস্তক্ষেপ বাংলায় দীর্ঘস্থায়িত্ব পায়নি। সেই সময়ে মোঘলরা 'সুবা বাংলা' নাম দিয়েছিল, যার সীমানা ছিল পূর্বে চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে তেলিয়াগর্হি এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের কাছে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নবাবরা অনেকটা স্বাধীনভাবেই বাংলা শাসন করেছেন।

ইংরেজরা বাংলার ক্ষমতা নেয়ার পরে খুব দ্রুত এখানকার দুটি

পাণ্ডুয়ার কুতুবশাহী মসজিদ

প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলমান ও হিন্দুদের ভেতরে বিভেদ তৈরি করতে সক্ষম হয়। ১৭৮৪ সালে উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। উইলিয়াম জোন্স ছিলেন অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট বহু প্রাচীন ভাষাবিদ। তাকে বলা হতো প্রাচীন ভাষার বিস্ময় বালক (Language prodigy)। তিনি ভাষার উৎপত্তির ওপরে ভিত্তি করে মতামত দেন যে বাংলার হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায় দুটি আলাদা উৎস থেকে উদ্ভূত এবং হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষা এবং দখলদার ইংরেজদের ইংরেজি ভাষা একই উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। সুতরাং হিন্দু এবং ইংরেজরা উৎপত্তিগতভাবে কাছাকাছি, মুসলমানেরা ভারতে বহিরাগত ও শোষক। খুব সম্ভবত এটা ছিল এ অঞ্চলে বয়ান (Narrative) নির্মাণ করে আধিপত্য বিস্তারের আদিতম দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে আরো নানা ইস্যু এই বর্গে যুক্ত করা হয়, ব্রিটিশ ইতিহাসবিদেরা ভারতের/বাংলার ইতিহাস লিখতে থাকেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভেতরে বিদ্বেষ তৈরি করতে থাকে। ইংরেজদের সাথে যোগ দেয় উঠতি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু। ফলে ধারাবাহিকভাবে স্বাধীনচেতা একটি জাতিকে বিভক্ত করার কৌশল প্রয়োগ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দির্ঘায়িত হতে থাকে। এভাবে বাংলায় 'সাম্প্রদায়িকতার' বিষবৃক্ষও রোপিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা গড়তে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। বাংলা এর আগে আর কখনই এত দীর্ঘ সময় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যা সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে। তবে পরাধীনতার এ সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ রচিত হয়েছিল সেই সময়ের বাংলা থেকেই। ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, তিতুমিরের বাঁশের কেল্লার প্রতিরোধ, হাজি শরিয়তুল্লার ফরায়েজি আন্দোলন ছিল সরাসরি দখলদার ইংরেজ ও তাদের স্থানীয় দোসর জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একেকটা মাইলফলক। শেষাবধি এ অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানরা যখন দখলদার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তখনই তারা এ এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা চলে গেলে বাংলা ভাগ হয়ে গেল, পশ্চিমের অংশ ভারতের এবং পূর্বের অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। ঐতিহাসিক জয়া চ্যাটার্জি তার বাংলা ভাগ হলো গ্রন্থে নানা ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে বাংলা ভাগ হয়েছিল উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। ফলত, এ সময়ে দুই বাংলাকে একত্র করে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল।

ফলত, পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষিজীবী সমাজকে পাকিস্থানের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে বাঙালি মুসলমানের অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও পরবর্তীকালে এই রাষ্ট্র কাঠামোতে তারা নিজেদেরকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আবিষ্কার করেছিল। নানা বৈষম্য এই এলাকার মানুষকে আবারো স্বাধীন স্বকীয় সত্তায় ফিরতে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। এ বৈষম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হওয়ার পরেও বাঙালিদের পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে দিতে গড়িমসি করা হয়েছিল। তদুপরি ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্র্যাকডাউন এ দেশের মানুষকে আরেকটি স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল। কার্যত, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছিল, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলের মানুষের হাজার হাজার বছরের স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষারই ধারাবাহিকতা।

বাংলাদেশের প্রায় তিন হাজার বছরের ধারাবাহিক মানবেতিহাসে নানা সময়ে নানা জাতিগোষ্ঠী এ ভূখণ্ডে এসেছিল নানা অভিপ্রায়ে। এলাকাটি প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত হওয়ায় বিশেষত, অসংখ্য নদীনালা, খালবিল, ঘন ঝোপঝাড়বিশিষ্ট বনবাদাড় এবং সেখানে নানা বিষাক্ত ও হিংস্র জীবজন্তুর উপস্থিতি আক্রমণকারী বহিঃশত্রুকে সর্বদা প্রতিকূল পরিবেশে ফেলে দিত। উপরন্তু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া মশা, মাছি, জোঁকসহ নানাবিধ কীটপতঙ্গের বসতি গড়তে আদর্শ যা বহিরাগত যেকোনো বাহিনীর দীর্ঘদিন অবস্থান করার জন্য ছিল প্রতিকূল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল এখানকার নিয়মিত ঘটনা। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা এখনো নৈমিত্তিক ঘটনা, যা সুদূর অতীতকাল থেকেই ঘটত। এতদসত্ত্বেও এখানে মানুষের সমৃদ্ধ বসতি গড়ে উঠেছিল, নানা বহিঃরাজনৈতিক শক্তি বারবার আক্রমণ করেছে এবং সর্বশেষ ইউরোপীয় শক্তিগুলো বাংলায় জড় হয়েছিল খুব সম্ভবত এখানকার অবারিত কৃষি উৎপাদন ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে। পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বিবরণীতে যেমনটি বাংলা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'দোজক ই পুর নিয়ামত'। অর্থাৎ এ দেশ দুর্যোগ ও সম্পদে ছিল ভরপুর। প্রতিনিয়ত দুর্যোগের সাথে লড়াই করা বঙ্গীয় বদ্বীপের মানুষেরা যেমন ছিল কর্মঠ তেমনি দুঃসাহসী। ফলে এরা ছিল বিদ্রোহী এবং কোনো নিপীড়ক কিংবা দখলদার শক্তিকেই তারা বরদাশত করেনি।

লেখক : আর্কিওলজিস্ট ও আর্কিওবোটানিস্ট, সহযোগী অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আদিনা মসজিদ

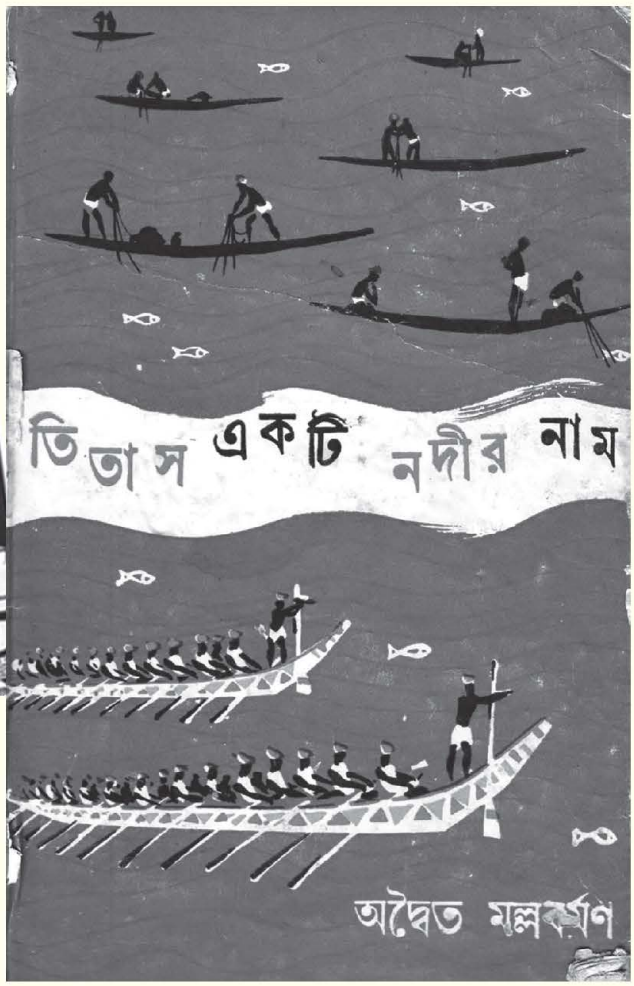

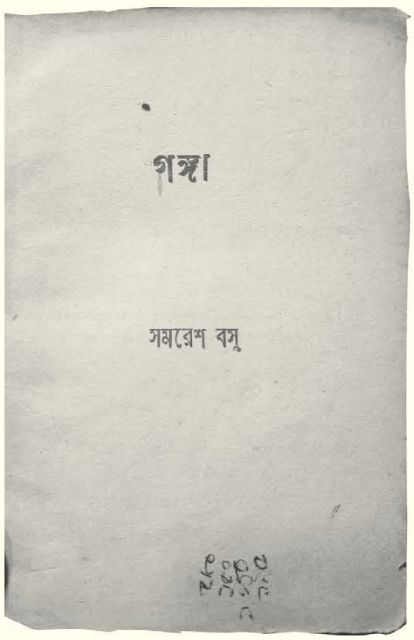

নদীকে তবু চেনা হলো না

প্রশান্ত মৃধা

‘বাংলা উপন্যাস’ শিরোনামের দীর্ঘ প্রবন্ধের একেবারে শেষ দিকে দেবেশ রায় সখেদে লিখেছেন, ‘বাংলা উপন্যাসে সঞ্চারিত হয়নি লোকায়ত পৌরুষ, বাংলা উপন্যাসের কাহিনীতে আসেনি পুরাণ বা মিথ ভাঙার লোকায়তিক পেশি, বাংলা উপন্যাসের সংলাপে আসেনি আমাদের প্রতি ক্রোশে আলাদা আলাদা উপভাষার খর চলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গশ্লেষরসিকতার শান।’

বাংলা উপন্যাস তো একেবারে শৈশব থেকেই ইউরোপীয় উপন্যাস, আরো ছোট করে বললে, ইংরেজি উপন্যাসের আদল আর গড়নকে এর প্রয়োজনীয় মান্যতা দিয়ে এসেছে। সেই 'ইংরেজি উপন্যাসের আদল ও গড়ন' যদি ইংরেজি শিক্ষিত এবং সবে উপন্যাস পড়তে-শেখা বাঙালিকে লোকায়ত পৌরুষের পেশি প্রদর্শন না করে আর উপভাষার চলমানতাকে সদ্য রপ্ত করতে শেখা 'আধুনিকতা'র ঝোঁকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাহলে বাংলা উপন্যাস সেদিকে যাবেই-বা কেন? প্রবন্ধগ্রন্থ হিসেবে *উপন্যাস নিয়ে* [১৯৯১] প্রকাশের পর থেকে আলোচিত। এ বইয়ে দেবেশ রায় আরো কয়েকটি বাক্য লিখেছেন যা বাংলা উপন্যাসে আজও সেভাবে ধরা পড়েনি, হয়তো 'কখনও'ই পড়বে না। ফলে তা তার ভাষায়, 'ঔপন্যাসিক ঐতিহ্য তৈরি করেনি, বড়জোর সেই ঐতিহ্য তৈরি হতে পারত এমন কিছু স্মারক তৈরি করেছে।' কেন রচিত হলো না সেই গৌরবের ঐতিহ্য? ঐহিত্যের উপাদান সম্পর্কে দেবেশ রায়ের ওই রচনার শেষাংশটুকু [জোর বোঝাতে নিম্নরেখ] :

> সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এ বাংলাই নাকি একমাত্র বা প্রধান নদী-বদ্বীপ যেখানে এত মানুষ বাস করে, অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হলো না কত নদীর জল কত রঙের মাটি ভাঙে। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এ বাংলারও নাকি অন্যতম আকাশ যেখান থেকে বছরে এতগুলো মাস এত বৃষ্টি পড়ে, অথচ আমাদের উপন্যাসে সে বিবরণ লেখা হলো না কত না কত রঙের মেঘ কত জল ঝরায়। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এ বাংলার ওপর দিয়েই বয়ে যায় রহস্যময় এক সামুদ্রিক বাতাস যার নাম মৌসুমি বায়ু। অথচ আমাদের উপন্যাসে সে বিবরণ লেখা হলো না। কোন খাত দিয়ে কী বাতাসে আমাদের গাছপালা দোলে। আর, এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল আর এই সমুদ্রকে অন্বিত করে যে-মানুষ সে তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এল না।

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। রচনার শুরুতেই বড় উদ্ধৃতি নিজের বলা কথাকে গুছিয়ে তুলতে না-পারারই ঢাল। কিন্তু নিম্নরেখগুলো সেই ঢালের বাইরে আপসেই ফুঁড়ে বেরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। একটু আগে ব্যবহৃত 'বড়জোর সেই ঐতিহ্য তৈরি হতে পারত এমন কিছু স্মারক তৈরি করেছে।' এই বাক্যটি কোনো ধ্রুব অর্থে নয়, ঢাল তো এখন আর নেই; কিন্তু জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট। এই যে এত নদী, যে-দেশকে শিশু জানতে শেখে নদীমাতৃক! লোককবি এর রূপ দেখে পাগল হয়ে গান : রূপালী নদীরে রূপ দেখে তোর হইয়াছি পাগল! কবি রূপক শেখান : নদীমেখলা, কোমরে পেঁচানো বিছা, নদী সেভাবেই জড়িয়ে আছে এ দেশটিকে। বাংলা তো সেই ভূখণ্ড যা নদী দিয়েই গঠিত। নদীর কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো ভূখণ্ডের পলিবাহী সমাবেশ। উত্তরের পর্বতময় অঞ্চল থেকে নেমে এসে জালের মতন ছড়িয়ে থাকা নদী গুচ্ছে গুচ্ছে একখানে হয়ে সাগরে পড়ছে। এর জনজীবন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে নদীকে কেন্দ্রে রেখে; অথবা উল্টোটা, নদীই স্থির করে দিয়েছে এর জনজীবনের চলন। অথচ বাংলা উপন্যাস নদীর দিকে সেভাবে তাকাল কই? যা তাকিয়েছে তা শুধু স্মারক, ঐতিহ্য নয়?

নামকরণে আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওই পর্যন্তই। এর বাইরে এখনো পর্যন্ত একেবারে নদীকে কেন্দ্রে রেখে, নদীই ওই উপন্যাসে গন্তব্যের নিশানা ও নিয়ন্ত—এমন উপন্যাস বাংলা ভাষায় সত্যি আঙুলে গোনা। ভূখণ্ড ও জনজীবনের দিকে তাকালে এ ভীষণতম বৈপরীত্য। এ যেন এই জনজীবনের প্রধানতম নিয়ন্ত্রতাকে কোনোভাবেই বুঝতে না-পারা, অথবা, এখানে উল্টোটাই—নদী এই জনজীবনের নিশ্বাসেরই প্রতিকল্প, শুধু প্রাত্যহিক অনুভবের চৌহদ্দির এক অনিবার্য অবয়ব, তাকে নিয়ে আলাদা করে গদ্যগীত রচনা নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। নদী নিয়ে আমাদের কোনো মহাকাব্য নেই। নাকি মহাকাব্যের যে প্রকল্প তা কোনোভাবেই অনুভূত হয়নি। এখানে মহাকাব্য শব্দটি রূপক; মহাভারত কি *শাহনামার* মতন কাহিনীকাব্য নয়। কেন্দ্র থেকে পরিধিতে যাত্রার তো ভিন্ন ভিন্ন ধরন থাকে, সেই ধরনেই জীবনের ভাষ্য গঠিত হয়, জনজীবনের অনিবার্য যে চাপ, সে চাপের কেন্দ্র এমনই ঘূর্ণায়মাণ পরিধিতে এক বিস্ফোরণ—সদা নদীকেন্দ্রিক জনজীবনকে অনায়াস গদ্যে ধরা স্বাভাবিক ছিল। বড় বড় নদী, এমনকি ছোট খরস্রোতা নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারত বাংলা গদ্যভাষাকে। হয়তো সেও তো এক অতিদূর কল্পনা। বাংলা উপন্যাসের এই পৌনে দুশো বছরের অভিযাত্রার পরও তা দূর কল্পনাই। এখন যেন মনে হয়, এই সবই 'এমন যদি হত'র মতো করে ভাবতে পারলেই ভালো হতো, কিংবা এ কথাগুলোই আকাশকুসুম! বাংলা কথাসাহিত্যের নদীকল্পনা অতিকথন। তবু নিজের পক্ষে কিছু সহায় তো মানতেই হয়।

'সতত হে নদ, তুমি পড়ো মোর মনে।' প্রবাসী মধুসূদন লেখেন। নদী পাল্টে দিয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা। পদ্মাপর্বে তার চিঠিপত্রে যেভাবে পদ্মা-গৌরী [গরাই]-ঘাগট বা যমুনার আংশিক ধরা পড়ে, তা গদ্যসাহিত্য হিসেবে আজও অবশ্যপাঠ্য, গল্পগুচ্ছ-এও কিছু নিদর্শন তো আছেই। পদ্মার বুকে তার নদীতে কাটানো সম্পর্কে এ কথা জানিয়েছেন, এই নদীময় বাংলাকে না-দেখলে এ দেশটাকে দেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নদীর বুকে বিকালের রোদপড়া প্রকৃতির বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাননি তিনি। রবীন্দ্রনাথ ভাষাহারা, ভাবলেও বিহ্বল হতে হয়। নীরদচন্দ্র চৌধুরী *বাঙালি জীবনে রমণী*তে পূর্ব বাংলার জল-নদী জলমগ্নতার কথাকেও বলেছেন প্রায় একই স্বরে। বাংলার জলকে না-বোঝা গেলে বাংলাদেশকে বোঝা যায় না। শুধু চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙার পুরাণ-কল্পনা তো নদীরই অনুষঙ্গে, সেখানে অন্য কিছু নেই। ভাটিয়ালি গানের সুরের সঙ্গে নদীর স্রোতের সম্পর্ক খুঁজলেই বোঝা যায়। হাওরের কূলে যে এত লোকগান জল-নদীর অনুষঙ্গ। *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর শুরুতে যে ভাষিক কাব্যময়তা : '...কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস', এর পরেই 'স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়।' 'স্বপ্নের ছন্দ'—এ তো নদীর জলে লেখা কবিতা। কিংবা *পদ্মা নদীর মাঝি*তে হোসেন মিয়াও গান বাঁধে কিংবা গান গায়। অন্যত্র ধনঞ্জয় বলে, গীত ক, কুবির। এ সবই নদী থেকে উৎসারিত গান।

নদী হয়তো অজানিতেই যেকোনো কলমকে কাব্যাক্রান্ত করে, নাকি বাংলার নদীর জলের আছে সেই শক্তি। একই সঙ্গে প্রামাণ্য গবেষক যা জানান, তা সাহিত্যিক বক্তব্যের কত কাছাকাছি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। কপিল ভট্টাচার্যের বিখ্যাত *বাংলা দেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা* থেকে :

> বাস্তবিক এ দেশের অধিকাংশ ভূভাগই নদ-নদীর দ্বারাই গঠিত। অর্থাৎ প্রবাহ-বাহিত পলিমাটির স্তরে স্তরে অবক্ষেপণই এই ভূভাগকে সমুদ্র থেকে গেঁথে তুলেছে। উত্তরে হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চল পর্যন্ত নল পুঁতে দেখা গিয়েছে, দু'তিন হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত শুধুই স্তরে স্তরে বালুকা আর নানা শ্রেণীর মৃত্তিকা পর পর সাজানো রয়েছে নিচে আদিম প্রস্তরের ভিত্তির ওপর। এই স্তরীভূত বালি আর মাটিগুলি যে নদ-নদী প্রবাহে বাহিত হয়েই এসেছে আর যুগ যুগ ধরে সমুদ্রগর্ভে জমা হয়ে ক্রমে বাংলা দেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলকে সৃষ্টি করেছে, যা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। সুন্দরবন অঞ্চলে আর তার ক্রোড়ে বঙ্গোপসাগরের গর্ভে আজও সেই গঠনক্রিয়া চলছে। কোনো কোনো নদী ক্রমশঃ মজে আসছে আর নতুন ভূখণ্ড গঠিত হচ্ছে। এমনকি স্তরগুলির বালি ও মৃত্তিকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষা করে বলা শক্ত নয়, কোন নদ অথবা নদী কোথা থেকে এই বালি আর মাটি এখানে এনেছে।

নদীবিজ্ঞান বলছে, এই দেশের ভূভাগ নদীই গঠন করেছে। জনপদও তাই। এমনকি আজও নদীকে হত্যা করে এবং আত্মহত্যায় বাধ্য করে চতুর্দিকে, বলা ভালো, দশদিকে যে উন্নয়ন উদযাপন চলমান, তার পরেও, এখন জনপদ-কল্পনা নদী কিংবা নদীর কোনো ধরনের প্রবাহ ছাড়া প্রায় অসম্ভব। অথবা হতে পারে নদী ও জল প্রবহমানতার এমনি এক অংশ যে এসব ছাড়া আমাদের কোনো জনপদভিত্তিক সমাজ গঠন অসম্ভব হয়ে ওঠে।

কপিল ভট্টাচার্যের এই বই থেকে আর-একটি উদ্ধৃতি। এই অংশের উপ-শিরোনাম 'গঙ্গা-পদ্মাই বাংলা দেশের মেরুদণ্ড'। বাক্যটি আজ বড় গোলমেলে। তা অবশ্য গোলমাল পাকানো অর্থে নয়, স্রেফ মনে হয় একটি নদীই একটা জলমগ্ন ভূখণ্ডের প্রধান ধারা। সেখানকার জনজীবনও তো এই নদী আর এর শাখা-উপশাখারই বিস্তার।

> প্রথমেই বাংলাদেশের নদ-নদীর মানচিত্রখানি একটু ভালো করে দেখতে হবে। বাংলা দেশের মাঝখান দিয়ে উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব-দক্ষিণ এবং ক্রমশঃ দক্ষিণে গঙ্গা বা পদ্মা প্রবাহিত হচ্ছে, আর অন্য প্রায় সমস্ত নদী এই গঙ্গা বা পদ্মার হয় উপনদী অথবা শাখা নদী। (পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা ও পূর্ববঙ্গের কর্ণফুলী নদী স্বাধীনভাবে সমুদ্রে প্রবেশ করেছে)। পশ্চিমবঙ্গের ছোট নাগপুর উপত্যকার উৎস থেকে উৎপন্ন নদ-নদীগুলি গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলী নদীতে এসে মিশেছে। এই রূপে, মোটের মাথায়, প্রধানত গঙ্গা নদীকেই অবলম্বন করে বাংলার সমস্ত নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

নদীবিজ্ঞানীর চোখও এখানে কখনো কখনো প্রায় কবির, অথবা উল্টোটা, কবির শিল্পকল্পনায় নদী যেভাবে জড়িয়ে থাকে এ যেন তারই এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। 'পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয়'-এর সঙ্গে এই প্রতিবেদনের প্রায় কোনো তফাত নেই, কিংবা 'রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বায়ে', কিংবা, ধানসিড়িটির তীরে আবার ফিরে আসার স্বপ্নসাধকে এক বিপরীত বাস্তবে দেখে নেয়া যায়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব, কবির কল্পনার সাধ কিংবা গদ্যলেখকের বাক্যে প্রায় কাব্য পঙক্তির আভা—সবটার পাশ কাটিয়ে যে-কথা তুলতে চাই, যে কথা তুলবার জন্যে এতখানি কথা প্রায় ভূমিকার মতন করে বলা হলো, তবু যেন মূল বিষয়ে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে এতক্ষণ ধরে প্রায় প্রবেশ-অধিকারহীন কি এই জন্যে, যে-কথা তোলার ইচ্ছা সেখানে শেষ পর্যন্ত হালে বেশি পানি পাওয়া যাবে না। সামনে থেকে একজন সুকানির দিকে তাকিয়ে চিৎকার শুরু করে বলবে, বাঁও মেলে না, বাঁও মেলে না। কোনো তল খুঁজে পাব না। যদিও জানি, বাঁও মেলে নাই তো যাত্রা অব্যাহত রাখারই সংকেত! ফলে নদীর বুকে শোনা ওই ধ্বনি দিয়ে এক মুক্তবেণীর উজানে যাত্রার সুযোগ নেয়া যাক।

২.

আচ্ছা, নদীকে কেন্দ্রে রেখে কিংবা নদীর পটভূমিকায় বাংলা ভাষায় রচিত প্রধান উপন্যাস কয়টি? একটির নাম এখন না-করলেও প্রধান উপন্যাস কোনোভাবে দশটি নয়। প্রধান-অপ্রধান, গৌনপ্রচেষ্টা ও ছুঁয়ে-যাওয়া মিলিয়ে কুড়িখানা হবে না। নদ-নদীর নামে শিরোনামকরণ ধরলে মোটামুটি কুড়িখানা হতে পারে। কিন্তু এতক্ষণ, এই রচনার শুরু থেকে, বাংলার, বাংলা দেশের কিংবা বাংলাদেশের জনজীবনে নদীর প্রভাবক ভূমিকা, নর-নারীর জীবনের গন্তব্যে প্রবহমানতায় যে ভূমিকা সব একজায়গা ভাবলে, শুধু নামকরণই হতে পারত শ-খানেক অথবা তারও বেশি। প্রধান উপন্যাস কেন দশটিরও কম? আর সেগুলো দেবেশ রায়ের ওই কথার মতো, ঐতিহ্য হতে পারত এমন স্মারক; (কিন্তু), ঐতিহ্য হয়ে ওঠেনি। অত জোর গলায় বলার মতো গলার স্বর আমার নেই। তাই তোলার চেষ্টা করে করেও যে-কথা তোলা যাচ্ছে না, যদি তা বলা যায়, সেই উপন্যাস যা এই জনপদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কল্পনা আর কবিতার আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে মহাজীবনের গান হয়ে উঠবে—সেই উপন্যাস বাংলা ভাষায় লিখিত হয়নি নদী নিয়ে। ওই উপন্যাসের কাহিনীর নিয়ন্ত্রক নদী, কিন্তু ওটি নদীর সে আখ্যান নয়, যা এই জনপদের জীবনের কারণে স্বতঃউৎসারিত হতো, তা হয়নি কি এই জন্যে যে এই শিল্পটা ইংরেজদের হাত থেকে পাওয়া? রুশ-ফরাসি বা স্প্যানিশদের কাছ থেকে পেলে এর রূপ ভিন্ন হতো? হতে পারে, এর কারণ কি এই—এই জনজীবনকে যাপন করার ভাষার সঙ্গে নদীর নিজস্ব ভাষা মিলেমিশে একাকার হলো না? যা মঙ্গলকাব্যে আর কবিতায় হয়েছে, বৈষ্ণব পদাবলিতে বর্ষার বৃষ্টির স্বর মিলেমিশে একাকার হয়েছে। তাই শিরোনামের *কর্ণফুলী*, *পদ্মার পলিদ্বীপ* কিংবা *পদ্মা মেঘনা যমুনা*, ইছামতী নদীর নামে উপন্যাস, কিন্তু নদীকে নিয়ে নয়; আর, *পদ্মা নদীর মাঝি*, *তিতাস একটি নদীর নাম* কিংবা *গঙ্গা নদীর* নামধারী উপন্যাস, নদীকে কেন্দ্রে রেখে এই গুরুত্বপূর্ণতম উপন্যাস তিনটির কাহিনী; তার পরেও নদী বিস্তারের সেই মহাকাব্যিক আখ্যান নয়; ফলে তা ঐতিহ্য হয়ে ওঠার মতন, কিন্তু সেই ঐতিহ্যের চিরকালীন স্মারক নয়।

কিন্তু এ কথা তো আজ প্রমাণেরও দুঃসাধ্য, যদি *পদ্মা নদীর মাঝি* সম্পর্কে বলাই হয় তা স্মারক হয়ে ওঠেনি। শিল্পমাত্রই প্রমাণের বাইরে, যেকোনো শিল্পের ক্ষেত্রে প্রমাণের কোনো তোয়াক্কা করতে হয় না। কিন্তু জনজীবনের স্মারক যে হয়ে ওঠেনি, সেটি প্রমাণের কী হবে? না, তাও অপ্রয়োজনীয়। সে কথা প্রত্যাশা। বাংলার মতো এক নদীবহুল জলমগ্ন জনপদের আখ্যান কেন হলো না জীবনের এপিক, কেন হলো না গদ্যের গাথা, সে লেখার বিভিন্ন ছত্র মধ্যবিত্ত জনজীবনের বাইরেও হয়ে উঠত প্রবাদ বা প্রবচন কিংবা ধাঁধার এক ভিন্ন রূপান্তর। এপিক বা মহাকাব্যগুলো তো তাই। শোনা যায়, জগৎশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর কোনো কোনোটি ওই নির্দিষ্ট ভাষার ক্ষেত্রে তাই। তার কোনো চরিত্র লোকপুরাণে পরিণত হয়েছে, কোনো বাক্যও নাকি তাই। সেই অপ্রাপ্তি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নদী নিয়ে লেখা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তোলার মতো গদ্যচর্চার কালও তো আমাদের ভাষা অতিক্রম করে এসেছে।

তবু যেটুকু যা হয়েছে তা একদিক থেকে *পদ্মা নদীর মাঝিই*। বলা প্রয়োজন, এ দিয়ে কোনো উপন্যাসের সাফল্য বা ব্যর্থতা কিংবা শিল্পগুণের বিচারের দাবি নিয়ে এ কথা তোলা হচ্ছে না। কী নিয়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তোলা হচ্ছে, সে কথা এতক্ষণ খেদে আর ওই খেদকে সামান্য মান্যতা দিতে একাধিকবার বলা হয়েছে।

পদ্মা নদীর মাঝির সংলাপ : 'হালা ডাকাইত'; কিংবা, সামাজিক স্তরবিন্যাস বোঝাতে : 'ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে'; কিংবা উপন্যাসের মাঝখানে ও শেষ দুবার একই সংলাপ : 'আমারে নিবা মাঝি লগে?' তো প্রবাদপ্রতিম। অথবা হোসেন মিয়ার মতন রহস্যময় চরিত্র যেন হালের মুম্বাইয়ের হিন্দি চলচ্চিত্রে পেছনে কলকাঠি নাড়া ভিলেন অথচ সামনে সদাসয় অতি ভালো মানুষ, তার গলায় বাউলাঙ্গের গানও ধ্বনিত হয়।

অথচ এই নদীর একাধিক নামের একটি কীর্তিনাশা, সে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নয়, চরিত্র যে তাকে হতেই হবে তাও নয়, কিন্তু কোনোভাবেই কাহিনীর প্রধান বাহক নয়। বরং পদ্মা তীরবর্তী মাঝিদের জীবনকে যাপন করার প্রধান উপাদান। এই নদী কুবের-কপিলার শেষ যাত্রার দিশা, যদিও সে যাত্রা নদীর বহতার কারণে। অফিমের কারবারি হোসেন মিয়ার কাছেও এই নদী জীবিকার যাত্রাপথ। কুবের ও কপিলার অন্তর্গত প্রেমকাহিনীর সঙ্গে যদি এই নদী, নদীতীরবর্তী লোকজীবন, এপাড় ওপাড়ের চর ও চরের অধিবাসীদের দীর্ঘকালীন যাপনের অভ্যাস, মুদ্রা আর লোকপুরাণ একাকার হয়ে যেত তাহলে প্রায় দুষ্টু বালকের যেমন মনে হয়, *পদ্মা নদীর মাঝিতে* কুবের-কপিলা যত কাছে আসে, নদী তত দূরে সরে যায়।—এই ফোঁড়ন মিছে হতো।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন প্রধানতম গদ্যলেখক এই-ই লিখতে চেয়েছেন। সমস্ত কুতর্কের বাইরে গিয়ে এটি বাংলা ভাষার সেরা উপন্যাসের একটি। বিভূতিভূষণের *ইছামতী*, তারাশঙ্করের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, ওয়ালীউল্লাহর *কাঁদো নদী কাঁদো* উল্লেখযোগ্যতম উপন্যাস, কিন্তু সেখানে ওই নদীগুলো জীবনপুরাণ হয়ে ওঠেনি, এমনকি এই তিনটি নদী নিয়ে লেখা উপন্যাসও নয়। সেদিক থেকে *পদ্মা নদীর মাঝি* একক। এই এককতাও মানিকের শিল্পসিদ্ধির অংশ, পদ্মাপুরাণ হয়ে না-ওঠার জন্য নয়! যেকোনো সাহিত্যিক গড়নের যে মানসিক আকার থাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেভাবে ভাবেনইনি। হোসেন মিয়া-নির্দিষ্ট পথে কুবের-কপিলাকে ময়না দ্বীপে নিয়ে যাওয়ার কাহিনীতে পদ্মা নদী তার কলমে এমন জায়গাও তো ঠিকই দখল করে নিয়েছে :

> পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহার সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। এ জলের দেশ। বর্ষাকালে চারিদিক জলে জলময় হইয়া যায়। প্রত্যেক বছর কয়েকটা দিনের জন্য এই সময়ে মানুষের বাড়িঘর আর উঁচু জমিগুলি ছাড়া সারাটা দেশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল যেবার বেশি হয় মানুষের বাড়ির উঠানও সেবার রেহাই পায় না। পথঘাটের চিহ্ন থাকে না। একই গ্রামে এ পাড়া হইতে ও পাড়ায় যাইতে প্রয়োজন হয় নৌকার। কয়েকদিন পরে জল কমিয়া যায়, জলের ভিতর হইতে পথগুলি স্থানে স্থানে উঁকি দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আরো এক মাসের মধ্যে পথগুলি ব্যবহার করা চলে না। যানবাহন এদেশে এক রকম নাই। মানুষের সম্বল নৌকা। উঠিতে বসিতে সকলের নৌকার দরকার হয়।
>
> নৌকার প্রয়োজন কমে সেই শীতের শেষে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে। খালে তখন জল থাকে না, মাঠে জলের বদলে থাকে ফসল অথবা ফসল-কাটা রিক্ততা। মানুষ মাঠের আলে আলে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়।
>
> নৌকা চলে পদ্মায়। পদ্মা তো কখনো শুকায় না। কবে এ নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কে জানে। সমুদ্রগামী জলপ্রবাহের আজও মুহূর্তের বিরাম নাই। গতিশীল জলতলে পদ্মার মাটির বুক কেহ কোনোদিন দেখে নাই, চিরকাল গোপন হইয়া আছে।

গোটা উপন্যাসে এমন বর্ণনা কমই আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন শব্দনিয়ন্ত্রক লেখকের জন্যে দীর্ঘ বর্ণনা দেয়া তার চরিত্রের সঙ্গে যায়ও না। আর এই কাহিনীর গন্তব্যও যে এই নদীকে কেন্দ্রে রাখা, তাও নয়। তাহলে ঋতু অনুযায়ী জীবনযাপন, মানুষে মানুষে সম্পর্ক আর নদীর সঙ্গে সংযোগের বর্ণনা থাকত, কাহিনীর গতিও হতো তাই। সেখানে পীতম মাঝি, রাসু, সোনার ঘড়া, গোপী—এত তাড়াতাড়ি এসে পড়ত না। কপিলার নিজের জীবনের দোলাচলতাও হয়তো আর-একটি আখ্যান হতো। আর কীর্তিনাশা পদ্মার সঙ্গে ঝুজবার গল্প প্রতি মুহূর্তে নদীকে একটি চরিত্রের মতনই সঙ্গে বহমান মনে হতো। বরং বড় রহস্যময় মানুষ হোসেন মিয়া যে রহস্য নিয়ে হাজির তা অনেকটাই এমন মিতায়ন কাহিনীতে বেশ জায়গাজুড়ে, যদিও ওই রহস্যের আবরণে সে ঢাকাই থাকে। এমনকি এই গানটিও :

> 'আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও/ বোনধু কত ঘুমাইবা।
> বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাল ফসল রোও/ মিয়া, কত ঘুমাইবা।
> [...]
> তোমার লাইগা হাওর দিয়া বাইয়া চেরাগ নাও/ দিল-জাগানি আলেন যিনি, মিয়া,
> চিরা-মেঘের বাদাম তুইলা বন্ধু কনে যাও?/ জিগায় তারে খাঁচার চিড়িয়া।
> নিদ্ ভাঙে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
> পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির—/ মাঝি কত ঘুমাইবা

এই গান শুনে
কুবের অভিভূত হইয়া বলিল, মুখে মুখে বানাইলেন মিয়া বাই?
হোসেন মিয়া জানায় :
খুশ হলি না পারি কী?

এই লোকগান আমাদের লোকগানে রূপান্তরিত হয়নি, কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে হয়, এটি পদ্মাপারে প্রচলিত গান, নাকি মানিকের রচনা?—সে যাই হোক, এ গান এই কাহিনীতে এমনভাবে প্রবিষ্ট সে কথা ভাবাই চলে না।

আর-একটি জায়গায়, সেই আমিনবাড়ি, যেখানে গোপীর ভাঙা পায়ের চিকিৎসার জন্যে তাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়ে কুবের-কপিলা রাতে নদীর কূলে একটি হোটেলে ছিল। পরদিন সকালে :

> মৃদু মধুর শীত পড়িয়াছে। কুবেরের চাদরখানা পরিয়া কপিলা প্রথমে নদীতে ডুব দিয়া আসিল, তারপর স্নান করিতে গেল কুবের। কুবের ফিরিয়া আসা পর্যন্ত কপিলা ঘেরা স্থানটুকুর মধ্যে লুকাইয়া রহিল। পুরুষের দৃষ্টিপাতে আজ বড় লজ্জা করিতেছে কপিলার, দিনের আলোয় আজ তার মনে হইতেছে জগৎসুদ্ধ সকলেই বুঝি জানে যার পাশে শুইয়া সে রাত কাটাইয়াছে সে তাহার স্বামী নয়।

এই আমিনবাড়িতেই একদিন মানুষভর্তি নৌকা নিয়ে গেলে, রাতে হোটেল থাকার সময়ে কুবের খেয়াল করে গণেশ নেই। 'আজীবন যে বোকা লোকটা [গণেশ] তাহার [কুবের] তোষামোদ করিয়া আসিয়াছে, সঙ্গদোষে একদিন সে এমনভাবে বিগড়াইয়া গেল।' ফলে, পরদিন গণেশের সঙ্গে কুবের কথা বলে না। রেগে বলে, 'কুচরিত্তির হইচস, আঁই?' তার আগে লজ্জিত ক্ষমাপ্রার্থী গণেশ তাকে ফিসফিস করে জানিয়েছে, 'বাক্যা মাইয়া কুবিরদা, কিবা গীত কয়!' এরপর সেই গান :

> পিরিত কইরা জুইলা মলাম সই, আ লো সই!
> আগুন ফাগুন সমান সোনার, জউলা ঢুকা দই!
> আ লো সই।
> থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
> বিদেশ গেলি মনের পোড়েন ভাইজা করে খই!
> আ লো সই!

বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত আধুনিকতার বহরে বদর-বদর বলে পালে হাওয়া লাগিয়ে ততদিনে, *পদ্মা নদীর মাঝি* রচিত হওয়ার কাল পর্যন্ত, কত নৌকা পদ্মায়-গঙ্গা-মেঘনায় প্রবাহিত। কিন্তু ওই 'আধুনিকতা'র সঙ্গে লোকজীবনের সমন্বয়ের এমন উদাহরণ ততদিন পর্যন্ত এক বিভূতিভূষণকে বাদ দিলে প্রায় নেই। তবু *পদ্মা নদীর মাঝি* নদীজীবনের সেই আখ্যান হয়নি, যতটা কুবের-কপিলা আর হোসেন মিয়ার এক ত্রিমুখী সম্পর্কের গল্প আর যার গন্তব্য ময়না দ্বীপ!

লেখাটার এইখানে এসে আবারো জানানো প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে, এই লেখা কোনোভাবে বাংলা গদ্যকাহিনীর সেরা লেখাগুলোর সমালোচনা নয়, শুধু এক অনুসন্ধান। কেন নদী এই জনজীবনের প্রতিকল্পের বিপরীতে বাংলা উপন্যাসে সেই অভিযাত্রায় সেভাবে শামিল হলো না? *তিতাস একটি নদীর নাম* সেদিক থেকে ব্যতিক্রম।

শোনা যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *ইছামতী*র পরিকল্পনা করেছিলেন অনেকটা মিখাইল শলোখভের *তিকি* [থির বা প্রশান্ত] *দন*-এর আদলে, চার খণ্ডে। শোনা অথবা হাওয়ায় ওড়া কথায় তো কোনো সূত্র থাকে না, বিভূতিভূষণের বিখ্যাত দিনপঞ্জিগুলোতে এর কোনো উল্লেখ আছে কি না, তাও জানা নেই। সেই 'পরিকল্পনা' কাজে রূপান্তরিত হলে তা নদীর আখ্যান হতো কি না সেটিও ভিন্ন কথা। কিন্তু *ইছামতী—পদ্মা নদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম* কিংবা *গঙ্গার* মতো নদীকে কেন্দ্রে রেখে লেখা নয়। একটি ব্যক্তিক পরিকল্পনা সঙ্গে অন্য-একটি ব্যক্তিক পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে, কিন্তু প্রতিতুলনা একেবারেই অর্থহীন।

তিতাস একটি নদীর নাম সে তুলনায় একেবারেই নিজস্ব পরিকল্পনা, এর গদ্যভাষা তার বড় প্রমাণ। ওদিকে যদি অদ্বৈত মল্লবর্মণের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি সত্যিও হয়, 'মানিকবাবু মাস্টার আর্টিস্ট, কিন্তু বাওনের পোলা জাইল্যার কী জানে, মালোজীবন নিয়ে উপন্যাস লিখব আমি।' এর ভেতরে ওই জনজীবনের প্রতি তার স্বাভাবিক সম্পৃক্ততার কথাই বলেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিন্তু এই কথা বলেননি, তিনি জেলে-নিকারি-মালো কিংবা কৈবর্তজীবন নিয়ে উপন্যাস লিখলেই তা ওই 'মাস্টার আর্টিস্টে'র চেয়ে ভালো হবে কি মন্দ হবে। আবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাস্টার আর্টিস্ট কইতেও তার আটকায়নি; অর্থাৎ *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাস হিসাবে কোন গোত্রের অদ্বৈতর মতন সর্বভুক পাঠকের তা জানা থাকার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু উক্তিটি অদ্বৈত মল্লবর্মণ করেছেন ঠিক আর সেই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সেই উক্তির শক্তিটি যে অন্যখানে তা এই দুই উপন্যাসের ভেতরেই নিহিত। নিজস্ব উক্তির নিহিত শক্তির স্বভাবটি তিনি ধরতে পেরেছেন *পদ্মা নদীর মাঝির* গঠনের ভেতরেই। *পদ্মা নদীর মাঝি* পদ্মাতীরবর্তী জেলেজীবনের গল্প, পদ্মা নদীর গল্প নয়। নদী এই উপন্যাসের সেই চরিত্র নয়, এমনকি এর তীরবর্তী জনপদও তা নয়, যা কুবের-কপিলা-হোসেন মিয়াকে কখনো কখনো পাশে রেখে কিংবা পেছনে ফেলে নিজেই কাহিনীর একক নিয়ন্তা হয়ে যায়। যেমন নামকরণের দিক থেকে *তিস্তা পারের বৃত্তান্ত*-এও নদীর নাম ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তিস্তা এবং এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বাঘারু কিংবা মাদারির মাকে পাশে রেখে তিস্তার পার উপন্যাসের সংগঠনের প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে ঔপন্যাসিকের আপন ইচ্ছায় আর শক্তিতে; অথবা ওই কাহিনী শেষ পর্যন্ত তাই, তা বাঘারুচরিতমানস যেমন হয়নি, হয়নি তিস্তাপুরাণও, বরং তিস্তার দুই কূলের বন ও বনান্ত-জুড়ে মানুষের একরোখা জীবন।

এখানে বলার চেষ্টাটা অন্তত সে রকম। এমনকি নামকরণ নিয়েও। একটি : *পদ্মা নদীর মাঝি*; অন্যটি : *তিতাস একটি নদীর নাম*। নদীরই সে আখ্যান, একক ও অদ্বিতীয় সে তিতাস। সেখানে কিশোর-কিশোরের বউ ও ডাকাতি আছে, আছে অনন্তের প্রবাহিত জীবন আর বাসন্তী। কিন্তু তাদের সবার সব কূল ছপিয়ে সে কাহিনী তিতাসের।

সেদিক থেকে ওই যে এপিকের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে, নদীর মহাকাব্য, নদীর সেই গাথার চরিত্র *তিতাস একটি নদীর নাম*। আজ আর জানা যাবে না, সে সুযোগও নেই, পত্রিকা অফিসে নিয়ে যাওয়ার পথে যে পাণ্ডুলিপি খোয়া গিয়েছিল, কিংবা খসড়া থেকে রূপান্তরের পরও প্রায় অসমাপ্ত রেখে, কিংবা শুধু খসড়ায় সমাপ্ত করে যে বই আমাদের জন্যে অদ্বৈত রেখে যান—এর ব্যতিক্রম হলে কী ঘটত। তবে মিখাইল শলোখভের *প্রশান্ত দনের* যে উদাহরণ বিভূতিভূষণের *ইছামতীর* প্রকল্প পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আনা হয়েছে, সে আকাঙ্ক্ষা কোনোমতেই *তিতাস একটি নদীর নাম*-এ প্রকাশিত হয়নি। হতে হবে সে দিব্যিও ঔপন্যাসিককে কেউ দেয়নি। অদ্বৈতর মতন মানুষ সেভাবে নাও ভাবতে পারেন আর *দন*-তীরবর্তী জনগোষ্ঠী যে যুদ্ধ ও অস্তিত্বের লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে জীবনের চলমানতা ওই কাহিনীতে বর্তমান, তিতাসের কাহিনী তার উল্টো। ফলে কথার পিঠে কথা আসছে বটে, কিন্তু এসবই এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

*তিতাস একটি নদীর নাম*ই বাংলা ভাষার একমাত্র উপন্যাস যা নদীরই পুরাণ। স্মারকমাত্র হলেও তবু এটিই স্মারক থেকে ঐতিহ্যমুখী!

কিছু উদাহরণ। একেবারেই হাতে উঠে আসা থেকে :

১। তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়ে নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।

২। অনেক নদী আছে বর্ষায় অকুণ্ঠ প্লাবনে ডুবিয়া তারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পারের কোনো হদিস থাকে না, সবদিক একাকার। কেউ তখন বলিতে পারে না এখানে একটা নদী ছিল। সুদিনে আবার তাদের ওপর বাঁশের সাঁকোর বাঁধ পড়ে। ছেলে মেয়ে বুড়োবুড়িরা পর্যন্ত একখানা বাঁশে হাত রাখিয়া আর বাঁশে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইয়া যায়। ছেলে-কোলে নারীরাও যাইতে পারে। নৌকাগুলি অচল হয়। মাঝিরা কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলি টানিয়া নেয়। এপারে ওপারে ক্ষেত। [...] নারীরা কোমরজলে গা ডুবাইবার চেষ্টায় উবু হইয়া দুই হাতে ঢেউ তুলিয়া নীচু-করা ঘাড়ে-পিঠে জল দিয়া স্নানের কাজ শেষ করে। শিশুদের ডুবিবার ভয় নাই বলিয়া মায়েরা তাহাদের জলে ছাড়িয়া দিয়াও নিরুদ্বেগে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, আর এক পয়সা দামের কার্বলিক সাবানে পা ঘষে। অল্প দূরে ঘর। পুরুষ মানুষে ডাক দিলে এখান হইতে শোনা যাইবে; তাই ব্যস্ততা নাই।

৩। এক সময়ে ধাঁ করিয়া সূর্য উঠিল। নদীর ওপর রোদ বিছাইয়া দিল। তাপের আভাস পাইয়া মাছ একাযোগে অথই জলে ডুবিয়া গেল। এখন আর তারা জালে ধরা দিবে না। একবার কিশোর জালটা ধপাস করিয়া ফেলিল। এই রকম ফেলার অর্থ—আজ এই পর্যন্তই। তিলক কোরা গুটাইয়া আগাইয়া আসিল। তারপর দুইজনে মিলিয়া দড়াদড়ির বাঁধা-ছাদা খুলিয়া ফেলিল।

মোড়ল আগেই ঘাটে বসিয়াছিল। প্রথম দিনের মাছ দেখিয়া খুশি হইল। বলিল, 'ছোট জল্লা, তোমার খুব সাইৎ। চল, মাছ ডাঙ্গিত লইয়া যাই।'

সাঁ সাঁ করিয়া বসন্তের বাতাস বহিয়া যায়, স্বচ্ছ জলের ওপর ঢেউ তুলিয়া। কিশোর ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হইয়া যায়। নদীর তাতা থৈ থৈ নাচনের সঙ্গে তার বুকখানাও নাচিয়া ওঠে। আকাশের রোদ বাড়ে। সে রোদ যেন নৌকার ওপর, তিলকের সুবলের মাথার ওপর, আর কিশোরের বুকের ওপর সোনা হইয়া ঝাড়িয়া পড়ে। কোন অদৃশ্য শিল্পী এক না-দেখা মোহর তুলি বুলাইয়া তার মনের মাঝখানের অদৃশ্য আনন্দের এক একটা ছোপ লাগাইয়া যায়; থাকিয়া থাকিয়া তার মনে সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম চিন্তার আবির্ভাব হয়। শুকদেবপুর পল্লীটা কখনো সুবলকে লইয়া একপাক ঘুরিয়া আসে। [...] কি ফুল চিনিতে না পারিয়া কিশোর দাঁড়াইল। সামনা দিয়া এক কুমারী কন্যা যাইতেছে। একগোছা সূতা হাতে করিয়া। কিশোর চলমান সুবলকে হাত ধরিয়া থামাইয়া বলিল, 'দাঁড়া, ফুলেরে আগে দেইখ্যা লই। বড় রঙ্গিলা ফুল। এই মাইয়ারে জিগা, ইটা কি ফুল কইয়া যাক।' [...] মেয়েটি লজ্জায় উচ্ছলিত হইয়া বলিল, 'মুগরাচণ্ডী! এর নাম মুগরাচণ্ডী ফুল।' বলিয়া কিশোরের চোখের দিকে চাহিল। কিন্তু চোখ আর নামাইতে পারিল না। সর্পমুগ্ধের মতো চাহিয়া থাকিয়াই পরনের বসন-আঁচলে বুকের শিশু স্তন দুটিকে ঢাকিয়া দিল। তারপর ভয় পাওয়া হরিণীর মতো বড় বড় পা ফেলিয়া একটির ঘরের আড়ালে চলিয়া গেল।

সুবল কিছু টের পাইয়া বলিল, 'যা কও দাদা, তোমার বাসন্তীর মতো একটা মাইয়াও কিন্তু শুকদেবপুরে দেখলাম না।'

'আমার বাসন্তী? তুই কি কইলি সুবলা?'

'তোমার সঙ্গে বিয়া হইব। তোমার বাসন্তী কমু না, তবে কি আমার বাসন্তী কমু?'

কিশোর হাসিল : 'নারে সুবলা, না, ঠিসারার কথা না! বাসন্তীরে আমার, তোর লগেই সাতপাক ঘুরাইয়া দেমু।'

'মনরে ঠার' কেনে কিশোর দাদা? বাসন্তী যে তোমার হাঁড়িতে চাউল দিয়া রাখছে—তুমি ত কম জান না।' [...]

> সেই সিগ্ধ নীলাভ ফাল্গুনী প্রভাত আসে। জাল লাগাইয়া মৃদু নৃত্যপরা তটিনীর বুকের গহনে গুঁজিয়া দেয় সেই জাল। তুলিয়া দেখে মাছ। রূপার মতো সাদা, ছোট ছোট প্রাণচঞ্চল অজস্র মাছ। এক একটা মাছ এক একটা প্রাণ। নৌকার ডরাতে জলের ওপর ভাসিতে ভাসিতে কেমন খেলা করে। দুই মিনিটেই যাদের মৃত্যু, তারা মরণকে অবহেলা করিয়া এমন শান্তিচিত্তে ভাসে কি করিয়া। কিন্তু বড় ভালো লাগে দেখিতে। দ্রুত তালে জাল তোলা-ফেলার মাঝে কিশোর আত্মহারা হইয়া যায়। তার মনের সব রকম অস্বস্তি কোথায় আত্মগোপন করে।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ। এতটাই দীর্ঘ তা যেন এখানে বলা কথার চেয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের অসাধারণ গদ্যের কাছে নিয়ে গিয়ে থামকে দাঁড় করায়! তা কি শুধু পাঠকের, অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃতি হিসেবে টুকে নেয়ার সময়েও তো সেই ভালো লাগার টান এমন করে গেঁথে থাকে যে টোকার

ঝোঁকাটাকেও যেন কোনোভাবে সামলানো যায় না। কেননা সেখানে, অন্তত তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে, এই উপন্যাসের চারটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, তাদের অন্তরের কথাও জানা হয়ে গিয়েছে। কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এদের কী পরিণতি হবে তা জানা আছে আমাদের। শুধু এখানে নেই অনন্ত। তিতাসের হয়ে যে এই কাহিনীর এক কল্পিত কথক, তিনিই তো কারো কারো কাছে অদ্বৈত। 'অ'-এ, 'অ'-এ ছদ্ম হোক আর প্রকাশ্য মিল রেখে দিয়েছেন মালোর বেটা মল্লবর্মণ। কিন্তু যে কথা প্রায় সূত্র মুখে তোলা হয়েছিল সেদিক থেকে, এই আখ্যান-গদ্যের সঙ্গে জনজীবন কী তীব্রভাবে জড়িয়ে আছে। তিতাস এখানে এই কাহিনীর একেবারেই অংশ, যাকে বলবার চেষ্টা করা হয়েছিল নদী-এপিক! যে গদ্য ওই স্মারকের বাইরে ঐতিহ্য! কয়েকটি বাক্য : 'নদীর ওপর রোদ বিছাইয়া দিল', 'নদীর তাতা থৈ থৈ নাচনের সঙ্গে তার বুকখানাও নাচিয়া ওঠে', 'কিশোরের হৃদয়ের পরদার মতো মসৃণ'; 'সর্পমুগ্ধের মতো চাহিয়া থাকিয়া'; কিংবা 'বাসন্তী যে তোমার হাঁড়িতে চাউল দিয়া রাখছে—তুমি ত কম জানো না।'

এই উৎসারিত জনজীবন ভাষা, প্রবাদ ও প্রবচন, তা কিন্তু ওই নদী তীরবর্তী জনসংস্কৃতিতেই মূলত বহমান, অন্যত্র এ জিনিস অচল। নদীকে আখ্যানের কেন্দ্রে রাখলে এই ভাষার বাইরে যাবার উপায় কই?

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

৪। স্ফটিকস্বচ্ছ জলের দিকে অনন্ত একবার মুখ বাড়াইয়া দেখিল। জলে তার ছোট মুখের ছায়া পড়িয়াছে। তারই ভিতর দিয়া দেখা যায় জলের স্বচ্ছতা ভেদ করিয়া জাগিয়া আছে বালিময় তলদেশ। দুই একটি শামুক হাঁটিয়াছে, তার রেখা বালির বুকে আঁচড় কাটিয়াছে। ছোট ছোট বেলেমাছ সে বালিতে বুক লাগাইয়া চুপ করিয়া আছে, যেন হাত বাড়াইলেই ধরা যাবে।

৫। তিতাস নদী এখানে ধনুর মতো বাঁকিয়াছে।

তার নানা ঋতুতে নানা রঙ নানা রূপ। এখন বর্ষাকাল। এখন রামধনুর রূপ। দুই তীরে সবুজ পল্লী। মাঝখানে সাদা জল। উপরের ঘোলাটে আকাশ হইতে ধারাসারে বর্ষণ হইতে থাকে। ক্ষেতের গৈরিক মাটিমাখা জল শতধারে সহস্রধারে বহিয়া আসে। তিতাসের জলে মিশে। সব কিছু মিলিয়া সৃষ্টি করে একটা মায়ালোকের। একটা আবেশমধুর মরমী রামধনুলোকের।

৬। বনমালী পাছায় থাকিয়া প্রচণ্ড শক্তিতে হাল চালাইতেছে। তার দাপটে হালের বাঁধন-দড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, আর সারা না' খানা একটানা হেলিয়া দুলিয়া কাঁপিয়া চলিয়াছে। সেই দোলায়মান নৌকার বাঁশের পাতনির ওপর দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া অনন্ত ছইয়ের ভিতরে আসিল। উদয়তারাকে দেখা যাইতেছে না। আন্দাজ করিয়া তার কাছে গিয়া বসিল। [...] মশার কামড়ে আর নৌকার দোলানিতে একবার তার ঘুম খুব পাতলা হইয়া আসিল। মাথাটা যে নরম আর চাঁদের মতো শীতল। আর রাশিরাশি ফুলঝুরি নামাইয়া-রাখা একপাট আকাশে বুঝি অনন্তর গায়ের ওপর চাপাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ঐ যে আকাশের ওপর দিয়া এদিক হইতে ওদিক চলিয়া গিয়াছে কি একটা উজ্জ্বল সাঁকো—কিছু দিন আগের দেখা সেই রামধনুটারই যেন ছিলা এটা। সাতরঙা ধনুটি গা-ঢাকা দিয়া আছে আর তার ছিলাটি অনন্তর জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

৭। উদয়তারা একদলা কাই হাতের তালুতে দলিতে দলিতে বলিল, 'হিজল গাছে বিজল ধরে সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে—কও, এই কথার মান্তি কি?'

'এই কথার মান্তি হাট।' বলিল আসমানতারা।

'আচ্ছা—পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকমিক করে, ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে?'

বড় বোন মানে বলিয়া দিল—'কুয়াশা।' [...]

তিন বোন তখনো অক্লান্তভাবে হেঁয়ালি বলিতেছে আর হাত চা চালাইতেছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মুদিয়া অনন্ত তখনো কানে শুনিতেছে—'আদা চাক্ চাক্ দুধের বর্ণ, এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম।'

এর মান্তি—টাকা, বলিয়া এক বোন পাল্টা তীর ছাড়ে— [...]

৮। বড় বড় নদীতে এক তীর ভাঙে, অপর তীরে চর পড়ে। ইহাই ধর্ম। কিন্তু তিতাসের ধর্ম তাহা নয়। এ নদীর কোন তীরই ভাঙে না। কাজেই তার বুকে যখন চর পড়িল, সে চর দিনে দিনে জাগিতে থাকে আয়তনে বাড়িয়া, চৌড়া বুক চিতাইয়া।

বর্ষাকালে জল বাড়িয়া তিতাস কানায় কানায় পূর্ণ হইল। বর্ষা অন্তে সে জল সরিয়া যাওয়াতে সেই চর ভাসিয়া বুক চিতাইয়া দিল। কোথায় গেল এত জল, কোথায় গেল তার মাছ। তিতাসের কেবল দুই তীরের কাছে দুটি খালের মতো সরু জলরেখা প্রবাহিত রহিল, তিতাস যে এককালে একটা জলে ভরা নদী ছিল তারই সাক্ষী হিসাবে। [...]

এখনো জোয়ার আসে। চরটা তখন ডুবিয়া যায়। সারা তিতাস এখন জলে জলময়। নদীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মালোরা ভাবিতে চেষ্টা করে : এই তো জলে-ভরা নদী। ইহাই সত্য। একটু আগে যাহা দেখা গিয়াছিল ওটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু ভাঁটা আসিলেই সত্যটা নগ্ন হইয়া ওঠে। মালোদের এক একটা বুকজোড়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হয়। তিতাস যেন একটা শত্রু। নির্মম নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে শত্রু। আজ সম্পূর্ণ অনাত্মীয় হইয়া গিয়াছে। এতদিন সোহাগে আহ্লাদে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। আজ যেন ঠেলিয়া কোন গহীন জলে ফেলিয়া দিতেছে! যেন মালোদের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকাইয়া নিষ্করুণ কণ্ঠে বলিয়া দিতেছে, আমার কাছে আর আসিও না। আমি আর তোমাদের কেউ না।

উদ্ধৃতি আর না-বাড়ানোই উচিত। এমন জলমগ্ন গদ্যকাব্য বাংলা ভাষায় খুব কম লেখা হয়েছে, একমাত্র *ছিন্নপত্রাবলীর* সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়। কিন্তু *ছিন্নপত্রবলী* তো পত্র, কথাসাহিত্য নয়। বাংলা কথাসাহিত্যে এমন গদ্যভাষা প্রায় নেই সে-কথা *আরণ্যক*-এর বিভূতিভূষণকে বিস্মৃত না-হয়েই ভাবা যায়। সেখানে ভাষা ওই অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একেবারে হয়ে মিশে গেছে। কিংবা একটু দূরবর্তী হলেও *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* [যদিও, তারাশঙ্করের সমকালীন কেউ কেউ তার গদ্যের শিল্পসফলতার প্রশ্নে সন্দিহান ছিলেন। তারা যে ভুল—এ কথা এখন প্রমাণ অপ্রয়োজনীয়।] আর *খোয়াবনামার* ভাষার বিষয়টি দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে না। কিন্তু কোনোটাই *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর জলময়তার কাব্যের মতো নয়। কিন্তু সেই ভাষাও তো উঠে এসেছে ওই প্রকৃতি থেকে। যেমন *আরণ্যক*-এর ভাষা ওই অরণ্যময় প্রকৃতি উৎসারিত, ওখানে বিভূতিভূষণের মাস্টার হাতের করসত প্রায় নেই; অথবা করসত যে নেই, সেটিই করসতহীন করে তুলতে পারাই মাস্টারি—পেছনের করসতটাকে লেপেপুছে দিতে পারা। তারাশঙ্কর সম্পর্কে একেবারে স্পষ্ট করে ওই কথা তো বলা যাচ্ছে না, কিন্তু ভূগোলকে স্থানিক সংস্কৃতির আবরণে জড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা বাংলা ভাষায় খুব কম ঔপন্যাসিকই অতটা সফলভাবে করতে পেরেছেন। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথাও* ওই জনপদ উৎসারিত গদ্যেরই নিদর্শন। তারাশঙ্কর চাইলেও কোনোভাবেই এর বাইরে যেতে পারতেন না। কিংবা *খোয়াবনামায়* কাৎলাহার বিল সংক্রান্ত যে-

পুরাণ তা ওই গদ্যভাষায় জন-জীবন ও জলসহ আপনি উৎসারিত। গদ্যভাষার উচ্চতর প্রকৃতি এভাবেই নির্ধারিত হয়। দেবেশ রায়ের *মফস্বলি বৃত্তান্তের* খেতখেতুর যাত্রাপথ ও খেত-অরণ্য-প্রকৃতিময় জীবন যেখানে ভাষার ক্ষেত্রে ভূগোল বড় ভূমিকা পালন করেছে।

এদিকে আমাদের জিজ্ঞাসার আড় তো ভাঙতে চাইছি নদী নিয়ে। গালভারি শব্দ নদীমাতৃক এই জনপদ, সেখানে *তিতাস একটি নদীর নাম*কেই একমাত্র মনে হলো, এর ভাষা তিতাস নদী উৎসারিত। এ কথা বললে, একটু আগে উল্লিখিত উপন্যাসগুলোর সঙ্গে এখানে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ভাষিক ক্ষমতার তফাত হয় না, প্রশ্নটি যেখানে নদীকাব্য— সেটিরও কাছে যাওয়া হয় না। কিন্তু উদ্ধৃতির বহর তো পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা। একেবারেই দৈবচয়নে। কাহিনীর কিছুই সেখানে বলা হয়নি। বলা অপ্রয়োজন। উপন্যাস কাহিনীহীন গদ্যকাহিনীর উদাহরণ। ভাষা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির জীবন, যা কখনই শেষ হয় না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের হাতেই তো সুযোগ ছিল *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর কাহিনীহীনতার বাইরে ব্যক্তির ও ব্যক্তি সমষ্টির কাহিনীতে যাবার। ভাষাকে 'আধুনিক', তিতাসহীন 'আধুনিক', প্রবাদহীন, প্রবচনহীন গতিময় করে তোলার, কিন্তু সেই সুযোগে তা আর কোনোভাবেই *তিতাস একটি নদীর নাম* নয়, সেদিকে অদ্বৈত গেলেনই না; নাকি যাবার সুযোগই দেয়নি তাকে তিতাস। যদি তার সেই নিজস্ব সংকল্প সত্যি হয়, 'মানিকবাবু বাওনের পোলা, জাইল্যার জীবন জানেন না।'—সেই সংকল্পের প্রাথমিক বিকল্প তিতাসকেই তার উপন্যাসের বিষয় করে তোলা এবং অন্তর্গত কসরতে যে অর্জন তা এই উপন্যাসের নদীকাব্যময় ভাষা। এ ভাষায় প্রচলিত 'কাব্যময়তা' বলতে যা বুঝি তা এটি নয়। প্রচুর নিম্নরেখ দিয়ে উদাহরণ, সে উদাহরণও তো যেন যথেষ্ট নয়, কিন্তু পরতে পরতে মূল কাহিনীর বাইরে, এই ভাষা তিতাসই অদ্বৈত মল্লবর্মণের হাত দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে, কোনোক্রমে এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ তার হাতে ছিল না তাও তো নয়। তার বাস কলকাতা শহরে, কাজ করছেন *দেশ* সাপ্তাহিকে। ততদিনে কলকাতার গল্প-উপন্যাসে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার বিপরীতে বেশ আধুনিক নাগরিক ভাষা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সেখানে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রর মতন সব্যসাচী লেখকরা, পাশাপাশি আছেন মহানাগরিক অন্নদাশঙ্কর রায় ও গোপাল হালদার। এখানে বলা ভালো, এদের ভেতরে গদ্যে ঘটি-বাঙাল সমস্যা প্রকট নয়, কিন্তু নাগরিক উপন্যাসের তরতরিয়ে পাঠ্যযোগ্য গদ্য বেশ বাজার পেয়েছে, আর আছেন গল্প-উপন্যাস লুকিয়ে রাখা জীবনানন্দ দাশ। আর অদ্বৈত মল্লবর্মণের সমকালীন যারা: বিমল মিত্র, কমলকুমার মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রি নদী, অমিয়ভূষণ মজুমদার, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন তাদের প্রথম পর্বের লেখাপত্তর নিয়ে কথাসাহিত্যের আসরে জায়গা করে নিয়েছেন। *দেশ* পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ অদ্বৈত মল্লবর্মণের মৃত্যুর পরে শোক করে যতই বলুন, বড় সাধ ছিল তাকে [অদ্বৈত] দিয়ে একখানি মৌলিক উপন্যাস লেখাবেন, তার সেই সাধ *দেশ* পত্রিকার পাঠককুলের মুখের দিকে তাকিয়ে ততটা পূরণ হতো না, যদি *তিতাস একটি নদীর নাম*-পরবর্তী উপন্যাসখানা অদ্বৈত মল্লবর্মণের সত্যিকারে 'মৌলিক' হতো। কেননা গল্পের ক্ষেত্রে সহনীয় হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে *দেশ*-সম্পাদককে তার পাঠককুলকে আদরের আসন দিতেই হতো, সেখানে বর্ণনায় 'মুদিয়া', 'পাছায়', 'সামনা' ইত্যাদি শব্দ আর নিম্নরেখগুলোর মতন বাক্য ওই পাঠকুলের কাতারে দাঁড়াবার নয়। যে জন্য হয়তো বিহার থেকে পাঠানো অপরিচিত এক লেখকের *জাগরী* নামের উপন্যাসটি *দেশ*-এ ছাপার জন্য অমনোনীত হয়। সে তো ওই মৌলিকত্ব আর অপরিচয়ের সূত্র ও অজ্ঞাতকুলশীলতা; যদিও এরপর পরই মুদ্রণ-ভুলেভরতি *জাগরী* সে-বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেলে সাগরময় ঘোষ নড়েচড়ে বসেছিলেন। অদ্বৈতর তো সে ভাগ্য হবারও নয়, *তিতাস একটি নদীর নাম* প্রকাশিতই হয়েছিল তার মৃত্যুর পরে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোনো সুযোগই দেননি।

ফলে নদীজীবনের পুরাণ কিংবা মহাকাব্য হয়ে ওঠার সমস্ত যোগ্যতা নিয়ে বাংলা ভাষায় একমাত্র উপন্যাস *তিতাস একটি নদীর নাম*। তিতাস তীরের কাহিনী এটি নয়, এখানে অনন্ত সুবল কিশোর বাসন্তী ইত্যাদি কেউই মুখ্য নয়, ওই নদীর লোকজীবনের গাথা এই উপন্যাস যা লেখা হয়ে নদীর ভেতর থেকে উৎসারিত এক অসাধারণ বাংলা ভাষায়। দেবেশ রায়ের সেই খেদ—নদী পাড় ভাঙল, বৃষ্টি ঝরল আর লোকায়ত পৌরুষ, লোকগাথার কমনীয়তা প্রতিটিই এখানে অতি সন্তর্পণে গেঁথে দেয়া, হয়তো মালোর ছেলে হওয়ায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ তা ঘটিয়েছেন অজ্ঞাতে। আবার তাই-বা কী করে হয়, তার মতন পাঁড় পাঠক, এত বই ছিল তার নিজের সংগ্রহে যে লাইব্রেরিতে দান করতে হয়েছিল। তার সাম্প্রতিক ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন, কিন্তু নিজে তিতাসকুলের মালোর জীবনের আখ্যানকারের বাইরে তিনি আর কিছুই যেন হতে চাননি, হননি; কিংবা সেই 'নাগরিক' প্রলোভনের বাইরে থেকে গিয়েছে তার লেখা, মাত্র ছত্রিশ বছরের জীবনে। কিন্তু স্মারকের অতিরিক্ত *তিতাস একটি নদীর নাম* কেন ঐতিহ্য হয়ে ওঠেনি, সেই হিসাব দেয়ার বা নেয়ার প্রশ্নের সামনে আর তিনি থাকেন না, বরং অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রচেষ্টার যে স্মারক রচনা করেছেন পরবর্তী বাংলা উপন্যাস কোনো নদীর কূলেই সেই অকুতোভয় অবস্থায় ঔপন্যাসিককে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। সেটি বুঝি মালোর ব্যাটার পৌরুষেই সম্ভব!

৩.

তিতাস একটি নদীর নামের প্রায় সমকালীন *গঙ্গা; পদ্মা নদীর মাঝির* খানিক অনুগামী। কাহিনীর দিক থেকে নয় যদিও, এখানে কোনো উপন্যাসেরই কাহিনীর প্রসঙ্গ প্রায় তোলাই হয়নি, তা এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক এবং তা কোনোভাবেই তুলনামূলক আলোচনাও নয়। অদ্বৈতর মৃত্যুর পরে খসড়া আর মাসিক *মোহাম্মদী*র মুদ্রণের সঙ্গে মিলিয়ে যে *তিতাস একটি নদীর নাম* আমাদের সামনে তার বছর দুয়েকের ভিতর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *গঙ্গা*। সমরেশ বসু তখন তরুণ লেখক। এর আগে প্রকাশিত হয়েছে *উত্তরঙ্গ, নয়নপুরের মাটি, বিটি রোডের ধারে, শ্রীমতি ফাফে* আর *সওদাগর*। *গঙ্গা* (সম্ভবত) তার ষষ্ঠ উপন্যাস। যদিও কালকূট ছদ্মনামে সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত *অমৃত কুম্ভের সন্ধানের* জন্যে কালকূট সমরেশ সে সময়ে ভীষণভাবে সংবর্ধিত! লেখাই তার তখন সসংকল্পজীবিকা, এর আগের জীবিকাগুলো কোনোটিই লেখক জীবনের অনুকূল নয়। বাঁধা নকশাকারের চাকরি চলে যাবার পরে, (রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে), ফেরিওয়ালা কাজও তাকে করতে হয়েছে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য। মাথার উপরে একটি টালির ছাঁদ, সেখানেই প্রাণান্ত পরিশ্রমে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় শুধু কথাসাহিত্য রচনা। এসব কথা প্রায় মিথ এখন। শুধু লিখে জীবন চালন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমন 'ব্যর্থ' উদাহরণের পর সমরেশ বসুর কাছে তা তো কোনোভাবেই 'রোমান্তিক' দেখানোপনার বিষয় ছিল না। উত্তীর্ণ কৈশোরে লেখা *নয়নপুরের মাটি*র মতো পায়ের নিচের মাটির খোঁজে তিনি ব্রতী, কিন্তু অথই জলে সে মাটির সন্ধান পাওয়া অতি দুঃসাধ্য বটে। তবু তিনি তাই করে দেখিয়েছিলেন। সাহিত্য করার সাধ ষোলো আনা অথচ ঝুঁকি নেয়ার সাধ্য সেই এক আনাও— বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতার সাহিত্যিককুলকে তিনি আপন ক্ষমতায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জানিয়ে দিয়ে গেছেন বিক্রমপুরের বাঙালদের জেদ কাহাকে বলে ও কত প্রকার।

সমরেশ বসুর এই জেদের গল্প, যা প্রায় মিথ, সেখানে *গঙ্গা*রও কিছু ভূমিকা আছে। *গঙ্গা* সম্পর্কে সমালোচকদের অভিজ্ঞান '*গঙ্গা* উপন্যাসেই প্রথম প্রমাণিত হলো তিনি থাকতে এসেছেন।' কিন্তু এই জেদের কাহিনী, *গঙ্গা* বই আকারে প্রকাশিত হবারও আগের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ওটি কারা যেন তাকে দরজা বন্ধ করে লিখিয়েছিলেন। এমন আরো গল্প আছে। রচনাবলিতে গল্পের পত্রিকায় প্রকাশ সম্পর্কে আছে সম্পাদকের সন্দেহ: '১৯৫৭ সালে *জন্মভূমি* (?) পূজাসংখ্যায় *গঙ্গা* প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রবীণ-নবীন সকলের কাছে অভিনন্দনধন্য হয়েছে।' আসলে গল্পটা জানা গেছে কিছুদিন আগে, ১৭৭৮: *গ্রন্থচর্চা* জুন ২০১৫-এ সুধীর চক্রবর্তীর 'সম্পাদকের কত কথা' নিবন্ধে। এই গল্পের কথক নিউ ইন্ডিয়া প্রেসের প্রধান বীরেন

সিমলাই। সুধীন চক্রবর্তী তখন এমএ ক্লাসের ছাত্র; বীরেন সিমলাইয়ার প্রেস থেকে *বসুন্ধরা, বসুধারা* ইত্যাদি কাগজ মাসে মাসে ছাপা হতো। ছাপার ব্যাপারে তারা খুব যত্নবান। সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন :

তো আমি একদিন মুড়ি চা সেবন করে বললাম, 'বীরেনদা, সমরেশ বসুর সম্পর্কে কী একটা গল্প বলবেন বলেছিলেন।'

'গল্প নয়, ফ্যাক্ট। এখানে, এইখানে ওই ফোনে যে চেয়ার টেবিল দেখছ সেখানেই ঘটেছিল বুঝেছ?' বীরেন সিমলাই আমাকে ধমকের সুরে বললেন।

একটা দামি সিগারেটে সুখটান দিয়ে সিমলাই বললেন, 'এই প্রেস থেকে কয়েকটা পূজা সংখ্যা বেরোত। আমিই দেখাশোনা করতাম। ঝক্কি ঝামেলাও সামলাতে হতো। যেমন ধরো বিখ্যাত ব্যস্ত লেখকদের তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে লেখা আদায় করা। তো সেবার এক কাণ্ড হলো। এক সম্পাদক সমরেশ বসুকে একটা উপন্যাস লেখার বরাত দিয়ে ১ হাজার টাকা দিয়ে বসেছে, এদিকে লেখার দেখা নেই, লেখকও বেপাত্তা। আরে শোনো, অত চোখ ছোট করবার কী আছে? সে সমরেশ কি আজকের কাপ্তান সমরেশ? নৈহাটিতে থাকত, বলতে গেলে একটি বস্তিবাড়িতে। আন্ডা বাচ্চা নিয়ে অসহায় অবস্থা। ওর বউ গৌরী সব সামলায়। গানের টিউশানি করত। এদিকে লেখক মশায় অ্যাডভান্সের হাজার টাকা সংসার খরচে দিয়ে বোকা বনে গেছে। আমি পড়েছি মহাবিপদে। সম্পাদক ফোনে হুমকি দিচ্ছে, 'কী মশাই উপন্যাস কই? এদিকে তো ধরুন পূজার ঢাক বাজল বলে। হাজার টাকা কি সস্তা?'

আমি এমন চমকপ্রদ ঘটনা শুনে তাজ্জব বনে গেছি দেখে সিমলাইমশাই দামি গোল্ড ফ্লেকে টান মেরে বললেন, 'আরে ভুলে গেলে চলবে কে যে আমিও সিমলাই বাড়ির ছেলে। তক্কে তক্কে থেকে একদিন সমরেশকে ধরে এনে, ধরো, তোমার এই চেয়ারখানায় বসলাম। প্রথমে চা সিগারেটে তোয়াজ করে, ভেবে দেখলাম, এ মানুষটাকে চটালে কার্যসিদ্ধি হবে না। তাই খুব নরম গলায় বললাম, "সমরেশ বাবু, বলুন তো মশাই, বন্ধুভাবেই বলুন, প্রবলেমটা কী?" উনি নিতান্ত ভদ্রলোক তো। কুণ্ঠিতভাবে বললেন টাকাটা মেরে দেয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই। নভেলের গল্পটা ভাবা হয়ে আছে। শুধু কাগজে কলমে যোগাযোগটাই হচ্ছে না। আমি এ কথা শুনে বললাম, "অসুবিধাটা হচ্ছে কোথায়? সময়াভাব? না অন্য লেখার চাপ?"

উত্তরে যা বললেন তা শুনে আমি তো হতবাক। কী বললেন জানো?

ওর বাড়িতে নাকি লেখার জায়গা নেই, পরিবেশও নেই।

'সে কী?' আমি বীরেন বাবুকে বললাম, 'তারপর কী সমাধান করলেন?'

আমি বললাম, 'এখানে এই প্রেসের মধ্যে যদি ব্যবস্থা করে দিই? খুব গোলমাল আর আওয়াজ অবশ্য। দুটো ট্রেডল আর একটা ফ্ল্যাট মেশিন চলছে ঘ্যাটা ঘ্যাং। পারবেন এর মধ্যে কনসেনট্রেট করতে? বললেন, 'সেসব কোনো সমস্যা নয়। একটা টেবিল চেয়ার দিতে পারবেন?' তাই হলো। ওই কোণে ব্যবস্থা করে দিলাম। মাঝে মাঝে চা। ব্যাস। ভাবতে পারো পরের এক সপ্তায় কী হল? ঠিক ঘড়ি ধরে নৈহাটি থেকে এসে সকাল দশটায় কাগজ নিয়ে বসেন। সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, পায়ে চটি, মুখে হাসি। সোজা হয়ে বসে বাঁ গালে বাঁ হাত ঠেকিয়ে টানা লিখে যাচ্ছে। যেন সাধক। কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। কোনো শব্দই কানে যাচ্ছে না। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত লিখে নৈহাটি ফেরা। মাঝখানে জোর করে খানিকটা খাইয়ে দিতাম। আর মাঝে মাঝে চা। সাতদিন টানা লিখে কোন বইটা নামল বলো তো? *গঙ্গা*।

দীর্ঘ উদ্ধৃতি। এমনকি মূল বিষয়ানুগও নয়। এখানে সমরেশ বসু আর *গঙ্গা* ভিন্ন মূল বিষয়ের কিছুই নেই। কিন্তু আছে এক অকুতোভয় তরুণের বীরত্বের কাহিনী। একবারে যোদ্ধার ভঙ্গিতে লড়ে যাওয়া। মাত্র সাতদিনে লিখিত হয়েছে *গঙ্গা*, ওই ভাবে! যা জনারণ্যে প্রচারিত, কারা যেন দরজা আটকে লিখিয়ে নিয়েছিল। তাই যদি হয়, যদি হয় কি, হয়েছে তাই, পায়ের নিচে মাটিহীনের লড়াইয়ের ব্রত রক্ষার জেদ সমরেশ বসু দেখিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি লক্ষ করার বিষয় অন্তত একটি জায়গায় : তিনি সেই বীরেন সিমলাইকে যে কথাটা জানাচ্ছেন, 'নভেলটার গল্প ভাবা হয়ে আছে। শুধু কাগজে কলমে যোগাযোগটা হচ্ছে না।' আর কেন হচ্ছে না, একটি নভেল লিখতে পারিবারিক যে আবহের প্রয়োজন হয় তা সমরেশ বসুর তখনো নেই। একটি ছোট্ট জলচৌকির ওপর লিখতেন তিনি, বাচ্চাদের কোলাহল না-হয় গৌরী বসু সামলাতেন। যে গল্পটা মাথায় আছে, সেটি তো একদিনেই তিনি মাথায় নিয়ে বসে নেই। ২৫ বৈশাখ ১৩৮১-তে *গঙ্গা*র নতুন মুদ্রণে তিনি ছোট্ট প্রাক-কথনে জানিয়েছেন, 'আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তার পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এদের সাহায্য ছাড়া *গঙ্গা* রচনা সম্ভব ছিল না।'

অন্যত্র এই প্রসঙ্গে আরো কথা জানা যায়। যেমন : নিমাইচাঁদ অধিকারী ছিলেন হালিশহরে রামপ্রসাদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক। তার কাছ থেকে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার ওই এলাকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে কাগজপত্রে ধারণাটা নেন। মাছমারাদের 'জীবিকা, জীবন, সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির খুঁটিনাটি নোট নেন। আর কার্তিক দাস ও পরেশ দাসের কাছ থেকে তাদের নিজস্ব উপভাষা, প্রকৌশলগত প্রয়োগ—বাঁধা ছাঁদি, টানা ছাঁদি, কোনা জাল, খুঁটে জাল, সাংলো জাল ইত্যাদি সম্পর্কে আর ওই জীবনের সংস্কার ও মাছ ধরার কৌশল। সঙ্গে দক্ষিণে এগিয়ে গেলে, সুন্দরবন সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে দক্ষিণ রায়ের মিথ; সেটা বাঘ সম্পর্কে, ওলাবিবি ইত্যাদি যেসব লৌকিক বিষয় আছে সেই সব। কিন্তু উপন্যাসটি লেখা সাতদিনে, *গঙ্গা* রচনার পেছনের আরো কিছু কথা জানা যায়। দিনের পর দিন জেলে নৌকায় কাটিয়েছেন তিনি। তাদের সঙ্গে থেকে কৌশলগুলো দেখেছেন, একেবারে ছেনে দেখা যাকে বলে। বিক্রমপুরের রাজনগরে পৈতৃকনিবাস সমরেশ বসুর, সেখানে বড় হননি, বেড়ে উঠছেন আজকের পুরান ঢাকায়। নৌকা যে তার বাহন হিসেবে প্রিয় এর প্রমাণ কালকূট ছদ্মনামে লেখা *কোথায় পাবো তারে* ও *স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে*তে পাওয়া যায়। সেখানে ধোলাইখাল থেকে ভাড়ার নৌকা নিয়ে বুড়িগঙ্গায় বাইয়ে দেয়ার মতো কৈশোরক দুরন্তপনার বর্ণনা আছে। সে বর্ণনার গতি আর ভঙ্গিতেই বোঝা যায়, ওই অভিজ্ঞতা কালকূট তথা সমরেশ বসুর নিজের। ফলে নদীময় বিক্রমপুর খাল আর বুড়িগঙ্গা ও তুরাগময় সেই ঢাকার অভিজ্ঞতা তার আছে। নদীর প্রতি টানও। জল যে ভালো চিনতেন তা লেখায় প্রমাণিত। ফলে স্কুলপালানো ছাত্র, প্রাক-যৌবন যখন ভাগীরথী ওরফে গঙ্গা তীরবর্তী নৈহাটিতে এসে পৌঁছলেন, তখন এই নদী সেই দেশভাগের আগেই বুড়িগঙ্গা ও বিক্রমপুরের অজস্র খালও পদ্মার বিকল্প শুধু বিকল্প নয় তার কাছে প্রতিকল্প। আর নভেলখানা যতই মাথায় থাকুক, একেবারে দিনক্ষণ গুনে, স্রোত গোন বুঝে নৌকায় কাটানো নৌকা বাওয়ার কথা জানা যায়? এই নদী তীরবর্তী মানুষ, শুধু মৎস্যজীবী নয়, অন্যান্য মানুষকে চেনাজানা প্রসঙ্গে তার বিখ্যাত 'পাড়ি' গল্পের কথা তো জানাই আছে। মিলেমিশে আছে এই নদীর দুই কূলের নৌহাটি জগদ্দল ইছাপুর চন্দননগর চুঁচুড়া হুগলির কথাও। এই অঞ্চলকে বুঝবার জন্যে কিছু প্রতিবেদন মতনও লিখেছিলেন দৈনিক পত্রিকায়। শোনা যায়, নদীর তীরে, জলের কাছে মুখ এনে কিংবা নৌকায় থাকতে জেলেদের সাংকেতিক ভাষায় দারুণ হাঁকও দিতে পারতেন সমরেশ বসু।

এ তো গেল মোটামুটি পটভূমিকা। এক তরুণ লেখকের প্রচেষ্টা। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে এই ধীবর জীবনের কাহিনী রচনায় সমরেশ বসুর সামনে স্মারকেরও বার্তাকে বহন করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মা নদীর মাঝি* নাকি *তিতাস একটি নদীর নাম*? *গঙ্গা*র কাহিনীর স্রোত যা, তাতে তিতাস সে গতির প্রধান অভিমুখ হতে পারত। কিন্তু সমরেশ বসুও তো কায়েতের পোলা, জাইল্যার কী জানে? ওই যে জীবন—নিবারণ সাঁইদার, বিলাস, পাঁচু, দামিনী আর হিমির কাহিনী বটে, আসলে এ গঙ্গাতীরে তাদেরই গল্প, অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাহিনীর মতন তিতাসের গল্প নয়। কারণ তিতাসের কাহিনীর ভেতরে বেড়ে

উঠতে হয়, *পদ্মা নদীর মাঝি* ও *গঙ্গার* জনজীবনের কাহিনীর ভেতরে লেখকের বেড়ে ওঠা নয়। সে সমরেশ বসু যতই মালোদের ভেতরে কাটান না কেন। এদিকে সমরেশ বসুর প্রায় উল্টো গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে প্রচলিত। *পদ্মা নদীর মাঝি* রচনার পটভূমি সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি যেটুকু স্বীকার করেছিলেন: কখনো নদীর মাঝি [জেলে]দের সঙ্গে বিড়িটিড়ি ফুঁকেছি। সরকারি চাকরিজীবী বাপের ছেলে যার বিদ্যালয়জীবন কেটেছে অবিভক্ত বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন এলাকায়, পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুর হলেও সেভাবে থাকেনি। তবে পারিবারিক প্রয়োজনে প্রথম যৌবনে লেখকজীবনে প্রায় শুরুতে বেশ কিছুদিন বিক্রমপুর অঞ্চলে ভালোই পা পড়েছিল তার। *পুতুল নাচের ইতিকথা* সেই অভিজ্ঞতার স্মারক বহন করে। এদিকে সমরেশ বসু একেবারে হিসাব কষে *গঙ্গার* কাহিনীকার। এই নিয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'অশ্লীল' ব্যঙ্গও আছে। তিনি *পদ্মা নদীর মাঝি* আর *গঙ্গা* রচনার জয়-পরাজয়ের খাতা খুলেছেন। যদিও শিল্পের হিস্যা কখনো দৌড় দেয়া বা গোল দেয়া বা ছয় মারার মতন বিষয় নয়। তবু সন্দীপন তার স্বভাবের চটুলতায় লিখেছেন, একজন বিড়ি ফুঁকলেন অন্যজন মাসকাবারি জেলে নৌকায় কাটালেন, তখন *রোজা* চলচ্চিত্রের

সমরেশ বসু

ওই গানটির মতন বলতে সাধ জাগে তার: রুকমনি রুকমনি সাদি কা বাদ কা কা হুয়া, কোন জিতা কেন হারা। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এই গান গাইতে গাইতে তিনি *পদ্মা নদীর মাঝি* আর *গঙ্গার* পারস্পরিক সফলতার মাত্রা নির্ণয় করেন।

না, *পদ্মা নদীর মাঝির* উদাহরণ সামনে থাকলেও *গঙ্গার* কাহিনীতে সমরেশ বসু সে-ছাপ পড়তে দেননি। বরং তার আকাঙ্ক্ষা অনেকখানিকই *হাঁসুলী বাকের উপকথাকে* নিজস্ব মডেল মান্য করা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-সূত্রও খুঁজে পান, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথার ভাষার জোর এইখানে যে সে ভাষার দুই তৃতীয়াংশ উপাদান, চলনভঙ্গি এবং অত্বরতায় কাহারজীবন, কাহার লোককথা, কাহারসংস্কৃতি প্রত্যক্ষ ব্যবহৃত হয়েছে। [...] সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রভাব' বলতে বোঝায় ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ শোধ—এই শোধের বা প্রভাবোদ্বেগের ব্যাপারটা আসল কথা। [...] কেদমে পাঁচু আর বিলাসের সম্পর্কে আলতো ছায়া পড়েছে বনোয়ারি-করালী সম্পর্কের। [...] *গঙ্গায়* সমরেশের মনোযোগ বিলাসের মহাকাব্যের বীরোল্লসিত প্রাণময়তার দিকে। এই বারে আর হাঁসুলী বাকের উপকথার সঙ্গে *গঙ্গার* প্রতিতুলনা চলবে না। [...] সচেতন অথচ শ্রদ্ধাবান দৃষ্টিতেও দেবেশ রায় ঠিকই ধরেন, "গঙ্গা নিয়ে লেখা উপন্যাসের সহজতম লভ্য মডেল তো ছিল পদ্মা নদীর মাঝিতে।" অথচ তার *গঙ্গা*-অভিজ্ঞতাকে সমরেশ অবয়ব দিয়েছিলেন *হাঁসুলী বাকের উপকথার* অবয়বের ছাঁচে।'

দেবেশ রায় উপন্যাসের মডেল প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা নিয়ে আগে কিছু কথা তোলা হয়েছে। কিন্তু এই লেখার বিষয় তা নয়। *গঙ্গা* উপন্যাস কি এই নদীর জল উৎসারিত? যদিও লোকপুরাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গের কথাগুলোও আগে বলা হয়েছে। সেখানে *তিতাস একটি নদীর নামের* ভাষাসহ সবকিছুর যোগ একমাত্র আরণ্যক-এর সঙ্গে, কারণ ওই অরণ্যই ওই কাহিনীহীন কাহিনীর গতি নির্ধারণী। সেখানে বিভূতিভূষণ শুধু রচয়িতাই মাত্র। একই কথা *তিতাস একটি নদীর নাম* সম্পর্কে। এখানে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* প্রসঙ্গ এসেছে *গঙ্গার* মডেলের দিক থেকে। কিন্তু *হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* ভাষা জনপদ উৎসারিত *গঙ্গার* তা নয়। বরং গঙ্গার দক্ষিণমুখী স্রোতের কথাকে মাথায় রেখে সমরেশ বসুর ভাষার যে গতিশীলতার কথা বলা হয় তা অনেকটাই নাগরিক।

উপভাষা আর আঞ্চলিক শব্দ বাদ দিলে, এই ভাষার জন্ম ওই ভাগীরথী-তীরবর্তী আতপুর হালিশহর অঞ্চলের মালোপাড়ার জীবন ও পাশের নদীর নয়। উল্টো দিকে *পদ্মা নদীর মাঝিতে* উপভাষা বাদে আঞ্চলিক শব্দ প্রায় নেই, কিন্তু নাগরিক গদ্যের বিপরীতে সাধু রীতিতে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেও এর সর্বনাম চলতি, তৎসম শব্দ প্রায় নেই। *তিতাস একটি নদীর নাম* আর *গঙ্গায়* তা নেই। তবে অদ্বৈতর গদ্যের তরঙ্গ ভীষণ তিতাসের জলচ্ছল, একেবারে নদীর জলের মতো কথা বলে ওঠে। সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা তির্যক আর সেখানে যে ইঙ্গিতময়তা তা বাংলা কাহিনীগদ্যে দোসরহীন। সমরেশ বসু গোড়াগুড়িতেই ধরতে চেয়েছেন ভিন্ন গতিশীলতা। কিন্তু নদীর জলের গদ্য কি এত পূর্ণ যতিসম্পন্ন হয়?

> ১। আশপাশে কাছ-ঘেঁষাঘেঁষি, পুড়্যা, আতুড়ে, ইটিন্ডে, দণ্ডিরহাট, শাঁখচূড়া, টাকি—সবখানে সব মাছ মারার ঘরে সাজসাজ রব পড়েছে। সবাই আসবে একে একে। ডাইনে রেখে গোপালপুরের বিল-জলা জংলা, সুদূর পশ্চিমে রেখে সন্দেশখালি, হাসনাবাদের তলা দিয়ে আসবে।
>
> ইছামতী দিয়ে এসে, হাসনাবাদের তলা দিয়ে নৌকা নামবে তরতর করে। একে বলে পথের প্যাঁচ। জলপথের ঘূর্ণি। কোথায় নামছে? না, মঠবাড়ি, দুলদুলি হয়ে একেবারে সাহেবখালির মুখে, ঝিল্লে আর রাইমঙ্গলের মোহনায়। সেখান থেকে খেল্যের গাঙ রেখে দক্ষিণে, ডাইনে পড়বে শুলকলি গাঙ, ভবানীপুর কালীনগর ভিড়িয়ে। এবার ওপর দিকে মনের চোখ খুলে তাকালে দেখা যাবে, সাপের মতো আঁকাবাঁকা কতগুলি জটা পাক দিয়ে, কিলবিলিয়ে উঠেছে চব্বিশ পরগনার উত্তরে। এতক্ষণ ইছামতীর ভাটার টান নেমেছে। হাল না মারলে, তাও ভাতসলা থেকে এক ভাটায় আসা যাবে না এত দূর।

গঙ্গার শুরুর দিকের এই গদ্য, ধীরে ধীরে গতিহীন হয়নি, এ তো নদীর কথা বলা, নদীর স্রোতময় গদ্যে বহমান, এই নদী সমুদ্রবাহী, পদ্মা কি তিতাস গোত্রের নয়। জোয়ার-ভাটা অতি নির্দিষ্ট। জল স্থির হয়ে দাঁড়ায় কম সময়। সমরেশ বসুর কলমও শুরুতে সে মতোই :

> ২। তারপরে জীবনে একবার গেছে পাঁচু দক্ষিণে। গেলে থাকতে পারে না। সমুদ্রের নীলাম্বুধি অন্ধকার গিলতে আসে থাকে। বাতাসের সাঁইসাঁই রবে কানে বাজে সাইদারের হাঁক। কালো কুচকুচে সর্বনেশে জঙ্গল তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে যাকে। ডাকে আর বাতাসে ফিসফিস করে বলে, ভাইরে পাঁচু, এইখেনে আছি।
>
> আজো ভুলতে পারেনি পাঁচু সেদিনের কথা। বাগবাজারের এই খালের মোড়ে বসেও সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। অগ্রহায়ণের আকাশ ঘোলাটে। গাঁজানো-রস-খাওয়া বাতাস। তার দিক ঠিক নেই। সেই সময়ে দেখা দিল জলের বুকে স্পষ্ট দাগ।
>
> সমুদ্রে জোয়ার ডেকেছে। ট্যাকের মুখে শাবর করে আছে গোটা সাই। আকাশ-বাতাসের গতিক বড় সুবিধের লাগছিল না। বাতাস এক বর্গা নিশেন হারিয়েছে। তার দিক ঠিক নেই। অগ্রহায়ণের সমুদ্র। কিন্তু তার গতিক ভালো নয়। আগনার মুখে বড় বড় হ্যাঁকা ভাঙছে। আগনা হল জোয়ারের আগমন। শাবর বলে সাইয়ের নৌকা-জমায়েতকে। অবস্থা দেখে, শাবর ভেঙে সাইয়ের মাছ মারারা সেদিন মাছ মারতে বেরোয়নি।

উপন্যাসটির শুরুর গদ্য থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছেন সমরেশ বসু। যেন গঙ্গা থেকে গঙ্গা-তীরবর্তী হালিশহর আতপুরের জেলেজীবনকে জানানোটাই উদ্দেশ্য হয়ে উঠছে অথবা উল্টোটাও হতে পারে, সেই জীবনকে ধরতে তার প্রয়োজন এই গদ্যের। এমনকি একটি বাক্যের পরে, পরের বাক্যে ওই লোকজীবনের ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন। যেমন: 'আগনা হল জোয়ারের আগমন। শাবর বলে সাইয়ের নৌকা-জমায়েতকে।' এই কাজটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনে সংলাপে সেরেছেন, অথবা এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে ব্যাখ্যার প্রয়োজনই পড়েনি। আর অদ্বৈত মল্লবর্মণ এসবের তোয়াক্কাই করেননি। অনায়াসে বসিয়ে দিয়েছেন; তিতাসকূলের গদ্যে তা অনায়াসেই প্রবিষ্ট হয়েছে। উত্তরঙ্গ থেকে *বিটি রোডের ধারে* কি *শ্রীমতি কাফে* পর্যন্ত আসতে সমরেশ বসু গদ্যের যে নাগরিক চলকে রপ্ত করে নিতে চাইছেন সমকালীন কলকাতার বাজারচলতি গদ্যের কাছাকাছি থাকার জন্যে, যাতে সংযোগ বা কমিউনিকেশন বলে, তা রক্ষা করার দায়ও খানিকটা তার ওপর বর্তেছে নিজেরই অজান্তে। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সতীনাথ আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদে বাংলা কথাসাহিত্যিকদের গদ্যের এই রপ্ত হওয়া কেতার বাইরে না-যাওয়া, সিদ্ধির দুর্গ আগলে বসে থাকার প্রবণতা ততদিনে ধীরে ধীরে নিয়মিত প্রবণতা। যতই এ কথা বলা হোক যে প্রতিটি উপন্যাস লেখা হয় ভিন্ন ভিন্ন গদ্যে, তা হয়তো বিষয়ের জন্যে, কিন্তু এমন উদাহরণই বেশি। যদিও পরে সমরেশ বসু নিজেই কতবার গদ্যের এই আড় ভেঙেছেন, যেমন *নির্জন সৈকতে* বা কোথায় পাব তারে-র ভাষিক দূরত্ব, কিংবা খুব বড় উদাহরণ: *বিবর* আর *মহাকালের রথের ঘোড়া।* কিন্তু *গঙ্গায়* তার হাতে সে সুযোগ কই? বিষয়ের চাপে গদ্য বদলে যায়, যেতে বাধ্য, কিন্তু হিমি আর বিলাস নিকটবর্তী হতে সে বিষয় সমরেশ বসুর হাত ফসকে বেরিয়ে যায়।

৩। সবাই চেনে একটু আধটু বিলাসকে। তেঁতলে বিলেসকে। সবাই জানে, বড় রগচটা আর গোঁয়ার। গায়ে শক্তিও তেমন। বলে, নিবারণ মালো বসানো একেবারে। ভাবসাবও সেই রকমের। এসব ছেলেকে নিয়ে ফ্যাসাদ হয় মহাজনের কাছে। সে মাছ মারার বাপ-চৌদ্দপুরুষের ধার ধারে না। এই পৌষ মাসে হল এক কাণ্ড। ঘরে একটি দানা নেই। ঘরে চলছে পোষ-পোড়া। পাঁচু নিজে যেতে পারেনি মহাজনের কাছে। বিলাসকে বলে পাঠিয়েছে, 'পাল মশাইকে বলিস, দশটা টাকা যেন অতি অবশ্যি দেন।' এদিকে ছেলে দড়ো। যা যা বলবে, ঠিক তেমনিটি বলবে। গিয়ে বলেছে।

মহাজনেরও বোধ হয় মন-মেজাজ খারাপ ছিল। বলেছে, টাকা দিতে পারব না।

—কেন?

আ ম'লো। কেন কী রে! বল, আজ্ঞে দয়া করুন। তা নয়, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। মহাজন তো চটেই অস্থির। খেঁকিয়ে উঠেছে, আমার খুশি।

—তবে আর মরতে মহাজন হওয়া কেন? মাছ হয়ে জন্মালেই হতো?

—মাছ?

—হ্যাঁ, তবে খুশিমত চলাফেরা করতে পারতে।

আর যায় কোথায়। মহাজন এই মারে তো এই মারে। তবে, ওই যে তেঁতলে বিলাস উনি। মারামারি করে আসতে একটুও চিন্তা-ভাবনা নেই।

পালমশাই ছুটতে ছুটতে একেবারে পাঁচুর কাছে। বাড়ির সকলে মিলে ক্ষমা চেয়ে তবে উদ্ধার পায়। কিন্তু তিনদিন ভাত খেল না বিলাস। ওর মা যে বলেছিল, গিলতে পারিস, আর এ বুদ্ধিটুকু নেই ঘটে?

৪। তা কে শুনছে সে কথা। শ্রীমানের এর মধ্যে দুবার ঘুরে আসা হয়েছে সমুদ্রে। ওঁর যে বড় নেশা। বড় টান। একবার যাকে ধরেছেন উনি, সে তো আর থির থাকতে পারবে না। ওঁয়ার ডাক যে কেমন করে কখন আসে সে পাঁচু টের পেয়েছে অনেকবার। নিজেকে দিয়ে নয়, দাদা নিবারণকে দিয়ে। এই গঙ্গাতে নৌকোর গলুয়ে বসে বসে দেখেছে কাঁড়ারে বসে দাদা তার দক্ষিণ দিকে চেয়ে রয়েছে গালে হাত দিয়ে। যে বারে বিশেষ করে, মা গঙ্গা নির্দয় হতেন। মা গঙ্গা নির্দয় হওয়া যে কী বস্তু, সে জানে তারা, যাদের জীবনমরণ গঙ্গার গহ্বরে। এই তাবৎ চব্বিশ পরগনার, হুগলী, নদীয়া ওদিকে খুলনার পশ্চিম, যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিমের মাছমারারা সব আসে গঙ্গায়। এখন দেশ ভাগাভাগি হয়েছে। পূবনীর হিন্দু মাছমারারা সবই এখন সার করেছে গঙ্গা।

গঙ্গা-ই আসল। বিশেষ এই মরশুমে। টানের দিনে সমুদ্রে পাটা জালের সাই দমে ভারী হয়ে ফেরে না। পাটাজালের সাই ইলিশের চক খোঁজে। পানসা জালের সাই হল টানের সমুদ্রের আগল।

এখানে ভূগোল ও সময় আর জাত ও ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিলেন সমরেশ বসু। ফলে উপভাষায় ভিন্নতার আদল থাকতে পারত যদি মাছমারাদের কিছুদিন আগের স্থায়ী জলের দখলদারিত্বের কথা স্মরণে রাখি, কিন্তু তা ঘটেনি। তা সবই এরপর থেকে গঙ্গা নদী-তীরবর্তী নির্দিষ্ট। অথচ বিক্রমপুর-ফরিদপুর পদ্মার উত্তর-দক্ষিণ আর খুলনো-যশুরে উপভাষা যে সমরেশ বসুর আয়ত্তাধীন ছিল না, তা তো নয়। তিনি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আর দেবেশ রায় ভিন্ন পশ্চিম বাংলার লেখকেরা পূর্ব বাংলার এক কল্পিত উপভাষা ব্যবহার করেছেন, তা আদৌ কোনো স্থানিকতা নির্দিষ্ট নয়, বড় বিচিত্র তা। গৌরকিশোর ঘোষসহ কারো কারো প্রয়াস খেয়াল রাখলেও কথাটা এখানে একেবারে নির্দিষ্ট অর্থে গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের অতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের নয়।

৫। ক. গান ধরেছে [বিলাস] গলুয় শুয়ে শুয়ে।

আমার প্রাণে নাই সুখ—হে
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।

খ. বিলাসের একটি বউ চাই শুধু। একটি ডাগর-সাগর বউ। বিলাস থামছে। অন্ধকারে দেখছে এদিক ওদিক। আবার গান ধরছে,

না দেখে তোমারে, আমার নয়নে নাই সুখ—হে
বড় উথালি পাথালি আমার বুক।

গ) গান থামে না বিলাসের।

টানাছাঁদি টেনে চলি, পাথালি লৌকোর বুহ—হে
ওই আওড়ের ঘূর্ণি-জলে দেখব তোমার মুখ॥
বড় উথালি-পাথালি আমার বুক॥

৬। ভরা জোয়ার। এখন বড় ঢলঢল করছে। কূলে কূলে ভরে উঠছে গঙ্গার শরীর। প্রাণ মন তোমার বেশি ভরে উঠলে কী হয়। ভার হয়। অঙ্গ বিষম হয়। ভেতরে ভেতরে ফুলছ, ফাঁপছ, ধরে রাখতে পারছ না নিজেকে। একি সুখ না দুঃখ, কে জানে। কিন্তু বিবশ শরীর আর চলে না, থির হয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে যাচ্ছে এক-এক জায়গায়। কান পাতলে শোনা যায়, কী এক বিচিত্র সুর এই ভরা জোয়ারের বুকে। কীসের সুধায় ভরে গেল প্রাণ। ব্যথার না সুখের! কী চাও, কী চাও তুমি। তোমার সেই কচি মেয়ের ঝাঁপাইঝোড়া কোথায়। কী বলছ তুমি চুপি চুপি, তটে তটে, বিষকাটাড়ি ঝাড়ে, জলে-ডোবা বন-হেনার ঝোপে।

এই জায়গায় *তিতাস একটি নদীর নাম*-তুল্য নদীর শরীরী ভাষা অসাধারণ ঔপন্যাসিক ক্ষমতায় পড়ে নিয়েছেন সমরেশ বসু। তিতাস-তুল্য বর্ণনায় নয়, নদীকে বোঝার ক্ষেত্রে। তাই হওয়াই তো প্রত্যাশা ছিল, যদি তোলা প্রশ্নের সেই জায়গাটার দিকে ফিরে তাকাই। এমনকি নামকরণেও, এ তো নদীর নাম-ও নয়, এ নদীর মাঝিও নয়, একবারে নদীটিরই নাম। কিন্তু সমরেশ বসুর গোড়া থেকেই গন্তব্য ভিন্ন, নদীর মাঝি বা জেলের সংগ্রামী জীবন জানাবেন তিনি। শিশিরকুমার দাশের একটি উক্তি স্মরণীয়: 'দক্ষিণবঙ্গের নদীনালা এবং মৎস্যজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ জীবনযাপনের সংগ্রাম কঠোরতা, সামাজিক বৈষম্য নিয়ে স্থির, নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত আখ্যান। এর একদিকে আছে বাস্তবের তথ্যের নিষ্ঠা অন্যদিকে আছে মৃত্যু ও অস্তিত্বের সংগ্রামের এক মানবিক উপলব্ধি।'

'নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত আখ্যান'—আখ্যানের দিক দিয়ে, গদ্যভাষায় কিন্তু সে আড় সবসময় ভাঙেননি তিনি। শুধু নদীর জীবন যে জীবন, নদীর যে পুরাণ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা প্রশ্নে ছিল,—সেই ঐতিহ্যিক গতির দিকে যাওয়ার কারণ হয়তো বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যগত আদলের ভেতরেই খুঁজে নিতে হবে।

৭। দেখ, গুনগুন করছে বসে [বিলাস]।

আমার ডাক পড়েছে সাগরে;
ঠাকুর, আমার যেতে মন করে।

৮। হিমি তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। অসীম আকাশের তলায় গঙ্গার বুকে, আদিম মানুষের মতো মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে বিলাস।
হিমির শাড়ির পাড়ে, জলের ঢেউ কেটে চলে ময়ূরপঙ্খী। পুবের বাতাস টানে আঁচল ধরে। কিন্তু অমন চোখে চোখে তাকিয়ে কী দেখে দুজনে দুজনের। যেন দুটিতে কতকালের চেনা, হারিয়ে গিয়েছিল, ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। আজ বহুদিন পরে, ভাটার জলে মাঝি ভাসে। আর পলিমাটির পিছনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে। চোখে চোখে বলে, যেন চেনা-চেনা লাগে, তুমি কি সেই মাঝি?
হঠাৎ হেসে উঠে হিমি বুকের কাপড় টেনে নেয়। হুঁ। নাতীনের জোয়ান বুক আর মানছে না।
৯। বিলাস তিবড়িতে আগুন দিয়ে গেয়ে উঠল,
আমার কিছুতে নাই মন
আমি ভাসব আকূল পাথারে হে
এই আমার মতি বিলক্ষণ।
১০। বিলাস বলল, অমর্তের বউয়ের সব কথা। বলল, বড় পাপ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি মহারানী। আমার ভেতরের শয়তানটাকে সে উসকে দিইছেল। বুকে আমার আগুন জ্বলছেল খা খা করে। তোমাকে যেদিন দেখলুম, আমার মন শান্ত হলো। তুমি আমার পাপ ধুয়ে দেও।
হিমি হাত দিয়ে বিলাসের মুখ চাপা দিল। ভারী উৎকণ্ঠা ও ত্রাসে বলল, কাকে কী বলছ তুমি? সোমসারে আমি তো পাপ-পুণ্যি বুঝিনে। তাহলে আমার পাপের ভরাডুবি হবে, ঢপ। [...]
বিলাস বলল, আমরা দুজনেই ধোয়ামোছা করে নিই জীবনটা।
হিমি বললেন, সেই ভালো।
কখন অন্ধকার হয়েছে, সাঁঝ উত্তরে রাত গেছে বেড়ে, টেরও পায়নি। হিমি ধড়ফড়িয়ে উঠল। বাতি জ্বলল ঘরের। উনুনে আগুন দিতে গেল গুনগুনিয়ে।
১১। বেতনা নদীতে, কালীনগরের গঞ্জের ভেড়িতে শাবর করেছে আঠারো গণ্ডা নৌকা। মাছমারাদের নৌকা, সাঁই নিয়ে সমুদ্রে যায় তারা। অগ্রহায়ণ পড়ে গেছে। উত্তরে বাতাস বয়। পালে হাওয়া লেগে গেছে, ডাক দিয়েছে সমুদ্র। ঢেউ লেগেছে রাইমঙ্গল আর ঝিল্লের মোহনায়। কালীনগর গঞ্জ থেকে চাল ডাল নুন তেল যোগাড়যন্ত্র হয়েছে। সাঁইদারের অপেক্ষা।
—সাঁইদার কে?
—বিলেস। তেঁতলে বিলেস।
তেতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।

সাঁইদার মানে সরদার। বিলাস এখন সমুদ্রগামী বহরের সরদার। গঙ্গা সমুদ্রে মিলাল বিলাসের এই বহরের হাত ধরে। গঙ্গার দক্ষিণপ্রবাহী যাত্রার শেষ। সমরেশ বসু তো মাছমারার কাহিনী লিখতে চেয়েছিলেন, লিখেছেনও তাই, গঙ্গা নদী সেখানে এই উপন্যাসের যাত্রাপথ। ভাষার নাগরিকতা যেমন আছে, একই সঙ্গে বিলাসের গাওয়া যে-লোকগানগুলো এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আর্তি যা সেখানে যেন না-চাইতেই আছে এক রাবীন্দ্রিক-আবহ, কোথাও কোথাও শুধু শব্দচয়নের ব্যতিরেক ধরা পড়ে। অথচ এ কাহিনী কলকাতার, 'নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের এক বিপরীত আখ্যান' ঠিকই, আছে 'বাস্তবের তথ্যের কঠিন নিষ্ঠা' 'আছে মৃত্যু ও অস্তিত্বের সংগ্রামের এক মানবিক উপলব্ধি', কিন্তু কাহিনীর বাইরে কোথাও যেন ওই মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজকে মাথায় রাখার একবারে বাইরে দিয়ে যায়নি; যা *পদ্মা নদীর মাঝির* ক্ষেত্রে নেই, *তিতাস একটি নদীর নাম* তো নেই-ই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো ওই পাঠককুলের দিকে চেয়েও দেখেননি, কোনো সংযোগ রচিত হোক তাও চাননি, যদিও লেখাই ছিল তার জীবিকা। আর অদ্বৈত তার আয়ুর সীমানা এতটাই কম নিয়ে জন্মেছিলেন যে ওই উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছিল তার মৃত্যুর পরে, এর আগের অগ্রন্থিত, সাদা হাওয়া কিংবা *রাঙামাটি* বেরিয়েছিল *তিতাস একটি নদীর নাম* বিখ্যাত হওয়ার সূত্রে, নইলে ওই উপন্যাস দুটো কোনোদিন আমাদের সামনে আসত কি না এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বাংলা ভাষার তিনটি প্রধান উপন্যাস, আবার নদীকে কেন্দ্রে রেখে প্রধানতম উপন্যাসও এগুলো নিয়ে যে কথা তোলা হলো, তুলতে চেষ্টা করা হলো, সে তো এই জন্যে যে এমনতর প্রচেষ্টাগুলো চোখের সামনে থাকার পরও তা স্মারক হলো, কিন্তু ঐতিহ্য কেন হলো না; ফলে ইচ্ছাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলার সুযোগ আর নেই, লোক-ঐতিহ্য কেন হলো না। অথচ এই নদীমাতৃক দেশে নদী নিয়েই তো রচিত হতে পারত, হওয়া উচিত ছিল বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ লেখা; যেমন রবীন্দ্রনাথ রচিত বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম গল্পগুলোর কয়েকটিতে নদী আছে; গল্পে যতটুকু থাকলে চলে। কিন্তু উপন্যাস তো একেবারেই ভিন্ন শিল্পমাধ্যম। আরণ্যক যেমন দোসরহীন, *তিতাস একটি নদীর নাম* কাছাকাছি!

একটা বিষয় অবশ্য এখানে খুবই কৌতূহলকর যে এই উপন্যাসগুলো লেখার সময়ে লেখকেরা সবাই তিরিশের এপাশে-ওপাশে। যেন ওই জলময়তাকে শরীরী শক্তি দিয়েও বুঝে নিতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে কম বয়েসি *পূর্বাশায়* যখন পদ্মা নদীর মাঝি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তখন তিনি ছব্বিশ ছাড়িয়ে সাতাশে; এটি বই আকারে যখন বেরোয়, তার আটাশ। অপরাজেয় পৌরুষ তিনি সারাটা জীবন গদ্য রচনায় রক্ষার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পদ্মা নদী বা ওই তীরবর্তী কিংবা নদীর কাহিনীতে আর ফিরে যাননি। সেটি যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি পরিণত বয়সের সমরেশ বসুকে 'আর একটি গঙ্গা কেন লিখলেন না?' এমন অবান্তর প্রশ্ন করলে তিনি আসর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই লেখায় এগোতে এগোতে, এই কথা তো ঘুরপাক খেল, এমনকি মিখাইল শলোখভকে মাথায় রেখে (*প্রশান্ত দন*-এর প্রথম খণ্ড তার তেইশ বছর বয়সের রচনা) যে, নদীর গল্প অমন তারুণ্য ছাড়া রচিত হতে পারে না? খরস্রোতা কিংবা স্থির—সে যে নদীই হোক, জলের ছলছল তার স্রোতের টান গদ্যকে যে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা যৌবনকেই একমাত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব? প্রসঙ্গের প্রায় পাশ দিয়ে যায় তবু, সত্যজিৎ রায়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের কাহিনী নিয়ে তিনি ছবি করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবি করার ইচ্ছা হয়নি তার? উত্তর দিয়েছিলেন, *পদ্মা নদীর মাঝি* নিয়ে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একসময়ে মনে হয়েছে, এখন তার পক্ষে নৌকায় ওইভাবে ক্যামেরা ধরা সম্ভব নয়। আর গঙ্গা রাজেন তরফদারের, সম্ভবত প্রথম চলচ্চিত্র, অনেক পরে তিনি পালঙ্ক পরিচালনা করেছিলেন। চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গেই *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর চলচ্চিত্রায়ণে ঋত্বিক ঘটক সফল, যদি নিজে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার কাজটুকু আরো ভালোভাবে করে যেতে পারতেন!

তবে বাংলা ভাষায় এই প্রচেষ্টাকে বিস্মৃত হওয়াও চলে না। একদিকে নাগরিক উপন্যাসের ঝোঁক, পাঠকও সেদিকে, আর উপন্যাসকে হতেও হবে 'ইউরোপীয়', ইংরেজি অর্থে আধুনিক, সেখানে পদ্মা হোক কি গঙ্গা হোক কিংবা মেঘনা কি ভৈরব-কীর্তনখোলা সুরমা-কুশিয়ারা, তিস্তা-মহানন্দ-করোতোয়া কিংবা ব্রহ্মপুত্র—সেই জনজীবনকে ধরতে গদ্যের আর লোকজীবনের নদীকেন্দ্রিক পারম্পরাগত যে সন্ধান ঔপন্যাসিকের রপ্তও করতে হয়। সেই জীবন, শিক্ষিত জীবন তো অনেকখানিক দূরে ঠেলে দেয়। সেই অভিযাত্রার সহযাত্রী হওয়াও তো সবার সম্ভবত হয় না, যেমন চাইলেই গেয়ে-ওঠা কিংবা রচনা করা যায় না বাউল গান—সে এক ব্রত। বাউলানা জীবনযাপনেরই অংশ। হয়তো এখানে এই ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক আর ঔপন্যাসিক থাকেন না, কাহিনীকার তো ননই, বরং তিনি কথোয়াল কিংবা বয়াতি বা গায়েন। নৌকার পাল উড়িয়ে ভাটিয়ালি তো লোকজীবনেরই অংশ, সে গান কি আর স্টুডিওয় বাঁধার জিনিস। এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর সমরেশ বসু কথোয়াল কিংবা বয়াতি হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। আগামীতে সে ব্রতযাত্রা হয়তো সম্ভবই নয়। নদীও তো তার ভাষা বদলে ফেলেছে, বদলে গিয়েছে, নদী লুট হয়েছে; মৌসুমি বায়ু আজও প্রবহমান, কিন্তু যন্ত্র বদর বদর বলে বাদামখাটানো ভুলিয়ে দিয়েছে কিংবা করে ফেলেছে অপ্রয়োজনীয়। ফলে নদীজীবনের আখ্যান যদি আগামীতে রচিত হয়, যদি তা এই তিন মহা কথোয়ালের ভাষ্যকে চারিয়ে নতুন বয়াতির আবির্ভাব নিশ্চিতও করে বাংলা গদ্যভাষায়—সেদিন তা হবে অন্য নদীর গল্প। কিন্তু সেই কাহিনীকারকেও বারবার, সেই বয়ানে ফিরে দেখতে হবে এই তিন মহান গদ্যলেখকের প্রচেষ্টাকে! বাংলা উপন্যাসকে প্রকৃত আধুনিকতা দিতে কী অকুতোভয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁরা পাল খাটিয়েছিলেন!

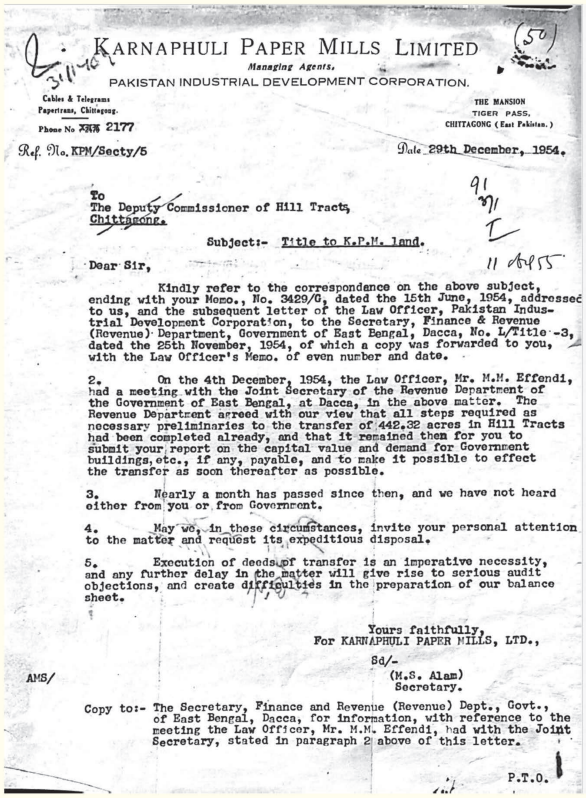

KARNAPHULI PAPER MILLS LIMITED
Managing Agents,
PAKISTAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION.

Cables & Telegrams
Papertrans, Chittagong.
Phone No 2177

THE MANSION
TIGER PASS.
CHITTAGONG (East Pakistan.)

Ref. No. KPM/Secty/5

Date 29th December, 1954.

To
The Deputy Commissioner of Hill Tracts,
Chittagong.

Subject:- Title to K.P.M. land.

Dear Sir,

Kindly refer to the correspondence on the above subject, ending with your Memo., No. 3429/G, dated the 16th June, 1954, addressed to us, and the subsequent letter of the Law Officer, Pakistan Industrial Development Corporation, to the Secretary, Finance & Revenue (Revenue) Department, Government of East Bengal, Dacca, No. L/Title -3, dated the 25th November, 1954, of which a copy was forwarded to you, with the Law Officer's Memo. of even number and date.

2. On the 4th December, 1954, the Law Officer, Mr. M.H. Effendi, had a meeting with the Joint Secretary of the Revenue Department of the Government of East Bengal, at Dacca, in the above matter. The Revenue Department agreed with our view that all steps required as necessary preliminaries to the transfer of 442.32 acres in Hill Tracts had been completed already, and that it remained then for you to submit your report on the capital value and demand for Government buildings, etc., if any, payable, and to make it possible to effect the transfer as soon thereafter as possible.

3. Nearly a month has passed since then, and we have not heard either from you or from Government.

4. May we, in these circumstances, invite your personal attention to the matter and request its expeditious disposal.

5. Execution of deeds of transfer is an imperative necessity, and any further delay in the matter will give rise to serious audit objections, and create difficulties in the preparation of our balance sheet.

Yours faithfully,
For KARNAPHULI PAPER MILLS, LTD.,
Sd/-
(M.S. Alam)
Secretary.

AMS/

Copy to:- The Secretary, Finance and Revenue (Revenue) Dept., Govt., of East Bengal, Dacca, for information, with reference to the meeting the Law Officer, Mr. M.H. Effendi, had with the Joint Secretary, stated in paragraph 2 above of this letter.

P.T.O.

কর্ণফুলী কাগজকল প্রকল্পের গোপন নথি, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস

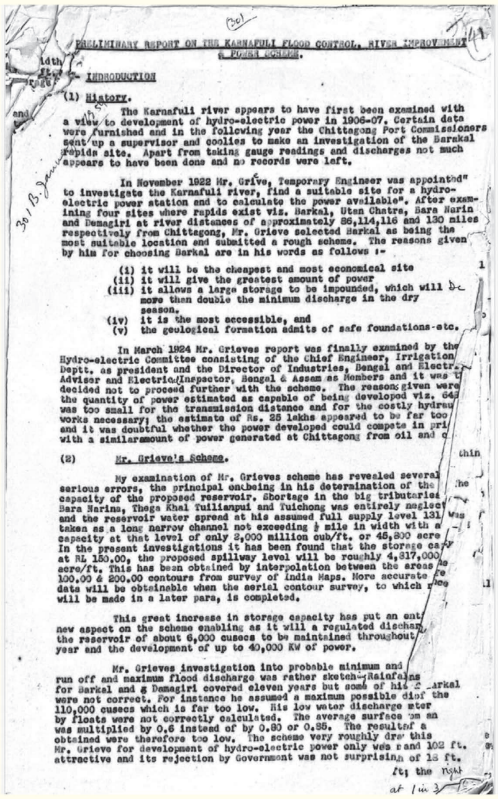

PRELIMINARY REPORT ON THE KARNAFULI FLOOD CONTROL, RIVER IMPROVEMENT & POWER SCHEME.

INTRODUCTION

(1) History.

The Karnafuli river appears to have first been examined with a view to development of hydro-electric power in 1906-07. Certain data were furnished and in the following year the Chittagong Port Commissioners sent up a supervisor and coolies to make an investigation of the Barakal Rapids site. Apart from taking gauge readings and discharges not much appears to have been done and no records were left.

In November 1922 Mr. Grieve, Temporary Engineer was appointed to investigate the Karnafuli river, find a suitable site for a hydro-electric power station and to calculate the power available". After examining four sites where rapids exist viz. Barkal, Utan Chatra, Sara Narin and Demagiri at river distances of approximately 86,114,116 and 130 miles respectively from Chittagong, Mr. Grieve selected Barkal as being the most suitable location and submitted a rough scheme. The reasons given by him for choosing Barkal are in his words as follows :-

(i) it will be the cheapest and most economical site
(ii) it will give the greatest amount of power
(iii) it allows a large storage to be impounded, which will be more than double the minimum discharge in the dry season.
(iv) it is the most accessible, and
(v) the geological formation admits of safe foundations-etc.

In March 1924 Mr. Grieves report was finally examined by the Hydro-electric Committee consisting of the Chief Engineer, Irrigation Dept. as president and the Director of Industries, Bengal and Electrical Adviser and Electric Inspector, Bengal & Assam as Members and it was decided not to proceed further with the scheme. The reason given were the quantity of power estimated as capable of being developed viz. 647 was too small for the transmission distance and for the costly hydrau works necessary; the estimate of Rs. 25 lakhs appeared to be far too and it was doubtful whether the power developed could compete in pri with a similar amount of power generated at Chittagong from oil and c

(2) Mr. Grieve's Scheme.

My examination of Mr. Grieves scheme has revealed several serious errors, the principal one being in his determination of the capacity of the proposed reservoir. Shortage in the big tributaries Sara Narins, Thegs Khal Tullangul and Tuichong was entirely neglect and the reservoir water spread at his assumed full supply level 131 was taken as a long narrow channel not exceeding ½ mile in width with a capacity at that level of only 2,000 million cub/ft. or 45,930 acre In the present investigations it has been found that the storage ca at RL 130.00, the proposed spillway level will be roughly 4,317,000 acre/ft. This has been obtained by interpolation between the areas 100.00 & 200.00 contours from survey of India Maps. More accurate da dats will be obtainable when the aerial contour survey, to which re will be made in a later para, is completed.

This great increase in storage capacity has put an ent new aspect on the scheme enabling as it will a regulated dischar the reservoir of about 6,000 cusecs to be maintained throughout year and the development of up to 40,000 KW of power.

Mr. Grieves investigation into probable minimum and run off and maximum flood discharge was rather sketchy-Rainfalls for Barkal and a Demagiri covered eleven years but some of his a arkal were not correct. For instance he assumed a maximum possible disc of the 110,000 cusecs which is far too low. His low water discharge ster by floats were not correctly calculated. The average surface ve sa was multiplied by 0.8 instead of by 0.80 or 0.85. The resultof a obtained were therefore too low. The scheme very roughly dra this Mr. Grieve for development of hydro-electric power only wea r and 102 ft. attractive and its rejection by Government was not surprising of 18 ft.

ft; the high at 1 in 3

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সরকারের গোপন নথি, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস

দেশ বিভাগ, উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ও বাঙালি সম্পর্ক

আজিজুল রাসেল

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগ বা ভারত ভাগ বিংশ শতাব্দীতে এ উপমহাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা। ভারত ভাগ হওয়ায় এ উপমহাদেশের নাম ভারতের বদলে দক্ষিণ এশিয়া ব্যবহার করা শুরু হয়। কারণ ভারত, পাকিস্তান নামে দুটি নতুন দেশের জন্ম হয়। এ দেশভাগ ছিল খুবই তাড়াহুড়ো করে। দেশভাগের কারিগররা ছিলেন দেশীয় অভিজাত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং ঔপনিবেশিক সরকার। সাধারণ মানুষ কিংবা ছোট নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগোষ্ঠীর মতামতের কোনো তোয়াক্কাই করা হয়নি এ দেশভাগে। কিন্তু এ উপমহাদেশের মানুষকে দেশভাগের প্রভাব বয়ে বেড়াতে হয়েছে বহুদিন ধরে।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ বাংলায়, পাঞ্জাব বা ভারত পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়ে মোটামুটি ভালোই গবেষণা হয়েছে। কিন্তু দেশ বিভাগ উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বাঙালি ছাড়া অন্য নৃতাত্ত্বিক বা ছোট জাতিগোষ্ঠীর ওপর কী রকম প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়ে প্রায় কোনো গবেষণা নেই বললেই চলে।

আমার বর্তমান প্রবন্ধে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব যে দেশ বিভাগ-পরবর্তী উত্তর-ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে দেশ বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল? সংখ্যালঘু বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর কী সম্পর্ক ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারত ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী

ভারত কিংবা বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের ওপরও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রভাব ফেলেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের অনুপ্রবেশের ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের সাধারণ জীবনযাত্রায় প্রথম বড় ব্যাঘাত ঘটে। বাংলায় মুঘল এবং নবাবী আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুঘল ও নবাবী শাসকদের তেমন প্রভাব ছিল না। তবে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশ বা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে আনার আগেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিরা ছিলেন। স্কটিশ সার্জন, পর্যটক ও বোটানিস্ট ফ্রান্সিস হ্যামিলটনের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ এবং এ-সংক্রান্ত বিবরণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সেখানে বসবাসকারী আদিবাসীদের সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। বুকানন পার্বত্য চট্টগ্রামের ঔপনিবেশিক শাসনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রায় ষাট বছর আগে সেখানে ভ্রমণ করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষদের নিয়ে নানা খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে বুকানন মার্মা, চাকমা, ম্রো, ছো, টিপেরা, বাঙালি, বার্মিজ এবং আরাকানিজসহ আরো অনেক মানুষের সাক্ষাৎকার নেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনি জুমচাষ নিয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেন। তবে বৃহৎ চট্টগ্রাম অঞ্চল সর্বপ্রথম ১৭৬০ সালে নবাব মীর কাসিম ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে হস্তান্তর করলেও তারও প্রায় এক শতক অব্দি পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের বাইরে ছিল। ১৮৬০ সালে প্রথম চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব বাড়তে থাকে। ১৮৭১ সালে প্রথম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে সার্কেলে বিভক্ত করেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে আনুষ্ঠানিকভাবে এর প্রশাসন ব্যবস্থায় যুক্ত করার পর থেকেই ক্রমে এ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমির ওপর অধিকার এবং চলাচল নিয়ন্ত্রিত করেন। আদিবাসী জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো স্থানীয় অস্ত্র বহন করা। এ অস্ত্র তারা বহন করে তাদের নিজেদের আহরণ ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন জারি হওয়ার পর এখানকার অধিবাসীদের দেশীয় বা অন্য কোনো অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসন পাহাড়ের অধিবাসীদের অন্যতম সুবিধাজনক চাষাবাদ জুমচাষও নিয়ন্ত্রিত করে। ঔপনিবেশিক সরকার জমিতে বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকার আইন অস্বীকার করে। ঔপনিবেশিক আইনগুলোর মধ্যে বন আইন সবচেয়ে শোষণমূলক। এ বন আইনের মাধ্যমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার আদিবাসীদের সংরক্ষিত বনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। এটি আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার ওপর খুব মারাত্মক প্রভাব ফেলে। আদিবাসীরা বহু বছর ধরে মাছ, পাখি, পশু শিকার এবং বাঁশ ও কাঠ কাটার মাধ্যমে যে জীবিকা নির্বাহ করত তা ব্যাহত হয়।

ইতিহাসবিদ নিলাদ্রী ভট্টাচার্য যেমনটা তার দ্য গ্রেট এগ্রিরিয়ান কনকোয়েস্ট গ্রন্থে দেখিয়েছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় উপমহাদেশ এক ধরনের কৃষি ঔপনিবেশিকীকরণ ঘটেছিল যাকে তিনি বলছেন দ্য গ্রেট এগ্রিরিয়ান কনকোয়েস্ট। নিলাদ্রী ভট্টাচার্যের কাজ মূলত পাঞ্জাব নিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কীভাবে পুরুষতান্ত্রিক উপায়ে পাঞ্জাব ও ব্রিটিশ ভারতের অনেক জায়গায় কৃষির সীমা বাড়িয়েছে। আর এ কৃষি সীমা বাড়ানোর সাথে সাথে ঔপনিবেশিক প্রশাসন উচ্ছেদ করেছে পশুচারণকারী, যাযাবর ও বনে বাস করা মানুষদের। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার সমতল জায়গার মতো অসমতল বা বনাঞ্চল পরিষ্কার করেও ঘটাতে চেয়েছিল কৃষির বিস্তার। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আওতায় আবার আরেকটা ডিপ কনকোয়েস্টের মতোই এ অঞ্চলে তাদের নিয়ম আদিবাসী পাহাড়ি জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এরই অংশ হিসেবে করা হয় সংরক্ষিত বন। সংরক্ষিত বনে আদিবাসীদের প্রবেশ নিষেধসহ জুমচাষে নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল ঔপনিবেশিক সরকার। ক্রিমিন্যাল ট্রাইব অ্যাক্ট করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক আদিবাসীকে। যদিও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন অ্যাক্ট এ অঞ্চলে অনুমতি ছাড়া অধিবাসীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করাসহ ব্যক্তিগতভাবে ২৫ একরের বেশি জমি অধিকার করা নিষিদ্ধ করা হলেও ডেপুটি কমিশনার এবং প্রশাসনকে অনেক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯৪৭ সালের দেশভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও এর আদিবাসীদের ওপর ব্যাপক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। ভারত ভাগ ও এই উপমহাদেশে সীমান্ত তৈরি সুনির্দিষ্ট আইন মেনে হয়নি। ভারত বিভাগ বহু আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল না। জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের প্রথম দিককার প্রস্তাবে ভারত যেভাবে ভাগ হয়েছে আসলে সেভাবে ভাগ করার কথা ছিল না। অনেক ইতিহাসবিদ, যেমন আয়েশা জালাল তার গ্রন্থ *দ্য সোল স্পোকসম্যানে* বলেছেন, ভারত বিভাগ প্রস্তাব ছিল জিন্নাহর একটি বার্গেইনিং টুল। কেউ কেউ বলছেন জিন্নাহ আসলে টেরিটোরিয়াল ডিভাইড চাননি প্রথম দিকে। যেমন, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তার *রিমেম্বারিং পার্টিশন : ভায়োলেন্স, ন্যাশনালিজম অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া* গ্রন্থে দেখিয়েছেন জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ প্রথমে চেয়েছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান তৈরি করা যা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় একটি ভারসাম্য তৈরি করবে। এই চিন্তাভাবনায় মানুষের ভৌগোলিক স্থানান্তরের দরকার ছিল না। ইতিহাসবিদ ডেভিড গিলমার্টিনের গবেষণা থেকেও দেখা যায় মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তি দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল মূলত জাতীয়তাবাদের নন-টেরিটোরিয়াল কল্পনা।

১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতকে একটি বিকেন্দ্রিক ফেডারেশন করার পরিকল্পনায় তখনকার ভারতের শীর্ষ দুই দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ সম্মত হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি হলে ক্যাবিনেট মিশনের ঐকমত্য অনুযায়ী ফেডারেশন করার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। প্রদেশকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা এবং মুসলমানদের অনেক ক্ষমতা পাওয়ার আশঙ্কায় ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা থেকে সরে আসে কংগ্রেস। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে পালন করার ঘোষণা দেয়। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে পালন করার দিনে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। কয়েকদিন ধরে চলে এ সংঘর্ষ। সংঘর্ষে সরকারি হিসাব মতেই মারা গিয়েছিলেন ৫ হাজারের বেশি নারী-পুরুষ ও শিশু। তবে বেসরকারি হিসাব মতে, এ সংখ্যা বিভিন্ন রকম। অনেকেই মনে করেন 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ে' প্রায় দশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ যেমন ব্রিটিশ সাংবাদিক টায়া জিনকিনের মতে, ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রায় তিরিশ হাজারের মতো মানুষ। কলকাতা দাঙ্গায় মারা যাওয়া ষাট শতাংশের বেশি ছিল মুসলমান। উদ্বাস্তু হয়েছিলেন প্রায় এক লাখ মানুষ। কলকাতার দাঙ্গার পরপরই নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাব, করাচি এবং দিল্লিসহ তৎকালীন ভারতের সব জায়গার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ মিলিয়ে দেশ বিভাগ দাঙ্গায় প্রায় ১০ লাখের ওপর মানুষ মারা গিয়েছিলেন আর উদ্বাস্তু হয়েছিলেন প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ থেকে দুই কোটি মানুষ। অপহরণ করা হয়েছিল প্রায় ৫০ হাজার নারী। এভাবে দাঙ্গা শুরু ও ছড়িয়ে পড়ার পর ভারতীয় উপমহাদেশের সব পক্ষের নেতা এবং মাউন্ট ব্যাটেনসহ ব্রিটিশ উপনিবেশের অধিবাসীদের সাথে বসে দ্রুত দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৪৭ সালের জুনের ৩ তারিখে মাউন্ট ব্যাটেন আনুষ্ঠানিকভাবে দেশভাগের

পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের জুনে জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, জেবি কৃপালিনী, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, আব্দুর রব নিসার ও শিখ নেতা মাস্টার তারা সিং পার্টিশন প্ল্যান মেনে নেন। গঠন করা হয় বাউন্ডারি কমিশন। প্রকাশ করা হয় র‍্যাডক্লিফ লাইনের প্রস্তাবিত সীমান্ত। এই পুরো প্রক্রিয়াই ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমান এবং শিখ সম্প্রদায়ের নেতাদের মতামত নেয়া এবং তাদের যুক্ত করা হলেও মতামত নেয়া হয়নি ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর। অথচ সীমান্ত রেখা টানা ছিল আদিবাসীদের জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সীমান্ত রেখা টানায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর বড় প্রভাব ফেলেছিল। যদিও দেশভাগ দাঙ্গায় আদিবাসীদের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তারপরও দেশভাগ এবং নতুন সীমান্ত তৈরিতে বাংলা সীমান্তে আদিবাসীরা ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুদেশের মধ্যে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী লুসাই, চাকমাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল নবগঠিত ভারত রাষ্ট্রের লুসাই, চাকমা এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে। দেশভাগে সীমান্ত নির্ধারণের জন্য গঠিত বাউন্ডারি কমিশন হিন্দু-মুসলমান সব পক্ষের কথা শুনলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কথা শোনেননি। ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনজন চিফম্যান বা গোত্রপ্রধান বাউন্ডারি কমিশনের সদস্যদের সাথে দেখা করেন। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতা চান। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তারা দাবি জানান তাদের দ্বিতীয় পছন্দ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে যেন ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু দেশভাগের পর তারা বিস্মিত হন। তারা দেখতে পান পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পাকিস্তানের মধ্যে, আরাকান হিল ট্র্যাক্টস বার্মার মধ্যে আর টিপেরা ও লুসাই হিল ভারতের মধ্যে।

বাঙালি-আদিবাসী সম্পর্ক : উত্তর-ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী

নবগঠিত উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কাছে যে রকম বিবেচিত হতো, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সঙ্গে সেভাবে ব্যবহার করা হত। পাকিস্তান আমলে আদিবাসীদের প্রায় একইরকম কলোনিয়াল সাবজেক্ট আকারেই দেখা হত। অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর শোষণ-নিপীড়ন এবং প্রান্তিকীকরণ বেড়েছিল। পাকিস্তান তৈরি হবার পর থেকেই একটা আলোচনা উঠেছিল যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আর ট্রাইবাল এলাকা হিসেবে রাখা হবে কিনা? পূর্ব পাকিস্তান আমলাদের অনেকেই মত দিয়েছিলেন নানা কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবাল স্ট্যাটাস উঠিয়ে দেয়া উচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবাল স্ট্যাটাস রদ করার পক্ষে মত দিতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আমলারা কথা বলতেন ঠিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলাদের মতো। পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবাল স্ট্যাটাস রদ করা হবে, না হবে না—এ সম্পর্কে এক আমলার মতামত শুনলেই ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হবে। গোপন নথিতে ওই আমলা মতামত দেন—

> Although Considerable enlightment is slowly creeping intro tribal life, The bulk of the population continue passionately adhere to old tribal laws, customs and traditions, handed down from generation to generation, which even today largely regulate their pattern of living. An overwhelming majority still live in a world of their own and have little in common with the people inhabiting the rest of the country. They have Compressed across the border with whom they have far greater ethnical affinity and even though the lure from outside is greater, they have mostly struck to their old home life because their old way of life has not been disturbed. The tribals are yet incapable of comprehending political or other fundamental rights. Nonetheless, they enjoy in quite a large measure, all the fundamental rights exercisable by persons elsewhere in the country.

পার্বত্য চট্টগ্রামকে ট্রাইবাল এলাকার ক্যাটাগরি থেকে বাদ দেয়ার এ প্রস্তাবের ওপর মতামতে পূর্ব পাকিস্তানের এই আমলা বলেন যে, যদিও ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ট্রাইবাল জীবনে আলোকায়ন ঘটেছে, কিন্তু এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা খুবই নিষ্ঠার সাথে পুরনো ট্রাইবাল আইন, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য মেনে চলেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই আইন রীতিনীতি এবং জীবনাচারকে এখনো নিয়ন্ত্রণ করে। এদের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ এখনো তাদের নিজেদের জগতে বাস করেন। এবং দেশের অন্যান্য জনগণের সঙ্গে তাদের একবারেই সাদৃশ্য নেই। সীমান্তের ওপারে বাস করা মানুষদের সাথেই তাদের বেশি নৃতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য রয়েছে। যদিও বাইরের বিশ্ব থেকে অনেক বেশি হাতছানি রয়েছে, কিন্তু তারা বদ্ধ ঘরেই নিজেদের মতো পুরনোকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। কারণ তাদের পুরনো জীবনধারায় এখনো কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি।

তার মতে, এখনো এই ট্রাইবাল মানুষেরা নিজেদের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে বুঝতে অক্ষম। তার মতে তারপরও এসব মানুষরা দেশের অন্যান্য মানুষের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো ভোগ করছে। এই আমলার কথা শুনে মনে হবে বিংশ শতাব্দীর কোনো পণ্ডিত ভারত নিয়ে কথা বলছেন। কিংবা মনে হতে পারে হেগেলই কথা বলছেন ভারত নিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এডওয়ার্ড সাঈদ যেমনটা দেখিয়েছেন পশ্চিমারা প্রাচ্যের মানুষের প্রতি যেভাবে মনোভাব পোষণ করে এবং যেভাবে প্রাচ্যের মানুষকে তাদের মতো করে নির্মাণ করে সে রকম। সাঈদ যেটাকে তত্ত্বায়ন করেছেন ওরিয়েন্টালিজম নামে। বলা হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে The Chittagong Hill Tracts Regulation করা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা মর্যাদা দেয়ার জন্য। এই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি 'Excluded Area' করা হয় যার মাধ্যমে এ অঞ্চলে বাঙালিদের প্রবেশ সীমিত করা হয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের শুরু থেকেই অনেক বাঙালি কারবারি এ অঞ্চলে চলে এসেছিল। তারাই মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল বটে। তবে বাঙালিদের অবাধ এই কর্তৃত্ব ব্রিটিশ প্রশাসনের আধিপত্যকে খাটো করার ঝুঁকি তৈরি করেছিল। এটা ঠিক এই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের অবাধ প্রবেশ কমানো গিয়েছিল। তবে ইতিহাসবিদ ভেলাম ফান শেন্ডেলের মতে, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য আদিবাসীদের 'ট্রাইবাল' অধিকার রক্ষা করা ছিল না বা এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে চায়নি। এই রেগুলেশন অ্যাক্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এই অঞ্চলের বাইরের ব্যবসায়ীদের সাথে দরকষাকষির সুযোগ বন্ধ করে সরাসরি ব্রিটিশ প্রশাসকদের অনুগত করা। যা-ই হোক এরপরও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা মনে করেন CHT Regulation, 1900 নানাভাবে তাদের সুরক্ষা দিত। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ১৯৬৪ সালে CHT Regulation, 1900 রদ করা হয়। এরপর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাভাষীসহ অন্যদের আগমন বেড়ে যায়। অবশ্য পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই এই অঞ্চলে বাংলাভাষী এবং উর্দুভাষী মানুষের প্রবেশ আরো ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। দেশ বিভাগের সাথে সাথেই বিপুলসংখ্যক বাঙালি এবং অবাঙালি মুসলমান পূর্ববঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে আসতে শুরু করেন। দেশ বিভাগের ফলে প্রায় ১৮ লাখ মানুষ পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসেন। এ বিপুলসংখ্যক মানুষকে জায়গা দেওয়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জন্য ছিল বড় একটি চ্যালেঞ্জ। উদ্বাস্তু হয়ে আসা মোহাজেরদের একটি অংশকে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়। নিঃসন্দেহে এটি পূর্ব পাকিস্তান সরকার এবং বিশেষ করে বাঙালিদের প্রতি আদিবাসীদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যদিও পুনর্বাসিত মোহাজেরদের একটা বড় অংশ ছিল উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমান। তারপরও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা এদেরকেও বাঙালি ঠাহর করত।

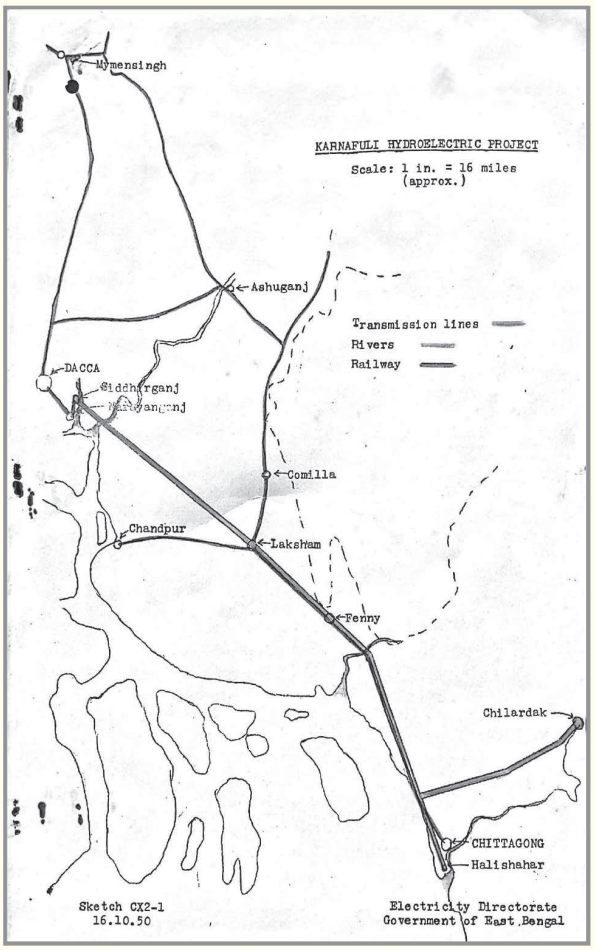

কর্ণফুলী জলবদ্যুৎ প্রকল্পের মানচিত্র, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস

কাপ্তাই বাঁধ ও আদিবাসী উচ্ছেদ

আরেকটি বড় ঘটনা যেটি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে বাঙালি সম্পর্কে ক্ষোভের তৈরি করেছিল তা হলো কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের একটি বড় অংশকে তাদের বসতবাড়ি এবং কৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হয়েছিল। আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের দুই অংশেই শিল্পায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নিতে থাকে পাকিস্তান সরকার। এত ব্যাপক শিল্পায়নের জন্য যে রকম জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ দরকার পাকিস্তানের দুই অংশের কোনোটাতেই তা ছিল না। সরকারি নথিপত্র দেখলে লক্ষ্য করা যাবে যে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি সংকটের কারণে প্রায়ই কারখানাগুলোকে বন্ধ রাখতে হতো। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের একটি তাৎক্ষণিক ও দারুণ পছন্দ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইতে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। কারণ পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যেই জানত পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের সম্ভাবনা ইতিপূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার যাচাই করে দেখেছিল। সেসব অনুসন্ধান প্রতিবেদনও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছে ছিল। ১৯০৬-০৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণের জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার সেখানে পরিদর্শনে যায়। তবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের প্রথম সেই পরিদর্শন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। এরপর ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে জলবিদ্যুৎ বাঁধের জন্য উপযুক্ত স্থান যাচাই-বাছাই করার জন্য ব্রিটিশ প্রকৌশলী গ্রিভকে নিযুক্ত করেন। প্রকৌশলী গ্রিভ তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন এবং তৎকালীন বাংলা প্রাদেশিক সরকারের কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেন। গ্রিভের প্রতিবেদনে দেখা যায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে প্রায় ২৮,০০০ থেকে ৪০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সালে পূর্ববঙ্গ সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট প্রকৌশলী ই মুরের নেতৃত্বে আরো ব্যাপক অনুসন্ধান করা হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তখন আবহাওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের একেবারে শেষ ধাপে ছিল। বাংলা প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন কলকারখানায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিল এবং বাঁধ নির্মাণের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর রূপরেখা ও আনুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করে ফেলেছিল। তবে ১৯৪০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশভাগের ডামাডোল এসব কারণে যথাসময়ে প্রকল্পটি এগিয়ে নিতে পারেনি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পূর্ব পাকিস্তান সরকার তড়িঘড়ি করে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি শুরু করে। ১৯৫১ সালের জুনে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ইউএসএআইডি থেকে একটি বড় অংকের সহযোগিতা পায়। তখন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় প্রকল্পটি ১৯৬০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে। লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি বর্ষাকালে গড়ে ৪০,০০০ কিলোওয়াট এবং অন্যসময়ে গড়ে ২০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। রাঙ্গামাটির কাপ্তাইতে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগেছিল প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে।

তবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালালেও যেসব আদিবাসী মানুষ এ অঞ্চলে বসবাস করছিলেন তাদের কোনো পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমনকি প্রকল্পের কাজ শুরু করার আগে আদিবাসীদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানওনি। তবে সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগ ভালো করে জানত যে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটির কাপ্তাইতে জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ১৯৫০-এর দশকে পাকিস্তান সরকারের আমলাদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সদরদপ্তর স্থাপনের আলোচনা চলছিল। তবে কাপ্তাইতে জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে একটি বিস্তৃত অঞ্চলে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং পরিবেশগত বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনার ফলে অনেক আমলাই তখন রাঙ্গামাটির কাপ্তাইতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর দপ্তর স্থাপনের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসকরা তখন বাঁধ নির্মাণের পর বড় আকারের সহিংস বিক্ষোভেরও আশঙ্কা করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তারা তখন এটা অবহিত ছিলেন যে বাঁধ নির্মাণের ফলে অনেক ভূমি প্লাবিত, বন্যা এবং অনেক আদিবাসী মানুষ বাস্তুচ্যুতিই হবে না বরং তাদের জীবন-জীবিকাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকার ওই এলাকায় সম্ভাব্য খাদ্য ঘাটতি সম্পর্কেও অবহিত ছিল। তা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী মানুষের পুনর্বাসন পরিকল্পনাগুলো ছিল খুবই অপ্রতুল এবং অবাস্তব। যেমন পূর্ব পাকিস্তানের ওয়াপদার তৎকালীন চেয়ারম্যান অবাস্তব পরামর্শ দিয়েছিলেন :

> There is no need to settle the affected persons on flat land in order to enable them to undertake plough cultivation of paddy and other food crops. They should be settled on the steep slopes of hills where they can grow fruit trees and tea and earn enough money to live. Food can be imported for them either from the rest of the province (or from abroad if necessary and they can live quite happily and comfortably.

['ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সমতল ভূমিতে পুনর্বাসন করার কোনো দরকার নেই। তাদের ধান এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ করারও দরকার নেই।

চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (১৯৩৩—২০১২)

ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাহাড়ের ঢালে বসতি স্থাপন করা উচিত। সেখানে তারা ফলের গাছ এবং চা চাষ করতে পারবেন এবং জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারবেন। প্রদেশের অন্য জায়গা থেকে অর্থ প্রয়োজন বিদেশ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য খাদ্য আমদানি করা যেতে পারে।'.

সরকারের গোপন প্রতিবেদনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছিলেন যা কিছুই ঘটুক না কেন তারা পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন না গোপন প্রতিবেদন উল্লেখ করে :

> The chief secretary feels that the rehabilitation plans and programme already settled and approved need not to undergo any material change or disruption, except that care should be taken to avoid constructing any valuable installations (V.I) such as tarred or concrete roads, model town, official headquarters or otherwise hospitals, schools or colleges, Rajbari of Chakma chief and so on below the level upto which water would rise in the event of high flood when the dam is ultimately raised another 13 ft...

'চিফ সেক্রেটারি মনে করেন ইতিমধ্যেই পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি ঠিক হয়ে গেছে এবং অনুমোদিত। পরিকল্পনায় আর কোনো বড় পরিবর্তন বা বন্ধ করার দরকার নেই। শুধু এটা মাথায় রাখতে হবে যে এখানে আর কোনো মূল্যবান স্থাপনা যেমন কার্পেটের রাস্তা, মডেল টাউন, বা অফিসিয়াল হেড কোয়ার্টার যেন না করা হয়। কারণ হাসপাতাল, স্কুল অথবা কলেজ, চাকমা চিফের রাজবাড়ী এবং আরো কিছু ইতিমধ্যেই পানির স্তরের নিচে থাকবে। আর যদি করা হয় তাহলে পানি আরো ১৩ ফুট উপরে উঠবে।'.

কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য একটি বড় আঘাত কাপ্তাইতে কর্ণফুলী নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের এক লাখেরও বেশি আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হন. যা এই অঞ্চলের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে সরকারের নির্ধারিত পুনর্বাসন স্থানগুলোর অনেকগুলোই ডুবে যায় তখন প্রায় ৪০,০০০-এরও বেশি আদিবাসী মানুষকে দেশ ছেড়ে ত্রিপুরা, আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাহলে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ বাঁধ হওয়ার পর যে আরো জায়গা প্লাবিত হতে পারে সরকার কি এটা জানত না? অবশ্যই সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এটি জানত এ বিষয়ে তারা নীরব ছিল সরকারের গোপন প্রতিবেদন থেকেও এ বিষয়ে জানা যায় :

> The 10,000 acres of flat land reserved in Kassalang for rehabilitation shall also go under water which means that rehabilitation work in this region must stop. There is no question of planning model town there. It is scheduled to be taken up next year... There should be no rehabilitation below 133 R.L. Major portion of the rehabilitation area so far explored and discovered by us and allotted is below 133 R.L... All these have been abandoned. The vast plain between Mahalchari and Panchari will go under water and has to be abandoned.

'কাসালাংয়ে পুনর্বাসনের জন্য সংরক্ষিত ১০,০০০ একর জমিও পানির নিচে চলে যাবে। তারমানে এই এলাকায় পুনর্বাসন কাজ বন্ধ করতে হবে। এখানে মডেল টাউন তৈরি করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এটা পরের বছর করা যেতে পারে... ১৩৩ আরএলের নিচে কোন পুনর্বাসন প্রকল্প করা ঠিক না। প্রায় বেশির ভাগ পুনর্বাসন এলাকা খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং আমাদেরকে ১৩৩ আরএলের নিচের জায়গা দেয়া হয়েছে। এ সবগুলোই পরিত্যক্ত করা হয়েছে। মহালছড়ি এবং পানছড়ির বিস্তৃত সমতল ভূমিও তলিয়ে যাবে এবং পরিত্যক্ত করতে হবে।'.

দেশভাগের পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালে আর শেষ হয় ১৯৬২ সালে আবাদযোগ্য জমির একটা বড় অংশ কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে ডুবে যায়. যা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে উর্বর ভূমি অনুমান করা হয় কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৪০ শতাংশ কৃষিজমি ডুবে গিয়েছিল এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী চাকমা রাজার ঐতিহ্যবাহী বাড়িটাও ডুবে যায় নিঃসন্দেহে এটি চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের জন্ম দেয় এছাড়া বিপুলসংখ্যক আদিবাসী মানুষের জীবিকা হুমকিতে পড়ায় আদিবাসীদের বাঙালিদের প্রতি একটি ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল কারণ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে তদারকি কাজের সাথে যুক্ত ছিল বাঙালিরা সরকার সেভাবে কোনো পুনর্বাসন কাজ করেনি বলেই চলে সরকারি গোপন নথি থেকে দেখা যায় যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অসুবিধা নিয়েও পরিকল্পকদের মধ্যে বিশদ আলোচনা হয়েছে :

> It is impossible to alter the rehabilitation plans so drastically as such short a notice without taking the people into confidence and the psychological effects of these changes are going to be colossal and catastrophic. The coffer dam has been closed and next year water will rise up to 120 ft... People have therefore, got to be evacuated somewhere. Even if they are settled on steep hill slopes and persuaded to grow fruit trees and tea, the scheme is not likely to take shape and be approved and commenced for another two years and will begin yield results only after 7 or 8 years. During this period a population of nearly a lakh and a quarter of persons (300 sq. miles of a most densely populated area)

'মানুষের আস্থা সৃষ্টি না করে এত অল্প সময়ে তাড়াহুড়ো করে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া অসম্ভব। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসবে তা গভীর ও বিপর্যয়করভাবে মানুষের ওপর মানসিক প্রভাব ফেলবে। কর্ণফুলী ড্যামটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে পরের বছর ১২০ ফুটের

ওপর পানি উঠবে। এর ফলে মানুষকে অন্য কোথাও সরাতে হবে। যদিও তাদের পাহাড়ের ঢালে উঁচু জায়গায় সরানো হয় এবং ফল গাছ ও চা গাছ লাগানোয় তাদের রাজি করা যায়, তারপরও দুই বছরের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এটা করতে গেলে অন্তত ৭ বা ৮ বছর লাগবে।']

কর্ণফুলী কাগজ কল ও আদিবাসী উচ্ছেদ

পার্বত্য চট্টগ্রামে জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান সরকার আরো বড় একটি প্রকল্প করে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছিল। এটি হলো চন্দ্রঘোনায় কাগজের কল নির্মাণ। ১৯৫০-এর দশক এ দুটি উন্নয়ন প্রকল্পপের—একটি কর্নফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং আরেকটা কর্ণফুলী কাগজকল—ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দ্বিগুণ আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। দুটি প্রকল্পই বিপুলসংখ্যক আদিবাসীকে বাস্তুচ্যুত করেছিল এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন বিভাগের এই জমি অধিগ্রহণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চট্টগ্রামের কমিশনারকে লেখা তার চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

> The Development Department of the Government of Pakistan have [has] been negotiating with me for some time for land in Chandraghona for a Paper Mill. Their requirements were vastly more at the end than they were expected they were expected to be at the outset. In fact, when the commissioner and I visited the area last year we thought they would need practically one-quarter of what they now demand. I offered then double of the original area; but they wanted the whole, which included the bazar, a supplies Godown, the Police Station, the Post Office, the C and W.D., an Inspection House and a number of private dwellings and fields. In fact, they demanded the whole of Chandraghona excluding the Baptist Mission Hospital.

['পাকিস্তান সরকারের উন্নয়ন বিভাগ কিছুদিন ধরেই আমার সাথে চন্দ্রঘোনার একটি কাগজ কলের জমির জন্য আলোচনা করেছে। এখানে তারা যে পরিমাণ জমি চেয়েছিল পরবর্তী সময়ে ওই চাহিদা আরো বেড়ে গিয়েছিল। আসলে গত বছর কমিশনার এবং আমি তাদের প্রস্তাবিত জায়গা পরিদর্শন করেছিলাম। আমরা যে পরিমাণ জায়গা, তাদের দেব ভেবেছিলাম, তা তাদের বর্তমান দাবির চার ভাগের এক ভাগ। আমি তাদেরকে তাদের প্রথমিক দাবির দ্বিগুণ জায়গা দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা এখন পুরো জায়গাটা চায়। এর মধ্যে বাজার রয়েছে, একটি সাপ্লাই গোডাউন রয়েছে, পুলিশ স্টেশন, পোস্ট অফিস, সিএনডব্লিউডি, একটি ইনস্পেকশন হাউজ এবং মানুষের বসতবাড়ি ও ফসলের খেত। আসলে তারা শুধু ব্যাপ্টিস্ট মিশন হাসপাতাল ছাড়া পুরো চন্দ্রঘোনাই দাবি করেছে।']

কর্ণফুলী কাগজ কল কর্তৃপক্ষ যে বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করেছিল চন্দ্রঘোনায় তার কোনো যথাযথ ক্ষতিপূরণ তারা দেয়নি। এই প্রকল্প বিপুলসংখ্যক আদিবাসীকে তাদের বসতবাড়ি এবং জুমিয়াদের তাদের উর্বর জুম জমি থেকে উচ্ছেদ করে। এই দরিদ্র আদিবাসীদের সঠিক কোনো পুনর্বাসন করা হয়নি। কর্ণফুলী কাগজকল কর্তৃপক্ষ শুধু একটা নামে মাত্র পরিমাণ অর্থ দিয়েছিল 'ট্রাইবাল' চিফকে। কিন্তু জুমিয়ারা কোনো ক্ষতিপূরণ পায়নি। এছাড়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের লেবার কমিশনার কর্ণফুলী কাগজ কল কর্তৃপক্ষ বলে দিয়েছিলেন, তারা যেন কোন ভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মিলে চাকরি না দেয়। সরকার সে সময় এই চন্দ্রঘোনায় যাতে আরো শোষণ চালাতে পারে এজন্য চন্দ্রঘোনাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অচিরেই চট্টগ্রাম জেলার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

যেটা উল্লেখ করেছিলাম, দেশ বিভাগের পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান হওয়ার পরই একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বা বাঙালি ও উর্দুভাষী মুসলমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি গেড়েছেন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। এদের অনেকে গিয়েছিলেন দেশভাগের পর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি এবং উর্দুভাষী মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকায় সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাঙালিদের সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। এছাড়া কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু হলেও আদিবাসীরা ১৯৫০-এর দশকেই বিক্ষোভ করেন। তখন থেকেই কাপ্তাই বাঁধ এলাকা এবং কর্ণফুলী পেপার মিল এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনার তখন আদিবাসীদের 'রাষ্ট্র ও পাকিস্তান বিরোধী' কাজের আশঙ্কা করে কর্ণফুলী পেপার মিলের অপারেটিভ ডিরেক্টর খুরশিদ আলীকে লিখেছিলেন...

> Deputy Commissioner's office
> Rangamati
> 24th September, 1952
>
> My dear khurshid Ali,
> *I believe a large number of officers and men are going to be recruited in different departments of your mill very soon. You know recently, specially after Rangamati Rajbari shooting incident case, many of the chakmas of the hill Tracts, particularly the students are inducing in various shorts of subversive activities and anti-Pakistan propaganda. We have records of those activities and by this time know who are taking the leading parts. We have also got reports that they planned to spread thief subversive activities within the paper mills and within Kaptai Hydro-Electric Project areas. In the circumstances may I request you to be so good as to see that hillmen candidates, specially the chakmas be not recruited in your mills without prior reverenced in your mills wihtour prior reference to me & to the S.P., Chittagong Hill Tracts.*
>
> Your Sincerely
> Sd/- A Sobhan

> [জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
> রাঙ্গামাটি
> ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২
>
> আমার প্রিয় খুরশিদ আলী
> *আমি বিশ্বাস করি খুব দ্রুত আপনার মিলের বিভিন্ন বিভাগে অনেক অফিসার এবং কর্মী নিয়োগ দেয়া হবে। আপনি জানেন সম্প্রতি, বিশেষ করে রাঙ্গামাটি রাজবাড়িতে গুলি চালানোর পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক চাকমা, বিশেষ করে ছাত্ররা নাশকতামূলক কার্যকলাপ এবং পাকিস্তানবিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত হচ্ছে। আমাদের কাছে এই কার্যকলাপের রেকর্ড আছে এবং এখন আমার জানি কারা এই কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা এ রকম রিপোর্টও পেয়েছি যে তারা কাগজ কল এবং কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকায় নাশকতামূলক কার্যকলাপ ছড়িয়েদেবার পরিকল্পনা করেছিল। এমতাবস্থায় আমি কি আপনাকে বিনয়পূর্বক অনুরোধ করতে পারি যে বিশেষ করে চাকমাদের আমার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের এসপির রেফারেন্স ছাড়া নিয়োগ দেবেন না।*
>
> আপনার একান্ত
> এসডি/- এ সোবাহান]

১৯৫২ সালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনায় বোঝা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বাঙালি সম্পর্ক কেমন ছিল বা কতটা। দেশ বিভাগের পর থেকেই বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে উপরে আলোচিত কারণে বাঙালি ও আদিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫২ সালে চাকমা মেয়ে অমীয় বালার সাথে বাঙালি ছেলে মাকতুল হুসেইনের প্রেম হয় এবং তারা পালিয়ে বিয়ে করেন। অমীয় বালা মুসলমান হয়ে নাম নেন হাজেরা। এতে অমীয় বালার বাবা জয় মঙ্গল চাকমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠী বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অমীয় বালার বাবা চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের কাছে নালিশ করেন এবং চাকমা রাজার সহযোগিতায় অমীয় বালাকে

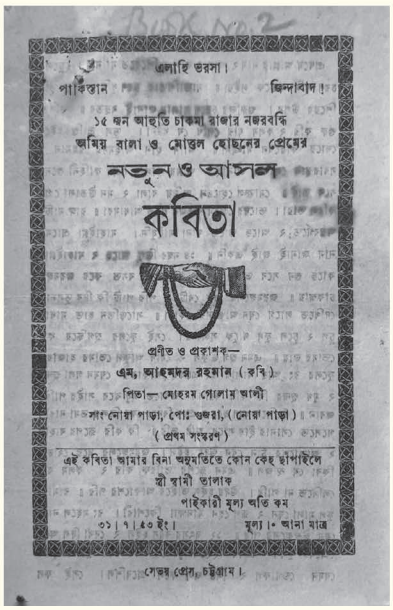
এলাকা ভরসা।
পাকিস্তান জিন্দাবাদ!
১৫ জন আহুতি চাকমা রাজার নজরবন্দি
অমিয় বালা ও মোক্তল হোছেনের প্রেমের
নতুন ও আসল
কবিতা
প্রণীত ও প্রকাশক—
এম, আহমদর রহমান (কবি)
পিতা— মোহরম গোলাম আলী
সাং নোয়া পাড়া, পোঃ গুজরা, (নোয়া পাড়া)।
(প্রথম সংস্করণ)
এই কবিতা আমার বিনা অনুমতিতে কোন কেহ ছাপাইলে
যা স্বামী তালাক
পাইকারী মূল্য অতি কম
৩১। ৭। ৫৩ ইং। মূল্য ।০ আনা মাত্র
সেভয় প্রেস, চট্টগ্রাম।

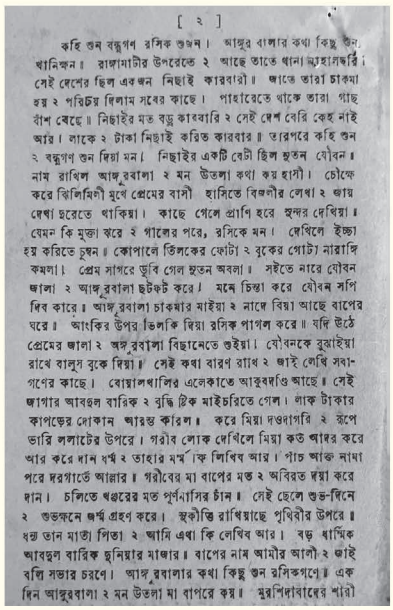
[২]
কহি শুন বন্ধুগণ রসিক শুজন। আঙ্গুর বালার কথা কিছু শুন খানিক্ষন। রাঙ্গামাটীর উপরেতে ২ আছে তাতে থানা হ্যহালঘরি। সেই দেশের ছিল একজন নিছাই কারবারী। জাতে তারা চাকমা হয় ২ পরিচয় দিলাম সবের কাছে। পাহারেতে থাকে তারা গাছ বাঁশ বেছে॥ নিছাইর মত বন্ধু কারবারি ২ সেই দেশ খেরি কেহ নাই আর। লাকে ২ টাকা নিছাই করিত কারবার॥ তারপরে কহি শুন ২ বন্ধুগণ শুন দিয়া মন। নিছাইর একটি বেটী ছিল নুতন যৌবন। নাম রাখিল আঙ্গুরবালা ২ মন উতলা কথা কয় হাসী। চৌক্ষে করে ঝিলিমিলী মুখে প্রেমের বাসী হাসিতে বিজলীর লেখা ২ ভায় দেখা ঘরেতে থাকিয়া। কাছে গেলে প্রাণি হরে সুন্দর দেখিয়া॥ যেমন কি মুক্তা ঝরে ২ গালের পরে, রসিকে মন। দেখিলে ইচ্ছা হয় করিতে চুম্বন॥ কোপালে তিলকের ফোটা ২ বুকের গোটা নারাঙ্গি কমলা। প্রেম সাগরে ডুবি গেল নুতন অবলা। সইতে নারে যৌবন জালা ২ আঙ্গুরবালা ছটফট করে। মনে চিন্তা করে যৌবন সপি দিব কারে। আঙ্গুরবালা চাকমার মাইয়া ২ নাদে বিয়া আছে বাপের ঘরে॥ আংকির উপর ভিলকি দিয়া রসিক পাগল করে॥ যদি উঠে প্রেমের জালা ২ অঙ্গুরবালা বিছানেতে শুইয়া। যৌবনকে বুঝাইয়া রাখে বালুস বুকে দিয়া॥ সেই কথা বারণ রাখ ২ ভাই লেখি সবা-গণের কাছে। বোয়ালখালির এলেকাতে আবুবদণ্ডি আছে॥ সেই জাগার আবদুল বারিক ২ বুদ্ধি ঠিক মাইচরিতে গেল। লাক টাকার কাপড়ের দোকান আরম্ভ করিল॥ করে মিয়া দওদাগরি ২ রূপে ভারি ললাটের উপরে। গরীব লোক দেখিলে মিয়া কত আদর করে আর করে দান ধর্ম্ম ২ তাহার মর্ম্ম কি লিখিব আর। পাঁচ আঙ্ক নামা পরে দরগাতে আজার॥ গরীবের মা বাপের মত ২ অবিরত দয়া করে দান। চলিতে খঞ্জরের মত পূর্ণনাসির চাঁন॥ সেই ছেলে শুভ-দিনে ২ শুভক্ষনে জন্ম গ্রহণ করে। সুকীর্ত্তি রাখিয়াছে পৃথিবীর উপরে॥ ধন্য তান মাতা পিতা ২ আমি এখা কি লেখিব আর। বড় ধার্ম্মিক আবদুল বারিক দুনিয়ার মাজার। বাপের নাম আমীর আলী ২ ভাই বলি সভার চরণে। আঙ্গুরবালার কথা কিছু শুন রসিকগণে॥ এক দিন আঙ্গুরবালা ২ মন উতলা মা বাপরে কয়। মুরশিদাবাদের শারী

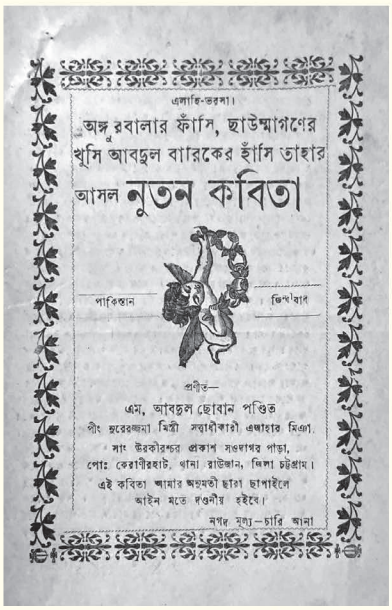
এলাকি-ভরসা।
অঙ্গুরবালার ফাঁসি, ছাউম্মাগণের
খুসি আবদুল বারিকের হাঁসি তাহার
আসল নুতন কবিতা
পাকিস্তান
জিন্দাবাদ
প্রণীত—
এম, আবদুল ছোবান পণ্ডিত
পীং মরেহুমা মিস্ত্রী সওদাগরী এজাহার মিঞা,
সাং উরকীরঘাট প্রকাশ সওদাগর পাড়া,
পোঃ কেরাণীহাট, থানা রাউজান, জিলা চট্টগ্রাম।
এই কবিতা আমার অনুমতী ছাড়া ছাপাইলে
আইন মতে দণ্ডনীয় হইবে।
মূল্য—চারি আনা

ছবি : বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস

ফিরিয়ে নিয়ে যান। এরপর বাঙালিরা দল বেঁধে এসে এর প্রতিবাদ জানালে এবং অমীয় বালাকে মাকতুল হুসেইনের কাছে ফিরিয়ে নিতে চাইলে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তাদের ওপর গুলি ছোড়েন। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ছোড়া গোলায় পনের জন বাঙালি আহত হন। এই ঘটনার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি-আদিবাসী উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। রাজা ত্রিদিব রায় চাকমার নামে মামলা দেয়া হয়। তবে সরকারের উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশীলদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তিনি এ মামলা থেকে অব্যাহিত পান। রাজা ত্রিদিব রায় সরকারের কাছে 'মার্সি' পিটিশন দাখিল করেছিলেন। তবে আহতদেরকে ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে তাকে নির্দেশ দেয়া হয় এবং আহতরা ধরন বুঝে প্রত্যেকের মধ্যে এই ক্ষতিপূরণ ভাগ করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়। আর মীয় বালাকে মাকতুল হুসেইনের আইনগত স্ত্রী হিসেবে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

এই ঘটনার পর অমীয় বালা এবং মাকতুল হুসেইনের প্রেমকাহিনীর ছায়া অবলম্বন করে কয়েক ডজন 'বটতলার' বাঙালি কবি কবিতা লেখেন। কবিতাগুলোতে ফ্যান্টাসি, যৌন সুড়সুড়ি এবং আদিবাসী বিশেষ করে চাকমাদের প্রতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। এ কবিতার বইগুলো তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক প্রচারিত ও বিক্রি হয়েছিল। কবিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর সাধারণ বাঙালিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। একটি কবিতার বইয়ের নাম ছিল 'অঙ্গুরবালার ফাঁসি ছাউম্মাগণের খুসি, আবদুল বারিকের হাসি তাহার আসল নতুন কবিতা।' কবির নাম এম আবদুল ছোবান পণ্ডিত। আরেকটি কবিতার বইয়ের নাম হল '১৫ জন আহুতি চাকমা রাজার নজরবন্দি : অমিয় বালা ও মোক্তল হোছেনের প্রেমের নতুন ও আসল কবিতা।' কবি এম আহমদর রহমান। দুটি কবিতার বই-ই খুব যৌন রসাত্মক ছিল। যেমন কবিতার কিছু ছত্র এ রকম ছিল :

> দেখিলে ইচ্ছা হয় করিতে চুম্বন/ কোপালে তিলকের ফোটা বুকের গোটা নারাঙ্গি কমলা/ প্রেম সাগরে ডুবি গেল নতুন আবলা/ সইতে নারে যৌবন জালা অঙ্গুরবালা ছটফট করে/ মনে চিন্তা করে যৌবন সপি দিব কারে/ আঙ্গুরবালা চাকমার মাইয়া নাদে বিয়া আছে বাপের ঘরে/ আংকির উপর ভিলকি দিয়া রসিক পাগল করে/ যদি উঠে প্রেমের জালা আঙ্গুরবালা বিছানাতে শুইয়া/ যৌবনকে বুঝাইয়া রাখে বালুস বুকে দিয়া/ আবদুল বারিক বলে বালা প্রেমের জালা কেন দাও আমারে/ রসের কালে স্বামী না পাই থাক একলা ঘরে/ আঙ্গুরবালা জোয়াব করে বারিকেরে কইল বুঝাই/ স্বামী ছারা অভাগিনী রজনী কাটাই/ আবদুল বারিক বলে বালা তোমার জালা না সহে অন্তরে/ স্বামী ছারা নারী জাতের ঘুমে কেনে ধরে।

শুধু যৌন রসাত্মকই নয়। এসব কবিতার বইতে আদিবাসী বিশেষ করে চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রতি বর্ণবাদী আচরণ ছিল স্পষ্ট ও তীব্র। এম আবদুল ছোবান পণ্ডিতের কবিতায়ও সে রকম অনেক লাইন পাওয়া যায়।

এম আবদুল ছোবান পণ্ডিত এবং এম আহমদর রহমানের কবিতার বই পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং এর আশেপাশের অঞ্চলের বাঙালিদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয় হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বিশেষ করে চাকমা জনগোষ্ঠী ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারা এই দুটি কবিতার বই নিষিদ্ধ করতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছে দাবি জানায়। রাজা ত্রিদিব রায় তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারকে এই কবিতার বই দুটি নিয়ে আপত্তি জানান। এই দুটি বই বা এ ধরনের আরো বইকে নিষিদ্ধ করতে আবেদন জানান এবং এ ধরনের বইয়ের লেখকদের শাস্তি দেবার দাবি জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারকে লেখা ত্রিদিব রায়ের চিঠিটি :

Chakma Raja's Office, No. 209, C, Dated 13.5.53
To
The Deputy Commissioner,

This is to bring your kind notice for necessary chastisement and action on unfortunate event viz. The publication of a booklet named 'Natun Kasita', Which has aroused the feelings of our tribesmen and our Buddhists. You will kindly find enclosed the book, a petition from some headmen and karbaries etc. and another from Buddhist Monk.

Against Buddhism page 4 underlined this Substance :
There is nothing in the religion of the chakmas, they make their idols with straw and mould with clay which if convenient I shall stamp on and they pray to this bundle of straw in the temple. The author has spoken through the girl.
Then he writes 'the skin peals of from your god and reveals bundles of straw.'
Page 6 underlined lines 'The chakmas stand and worship and do not use water after urinating. They dye white cloths and bring to their god. Such a devils' religion I do not respect. To make their god (idol) urine of a prostitute is necessary.'
Page 7 Underlined line. 'As if dog's dirt has fallen in the Chakmas month.'
Beside the lewd crude style, the author has painted the girl with immorality and shamelessness, betrayal of home for a foreigner and a host of other obscenities. As you are aware the author may be prosecuted under section 295 A of P.P.C. I do hope you will do everything possible so that there may be no such books published in future.
Needless to say we desire
That this or any such book be proscribed.
The author be criminally prosecuted.
That you kindly adopt any measures you think fit to wing to stop the sale of any such book which. Might disturb the tranquility and communal harmony which we enjoy here.

Sd/-T. Roy
Chakma Raja

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি এবং উর্দুভাষী মুসলমানদের পুনর্বাসন, ক্রমন্বয়ে আরো বেশি বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন, কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, কর্ণফুলী পেপার মিল স্থাপন এবং বিপুলসংখ্যক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীর বাস্তুচ্যুতি ও তাদের জীবিকায় আঘাত করা এবং বাঙালিদের আদিবাসী নারী বিয়ে করা, তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত (যদিও এটা খুব কম ঘটেছে) করার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালি-আদিবাসী সম্পর্ক খারাপ থেকে আরো খারাপ হচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও উচ্ছেদ নীতিরও ক্ষোভ গিয়ে পড়েছিল বাঙালিদের ওপরে। ফরাসি দার্শনিক লুই আলথুসার দেখিয়েছেন রাষ্ট্র কিভাবে তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইডিওলজি জারি রাখে। রাষ্ট্রীয় আইডিওলজির আধিপত্যের আওতায় আসে এর নাগরিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে একটি প্রেজুডিস তৈরি করেছিল। এই প্রেজুডিস প্রবাহিত হয়েছিল অনেক বাঙালির মধ্যে। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রেও আদিবাসীদের প্রতি বাঙালি সমাজে একটি প্রেজুডিস রয়েছে। Gyanendra Pandey তার *Routine violence: nations fragments histories* গ্রন্থে দেখিয়েছেন উত্তর ঔপনিবেশিকের রাষ্ট্র কীভাবে 'marked' এবং 'unmarked' মানুষ তৈরি করে। 'marked' মানুষের নাগরিকত্ব এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সবসময় প্রশ্নযোগ্য থাকে। আসলে পাকিস্তান আমলে সরকারের গোপন নথি-চিঠি-পত্র থেকে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা সবসময় ছিল জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের ভাষায় বললে, 'marked' মানুষ। সরকার সবসময়ই মনে করত এরা রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জড়াতে পারে এবং পাকিস্তানবিরোধী কাজে যুক্ত হতে পারে। জনাব সোবহানের চিঠির ভাষা থেকেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

দোহাই

১. Willen van Schendel, "The Invention of the Jummas"; State and Ethnicity in Southeastern Bangladesh, in *Modern Asian Studies*, 26(1); 1992,95-128.
২. Willem van Schindel, *The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia*, Anthem Press, 2004.
৩. Tamina M Chowdhury, *Indigenous Identity in South Asia: Making claims in the Colonial Chittagong Hill Tracts*, Routledge, 2017.
৪. Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and Bengal frontier, 1204-1760*, University of California Press, 1993.
৫. Neeladri Bhattacharya, *The Great Agrarian Conquest: The Colonial Reshaping of Rural World*, Permanent Black, 2018.
৬. Rajkumari Chandra Roy, *Land Rights of the Indigenous Peoples of the Chittagong Hill Tracts*, Bangladesh, IWGIA, 2000.
৭. Inspection and survey of Karnaphuli Dam site by Mr. Savage, an American Expert File No. 7P-3/48, National Archives of Bangladesh. (এর পর থেকে NAB লেখা হবে)।
৮. Edward W. Said, *Orientalism*, Vintage Books, 2024.
৯. Shapan Adnan and Ranajit Dastidar, *Alienation of the Lands of Indigenous Peoples in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Chittagong Hill Tracts Commission and International Work Group for Indigenous Affairs, 2011.
১০. Urvashi Butalia, *The Other Side of Silence: Voices From the Partition of India*, Duke University Press, 2000.
১১. Ayesha Jalal, *The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan*, Cambridge University Press, 2011. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511558856
১২. David Gilmartin, "Partition, Pakistan, and South Asian History: In Search of a narrative", *Journal of Asian Studies*, 57(4), 1998, 1068-95.
১৩. The Karnaphuli Hydroelectric Project Report, File No. 14E-84/50 NAB.
১৪. 'Provincial Administration Commission' File No. 84/59, 1945-1960, NAB.
১৫. Nalori chakma, 'The Kaptai Dam: A Story of Disenfranchisement, Displacement and Destruction in International River: People, Water, Life.
১৬. 'Proposal for Exclusion of C. H.Ts from category of tribal area file no 5/63, 1946-1968, NAB.
১৭. Establishment of a paper mill at Chandraghona, Rangamati, Chittagong Hill Tracts", File No. 164/1950/2, NAB.
১৮. Inclusion of Industrial Area in the District of chittagong, File No, 48/53, 1945-1960, NAB.
১৯. "Firing incident at the Rajbari Rangamati, C.H.TS", File No 7/54, 1945-60, NAB.
২০. Vazira Fazilla-Yacoobali Zamindar, *The Long Partition and the Making of modern South Asia: Refugees, Boundaries, Histories*, Columbia University Press, 2007.
২১. Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal, 1905-1947*, Oxford University Press, 1994.
২২. Taya Zinkin, Reporting India, Chatto & Windus, 1962.
২৩. Gynendra Pandey, *Routine Violence : Nations, Fragments, Histories*, Sandford University Press, 2006.
২৪. Louis Althusser, *On the Reproduction of Capitalism; Ideology and Ideological State Apparatuses*, Verso, 2014.
২৫. এম আবদুল ছোবান পণ্ডিত, *আঙ্গুরবালার ফাঁসি ছাউমাগণের খুসি, আবদুল বারিকের হাসি তাহার আসল নতুন কবিতা*, সাল অনুল্লেখিত।
২৬. এম আহমদর রহমান, *১৫ জন আহুতি চাকমা রাজার নজরবন্দি : অমিয় বালা ও মোজ্জল হোছেনের প্রেমের নতুন ও আসল কবিতা*, ১৯৫৩।
২৭. *Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798), His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill tracts, Noakhali and Comilla*

নলিনীকান্ত ভট্টশালী

যদুনাথ সরকার

আবদুল মমিন চৌধুরী

ইতিহাস চর্চায় ‘বাংলার মধ্যযুগ’

নলিনীকান্ত ভট্টশালী থেকে আবদুল মমিন চৌধুরী

ড. শহিদুল হাসান

> আরেকজনের কথা মনে করতে হবে, নলিনীকান্ত ভট্টশালী। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ওপর আমার একটা ছোট বই আছে; ন্যাশনাল মিউজিয়াম থেকে প্রকাশিত। এটার মধ্যে তার পুরো কাজের একটা বিবরণ ও মূল্যায়ন আছে। ঢাকা জাদুঘর তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিউরেটর হিসেবে তাকে নিয়োগ করা হয় ১৩০ টাকা বেতনে। ছেলে মেয়ে ছিল পাঁচটা। তার মানে বড় একটা পরিবার। অন্য কেউ হলে শুধু চাকরি করত। কিন্তু এই লোক পড়ালেখা করেছে, বহু কিছু আবিষ্কার করেছে। তুমি যে বললে প্রাচীন লিপি এটা সে নিজে নিজে শিখেছে। সংস্কৃত আগে থেকেই ভালোভাবে জানতেন। শেষ পর্যন্ত শুধু প্রাচীন যুগে তিনি অবস্থান করেননি তার শেষের দিকের বই ঈসা খাঁ ইংরেজদের যুদ্ধ নিয়ে। এছাড়া অনেক প্রবন্ধ তার প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চায় তখন একটি স্রোত এসেছিল।

আবদুল মমিন চৌধুরী ২০২২ সালে প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বাংলার অতীত গবেষণার প্রবাদ প্রতীম স্বশিক্ষিত প্রত্নতত্ত্ববিদ, জাদুঘর বিশারদ এবং ইতিহাসবিদ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন খুরশিদ জাহান এবং সেটি প্রকাশিত হয়েছিল আশফাক হোসেন ও আশা ইসলাম সম্পাদিত *শতবর্ষে ইতিহাস বিভাগ অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* গ্রন্থটিতে (ঢাকা : ২০২২, পৃষ্ঠা ৪০৭-১৪)। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে প্রকাশিত নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে নিয়ে আবদুল মুমিন চৌধুরী সম্পাদিত গ্রন্থটির শিরোনাম হলো *A Revered Offering to Nalini Kanta Bhattasali A Versatile Scholar* (ঢাকা : ২০১৩)। নলিনীকান্ত ভট্টশালী লোকান্তরিত হন ১৯৪৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি; অন্যদিকে আবদুল মমিন চৌধুরী ইন্তেকাল করেন ২০২৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্রের অতীত অন্বেষণের বহুমাত্রিকতা ও বহুত্ববাদের ধারক ও বাহক এই দুইজন জ্ঞান সাধকের সামনাসামনি বাতচিত হয়েছিল— এ ধরনের কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। বর্তমানে দুজনই ঐশ্বরিক জগতের বাসিন্দা।

বাংলার ইতিহাস চর্চার সমালোচনা কিংবা এই দুইজন জ্ঞানতাপসের ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের ইরাদায় বর্তমান প্রবন্ধটির সূত্রপাত হয়েছে ভাবলে পাঠক কিছুটা বিভ্রান্ত হবেন। ‘বাংলার মধ্যযুগ’ শিরোনামের এই দুই শব্দই এই লেখার মনজিলে মকসুদ। কিন্তু সেটিকে মূল্যায়ন করা কিংবা পাঠকের দরবারে তুলে ধরার যোগ্যতাও বর্তমান লেখকের নাই। ‘বাংলা’ কথাটি ভাষা ও ভূখণ্ড উভয় দ্যোতনা বাহক। বর্তমান লেখায় বাংলা শব্দটিকে এই দুই অর্থের কোনোটিকেই নেয়া হয়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রশাসনিক একক ‘বেঙ্গল প্রভিন্স’— যা ১৯৪৭ পূর্ব সময়ে বিদ্যমান ছিল। এই প্রশাসনিক এককের ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক অস্তিত্বটি বর্তমানে নেই। উপনিবেশ-উত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতায় ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীন অ্যাক্টের মাধ্যমে ব্রিটিশদের বেঙ্গল প্রভিন্সটি ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক সীমানার অংশ হয়। ১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এছাড়া ব্রিটিশ বেঙ্গলের কিছু অংশে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ অংশ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের কিছুটা। বঙ্গ-বাঙ্গালা-বেঙ্গালা-সুবাহ বাঙ্গালাহ— ইতিহাসের পরিক্রমায় নানা রকম প্রশাসনিক ও ভূ-রাজনৈতিক নামে এই এলাকাটি পরিচিত ছিল।

বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামে ব্যবহৃত ‘মধ্যযুগ’ শব্দটি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য ও মানবিক বিদ্যার বিভিন্ন শাস্ত্রে বহুল ব্যবহৃত কালবাচক একটি প্রত্যয়। ইউরোপীয় চশমায় প্রাচ্যকে দেখতে গিয়ে প্রাচীন (Ancient), মধ্য (Medieval) ও আধুনিক (Modern)— এই ত্রিবিভাজিত যুগ পরিচয় ভারতীয় ইতিহাস রচনায় প্রয়োগ করা হয়। পোস্টমডার্ন জামানায় এসে এটিকে ত্যাগ করার প্রবণতা হালফিলের নানা গবেষকের ভার্চুয়াল আলাপে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে নতুন কোনো যুগ বিভাজনের প্রস্তাব বিষয়ক নতুন কোনো গবেষণা গ্রন্থ বা প্রবন্ধের দেখা এখনো পাওয়া যায়নি। এই ত্রি-কালিক বিভাজন

পৃথিবীর ইতিহাসে নানা দেশে নানাভাবে দেখা হয়। বাংলার ইতিহাসে অতি প্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতক পর্বটি প্রাচীন এবং ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক কালপর্বটি মধ্যযুগ নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ইতিহাস পঠন-পাঠন, গবেষণা ও প্রকাশনায় মধ্যপর্বটিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়— সুলতানি (১২০৪-১৫৬৫), মুঘল (১৫৬৫-১৭১০) ও নবাবি আমল (১৭১০-৬৫)। পাঠকের কাছে সদয় স্বীকারোক্তি করছি যে, বহুল প্রচলিত ত্রি-যুগ বিভাজনের ধারণাকে ডিকন্সট্রাকট বা খারিজ করার কোনো ইরাদা এই লেখায় নাই। অধিকন্তু বহুল প্রচলিত 'বাংলার মধ্যযুগ' প্রপঞ্চটিকে মেনে নিয়ে বিগত এক শতাব্দীতে রচিত কয়েকটি ধ্রুপদী ইতিহাস গ্রন্থের সাথে বিজ্ঞ পাঠকদের পরিচয় করানোই আমার খাস নিয়ত। এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের নাম অনুসরণ করে কয়েকটি অনুচ্ছেদে লেখাটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সময় ও পরিসর বিবেচনায় যদি কোনো ইতিহাসবিদ বা জ্ঞানীজনের অবদান বাদ পড়ে যায় তাহলে সমজদার পাঠক নিজ মাহাত্ম্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী

নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে থাকা মিলনায়তনের নামফলকে জেনে থাকবেন। কিন্তু ১৯১৩ সালে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের উদ্বোধন করা ঢাকা জাদুঘর থেকে পথচলা শুরু করে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর হবার প্রক্রিয়ায় নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও বহুমাত্রিক গবেষণার খবর কিছুটা কম প্রচারিত ও সল্প আলোচিত। ১৯১৪ সালের ৬ জুলাই তিনি ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে উপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলার জ্ঞান ও সমাজ জগতে প্রত্নবস্তু তথা অতীতের বস্তুগত নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনীর অন্যতম আয়োজক ছিলেন ভট্টশালী। শেকড় অনুসন্ধানী গবেষক হিসেবে ভট্টশালীকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আবদুল মমিন চৌধুরী লিখেন—

> The Seed of the Dacca Museum was sown by the then Government being urged by the elites of the small town of Dacca. Bhattasali single handedly nursed the sapling, saw it grow in stature and volume and its reputation as an important centre of research spread all over India only through the publication of the curator. He was not only a collector, but at the same time he was a versatile research scholar and published books and articles in various fields of Indological studies such as Iconography, Epigraphy and Paleography as well as history and Culture of ancient Bengal. (*A Revered Offering to Nalini Kanta Bhattasali*, পৃষ্ঠা ১১)

জাদুঘর সংগঠক, প্রাচীন মূর্তিবিশারদ ও পুরালেখ বিদ্যায় পারদর্শী ভট্টশালীর একাডেমিক পরিচয় কেবল সমকালে নয় বরং শতবর্ষ পরে এসেও বাংলার জ্ঞানাকাশের শুকতারার মতো উজ্জ্বল তারকা। কিন্তু আজকের নিবন্ধে আমার দৃষ্টি ১৯২২ সালে ক্যামব্রিজ থেকে প্রকাশিত *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal* গ্রন্থটির দিকে। তিনি তৎকালীন ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ (বর্তমানে এটি নারায়ণগঞ্জ জেলা ভুক্ত) থানায় একটি তামার লোটায় পাওয়া সুলতানি যুগের বেশ কিছু মুদ্রার ভিত্তিতে মধ্যযুগের বাংলার প্রথম দিককার সুলতানদের নামের তালিকা ও প্রস্তাবিত কালানুক্রম সংশোধন করেছিলেন। উনিশ শতকে ব্রিটিশ ইন্ডোলজিস্টদের মধ্যে চার্লস স্টুয়ার্ট তার *The History of Bengal* (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1813); এডওয়ার্ড টমাস *The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, Illustrated by Coins, Inscriptions, and other Antiquarian Remains* (London, Trubner And Co., 1871.) গ্রন্থে এবং হেনরি ব্লখম্যান 'Contribution to the Geography and History of Bengal' (*Journal of the Asiatic Society*) তিন খণ্ডে প্রকাশিত (1873, Part 1, No. 3; 1874, Part 1, No. 3; 1875, Part 1, No. 3) নিবন্ধে বাংলার সুলতানদের রাজনৈতিক ইতিহাস লিখেছিলেন। ভট্টশালী উপস্থাপিত বাংলার সুলতানদের রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ববর্তী তিনটি প্রকাশনার একাধিক ভুল সংশোধন করেছিল।

বাংলার মধ্যযুগ বিশেষত, ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক কালপর্বে ইতিহাস লিখনের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো সমসাময়িক ইতিহাস বিষয়ক লিখিত গ্রন্থের অনুপস্থিতি। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দরবারের অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের নানা জায়গায় মুসলিম রাজ বংশের ইতিহাস লিখনের মাধ্যমে সেই এলাকার '*ইলম-আল-তারিখ*' বা ইতিহাস বিদ্যার শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু বাংলার সুলতান কিংবা তাদের অধীনস্থ উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কোনো ইতিহাস গ্রন্থ কিংবা অতীত কথননামা পাওয়া যায়নি। এই সংকট অতিক্রম করার জন্য ইতিহাসবিদদের অনেকাংশে নির্ভর করতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসের প্রতি। বাংলার সুলতানদের জারিকৃত *সিক্কা* বা *ফিদ্দা* (ধাতব মুদ্রা) তাদের ইতিহাস লিখনে গুরুত্বপূর্ণ আকরসূত্র (primary source)। প্রাচীন লিপিবিশারদ, মুদ্রাতত্ত্ব এবং মূর্তিতত্ত্বে পারদর্শী ভট্টশালীর গবেষণায় সুলতানি যুগের আরবিলিপি সংবলিত নীরব মুদ্রা হয়ে উঠেছিল সরব। রাজদণ্ডের ক্রমধারা ও কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনার বাইরেও ভট্টশালী তার গ্রন্থে তুলে ধরেছিলেন সুলতানি মুদ্রার গঠন, শৈলী, লিখনরীতি ও বিষয় উপস্থাপনের বিভিন্ন ধরনের অনুষঙ্গ। ভট্টশালীর এই গ্রন্থটি ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ বাংলায় ভাষান্তর করেন। অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার লিখিত ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদ নিচে উপস্থাপন করছি :

> ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর (১৮৮৮-১৯৪৭) লেখা *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal* (১৯২২) গ্রন্থটি বর্তমানে এদেশে দুষ্প্রাপ্য। এ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও বঙ্গানুবাদ এই মুহূর্তে একটি জরুরি কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে ইংরেজির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপকভাবে। অথচ বাংলাদেশে ইংরেজি জানার জন্য আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত জনসংখ্যার এক বিপুল অংশে। ইংরেজি ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি বইপত্রের বঙ্গানুবাদ তাই এখন একটি অতি প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। বর্তমানে বাংলার ও আব্বাসীয় মুদ্রার গবেষণরত রেজাউল করিম অনূদিত ভট্টশালীর গ্রন্থটি বাংলার মুদ্রাতত্ত্ব ইতিহাসের গবেষকদের কাজে লাগবে এবং সাধারণ পাঠকদের প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল মেটাবে। তাছাড়া ভট্টশালী একজন অতি প্রতিভাশালী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ। তার যে-কোনো গ্রন্থেরই অনুবাদ তার পবিত্র স্মৃতিকে উজ্জীবিত করবে এবং বলতে গেলে এক ধরনের স্মারক হিসেবেও কাজ করবে। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে ক্ষীয়মান, বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের এই ধারাকে অনূদিত গ্রন্থটি কিছুটা সঞ্জীবিত করতে পারে। (*বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালানুক্রম*, পৃষ্ঠা ৪)

অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদারের বক্তব্যটি বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চা, পূর্ববাংলার মানস জগতে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের রোশনাই অথবা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইংরেজি অনীহা—ইত্যাদি নানা চিন্তার উসকানিদায়ক মসলায় পরিপূর্ণ। এসব ঝুঁকিপূর্ণ সাওয়ালের জবাব দেওয়া বা মমতাজুর রহমান তরফদারের সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাহাসের বিন্দুমাত্র যোগ্যতা আমার নাই। পাঠক যদি তা প্রত্যাশা করেন তাহলে আমার সদয় স্বীকার- 'আমার ভুল হইয়া গেছে আমায় ক্ষমা কইরা দেন'। তাহলে কেন এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির পুনরাবৃত্তি? অধ্যাপক তরফদারের বক্তব্যের সূত্র ধরে তৎকালীন পূর্ববাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের চেতনার বাতিঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানপরিসরে গড়ে ওঠা বাংলা ও বাঙালির অতীত অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশেষত মধ্যযুগের ইতিহাস ও প্রত্নচর্চার বৈচিত্র্যময় জগতে সফর করার একটি প্রচেষ্টা নিবন্ধের পরবর্তী অংশে করতে চাই। এক্ষেত্রে মান্যবর ইতিহাসবিদদের গবেষণার মূল্যায়ন এড়িয়ে তরফদারের 'ক্ষীয়মান বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের' ভরা যৌবনকে খোঁজাই হবে আমাদের উদ্দেশ্য।

বাংলা ও বাঙালির অতীত, সভ্যতা ও সংস্কৃতি উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের। আধুনিক পদ্ধতিতে অতীত কথন বা ইতিহাস রচনার শুরু ব্রিটিশ পণ্ডিতদের হাত ধরেই। তবে এ সময়ের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য হলো কলোনিয়াল তথা ঔউপনিবেশিক কাঠামোকে সহায়তা করা এবং কায়েম রাখা। উনিশ শতকের শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত আফসোস উক্তি— 'বাংলার ইতিহাস নাই, বাংলার ইতিহাস চাই'- ইতিহাসের বিজ্ঞ পাঠকের অজানা নয়।

ইউরোপীয় লেখকদের বিপরীতে বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে জাতীয়তাবাদী ঘরানায় ইতিহাস রচনার প্রবণতা শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ডাকে সাড়া দিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুই খণ্ডে রচনা করেন বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯১৭)। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলার মধ্যযুগ তথা বখতিয়ার খলজির নদীয়াহ জয় থেকে নবাবি শাসনের অবসান (১৭৫৭) এর ইতিহাস তুলে ধরা হয়। রাখালদাসের প্রায় সমসাময়িক গ্রন্থ হিসেবে ভট্টশালীর *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*- গ্রন্থটিকে বিবেচনা করা যায়। এর পরবর্তী দুই দশকে অসংখ্য পণ্ডিত বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগের নানা আকর সূত্র বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ও বিশ্লেষণসহ পাঠকের দরবারে তুলে ধরেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির সাথে সাথে আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত সর্বভারতীয় ইতিহাসগ্রন্থাদির ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়। বাংলার গুপ্ত-পাল-সেন-চন্দ্র-রাজাদের তাম্রশাসন পাঠোদ্ধারের পাশাপাশি বাংলার সুলতানদের আরবি-ফারসি লেখমালা ও মুদ্রার পাঠোদ্ধার ও পরিচায়ন বিভিন্ন গবেষণা জার্নালে প্রবন্ধ বা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়। এই প্রক্রিয়াতে ভট্টশালীর অংশ গ্রহণ ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলার অতীত লিখনের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগটি নেওয়া হয় এ সময়েই। পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকার অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে *History of Bengal* প্রকল্পটি। বাংলার প্রাচীন যুগ তথা মুসলিম অধিকারের আগ পর্যন্ত ইতিহাস গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার। এই প্রকল্পের অধীনে দুটি খণ্ড প্রকাশ হয়েছিল। প্রথম খণ্ডটি ১৯৪৩ সালে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৪৮ সালে। স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত দ্বিতীয় খণ্ডটি ছিল বাংলার মধ্যপর্ব তথা মুসলিম শাসন আমলের ইতিহাস।

যদুনাথ সরকার

বাংলার ইতিহাস রচনার এই প্রকল্পটিতে যদুনাথ সরকার সম্পাদিত *History of Bengal* , Vol. 2 গ্রন্থটিকে রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো উপস্থাপনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। যদিও সম্পাদক মহোদয় ভীষণ ভাবে বাংলার মধ্যযুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের অভাব বোধ করেছিলেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার পাশাপাশি যদুনাথ সরকারকে বেশিরভাগ অধ্যায়ের লেখনীর কাজও কাঁধে নিতে হয়েছিল। একটি সমন্বিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ হিসেবে বিভিন্ন অধ্যায় রচনার জন্য বিভিন্ন লেখকদের নির্বাচন করা হয়েছিল এবং লেখার জন্য লিখিতভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। অনেক লেখকই কথা দিয়ে কথা রাখেনি। ফলে কাজটির সমাপ্তি টানার জন্য সম্পাদককেই অনেকগুলো অধ্যায় রচনার গুরুভার নিতে হয়েছিল। যদুনাথ সরকার রচিত অধ্যায়গুলো ছিল মুসলমানদের বাংলা বিজয়, বাংলায় ইলিয়াস শাহি বংশের উত্থান, রাজা গণেশ ও তার বংশধরদের শাসন, বাংলার আফগান শাসন (১৫৫৩-৭৫), মুগলদের বাংলা বিজয়ের প্রাথমিক পর্যায়, বাদশাহ শাহজাহানের সময় সুবাহ বাংলা, সুবাদার মির জুমলার আমল (১৬৫৯-৬৩), সুবাদার শায়েস্তা খান ও ইব্রাহিমের সময়, সুবাদার-নওয়াব মুর্শিদকুলি খানের সময়, মারাঠাদের আক্রমণ বাংলা নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান বিষয়ক।

সম্পাদনার পাশাপাশি এতগুলো অধ্যায় লেখার কাজটি ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। বর্তমান প্রজন্মের কাছে হয়তো প্রায় অসম্ভবই মনে হবে। যদুনাথ সরকার নিজেও এই দুঃসাধ্য কাজের স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন নিম্নোক্তভাবে—

> I have had to write more than 200 pages in valium of a little over 500 pages. Besides revising and sometimes recasting the work of many of the other contributors. (*History of Bengal* , Vol. 2, Page VIII)

বাংলার ইতিহাসের এই প্রকল্পটি দীর্ঘদিন পরবর্তী গবেষকদের রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়িত হয়। বাংলার ইতিহাস তত্ত্ব বিষয়ক গবেষক সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় ফারসি আকর সূত্রের পাশাপাশি ইউরোপীয় ভাষায় রচিত ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলির নথি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকারের মুন্সিয়ানার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেন :

> In the uncharted wilderness of medieval Bengal Jadunath acted as a safe guide and path finder by virtue of his unrivalled mastery of Persian manuscripts sources and European records. (*Evluation of Historiography in Modern India*, Page 30)

হিস্ট্রি অব বেঙ্গল প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যদুনাথ সরকার প্যারিসের বিবলিওথিকে ন্যাশনাল-এর সংগ্রহভাণ্ডার থেকে ফারসি ভাষায় রোজনামচার ভঙ্গিতে রচিত *বাহারিস্তান-ই-গায়েবি* গ্রন্থটির একমাত্র পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন এবং গবেষক-পাঠক মহলে তুলে ধরেন। মুঘল নাওয়ারার দক্ষ সেনাপতি মির্জা নাথানের লেখা এই গ্রন্থটি বাংলায় মুঘল আক্রমণের ইতিহাস পুনর্গঠনের একমাত্র সমসাময়িক লিখিত বিবরণ। যদুনাথ সরকার এই গ্রন্থের ভাষ্যকে প্রমাণ হিসেবে নিয়ে বাংলার বারভূঁইয়াদের সম্পর্কে প্রচলিত অনেক লোকগাঁথা ও লোক-চরিত্রের ঐতিহাসিক সত্যতাকে প্রশ্ন করেছিলেন। বঙ্গীয় বদ্বীপের জল-জমিনে সমভাবে আধিপত্যবাদী মুঘল সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ কৌশল ও সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রাঞ্জল বিবরণ প্রদানে এই গ্রন্থের জুরি মেলা ভার।

গ্রন্থটি শুধু যুদ্ধের বিবরণ নয়। এতে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার বিশদ ও নির্ভুল বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। লেখক নিজে বারভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মুঘল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এ গ্রন্থের প্রধান বিষয় হলেও এতে বর্ণিত সমসাময়িক সময়ের সমাজচিত্র অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। গ্রন্থটির রচনার ক্ষেত্রে লেখক নিজের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি দলিল ব্যবহার করেন। যদিও গ্রন্থটি তারিখ বর্ণনার কার্পণ্য এবং আত্ম প্রশংসার দোষে দুষ্ট। তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থটির কারণে জাহাঙ্গীরের সময়ের সুবাহ বাঙ্গালার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে জানা যায়। ব্রিটিশ পূর্ব সময়ের অন্য কোনো শাসকের সময় সম্পর্কে এভাবে জানা যায় না। গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্পর্কে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছিলেন,

> ".. এই সুদীর্ঘ গ্রন্থের ...একমাত্র বিষয় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ পর্যন্ত বাঙ্গলার অতি বিস্তৃত ইতিহাস। ইতিহাস বলিতে অবশ্য বুঝায় শুধু সুবাদারের দরবারের ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি, ওমরাগনের কার্যকলাপ এবং বাদশাহের সভার সংবাদ। দেশের কথা, প্রজার অবস্থা...স্থানে স্থানে কিছু আভাস পাওয়া যায়। (যদুনাথ সরকার, 'প্রতাপাদিত্যের পতন', *প্রবাসী*, কার্তিক, ১৩২৭ বা.স.,পৃষ্ঠা ১-৯)

সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে তিনি প্রত্যেকটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এ জন্যই সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা সমগ্র বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা জানার জন্য *বাহারিস্তান* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মুসা খানের ডাকছড়া ও যাত্রাপুর দুর্গের অবস্থান ও তার বর্ণনা; ঢাকার পার্শ্ববর্তী খিজিরপুর, ডেমরা ও কতরাব বন্দর খাল ছাড়াও লক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বর্ণনা; অথবা বুকাই নগর, সিলেট, যশোর, বাকলা, কামরুপ, ভুলুয়া ও ত্রিপুরার যাত্রাপথের বিবরণ। যদিও *বাহারিস্তানের* বর্ণিত অনেক নদীই তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে তা সত্ত্বে ও তৎকালীন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পুনর্গঠনে গ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থটিতে মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মির্জা নাথানের নেতৃত্বে একটি মৃতপ্রায় নদীকে বিরাট মুঘল নৌবাহিনীর চলাচলের উপযোগী করা হয় তার বর্ণনা দেওয়া আছে নিম্নোক্ত উপায়ে :

> .....fort was surrounded on one side with the water of river and on the other three by a marsh, it was found impossible to attack him and so the commander had to back. Then Raja Raghunath gave the following advice: "There is a canal between the tranches of Iftikhar Khan and Mu'taqid Khan which has dried up and a large heap of sand has blocked in mouth; if it is dug and the imperial navy is made to enter the river Isamati through the canal then this fort as well as the fort of jatrapur may be occupied without a battle". Therefore, the Mansabdars for excavation. After three days when Islam Khan saw that the work has not yet complete, he thought that it would not be possible to accomplish this work without Mirza Nathan, son of Ihtimam Khan, so he went to the camp of Ihtimam Khan.....he said "Ihtimam Khan! I have come here simply for the purpose of taking

Mirza Nathan from you to look after the works of the excavation of the canal.

...Islam Khan took Mirza Nathan with him in the supervision of the excavation of the canal on this side of the trench of Mu'taqid Khan.

....Of the twelve thousand sailors of the fleet, Mirza Nathan left two thousand in the boats with Ihtimam Khan and employed the remaining ten thousand in the excavation of the canal. He personally supervised the work standing for four *pahar*s on foot and cheered up the sailors by distributing among them copper coins, rice, bhang (Indian hemp) and opium, and finished the work (of clearing the mouth of the canal) with in six *pahar*s. (Mirza Nathan, *Bahristan-i-Ghaybi*, M.I. Borah English translation with annotation, Vol. I, Gauhati: Goverment of Assam, 1936, P. 61-62).

মির্জা নাথানের বর্ণিত এই খাল খননের প্রক্রিয়াটি নিঃসন্দেহে সামরিক আগ্রাসনের প্রয়োজনে হয়েছিল। কিন্তু এর সাথে সাথে এটি উল্লেখ্য যে, বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর সামষ্টিকভাবে মানুষের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার এত বিস্তৃত বিবরণ অন্য কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগের সূত্রগুলোতে পাওয়া যায়নি। যদুনাথ সরকার কেবল মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা নয় ইতিহাসের আকর সূত্র পরিচায়ন ও সম্পাদনা করার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আহমদ হাসান দানী

উপনিবেশ-উত্তর কাল বিশেষত ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে পূর্ববাংলার তথা ঢাকার বিদ্বৎসমাজে আহমদ হাসান দানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একযুগের বেশি সময় (১৯৪৯-৬২) তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। কাশ্মীরি বংশজাত এই জ্ঞানসাধন সংস্কৃত সাহিত্যে এমএ করলেও আরবি, ফারসি, উর্দু ও তামিলসহ আরো অনেক ভাষায় ছিলেন দক্ষ। ১৯৫৫ সালে তিনি লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে Prehistory and Protohistory of Eastern India-শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন; যা ১৯৬০ সালে কলকাতা থেকে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি ঢাকা জাদুঘরের খণ্ডকালীন কিউরেটর এবং বর্তমান বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করেছেন। অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে তিনি এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছেন। দানীর শিক্ষকতা ইতিহাস বিভাগে হলেও তিনি ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্যবিদ্যা, শিল্প-সমালোচনা, নৃবিজ্ঞান, পুরালেখ বিদ্যায় পারদর্শী। ব্রিটিশরাজের সময় তিনি Archaeological Survey of India-এর হয়ে তক্ষশীলা জাদুঘরের কিউরেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্টিমার হুইলারের সাথে সিন্ধু সভ্যতার একাধিক প্রত্নস্থল উৎখনন করেছিলেন। তিনি *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal Down to* (১৯৫৭) শিরোনামে মধ্যযুগের বাংলার সুলতানদের জারিকৃত আরবি-ফারসি শিলালিপির একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করেন। এটি পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত বাংলার মুসলিম যুগের পুরালেখ বিষয়ক প্রথম সংকলন। তবে এটি গ্রন্থাকারে নয় বরং তৎকালীন এশিয়াটিক সোসাইট অব পাকিস্তানের জার্নালের অ্যাপেন্ডিক্স হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬০-এর দশকের ঢাকায় বিদ্বৎসমাজে দানী ছিলেন অত্যন্ত কর্মচঞ্চল ও তৎপর সংগঠক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পাঠদান, এশিয়াটিক সোসাইটিকে গড়ে তোলা, ঢাকা জাদুঘরের পরিচালনার সাথে সাথে গবেষণা ও প্রকাশনায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। এ সময়ের দুটি গ্রন্থ মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসকে পাঠক মহলে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছিল। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত *Dacca A Record of Its Changing Fortune* গ্রন্থটি মুঘল সুবাহ বাংলার রাজধানী থেকে উপনিবেশ-উত্তর কালে শহরটির গড়ে উঠার একটি বিবরণ। রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো অনুসরণ করে একটি সামরিক ছাউনির শহর হয়ে উঠার ইতিহাস, শহরের বসতিবিন্যাস উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নস্থাপনাসমূহের বিবরণ, শহরের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বর্ণনাই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তবে মসজিদ স্থাপনা বিশেষত মসজিদের নগরী খ্যাত ঢাকার ঐতিহাসিক মসজিদগুলির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যর বিশ্লেষণকে এই গ্রন্থের প্রাণ ভোমরার সাথে তুলনা করা যায়। ঢাকার মধ্যযুগের আরবি-ফারসি শিলালিপি ও সুফি দরগাহের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যায়ন এই গ্রন্থের পাঠককূলকে কখনো কখনো কল্পনায় মুঘল ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। দানী ১৯৬২ সালে গ্রন্থটির দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯৬১ সালে দানী প্রকাশ করেন *Muslim Architecture in Bengal* গ্রন্থটি। এটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের গবেষকদের কাছে এখনও ধ্রুপদী টেক্সট। গৌড়-পাণ্ডুয়া-ঢাকা-সাতঁগাও-সোনারগাঁও—এই বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সুলতানি ও মুঘল যুগের স্থাপত্যগুলোকে এক মলাটে গবেষণা আকারে প্রকাশের জন্য দানী আজও স্মরণীয়। শিল্প ইতিহাসের কায়েদা অনুসরণ করে রচিত বইটিতে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের স্বকীয় চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বিদ্বৎসমাজে সংগঠক দানী পিএইডি গবেষণা তত্ত্বাবধায়নেও ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। ১৯৫৯ সালে তার তত্ত্বাবধায়নে আবদুল করিম "Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538)" এবং মাইনুদ্দীন হোসেন খান ১৯৬১ সালে "A History of The Faraidi Movement" শিরোনাম পিএইডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। দ্বিতীয় গবেষণাটি মধ্যযুগের কালপর্ব অতিক্রম করে ঔপনিবেশিক সময়ের ধর্ম-সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিষয়ক। কিন্তু দুটি গবেষণারই একটি বিষয়ে মিল রয়েছে; দুটিই অভিসন্দর্ভই বাংলার মুসলিমদের পরিচয় গঠন ও অতীত অনুসন্ধান। এককথায় দানী ছিলেন বহুবিদ গুণের অধিকারী কর্মতৎপর গবেষক-শিক্ষক-সংগঠক।

আবদুল করিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন থাকা সত্ত্বেও আবদুল করিম ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় আরেকটি পিএইচডি করেন "Murshid Quli Khan and His times" শিরোনামে। এটি কিছুটা ব্যতিক্রমী ঘটনা; আত্মজীবনী গ্রন্থ *সমাজ ও জীবন* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৪)-এ বিষয়টির কিছুটা ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত রিডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে একই পদে যোগদান করেন। আবদুল করিম ১৯৮৪ সালে ইতিহাস বিভাগ থেকে অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে এর মধ্যেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট, ডিন ও উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এই ইতিহাসবিদকে ইমেরিটাস অধ্যাপক পদে ভূষিত করেন এবং তিনি ২০০৭ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ পদে সম্মানিত ছিলেন।

আবদুল করিম প্রণীত ৩৮ খান গবেষণা গ্রন্থ এবং দুই শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধের প্রায় সবই মধ্যযুগের বাংলার নানা প্রসঙ্গে। তার প্রথম গ্রন্থটি প্রথম অভিসন্দর্ভ এর গ্রন্থরূপ; যেটি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান থেকে *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538)* শিরোনামে ১৯৫৯ সালে এবং একই নামে ১৯৮৫ সালে চট্টগ্রামের বাইতুল শরফ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার থেকে পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ হয়। গ্রন্থটির বাংলা ভাষ্য করেছেন তদ্বীয় ছাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মোকাদ্দেসুর রহমান। উপনিবেশ-উত্তর পূর্ব বাংলার ইতিহাস ও গ্রন্থ প্রকাশের সারণি তৈরি করলে এটি স্পষ্ট হবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *History to Bengal*, Vol.-2-এর পর এটি দ্বিতীয় গ্রন্থ যেখানে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় ছয় দশক পরে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার বৃহৎ পাটাতনে নিজগুরু আবদুল করিমের এই গ্রন্থটিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে আবদুল মমিন চৌধুরী লিখেন:

> করিমের এই গ্রন্থটি ছিল বিষয়বস্তু, উৎস ব্যবহার, উৎসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমসাময়িক ইতিহাস চর্চায় অনেকটাই অগ্রসর ও স্বতন্ত্র। উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার দীর্ঘদিনের প্রচলিত বৃত্ত অতিক্রম করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার যে ধারা পাশ্চাত্যে শুরু হয় *History of Bangel*, Vol-2-এর ক্ষেত্রে তার কোনো প্রতিফলন লক্ষ করা যায়নি। ... করিম প্রথাগত সেই রীতি ভেঙে বাংলার সামাজিক ইতিহাস

অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন। এজন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন বাংলার ইতিহাসের মধ্যপর্বকে। করিমের গ্রন্থটি ফরাসি 'এন্যাল' স্কুলের হুবহু অনুসরণ নয় বরং দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে (১২০৪-১৫৩৮) বাংলা অঞ্চলের মুসলমানদের সমাজ গঠন, সমাজ পরিবর্তন; সমাজ গঠন ও পরিবর্তনে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা এবং সেই সাথে ধর্মীয় জীবনের অনুসন্ধানের উদ্যোগ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সমাজ গঠনের পটভূমিতে ক্রিয়াশীল অনুঘটকগুলোকে ব্যাখ্যা করাই এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। মুসলিম সমাজ গঠনে প্রচলিত ধারণা, যার প্রবক্তা ছিলেন ফজলে রাব্বি, অনুযায়ী বাংলার মুসলমান সমাজ গঠন হয়েছিল অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বহিরাগত মুসলমানদের বংশ বিস্তারের মাধ্যমে। কিন্তু করিম এই প্রস্তাবনার বিপরীতে দেখাতে চেয়েছেন মুসলিম সমাজ গঠন প্রক্রিয়াটি বহুমাত্রিক। যেখানে সুলতান তথা শাসকগোষ্ঠীর পাশাপাশি সুফি এবং উলেমা সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলাম জনপ্রিয় হয়েছে। ('বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস ও অধ্যাপক আবদুল করিম', পৃষ্ঠা ৩৫)

বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসের বিভিন্ন শাখার আবদুল করিমের বিচরণ ছিল অবাধ। সুলতানদের মুদ্রা এবং সুলতানি-মুঘল যুগের আরবি-ফারসি ভাষার পুরালেখ পাঠোদ্ধার, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণে আবদুল করিম ছিলেন বিশেষ দক্ষ। তার মতো আরবি-ফারসি ভাষা ও লিপিজ্ঞান সম্বলিত ইতিহাস গবেষক বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে নেই বললেই চলে। লন্ডনে দ্বিতীয় পিএইচডি করার সময় তিনি ডাচ ভাষাও শিখেছিলেন। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস গবেষণা ও আকর সূত্রের ক্যাটালগ তৈরি- এই দুই মাত্রা আবদুল করিমকে করেছে 'বিরল প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত'। এই বৈরল্যই করেছে তাকে অবিসংবাদিত। রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটনের ভাষায় "Such a fine man and great Scholar"। আবদুল করিমের ইংরেজি ভাষায় উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থাদির মধ্যে রয়েছে: Dacca The Maghal Capital (১৯৬৪), History of Bengal Mughal Period (দুই খণ্ড, ১৯৯২ ও ১৯৯৬), The Rahingyas: A Short Account of Their History and Culture (2000)। তার বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির তালিকায় আছে: *ঢাকাই মসলিন* (১৯৬৫), *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, (১৯৬৯), *হযরত শাহ সুফী আমানত খান* (১৯৬৯), *চট্টগ্রামে ইসলাম* (১৯৭০), *বাংলার সুফী সমাজ* (১৯৮০), *বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল* (১৯৭৭), *ঈসা খান মসনদ ই আলা* (১৯৮০), *মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মাদ্রাসা* (১৯৮৭), *মোল্লা মিসকিন শাহ (র.)* (১৯৮৭), *বাংলার ইতিহাস মুঘল আমল* (দুই খণ্ড, ১৯৯২ ও ১৯৯৫)।

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের আকর সূত্রের সম্পাদনা, অনুবাদ ও বিশ্লেষণে করিম অনতিক্রম্য। এ ধরনের গ্রন্থের তালিকাটিও দীর্ঘ: *Corpuse of the Muslim Coins of Bengal (Down to A.D. 1538)* (1960), Catalouge of Coins in the Cabinet of the Chittagong University (1979), *Corpus of the Arabic and Presian Inscriptions of Bengal* (1992), *নসরুল্লাহ খন্দকার বিরচিত শরীয়তনামা* (১৯৭৫), *সুলতান ফীরুজশাহ তুঘলক বিরচিত ফুতুহাত-ই-ফীরুজ শাহী* (১৯৮৯)। এছাড়াও তিনি অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা প্রশ্ন, বিতর্ক ও নিজ প্রস্তাবনা প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বীয় গবেষণা, লেখনী এবং ইতিহাসের আকর সূত্রের প্রয়োগে হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তি ইতিহাসবিদ। মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান সত্তার বহুমাত্রিকতা ও বাংলার উদার ইসলাম, বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় ইসলাম বিস্তার ও সেই প্রক্রিয়ায় সুফি-সাধকদের কর্মতৎপরতা ও মানস জগতের বৈচিত্র্যময় অনুসন্ধানে আবদুল করিমের জুড়ি মেলা ভার।

এম এ রহিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এম এ রহিম দুই খণ্ডে *Social and Cultural History of Bengal* (১৯৬৩ এবং ১৯৬৭) এ মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের চিত্রায়ণ করেন। আবদুল করিমের হাত ধরে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার যে ধারা শুরু হয়েছিল মান্যবর এম এ রহিমের এই দুটি গ্রন্থ সেই সেটিকে পরিপূর্ণ ও পুষ্ঠ করে। প্রথম খণ্ডটি ১২০১ থেকে ১৫৭৬ এবং দ্বিতীয়টি ১৫৭৬-১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম খণ্ডে বাংলার মুসলমানদের আগমন, উৎপত্তি ও বিস্তারের সামাজিক সাংস্কৃতিক মতবাদগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদক আসাদুজ্জামান মুখবন্ধ অংশের বাংলা ভাষ্যে লিখেন:

> যদিও এই গ্রন্থ প্রধানত মুসলমানদের ওপর লিখিত, তথাপি হিন্দুদের উন্নতি ও তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন এবং মতবাদসমূহেরও যথেষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলার ভূগোল পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর এর প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে। (পৃষ্ঠা ছয়)

জল-জমিন-প্রকৃতি বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবিল একটি এলাকার সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বাংলার ইতিহাস গবেষণায় এমএ রহিমের এই প্রস্তাবনা হালফিলের পরিবেশের ইতিহাস (Environmental History)- লেখার যে প্রবণতা তার অঙ্কুর হিসেবে দেখা যেতে পারে। লেখক গ্রন্থটির প্রথম অনুচ্ছেদেই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করেন:

> এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য মুসলমান অধিবাসীদের অগ্রগতির প্রতি বিশেষ নজর রেখে ১২০১-১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র রূপায়ন করা। জীবনধারা ও ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাবে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার প্রাকৃতিক ও সহজকৃত বৈশিষ্ট্য এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এর অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর এগুলোর প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে। বস্তুত ভূ-প্রকৃতির গঠন প্রণালীই কয়েক শতাব্দীব্যাপী ব্যাপকভাবে বাঙালির স্বাধীন রাজনৈতিক জীবনধারা ও এর অধিবাসীদের মধ্যে বিশিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদসমূহের উন্নয়নের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। বাংলার স্বাধীন সালতানাত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নই এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেশের ভৌগোলিক অবস্থা বাঙালি জাতির দেহ ও মনের ওপর গভীর ছাপ রেখে গেছে। জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে তা তাদেরকে করে তুলেছে অতীন্দ্রিয়বাদী ও কল্পনা প্রবণ। এটা তাদের জীবন প্রণালী, বসবাস, পোশাক আশাক, খাদ্য ইত্যাদিকে প্রভাবান্বিত করেছে। (*বাংলার মুসলমানদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃষ্ঠা সাত)

উপরের উক্তি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, বঙ্গীয় ব-দ্বীপের নদী-খাল-বিল আর সবুজের সমারোহে স্থানীয় জনমানুষের মানস জগৎ ও সংস্কৃতির বিন্যাস এমএ রহিমের ইতিহাস প্রস্তাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত বাংলার প্রাগ-আধুনিক পর্বের ইতিহাসে স্থানীয় ভূগোলের প্রভাব তথা পরিবেশের ইতিহাস ভাবনার প্রয়োগ এটাই প্রথম।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে বাদশাহ আকবরের সময় তার সুযোগ্য সেনাপতি মানসিংহের নেতৃত্বে বাংলা জয়ের পর থেকে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় পর্যন্ত সময়ের মুন্সীয়ানার সাথে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রাধান্য এড়িয়ে জনজীবনের বৈচিত্র্যময় সামাজিক স্তরায়ন, ধর্ম-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির নানা অনুষঙ্গকে দক্ষতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

মমতাজুর রহমান তরফদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক মমতাজুর রহমান তরফদারের লেখা *Hussain Shahi Bengal: A Socio-Political Study (1495-1538)* (১৯৬৫ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থটি স্বাধীন সুলতানি যুগের অন্যতম রাজবংশ হোসেন শাহী সুলতানদের রাজত্বকালের বাংলা ও বাঙ্গালির চমৎকার অতীতনামা। তরফদার কেন এই পর্বকে ইতিহাস চর্চায় বেছে নিয়েছিলেন? লেখকের ইংরেজি ভাষ্যের মুখবন্ধের বাংলার অনুবাদ করতে গিয়ে মোকাদ্দেসুর রহমান লিখেছেন:

> এ দেশের ইতিহাসে হোসেন শাহী শাসনামলের (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ) একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সে আমলের বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপনই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। যথেষ্ট উপাদান ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত হওয়ায় এ আমলের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব, যাকে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। হোসেন শাহী আমলের বাংলার বিভিন্ন দিক, যেমন প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় আন্দোলন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয় নিয়ে এ পর্যন্ত গ্রন্থ রচনার কোনো প্রয়াস চালানো হয়নি। আলোচ্য সময়কালে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের সক্রিয় শক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করে এসব বিষয়ে আলোচনার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ গ্রন্থে করা হয়েছে।

তরফদার হোসেন শাহী যুগকে 'বাঙালি জনসত্তার গাঠনিক' পর্ব হিসেবে

চিহ্নিত করেছেন। অজয় রায়ের ভাষ্যে এ কালপর্বটি 'যুগ সন্ধিক্ষণও' বটে; রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল 'মুঘলদের আধিপত্যের পূর্বলগ্ন' এবং আসন্ন কালে 'দৃশ্যমান পশ্চিমা বাণিজ্যিক শক্তির আগমন' পর্ব। তরফদারের নিজের ভাষায় :

> It was this period which witnessed the beginning of significant forces deeply affecting the political and economic history of Bengal. Between the dates of the first advent of Europeans and starting of the Mughal rule, one may specifically fix the period of the historical process which were destined to shape the life of the country for centuries to come... But the period in question showed the signs of a new Bengal to be brought into existence trough the working of those forces.

ইসলামী সুফিবাদের সঙ্গে দেশজ নানা ধারণার সংমিশ্রণের অনিবার্যতা তরফদারের লেখায় স্পষ্ট। বাংলার মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে ইসলামের আগমন দেশীয় সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ, সমন্বয় ও আদান-প্রদানের বৈচিত্র্যময় যৌগিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ অন্বেষণ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, বর্ণপ্রথা ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের কঠোর আচারাদির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত অন্তজ শ্রেণীর নিম্নবর্গের মানুষের ইসলামের সাম্য উদারতার প্রতি আকর্ষণ, হিন্দু-বৌদ্ধ উপাদানের সাথে ইসলামী মরমীবাদের দেওয়া-নেওয়া এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হওয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন-এসকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে হোসেন শাহী যুগের সামগ্রিক ইতিহাস (total history) রচনার যৌগিক প্রক্রিয়ার আকর সূত্র ভিত্তিক বিশ্লেষণের সফল নিদর্শন হলো *Hussain Shahi Bengal* গ্রন্থটি। শিপ্রা দস্তিদার 'মমতাজুর রহমান তরফদারের ইতিহাস চিন্তা' প্রবন্ধে গ্রন্থটিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখেন :

> হোসেন শাহী আমলের সমগ্র পরিচয় তুলে ধরার জন্য তিনি উত্তর ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক, ইলিয়াস শাহী আমলে বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয়, শিল্পকলা, স্থাপত্য, মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা করে মুসলমান শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরেছেন। হোসেন শাহী সুলতানদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অভিজাত শ্রেণী, কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রাদেশিক সরকারে আলোচনা করে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এ সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, মুদ্রা, বিনিময় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান আন্তঃসম্পর্ক এবং সর্বশেষ জন সাধারণের অবস্থা নির্ণয় করেছেন।...

হোসেন শাহী আমলে বাংলার ধর্মীয় জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলাম, বৈষ্ণবধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ধর্মপূজা, নাথপন্থা, মনসা ও চন্ডীর পূজা, শৈব, ব্রাহ্মণ্য, তান্ত্রিক মত ও হিন্দু ধর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, চারুকলা ও স্থাপত্যবিদ্যা নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এতে মনসা মঙ্গল, মহাভারতের অনুবাদ, বৈষ্ণব পদাবলী, যোগদর্শন বিষয়ক কবিতা ও নাটক আলোচিত হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সে যুগের মানুষের জীবনধারা। হিন্দু ও মুসলমানদের সমাজ জীবন, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সঙ্গে পর্তুগীজ অভিবাসী ও নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের জীবন ধারাও এসেছে।... হোসেন শাহী আমলের চার দশকের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিকাশমান ধারার মধ্যে এক নতুন বাংলার অভ্যুদয় দেখা গিয়েছিল। (পৃষ্ঠা ১১৫)

তরফদারে লেখায় মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি সমকালীন অর্থনীতিতে নগরায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকাও সমভাবে উঠে আসে। পাল-সেন যুগের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে তুর্কি শাসনামলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা, নগরায়ন, রপ্তানি বাণিজ্য ইত্যাদিতে উত্তরণ ঘটে।

মমতাজুর রহমান তরফদারের লেখা *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন* (১৯৯৩) গ্রন্থটি বাংলার মুসলিম আমলের বাণিজ্য, প্রযুক্তি, কারিগরি শিল্প বিষয়ক আরেকটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ এবং পাঠকের দরবারে বিশেষ সমাদৃত। এছাড়া *বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি* (১৯৭১) গ্রন্থটিতে তরফদার চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে আওয়াধী-হিন্দি সাহিত্যের কবি দাউদ, কুতবান, জয়সী, সনঝন প্রমুখের কাব্যের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা ব্যবহার, অলঙ্করণ ও চিত্র রচনার কৌশল বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ধারা রোমান্সমূলক প্রণয় কাব্যসমূহের ওপর আওয়াধী-হিন্দি কাব্যরীতির প্রভাব তুলে ধরেছেন। মার্ক্সীয় ইতিহাস তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত তরফদারের অসংখ্য গবেষণা প্রবন্ধে মধ্যযুগের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের নানা বিষয়কে তাত্ত্বিক কাঠামোর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আবদুল করিম, এমএ রহিম ও মমতাজুর রহমান তরফদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিনজন যশযশস্বী ইতিহাস গবেষক মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার যে ধারা সূচনা করেছিলেন তা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের বাইরের অনেক গবেষককে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বের বিশেষত এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাংলার মধ্যপর্বের ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় জগতের নানা বিষয়ে গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন। লেখার পরিধি না বাড়িয়ে কেবল কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থের নিচে উল্লেখ করা হলো :

সুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব ও *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল*, অসীম রায়ের *The Islamic Syncretistic Traditaion in Bengal*, রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল ইটনের *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, সৈয়দ এজাজ হোসেনের *The Bengal Sultanate: Politics, Economy and Coins (AD 1205-1576)*, অনিরুদ্ধ রায়ের *মধ্যযুগের বাংলা*, টনি কে স্টুয়ার্টের *Fabulous Females, and Peerless Peers: Tales of Mad Adventure in old Bengal, The Chaitanya Caritam and the Grammar of Religious Tradition, Witness To Marvels! Sufism and Literary Imagination* ও *Needle at the Bottom of the Sea*, আয়েশা এ ইরানির *The Muhammad Avatara: Salvation History, Translation, and the Making of Bengali Islam*, থিবো দ্যুবের Meaingful Rituals: Persian, Arabic and Bengali in the Nurnama Tradition of Eastern Bengal, মর্তুজা বশিরের *মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে বাংলার হাবশি সুলতান ও তৎকালীন সমাজ*, একেএম শাহনেওয়াজ রচিত *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি*, তপন রায় চৌধুরীর *Bengal Under Akbar and Jahangirnr*, খন্দকার মাহবুবুল করিমের The Provinces of Bihar and Bangla Under Shahjana. এই দীর্ঘ তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয়; তবে এটি স্পষ্ট মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, সংস্কৃতির অতীতনামা অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছেন বহু বিদগ্ধ পন্ডিত। বাংলার বহুত্ববাদী চেতনার মতোই উপরের তালিকাটি বহুমাত্রিক বিষয় ও মৌলিক অনেক সাওয়াল-জাওয়াব খোঁজার নিরন্তর প্রক্রিয়ার ফলাফল।

আবদুল মমিন চৌধুরী

আবদুল মমিন চৌধুরীর ইতিহাস চর্চার প্রতিপাদ্য প্রাগ আধুনিক পর্বের বাংলা। ১৯৬৫ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এ এল বাশামের নিকট প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তার অভিসন্দর্ভটি ১৯৬৭ সালে ঢাকাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে *Dynastic History of Bangal (c. 750-1200 A.D.)* শিরোনামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গবেষণা দিয়েই মমিন চৌধুরীর সুখ্যাতি ও পরিচিতি। কিন্তু তার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র বহুমাত্রিক। তার ইতিহাস চেতনায় ও দর্শনের কেন্দ্রে ছিল বাংলার মানুষের শেকড় অন্বেষণ, প্রাচীন সমাজ ও রাজনীতি, ভূগোল ও ইতিহাসের পারস্পরিক আদান প্রদান, বাংলায় ইসলাম বিস্তার, বাংলার স্থাপত্য ও শিল্পকলার স্বকীয়তা, ধর্মীয় উদারতা ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ।

সংস্কৃত ভাষা ও পুরালেখ বিদ্যায় পারদর্শী আবদুল মমিন চৌধুরীর গবেষণার ক্ষেত্র বাংলার আদিপর্ব বা প্রাক মুসলিম যুগ হলেও বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিক পরিবর্তনকে তিনি একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনুসন্ধান করেছেন। অধ্যাপক চৌধুরীর রচিত বাংলার অতীত অন্বেষণের বহুমাত্রিক গবেষণা নিবন্ধগুলো দেশ বিদেশের গবেষণা জার্নাল আর্টিকেল এবং একাডেমিক বক্তৃতা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিবন্ধ *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (এটি ২০০৯ ও ২০২২ সালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ) নামে এক মলাটে ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরীর গবেষণা জীবনের সর্বশেষ ও অনন্য বহিঃপ্রকাশ

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত যৌথভাবে সম্পাদিত দুই খণ্ডের *History of Bangladesh Early Bengal in Regional Perspective (up to c. 1200 CE)* এবং একক সম্পাদনায় প্রকাশিত *History of Bangladesh Sultanate and Mughal Periods (c. 1200-1800 CE), বাংলাদেশের ইতিহাস আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত) এবং বাংলাদেশের ইতিহাস সুলতানি ও মুঘল আমল (আনু. ১২০০ ১৮০০ সা. অব্দ)*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের অতীত লিখনের উদ্দেশ্যে *বাংলাদেশের ইতিহাস* শিরোনাম গ্রন্থমালা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশের তথা বাংলার ইতিহাসের দীর্ঘ কালসীমার একটি ধারাবাহিক রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯৮০ দশকের শেষ দিকে নিয়েছিল একটি গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এই গবেষণা প্রকল্প থেকে ১৯৯২ সালে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *বাংলাদেশের ইতিহাস* যা ১৭০৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পর্বের ইতিহাস বিষয়ক তিনটি খণ্ড। আবদুল মমিন চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রকাশিত উপরের গ্রন্থগুলো মূলত অতি প্রাচীনকাল থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। রণবীর চক্রবর্তী এবং আবদুল মমিন সম্পাদিত *History of Bangladesh Early Bengal in Regional Perspectives (up to c. 1200 CE)* এর দুটি খণ্ডের Foreword -এ রমিলা থাপারের নিম্নোক্ত ভাষ্যটি পোস্ট-কলোনিয়াল যুগে জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনেই প্রাচীন ইতিহাস চর্চার পাটাতনে এই গ্রন্থমালাকে অনুধাবন করতে সাহয্য করবে। তিনি লেখেন,

> Although the main title describes the volume as the history of Bangladesh, the contents cover much beyond that. The sub-title is the more appropriate description. The volumes cover the history of the region that was called Bengal—in its variant versions—and which in earlier times was more extensive as a single region, than that which lies within either of the current demarcations associated with the name Bengal…
>
> The concept of the region ... is not determined solely by territorial boundaries, nor does it necessarily coincide with the contemporary boundaries that demarcate the units of the Sub-continent. The awareness of identity draws from other factors as well as some of these may even have a deeper imprint. Factor such as language, social stratification, economic diversities and belief systems also contributed to creating an identity.

দক্ষিণ এশিয়ায় একডেমিক ও পপুলার হিস্টোরিকাল ডিসকোর্সের অন্যতম প্রতিবাদী স্বর অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারের উপর্যুক্ত মন্তব্যটি ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক কাল পর্বের অতীত অনুসন্ধানেও সমভাবে প্রযোজ্য। ভাষা, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস, ধর্মীয় বহুত্ব, প্রান্তজনের মানস জগৎ, অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল—ইত্যাদি নানা উপাদানের সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলার মানুষের সমাজ ও মানস জগতের পরিচয়।

বাংলাদেশের ইতিহাস গ্রন্থমালার সর্বশেষ প্রকাশিত দুই খণ্ড বাংলাদেশের ইতিহাস সুলতানি ও মুঘল যুগ (আনু ১২০০-১৮০ সা. অব্দ)-এর রাজনৈতিক ইতিহাসের ভূমিকা লিখেছিলেন সম্পাদক আবদুল মমিন চৌধুরী। বার পৃষ্ঠায় এই ভূমিকায় কিছু বিষয় পাঠকের সাথে হুবহু উপস্থাপনের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এআইয়ের যুগে এসে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস গবেষণা সম্পর্কে এই বর্ষীয়ান ইতিহাসবিদের মন্তব্যগুলোর সাথে দ্বিমত করার অবকাশ নেই বললেই চলে।

(ক) অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের শেষের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস বিনির্মাণে এই মধ্য পর্বের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ৭২ বছর আগের বাংলার মুসলিম পর্বের ইতিহাস লেখার উদ্যোগের ফসল ছিল রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামে উপস্থাপনা। তখন ব্যাপক গবেষণা এবং উপযুক্ত লেখকদের অভাবে ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। তবে বিগত ৭২ বছরে ভারতবর্ষে এবং বহির্বিশ্বে এ বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। (পৃষ্ঠা xxii)

(খ) বিগত ৭২ বছরে অসংখ্য নতুন আকরসূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—বিশেষত মুদ্রা এবং লেখ। এগুলোর বিশ্লেষণে শাসকের কাল নির্ণয়, ধারাবাহিকতা এবং কালানুক্রমে পরিবর্তন হয়েছে। বাংলার মুসলিম মুদ্রার সংকলন প্রকাশ করেছেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী, আহমদ হাসান দানী, আবদুল করিম ও সুতপা সিনহা।.... একইভাবে মুসলিম লেখমালার সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। আদিতম সংকলনটি ছিল শামসুদ্দিন আহমদের এবং আবদুল করিম তাকে অনুসরণ করেন। আমাদের গ্রন্থটিতে সাম্প্রতিক সময়ের আবিষ্কৃত লিপিতাত্ত্বিক ও মুদ্রাতাত্ত্বিক আবিষ্কার বিষয়ক একটি অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি গবেষকগণ এধরনের উৎসের অবহেলার দায় থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন। (পৃষ্ঠা xxii)

(গ) বাংলার স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছরের শাসনে দিল্লির সঙ্গে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এই কালপর্বটি বাংলার ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে বাংলার মানস জগতে স্বাধীনতার চেতনা অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং এই এলাকার পরবর্তী ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

....স্বাধীন সুলতানি যুগ ছিল সেই পর্ব যখন বিদেশী মুসলিম শাসন বাঙালি মুসলিম শাসনে পরিণত হয়—আলোচ্য সময়ের অৎপর্য সম্পর্কে আমাদের এই মন্তব্যটি অত্যুক্তি নয়। 'বাংলা' (স্বাধীন ও একত্রিত একটি সত্তা) ধারণাটি এ সময়ের পূর্ণতা পায়। 'বাংলা' নামে একটি ভৌগোলিক সত্তা তৈরি হয়েছেল এবং মুঘলদের সময় সেটি হয় সুবাহ-ই-বাঙ্গালা; চূড়ান্তভাবে ব্রিটিশ শাসনের সময় 'বেঙ্গল'। এই পর্বের ইতিহাসের পুরোটা সময় একটি স্বতন্ত্র বাংলা চেতনার প্রতিপালন করা হয়। ১৯১৭ সালে বাংলাদেশের জন্মের মাধ্যমে এই চেতনার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমাদের এই উক্তিটি নিশ্চয়ই ভুল নয়। (পৃষ্ঠা xxii)

(ঘ) স্বাধীন সুলতানি যুগে ধর্মীয় বহুত্ববাদ' ছিল রাষ্ট্রীয় নীতি। বাংলার সুলতানরা স্থানীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। সুলতান এবং তার কর্মকতাদের অর্থানুকূল্যে রামায়ন ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হয়। স্বাধীন সুলতানি যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়। (পৃষ্ঠা xxiv-xxv)

(ঙ) দুই শতকের স্বাধীন সালাতানাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বাংলার সমাজে অনুভূত হয়— বাংলার পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাংশে ইসলামের বিস্তার। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকাতায় সুফিরা ধর্ম প্রচারকের ভূমিকা পালন করেন এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এর ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়—হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের প্রয়াসেই। প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায় এবং এটি বাংলার সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহিষ্ণুতার মনোভাব সৃষ্টি করে ধর্মীয় ক্ষেত্রসহ।

আদি মধ্যপর্বেই (সা. অব্দ সাত থেকে বারো শতক) বাংলার সমাজে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। স্বাধীন সুলতানের সহিষ্ণুতার প্রবণতাটি আরো দৃঢ় হয়।

এই সহিষ্ণু মনোভাব বাংলার সমাজে বিশ শতকের শুরুর দিকেও বিরাজমান ছিল। ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির বলে এই সম্প্রদায়িক সম্প্রতি বাধাগ্রস্থ হয়। (পৃষ্ঠা xxv-xxvi)

বাংলার মুসলিম সমাজ গঠনের বৈচিত্র্যময় বহুমাত্রিক যৌগিক প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গতিময়তা অনুসন্ধানের চেষ্টায় আবদুল মমিন চৌধুরীর কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ২০১৯ সালে 'জ্ঞানতাপস আব্দুল রাজ্জাক গুণিজন বক্তৃতামালায় মমিন চৌধুরী বাংলার বহুত্ববাদী মানস জগতের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বাংলার ধর্ম-সামাজিক জীবনকে বীক্ষণ করেছিলেন। 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলায়' শিরোনামা বক্তব্যটির শুরুতে তিনি ইতিহাস বিদ্যার মৌলিক সংকটের সদয় স্বীকারোক্তি করে বলেন,

> ইতিহাসের ব্যাখ্যান অনেক সময়ই দ্বিমুখী প্রক্রিয়া বলে মনে হতে পারে—বর্তমানের প্রয়োজনে অতীতে খুঁজে বেড়ানোর প্রক্রিয়া কিংবা অতীতের প্রতিচ্ছবি বর্তমানের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এই প্রতিচ্ছবি সমসাময়িক রাজনৈতিক কল্পনা-প্রসূত অতিকথা সৃষ্টিতেও সাহায্য করে। এ ধরনের রাজনৈতিক প্রচারণায় সহায়ক ভূমিকায় অনেক সময়ই ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানীর সৃষ্ট-জ্ঞানকে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

তিনি উদাহরণ হিসেবে হিটলার কর্তৃক আর্য জাতির ধারণাকে ব্যবহার এবং হিন্দু ও মুসলিম দুটি আলাদা 'নেশন' ধারণাকে পাকিস্তান সৃষ্টির

প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করেন। প্রথম ধারণাটিকে বিশ শতকের একাধিক ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় ধারণাটিও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বক্তৃতাটির তাত্ত্বিক কাঠামো সমাজ বিজ্ঞানের ধর্মীয় উগ্রতার বিপরীতে ব্যবহৃত pluralism বা বহুত্ববাদ ধারণাটি। যার নানাবিধ অর্থের মধ্যে রয়েছে :

(ক) কোনো একটি ধর্মই সত্যের একক ও বিশিষ্ট উৎস নয়; অন্য ধর্মগুলিতেও সত্যও মূল্যবোধ আছে।
(খ) একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় কিংবা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বিদ্যমান সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সমঝোতা।
(গ) ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় সহ-অবস্থান।
(ঘ) রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিক সমাজের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সমাজের সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি।

এই ধারণার আলোকে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আদিকাল থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙালির ধর্মীয় ও সামাজিক জগতের নানা প্রমাণ তিনি উপস্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে— ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের আগেই বাংলার সমাজের মানবতাবাদ ও সহঅবস্থানের সংস্কৃতির উত্থান, যার প্রমাণ বাংলার প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তিসমূহ; পাল রাজাদের ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের জন্য ভূমিদান; সভাকবিদের প্রশস্তি অংশে বৈদিক চরিত্রের মাধ্যমে পালরাজাদের ভূয়সী প্রশংসা কিংবা বৌদ্ধ পাল প্রশাসনে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতি।

আবদুল মমিন চৌধুরীর মতে, বাংলার এই উদার মানবতাবাদী চরিত্রই মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের আমলে চর্চিত ও পালিত হয়েছে। স্বাধীন সুলতানদের সৈন্যবাহিনীতে অমুসলিমদের উপস্থিতি, শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক স্থানীয় চাপ ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সকল ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সম-নাগরিক অধিকারের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি বক্তব্যের ভিত্তি দাড় করান। বাংলার মানবতাপ্রেমী সংস্কৃতি বহুত্ববাদের একটি ফসল। সতের শতকের মুসলিম কবি লাল মাহমুদের নিম্নোক্ত কবিতাংশে যেন এই বক্তব্যেরই অনুরণন :

হিন্দু কিম্বা হোক মুসলমান।
তোমার পক্ষে সবাই সমান
আপন সন্তান জাতির কি বিচার।
ভক্ত সকল জাতির শ্রেষ্ঠ চন্ডাল কি চামার
কেহ তোমায় বলে কালী, কেহ বলে বনমালী
কেহ খোদা আল্লা বলি তোমায় ডাকে সারাৎসার।

একই রকম চেতনার প্রমাণ পাওয়া যায় *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* এবং *মৈমনসিংহ গীতিকার* 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা' গীতে :

হেঁদু আর মোছলমান এক্কই পিন্ডের দড়ি
কেহ বলে আল্লা রসূল কেহ বলে হরি
বিছমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু এক্কই গোয়ান
দোফাক করি পরভ রাম রহিমান।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। ফলে বাংলা সাহিত্য স্মৃতিবহন করছে হিন্দু-মুসলিমের সমন্বয়ের; সুলতানি আমলের থেকে তা স্থানান্তরিত হয়েছে মুঘল সুবাদারদের শাসনকালে। মমিন চৌধুরীর প্রস্তাবনা হলো : 'প্রাচীন যুগের মানবতা-আশ্রয়ী সমন্বয় প্রবণতা মধ্যযুগের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহিরাগত শাসকদের রাজত্বকালে বাধাতো পড়েইনি, বরংচ আরো শক্তি সঞ্চয় করে ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বহুত্ববাদের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করছে।' (পৃষ্ঠা ২১) তিনি বক্তব্যের শেষে দৃষ্টান্ত টানেন শ্রীচৈতন্যের নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের। এ আন্দোলনটি বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তার 'মানবতা' এবং 'প্রেম'-এর ঐতিহ্যকে ভর করে। ইসলামের সাম্যবাদের বিপরীত প্রান্তে মানব প্রেমের শক্তিতে চৈতন্য মোকাবেলা করেছিলেন 'রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বর্ণবাদী' মনোভাবকে। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বাংলার আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিত' ধর্মীয় সমন্বয়ের ধারা গড়ে উঠে।

বৌদ্ধ সহজিয়া, মুসলিম তাসাউফ এবং বৈষ্ণব মানব প্রেম—এই ত্রিমুখী স্রোতের সমন্বিত ধারায় সৃষ্টি হয় সহজ প্রেম। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাংলার বাউলদের উত্থানের মাধ্যমে। উদারতা বাংলার ইতিহাসের উত্তরাধিকার। এখানকার সমাজের অতীত প্রবাহ ও ধর্ম সংস্কৃতিকে এই মনোভাব যুগ থেকে যুগে স্থানান্তরিত হয়েছে। পেয়েছে নতুন শক্তি ও গতি। বাউল সাধক লালনের গানে যেন সেই কুহুকুহু ডাক :

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে তার কাছে জাতির বিচার নাই
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হলো।

সহিষ্ণুতা ও সাম্যভাবনা—প্রসূত 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ' এর ধারণা উপনিবেশ পূর্ব বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য। বাংলার ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কৃতি চিরকালই গুরুমুখী। বাংলার ইসলামে 'সুফিবাদ' জনপ্রিয়। গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সুফি বা পিরের দরগা। ধর্ম, বর্ণ, বয়স নির্বিশেষে সকলের কাঝে সম্মানের। পীর বা গুরুভক্তি বাংলার জনমানসের 'ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কৃতি বিশেষ অঙ্গ'।

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের একজন শিক্ষানবিশ গবেষক হিসেবে নলিনীকান্ত ভট্টশালী, যদুনাথ সরকার, আহমেদ হাসান দানী, আবদুল করিম, মমতাজুর রহমান তরফদার আমার কাছে ইতিহাসের গুরু (উস্তাদ অর্থে সুফি তরিকার মুর্শিদ অর্থে নয়)। তাদের কাছ থেকে শ্রেণিকক্ষে বা বিদ্যায়তনের প্রচলতি পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ আমার হয়নি। আহমদ হাসান দানীর সরাসরি ছাত্র ছিলেন আবদুল করিম ও আবদুল মমিন চৌধুরী। এদের মধ্যে আবার আবদুল করিমকে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন আবদুল মমিন চৌধুরী। ইতিহাস চর্চায় এদের মাঝে আদর্শগত পরম্পরা তৈরি না হলেও তারা ছিলেন বাংলাদেশের অতীত অন্বেষণের দীর্ঘ যাত্রার সারথী। শ্রেণীকক্ষ এবং পিএইচডি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বর্তমান লেখক আবদুল মমিন চৌধুরীর ছাত্র। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস চর্চার এই দীর্ঘ কথন শেষ করতে চাই শিক্ষকের বক্তব্যকে কর্জ নিয়ে :

> বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এই সীমিত পরিসরে তুলে ধরা যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বা প্রায় দূর সাধ্য তা মেনে নিয়েই আমার এই প্রয়াস। আমি এ বিষয়ে সজাগ যে, আমার বক্তব্য সর্বৈব সত্য এবং গ্রহণীয়— এমন দাবি করার দুঃসাহস আমার নেই। এই প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে ঐতিহাসিকের সমাজ সচেতনতা ও ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতি দিক-নির্দেশনার অন্যতম দায়িত্ব বোধ থেকে।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন : আত্মজীবনী*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪
নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাঙালির ইতিহাস চর্চার ধারা (১৯০১- ১৯৫০)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭
Abdul Karim, *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A.D. 1538)*, Dhaka: Asiatic Society of Pakista, 1959 (Reprint in 1985, Chittagong: Baitusharaf Islamic Research Center)
M A Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol. 1 and 2.
Abdul Momin Chowdhury, *A Revered Offering to Nalinikanta Bhattasali A Versatile Scholar*, Dhaka: Bangladesh National Museum, 2013
Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti (ed.), *History of Bangladesh, Early Bengal in Regional Perspectives (c. Up to 1200 CE), Vol. 1, Archaeology, Political History and Polity,* Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2018; *Vol. 2, Society Economy Culture,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2018.
আবদুল মমিন চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস, আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত)*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৯।
Abdul Momin (ed.), *History of Bangladesh History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods (c. 1200-1800 CE),* Vol. 1, *Political History* and Vol. 2, *Society Economy Culture*, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2020
আবদুল মমিন চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস : সুলতানি এবং মুঘল যুগ (আনু. ১২০০-১৮০০ সা. অব্দ), প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২০
এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২
যদুনাথ সরকার, 'প্রতাপাদিত্যের পতন', প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭ বা.স.,পৃ. ১—৯; অগ্রহায়ণ ১৩২৮ বা.স., ১৪৫—৫৩; ভাদ্র, ১৩২৯, বা.স. ৬৩৬—৪৫
যদুনাথ সরকার, 'এ নিউ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইন জাহাঙ্গীরস টাইম', দি জার্নাল অফ দি বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, পাটনা, ভল্যুম ৭, ১৯২১
মির্জা নাথান, *বাহারীস্তান ই গায়েবী*, (অনু. খালেকদাদ চৌধুরী), ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯, পুনঃপ্রকাশ, ২০০৪।

‘ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান’

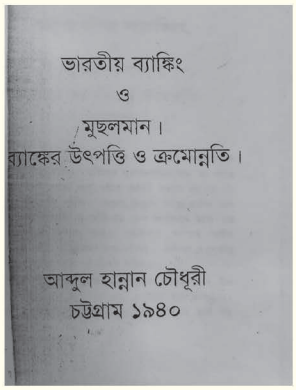

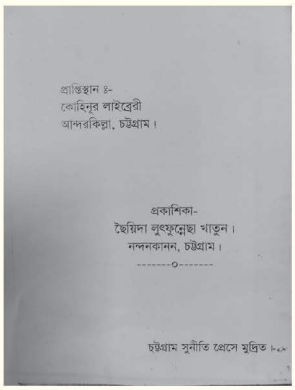

উপলক্ষ

ডিজিটাল আর্কাইভ বাংলাদেশ অন রেকর্ডের কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের শুরুর দিকে সাবেক রাষ্ট্রদূত নাসিম ফেরদৌসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। বাংলাদেশের প্রথম নারী রাষ্ট্রদূত হিসেবে তার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অমূল্য। তার আত্মজীবনী *বসন্ত হাওয়ার দিনগুলো* তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য। আলোচনার এক পর্যায়ে তার বাবা আব্দুল হান্নান চৌধুরীর প্রসঙ্গ আসে এবং তিনি আমাকে তার লেখা *ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান* বইটির একটি কপি দেন। ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ৬২ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করি। স্বল্পকথায়, সরস ভাষায় ব্যাংক ব্যবসার মতো জটিল বিষয় অর্বাচীন পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মুনশিয়ানায় আমি মুগ্ধ হলাম।

বাংলা ভাষায় অর্থনীতিবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা এমনিতেই কম, তার মধ্যে মুসলমানদের রচিত বই তো হাতেগোনা। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী অনুযায়ী, ১৮৫০-১৯৪৭ সালের মধ্যে অর্থনীতি সম্পর্কিত মাত্র ১৩টি বই প্রকাশিত হয়েছিল। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরো কিছুটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ আমাদের আলোচ্য বইটির মতো বেশকিছু বই হয়তো এখনো গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান বইটি তাই আমার কাছে ঈদের চাঁদ! বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার এক হারিয়ে যাওয়া রত্নের আবিষ্কার!

আব্দুল হান্নান চৌধুরীর (১৯০৪-৭৭) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বইটির মূল্যায়নে হয়তো সহায়ক হবে। যেকোনো লেখা শেষ পর্যন্ত লেখকের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মননের প্রতিফলন। শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি ছিলেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম উচ্চশিক্ষিত হিসাববিদ বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ১৯২৪ সালে তিনি গ্লাসগোর করপোরেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের সহযোগী সদস্য হন এবং ১৯২৯ সালে বার্মিংহামের ইনস্টিটিউট অব কমার্সের সদস্যপদ লাভ করেন। একই বছর তিনি ‘ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান’ শিরোনামে একটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করেন।

আব্দুল হান্নান চৌধুরীর পেশাগত জীবনও ছিল ব্যস্ত ও বৈচিত্র্যময়। তিনি মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও অডিটর হিসেবে চার বছর কাজ করেন। দেশে ফিরে ১৯৩০ সালে দিল্লিতে মেসার্স গোভান ব্রাদার্সে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে যোগ দেন। এরপর দুই বছর ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনে কমার্শিয়াল অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে বীমা খাতে যুক্ত হন, যা ছিল মুসলমান মালিকানাধীন প্রথম ভারতীয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর উৎসাহে গোলাম মোহাম্মদ (পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল) এ কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩২ সালে এবং আব্দুর রহমান সিদ্দিকী (পরবর্তী সময়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচিত মেয়র ও পূর্ব বাংলার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর) ছিলেন এর প্রথম চেয়ারম্যান। হান্নান চৌধুরী ছিলেন কোম্পানির প্রথম চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পরে তিনি পরিচালনা পর্ষদের একজন পরিচালক হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ট্যারিফ কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৬১-৬২ সালে তিনি এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তানের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তী দুই বছর হাবিব ব্যাংকের ব্যাংকিং পরামর্শক ছিলেন। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান বইটির নিবিড় পাঠ লেখকের এ বিপুল অভিজ্ঞতার নির্যাসে পুষ্ট করবে যেকোনো আগ্রহী পাঠককে।

বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে আর শব্দ খরচ না করে এ প্রচেষ্টায় লেখকের প্রেরণার কথাটাই বলি :

> মুছলমান সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধান উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ মুছলমান দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। শুধু গবর্নমেন্টের চেষ্টা ও সরকারী তহবিলের উপর নির্ভর করিলে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে না। চাই সমাজের শত সহস্র লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়সংকল্প। [পৃ :৫২]

লেখক কতখানি সফল হয়েছেন তা নির্ধারণের ভার পাঠকের। আমি শুধু বলব আজ থেকে প্রায় ৮৫ বছর আগে প্রকাশিত *ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান* বইটি নিশ্চিতভাবেই পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে আব্দুল হান্নান চৌধুরীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়সংকল্পের এক মহৎ নিদর্শন।

—সামসুদ্দোজা সাজেন
সাংবাদিক ও আর্কাইভিস্ট, বাংলাদেশ অন রেকর্ড

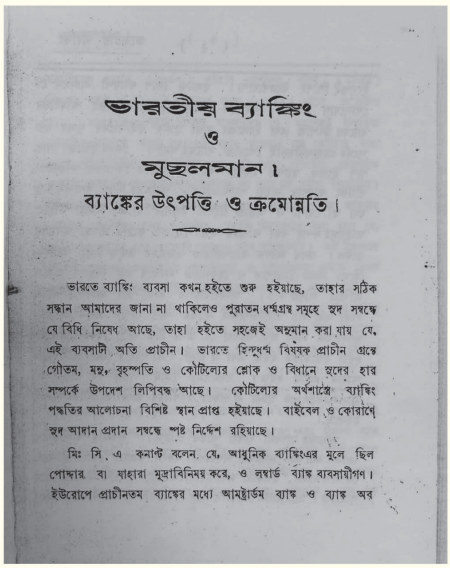

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং
ও
মুছলমান।
ব্যাঙ্কের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি।

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা কখন হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার সঠিক সন্ধান আমাদের জানা না থাকিলেও পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে সুদ সম্বন্ধে যে বিধি নিষেধ আছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই ব্যবসাটী অতি প্রাচীন। ভারতে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থে গৌতম, মনু, বৃহস্পতি ও কৌটিল্যের শ্লোক ও বিধানে সুদের হার সম্পর্কে উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির আলোচনা বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বাইবেল ও কোরাণে সুদ আদান প্রদান সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

মিঃ সি. এ. কনান্ট বলেন, যে, আধুনিক ব্যাঙ্কিংএর মূলে ছিল পোদ্দার বা যাহারা মুদ্রাবিনিময় করে, ও লম্বার্ড ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ। ইউরোপে প্রাচীনতম ব্যাঙ্কের মধ্যে আমষ্ট্রার্ডম ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অব

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও মুছলমান ব্যাঙ্কের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি

আব্দুল হান্নান চৌধুরী

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা কখন হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার সঠিক সন্ধান আমাদের জানা না থাকিলেও পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে সুদ সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই ব্যবসাটী অতিপ্রাচীন। ভারতে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থে গৌতম, মনু, বৃহস্পতি ও কৌটিল্যের শ্লোক ও বিধানে সুদের হার সম্পর্কে উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির আলোচনা বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বাইবেল ও কোরানে সুদ আদান প্রদান সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

মি. সি. এ. কনান্ট বলেন যে আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের মূলে ছিল পোদ্দার বা যাহারা মুদ্রাবিনিময় করে, ও লম্বার্ড ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ। ইউরোপে প্রাচীনতম ব্যাঙ্কের মধ্যে আমস্টারডাম ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হল্যান্ড দেশে কারেন্সি প্রচলনে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিবারণের জন্যই আমস্টারডাম ব্যাঙ্কের উৎপত্তি এবং ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের যুদ্ধের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তাই শেষোক্ত ব্যাঙ্কের জনক। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে বিলাতের স্বর্ণকারগণ ব্যাঙ্কিং কারবার করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের নিকট মূল্যবান ধাতু যথা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য জহরত ইত্যাদি থাকিত বলিয়া তাহারা তাহাদের সম্পদ রক্ষা করিরার জন্য পাহারার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিত। ক্রমে অন্যান্য ব্যবসায়ীও তাহাদের উদ্বৃত্ত টাকা স্বর্ণকারদিগের নিকট নিরাপদে ও হেফাজতে থাকিবে এই বিশ্বাসে গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করে। স্বর্ণকারেরা ঐ টাকা সুদে খাটাইয়া যাহারা টাকা জমা দিত তাহাদিগকেও লাভের অংশ বা সুদ প্রদান করিত। স্বর্ণকারেরা টাকা জমা রাখিয়া যে রসিদ দিত তাহা বিশ্বস্ত বিবেচিত হইয়া হস্তান্তরিত হইত এবং ঐ রসিদ টাকা পয়সার বিনিময়ে অবাধে আদান-প্রদান হইত। বর্তমানের 'নোট' 'চেক' ও Bills of exchange-এর সূচনা ঐ প্রকার স্বর্ণকারের রসিদ বা নোটের দ্বারাই হইয়াছে।

ভারতের মহাজনী ব্যবসা আরও প্রাচীন। বাঙ্গলায় যাহাদিগকে মহাজন বলা হয়, ভারতের অপরাপর অঞ্চলে তাহারা কোথায়ও শ্রফ, কোথাও বনিয়া, ছওকার, অপর কোথায়ও চেট্টি, নানবতি ইত্যাদি নামে পরিচিত। স্যার রিচার্ড টেম্পলের মতে (Journal of the Institute of the Bankers, Vol, II, 188) পুরাকালে ভারতে ১১৮০০০ হাজার কুসীদজীবী পুরুষ এবং পাঁচ লক্ষ গ্রাম ও প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দুইজন করিয়া বাণিয়া ছিল। ১৯২১ সালের আদমশুমারীতে ব্যাঙ্কিং কারবারে সমগ্র ভারতে ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার লোক নিয়োজিত ছিল; বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পুরাকালে মহাজনদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্রীয় ইজ্জত রাজা মহারাজাগণেরও ঈর্ষার বস্তু ছিল। দেশের শাসনকর্তার দরবারে তাহারা উচ্চ সম্ভ্রম লাভ করিত। আমরা পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ম ওলন্দাজ যুদ্ধের সময় তাঁহারই প্রজা সুবর্ণবণিক মহাজন-দিগের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া যুদ্ধ ও রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন। মোগল আমলে ভারতেও বাদশাহগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ দুর্দ্দিনে মহাজনের শরণাপন্ন হইতেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জগতশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি মহাজনগণের নাম কে না জানেন? দক্ষিণ ভারতেও চেট্টি ও শেঠগণ দেশীয় শাসনকর্তাগণকে এবং পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে যুদ্ধ বিগ্রহ চালাইবার জন্য অর্থ সরবরাহ করিতেন। এখনও তাঁহারা দেশীয় রাজ্যে প্রভূত প্রস্তাব প্রতিপত্তির অধিকারী। দেশীয় মহাজন ও মহাজনী ব্যবসায় সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এখানে আর তাহার আলোচনা না করিয়া আমরা সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাঙ্কিংয়ের ইতিহাস আলোচনা করিব।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মি. আর-এম মার্টিনের তালিকামতে (Indian Empire Vol. I, P. 565) ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে মোট ২৩টি ব্যাঙ্ক ছিল, তন্মধ্যে বাংলায় ৮টি, মাদ্রাজে ৪টি, বোম্বাইয়ে ৬টি এবং মফস্বলে ৫টি। সি. এন. কুক্ কিন্তু ১৯০৯ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ৩৯টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন— (Rise and Progress of Banking in India)। যতদূর জানা যায় ভারতের সর্ব্বপ্রথম ব্যাঙ্ক ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে গভর্নর গিফোর্ড কর্তৃক মাদ্রাজে স্থাপিত হয়। কেহ কেহ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তানকে ভারতীয় ব্যাঙ্কের আদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সূচনা ও দ্রুত প্রসারের মূলে রহিয়াছে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোগল আমলে ও ইংরাজের শাসনকার্য্য গ্রহণের পর প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে কাজ কাজবারের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দেশের মুদ্রা একীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে লিমিটেড লায়েবিলিটি অর্থাৎ সীমাবদ্ধদায় নীতি গ্রহণ করা হয়।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক কর্তৃক নোট ইস্যুর অধিকার বাতিল করিয়া দেয়া হয়। ইহার পর হইতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হয় এবং অল্পকালের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে ৪৪টি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সব কয়টিই ইউরোপীয় দ্বারা পরিচালিত হইত।

ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের অগ্রদূত এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ১৮৬৪ সালে স্থাপিত হয় এবং তৎপর এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব শিমলা (১৮৬৫), কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক (১৮৮১), পাঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক (১৮৯৪), পিপলস ব্যাঙ্ক (১৯০১), অমৃতসর ব্যাঙ্ক (১৯০৪) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫-০৬ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের যে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অন্যূন ১৫-১৬টি ব্যাঙ্ক কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সময়ে ভারতীয় জয়েন্টস্টক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন অন্তত শতকরা ৩১ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যদিও ১৮২৯-৩২, ১৮৫৭ ও ১৮৬৩-৬৬ সালে কয়েকটি ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিল তথাপি

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ১৯১৩-১৫ সালের মত মহাসঙ্কট ভারতে আর আসে নাই। এই উপলক্ষে বিদেশীয় মহলে ভারতীয়দের অকর্মণ্যতা ও অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা চলিয়াছিল ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও লালা হরকিষেণ ১৯২৫ সাল পর্যন্ত লাল তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। যে যে ব্যাঙ্কের মূলধন ও রিজার্ভ ৫ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব ছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৮ এবং এক লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধন (রিজার্ভ সমেত) ওয়ালা ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৪৬। ১৯২৯ সালে কেবল বড় বড় ৩৩টা ভারতীয় ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এবং মূলধন ও রিজার্ভ ছিল ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্তী ২৫ বৎসরে আমানত বাড়িয়াছিল ৫ গুণ এবং মূলধন সাত গুণেরও বেশী। ঐ সময়ে বিদেশীয় ব্যাঙ্কের আমানত বাড়িয়াছিল পৌনে চারিগুণ। এই তথ্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাঙ্কিং কারবারে ভারতীয় কিরূপ অগ্রসর হইয়াছে। গত দশ বৎসরে এ ব্যবসায়ে আরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে; তাহার অন্যতম কারণ ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা (১৯৩৫) [The Reserve Bank of India Act. (II of 1934)].

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তফশীলভুক্ত হইবার অন্য বহুসংখ্যক ভারতীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের মূলধন ও আমানত অল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

স্বদেশীযুগে প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া' (১৯১১) ভারতীয় ব্যাঙ্ক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ বিশেষত তাহার বিশেষত তাহার ভূতপূর্ব জেনারেল ম্যানেজার পরলোকগত স্যার পুচখানওয়ালা ও পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান পরলোকগত স্যার ফিরোজ শেঠনা যেকোন দেশের ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞদিগের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অব বরোদা ও ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অব মায়সোর ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের স্তম্ভস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া ভারতীয়দিগের দক্ষতা ও উপযুক্ততার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে বাংলার কয়েকটি ব্যাঙ্কের নাম অনায়াসে উল্লেখ করা চলে। যথা: ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন (১৯১৪), নাথ ব্যাঙ্ক (১৯২৬), মহালক্ষী ব্যাঙ্ক (১৯১০), কমরেড ব্যাঙ্ক (১৯৩৪) প্রভৃতি। ১৯২৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের তিরোধানের পর বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণ আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। উল্লিখিত ব্যাঙ্কসমূহের পরিচালনে বাঙ্গালীর সফলতা পুনরায় বাঙ্গালীর মনে বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করিয়াছে। নোয়াখালীর নাথ ব্যাঙ্ক গত ১০-১২ বৎসরের মধ্যে মোট ২২টি ব্রাঞ্চ স্থাপন করিতে ও কার্য্যকরী মূলধন ষোল হাজার টাকা হইতে এক কৌটি টাকায় বর্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

লোন কোম্পানী

বাঙ্গালাদেশে এক প্রকার জয়েন্টস্টক ব্যাঙ্ক আছে, তাহাদিগকে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। আমরা লোন কোম্পানীর কথা বলিতেছি। ১৯০৫ সালে তাহাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। তাহার মধ্যে ত্রিপুরা (১৮৭১), ফরিদপুর (১৮৭১), বরিশাল (১৮৭৩), বগুড়া (১৮৭৪) ও ঢাকার (১৮৮০) লোন কোম্পানীগুলিই প্রাচীন। ইহাদের আদায়ী মূলধন ১৮০০০ টাকা (বরিশাল) হইতে ১ লক্ষ টাকা (ত্রিপুরা) পর্য্যন্ত। ১৯৩৫ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৫০০ এবং ১৯৩৩ সালে ছিল ৮০০। তাহাদের আদায়ী মূলধন, রিজার্ভ ও আমানত মোট প্রায় ৯ কোটি টাকা। গত কয়েক বৎসর বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য তাহাদের অবস্থা অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়াও বাঙ্গালার মফঃস্বলে কতকগুলি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। চট্টগ্রাম শহরেই তাহাদের সংখ্যা ৩০-৪০ এর কম হইবে না। ইহাদের অধিকাংশই মহাজনী ব্যবসার নামান্তর। অল্প সুদে আমানত গ্রহণ করিয়া অধিক সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাহাদের প্রধান কারবার। স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলিতে সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য ও অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া হয় এবং ব্যাঙ্কের প্রাপ্য সুদ ও আসলে বন্ধকী মালের বাজারদরের সমান হইবার পূর্ব্বেই তাহা নিলামে বিক্রয় করিয়া স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লওয়া হয়। ইহাদের দ্বারা আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের কেবলমাত্র প্রাথমিক ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালার লোন কোম্পানীগুলি সঙ্ঘবদ্ধ মহাজনী ব্যবসারই নামান্তর। ব্যক্তিগত লাভ ও মূলধন বৃদ্ধি মহাজনী ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। দেশের আর্থিক উন্নতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিতান্তই গৌণ। ফলে মহাজনী ব্যবসার দ্বারা এক শ্রেণীর লোকের হাতে দেশের অর্থ ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থকরী প্রচেষ্টা মূলধনের অভাবে পঙ্গু হইয়া পড়ে। অপরদিকে খাতকশ্রেণী কেবলই শোষিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে খাতকের সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয় ও মহাজন কেবল টাকা পয়সারই নহে, অন্যান্য বন্ধকী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিরও মালিক হইয়া বসে। লোন কোম্পানীর মালিক ও পরিচালকদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। উভয়ের দ্বারাই জাতির ধনবৃদ্ধি না হইয়া সমাজের ভিতরে কেবল অর্থ হস্তান্তরিত হইয়া থাকে এবং উভয়েই খাতককে ধ্বংস করিয়া স্বীয় আর্থিক উন্নতি সাধন করে, ইহা কখনও কোন সমাজের অভিপ্রেত বা কল্যাণকর হইতে পারে না, মহাজনদিগেরও নহে। কারণ যে রাজহংসী তাহাদিগকে সুবর্ণ ডিম্ব প্রদান করে, তাহাকেই তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া এখন বাঙ্গালার দিকে দিকে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ মহাজনদিগের কার্য্যকলাপে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদিগের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও বিরূপতা পোষণ করিতেছে। লোন কোম্পানীর কল্যাণে বাঙ্গালার পুরাতন বহু জমিদারী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কোন কোনটি আবার মহাজনী লোন কোম্পানীর উপর জগদ্দল পাথরের মতন চাপিয়া বসিয়া তাহাকে পিষিয়া মারিতেছে। মোট কথা বাঙ্গালার লোন কোম্পানী ব্যাঙ্কিং নীতি ও প্রথাকে এত সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে, এখন এই অভিশপ্ত কারবার ধ্বংস হইয়া গেলেও কেহ একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।

ব্যাঙ্কের ভিত্তি বিশ্বস্ততার উপর একান্ত নির্ভরশীল। দায়িত্ব বহনের সামর্থ্য ও যেকোন অবস্থার সম্মুখীন হইবার মত উপযুক্ত আর্থিক বল সম্বন্ধে জনসাধারণের আস্থা না থাকিলে কোন ব্যাঙ্ক টিকিয়া থাকিতে পারে না দেশে অল্প মূলধন লইয়া গঠিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে ইহা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়। সঙ্কট উপস্থিত হইলে এই সকল ব্যাঙ্ক বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারিবে না, ফলে অংশীদার, ডিপজিটর প্রভৃতি জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি হইবে। স্বল্পবিত্ত জনসাধারণই এ সমস্ত ব্যাঙ্কের সহিত জড়িত এবং তাঁহারা সাধারণত ব্যাঙ্কের দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা বিচার করিতেও অক্ষম। আমাদের মতে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে গভর্নমেন্ট আইন প্রনয়ন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কসমূহকে সম্মিলিত হইয়া কাজ করিবার জন্য বাধ্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অধুনা বীমা ব্যবসাকে সংযত, সংহত ও শক্তিশালী করিবার জন্য যেরূপ ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বীমা আইন প্রণীত হইয়াছে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি বিধান করিবার উদ্দেশ্যেও তদ্রূপ আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা অস্বীকার করার উপায় নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার, ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন।

ব্যাঙ্কের কাজ

ব্যাঙ্কের কাজ দ্বিবিধ যথা: (১) লোকের অর্থশক্তির শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও (২) দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য দাদনের (credit) ব্যবস্থা করা। মূলধনের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির দ্বারা লোকের অর্থশক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। আদিমকালে ব্যাঙ্ক কেবল কর্জ্জদান ও আমানত গ্রহণের কাজ করিত; বর্তমানে টাকা পয়সা স্থানান্তরিত করা, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অর্থের সংস্থান করা ব্যতীত অন্যান্য বহু কাজ ব্যাঙ্কের মারফত হইয়া থাকে।

বর্তমান যুগকে মূলধনের যুগ বলা হয়। কারণ জাগতিক সমস্ত কারবার এমনকি জীবন ধারণ পর্য্যন্ত মূলধনের উপর নির্ভর করে। আদিম যুগে মূলধনের বালাই ছিল না। গুহাবাসীরা 'হাতে মুখে' জীবনযাপন করিত, অর্থাৎ ক্ষুধা পাইলেই শিকারে বাহির হইত এবং শিকার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। পরের দিনের চিন্তা তাহারা করিত না। সে স্বর্ণযুগ আর নাই। এখন আমরা কেবল পরের দিনের চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত নহি বরং পরের বৎসরের এমনকি পরবর্তী যুগের অভাব পূরণের সংস্থান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। তাই বলা হইয়া থাকে ব্যক্তি হিসাবে যেমন, জাতি হিসাবেও তেমন। যে জাতি যত দূরপ্রসারী ভবিষ্যতের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারে ও তাহার সংস্থান করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় সে জাতি তত সভ্য ও উন্নত। এই সংস্থান যাহার সাহায্যে করিতে হয় তাহাই মূলধন।

অর্থশাস্ত্রবিদেরা বলেন যে "যে সম্পত্তি দ্বারা আয় লাভ হয় বা আয় লাভে সহায়তা পাওয়া যায়, অথবা যাহার উদ্দেশ্য আয় লাভে সহায়তা করা, তাহাই 'মূলধন'। উহা দ্বারা জ্ঞান, কর্ম্মকুশলতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বুঝাইলে তাহাকে গণমূলধন (human capital) এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝাইলে উহাকে বস্তুমূলধন (material capital) বলা হয়। সংসারে একটির প্রয়োজন অন্যটির অপেক্ষা কম নহে। মূলধনের বন্দোবস্ত করা

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা মূলধনের জনক। যাহার আয়ের অপেক্ষা ব্যয় কম সেই সঞ্চয় করিতে পারে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর যেমন ব্যক্তিগত মূলধনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি নির্ভর করে, তেমনই জাতীয় মূলধন বা জাতীয় সম্পদ নির্ভর করে জাতির সমষ্টিগত সঞ্চয়ের উপর। ১৯১৩ সালে ইংল্যান্ডের মোট অর্জিত অর্থ ছিল দুইশত কোটি পাউন্ড। তাহা হইতে নূতন মূলধন সৃষ্টির জন্য এবং উৎপাদন যন্ত্রাদি চালু রাখিবার জন্য ৪০ কোটি পাউন্ড, অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া রাখা হয়। ভারতে অধিকাংশ লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই। জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরিয়া প্রভৃতি দ্বারাই ভারতে মূলধন সৃষ্ট হইতে পারে। টাকা বাঁচাইবার ও টাকা খাটাইবার সহজ পন্থা, সুবিধা সুযোগ থাকিলে শীঘ্র মূলধন বৃদ্ধি হয়। ব্যাঙ্কের কর্তব্য সঞ্চয়ের পথকে সুগম ও নির্ব্বিঘ্ন করিয়া দেওয়া এবং যাহাতে সঞ্চিত টাকার সদ্ব্যবহার করিয়া মূলধন বাড়ান যায় তাহার ব্যবস্থা করা।

মূলধনের অভাবে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতি সম্ভব হইতেছে না। বিদেশী মূলধন দ্বারা কারবার করিয়া দেশ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পরে দেওয়া যাইবে। সুগঠিত ও সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক না থাকায় একদিকে দেশের জনসম্পদ বেকার থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অন্যদিকে বস্তুমূলধন লাভজনকভাবে ব্যবহৃত হইবার সুযোগ না পাইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে। দেশে অর্থের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও মূলধনের অভাবে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতে পারিতেছে না ও অভাবের ফলে অধিকাংশ লোক জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে।

ব্যাঙ্কের প্রকারভেদ

কৃষিকার্য্য, শিল্প ও বাণিজ্য প্রত্যেক বিষয়েই মূলধনের প্রয়োজন। কিন্তু তাহা বিভিন্ন প্রকারের। বাণিজ্যে যে টাকা খাটান হয়, তাহা বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রিত হইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসে, সুতরাং তাহাতে দীর্ঘমেয়াদের ধারের প্রয়োজন হয় না। শিল্পে মূলধন কলকারখানা ও কাঁচামালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত না হওয়া পর্যন্ত মূলধন ফিরিয়া আসে না; কাজেই তাহাতে দীর্ঘমেয়াদের ধারের প্রয়োজন হয়। আবার কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত মূলধন বৎসরে বৎসরে ফিরিয়া আসে, যদিও কৃষিকার্য্যের সাফল্য নৈসর্গিক অবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া মূলধনের প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত অনিশ্চিত। এই সব কারণে মূলধন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের হওয়া প্রয়োজন।

ভারত গবর্নমেন্টের অর্থসচিব স্যার জেমস মেষ্টন ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়কে চারিভাগে বিভক্ত করেন, যথা : প্রথম সাধারণ ব্যাঙ্কিং, দ্বিতীয় জমি বন্ধকী, তৃতীয় সমবায়ী ও চতুর্থ শিল্পবিষয়ক। জাপানে অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, কৃষিশিল্প ও ঔপনিবেশিক কারবারের জন্য পাঁচ প্রকারের ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলান্ডেও বিবিধ ব্যবসায়ের জন্য পৃথক পৃথক ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল জার্মানিতে জার্মান গ্রস ব্যাঙ্কের সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও নানাবিধ ব্যাঙ্ক আছে; যথা : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, জয়েন্ট স্টক, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, কো-অপরেটিভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

দেশের বড় বড় যত ব্যাঙ্ক তাহার অধিকাংশই বিদেশী। ধনী ও বড় বড় ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেহই ঐ সকল ব্যাঙ্কের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। ইহা স্বাভাবিক যে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি প্রথমে স্বজাতীয়দিগকে অর্থ সরবরাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা অধিক সুদে এদেশে খাটাইবে। বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজনের জন্য ভারতে বিদেশী প্রায় কুড়িটা বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) আছে, কিন্তু ভারতীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক একটাও নাই। অল্পদিন হইল সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এই ব্যবসায়ে নামিয়াছেন। যে দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৪০০ কোটি টাকা (১৯৩৭-৩৮ সালে ৩৬৭ কোটি টাকা) দেশীয় বিনিময় ব্যাঙ্কের অভাব যে তাহার কত তীব্র ইহা সহজে অনুমেয়। স্বদেশী মূলধনের অপ্রাচুর্য্য কৃষিপণ্যের মূল্যহ্রাস ও আমদানী মালের মূল্যবৃদ্ধির কারণ।

দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা চালাইবার মত পর্যাপ্ত মূলধনের সংস্থানও আমাদের নাই। তজ্জন্যও আমাদিগকে বিদেশী ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে হয়। দেশীয় মহাজনগণও টাকা যোগান দিয়া থাকে, তবে তাহাদের সুদের হার এত চড়া যে তাহাদের টাকার দ্বারা ব্যবসায় চালাইয়া ব্যবসায়ীদিগকে লাভ করিতে হইলে কাঁচামাল খুব সস্তা দরে কিনিতে হয়। ফলে কাঁচামালের উৎপাদনকারীদিগের সমূহ ক্ষতি হয়। মালিক তাহার চাষের খরচও পোষাইতে পারে না। বাঙ্গালার কৃষকদিগের দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ

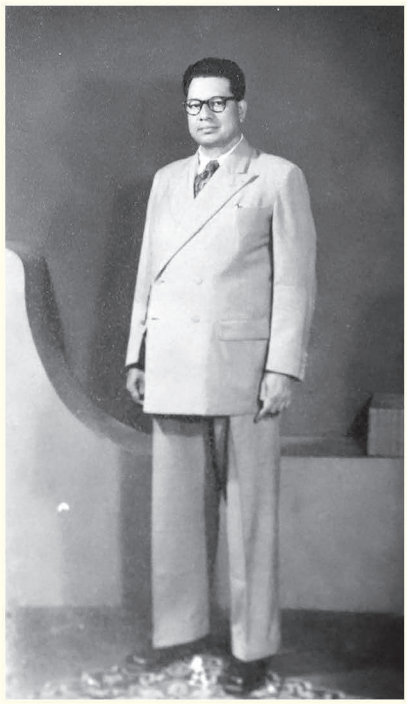

আব্দুল হান্নান চৌধুরী, ছবিটি সম্ভবত ষাটের দশকে তোলা।
সূত্র : নাসিম ফেরদৌস/ বাংলাদেশ অন রেকর্ড

ইহাও বটে। বিদেশের টাকা দ্বারা অন্তর্বাণিজ্য চালাইতে গেলে অনুরূপ ফল দাঁড়ায়। যে সকল বিদেশী সওদাগর এদেশ হইতে মাল চালান দেয়, তাহারাই আবার দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করে। তাহাদের এজেন্ট বা খরিদ্দার গ্রামে গ্রামে ও ব্যবসা কেন্দ্রে ঘুরিয়া কাঁচামাল সংগ্রহ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য ভূমির উপর থাকিতেই তাহারা দাদন দিয়া আসে এবং ফসল সংগ্রহকালে তাহা আদায় করে। দেশে ব্যাঙ্ক সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রচুর নাই বলিয়া রায়তকে অল্পমূল্যে তাহার পণ্য বিক্রয় করিতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের রায়ত, কৃষক ও মধ্যস্থ বেপারীগণ পর্যন্ত কিরূপ কঠোরভাবে বিদেশী মূলধনে কৃতদাসের মত নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইতে বাধ্য হয়। বিদেশী মূলধন খাটাইয়া ব্যবসা চালাইলে সুদের হার যাহা দাঁড়ায় তাহা মহাজনী হারের চেয়ে কম নহে।

আমদানী ব্যবসায়েও বিদেশী টাকা ও মহাজনের দয়ার উপর নির্ভর না করিলে আমাদের চলে না। কাজেই মফস্বলের গ্রাহকদের নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে আমদানী দ্রব্যের দামও অনেক বাড়িয়া যায়। বন্দরে মাল আসিয়া পৌঁছিলে ব্যবসায়ীদিগকে মাল ছাড়াইতে বিনিময় ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় এবং যাহারা মফঃস্বলে মাল চালান দেয় তাহারা হয় ব্যাঙ্ক নতুবা মহাজনদিগের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করে; বলা বাহুল্য যে ধারের সুদ পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করে এবং সুদের হার যত চড়া হয়, মূল্য ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। রাজকীয় কৃষি কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন যে এই প্রকার দাদনে মহাজনের টাকার সুদের হার শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৬০ টাকা। তদুপরি দালালদিগের কমিশন বা দালালী আছে। আসামে সুদের হার শতকরা ৩০ টাকা ও কমিশনের হার তিন মাসের ম্যাদে ৪৭।। ০ টাকা বাঙ্গালায় সুদের হার ৩৬ থেকে ৪৮ টাকা ও কমিশনের হার ২০ থেকে ২৫ টাকা। সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের মারফতে দেশীয় মূলধন ব্যবহৃত হইলে আমদানী-রফতানী বাণিজ্যের সংশ্রবে কত টাকা দেশের মধ্যে থাকিয়া যাইত তাহা উপলব্ধি করা কষ্টকর নহে। গত বৎসর ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল পৌনে দুইশত কোটি টাকার অধিক।

কৃষিকার্য্যের জন্য অর্থসংস্থান

দুঃখের বিষয়, কৃষির উন্নতির জন্য ঋণ, দাদন বা মূলধন দিয়া সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা দেশে অত্যন্ত স্বল্প। রাজকীয় কৃষি কমিশনের (Royal Agricultural Commission) রিপোর্টে সমস্ত ভারতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ৩৯টি বলিয়া উল্লিখিত

এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তানের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কোনো এক দাপ্তরিক সফরে। আনুমানিক ১৯৬২-৬৩ (বাঁয়ে)। করাচীর বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অতিথিদের সঙ্গে নৈশভোজ। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের পাশের আসনে আব্দুল হান্নান চৌধুরী। আনুমানিক ১৯৫৬-৫৮ (ডানে)। সূত্র : নাসিম ফেরদৌস/ বাংলাদেশ অন রেকর্ড

হইয়াছে। তখন বাঙ্গালাদেশে মাত্র একটি ও আসামে মাত্র দুইটি ব্যাঙ্ক ছিল। এই প্রকার ব্যাঙ্ক স্থাপনে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী মাদ্রাজ প্রদেশ, তারপর পঞ্জাব। বর্তমানে দেশে গ্রামোন্নয়ন, অন্য কথায় কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য স্বয়ং বড়লাট লর্ড লিনলিথগো হইতে আরম্ভ করিয়া গান্ধী মহারাজ ও সরকারী বেসরকারী, কংগ্রেস, মুছলিম লীগ ইত্যাদি গণপ্রতিষ্ঠান এমনকি গ্রামের নিরক্ষর অধিবাসীবৃন্দ পর্যন্ত যেরূপ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে গ্রামোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির প্রতি দেশবাসীর, বিশেষত গবর্নমেন্টের অধিকতর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

বাঙ্গালা দেশের কথাই ধরা যাউক। শহর ছাড়িয়া গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে গ্রামবাসীর দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী প্রজা ও কৃষক। বাকি কয়জন জমিদার, তালুকদার, মহাজন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ইহা বলাই বাহুল্য যে প্রজা ও কৃষকের উন্নতি ও অবনতির উপর গ্রামের—অন্য কথায় সমগ্র দেশের—উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে। গ্রামের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথম কৃষকের পূর্ব্বকৃত ঋণ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। তৎপর তাহার পেশা পরিচালনের ও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মূলধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করিতে হইলে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ছাড়াও দেশে শত শত ব্যাঙ্ক অফিস খুলিতে হইবে, তাহাদের সাহায্যে খাঁটী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বহুল বিস্তৃতি সাধন করিতে এবং কৃষক যাহাতে সহজে চাষ আবাদের সময় বা পণ্য সংগ্রহের সময় প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা তাহার পণ্যের মূল্য চাষের খরচের অপেক্ষাও কম থাকিয়া যাইবে।

কৃষি কার্য্যের প্রয়োজনীয় মূলধন সাধারণত দুই প্রকারের। প্রথমত : কৃষককে সম্বৎসর খাই খরচা চালাইয়া পরিবারবর্গসহ বাঁচিয়া থাকিতে হয়। কৃষির জন্য বীজ, সার, হালের গরু, লাঙ্গল ইত্যাদি যোগাড় করিতে হয়; দ্বিতীয়ত : জমির উৎকর্ষ সাধন করিতে, ঋণের সুদ বহন করিতে ও কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য ব্যবস্থা করিতেও অর্থের প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালার কৃষিজীবীর সংখ্যা বর্তমানে ৩ কোটির মত এবং কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ২ কোটি ৪৬ লক্ষ (১৯৩৬-৩৭ ও ১৯৩৭-৩৮ সালের গড়) একর অর্থাৎ জনপ্রতি এক একর অপেক্ষা কিছু কম।

বাঙ্গালার প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি বগুড়া জেলার করিমপুর গ্রামের ৫২টি পরিবারের দেনার হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া ছিলেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে তাহাদের ১৯২৯-৩০ সালে সকলের মোট দেনা ছিল ৯১৩২ টাকা ও ১৫৯ মণ ধান এবং ১৯২৮-২৯ সালে তাহারা ধার করিয়াছিল মোট ২৭১৫ টাকা। তন্মধ্যে সাবেক ঋণ-শোধের জন্য ব্যয় করিয়াছিল ৩৮৯ অর্থাৎ হাল সনের ঋণের শতকরা ১৪ ভাগ। চাষের পশুক্রয় সমেত অন্যান্য স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য ১০৮৭ টাকা, বা শতকরা ৪০ ভাগ, জমির খাজনা ইত্যাদির জন্য ৫৭৩ টাকা বা ২১ ভাগ, চাষ খরচের জন্য ৪৩৫ টাকা বা শতকরা ১৬ ভাগ, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবের জন্য ১৫০ টাকা বা শতকরা আধ ভাগ এবং অন্যান্য বাবদে ৬৬ টাকা বা শতকরা ২০ ভাগ।

এই স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নূতন ঋণের প্রায় অর্দ্ধেক কৃষি কার্য্যের স্থায়ী উন্নতি সাধনকল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল এবং শতকরা ৫।। ০ ভাগ মাত্র সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসবের জন্য বায়িত হইয়াছিল। যদি নূতন ঋণ অল্পায়াসে ও কম সুদে পাওয়া যাইত, তবে কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য আরো অধিক টাকা ব্যয় করিতে পারিত ও ফলে তাহাদের আয় ও বৃদ্ধি পাইত।

পণ্য-শিল্প ব্যাঙ্ক

বর্তমানে পণ্য-শিল্পের বিস্তৃতির উপর সমধিক জোর দেওয়া হইতেছে।

ভারতের লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে (১৯৪১ সাল পর্যন্ত ৪০ কোটি পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা) তাহাতে অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দেশে ছোট বড় কারখানার দ্রুত প্রসার খুব জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ব্রিটিশের আগমনের পূর্ব্বেও ভারতীয়েরা কৃষিদ্বারা অন্নের সংস্থান করিত ও পণ্যশিল্পের দ্বারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিত। কর্ষণযোগ্য ভূমি বর্ত্তমানে পতিত অবস্থায় বেশী পরিমাণে নাই; সুতরাং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-শিল্পের উন্নতি দ্বারা কৃষিজাত সামগ্রীর পরিমাণ বাড়াইয়া লওয়া ছাড়া ভূমির উপরে অন্য কোনো প্রকার চাপ দেয়া অনর্থক। অতএব পণ্যশিল্পের প্রসারের প্রতিই আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। কুটির-শিল্পের উন্নতিসাধনে ও ছোট, বড়, মাঝারি কলকারখানা স্থাপনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তজ্জন্য মূলধনের দরকার। সাধারণ বাণিজ্য-ব্যাঙ্কের দ্বারা এই মূলধন সংগ্রহ করা অসম্ভব। তদুদ্দেশ্যে বিশেষ রকমের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান করিবার জন্য জাপানে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক আছে ও তাহারা দীর্ঘমেয়াদের ধারের কারবার করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও কয়েকটি পণ্যশিল্প ব্যাঙ্ক আছে, কিন্তু তাহা মোটেই পর্যাপ্ত নহে—বিশেষত বাঙ্গালাদেশে। ভারতে যতগুলি শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে টাটা শিল্প-ব্যাঙ্কই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ। উহা ১৯১৭ সালে স্থাপিত হয়। উহার আদায়ী মূলধন সোয়া দুই কোটি টাকার উপর। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত কর্ণাণী ব্যাঙ্কের মূলধন ৬০ লক্ষ টাকা। এই প্রকার ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে মোট এক ডজনের বেশী হইবে না।

হায়দ্রাবাদের Industrial Trust Fund নিজাম রাজ্যে বহুসংখ্যক উন্নতিশীল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জনক ও পোষক। আজ পর্যন্ত এই ফান্ডের মোট মূলধন ১,২১ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর নিজাম রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব হইতে ২৭ লক্ষ টাকা ইহার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ফান্ড হইতে শিল্পবৃত্তি শিক্ষায় সাহায্যদান, কুটির শিল্পের মূলধন সরবরাহ, যৌথ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয়, রাজ্যের খনিজ সম্পদ আহরণ করিবার জন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্যদান করা হইয়া থাকে। ফলতঃ অল্পদিনের মধ্যে এই ফান্ড রাজ্যের শিল্পোন্নতির চেষ্টায় যেরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহার উপযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া দাবি করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার 'শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায় হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর রাজ্যের শিল্পনীতির সাহায্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।'

পণ্যশিল্পের জামীন (Security) সাধারণতঃ (১) জমি ও কলকারখানা (২) কার্য্যকরী মূলধন, (৩) কাঁচামাল ইত্যাদি। ইহাতে বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক নানা কারণে টাকা ধার দিতে পারে না। তাই শিল্পোন্নতির জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক স্থাপন অপরিহার্য্য।

ভারতের পণ্যশিল্প বিস্তারের ধারা হইবে আলাদা। অধিকাংশ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইবে কুটিরে ও ছোট ছোট কারখানায়—যাহাতে গ্রামবাসীর

কৃষিকার্য্যের মধ্যে যে অবসর সময় থাকে, তাহাকেও উপার্জিত অর্থে পরিণত করা যায়। যে যে শিল্প খুব বৃহদাকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহা ছাড়া জাপানের অনুকরণে এবং পাশ্চাত্যকে পশ্চাতে রাখিয়া দেশময় ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেক পরিবার, গ্রাম, তহশীল ও জিলায় উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পণ্যোৎপাদনের এক একটি প্রক্রিয়া (manufacturing process) বা গোটা সামগ্রীর এক একটি অংশ বিভিন্ন আয়তনের বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মারফতে প্রস্তুত করা হইবে এবং অবশেষে তাহা প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় কারখানাগুলিতে একত্রিত (assemble) করা হইবে। সেইখানেই সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহাতে কর্মীগণ নিজ নিজ আবাসে থাকিয়াই ঐ সমস্ত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এক জায়গায় অধিক লোক একত্রিত, বাস করিতে বাধ্য হইবে না। ফলে আধুনিক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলি, যথা : বাসগৃহ, জনস্বাস্থ্য, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত ইত্যাদি উপস্থিত হইবে না; অথচ ধর্ম্মঘট, লকআউট ইত্যাদি ও তাহার অনভিপ্রেত ফলাফল হইতে সমাজ নিরাপদ থাকিবে।

এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দরকার। গভর্নমেন্টের সহায়তা ছাড়া ঐ সব প্রতিষ্ঠান সফলতা লাভ করিতে পারে না। অতএব যাহাতে পণ্যশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে গবর্নমেন্টকেই অগ্রণী হইয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় State Aid to Industries Ac সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সরকারের এই আইনাধীন আর্থিক সাহায্য লইতে হইলে যে যে শর্ত পূরণ করিতে হয় তাহা খুব কঠোর। বেসরকারি ঋণ ইহার চেয়ে সহজলভ্য।

বাঙ্গালায় একটা খাটি প্রাদেশিক শিল্প ব্যাঙ্কের আশু প্রয়োজন এবং তাহার অধীন শিল্পপ্রধান প্রতি কেন্দ্রে স্থানীয় প্রয়োজনের দাবি অনুসারে আরো কয়েকটি শিল্প-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আবশ্যক। খাঁটি ব্যাঙ্কিং ছাড়া আরো কয়েকটা বিষয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইবে। যথা :

১। নূতন নূতন শিল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতা বিচার করিয়া তাহার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠনে সরকারি শিল্প-বিভাগের সহায়তায় শিল্পোদ্যোগীদিগকে উৎসাহ প্রদান করা।

২। বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিল্প উৎপাদন ও বিক্রয় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা এবং পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইলেই নিজ পরিচালনাধীন ডিপোতে স্থানান্তরিত করিয়া বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদনকারীর জন্য দাদনের ব্যবস্থা করা

৩। ছোট, বড় সঞ্চয় কিরূপে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহার পন্থা নির্দেশ করা।

৪। দেশের অব্যবহৃত অকেজো অর্থ ভূগর্ভ বা লোহার সিন্ধুক, পোস্ট অফিসের ক্যাশসার্টিফিকেট, সেভিং ব্যাঙ্ক ইত্যাদি হইতে বাহির করিয়া লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

মোট কথা ইহার উদ্দেশ্য হইবে ব্রিটিশ ট্রেড কর্পোরেশনের মতো ভারতীয় মূলধনওয়ালা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

ব্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয়ের স্থান

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ভারতীয়দিগের স্থান কোথায় এবং ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভারতীয় আর্থিক ও জনমূলধন এযাবৎ কতটা অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তফশীলভুক্ত, তাহাদের আর্থিক পরিস্থিতি গত ১০ নভেম্বর পর্য্যন্ত এইরূপ ছিল :—

মোট দায়—	২২৯.২৮ লক্ষ টাকা
নগদ—(নোট ও টাকা পয়সায়)	৭.২৯ লক্ষ টাকা
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত—	২৫ লক্ষ টাকা
ঋণ বা দাদন	১৯১.৬০ লক্ষ টাকা

ইহা ছাড়া অন্যান্য ব্যাঙ্কে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে অর্থ জমা ছিল, তাহার হিসাব ধরিয়াও ভারতবর্ষে জনপ্রতি জমার (deposit) পরিমাণ ৭ মাত্র, অর্থাৎ বিলাতের জনপ্রতি জমার শতকরা ৯ ভাগ ও আমেরিকার শতকরা ৩ ভাগ। অন্যদিক দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ভারতের প্রতি তিন লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র একটা ব্যাঙ্ক অফিস আছে। ইহা হইতে সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, এ ব্যবসায়ে আমরা কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

আধুনিক যুগে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ব্যাঙ্কের সংশ্রব অপরিহার্য্য। নানাভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন ব্যাঙ্কিংয়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যে যে উপায়ে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, ব্যাঙ্কই তাহাদের জীবনীশক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। সমগ্র ভারতের কথা বাদ দিয়া কেবল বাঙ্গালাদেশের কথাই ধরা যাউক। বাঙ্গালাদেশের প্রয়োজনানুযায়ী যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইলে কোটি কোটি টাকার দরকার।

বাঙ্গলার বিশিষ্ট সম্পদ পাট। কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য বিদেশে চালান দিয়া যে টাকা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ বিদেশীয় মূলধনের পারিশ্রমিক হিসাবে বিদেশীর পকেটে চলিয়া যায়। গত বৎসর কেবল বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪৩,৮০ লক্ষ টাকা। বাঙ্গালার লোক যে কাপড় ব্যবহার করে, তাহার যোগান দিতে অন্ততঃ ১৫০টি কাপড়ের কলের প্রয়োজন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় মাত্র ২৮টি কল স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের ৩৮০টি কাপড়ের কলে মোট মূলধন ১০০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে বাঙ্গালায় আরো ১০০টি কল বসাইতে হইবে। কমপক্ষে ২৬ কোটি টাকার প্রয়োজন। শর্করা শিল্পে ভারতবর্ষ এখন স্বাবলম্বী কিন্তু বাঙ্গালার প্রয়োজনীয় মালের চতুর্থাংশও বাঙ্গালায় প্রস্তুত হয় না।

বাঙ্গালার ৫ কোটি অধিবাসীর প্রায় সকলেই মৎসাহারী ও প্রায় ১২ লক্ষ লোক মৎস্য ব্যবসায়ী। বৎসরে বাঙ্গালীর কমপক্ষে ১৭ লক্ষ টন মাছের প্রয়োজন, কিন্তু তাহার দশম-অংশও এখন তাহাদের ভাগ্যে জুটে না। বাঙ্গালার অসংখ্য খাল, বিল নদীর কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র বঙ্গোপসাগরের মৎস্য দ্বারা বাঙ্গালীর সকল অভাব মোচন হইতে পারিত। কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, These fisheries of the Bay of Bengal are of a value well-nigh in- calculable. That they are unknown, uncared for and unappreciated is unfortunately true but it is equally true that they will prove a mine of wealth to whoever have the enterprise to exploit them.

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার অত্যন্ত দুঃখে বলিয়াছেন, 'ধন সম্পদ বাড়াইতে চাও অথচ শুইয়া থাকিবে সর্ব্বদা নিজ কোটরে, তাহা সম্ভব নয়। তোমার দুয়ারে আসিয়া দেশের লোক, দুনিয়ার লোক তোমাকে রাজা করিয়া দিয়া যাইবে, তাহা কষ্মিন কালেও ঘটিতে পারে না।'

বাঙ্গালার আমদানী-রফতানী বাণিজ্যের পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। (গত অক্টোবর মাসে ১২ কোটি টাকার উপর ছিল।) অন্তর্বাণিজ্যের পরিমাণ তারও ১০-১৫ গুণ বেশী। বাঙ্গালার প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিমেয়। তাহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া ভোগ করিতে হইলে বা জাতীয় সম্পদ বাড়াইতে হইলে প্রভূত মূলধনের দরকার। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। একদিকে লক্ষ লক্ষ বঙ্গসন্তানের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন, অপর দিকে প্রকৃতির অফুরন্ত ধনভাণ্ডার বঙ্গজননীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত। যতই ক্ষোভ ও আক্ষেপের বিষয় হউক না কেন, আমাদের অজ্ঞতা, অক্ষমতা ও অকর্ম্মণ্যতাই যে ইহার জন্য দায়ী, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। Sir M. de P. Webb যথার্থই বলিয়াছেন : 'India needs more Banks, manned by Indian men and financed by Indian Capital.'

ইউরোপীয় পর্যায়ে যাইতে হইলে ভারতে অন্তত ৩৬ হাজার ব্যাঙ্কের প্রয়োজন। আমাদের অর্থের অভাব নহে, অভাব কর্মীর ও প্রেরণার। ১৯৩৩ সালের ৩০ নভেম্বর Sir John Anderson বাঙ্গলা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : "The province is not poor, but suffers from mal-adjustment"- এই মন্তব্যে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না। বাঙ্গলার সুসন্তান কর্মবীরগণের সম্মুখে বিরাট কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। দেশের সম্পদকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দেশবাসীর অভাব ও দারিদ্র্যকে চিরতরে নির্বাসিত করিতে ও দিকে, দিকে প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের বন্যা ছুটাইবার মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে তাঁহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া অগ্রসর হউন। আজ যাহা শত বৎসরের সাধনা সাপেক্ষ বলিয়া বোধ হইতেছে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কর্ম্মকুশলতার সামনে তাহা অচিরে আয়ত্তাধীন হইবে। রুশিয়া তুরস্ক, জাপান, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশসমূহের গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস ইহার জলন্ত প্রমাণ।

ব্যাঙ্কিংয়ে মুছলমানের স্থান

ব্যাঙ্কের সহিত মুছলমান সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সমগ্র ভারতের মধ্যে মুছলমান পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক একটিও নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে The Muslims Bank of India Ltd, নামক একটি ব্যাঙ্ক লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম ভারতে তাহার কয়েকটি শাখাও স্থাপিত হয়। গভীর পরিতাপের বিষয় যে এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে মুছলমানদিগের খেদমত আঞ্জাম দিয়া গত বৎসর ইহা কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে

Deccan Commercial Bank নামে আর একটি মুছলমান পরিচালিত ব্যাঙ্ক কয়েক বৎসর ব্যবসা চালাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। Comrade Bank Ltd, নামে আর একটি মুছলিম ব্যাঙ্ক ৫ বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে স্থাপিত হয়। সুখের বিষয়, ইতিমধ্যে ইহা ২-৩টি শাখা অফিস খুলিতে সমর্থ হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুছলমান। বাঙ্গালার ঐশ্বর্যের উৎপাদনকারীদের অধিকাংশ তাহারাই। কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, তাহাদের অনেকেরই দুই বেলা অন্ন জুটে না; লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের অভাবে তাহারা সমাজে মুখ দেখাইতে পারে না। বাঙ্গালার অল্পসংখ্যক মুছলমান সহরে বাস করে। ছোট ছোট ব্যবসায়ে নিজের স্বল্প পুঁজি খাটাইয়া কোন মতে কালাতিপাত করে। অভাবে, ম্যালেরিয়ায়, কলেরা ও যক্ষ্মায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরে, আর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জমিদার ও মহাজনের সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত থাকে। জীবনের সুখশান্তির হিস্সায় তাহাদের দাবি নিতান্তই স্বল্প ও ক্ষীণ। তাহারা ঋণের বোঝা মাথায় লইয়া জন্মে ও যতদিন থাকে, তাহা সযত্নে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চলে ও পরমাত্মীয়ের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করে। চিত্রের অন্যদিকও আছে বটে, তবে তাহা সাধারণ বাঙ্গালা সমাজেরই অনুরূপ। তাহাতে বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনাকালে কৃষক সমাজ, ক্ষুদে শিল্পী ও ব্যবসায়ী এবং শিল্প-মজুর প্রভৃতির পর্যায়ে সাধারণতঃ মুছলমানকেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিতে (অবশ্য খাতক হিসাবে ছাড়া) তাহাদের পাত্তা পাওয়া যায় নাই। হিন্দুরাই বাঙ্গালার গরিষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া দাবি করেন এবং তাহা অনর্থক নয়। ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজ-কার্য্য, শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহারাই অগ্রণী; ধনে দৌলতেও মুছলমান তাহাদের বহু পশ্চাতে। বাঙ্গালার প্রায় ৮০০ শত লোন কোম্পানীর ৮-১০ হাজার ডাইরেক্টার, সেক্রেটারি ও প্রায় সমসংখ্যক কেরানি, মুহুরী, অ্যাকাউন্টেন্ট ও ম্যানেজার প্রভৃতির মধ্যে মুছলমান কয়জন আছেন তাহা অঙ্গুলে গণনা করা যায়। বাঙ্গালার ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসায় দ্বারা ৬০-৭০ লোক জীবিকার সংস্থান করে, তন্মধ্যে মুছলমানের সংখ্যা শতকরা ৫ জনও নহে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যাহাই হোক, আর্থিক ক্ষেত্রে মুছলমানের অস্তিত্বের খোঁজ লইতে হইলে দস্তুরমতো গবেষণা করিতে হয়। বাঙ্গালার ২৮টা কাপড়ের কলের একটাও মুছলমানের নয়, ৮-১০টা চিনির কলের তাহারা মজুররূপী চিনির বলদ ছাড়া আর কিছু নহে। আর বাঙ্গালার বৃহত্তম পণ্যদ্রব্য পাট, যাহার মোটা অঙ্ক দ্বারা অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের মতন ঝুনা অর্থশাস্ত্রী ও চাষীর সম্পদ বৃদ্ধির হিসাব খতাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন; তাহা উৎপাদন করিয়া বিদেশী ও ভাটিয়া মাড়োয়ারীদের আর্থিক ও মানবিক মুলধনের লভ্যাংশ স্বরূপ বৎসরে ১৫ কোটি টাকার যোগান দিয়া থাকে মুছলমান। অথচ নিজে চাষের ও জীবিকা নির্ব্বাহের খরচের জন্য হিন্দু মহাজনের কাছে চিরজীবন দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা হইয়া থাকে।

ইহার প্রতিকার কে করিবে ও কিরূপে করিবে, ইহাই আজ মুছলমান সমাজের সর্বপ্রধান প্রশ্ন ও সমস্যা। গত শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষাকে বর্জ্জন করিয়া মুছলমান যে আত্মঘাতী নীতির আশ্রয় লইয়াছিল, সুদের জায়েজ না জায়েজ প্রশ্ন তুলিয়া সেই নীতির কৃপায় সে আর্থিক অবনতির এখনও যদি সে নিজের সর্বনাশী ভুল শোধরাইতে না পারে, তবে তাহার পরিত্রাণের কোন আশাই নাই।

অর্থ ছাড়া যখন সাংসারিক জীবন যাপন অসম্ভব তখন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে তাহাকে আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে এবং যত শীঘ্র ইহাতে সে ন্যায্য ও যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করে, ততই তাহার ও সমস্ত দেশের মঙ্গল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে অনুন্নতের চেয়েও অনুন্নত, তাই গবর্নমেন্টের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে। দেশের ব্যাপক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গবর্নমেন্ট তাহার সাহায্যার্থ অবিলম্বে অগ্রসর হউন প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেশহিতৈষী ব্যক্তির ইহাই কামনা। মুছলমান সমাজের অর্থিক সমস্যার সমাধান উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ মুছলমান দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। শুধু গবর্নমেন্টের চেষ্টা ও সরকারি তহবিলের উপর নির্ভর করিলে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যাইবে না। চাই সমাজের শত সহস্র লোকের ব্যক্তিগত চেষ্টা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়সঙ্কল্প।

দেশের গবর্নমেন্ট সরাসরি ব্যবসায়ে নামিতে পারেন না স্বীকার করিয়াও দাবি করা যাইতে পারে যে, পরোক্ষভাবে মুছলমানদিগের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন গবর্নমেন্ট এবং যতদিন না বেসরকারি প্রচেষ্টা সফলতা লাভে সমর্থ হয়, ততদিন পর্যন্ত তাহা পরিচালনে অংশ গ্রহণ করিবেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মুছলমানদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গবর্নমেন্ট নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

(১) বেসরকারি মুছলমান পরিচালক সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপনে সাহায্য করিবেন।
(২) মঞ্জুরীকৃত মূলধনের অর্দ্ধেক গবর্নমেন্ট প্রদান করিবেন
(৩) পরিচালন সমিতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি থাকিবে।
(৪) ব্যাঙ্কের প্রথম গবর্নর দুই হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য গবর্নমেন্ট নিযুক্ত করিবেন।
(৫) External হিসাব পরীক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন।
(৬) ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা লাভেচ্ছু উপযুক্ত মুছলমান শিক্ষার্থীকে আধুনিক ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি শিক্ষা করিবার জন্য করিয়া সুপরিচালিত ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিসী করিবার বন্দোবস্ত দিবেন, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ দুইজন শিক্ষার্থীকে বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য সরকারি ভাতা প্রদান করিবেন। এই ব্যাঙ্ক বাঙ্গালার প্রত্যেক বিভাগে একটা করিয়া শাখা স্থাপন করিবে এবং স্থানীয় পরামর্শ সভা গঠন করিয়া ব্যবসা পরিচালনে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

জার্ম্মানির 'গ্রস ব্যাঙ্কনের' আদর্শে উহা সকল প্রকার: ব্যাঙ্কিং ব্যবসা চালাইবে এবং কৃষি, শিল্প, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের জন্য উহার স্বতন্ত্র বিভাগ অভিজ্ঞ ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হইবে।

ব্যাঙ্কিং ও ওয়াক্‌ফ

বর্ত্তমান যুগে মুছলমানদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ এই যে, তাঁহারা ইছলামের খাটি শিক্ষা ও কৃষ্টি হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। ইছলাম মানব জাতিকে এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনে পূর্ণতা অর্জন করিবার জন্য অননুকরণীয় বিধান দান করিয়াছে যখনই যে জাতি বা সমাজ ইসলামকে সত্যকাররূপে গ্রহণ করিয়াছে তখনই তাহারা তাহাদের সমসাময়িক অন্যান্য জাতি বা সমাজ হইতে অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইছলামের অর্থনৈতিক বিধানগুলি এত সুন্দর সুষ্ঠু ও অব্যর্থ কার্য্যকরী যে তাহা পালন করিলে সমাজের দেহ ও মন সকল প্রকার দোষত্রুটি, অভাব, অনটন, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। ইছলাম বাণিজ্য-ব্যবসা ও অন্যান্য পেশাকে বিশেষ সম্ভ্রমের আসন দান করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভিক্ষাবৃত্তি, জুয়াখেলা, অমিতব্যয়িতা ইত্যাদিকে হীন কাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। দান, ধ্যান, পরোপকার প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিবার আদেশ দান করিয়াছে, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। ওয়াকফ এমনই একটি মঙ্গলজনক ব্যবস্থা।

সমাজের উন্নতি ইহার সাহায্য ওয়াফের চরম উদ্দেশ্য মুছলমান সাধন করা। সুতরাং প্রত্যেক মুছলমান তাহাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট। বর্তমানে আমাদের সমাজের চরম সমস্যা আর্থিক সংগঠন। আশা করি, সকলেই ইহাতে একমত হইবেন যে, সমাধানে ওয়াকফ যেরূপ প্রকৃত কার্য্যকরীভাবে করিতে পারিবে, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সেরূপ সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে না। বাঙ্গালার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সমগ্র বাঙ্গালার এক বিরাট অংশ, আনুমানিক এক-দশমাংশের কম নহে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহকে বাঙ্গালার Epitome বলা যাইতে পারে অর্থাৎ সমস্ত দেশে যে যে সমস্যা, সম্পদ, সুবিধা-সুযোগ বা অভাব অভিযোগ আছে, তাহা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে ও বিদ্যমান। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে প্রজা আছেন, জমিদার আছেন; স্বার্থভোগী Beneficiaries আছেন, তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাও আছে; কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি আছে করুণাময় খোদার সন্তুষ্টি বিধানের ও অভাবগ্রস্ত বান্দার মহদুপকার সাধন করিবার সুযোগ। ওয়াক্‌ফ মুছলমানদিগের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। ইহার মারফতে স্ব-সমাজের জীবন- অপেক্ষাকৃত সহজ।

আর্থিক সংগঠনের কথাই ধরা যাউক। ওয়াকফর মারফতে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইতে পারে, যাহাদ্বারা মুছলমান সমাজের গুরুতর সমস্যাগুলির আশু সমাধান হইতে পারে। সরকারি ওয়াক্‌ফ বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'মুসলিম আর্থিক সংগঠন সমিতি' কায়েম করিয়া যাহাতে অর্থনৈতিক বিষয়ে মুছলমানদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয় এবং সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। যেহেতু বাঙ্গালা সরকারের কয়েকটি বিশেষ কর্তব্য এই সমিতি দ্বারা সম্পন্ন হইবে, গবর্নমেন্ট হইতে ইহার প্রয়োজনীয় মূলধন ও অন্যান্য সাহায্য দাবি করা যাইতে পারে।

এই সমিতির উদ্দেশ্য হইবে

১। মুছলমানদিগের জন্য একটা ব্যাপক আর্থিক পরিকল্পনা গঠন করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যকীয় অর্থের সংস্থান করা।

২। এই পরিকল্পনার যে ধে অংশ সরকারি কর্ম-তালিকার বাহিরে পড়ে বা সরকারি প্রচেষ্টায় সন্তোষজনকভাবে সম্ভাবনা থাকে, তাহা কার্য্যে ভাবে সম্পন্ন না হওয়ার পরিণত করিবার বন্দোবস্ত করা।

৩। সমিতির কার্যাবলি যাহাতে ওয়াকৃষ্ণ আইনের ভিতরে থাকিয়া সরকারি ওয়াক্‌ফ বিভাগের তত্ত্বাবধানে চলিতে পারে, আবশ্যক হইলে, আইনের সংশোধন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করা।

এই সমিতির আশু কর্ত্তব্য হইবে—

১। সরকারি বিভাগসমূহের সাহায্যে মুছলমানদের বর্তমান আর্থিক কার্যকলাপভাবে অনুসন্ধান করিয়া তাহার সাহায্যে বাঙ্গালার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ দোষ ত্রুটি সংশোধন ও অভাব অভিযোগ পরিপূরণকল্পে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা।

২। একটা সময়োপযোগী আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা।

৩। বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক দান খয়রাত ইছলামের প্রকৃত বিধানানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করা।

৪। ওয়াকফ সম্পত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারি ওয়াক্‌ফ বিভাগকে সাহায্য করা।

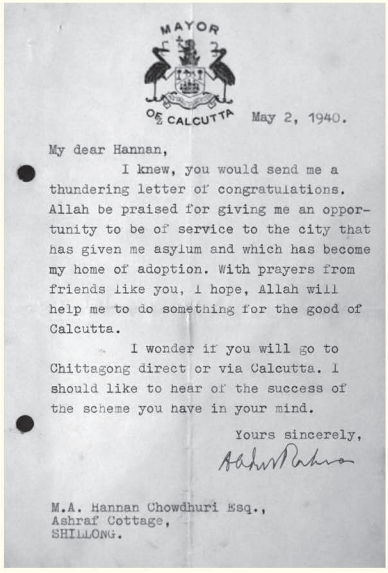

MAYOR
OF CALCUTTA

May 2, 1940.

My dear Hannan,

I knew, you would send me a thundering letter of congratulations. Allah be praised for giving me an opportunity to be of service to the city that has given me asylum and which has become my home of adoption. With prayers from friends like you, I hope, Allah will help me to do something for the good of Calcutta.

I wonder if you will go to Chittagong direct or via Calcutta. I should like to hear of the success of the scheme you have in your mind.

Yours sincerely,

Ashraf Mahon

M.A. Hannan Chowdhuri Esq.,
Ashraf Cottage,
SHILLONG.

আব্দুল হান্নান চৌধুরীর কাছে লেখা তৎকালীন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের মেয়র আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর একটি চিঠি। ১৯৪০।
সূত্র : নাসিম ফেরদৌস/ বাংলাদেশ অন রেকর্ড

বেঙ্গল ওয়াক্‌ফ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

সম্প্রতি বাঙ্গালার ওয়াক্‌ফ কমিশনার একটি ব্যাঙ্কের গঠনতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কয়েকটি ধারা সম্বন্ধে সমাজের ও বিশেষতঃ ওয়াকফ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমরা কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

ব্যাঙ্কের By-Lawর ৬ষ্ঠ ধারানুযায়ী সভ্য বা অংশীদার হইবেন কেবল মোতাওয়াল্লি ছাহেবান ও ৩য় ধারানুযায়ী তাহাদের মধ্যে সঞ্চয়, সহযোগিতা ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করাই হইবে ব্যাঙ্কের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইহা সুস্পষ্ট যে, মোতাওয়াল্লি ছাড়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট অপর কেহই প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের মেম্বার বা অংশীদার হইতে পারিবেন না, স্বয়ং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিও না। সুতরাং ব্যাঙ্কের সুবিধাসুযোগ কেবল মোতাওয়াল্লিদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপর কেহ যত বড় Beneficieryই হউন, এই ব্যাঙ্কের সহিত কারবার করিতে পারিবেন না।

১২শ ধারামতে কোন মোতাওয়াল্লি ১০০০ টাকার বেশী মূল্যের অংশ ক্রয় করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ প্রত্যেক মোতাওয়াল্লি সর্ব্বোচ্চ মূল্যের অংশ ক্রয় করিলে মোট ২০০ জন মোতাওয়াল্লি এই ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারিবেন। কার্যক্ষেত্রে হয়ত অংশীদারের সংখ্যা ৪-৫ শতও হইতে পারে। কিন্তু তবুও আজ পর্য্যন্ত ওয়াক্‌ফ বিভাগে যতগুলি সম্পত্তি রেজিস্ট্রি হইয়াছে তাহার দশ ভাগের ৯ ভাগ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লিগণই ব্যাঙ্কের অংশীদার-শ্রেণী হইতে বাদ পড়িয়া যাইবেন। ব্যাঙ্কের মূলধন ২-৩ গুণ বাড়াইলে হয়তো অংশীদার সংখ্যাও সেই পরিমাণে বাড়িবে। তবুও অধিকাংশ মোতাওয়াল্লি এই ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারিবেন না।

৩৩শ' ধারানুসারে কোন অংশীদার স্বীয় আদায়ী মূলধনের ১০ গুণের বেশী টাকা ধার পাইবেন না। ইহাতে দুইটি অসুবিধা লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ ধরা যাউক, কোন বৃহৎ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লি মোট ১০০ টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছেন। তাহার ১০,০০০ হাজার টাকার অপরিহার্য্য প্রয়োজন। কিন্তু তিনি ১০০০ টাকার বেশী ধার পাইবেন না। বাকি টাকার সংস্থান তাঁহাকে অন্যত্র করিতে হইবে।

তাঁহার দ্বিতীয়তঃ কোন কোন মোতাওয়াল্লি স্বীয় অব্যবহৃত অর্থ খাটাইয়া লাভবান হইবার আশায় সর্ব্বোচ্চ মূল্যের অংশ ক্রয় করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাদের ধার করিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন না থাকিতে পারে। অথচ যাঁহাদের ধারের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী এবং তদনুযায়ী জামীন দিতে প্রস্তুত ও সক্ষম তাঁহারাই হয়ত অল্পমূল্যের অংশ ক্রয় করিয়াছেন বা মূলধন পূর্ব্বেই বিলি হইয়া যাওয়ায় মোটেই অংশ ক্রয় করিতে পারেন নাই, ফলে তাঁহারা ব্যাঙ্কের সাহায্য লাভে বঞ্চিত থাকিবেন। এই অবস্থায় একদিকে যেমন যাঁহার টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন,

তিনি ধার পাইবেন না, অন্যদিকে টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়া থাকিবে তাহার সদ্ব্যবহার হইবে না। ফলে ব্যাঙ্কের কারবারের ক্ষতি হইবে।

আমাদের মতে, কর্জদানের পরিমাণ আদায়ী মূলধনের দ্বারা সাব্যস্ত না করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি বা জামীনের বাজার দর অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তাহা হইলে দশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তির মোতাওয়াল্লি মাত্র দশ টাকার অংশীদার হইলেও অনায়াসে ৫-৬ হাজার টাকা ধার করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান বিধান মতে তিনি ১০০ টাকার বেশী পাইতে পারেন না।

ওয়াক্‌ফ ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হইবে, ওয়াফের সেবা করা, তাহাদ্বারা যেমন মোতাওয়াল্লিগণ উপকৃত হইবেন, অন্যান্য Benefaciery গণও যাহাতে সেইরূপ উপকৃত হইতে পারেন, তাহাতে তাহারও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আমরা নিম্নে এইরূপ একটি ব্যাঙ্কের পরিকল্পনার আভাষ প্রদান করিলাম। মূলনীতি অনুমোদিত হইলে তাহার বিস্তৃত গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য হইবে না।

ওয়াক্‌ফ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১। এই ব্যাঙ্ক কোম্পানী আইনমতে লিমিটেড কোম্পানীরূপে রেজিস্ট্রি হইবে ও ভারতীয় রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের তফশীলভুক্ত হইবে।

২। নাম হইবে 'ওয়াক্‌ফ ব্যাঙ্ক লিমিটেড।'

৩। রেজিস্ট্রারি আফিস বঙ্গদেশে থাকিবে।

৪। উদ্দেশ্য হইবে,

(ক) স্থানে স্থানে শাখা বা এজেন্সি অফিস স্থাপন করিয়া সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং ব্যবসা পরিচালনা করা—

(খ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লি, উপস্বত্ব ভোগকারী ও অন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণকে (ব্যাঙ্ক উপযুক্ত মনে করিলে) যথেষ্ট বন্ধক গ্রহণ করিয়া ঋণ প্রদান করা—

(গ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ও সুপরিচালনে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা—

(ঘ) যে সমস্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বন্ধক সূত্রে ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বাধীনে আসে, ওয়াক্‌ফ পরিচালনের ব্যবস্থা করা। কমিশনারের সাহায্যে তাহার

(ঙ) ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন ফান্ড বা ট্রাস্টের টাকা পয়সা আদায় বা ব্যয় করার ভার ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইলে তাহার বিহিত ব্যবস্থা করা।

(৫) মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হইবে।

(৬) ৫ জন হইতে ৯ জন সভ্য লইয়া পরিচালন সমিতি গঠিত হইবে— তাঁহাদের একজন হইবেন কর্ম্মকর্ত্তা বা গভর্নর। সভ্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাঙ্গালার ওয়াক্‌ফ কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালা সরকার মনোনীত করিবেন। বাকী সভ্যগণ অংশীদার কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৭) কোম্পানী আইনের ব্যবস্থানুযায়ী হিসাবপত্র পরীক্ষা ছাড়াও বঙ্গীয় ওয়াক্‌ফ কমিশনার অন্তত বছরে একবার ব্যাঙ্কের হিসাব-পত্রাদি পরীক্ষা ও কার্য্যপরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

[গ্রন্থটির নির্বাচিত অংশ এখানে মুদ্রিত হয়েছে]

থ্রি লা র

মীর বহরের খুন

মাহমুদুর রহমান

গ্রীষ্মের তপ্ত দ্বিপ্রহর আজ বুঝি তার সব তাপ আগ্রায় বর্ষণ করায় মনঃস্থ হয়েছে। মধ্যগগনে উঠে স্থির হয়ে তাপ বিকিরণ করে চলেছে সূর্য। খসখস বারবার সিক্ত করেও কামরাগুলো শীতল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে আগ্রার রাস্তায়। তাদের বেশির ভাগের গায়েই সাদা পোশাক। অন্তত মস্তকোপরি একটি সফেদ চাদর। নইলে মগজ তাদের সেদ্ধ হয়ে যাবে। তবু রাস্তায় মানুষের অভাব হয় না। দুই-চারজন তো ঘোড়া ছুটিয়েই চলে যায়।

আগ্রার চরিত্রই এমন। প্রায় হর-ওয়াক্তই ব্যস্ততা। রাত নামলেও কমে না। মশালের আলোয় কাজ চলে, বাজার চলে। আর দিনে তো কাজকামের কামাই দেয়ার কোনো উপায় নেই। বাদশাহ শাহজাহানের রিয়াসতে এখন অর্থের কিছু অভাব দেখা দিয়েছে। তাই নানাভাবে তা সামাল দেয়ার চেষ্টা করছেন তার আমিররা। তারা নিজেরাও নানা কাজে ব্যাপৃত।

নিদাঘের সে দুপুরে প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবছেন একজন মানুষ। ঋজু তার শরীর। পরিধানে শুভ্র বেশ। অতি সাধারণ পোশাক মনে হলেও এর সুতা আসে বাঙ্গাল মুলুক থেকে। একটা চাদরের দামে আগ্রার সাধারণ দুটো পরিবারের মাসের খরচ চলে যাবে। সেই পোশাক বাদশাহর পরিবারেরই কেউ পরবে! কিন্তু প্রাসাদের শিখরে দণ্ডায়মান এ পুরুষকে হঠাৎ দর্শন করে কেউ বুঝতে পারবে না মানুষটি আসলে কে!

'শাহজাদা', মিষ্টি কণ্ঠস্বরে চিন্তার সুতো কেটে গেলে ফিরে তাকান তিনি। পাতলা শ্মশ্রু-গুম্ফের আড়াল থেকে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। তার চোখে দেখলে মনে হয় আগ্রার রোদ গ্রীষ্মের না, শীতের সকালের। যেমন রোদ ওঠে বাঙ্গালে।

তিনি ডায়া হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দিল! এসো, আমার নজদিক এসে দাঁড়াও।'

গোলাপি ঘাগড়া-চোলি পরা মেয়েটি বড় ধীরে তার দিকে এগোয়। এগোতে এগোতে বলে, 'এমন গরমির দো-পেহেরে এখানে কেন আপনি? আগ্রার সুরাজের তাকত বড় বেশি। আপনার সেহাত খারাব হবে, শাহজাদা।'

'বিমারি আমার নজদিক যেন না আসে, তুমি নজদিক এসে দাঁড়াও জান-এ-জিগর', কণ্ঠে প্রেম ঢেলে বললেন তিনি। মুখে অনাবিল হাসি। কোনো রকম মালিন্য নেই সেখানে।

মেয়েটি কাছে আসতে পুরুষটি তার হাত ধরলেন। বললেন, 'ওই দেখো, যমুনার কিনারে সফেদ ওই ইমারতের খুবসুরতি আমায় মোহিত করেছে।'

'তাজমহল!' যেন প্রথমবার ওই ইমারতের খবর জেনেছে, এমন করে বলল মেয়েটি।

'হ্যাঁ দিল! তাজমহল!' বলে শাহজাদা যেন প্রতিধ্বনি করলেন।

মেয়েটি তার হাত ধরে বলল, 'তামাম হিন্দুস্তানের সেরা ইমারত গড়েছেন খোদাবন্দ পাদিশাহ শাহজাহান!'

হাতটি আরো নিবিড় করে নিয়ে শাহজাদা বললেন, 'ভেবে দেখো দিল, কত সময় আর কত পরিশ্রমের ফল ওই ইমারত! সহস্র শ্রমিকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা, বহু কারিগরের বুদ্ধি, শ্রম আর প্রজাদের দেয়া অর্থ দিয়ে তৈরি ওই ইমারত।'

কিছুক্ষণ থেমে কিছু যেন ভাবলেন। আবার বললেন, 'খোদা তায়ালার দুনিয়ায় ইনসান হলো চার দিবসের অতিথি। লেকিন, কত আশ্চর্য কাজে ডুবে যায় তারা। ইমারত তৈরি করে। কেবল বাস করতে না, জৌলুস দেখাতে। যুদ্ধ করে। আরো কত কী!'

শাহজাদার কণ্ঠস্বর বুঝি বহুদূর হতে আসছে। ধীর, গভীর। যেন তিনি শাহজাদা নন, এই দুনিয়ার কোনো মানুষও নন। আগ্রার বাজারে কখনো কখনো যে দরবেশরা আসেন কিংবা দিল্লির বহু দরগাহের সুফিরা যেভাবে কথা বলেন, শাহজাদা তেমনি বলছেন। জিগর জুড়িয়ে যায় তার বচনে। ঠিক সেই সময় যমুনার ওপার হতে এক ঝলক শীতল হাওয়া উড়ে আসে। শরীরও তার পরশে জুড়িয়ে যায়। শাহজাদা আঁখ মুদে সে হাওয়ার পরশ অনুভব করেন।

মেয়েটি পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে চাইল। বলল, 'শাহজাদার আজ কী হলো? তিনি যে বাদশাহির "ওয়ালী আহদ", সে কথা বুঝি জেহনে নেই! বাতচিত করছেন যেন এক সুফি! এ কথা বরং আপনার ভাইয়ের মুখে মানায়!'

শুভ্র কপাল আর ভ্রুতে কুঞ্চন এসে যায় অনিচ্ছায়। শাহজাদা বলে ওঠেন, 'তার জেহনে কী আছে মালুম হয় না। তার মুখে এক, জেহনে আরেক। সে যতটা সহজ, ততটা কঠিন। যতটা কঠোর, ততটা কোমল। তবে ইয়াকিন করো দিল, আমি শাহজাদা হলেও আমার অন্দরে এক সুফিরই বাস।'

মসলিনের সূক্ষ্ম পোশাকের ওপর একটি আলোয়ানে মস্তক আচ্ছাদিত করে তপ্ত সূর্যালোক বাঁচানো নারীটির কপাল, নাক, চিবুকে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ঠোঁটে এক অনির্বচনীয় হাসি ফুটিয়ে সে বলল, 'আর একজন আশিক।'

সে কথা শুনে শাহজাদার মুখভঙ্গি এবার সহজ হয়ে আসে।

তিনি বলে ওঠেন, 'পুরুষের মাঝেই আশিকের বাস। হর মর্দের মধ্যেই আশিক থাকে। কেবল তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য মাশুকা প্রয়োজন। আমি সেই মাশুকা পেয়েছি।'

সে কথা শুনে মেয়েটি বলল, 'মাশুকার সন্ধান কি করতে হয় না, খোদাবন্দ?'

শাহজাদা দূরে দৃষ্টিপাত করেন। বললেন, 'হয়তো হয়। অথবা হয় না। আমি কি জানতাম দিল্লির রাস্তায় একদিন তোমার সঙ্গে মোলাকাত হবে?'

দিল বলে সম্বোধিত মেয়েটি এবার চোখে ঘোর তুলে জিজ্ঞেস করে, 'এ কি খোদার রহস্য?'

'হ্যাঁ, রহস্য!' খুব সহজ স্বরে শাহজাদা বলেন, 'খোদা এই দুনিয়া ভরে রেখেছেন রহস্যে। আর ইনসান সেই রহস্যের চারদিকে কোহরা লেপে রাখে রাণা।'

'দিল থেকে রাণা?' কপট ক্রোধ দেখায় মেয়েটি। শাহজাদা হাসেন আবার। মিষ্টি হাসি। প্রশ্রয়ের হাসি।

'কেন? তুমি তো রাণাদিল। কখনো রাণা, কখনো আমার দিল', বলে এক হাতে রাণাদিলের কোমর বেষ্টন করেন তিনি।

মেয়েটি তখন বলল, 'শাহজাদা কি জানেন না, দিল্লি-আগ্রা আমাদের নতুন নাম দিয়েছে? কেউ বলে "দারাদিল", কেউ বলে "রাণাশুকো"।'

সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে শাহজাদা জবাবে বলেন, 'ইশ্‌ক্ এমনই, রাণা। দুনিয়ার ইনসানের সমঝে আসবে না। নাম দেবে, বদনাম দেবে। ইশ্‌ক্ আর জুনুনকে মেলাবে। দোস্তির তো মানেই জানে না এখনো। এত সুফি এল-গেল এই জমিনে, তবু মানুষ না বোঝে নারী পুরুষের প্রেম, না বোঝে খোদার সঙ্গে বান্দার ইশ্‌ক্।'

রাণাদিল বুঝতে পারে শাহজাদার মনে নানা রকম ভাবনার দোলাচল। তিনি সেসবের মধ্যে বিখরা হয়ে আছেন। তার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। সেই বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে মেয়েটি বলল, 'দিল্লি থেকে খত্ আসার বাদ হতে আপনি বড্ড বেচেয়িন হয়ে আছেন। বাঁদীকে বলবেন, কী হয়েছে?'

কোনো জবাব না দিয়ে সিঁড়িতে থমকে দাঁড়িয়ে রাণাদিলের ঠোঁটে একটা চুম্বন এঁটে দিতে যান বাদশাহ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র—শাহজাদা দারা শুকোহ।

কিন্তু চুম্বন পূর্ণ হয় না। একেবারে ভূমি ভেদ করে সামনে দাঁড়ানোর মতো একটি ছায়ার দেখা মেলে। দারা শুকোহর খাস অঙ্গরক্ষক আসাদ, চোখে জরুরি বার্তার ইঙ্গিত।

রাণাদিল নিজেকে আরেকটু আড়াল করে আলোয়ানে। রাণাদিল এক ধাপ পিছিয়ে গেলে দুই ধাপ এগিয়ে শাহজাদার সামনে দাঁড়ায় আসাদ।

'কী সংবাদ?' প্রেমিক না, শাহজাদার কর্তৃত্ব এখন দারার কণ্ঠে।

আসাদ চোখ তোলে না। মাটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'দিল্লিতে খুন হয়েছে।'

আসাদ কিংবা কোনো দেহরক্ষীই কখনো চোখ তুলে তাকায় না। সেই সঙ্গে তাদের বার্তা হয় সংক্ষিপ্ত। কেবল বাদশাহ, বেগম, শাহজাদা-শাহজাদি সম্পর্কে কথা বললেই বিশেষণ যুক্ত হয়। অন্যথা তারা অতি সংক্ষেপে মূল বার্তা দেয়। তার বিপরীতে মালিক যদি প্রশ্ন করে, তখনই বিস্তারে বয়ান করে তারা।

কিন্তু এ মুহূর্তে দারা শুকোহ বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি জানেন খুন কে হতে পারে। তার পরও আসাদের মুখ থেকেই শুনে নিশ্চিত হতে হবে। দারা শ্বাস বন্ধ করে ছিলেন। আসাদ মাটির দিক থেকে মাথা একটু তুলে আবার নামায়। দারা না দেখলেও রাণাদিল দেখেন আসাদ তার চোখের পাতা একবার কাঁপিয়ে আবার বলে, 'আমাদের মীর বহর শরফউদ্দীন খাঁ তার খাস কামরায় খুন হয়েছেন।'

দুই বছর হয় শরফউদ্দীনকে মীর বহর করা হয়েছিল। তার বিরোধী ছিল অন্তত চারজন। কিন্তু বাদশাহ শাহজাহানের মনে হয়েছিল

শরফই তার উপযুক্ত মীর বহর হতে পারবে। কেননা পশ্চিমের বিদেশী গোরাদের সঙ্গে শরফের খাতির ভালো। গোয়ায় পর্তুগিজরা দ্রুতই শক্তি আরো বাড়াবে, শাহজাহান জানতেন। জাহানারার সুরাট বন্দরেও এরা কিছু সমস্যা তৈরি করেছিল। সেই কারণে শরফকে বাদশাহি নৌবহরের প্রধান করা।

কিন্তু দারার মনে হয়েছিল শরফের ওই যোগাযোগটা তাদের কাজে লাগবে না। বরং শরফের যা চরিত্র, সে নিজের মুনাফা নিয়েই ব্যস্ত হবে। নানা কথাই কানে এসেছিল দারার। তিনি চিঠিও দিয়েছিলেন দিল্লিতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

ভাবনার অবচেতনে কোমরের পেছনে হাতের ওপর বেঁধে রাখা দারা শুকোর হাত শিথিল হয়ে যায়। ঠিক তখনই শোনা গেল জোহরের আজান।

২.

মধ্যাহ্নভোজের পরই আগ্রা থেকে দিল্লির পথে রওয়ানা হয়েছেন দারা শুকোহ। তার দলে কেবল দশজন। কোনো জাঁকজমক নেই। দেখলে মনে হবে সাধারণ কোনো ছোট বণিক দল যাচ্ছে। এমনিতেই এ রাস্তায় বণিকরা যাতায়াত করে। শাহজাদা চাননি কোনোভাবে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনো আপস নেই। দশজনের আরেকটি অগ্রবর্তী দল রওয়ানা হয়েছে শাহজাদার এক ঘড়ি আগে। তার পেছনে নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে আরেকটি দল। প্রতিটি দলেই আছে বাছাই করা সেনা। সবাই শাহজাদা দারা ও বাদশাহ শাহজাহানের দেহরক্ষী দলের।

দারা শুকোহ ও আসাদ চলছেন প্রায় পাশাপাশি। আসাদ কেবল কয়েক কদমের দূরত্বে। তার কালো ঘোড়াটির মস্তক এখন দারার বাদামি ঘোড়াটির উদর বরাবর। দারার এই ঘোড়াটি তুর্কি। মূলত আকবরের সময়ে যে সেরা ঘোড়াগুলো আস্তাবল থেকে বাছাই করে বংশ বৃদ্ধি করানো হয়েছিল এটি তাদেরই বংশধর। বলা যায় মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের মতো তাদের ব্যবহৃত ঘোড়াগুলোও বাদশাহদের সওয়ারি করা ঘোড়ার উত্তরসূরি।

দারা শুকোহর কিছুটা সামনে দুজন ঘোড়সওয়ার চলছে। দারাদের পশ্চাতে আরো ছয়জন। এই নয়জনের সবাই আসাদের অধীন। আরো একজন ছিল। সে মীর বহরের মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছিল। পথশ্রমের কারণে তাকে আগ্রায় রেখে আসা হয়েছে। যদিও নওশেরা নামের তরুণ আফগানটি চেয়েছিল সেও সঙ্গী হবে। কিন্তু মোগল সেনাবাহিনীর নীতি অনুসারে সে আসতে পারে না। কেননা পথশ্রমে ক্লান্ত সেনার জন্য দ্রুতগামী দলের গতি শ্লথ হতে পারে। কোনো আক্রমণ মোকাবেলায়ও সে অন্যদের তুলনায় দুর্বল হবে। বিষয়টি পুরো দলের জন্যই অনিরাপদ।

খবর আসার পর দ্রুতই মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলেন দারা। ভোজের পর দস্তরখানে বসেই নওশেরাকে তলব করেন। সেখানেই তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন দারা শুকো।

'তুমি মুর্দা দেখেছ?' সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন।

বিশ বছর বয়সী তরুণটি উত্তর দেয়, 'জি না, খোদাবন্দ। আমি কেবল বার্তাবাহক।'

দারা ফের প্রশ্ন করেন, 'এই মৃত্যু সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

এক মুহূর্ত সময় নিল নওশেরা। কথা গুছিয়ে নিল। তারপর বলল, 'শাহজাদা, আজ সুবাহ এই খুন হয়েছে বলে হেকিম সাহাবের ইয়াকিন। শরফউদ্দীন সাহাব হররোজ সুবহে সাদিকে নিঁদ থেকে ওঠেন। আজ সূর্যোদয়ের পর ভি তিনি নিদে ছিলেন বলে প্রহরীর শক্ হয়। ফির, কামরার অন্দরে গিয়ে দেখা যায় মীর সাহাবের গলায় খঞ্জর চালিয়ে কেউ তাকে খুন করেছে।'

দারার ইশারায় খিদমতগার এক পাত্র শরবত হাতে দিয়েছিল নওশেরার। চোখ মাটিতেই নিবদ্ধ ছিল পুরো সময়। পাত্র হাতে নিয়ে পানের অনুমতির আশায় শাহজাদার দিকে একবার চোখ তুলে তাকায় নওশেরা।

শাহজাদা চোখের ইশারায় অনুমতি দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, 'শরফউদ্দীন কাল রাতে কোনো বিবির সঙ্গে শয়ন করেননি?'

শরবতে চুমুক দিয়ে সে বলল, 'না, শাহজাদা। দো দিন হলো তিনি হেকিম সাহাবের কাছে জ্বরের দাওয়াই নিয়েছেন। তার সঙ্গে নিঁদ যাওয়ার গোলি।'

এ পর্যন্ত শুনেই উঠে পড়েছিলেন দারা শুকোহ। আসাদকে বলেছিলেন ঘোড়া প্রস্তুত করতে। আসাদ বেরিয়ে যাওয়ার আগেই তার হাত দিয়ে নওশেরাকে দিয়েছিলেন মুক্তখচিত বাঁটের একটা খঞ্জর। তরুণ আফগানকে তার পছন্দ হয়েছে। ছেলেটা গুছিয়ে কথা বলতে পারে।

ঘোড়াটা শাহজাদার খুব পছন্দ। দুলকি চালে চলে, আবার আদেশ বুঝে চলতে পারে ক্ষিপ্রগতিতে। এখন যেমন মাঝারি গতিতে চলছে। গরমের জন্য এর চেয়ে বেশি গতি আনতে শাহজাদা ইচ্ছুক নন। দ্রুত গেলেও মীর বহরের জীবন ফিরিয়ে আনা যাবে না। অযথা ঘোড়া এমনকি তার দলেরও কষ্ট বাড়বে কেবল।

মাঝারি গতি দারাকে ভাবতেও সাহায্য করে। আর তার ভাবনারও নানা শাখা-প্রশাখা। পড়ন্ত বিকেলে মনে পড়ে, সকালে কী যেন বলছিলেন রহীম বেগ। সম্ভবত আজ সমগ্র বিকাল তার সঙ্গে আলোচনা করার কথা। এক বিশেষ পুস্তকের সন্ধান পেয়েছেন রহীম বেগ। বেদ আর কোরআন নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে সেখানে।

আশ্চর্য মানুষ এই রহীম বেগ। একসময় সেনাবাহিনীতে দুর্ধর্ষ গুপ্ত-সেনা হিসেবে কাজ করেছেন। আঠারো বছর বয়স থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত এ কাজই করে গেছেন। এরই মাঝে সিরহিন্দে এক সুফির সঙ্গে কেমন করে যেন তার পরিচয়। এরপর আট বছর কেবল অধ্যয়ন। ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সমরবিদ্যা, বাণিজ্য—কী জানেন না তিনি! এমন সঙ্গ বাদ দিয়ে কিনা দারা শুকোহকে চলতে হচ্ছে দিল্লি! কেননা শরফউদ্দীনের মৃত্যু তাকে ভাবাচ্ছে। শরফকে নিয়ে ভিন্ন সন্দেহ ছিল তার, কিন্তু ঘটনা যেহেতু ঘটেছে সেখানে আরো বড় কোনো বিষয় থাকা অসম্ভব নয়।

এছাড়া আছে রহীম বেগের প্রভাব। মধ্যাহ্নভোজের পূর্বে রহীম বেগ বলেছিলেন, 'এ খুনের কিনারা করা প্রয়োজন, শাহজাদা। মোগল বাদশাহির খাতিরে, যত তেজ সম্ভব।'

রহীম বেগ এই বাদশাহির বহু বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। বাদশাহ শাহজাহানের একজন উপদেষ্টাও বটে তিনি। কিন্তু সম্মুখে আসেন না। দরবারে তাকে বিশেষ দেখা যায় না। শাহজাহানাবাদের এক কোণে তিনি নিজের দুই মালের ইমারতে বাস করেন। তার একটা অংশ কেবল পুস্তকে ভর্তি। কিন্তু দীর্ঘদিন চরবৃত্তির কারণে সাম্রাজ্যের কোণে কোণে ঘটা নানা বিষয় সম্বন্ধে তার ন্যায় জ্ঞাত ব্যক্তি তেমন কেউ নেই। তাই রহীম বেগের কথা ফেলতে পারেন না দারা। সেই সঙ্গে নিজের মনেও তো সন্দেহ ছিল।

বাদশাহ শাহজাহানের খাস কামরায় মিলিত হয়েছেন সবাই। আছেন সেনাপতি মহাবত খাঁ, উজির-এ-আজম সাদউল্লাহ খাঁ, শাহজাদা দারা শুকোহ, তার দেহরক্ষী ও গুপ্তচর প্রধান আসাদ, সাম্রাজ্যের গুপ্তচর প্রধান ওয়ালী বেগ, দুই হেকিম আহসানউল্লাহ ও রামদয়াল। দুজন হেকিম দুই ধারায় চিকিৎসা করেন। এর মধ্যে ভারতের ভেষজ চিকিৎসায় রামদয়ালের জুড়ি নেই। এমনকি আহসানউল্লাহ তার গুণগ্রাহী। দুজনেই পরীক্ষা করেছেন মীর বহরকে। তারা এই মওত সম্পর্কে জানাবেন।

কিন্তু সেসবে যাওয়ার আগে শাহজাহান বললেন, 'দারা, নাদিরার তবিয়ত কেমন আছে?'

দারা জানতেন আব্বাজান আগে এই প্রশ্নই করবে। তিনি বললেন, 'খুশহাল, আব্বাজান। হেকিম সাহাবের দাওয়াইয়ে উপকার হয়েছে। আর সে নিজেও চেষ্টা করছে নিজেকে সুস্থ করার।'

তবে এসব বলার সময় দারা শুকোহ মাথা নিচু করেই কথা বলেন। যেন এখনো কিছু ভাবছেন। শাহজাহানের মনে হলো দারা তার স্ত্রী নাদিরার কথাই ভাবছে।

আসলেও তিনি নাদিরা সম্পর্কেই ভাবছিলেন। আগ্রা থেকে ফিরে নাদিরার সঙ্গেই প্রথমে দেখা করেছেন। চোখের নিচে কালি নিয়ে নাদিরা হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করেছে। বলেছে, 'আমি ওয়াকেফ আছি আপনি এখন ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। শরবত নিন আর নাশতা পর্যন্ত আমি আপনার নজদিক থাকতে চাই।'

'নাদিরা', স্ত্রীর একটি হাত ধরে দারা বলেছিলেন, 'তুমি তো বরাবরই আমার সঙ্গে ছিলে। আমার নজদিক ছিলে।'

নাদিরা মিষ্টি হেসে বলেছিল, 'এখনো আছি, শাহজাদা। কিন্তু আমার এই অবসাদ, আমার শরীর, আমাকে আপনার সঙ্গে থাকতে দেয় না। কিন্তু আমি জানি, আপনি যে দুনিয়াতেই থাকুন, নাদিরা বেগম যেমন আপনার সঙ্গে থাকে, আপনিও নাদিরার সঙ্গে থাকেন।'

সেনাপতি মহাবত খাঁ-র গলা খাঁকারিতে শাহজাদার চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায়।

'শাহানশাহ, আমার মনে হয় আগ্রা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল্লি আসতে শাহজাদা হাঁপিয়ে উঠেছেন। তাঁকে বিশ্রামের ওয়াক্ত দেয়া প্রয়োজন', বললেন সেনাপতি। দারাকে সুচ বিঁধিয়ে কথা বলা মহাবত খাঁ-র অভ্যাস।

দারা কোনো জবাব দেওয়ার পূর্বে বাদশাহ নিজেই বললেন, 'ক্লান্তি কেবল ঘোড়া ছোটানোর কারণে আসে না মহাবত খাঁ। অন্য বহু কারণ থাকে। যেকোনো মোগল পুরুষের ক্লান্তি আমি বুঝতে পারি। এ তো আমার পুত্র। শাহজাদা এখনো ঘোড়া ছুটিয়ে জঙ ফতেহ করতে সক্ষম।'

বাদশাহর কথার ওপর কিছু বলার থাকে না। দারা শুকোহ জানেন মহাবত খাঁ তাকে পছন্দ করেন না। এজন্য দারার নিজের স্বভাব কতকটা দায়ী। কতকটা মহাবতের লোভ ও অহংকার। নানা সিদ্ধান্ত-আলোচনায় বারবার এ বিসংবাদ তোলা মহাবতের খাসলতের অংশ হয়ে উঠেছে। তাই আপাতত মজলিসে উত্তাপ বৃদ্ধি না করে হেকিম আহসানউল্লাহর দিকে তাকালেন দারা শুকোহ।

'হেকিম সাহাব', কোনো প্রশ্ন না করে সম্বোধনেই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন দারা।

কিন্তু প্রশ্ন দারা করলেও উত্তর দারাকে দেন না আহসানউল্লাহ। কেননা বাদশাহকেই এত্তেলা করা তার দায়িত্ব। তাকে উদ্দেশ করেই বলেন, 'শাহানশাহ আপনাকে তো আমি এক দফা বয়ান করেছি। শাহজাদা, আমি যখন এত্তেলা পাই তখনই দ্রুত গমন করেছি। বদন তখন কেবল শক্ত হতে আরম্ভ করেছিল। অর্থাৎ খুন হয়েছে রাত্রির শেষ প্রহরের সূচনায়', নিজের বক্তব্য শেষ করে রামদয়ালের দিকে দৃষ্টি দিলেন তিনি।

রামদয়াল মিতব্যক। সনাতন ধর্মাবলম্বী বলে তার প্রতি অনেক মোগল আমিরের অসন্তোষ আছে, তিনি অবগত। সংযতবাক হওয়ার এটি একটি কারণ। তিনি কেবল মস্তক আন্দোলনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন আহসানউল্লাহর সঙ্গে তার মতের কোনো ভেদ নেই।

নৈঃশব্দ্যে কেটে যাচ্ছিল সময়। হঠাৎ দারা শুকোহ উঠে ওয়ালী বেগের সামনে দাঁড়ালেন।

'ওয়ালী, সিরফ দিল্লি নয়, সমস্ত মোগল বাদশাহির গুপ্ত খবর সংগ্রহ আর সেসব নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব তোমার। এই খুনের সম্ভাবনা নিয়ে তুমি কোনো পূর্বাভাস পাওনি?' কুপিত স্বরেই প্রশ্ন করেন দারা। সমবয়সী ওয়ালীকে তারই সুপারিশে নিয়োগ করেছিলেন বাদশাহ শাহজাহান। স্বভাবতই দারার ক্রোধ গিয়ে তার ওপর পড়ল।

ওয়ালী বেগ কোনো কথা না বলে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু তার দাঁড়ানোর মাঝে এমন কিছু ছিল যাতে শাহজাদার মনে হয় ওয়ালী বেগের কিছু বলার আছে যা তিনি এই দরবারে বলতে নারাজ। কিন্তু তবু লালকেল্লা হতে সামান্য দূরে নিজের প্রাসাদে শরফউদ্দীনের খুন হওয়া সমস্ত মোগল প্রশাসন, মোগল শাসনের প্রতি হুমকি। মোগল সেনা ও গুপ্তচর বিভাগের ব্যর্থতা প্রজাদের সামনে নাঙা হয়ে যাবে। তাই কিছু না কিছু বলতেই হবে।

এমন সময় মুখ খোলেন খোদ শাহজাহান। 'দাক্ষিণাত্য?' সাদউল্লাহ খাঁ-র দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি।

'না, জাহাঁপনা। দাক্ষিণাত্যের এ ওয়াক্তে এহেন কাজ করার সাহস নেই। আর খোদ আওরঙ্গজেব এখন দাক্ষিণাত্যে। সে থাকতে এমন কোনো পরিকল্পনা দাক্ষিণাত্য হতে সম্পন্ন হয়ে দিল্লি পর্যন্ত আগমন অসম্ভব', মাথা নেড়ে আত্মবিশ্বাসী সাদউল্লাহ এ সিদ্ধান্ত দেন। তার কথা সবাই সমর্থন করেন।

কেবল বাদশাহ শাহজাহানের নিজের মনের মাঝে একটা কাঁটা বিঁধে থাকে। তার মনে হতে থাকে, এ কোনো প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সূচনা তো নয়? মোগল প্রশাসন হতে শুরু করে যা ধীরে ধীরে সিংহাসন পর্যন্ত আসতে পারে? পরক্ষণেই এ চিন্তা নাকচ করেন দেন তিনি। কেননা মোগল সাম্রাজ্যের এখন তুঙ্গস্পর্শী অবস্থা। এ মুহূর্তে বে-আদবি করার সাহস কারো হবে না।

'আলমপনা', সাদউল্লাহ খাঁ আবার কথা বলে ওঠেন, 'মীর বহরের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। কিন্তু মোগল প্রশাসনের এমন এক ব্যক্তির অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাকে খুন করার এ কথা ছড়িয়ে পড়তে বেশি ওয়াক্ত প্রয়োজন হবে না। প্রজারা শঙ্কিত তো হবেই, সাম্রাজ্যের নানা অংশের বিদ্রোহীরা পর্যন্ত সুযোগ পাবে। মোগল সেনা ও গুপ্তচর ব্যবস্থা দুর্বল মনে করে তারা বিদ্রোহ করবে। এমনকি আমাদের সেনারাও বিদ্রোহী হতে পারে।'

সাদউল্লাহ খাঁ সাধারণত কম কথার মানুষ। আজ তার এতগুলো কথা বলায় প্রত্যেকেই সমস্যার স্বরূপ ফের একবার অনুধাবন করতে পারেন।

'হত্যার কারণ কী হতে পারে?' দারা শুকোহ আপন মনেই বলে ওঠেন। তার মনে অন্য কোনো সন্দেহ উঁকি দেয়। দারা আরো বলেন, 'যেকোনো খুনের পশ্চাতেই একটা বা একাধিক কারণ থাকে। বিনা কারণে তাকে কেউ হত্যা করেনি। আর বাদশাহির বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য মীর বহর না, ওয়ালী কিংবা মহাবত খাঁর ওপর আক্রমণ হতে পারত। আমার ওপরও হতে পারত।'

দারার কথা শুনে শাহজাহানের খানিকটা বিরক্তি আসে। কেননা পুত্র খুঁজছে খুনের কারণ। এর চেয়ে বড় কিছু তার নজরে আসছে না। কিন্তু আবার দারার কথায় যুক্তিও খুঁজে পান তিনি। দারা নিজে এক মাহিনা আগ্রায় ছিল। তার ওপরও হামলা হতে পারত। এর মধ্যেই আরেকটি কথা সবাইকে চমকে দেয়।

'মীর বহর দুই মাস আগে শাদি করেছিলেন', এতক্ষণে প্রথমবার মুখ খোলে ওয়ালী বেগ।

'তো শাদি করলে কেউ খুন হয় নাকি?' কিছুটা বিদ্রূপ মিশিয়ে বললেন মহাবত খাঁ। মোগল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই একাধিক শাদি করেছে। ওয়ালীরও দুই স্ত্রী।

তবে ওয়ালী সে কথা গায়ে না মেখে একবার বাদশাহর দিকে দৃষ্টিপাত করে ফের শাহজাদার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তিনি শাদি করেছিলেন এক পর্তুগিজ নর্তকীকে। সে শাদিতে কেমন ধুমধাম হয়েছিল, আপনার মনে আছে শাহজাদা?'

দারা শুকোহর মনে পড়ে। মীর বহর শরফউদ্দীন ৪৭ বছর বয়সে যখন চতুর্থ বিয়ে করলেন তখন যে এলাহি আয়োজন করেছিলেন তা উজিরের পুত্রের বিয়েতেও হয় না। সে সময়ে ওয়ালী নিজেই একবার শাহজাদার কানে কথা তুলেছিল, এত খরচের উৎস কী? উপনিষদের ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত দারা শুকোহ সেসবে কান দেননি। এখন মনে হলো দেয়া উচিত ছিল।

পিতার দিকে নজর দিয়ে দারা বললেন, 'আব্বাজান, মীর বহরের সম্পদ তো এখন বাদশাহির সম্পত্তি। সে সম্পত্তির প্রতি সিক্কার হিসাব করার ব্যবস্থা হোক। সাথে আমাদের জানা জরুরি এ সম্পদের উৎস কী!'

'সে কথা জানা সহজ হবে না', মহাবত খাঁ বললেন।

তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন, 'অনেক মোগল অমাত্যই ঘুস এবং অন্যান্য ফিকিরে আশরফি রোজগার করে চলছে কিন্তু সে হিসাব কেবল ওই ব্যক্তি ছাড়া কেউ জানে না। আর এখানে সে নিজেই মৃত। তবে জানবেন কেমন করে?'

দারা জানেন তাজমহল তৈরি শুরুর সময় থেকে বাদশাহির বহু কর্মকর্তা-কর্মচারী নানা অসাধু উপায়ে অর্থবিত্ত, রত্ন, নারী ও ভূমি দখল করে যাচ্ছে। এ নিয়ে শাহজাহানের কাছে তিনি অভিযোগও করেছিলেন কিন্তু বাদশাহ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কিন্তু তাই বলে সম্পত্তির হিসাব সম্ভব না, এ কথা দারা বিশ্বাস করেন না। তার কাছে একটা পরিকল্পনা আছে। কিন্তু দারা কথা বলার আগেই এর সমাধান আসে।

'কোনো ইনসান সম্পর্কে জানতে সে ইনসান কাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, সে সংবাদ গ্রহণ করলেই একটা রাহ বেরিয়ে আসবে', চিকের আড়াল হতে নারী কণ্ঠ বলে উঠলে সবাই চমকে গেলেন। নিজেদের কথোপকথনে তারা ভুলেই গিয়েছিলেন, সম্রাটের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা এই সভায় উপস্থিত।

শাহজাদাকে উদ্দেশ করে পাদিশাহ বেগম জাহানারা আবার বললেন, 'দারা, ওয়াক্ত যায়া না করে তুমি মীর বহরের মহলে যাও। সেখানে প্রত্যেক আওরাতকে সওয়াল করো। শুনি, মীর বহর আওরাতদের বড় ভালোবাসতেন। তার সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো খবর আওরাতরাই দিতে পারবে।'

দারা শুকোহ জানেন, জাহানারার বাস্তববুদ্ধি তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। কিন্তু এ আওরাত প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি কি রাণাদিলের বিষয়ে দারাকে খোঁচা দিলেন? কে জানে! নারীর মন, সে স্ত্রী হোক কি বোন; বোঝা অসম্ভব।

৩.

শরফউদ্দীনের তিনতলা প্রাসাদ দেখে দারা শুকোহর ধন্ধ লাগে। সাবেক মীর বহরের প্রাসাদের জৌলুস যেন স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি। শাহজাহানাবাদের এ এলাকায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মোগল অমাত্যদের কয়েকটি প্রাসাদ। কোনোটি বাদশাহর দান, কোনটি অমাত্যর নিজের খরচেই তৈরি। ভূতপূর্ব মীর বহর এই দ্বিতীয় দলের।

দিল্লির পথে-প্রান্তরে দারা শুকোহ অনেক ঘুরেছেন। ঘুরে ঘুরে দেখেছেন মানুষের জীবন। কথা বলেছেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু অমাত্যদের বাসস্থানের এ অঞ্চল তার দেখা হয়নি। কখনো কোনো অমাত্য নিমন্ত্রণ করলে তিনি নৈশভোজে যোগ দিয়েছেন। সে সময়ে তিনি ভ্রমণ করেছেন দুই ঘোড়া চালিত জুড়ি গাড়িতে—যে গাড়ি তার দাদাজান বাদশাহ জাহাঙ্গীর ফরমায়েশ দিয়ে তৈরি করেছিলেন। ইংরেজ দূতের উপহার দেয়া দুটি গাড়ি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের এতই পছন্দ হয় যে তিনি সেরূপে আরো কিছু গাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন।

দারা শুকোহ ভাবেন, বড় আমুদে ছিলেন দাদাজান। সুরা, পড়াশোনা, সংগীত আর শিকারে মেতে থাকতেন। সেই যখন পিতা বাগী হলেন, সে সময়ে দাদিজান নূরজাহান আমাকে আর আওরঙ্গজেবকে জিম্মা রেখেছিলেন। দাদাজান হররোজ আমাদের দুই ভাইকে পাশে বসিয়ে কিসসা বলতেন। আমির তৈমুরের কিসসা। বাদশাহ বাবুরের কিসসা। তার বাবা আকবর বাদশাহর কিসসা।

বাস্তবিক দারা জানবেন না, এমন কিসসা সব দাদাজানই করে থাকেন নাতিদের সঙ্গে। আগ্রা, দিল্লি, ভেঙে পড়া সিক্রি, ওড়িশা, বাঙ্গাল, গুজরাতের মহলে, তাঁবুতে, কুঁড়েঘরে সব দাদাই তার নাতিদের নিয়ে সন্ধ্যা কিংবা রাতে কিসসার আসর বসান। তাদের কিসসায় শিকার, বাগী হওয়া হয়তো থাকে না। তবে থাকে পূর্বপুরুষের আখ্যান। কৃষক দাদাটি হয়তো বলেন কোন সময়ে তিনি ফসল ফলানোর কথা ভাবতেন। আসমানের দিকে তাকিয়ে কী ভাবতেন। কেমন করে দেখা হয়েছিল দাদিজানের সঙ্গে।

তবে বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও তার কিসসার কথা স্মরণ করে ৩৮ বছর বয়সী দারার মন বিস্মিত হয়। কেননা জাহাঙ্গীরের বহু কিসসা ছিল তার পিতা আকবরকে নিয়ে। সেই কবে বাদশাহ আকবর রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে জঙ করেছিলেন। চিতোর অবরোধ করে একদিন ভুল করে হত্যা করেছিলেন দুই বীরকে। আবার সেই বীরের সম্মানে নির্মাণ করেছিলেন তাদের মূর্তি।

বীরবলকে বড় পছন্দ করতেন পরদাদা আকবর। তার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় মাততেন। কখনো তানসেনের সংগীত শ্রবণ করেছেন রাতভর। সেসব কথাই বলতেন দাদাজান। কিন্তু কখনো তিনি আবুল ফজলের নাম করেননি। এই মোগল অমাত্যটিকে নিয়ে বিস্ময় হয় দারার। এক জীবনে অনেক কাজ করেছেন তিনি। তবে দারা শুনেছেন, দাদাজানই হত্যা করিয়েছিলেন আবুল ফজলকে।

পিতার বিরুদ্ধে বাগী হয়েছিলেন জাহাঙ্গীর। অস্ত্র তুলেছেন, জঙ করার চিন্তা করেছেন। সময়ের ফেরে তার পুত্রও বাগী। অথচ সেদিনের সেই বাগী পুত্র, তার নাতিকে শোনাতেন পিতার বীরত্বের কাহিনী। কখনো কখনো আফিম আর সুরার নেশা গাঢ় হলে তিনি বলতেন, 'তোমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে বড় বে-ইনসাফি হয়েছে। পিতার স্নেহ থেকে এখন তোমরা বঞ্চিত। অথচ দেখো, তোমাদের পরদাদাজান আকবর-এ-আজম আমাকে 'শেখু বাবা' বলে ডাকতেন। সে ডাক আমি এই ওয়াক্তেও ইয়াদ করতে পারি।'

মোগল পুরুষদের চরিত্র বুঝি বরাবরই এমন দ্বৈততায় ভরা। যখন একদিনের বাগী পুত্র, তার পৌত্রদের নিজের পিতার স্নেহের কথা বলছেন, তখন তারই পুত্রকে বাগী কারার দিয়ে নির্বাসনে প্রেরণ করেছেন। এ কী স্বাভাবিক দ্বৈত চরিত্র, নাকি সিয়াসত এমনই? 'তখত, ইয়া তাবুত'-এ বিশ্বাসী মোগল পুরুষদের এ-ই হয়তো নিয়তি। পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই!

ভাইয়ের চিন্তা আসতেই শাহজাদা দারা শুকোহর মাথায় আওরঙ্গজেবের ছবি ভেসে ওঠে। গৌর-দেহ সে পুরুষ, তার ভাই। এখন দাক্ষিণাত্যে। অথচ যেন প্রতিদিন দারার সঙ্গে তার দেখা হয়। কথা হয় মুখোমুখি। কথা তো নয়, বিতণ্ডা। বড় ভাইকে তিরস্কার করে আওরঙ্গজেব। কেননা আওরঙ্গজেবের দৃঢ় বিশ্বাস, দারা ইসলাম মানেন না। সেই সঙ্গে দারার নেই রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ।

বাচপানে একসঙ্গে থাকার সময় তাদের মধ্যে বিচিত্র কথা হতো। কিন্তু একবার আব্বাজান হাতির লড়াই আয়োজন করলেন, সেদিন থেকেই তাদের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বিধাভেদ উপস্থিত। বাদশাহির বহু অমাত্য এমনকি প্রজাও বিশ্বাস করে, একদিন আওরঙ্গজের আর দারার মধ্যে যুদ্ধ হবে। একজনের মওত হবে এবং অন্যজন হবে নতুন বাদশাহ। সে কথা স্মরণ হতে পরিধানের কাবার কোমরবন্ধনীতে একবার হাত বুলিয়ে নেন দারা শুকোহ। তারপর প্রবেশ করেন মীর বহরের শয়নকক্ষে।

দারা শুকোহ দেখলেন সমস্ত শয়নকক্ষ পারসি গালিচায় মোড়া। পা রাখামাত্র তা ডুবে যায়। কামরার মাঝবরাবর রাখা বিছানায় মখমলের রজাই, তাকিয়ায় কারুকাজ। কামরার চারদিকে খিড়কিতে ভারী পর্দা। একদিকে কয়েকটি নিচু কুরসি, তার পাশে ইংরেজদের 'টেবিল'। সেখানে নানা রকম সুরাপাত্র সজ্জিত। সুরার অংশটি বাদ দিয়ে নজর করলে দারার মনে হয় তার নানা আসফ খান যখন 'উজির-এ-আজম' ছিলেন, কেবল তখনই তার খাস কামরা এমন সজ্জিত ছিল।

'ওয়ালী', নাম ধরে ডাকতেই ওয়ালী বেগ এগিয়ে আসে।

'সব মোগল আমিরের শয়নকক্ষ কি এমন সজ্জিত?' সরাসরি জিজ্ঞেস করেন দারা।

'জি না, খোদাবন্দ। এমনকি মীর বহরের শয়নকক্ষও এরূপ সজ্জিত ছিল না। এ সজ্জা তার বিবাহের পূর্বে করা হয়েছে', ওয়ালী জবাব দিলে দারা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বিছানায় দৃষ্টি দেন।

তার কিছু একটা নজরে পড়েছে। দারার ইশারায় সাদেক নামের এক মোগল সেনা এগিয়ে আসে। দারাকে জানানো হয়েছে দারোগা পদবির এই সেনাই প্রথম প্রবেশ করেছিল এবং দেখেছিল সাবেক মীর বহরের মুর্দা।

সাদেকের দিকে না তাকিয়েই দারা প্রশ্ন বললেন, 'তুমি যখন কামরায় প্রবেশ করো, তখনকার চিত্র বয়ান করো।'

'শাহজাদা', মাথা ঝুঁকিয়ে সাদেক শুরু করে, 'মীর বহরের শির উত্তরে আর পা ছিল দক্ষিণে। রজাই দিয়ে গর্দান পর্যন্ত ঢাকা। মুখ বাম দিকে ফেরানো। গলা থেকে ক্ষরিত রক্তে বিছানা সিক্ত। মীর বহরের পায়ের কাছে তার তিন বিবি। নতুন বিবি মূর্ছা গিয়েছিলেন। তাকে পাশের কামরায় রাখা হয়েছিল।'

শাহজাদা এক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করেন, চোখ খুলে ফের প্রশ্ন করলেন, 'কামরার কী অবস্থা ছিল?'

সাদেক এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'মীর বহরের লাশ সরিয়ে ফেলা ছাড়া কামরায় কোনো পরিবর্তন হয়নি জনাব। এখনো আগের অবস্থায়ই আছে।'

দারা শুকোহ আরেকবার পুরো কামরা ঘুরে দেখলেন। কখনো রজাই তুললেন, কখনো পর্দা সরিয়ে দেখলেন। খিড়কির দিকে হেঁটে গেলেন। দেখলেন সব খিড়কিই অন্দর থেকে বন্ধ করা। বাহির থেকে অন্দরে খিড়কি দিয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব।

'ওয়ালী', দারা শুকোহ ডাকলেন। ওয়ালি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তার পেছনে।

'গ্রীষ্মের এই তপ্ত রাতে তুমি কি খিড়কি বন্ধ করে নিদ্রা যাও?' প্রশ্ন করলেন দারা।

'না, জাহাঁপনা। আমি তো কখনো তীব্র গরম মনে হলে ছাদে চৌপাই

পেতে নিদ্রা যাই। অবশ্য তলোয়ার পাশে নিয়ে', উত্তর দিল ওয়ালী বেগ।

'কিন্তু এই গরমে মীর বহর কেন খিড়কি বন্ধ করে ঘুমাবেন?' কিছুটা আপনমনেই বললেন দারা। তবে প্রশ্নটা বাকি দুজনের উদ্দেশেও ছিল।

ওয়ালী, সাদেক ও দারা শুকোহ কাছাকাছি বয়সের। সাদেক কিছু ছোট, ওয়ালী কিছু বড়। ওয়ালীর সঙ্গে দারা সুযোগ পেলে তলোয়ারবাজি করেন। আর সাদেক তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। মোগল রীতি রেওয়াজের বাইরেও তাই এদের মধ্যে কিছুটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়েই গেছে। সেই সুত্রেই ওয়ালী কিছুটা কৌতুক করে সাদেকের দিকে চেয়ে বলে, 'মীর বহর নতুন বিবি এনেছিলেন জনাব!'

কৌতুকের এই সুর দারার মাঝেও কিছুটা প্রবেশ করে। হালকা হলায় তিনি বলেন, 'কিন্তু জনাব তো শুনেছি বিবিকে ছেড়েই তিন রাত নিঁদ যাচ্ছেন।'

বলেই কিছুটা গম্ভীর হয়ে যেন আপন মনেই দারা শুকোহ বললেন, 'তবিয়ত বেহাল হওয়ার কথা ঝুঠা হতে পারে।'

তখনই তিনি সুরাপাত্রগুলোর নিকট পৌঁছলেন। একটা খুশবু তার নাকে এসে ধরা দিল। ধরা দিল, নাকি দারা নিজেই খুঁজে নিলেন তিনি বুঝতে পারলেন না। কিন্তু এটুকু বুঝলেন যে এ খুশবুর সঙ্গে তিনি এর পূর্বেও পরিচিত হয়েছেন। বড় মৃদু এ খুশবু, কিন্তু স্থায়িত্ব অনেক। দারা মনে করতে চাইলেন, কিন্তু তখনই সাদেক জানাল, 'মীর বহরের বিবিরা বাতচিত করতে প্রস্তুত।'

মূলত দারা এদের তলব করেছেন। মোগল অমাত্যদের স্ত্রীরা কঠোর পর্দা মেনে চলেন কিন্তু এই মুহূর্তে স্বামীর মৃত্যুরহস্য ও বাদশাহি তলবের কারণে তাদের কিছুটা পর্দা ভাঙতে হচ্ছে। অবশ্য সবাই বাতচিত করবেন পর্দার আড়াল থেকে।

মীর বহরের চার বিবি তশরিফ রেখেছেন চিকের আড়ালে। অন্য পাশে দারা শুকোহ। তার পেছনে ওয়ালী ও সাদেক। সওয়াল জওয়াব করতে হবে। শরফউদ্দীনের মওতের নিষ্পত্তির জন্য তার বিবিদের গাওয়াহি জরুরি।

শাহজাদা চাইলে যেকোনোভাবেই তাদের তলব করতে পারেন। কথা শুরু করতে পারেন রূঢ়ভাবে। কিন্তু দারা কোমলভাবেই শুরু করলেন। বললেন, 'আমি শাহজাদা হলেও অন্দরের জেনানাদের তকলিফ দেয়ার এখতিয়ার আমার নেই। কিন্তু মীর বহর শরফউদ্দীনের খু...' বলে থেমে গেলেন দারা। এরপর শব্দটা খানিক বদলে নিয়ে বললেন, 'তার মৃত্যু আমাদের বাধ্য করেছে আপনাদের তলব করতে। আপনারা যদি আমাদের মদত করেন, তাহলে মুজরিমকে গ্রেফতার করা সম্ভব।'

কথা শেষ করতেই চিকের আড়াল থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ পান দারা শুকোহ। প্রথমে কেঁদে ওঠে ছোট বিবি, তারপর সে কান্না সংক্রমিত হয় সবার মধ্যে। ওয়ালী কিংবা সাদেকের কোনো কথায় সে কান্নার বেগ কিছুমাত্র প্রশমিত হয় না। কেবল বড় বিবি মালেকা বানু তার রোনাজারির মধ্যেই বলেন, 'মীর সাহেব তো নতুন বিবি আনার বাদ আমাদের সাথে ওয়াক্ত গুজার করতেন না। আমরা তার কথা আর কী বয়ান করব? তিনি আমাদের নজদিক ছিলেন না আর।'

দারা শুকোহ বুঝতে পারেন, শরফের চতুর্থ নিকাহ নিয়েই এরা এখন কথা বলে যাবে। তিন বিবির এই এক জায়গায় একই বেদনা। এদের সঙ্গে কোনো কথাই এখন তার পক্ষে বলা সম্ভব না। তিনি 'ক্ষমা প্রার্থনা' করে উঠে যান।

আবার একবার মনে হয় এই বিবিরা কোনো কথা গোপন করার জন্যও এ রকম করতে পারে। ওয়ালীই একবার বলে, যেহেতু খিড়কি আর দরওয়াজা বন্ধ ছিল অন্দর থেকে, বাহির থেকে কারো প্রবেশের সুযোগ ছিল না। কিন্তু তা হলেও কেমন করে কেউ খুন করে ফারার হয়! ভাবছেন দারাও।

কামরা পেরিয়ে বাইরে আসতেই অপেক্ষমাণ একটি বালকের দর্শন পান তারা। বছর পনেরোর বালকটির গায়ের রঙ তামাটে। নিম্ন স্বরে দারা শুকোহকে ওয়ালী বলেন, 'শরফের নওকর।'

'তোমার নাম?' দারা শুকোহ জানতে চান। দারার মনে হয় ছেলেটি দিল্লির নয়।

'শঙ্কর', বালকটি উত্তর দেয়।

'তুমি হিন্দু?' প্রশ্ন করেন ওয়ালী। প্রশ্ন করার প্রয়োজন ছিল না। নাম শুনেই বোঝা যায়। কিন্তু মোগল খেদমতগারদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়। তাদের নামও পরিবর্তিত হয় কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞেস করলে পিতৃদত্ত নামটিই তারা উচ্চারণ করে।

তবে শঙ্কর বলল, 'জে আজ্ঞে হুজুর।'

'এখানে কী করে এলে?' প্রশ্নটা এবার দারা করলেন।

ছেলেটি অনেকটাই সপ্রভিত। সম্ভবত জানে না এখানে শাহজাদাও আছেন। থাকলে সরাসরি নজর দিত না তার মুখের দিকে। সে বলল, 'হুজুর আমরা বাঙাল মুলুকের মানুষ। বাবা চাষের কাম করতেন। কিন্তু খাজনা দিতে পারি নাই। চাষের জমি রাজা নিয়ে নিল। বাবার সাথে আমি আসছিলাম কাজের খোঁজে। কিন্তু চাষের কাজ ছাড়া আমরা কিছুই পারি না।'

বালকটির বিস্তারিত জীবনকথায় ওয়ালী খানিক বিরক্ত হলেও দারা খুব মন দিয়ে শোনে। বুঝতে চেষ্টা করে এমন এক শ্রেণীর কথা, যাদের সে স্পষ্ট করে চেনে না।

ছেলেটি বলে চলে, 'শেষে বাবা ফৌজে গেলেন। কিন্তু সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। আমি দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম। তারপর একদিন হোসেনি আপা আমারে কুড়ায় পায়। হোসেনি আপা এই মহলের খাস বাঁদি। উনি আমারে এখানে আনেন। একসময় মীর সাহাবের নিঁদের আগে তার পা টেপা আমার কাজ ছিল প্রথমে। তারপর মীর সাহাবের কাছে কাছে থাকাই আমার কাজ হয়।'

দারা শুকোহ বোঝেন, শঙ্করকে কিছু সওয়াল করলে মীর বহর সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য তিনি জানতে পারবেন। কিন্তু শাহজাদার খায়েশ হয় না। কেননা শঙ্করের মলিন মুখ তাকে মনে করিয়ে দেয়, এমন একটি বালকের কথা যে বারবার অবলম্বন হারিয়েছে। প্রথমে ঘর, তারপর পিতা, তারপর মনিব।

মীর বহর খুন হওয়ার পর তার সমস্ত সম্পত্তি মোগল বাদশাহর জিম্মায়। মীর বহর নিঃসন্তান। সুতরাং এ সম্পত্তি বণ্টিত হবে অন্য আমিরের মাঝে। হয়তো তার নওকররাও বণ্টিত হবে আমিরদের মাঝে। শঙ্করের জায়গা কোথায় হবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই।

কী অদ্ভুত শাসন! এখানে কারো নিজের ওপর নিজের স্বাধীনতা নেই। দারা শুকোহ বহুবার পিতাকে এ সম্পর্কে ওয়াকেফ করার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, 'আব্বাজান, যখন একজন ইনসান ওয়াকেফ আছেন যে তার জমিন, তার বেওপার তার মওতের পর বাদশাহির জিম্মা হবে, সে কেন জমিনে ফসল বাড়ানোর চিন্তা করবে? কেনই বা অর্থ বাড়ানোর চেষ্টা করবে বেওপারে? আপনি ফরমান জারি করুন, জমিনের ওপর তাদের অধিকার দেয়া হবে, তবে দেখবেন জমিন-বেওপার থেকে আমদানি দ্বিগুণ হবে।'

কিন্তু বহু পুরনো রীতি থেকে পিতা সরে আসেননি। আসবেনও না। দারা বুঝতে পারেন, হয়তো সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি নিজেও এ প্রথা বলবৎ রাখবেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে শঙ্করের দিকে নজর দিলে তার মন সিক্ত হয়ে ওঠে। শঙ্করের মাঝে যেন নিজের চেহারা দেখতে পান তিনি। স্মরণ করতে পারেন সেই এক একটি দিন যখন তিনি আর আওরঙ্গজেব 'বন্দি' ছিলেন নূরজাহানের হাতে। সে দিনগুলোতে তিনি ছিলেন আওরঙ্গজেবের সবচেয়ে বড় বন্ধু। আর এখন? সবাই জানে, এমনকি তিনিও বুঝতে পারেন, দুই ভাই মুখোমুখি হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা।

কিন্তু সে ভাবনায় বাধা দিয়েছে একটি খত্। দারা বুঝতে পারছেন না আওরঙ্গজেব তার শত্রু, না বন্ধু?

৪.

'হেকিম সাহাব, আপনি আচানক আমার সঙ্গে মোলাকাতের খায়েশ কেন করলেন?' প্রশ্ন করলেন দারা শুকোহ।

দারা বসে আছেন তার পড়াশোনার কামরায়। চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা পুস্তক। নিচু টেবিলের ওপর কিছু ছড়ানো। পাশে দোয়াত-কলম। নাস্তালিক লিপিতে শাহজাদার পারদর্শিতার কথা হেকিম আহসানউল্লাহর অজানা নয়। তবু তিনি মুগ্ধ হয়ে সেদিকে চেয়ে ছিলেন। অনেকটা সময় তিনি অপেক্ষা করেছেন। এমন না যে দারা তাকে সুযোগ দেয়নি। কিন্তু নিজেই এই কামরায় প্রবেশ করে বিস্মিত হয়েছিলেন।

আহসানউল্লাহ জানেন বাদশাহ আকবরের নানা ধরনের বিষয়ে আগ্রহ ছিল। নিজে পড়তে পারতেন না কিন্তু পুস্তক তৈরি করিয়েছেন বিস্তর। সেইসব তিনি শুনতেন। মনেও রাখতেন। শ্রুতিধর ছিলেন। প্রপৌত্র দারার মধ্যে আছে জ্ঞানের তৃষ্ণা। কেবল জানার না, তিনি অনুসন্ধান করেন রীতিমতো।

দারা প্রশ্ন করার কিছুটা সময় পর মুখ তুলে তাকান হাকিম আহসানউল্লাহ। শরফউদ্দীনের মৃত্যু নিয়ে তিনি কিছু বিষয় চিন্তা করেছেন। তা নিয়েই দারার সঙ্গে বাতচিত করতে এসেছেন তিনি।

'রামদয়ালের সাথে বাতচিত করছিলাম, শাহজাদা। শরফের মৃত্যু নিয়ে একটা শক্ আমারও হয়েছিল। রামদয়ালও একই বাত করল', থেমে থেমে বললেন হেকিম।

'কী?' যেন মনোযোগ নেই এমন করেই প্রশ্নটা করলেন দারা।

আহসানউল্লাহ বললেন, 'মীর বহরের মুখ ফেরানো ছিল পুব দিকে। গলা কাটা হয়েছে তার ডান দিক থেকে বামে।'

'এ কথার গুরুত্ব?' দারা খানিক বিরক্ত বোধ করেন। সঙ্গে নিজেই বুঝতে পারেন এই দ্রুত বিরক্তির অভ্যাস কিছুতেই ভালো বয়ে আনে না। আহসানউল্লাহ বুজুর্গ মানুষ। তার কথার নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় অর্থ আছে। আর বুজুর্গ মানুষেরা একবারে সব কথা বলেন না। তাদের কথা শোনার জন্য ধৈর্য রাখতে হয়।

অভিজ্ঞ, বয়সী হেকিম ধৈর্যশীল। দারার অবস্থাও বোঝেন। তাই তিনি আবার বললেন, 'আমাদের ইয়াকিন খুনি দাঁড়িয়ে ছিল মীর বহরের শিরের দিকে। ডাইনা হাতে সে মীর বহরের মুখ বন্ধ করে আর ছুরি চালায় বায়া হাতে, ডাইনা থেকে বায়ে। মতলব খুনি বাম হাতে কাজ করে।'

দারার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দুধ, পেস্তা বাদাম, কয়েক ফোঁটা সুরা আর বরফ দিয়ে তৈরি শরবত তার পাশেই। শরবতে চুমুক দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তিনি হেকিমের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

হাকিমের কথায় তার মগজে এবার কিছু চিন্তার সঞ্চার হয়েছে। 'হেকিম সাহেব, খুনি এক পোঁচেই কাম তামাম করেছে, ঠিক?' দারা জিজ্ঞেস করলেন।

'জি শাহজাদা', শান্তভাবে উত্তর দিলেন হাকিম আহসানউল্লাহ।

দারা বুঝতে পারলেন এই খুন কোনো অভিজ্ঞ মানুষের দ্বারাই সম্ভব। এক পোঁচে গলা কাটা সহজ না। প্রথমত বাধা আসে। তাছাড়া অভিজ্ঞ খুনি না হলে এমন করা সম্ভব না। কারো মধ্যে ইন্তেকামের ইচ্ছা থাকলেও খুন করার সময় দুবিধা আসে তার মধ্যে।

'ফৌজের কোনো সিপাহি অথবা কোনো কিরায়া খুনি হওয়া অসম্ভব না। সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই জিয়াদা। লেকিন, আমার মনে হয়, এর পিছে কোয়ি বড় সাজিশ আছে', কিছুটা যেন মনে মনেই বললেন দারা।

কিন্তু হেকিম সাহেবের তরফ থেকে চমক তখনো শেষ হয়নি। তিনি তার জেবের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দারার হাতে দিলেন।

দারা দেখলেন খুবই ক্ষুদ্র এক টুকরো কাগজ। সেখানে আংরেজ মুলুকের লোকেদের ব্যবহার করা দুটি অক্ষর—ci.

'মীর বহরের তাকিয়ার পাশে ছিল,' কাগজটি তুলে দেয়ার পর এই কথার মধ্য দিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করেন হেকিম আহসানউল্লাহ।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে জাহাজ নিয়ে সাদা চামড়ার এই বিদেশীরা হিন্দুস্তানে আসছে সে বেশ অনেকদিন হয়ে গেল। আকবরের সময়ে এসেছিল কিছু পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারক। মনসারেত নামের পাদ্রি তো নাকি ধরেই নিয়েছিলেন যে আকবর যিশুর ধর্মে দীক্ষিত হবেন। শেষ পর্যন্ত কাজে সফল না হওয়ায় নারাজ হয়েছিল লোকটি। আকবারের সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছে সে। তবে গোয়া, সাতগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গির্জা ও যিশুর সংঘ।

ধর্ম প্রচার সব কালেই হয়েছে। তার পেছনে ছিল রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা। রাজারা ক্ষমতা সংহত করার জন্য এদের সমর্থন করতেন। আর ধর্মপ্রচারকরাও কেবল যে ধর্ম প্রচার করেছেন, বিষয়টা তা নয়। তাদের থাকত আরো অনেক উদ্দেশ্য। পাদ্রি, পুরোহিত, ভিক্ষু, দরবেশরা হয়তো ধর্মই প্রচার করতে চাইতেন কিন্তু তাদের এসবে উদ্বুদ্ধ করত ক্ষমতাসীনরা। বণিকরাও এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নিজেদের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য।

ইউরোপ থেকে যখন নাবিকরা ভারতের দিকে এল তখন মূল কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যের পরিধি বৃদ্ধি। মসলা, ফসল, মানুষ—সবই তাদের ব্যবসার উপাদান। ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তারা নিজেদেরও প্রচার করার চেষ্টা করেছিল। আকবরের সময়ে এসে তারা নিজেদের আরো বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। আকবার এদের মূল বিষয়টা বুঝতে পারেননি এমন না কিন্তু সে সময় তিনি ধর্ম নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। একদিকে বন্দরে সালিমা সুলতান বেগমের জাহাজ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, অন্যদিকে তিনি পর্তুগিজ পাদ্রিদের ডেকে তাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করছেন ইবাদতখানায়।

'আকবর অদ্ভুত মানুষ ছিলেন', দারা ভাবেন। 'মানুষকে নিয়ে নানা খেলা খেলেছেন এই পরদাদাজান। যেমন যুদ্ধ, তেমন সিয়াসত জানতেন।'

পরক্ষণে দারার মনে হয় তিনি নিজে না জানেন সিয়াসত, না জানেন জঙ। তাহলে এই বিশাল মোগল সালতানাত চালাবেন কী করে!

আসলে একজন মানুষ কি সব পারে? পারে না। সে যা চায়, হর ওয়াক্ত তা পাওয়া সম্ভব হয় না। দারার পছন্দ পড়াশোনা। ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন এসবে একবার যে ডুবেছে, সে জানে সিংহাসনের চেয়ে বড় লোভ পৃথিবীতে আছে।

কিন্তু মোগল রক্ত যার মধ্যে আছে সে নিজের খুশিতে তলোয়ার ত্যাগ করতে পারে না। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়ে, 'ওয়ালী আহ্‌দ' হয়ে তাকে জঙ, সিয়াসত নিয়ে ভাবতেই হয়।

দারা মনে করতে পারেন, জাহাঙ্গীরের আমলের পর থেকে সাদা চামড়ার এই লোকেরা মোগল সিয়াসতি মামলায় আস্তে আস্তে প্রবেশ করেছে। মসলার বাণিজ্য করতে আগত এই সাদা চামড়ার মানুষদের মধ্যে আলাগ আলাগ মুলুকের ইনসান আছে। এরা নিজেদের মধ্যে ঠাণ্ডা জঙ-এ ডুবে আছে। কে কীভাবে সম্রাটের নজদিকী হতে পারে সেই কোশিশ।

বাদশাহ শাহজাহান খুব একটা পছন্দ করেন না এদের। কিন্তু নানা কারণে এ বানিয়াদের নানা সুযোগ দিতে হয়। কখনো আমিরদের সিফারিশ আসে। এই সিফারিশের কারণ, আমিররা অর্থ লাভ করেন বানিয়াদের কাছ থেকে। নানা কজের জন্য তারা ইনাম নেন। কখনো অর্থ, কখনো রত্ন, কখনো নারী। দারার মনে হয়, মীর বহরও কোনোভাবে এদের সঙ্গে জড়িত।

জাহানারা এত্তেলা দিয়েছেন ভাইকে। অবশ্য একে 'এত্তেলা' বলা চলে না। কোনো সাধারণ ঘরে একজন বোন যেভাবে ভাইকে ডাকে, জাহানারার এত্তেলাও তেমন। দারা সে কথা জানেন। দারা এ-ও জানেন, এ মুহূর্তে জাহানের সঙ্গে বাত করলে শান্তি লাভ করবেন।

জাহানারার কক্ষে মৃদু দীপ জ্বলে। সেই দুর্ঘটনার পর জাহান কোশিশ করেন আগুন থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু আঁধার ঘরে তো থাকা সম্ভব নয়। তাই আলো জ্বালতে হয়। ঘৃতের প্রদীপ তিনি আর জ্বালেন না।

জাহানারা কখনো কখনো রুবাই লেখেন। কখনো নিজের মনে গান করেন। আবার কখনো দারাকে তলব করে তার সঙ্গে বাতচিত করেন। দারা দেখলেন, দোয়াত-কলম নিয়ে এই রাতেও বসে আছেন জাহানারা। বোনকে কখনো কখনো জাহান বলে সম্বোধন করেন পিতা। দারা প্রবেশ করতে বাঁদিদের ইশারায় সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন জাহানারা। দারা বসলেন জাহানের মুখোমুখি।

তেমন কোনো খাতিরদারি হলো না দারার। একেবারেই সাধারণ পরিবারের ভাইবোন যেন তারা।

'কিছু মালুম হলো?' প্রথমেই জানতে চাইলেন জাহানারা।

হেকিমের দেয়া তথ্য জাহানকে জানালেন দারা। জবাবে জাহানারা বললেন, 'এই বানিয়ারা মোগল আমিরদের বশ করার কোশিশ করছে। সিরফ বেওপারের মতলবে এরা আসেনি দারা। শুনলাম ফৌজেও নাকি ভর্তি হচ্ছে। কোথাও তাদের দেয়া হচ্ছে বড় দায়িত্ব। গোলন্দাজ বাহিনীতে এক এক করে ভর্তি হয়েছে অনেক বিদেশী। তাদের অধীনে কিছু করে সেনা আছে, গোলাবারুদ আছে। দারা, ভেবে দেখো ফৌজে যদি এরা শৃঙ্খলা নষ্ট করে, কোনো সাজিশ করে তবে কী হবে?'

কিন্তু দারা এতটা শঙ্কা করতে রাজি না। তিনি বললেন, 'আপাজান, বানিয়াদের আবভি ইতনা জিগার হয়নি। আমি ইয়াকিন করি তারা কোশিশ করছে কিন্তু আসান হবে না তাদের কোশিশ। আমাদের সিপাহি, মনসবদাররা চওকান্না থাকেন।'

জাহানারার মুখে সামান্য হাসি দেখেন দারা। 'পানি শিরের উপরে উঠে গেলে কিছু করার থাকে না দারা। সে ওয়াক্ত আসার আগেও ইনসানের উচিত মেহফুজ জাগা খোঁজ করা। কথায় বলে না, ওষুধ খোঁজার চেয়ে নীরোগী থাকার কোশিশ করো', বাঁ হাতের পোড়া অংশ আড়াল করতে করতে জাহানারা বললেন।

সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে দারার মন খারাপ হয়। কিন্তু জাহানারা চেষ্টা করেন নিজের মনোভাব আড়ালের। নাদিরার কথা তোলেন তিনি। দারা জানান নাদিরা ভালো আছেন। সে কথা শুনে জাহানারা বলেন নাদিরার স্বাস্থ্যের উন্নতি আল্লাহর দান। আরো বলেন, 'শোকর গুজার করি দারা। কিন্তু তুমি কি এখনো অনিশ্চিত?'

'কী বিষয়ে বলছেন আপনি?' জানতে চান দারা।

'রাণাদিল', এক শব্দে উত্তর দেন জাহান।

এ প্রসঙ্গ উঠবে, তা দারার অজানা ছিল না। কিন্তু আজই জাহানারা জিজ্ঞেস করবেন তিনি আশা করেননি। ভেবেছিলেন আলোচনার গতি মীর বহরের খুন পর্যন্তই থাকবে। এর বাইরে বাদশাহির অন্য কোনো জটিল প্রসঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু দারার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে জাহানারা সবসময়ই চিন্তিত থাকেন। দারার সেটা অজানা নয়। সে কারণেই বিষয়টিকে অন্যভাবে নিলেন না। তবে জাহানারা যখন প্রশ্ন করেছেন তখন পুরো বিষয়টা গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। তারপর আবার মনে হয় গুছিয়ে নেয়ার কোনো দরকার আসলে নেই।

'আমি নিশ্চিত, তাকে বেগমের মর্যাদা দিতে চাই। প্রয়োজনে তাকে আপনার সামনে পেশ করব। অনুমতি করেন তো কালই...', কথা শেষ হয় না দারার। মধ্যেই বাধা দেন জাহানারা।

'দারা, সে সময় পেরিয়ে যাবে না। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কোনো একটা সাজিশ চলছে। সে সাজিশের খোঁজ করা প্রয়োজন', চিন্তিত জাহানারার স্বর।

দারাও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে সরে যান। 'আপনার কি মনে হয়, মহলের কেউ এর সঙ্গে জড়িত?' দারা প্রশ্ন করলে অন্ধকারেও বুঝতে পারেন জাহানারার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে।

'তুমি কি পরিবারের কারো ওপর শক্ করছ?' সরাসরি প্রশ্ন করেন জাহানারা। কিন্তু কোনো উত্তর দারা দেন না। তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেন। জাহানারার স্পষ্টই মনে হয় দারা সন্দেহ করেন আওরঙ্গজেবকে। কিন্তু সে কথা ভাই বোনের কেউই উচ্চারণ করেন না। করা সম্ভবও না। এমন কিছু বিষয় থাকে রাজকীয় মহলে, সিয়াসতে, সিংহাসনের সঙ্গে, যা নিয়ে কথা বলা যায় না। তাই নীরবতাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর দারা প্রস্থানের অনুমতি চান।

দারা চলে যাওয়ার পরে জাহানারার চোখ পড়ে কিছু একটায়। দারা ঠিক যেখানে বসে ছিলেন সেখানে এক টুকরো কাগজ। যেন কোনো খত্।

কাগজটি তুলে নিলেন তিনি। ভাঁজ খুলে চমকে উঠলেন। সেখানে ফার্সিতে কেবল দুটো বাক্য লেখা।

> দারা, তুমি এখনো শত্রুকে শনাক্ত করতে শিখলে না। দূরের বন্ধুকে পেহচান করতে শেখোনি তুমি। অন্তত নজদিকের দুশমনকে নজর করতে শেখো।
>
> —শ্বেতসর্প

৫.

বাতিদানে সুগন্ধি তৈল পুড়ে আলো জ্বলতে থাকে। ময়ূরের পালকে তৈরি পাখায় হাওয়া করছে এক বাঁদি কিন্তু জাহানারা বিনিদ্র। দুশ্চিন্তা কিছুতেই দূর করতে পারছেন না তিনি। বিছানায় উঠে বসে বাঁদিকে পানি আনতে বলে নিজে এগিয়ে যান খিড়কির দিকে। হাওয়া একদম বন্ধ কিন্তু খিড়কির কাছে দাঁড়ালে আরাম হয়।

বাঁদির এনে দেয়া পানিতে বরফের দুটো দানা। চুমুক দিয়ে জাহানারা ডুবে যান তার স্মৃতির অতলে। সেখানে অনেক দৃশ্য, অনেক শব্দ এসে ভর করলেও একটা দৃশ্য খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

বাদশাহ শাহজাহান তখনো ইসলামের বিধিবিধানের কঠোরতার দিকে মনোযোগ দেননি। এখনো খুব যে কঠোর এমন নয়। কিন্তু তখন তিনি কখনো কখনো হিন্দু পুরোহিত, বৌদ্ধ শ্রমণদের সঙ্গে বাতচিত করতেন। জ্যোতিষীদের কথা শুনতেন। এমনই এক দিন এক জ্যোতিষীকে এনেছিলেন দরবারের কোনো আমির। 'দরবার-ই-আম' এ তাকে আনা হয়েছিল। বাদশাহ তাকে ডেকেছিলেন অন্দরে।

পাদিশাহ বেগম মারা গিয়েছিলেন দুই বছর আগে। পিতা তখনো শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু বাদশাহির কাজ তো বন্ধ করা যায় না। পিতা নিজের ওপর জোর করে তা করতেন। হয়তো শোক প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই বেলা দ্বিপ্রহরের আগে শাহজাদা, শাহজাদিদের সঙ্গে কিছু ওয়াক্ত পার করতেন।

জাহানারা স্মরণ করেন সেদিনের কথা। বিড়বিড় করে উচ্চারণও করেন। সেদিন যখন পিতা জ্যোতিষীর সঙ্গে বাতচিত করছিলেন আমরা সবাই সে কামরাতেই উপস্থিত ছিলাম। সব মতলব আমি, রওশন, দারা, শুজা, আওরঙ্গজেব। শুজা আর রওশন কখন কামরা ছেড়ে চলে গেল! পিতা তখন আমাদের তলব করেছিলেন জ্যোতিষীর সামনে। জ্যোতিষী প্রথমে আমার মুখে নজর করলেন। বললেন, আমি হব শান্ত স্বভাবের, বিদুষী। দারার দিকে নজর করে বলেছিলেন, 'আপনার এই পুত্রটি বিদ্যায় ছাড়িয়ে যাবে অনেককে। কিন্তু স্বভাব বড় রূঢ় হবে।'

সম্রাট এসব কথা বিশ্বাস করেছিলেন কিনা তা জাহানারা সেদিন যেমন বুঝতে পারেননি, আজও বোঝেন না। কিন্তু তিনি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারেন জ্যোতিষী যখন আওরঙ্গজেবের দিকে নজর ফিরিয়েছিলেন, আওরঙ্গজেব তখন একদৃষ্টিতে জ্যোতিষীকেই নজর করছিল। জটাধারী জ্যোতিষীর টকটকে লাল চোখের দিকে ছিল আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি। ১৩ বছরের বালক আওরঙ্গজেব।

সে চোখের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলেছিলেন জ্যোতিষী। বলেছিলেন, 'জাহাঁপনা, আপনার পরিবার এবং আপনার সাম্রাজ্যের জন্য এই বালক খতরনাক। সবকিছু তাবা করে দেবে সে। আপনার এই সন্তান একটি শ্বেতসর্প।'

আওরঙ্গজেবের রঙ তাদের সবার মধ্যে উজ্জ্বল গৌর, সে কারণেই জ্যোতিষী আওরঙ্গজেবকে 'শ্বেতসর্প' বলেছিল হয়তো। সেদিনের পর এ কথা দ্বিতীয়বার মোগল প্রাসাদে উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু তিন বছর আগে যখন আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের বরাদ্দ বাড়ানোর আবেদন করেছিল তখন বাদশাহর সঙ্গে তার বাগবিতণ্ডা হয়। সে সময়ে দারা সম্পর্কে আওরঙ্গজেব কিছু রূঢ় কথা উচ্চারণ করেছিলেন।

আওরঙ্গজেবের কোনো কথাই মিথ্যে ছিল না। বাস্তবিক, মোগল বাদশাহি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সিয়াসতের জ্ঞান। দারার তা আছে কিন্তু বাস্তব জ্ঞান নেই। সে পুস্তকে পড়ে অনেক কিছু জানে। বাস্তবে তার প্রয়োগ সবসময় থাকে না। দারা এ কথা বুঝেও বুঝতে চায় না। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যের কঠিন পরিবেশে থেকে আওরঙ্গজেব এখন সিয়াসত আর জঙ নিয়ে জানে না এমন কিছু নেই। একজন মোগল বাদশাহর গুণ তার মধ্যে আছে। কিন্তু ধর্ম নিয়ে তার বাড়াবাড়িটা পছন্দ না জাহানারার।

জাহানারার স্মরণে আসে, সেদিন বাদশাহকে নিয়েও কিছু কথা বলেছিল আওরঙ্গজেব। তাজমহল নির্মাণ, রত্নপাথরে অতিরিক্ত খরচ করায় পিতার সমালোচনা করেছিল সে। মোগল বাদশাহিতে এই গোস্তাকির মাফ নেই। শাহজাহান সরাসরি কোনো শাস্তি দেননি পুত্রকে। তবে আওরঙ্গজেবকে বহু বছর পর তিনি আবারো 'শ্বেতসর্প' বলে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'জঙ আর সিয়াসত সামলানোই বাদশাহর গুণ না। তাকে গড়তেও জানতে হয়। তুমি গড়তে শেখোনি এখনো। কেবল ভেঙে যাও। এই ভাঙন একদিন তোমাকেও ভাঙবে।'

আওরঙ্গজেব এসবের কোনো উত্তর দেয়নি। সে চলে গিয়েছিল নিজের সুবায়। সেখানে এখন মারাঠাদের নিয়ে ব্যস্ত। আর ফসল ফলিয়ে খাজনা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। জাহানারার তখন আবার মনে পড়ে আওরঙ্গজেবের ওয়াকিল জামশেদ দিল্লি এসেছে কিছুদিন আগে। এই তুরানিকে বোঝা যায় না সহজে। জামশেদের কালো পোশাক আর স্থির নজরের কথা স্মরণ করতে জাহানারার মেরুদণ্ড বেয়ে এক শীতল স্রোত নেমে যায়।

৬.

জামশেদ আসলে আওরঙ্গজেবের ছায়াসঙ্গী। রাজা-বাদশাহ-সম্রাটদের এমন ছায়াসঙ্গী রাখতে হয়। দেহরক্ষী বা সেনাদল থেকে বাছাই করা একজনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে এই পদে আনা হয়। সবসময় নির্দিষ্ট একজনই থাকবে এমন না, অনেক সময় ব্যক্তি বদল হয়। কিন্তু দেখা যায় কোনো ব্যক্তি সম্রাট, বাদশাহ বা শাহজাদার এতই বিশ্বাসভাজন হন যে তার স্থান স্থায়ী হয়ে যায়।

দুই বছর হলো জামশেদও আওরঙ্গজেবের স্থায়ী ছায়াসঙ্গী হয়ে গেছে। আওরঙ্গজেব যেখানেই যান না কেন, আওরঙ্গজেবের পাশেই থাকে সে। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কাজে পাঠানো হয়। কখনো জরুরি বার্তাসহ তাকে দিল্লি আসতে হয়। এর আগেও আওরঙ্গজেবের খাস বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে সে। আর বার্তা বা খত্ বরাবরই দেয়া হয়েছে বাদশাহর হাতে। দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য কখনো দেখা যায়নি।

এবার কেন ফারাক হবে? ভাবেন দারা শুকোহ।

লালকেল্লা ছাড়িয়ে দিল্লির বাজারে এসে পড়েছেন তিনি। মাঝে মাঝেই এমন করেন। কোনো বিষয়ে চিন্তা করার হলে কেল্লা থেকে বেরিয়ে তিনি চলে যান দিল্লির পথে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নানা চিন্তা করা তার স্বভাব। সাধারণ মানুষের বেশে তিনি ঘুরে বেড়ান। শুনেছেন বাদশাহ আকবরেরও নাকি এই স্বভাব ছিল। তবে তিনি আকবরকে অনুসরণ করেন, এমন না। খলিফা ওমরের (রা.) এ অভ্যাসের কথা মুসলিম জাহানের কারো তো অজানা না। তবে দারা শুকোহ মানুষের সমস্যা দেখতে বা সমাধান করতে বের হন না। তিনি মানুষকে জানতে চান, জানার চেষ্টা করেন।

একটা সাধারণ সালোয়ার পরেছেন দারা। শরীরের ওপরের অংশে একটা পিরান গায়ে দিয়ে হাঁটছেন দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তাজবিহীন মাথায় একদম সাধারণ দিল্লিবাসী মনে হচ্ছে তাকে। মুখের রঙ আড়াল করতে সামান্য রঙ লেপেছেন। যদিও রাতের দিল্লি শহরে তার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কখনো দরবারের আমিররাও পথে চলেন। তাদের চোখে আচানক পড়ে গেলে একটা হাঙ্গামা খাঁড়া হতে পারে।

মানুষের ভিড় লেগে থাকে দিল্লির এ বাজারে। নানা ধরনের মানুষ। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ তস্কর, কেউ কেবলই ভবঘুরে। কথায় বলে—দিল্লি কাউকে ফেরায় না। যে একবার আসে সে-ই থেকে যেতে পারে। অবশ্য নিজের জায়গা খুঁজে নিতে হয়। কেউ খুঁজে পায়, কেউ ফিরে যায়। যুগ যুগ ধরে দিল্লিতে বহু মানুষ এসেছে এর চারপাশ থেকে। তারাই খুঁজে নিয়েছেন দিল্লিতে নিজের জায়গা। আবার কাউকে দিল্লি নিজেই খুঁজে নেয়। যেমন শঙ্করকে খুঁজে নিয়েছিল।

শঙ্করের কথা মনে আসতেই একটা রুটি-কাবাবের দোকানের সামনে তাকে দেখা যায়। তার পাশে আসাদ। আগ্রা থেকে এর মধ্যেই চলে এসেছে। দারার মনে হয়েছিল শঙ্করের সঙ্গে কথা বলার সময় আসাদ থাকলে ভালো হয়। কেননা আসাদের বয়স কম। শঙ্করের সঙ্গে কথা বলার সময় সে দোস্তসুলভ আচরণ করতে পারবে।

শঙ্করকে আসাদই নিয়ে এসেছে দিল্লির বাজারে। তার আগে অবশ্য দুই দিন নানাভাবে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছে আসাদ। কিছুটা সফলও হয়েছে। দারার দিকে তাকিয়ে চোখে সে রকমই একটা ইশারা করে আসাদ। দারাও বুঝে নেন।

'শঙ্কর, তুমি তো হিন্দু। তুমি কি কাবাব খাও?' শঙ্করকে নিয়ে বসে জিজ্ঞেস করেন দারা।

'হ্যাঁ ভাইজান। মীর সাহাবের মহলে এতদিন নওকরের কাম করে আভি আমার বোলচাল, সুলুক বদল গিয়া। এখন ডর হলে বাঁ রোনা আসে তো পুরানা শঙ্কর বনে যাই', বলে শঙ্কর। আগের চেয়ে অনেক সপ্রভিত লাগে তাকে। তবে ভাইজান বলে সম্বোধন করার বিষয়টা তাকে আসাদ শিখিয়ে দিয়েছে। বাজারে দারার পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

খানা আসতে আসতে দারা শুকোহ আবার জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি খুদ আমার সঙ্গে বাত করতে চাইলে?'

'না খো...', ইশারা করলেন দারা। ইশারা বুঝে শঙ্কর আবার বলল, 'না ভাইজান। বিবিজান আমাকে ভেজ দিয়েছেন। সাথ মে বলেছেন আপনাকে সাবকুচ ঠিক ঠিক বাতাতে।'

দারা শুকোহ চুপ করে থাকেন। কোন বিবিজানের কথা শঙ্কর বলছে তিনি জানেন না। জানার এখন দরকারও নেই। শঙ্করের কথা থেকেই বোঝা যাবে। আপাতত তিনি লক্ষ করেন উত্তর দিকে দুটো চারপাইয়ে বসে ডাল-তরকা খাচ্ছে চারজন লোহার। নিজেদের মধ্যে কথাও বলছে। কামারের ছদ্মবেশ নিলেও ওয়ালীর চার সেনাকে চিনতে কষ্ট হয় না দারার। তিনি খানিকটা আমোদ পাওয়ার সঙ্গে নিরাপদও বোধ করেন। তারপর তাকান শঙ্করের দিকে।

পানি পান করে শঙ্কর বলে, 'মীর সাহাব দো তিন রোজ সে অনেক পেরেশান লাগছিলেন। তিন রোজ একা নিঁদ যান। বিবিদের সঙ্গে বাতচিতও করতেন না। এক রোজ আমি তার পা দাবানোর ওয়াক্ত শুনি তিনি কিছু বলছেন। সে বাত আমার সমঝে আসে না। বিবিজানকে সে বাত বাতাতেই আপনাকে খুলকে বাতাতে বললেন।'

'মীর সাহাব নিঁদ মে বাত করছিলেন?' জানতে চাইলেন দারা।

'নিঁদ পড়েছিলেন। খোয়াবে বরবর করছিলেন। কী বলছিলেন ইয়াদ নেই কিন্তু 'টমটম' সা কুছ বলছিলেন।'

শঙ্কর এবার নিজেই বিড়বিড় করতে আরম্ভ করে। দারা শুকোহ বুঝতে পারেন ছেলেটির তেমন কিছু বলার নেই। কেবল মীর বহরের চতুর্থ বিবি তার আবেগ থেকেই একে পাঠিয়েছে। কেননা শঙ্কর বলেছে, শরফের তরুণী বিবিটি তাকে চারটি আশরফি দিয়ে বলেছে সে যেন শাহজাদার সঙ্গে দেখা করে।

শরফ খুন হয়েছেন সাত রোজ আগে। এ পর্যন্ত কিছুই করা সম্ভব হয়নি। দারার নিজেকে অক্ষম মনে হয়। সে অক্ষমতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেই রাণাদিলের কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা। শঙ্করের সঙ্গে কথা বলে আসাদকে তার ঘোড়া আনার হুকুম। তারপর সে ঘোড়া ছুটতে থাকে।

ওদিকে ছুটছেন আওরঙ্গজেব। দাক্ষিণাত্যের বেরার থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন মালওয়ার সীমান্তে। বুন্দেলদের পরাজিত করা শাহজাদা তিনি। জওয়ানি থেকেই একের পর এক জঙ ফতেহ করে চলেছেন। দাক্ষিণাত্য, গুজরাতের মতো সুবার দায়িত্ব তার, যেখানে শান্তি কম আর বাগীর সংখ্যা বেশি। যেমন সংখ্যা তেমন শক্তি। সে বাগীদের বিরুদ্ধে একা লড়াই করছেন। নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন ফৌজ। কিন্তু বাদশাহ শাহজাহানের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। তার ধ্যান তাজমহল, তার জ্ঞান দারা শুকোহ।

গভীর রাতে ঘোড়া ছোটাতে নিষেধ করেছিল সবাই। কিন্তু আওরঙ্গজেব পাত্তা দেয়ার মানুষ নন। পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন নিজেই। সীমান্তে ডেরা জমানো ডাকাত দলকে শায়েস্তা করতে হবে। মালওয়া থেকে কিছু দস্যুর উৎপাত শুরু হয়েছে। এই ওয়াক্তে শায়েস্তা করা না হলে একদিন এরাই সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

পিতার প্রতি অসন্তোষ আছে তার। অসন্তোষ আছে ভাইয়ের প্রতি। কিন্তু তৈমুরি সিলসিলায় বাবুর যে সালতানাতের বীজ বপন করেছিলেন তা আজ বিশাল বাদশাহিতে পরিণত। তাকে রক্ষা করতে আওরঙ্গজেবের কোনো ক্লান্তি নেই। আর তা করার জন্য যেকোনো কাজ তিনি করতে পারেন।

ঘোড়ার গতি কমিয়ে কিছুটা ধীরে চলতে থাকেন তিনি। জামশেদের অভাব খুব করে অনুভব করছেন।

জামশেদকে তখন এত্তেলা দিয়েছেন খোদ পাদিশাহ শাহজাহান। বাদশাহর সামনে উপস্থিত হয়ে জামশেদ তাকে সাজদা করল।

'দাক্ষিণাত্যে বাগীদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে আওরঙ্গজেবের অর্থ প্রয়োজন?' শাহজাহান জিজ্ঞেস করেন।

'জি, আলমপনা', মোলায়েম বিনীত স্বরে উত্তর জামশেদের।

'খাজনা, বরাদ্দ নিয়ে কথা বলা তো তোমার কাজ নয়। দক্ষিণ সুবার জরুরত আমাকে বোঝানোর মতো তাজুরবা কি তোমার আছে?' বলে শাহজাহান জামশেদের দিকে তাকান। তিনি যেন পরখ করে নিতে চাইছেন এই সৈনিককে।

জামশেদও বুঝতে পারল, আওরঙ্গজেবের এবারের প্রার্থনা মঞ্জুর করাতে হলে তাকে অর্থনীতিবিদের ভূমিকা নিতে হবে। আওরঙ্গজেব নিজেও হয়তো আন্দাজ করেছিলেন। যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জামশেদকে। সে অনুযায়ী জামশেদ দাক্ষিণাত্যে অর্থ বরাদ্দের খাত এবং প্রয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত বয়ান করতে লাগল।

খঞ্জর আর তলোয়ার চালানো একজন সৈনিককে এভাবে তৈরি করে বাদশাহর কাছে পাঠিয়েছেন আওরঙ্গজেব। সঙ্গে দিয়েছেন আরেকটি দায়িত্ব। পুত্রের বুদ্ধি এবং কর্মকুশলতায় আনন্দিত হলেও প্রকাশ করেন না। বরং জামশেদের বক্তব্য শেষ হলে বলেন, 'বহৎ খুব।'

বলেই বাদশাহ তার পাশে রাখা স্বর্ণের থালা থেকে একটি আপেল তুলে জামশেদের দিকে ছুড়ে দেন। জামশেদ সেটি এক হাতে ধরে ফেলে বাদশাহকে কুর্নিশ করলে বাদশাহ বলে ওঠেন, 'একে কয়েদ করো।'

চিকের আড়াল থেকে জাহানারাও দেখেছিলেন, জামশেদের ডাইনা হাতের আগে তার বাঁয়া হাত চলে।

৭.

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে গত রাতের শেষ প্রহর থেকে। রাণাদিলের বাহুর আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হয়ে শাহজাদা দারা শুকোহ এসে দাঁড়িয়েছিলেন খিড়কির কাছে। বৃষ্টি হলেও গুমোট কাটেনি। বরং ঘাম জমছিল শরীরে। রাণাদিলের নিঁদ টুটে গেলে সে এগিয়ে এসে দারার হাতে হাত রেখেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাতে হাত ধরাধরি করে প্রেমিক-প্রেমিকা দাঁড়িয়ে শুনছিল বৃষ্টির সুর।

আগ্রার বৃষ্টি তেমন জমে না। এই এল তো এই নেই। পরদাদা হুমায়ুন লিখেছিলেন বাংলার বৃষ্টির কথা। সেখানে টানা তিন-চারদিনও নাকি বারিষ হয়। বারিষ এলে বাতাসে নাকি মাটি আর গাছপালার একটা সুবাস ওঠে। এখানে সেই অবস্থা নেই।

দারার এই বাড়িটা বানিয়েছেন নিজের মতো করে। লাল পাথরেই বানানো। তবে কামরাগুলো অন্য মোগল প্রাসাদের মতো না। তার চেয়ে বড় কথা একটা ঝুলবারান্দা বানিয়েছেন তিনি। কোনো অমাত্যের কামরার চেয়েও বড় সেটা। আর খিড়কি দিয়েছেন দক্ষিণে। রাণাদিল তাকে বলেছে দক্ষিণ থেকে নাকি সুন্দর হাওয়া দেয়। তিনতলার সেই খিড়কিতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা। বৃষ্টির হালকা ছাঁট এসে লাগছিল দারার বুকে।

সকাল থেকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। গরমের তীব্রতা কমে গেছে। খুশহাল মন নিয়ে দারা শুকোহ বসেছেন তার পড়াশোনা নিয়ে। ঝুলবারান্দার এক কোনায় নিচু টেবিল। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছেন দারা। ওপাশে কামরায় বিছানা পরিপাটি গোছানো। দেয়ালে ঝুলছে নানা রকম ছবি, একটা হরিণের মাথা। ফরশে পাতা বাঘছাল। একটু আগে সেটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন রহীম বেগ।

রহীম বেগ নিয়ে এসেছিলেন কিছু বইপুস্তক। প্রায় এক ঘড়ি আলোচনা করেছেন সেসব নিয়ে। এখন নিজের মতো আরো কিছু খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করছেন দারা। আবার মাঝে মাঝে লিখছেনও। স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝে সম্পর্কের অলৌকিকত্ব নিয়ে লেখায় ডুবে ছিলেন দারা।

'খোদাবন্দ', মৃদু স্বরে সম্বোধন করল রাণাদিলের বাঁদি কুলসুম। রাণাদিল তাকে প্রেরণ করেছে শাহজাদার নিকট। সে নিজে ব্যস্ত রসুইয়ে। মুখ তুলে তাকালেন দারা। কিন্তু তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো তিনি কুলসুমকে চিনতে পারেননি। এমন মাঝে মাঝেই হয়। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তিনি অনেক সময় হারিয়ে যান।

'শাহজাদা, ওয়ালী বেগ আপনার জন্য জরুরি সংবাদ দিয়ে ইনতেজার করছেন', বলে ইতস্তত করে শাহজাদি। দারা কোনো উত্তর না দিলে সে চলে যায়।

খানিক বাদে রাণাদিল এসে দেখে আবার মগ্ন হয়েছেন শাহজাদা। রাণাদিল সাবধানে শাহজাদার পাশে বসলে মুখ তুলে দারা হাসে। শিশুর মতো সে হাসি।

'দিল দেখো, এখানে কী লিখেছে! স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক হবে প্রেমের, ভীতির না। দেখো, আজ তক সব কওমের ইনসানকে বলা হয়েছে—তাকে ভয় করো। কিন্তু ভয় কী প্রেম আনে, দিল?'

রাণাদিল কিছু না বলে চুপ করে শাহজাদার দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় শাহজাদার ঘোর ভাঙলে দেখতে পায় ওয়ালী বেগ তার সামনে দণ্ডায়মান।

'ওয়ালী, তুমি?' অবাক শাহজাদা প্রশ্ন করেন।

'জি শাহজাদা। দিল্লি থেকে খবর নিয়ে তুরন্ত এসেছি', ওয়ালী জানায়।

'কী খবর?' অনাগ্রহ ঝরে দারার কণ্ঠে।

ওয়ালী শান্ত স্বরে বলে, 'আপনার পিতা, পাদিশাহ-এ-জাহান, শাহজাহান, জামশেদকে কয়েদ করেছেন।'

এমন কিছু হওয়ার কথা না। কিন্তু বাদশাহ কোনো কারণ ছাড়া এমন করেননি সেটাই মনে হয় দারার। তবুও আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, 'কেন?'

ওয়ালী তার কুর্তার আড়াল থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে শাহজাদার হাতে দিলে দারা বুঝতে পারে এ সেই খত্, যা আওরঙ্গজেব পাঠিয়েছিল। কোনোভাবে সে খতটা হারিয়ে ফেলেছিল। আশ্চর্য! সে নিজেও জানে না কোথায় হারিয়েছিল।

'পাদিশাহ বেগম শাহজাদি জাহানারা আপনাকে এই খত্ দিয়েছেন', বলে ওয়ালী আরেক টুকরো কাগজ হাতে তুলে দেয়।

প্রথম খতখানা আওরঙ্গজেবের। দ্বিতীয়টি জাহানারার নিজের হাতে লেখা।

> দারা, তোমার বে-খায়ালি দিন দিন হদ পার করে চলেছে। আমি জানি তুমি তোমার আধ্যাত্মিক অন্বেষণে ব্যস্ত। কিন্তু সালতানাতের ওয়ালী আহদ এত বে-খায়াল থাকলে সালতানাত রক্ষা করা সম্ভব? আব্বাজান তোমাকে পেয়ার করেন। কিন্তু সে পেয়ারের কিমত আদায় করাও তোমার জন্য ফরয।
>
> —জাহান

ওয়ালী বেগ দিল্লির সমস্ত খবর দারাকে জানাল। দারা দিল্লি ত্যাগের তৃতীয় দিন জামশেদকে কয়েদ করেছেন বাদশাহ শাহজাহান। জামশেদ যে মীর বহরের খুনি তার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও দারার কাছে থাকা আওরঙ্গজেবের খত্ জামশেদের দিকেই শক্ নিয়ে যায়।

চৌবাচ্চার উষ্ণ পানিতে শরীর ডুবিয়ে দারার আরাম বোধ হয়। একই সঙ্গে নিজের প্রতি হেসে ওঠেন তিনি। কী বেয়েখাল! এমনই হয়। কোমরবন্ধে রাখা খঞ্জরই মাঝে মাঝে অনুভব করতে পারেন না, এ তো সামান্য এক খত্। হতো যদি বেদের কোনো ব্যাখ্যা, ফির ইয়াদ থাকত।

যার যেখানে দিল্লাগি, সে সেখানেই খুশহাল থাকে।

কিন্তু জামশেদকে কয়েদ করা সহি হলো না। দারা নিশ্চিত, এ কাজ জামশেদের নয়। আর যদি হয়েও থাকে তা হয়েছে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে। জামশেদকে কয়েদ করা মানে আওরঙ্গজেবের কামকে সওয়াল করা। এতে আওরঙ্গজেব খুদ নাখোশ হবে। আর দরবারের বাইরে এই বাত জানাজানি হলে সবাই জানবে মোগল শাহজাদাদের মধ্যেই জঙ বাধার সময় এসেছে।

আওরঙ্গজেবকে চেনেন দারা। একসঙ্গে বড় হয়েছেন। মুখে তুলে খাইয়েছেন। একবার যখন বিমার হলো সারা রাত জেগে ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাকে বলেছিল, 'আপনাকে আমি কোনোদিন দরদ দেব না, ভাইজান।'

কিন্তু সেই আবেগ এখন তাদের কারো মধ্যে নেই। না থাকলেও এভাবে দারা কিংবা বাদশাহির ক্ষতির কারণ হবেন না আওরঙ্গজেব। তার কাজ আরো গভীর হবে। তিনি এমনভাবে কাজ করবেন যেন সন্দেহের তীর থাকে বহুদূরে।

পানিতে ডুব দিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে এতসব চিন্তা করে দারা মনে মনে হাসেন। আমির, বানিয়া থেকে আব্বাজান পর্যন্ত কাভি কাভি বলেন, 'দারা সিয়াসতে না-সমঝ।'

দারার মনে হয় কখনো তাদের বলে দেবে, 'সিয়াসতে আমার সমঝ আপনাদের কারো চেয়ে কম না। আমি শুধু সিয়াসতি নই।'

সব কথা বলা হয় না, বলা যায় না, দারা জানেন। সিয়াসতের এ-ও এক নিয়ম। সব কথা বলা চলে না। কিছু কথা মনের মধ্যে গোপন করতে হয়। আবার কিছু কথা ছড়িয়ে দিতে হয়। এখন সে রকম কোনো কাজই করা দরকার হয়তো। আলোচনা করতে হবে কিছু বিষয় নিয়ে।

মোগল গোসলখানা, আলোচনার এক বিশেষ স্থান। গোসলের সময় সম্রাট কিংবা শাহজাদা তাদের খাস আমির, সিপাহসালার কিংবা গুপ্তচর প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করেন। দারাও আজ এত্তেলা দিয়েছে ওয়ালী বেগকে। কিন্তু দারা কেবল উষ্ণ পানিতে কখনো ডুবছেন, কখনো ভাসছেন।

দশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ খান। নারীও নয়, পুরুষও নয়। রাণাদিলের মহলের দায়িত্বে আছে সে। দারার গোসলের ইন্তেজাম করে

এখানেই এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে দারা ডুব দিচ্ছেন একের পর এক।

সে সিলসিলা খতম করে একসময় নিজেই বললেন, 'জামশেদকে কি কয়েদ করা হয়েছে, নাকি সে নজরবন্দি?'

'নজরবন্দি, শাহজাদা', বললেন ওয়ালী।

'ফের তুমি কেন বললে কয়েদ করা হয়েছে?' দীর্ঘ গোসল কিংবা ক্রোধে দারার চোখ রক্তাভ।

'গলতি মাফ হয় শাহজাদা', ওয়ালী চোখ নামিয়ে নিলেন।

'ওয়ালী', দারা বলতে শুরু করেন, 'ইয়াদ রাখো, কাভি কাবার এক শব্দের কারণেও কথার অর্থ এমন বদলে যায় যে ভিন্ন অর্থ করে।'

'জি জনাব', বলে চুপ করে যায় ওয়ালী।

দারা মুচকি হাসেন। তারপর বললেন, 'এখন বাতাও, তোমার জাসুসরা কী খবর আনল?'

'জনাব', ঢোক গিলে শুরু করে ওয়ালী, 'মীর বহরের নওকর, বাঁদি সবাইকে সওয়াল করে জানা গেছে মীর সাহাব তার মওতের পিছলা তিনদিনতক কারো সঙ্গে মোলাকাত করেননি। লেকিন তিন মাহিনা হলো তিনি আংরেজিতে পড়াই লিখাই শিখতে শুরু করেছিলেন।'

'বহৎ খুব। আগে বলো', যেন খুব আমোদ পাচ্ছেন তিনি।

দারার মেজাজ শরিফ দেখে ওয়ালী আরো বলল, 'মীর সাহাবের সঙ্গে আংরেজ বানিয়াদের কোনো না কোনো যোগাযোগ ছিল। মীর সাহাবের মহলের দারওয়ান বয়ান করেছে মীর সাহাব কাভি কাভি ভেস বদল করে রাতে কোথাও চলে যেতেন।'

'খুশবু লাগিয়ে?' দারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

থতমত খেয়ে ওয়ালী বলল, 'এ সওয়াল তো জিজ্ঞেস করিনি জনাব।'

দারার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়ালীর মনে হয়েছিল এই উত্তর শুনে ওয়ালীর গর্দান নেয়ার আদেশ দেবেন। কিন্তু না। দারা সামান্য হেসেই উঠলেন। বললেন, 'এ সওয়াল করার কথাও না কারো।'

পোশাক বদলে দারা এক মুহূর্ত চোখ বুজে থাকলেন। মনে হলো এ রহস্য সমাধানের চেষ্টায় তিনি খুশি লাভ করছেন। সে খুশি দারার মুখে স্পষ্ট দেখল ওয়ালী।

চোখ খুলে ওয়ালীকে দারা বললেন, 'ওয়ালী, নওকর-বাঁদিদের সওয়াল করো মীর সাহাব পিছলা কিছুদিন তার মহলের কোন হিস্যায় হঠাৎ চলে যেতেন?'

'মতলব, জনাব?' ওয়ালী বুঝতে পারেনি দারা ঠিক কী জানতে চান।

'কোনো মতলব নেই ওয়ালী। সওয়াল করবে মীর সাহাব আচানক কাম কাজ ছেড়ে মহলের নির্দিষ্ট কোনো হিস্যায় দওরকে চলে যেতেন কিনা।'

'জি হুজুর', বুঝতে না পারলেও হুকুম তামিল করার কথা মাথায় নিল ওয়ালী বেগ।

ওয়ালী প্রস্থান করলে দারা রাণাদিলের কামরায় যান। খানা তৈয়ার করে অপেক্ষা করছিল সে।

দিল্লির পথে পথে ঘোরা রাণাদিল বিভিন্ন রকম সহজ কিন্তু সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে পারে। বাঙাল মুলুকের সাদা ভাত আর ভর্তা যেমন রাণার গুণে শেহেদ মনে হয়, তেমনি মুর্গ মুসল্লমেও রাণা মাহির।

'আপনি ইয়াকিন করেন, জামশেদ খুনি নয়?' প্রশ্ন করে রাণাদিল।

'করি। শরফউদ্দীন যে রাতে খুন হয় সে রাতে জামশেদ দিল্লির দক্ষিণে ছিল, যেখানে সাধারণ মানুষের বাস', জবাব দেন দারা।

'সেখান থেকে উত্তরে যাওয়া অসম্ভব নয়। বেশি ওয়াক্তেরও জরুরত হয় না', রাণাদিল দিল্লির পথ ও সেখানে সহজে চলার উপায় সম্পর্কে জানে।

দারাও মেনে নিলেন তার কথা। বললেন, 'তা হয় না। কিন্তু জামশেদের শক্ত মুখের আড়ালে একটা নাজুক দিল আছে।'

'এ কেমন পহেলী করছেন আপনি, শাহজাদা?' প্রেমিকার মতো ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিনয় করে রাণা।

'পহেলী না, দিল। ভাবো, আওরঙ্গজেব আচানক এক সিপাহিকে কেন হিসাবের খতিয়ানসহ দিল্লি পাঠিয়েছে?' দারা অমোদ করার মতো প্রশ্ন করলেন।

'আপনাকে খত্ পৌঁছানোর জন্য। সঙ্গে প্রয়োজনে মীর বহরের খুন', সহজ জবাব রাণাদিলের।

'না দিল। আমার তা ইয়াকিন হয় না', জোর দিয়ে বললেন দারা। আরো বললেন, 'আমার কাছে খত্ পৌঁছানো আওরঙ্গজেব জরুরি ভেবেছে, ও কাম যে কেউ করতে পারত। দুসরা কারণ আছে।'

'আর আপনি সেটা জানেন। কিন্তু রাজ খুলবেন না। এই তো?' মিষ্টি হাসে রাণাদিল।

হাসি ফিরিয়ে দিয়ে দারা বলেন, 'খুলব। তবে তোমার মদত আমার জন্য জরুরি।'

'কী মদত? শাহজাদার জন্য তো জান হাজির', নিবেদনের সুরেই দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে।

'তোমার জান তো আমারই কাছে। আপাতত জানাও যে দিল্লির কোন কোন কোঠিতে বিদেশী বানিয়াদের মেহফিল জমে?' দারাও হাসেন এ কথা বলে।

একদিন পরই দিল্লি ফিরলেন দারা। তবে শাহজাদার বেশে নয়। এক রইস রাজপুত বণিকের বেশ নিলেন তিনি। দেবেন্দ্র সিং নাম নিলেন দারা, আসাদের নাম বিজয় মল। দিল্লির এক সরাইখানায় গিয়ে কামরা নিলেন দুজনে। সরাইখানার মালিক রুবাইয়াৎ রাতে খাবার নিয়ে নিজেই গেল দেবেন্দ্র সিংয়ের ঘরে।

'হুজুর, অধমের কেন যেন মনে হয় আপনি এবারের আগেও আমার সরাইয়ে উঠেছিলেন', প্রশ্ন করল রুবাইয়াৎ। তার বয়স চল্লিশের কোটা ছুঁয়েছে। তিন বছর আগে সরাইটা শুরু করেছে সে।

'কা বাত করছেন আপনি? হাম দিল্লি পহেলি দফা আসছি', সহজ করেই জবাব দেন দারা।

'গলতি হবে হয়তো। লেকিন আপনার চেহরা খুব জানা পেহচানা লাগছে', সন্দেহ যেন দূরীভূত হয় না।

দারা ইচ্ছে করেই এই সরাইতে উঠেছেন। কেননা কখনো কখনো সামান্য ছদ্মবেশ নিয়ে এই সরাইয়ে রাতের খাবার খেয়ে যান তিনি। রুবাইয়াৎ নাম হলেও মূলত মানুষটি ব্রাহ্মণ। স্বভাব কবি লোকটি কেন সরাই চালায়, দারার সে কথা এখনো জানা হয়নি। সুস্বাদু নিরামিষ আর সংস্কৃত শ্লোক শুনতে এখানে আসে দারা। খুসরোর ভক্ত রুবাইয়াৎ। সে চেষ্টা করে সংস্কৃত শ্লোককে ফারসি রুবাইয়ের মতো করে বলতে। দারার খুব ইচ্ছা এই রুবাইগুলো সংকলন করে।

রুবাইয়াৎ চলে গেলে দারা নিশ্চিন্ত হয়। এখানে তাকে কেউ চিনতে অক্ষম। তখন তিনি আসাদ ওরফে বিজয়কে নিয়ে পথপরিক্রমায় বের হন।

কথায়ই পথপরিক্রমা। তাদের মূল লক্ষ্য মালেকা জানের কোঠা। রাণা জানিয়েছে চাঁদনি চওক থেকে দশ কদম সিধা গিয়ে ডাইনা মোড় নিয়ে শ কদম চলার পর যে সরু গলি দেখা যাবে সে গলিতে তিরিশ কদম চলার পর মিলবে এক দরওয়াজা। সে দরওয়াজায় দস্তক দিলে এক খোজা এসে নিয়ে যাবে মালেকা জানের কোঠায়।

'এ তো পহেলীর মাফিক হলো!' রাণাদিলের কথা শুনে তাজ্জব হয়ে বলেছিলেন দারা।

'হা শাহজাদা, হলো। দিল্লি আগ্রার কারিব সব কোঠার মালকিন হয়। মতলব মালকিন এক আওরাত। লেকিন মালেকা জান কোনো আওরাত না। সে একজন খোজা। আবার কেউ কেউ বলে সে মরদ, লেকিন আওরাতের মতো পোশাকে সাজে।'

'মতলব, এ কোনো সাধারণ কোঠা নয়? এখানে নাচ গানের মেহফিল বসে না?' জানতে চেয়েছিলেন দারা।

রাণাদিল জানিয়েছিল সেখানে নাচ-গানের মেহফিল বসে। কিন্তু আসলে সেখানে নানা কিসিমের বেওপার হয়। ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, আংরেজ বানিয়ারা সেখানে যায়। কখনো ভেস বদলে যায় মোগল মহলের কর্মচারীরা। তারা আমিরদের নিযুক্ত লোক।

'দিল্লিতে এমন এক জায়গা আছে, আমাদের জাসুসরাও জানে না!' অবাক হন দারা।

'শাহজাদা, মোগল জাসুস লস্করের যে তাকত জরুরি, তা এর নেই। তবে আমি ইয়াকিন করি আপনি কোশিশ করলে তাদের তাকাত বাড়ানো

না-মুমকিন নয়', দারার মন রক্ষার পাশাপাশি জরুরি একটা বিষয় সমাধান করে রাণাদিল।

সামান্য থেমে সে আরো বলেছিল, 'শাহজাদা, দিল্লির গলিতে রঙ আছে, পয়সা আছে, শান্তি আছে। সঙ্গে মওত ভি আছে। লেকিন সবকিছু বাদ দিয়ে দিল্লির গলিতে বহুত কাহানি আছে। সে কাহানি তারাই জানে, যারা দিল্লির গলি গলিতে ঘুরে মরেছে একটা রুটির জন্য।'

রাণাদিলের ভবঘুরে জীবনের কথা দারার অজানা নয়। দিল্লির অজানা গল্প বলতে গিয়ে সে স্মৃতি রাণাকে কষ্ট দিতে শুরু করেছে বুঝতে পেরে দারা তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

এখন দিল্লির পথে চলতে চলতে সেই কথা মনে পড়ে। দারা চলছেন চাঁদনি চওকের মধ্য দিয়ে। পথ চলার সময় চাঁদনি চওককে ভালো করে লক্ষ করেন দারা। জাহানারা নিজে নকশা করেছেন এ বাজারের। এখনো সব কাজ শেষ হয়নি। বাজারের মধ্যভাগে ঝরনাটি এখনো তৈরি হয়নি। কাজ চলছে। জাহানারা নিজে একাধিক দিন এখানে এসে তদারক করে গেছেন কাজ। চতুর্দোলায় করে যখন তিনি আসেন, বহু লোক জমায়েত হয়। তারা অবশ্য দূরত্ব বজায় রাখে। মোগল সেনা মোতায়েন থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে ওয়ালীর বাছাই করা গুপ্তচর।

গভীর হয়নি রাত কিন্তু দ্বিতীয় গলিটা সুনসান। কিছু লোক ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ একজন আরেকজনের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যায় এরা আফিম কিংবা সুরার নেশায় বুঁদ। দারা লক্ষ করেন এরা সবাই দিল্লিবাসী না। কেউ হয়তো এসেছে গুজরাট, কেউ মালওয়া, কেউ দাক্ষিণাত্য থেকে। এর মধ্যেই কিছু আছে পর্তুগিজ আর কিছু আংরেজ। তারা চেহারা আবৃত করে রেখেছে। অথবা রঙ মেখে আসল মুখ লুকানোর চেষ্টা করছে।

দারার পাশ দিয়ে একটা লোক চলে গেল। তার মনে হলো একে সে চেনে। কোনোভাবেই মনে করতে পারল না গোলাবী আলোয়ান জড়ানো লোকটা কে। তবে মনে হয় কখনো তার খুব কাছেই বসে ছিল। চেহারা দেখেনি দারা। তবে এর গায়ের খুশবুটা বড় পরিচিত।

৮.

খোজা লোকটার উচ্চতা দারার চেয়ে বেশি, প্রস্থে দ্বিগুণ। দারার ধারণা এর ওয়াতান আফ্রিকি মুলুকে। ওলন্দাজ, আর্মেনি বানিয়ারা তাদের মুলুকের নানা জিনিসের সঙ্গে নিয়ে আসে মানুষ। জাহাজ ভরে মানুষও আনা হয় বাণিজ্যের জন্য। কেউ সুস্থ-সবল, তাকে বিকিয়ে দেয়া হয় গতর খাটানোর জন্য। আবার কাউকে খোজা করে তার সওদা করা হয় কোঠিতে কিংবা আমিরদের কাছে। কখনো সরাসরি বাদশাহকেই নজরানা দেয়া হয়।

খোজাদের সঙ্গে থাকে সুন্দরী রমণী। মাসালা, গালিচা, চামড়ার বেওপারের পিছে এসব বেওপার চলে। কিছু চলে খুল্লাম-খুল্লা, কিছু চলে আঁধারে। দারার কখনো কখনো মনে হয় খোজা, দাসী, বাইজি এসব ইনসানের জরুরত। এ জরুরত বাদ দিয়ে ইনসান জিন্দা থাকতে পারলেও খুশ থাকতে পারে না। কিন্তু একজনের খুশির জন্য একজনের জিন্দেগি বরবাদ করার এখতিয়ার কি কারো আছে?

দারা জওয়াব খুঁজে পান না। কেবল হাঁটতে থাকেন। তিনি চলছেন বড় জটিল, কোহরা-ভরা পথে। ধর্ম আর দর্শন নিয়ে তার যে খোঁজ, সেখানে যেমন কোহরা, তেমনি দিল্লির এই আনজান গলিতেও সব অচেনা।

খোজাকে অনুসরণ করে দারা আর আসাদ চলতে থাকে অন্ধের মতো। অনেক সময় পার হওয়ার পর একটি সিঁড়ি বেয়ে তারা উঠল অনেকটা। দারা আন্দাজ করেন, তিসরি মঞ্জিলে আছেন। সেখানে বিশাল এক দরওয়াজা। ঠিক তিন টোকার পর দরওয়াজার পাল্লা আলগা হয়। বাহির যেমন অন্ধকার, ভেতর তেমনি রোশনাইয়ে ভরা।

খোজা সেখান থেকেই বিদায় হলো। দারার সঙ্গে আসাদকে পথ দেখিয়ে চলল এক রমণী। বয়সে প্রৌঢ়া। দুই কামরা পার হয়ে তৃতীয় কামরায় পৌঁছলে দারা তাজ্জব হলেন আরেকবার।

গভীর রাতে সে কামরা আলোকোজ্জ্বল। দেয়ালে ভারী পর্দা। মেঝেতে কিমতি গালিচা। কামরার চারদিকে অসংখ্য বাতিদানে জ্বলন্ত বাতি। ছাদ থেকে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি। দেয়ালের ওপরের দিকে ঘুলঘুরি এমনভাবে বসানো যে কামরায় গরম জমে থাকে না।

ঘরে বসে আছে নানা রকম মানুষ। দুজন মোগল মনসবদারকে দারা চিনলেন প্রথম নজরে। শরাবের প্রভাবে তারা মজলিস শুরু হওয়ার আগেই বুঁদ। দারাকে নজর করেনি। নজর করলেও নতুন বেশে শাহজাদাকে পেহচান করা সম্ভব ছিল না।

কামরার দক্ষিণ দিকে আসাদকে নিয়ে বসলেন দারা। তার উল্টো দিকে বসা দুজনকে দেখে আর্মেনি বলে মনে হয়। পশ্চিমে চারজন ফরাসি। তাদের সামনে নিজের দেশের শরাব। দারার পাশে কিছু জায়গা বাদ দিয়ে একজন বসেছে। শালে জড়ানো দেহ দেখে চেনা অসম্ভব সে কে!

সবার থেকে দূরে, কামরার পূর্ব দিকে বাঁয়া-তবলা, সারেঙ্গী নিয়ে অপেক্ষমাণ বাদক দল। যে নারী দারাদের পথ দেখিয়েছিল সে এবার দারার সামনে শরাবের পেয়ালা রেখে গেল। সে যেতেই আগমন হলো যার, তার দর্শনে দারারও নজর ঝলসে গেল।

মসলিনের পোশাকের নিচে তার দেহবল্লরী আবছা স্পষ্ট। সে দেহের নিপুণ বাঁকে বাঁকে কামনা আগুন জ্বালায়। সে নারী ঠিক নারী নয়, সদ্য কিশোরী। হিন্দুস্তানের নয়, অন্য কোনো মুলুকের। কোন মুলুক, দারা জানে না। তবে বুঝতে পারল শরীরের ছন্দে যেকোনো কামুক পুরুষের দিল টুকরো করতে পারে।

কিন্তু সে নাচল না। তমিজের সঙ্গে বসে সবাইকে সম্মান জানিয়ে শুরু করল একটি গান। ভাষাটি দারার অজানা।

একটি গানের রেশ রেখেই সে আবার আদাব আরজ করে অন্দরে অন্তর্হিত হলো। উপস্থিত কারো কোনো বিকার লক্ষ করলেন না দারা। কিছু যদি সে মানুষদের ভালো লেগে থাকে, তবে তা কিশোরীর শরীর। গান কিংবা সুরের আবেশ কিছুই তাদের স্পর্শ করেনি। এখানে গান শুনতে কেউ আনে না। কিন্তু দারা এতই মজে গিয়েছিলেন, নজর করেননি দুজন ইংরেজ কখন এসে শাল-ঢাকা আদমির পাশে বসে গেছে।

মেয়েটি চলে যেতেই নবাগত দুজন অন্দরের দিকে গমন করে। খানিক পরে বেরিয়ে আসে একজন বাইজি। পূর্ণযৌবনা। শরীরের অধিকাংশ অংশ অনাবৃত তার। বাজনাদারদের বাজনা শুরু করে শুরু হলো তার নাচ। সুরাশক্তদের 'বাহবা', 'মারহাবা'র মাঝে দারা নীরব রইলেন।

তখন সেই প্রথম প্রৌঢ়া এসে দারাকে বললেন, 'শরাব পসন্দ হলো না বারখুরদার? আংরেজ মুলুকের শরাব পেশ করি? নাকি অন্য কিছু আরজ করেন?'

ঘোরে পড়া মানুষের মতো দারা প্রশ্ন করলেন, 'আনজান জবানে গান গাওয়া ওই বাইজির সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই।'

'আজকে রাতের মতো ও বিকে গেছে হুজৌর', বলে চোখে কৌতুক করে সে নারী।

দারা তার জেব থেকে কতগুলো আশরফি বের করলে প্রৌঢ়ার চোখ চকচক করে। এমনিতে তারা মোহর পেয়ে থাকে কিন্তু বাদশাহি আশরফি তাদের জোটে না সহজে। তাই 'বাঁদি খেতমতে হাজির' বলে দারাকে অন্দরে আগমনের ইশারা করে।

শরাবে আসাদের রুচি নেই। কিন্তু শরাব আসাদকে কাবুও করতে পারে না। তাই কয়েক পাত্র শরাব পানের পরও আসাদের মাথা ঠিকঠাক কাজ করতে থাকে। আসাদের তীক্ষ্ণ নজর তাকে বলে অন্দর-বাহির করা ওই অংরেজ আদমিদের কোনো মনসুবা আছে। এখানে তারা বাইজির নাচ দেখতে বা শরাব পান করতে আসেনি। অনেকটা তাদেরই মতো। সে আর শাহজাদাও আসেননি শরাব বা গানের জন্য।

রাত আরো বাড়লে আসাদ দেখল, দুই মোগল মনসবদার বাইজির হাত ধরে অন্দরে গেল। ফিরে যখন এল তখন তাদের সঙ্গে ইংরেজদের একজন। দ্বিতীয় মনসবদারের পা যেন টলে না যায় সেদিকে ইংরেজের সদয় মনোযোগ।

শাহজাদা না জানি কী করছেন, দুশ্চিন্তা হয় আসাদের। কিন্তু শাহজাদা দারা শুকোহর সঙ্গী হয়ে আসাদ জেনেছে, শাহজাদা কিশোরীর লোভে অন্দরে যাননি। তিনি অন্দরে গিয়েছেন অজানা অচেনা এক ভাষা আর সুরের নেশায়।

দারা যখন ফিরে এলেন সূর্যোদয়ে তখনো অনেক বাকি। আসাদের তন্দ্রা এসেছিল। শাহজাদার হাতের স্পর্শে তন্দ্রা ভেঙে গেলে আসাদ উঠে দাঁড়ায়। শাহজাদা ইশারায় বোঝান এবার তাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রৌঢ়া নারী দরওয়াজা খুলে দিলে সেখানে এক নতুন খোজাকে দেখলেন দারা।

কিন্তু যেমন নির্বিবাদে এসেছিলেন, ফেরাটা তেমন হলো না। খোজার সঙ্গে চলতে চলতে কয়েক বাঁক পার হতেই তিনজন মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। আর ঝাঁপ দিতে না দিতেই খোজা অদৃশ্য। আলো আঁধারিতে আক্রান্ত আসাদ বুঝতে পারে দুশমন শরীরের শক্তিতে তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কিন্তু আসাদও মোগল ফৌজে শিক্ষা নেয়া সেপাই।

দারাকে একজন জাপটে ধরেছে পেছন থেকে। বুকের ওপর শক্ত বাঁধনে দারার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। শরাবের প্রভাবে কিছু অন্যমনস্ক শাহজাদাকে সহজে কাবু করে ফেলেছে দুশমন। আসাদের সঙ্গে অন্যদের হুটোপুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দারার মনে পড়ে একবার এক হিন্দু সাধু তাকে শ্বাস নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে শিক্ষার কথা স্মরণ করে দারা নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে তার মন, চিন্তাও তার নিয়ন্ত্রণে আসে। মনে পড়ে কোমরবন্ধে একটা খঞ্জর লুকানো আছে। মুহূর্তে সে খঞ্জর বিঁধে যায় তস্করের কোমরে।

অন্ধকারেই আসাদের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করেন দারা। কান ফাটানো শব্দে তখন বিস্ফোরিত হয় কিছু। মাস্কেট থেকে গুলি ছুটলে এমন আওয়াজ হয় এ কথা দারা এবং আসাদ কারো অজানা ছিল না। সম্ভবত অজানা ছিল না তাদের আক্রমণকারীদেরও। মুক্ত আসাদ ধপ করে বসে পড়ে রাস্তার ওপর।

আকাশে হালকা আলোর ছোপ লাগতে শুরু করেছে। দিল্লির পথে তখন তিনজনকে একসঙ্গে হাঁটতে দেখা যায়। তাদের একজন দারা, একজন আসাদ, অন্যজনের চেহারা এবং পোশাক দেখে তাকে ফরাসি বলে সন্দেহ হয়। দারা তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করেন, উমর কমই হবে। হয়তো আঠারো সাল। লেকিন বাহাদুরি আছে।

সকালটা ভালোই লাগছিল দারার। নৈঃশব্দ্যের মাঝে পথ চলতে চলতে আলোকিত দিল্লির রূপ উপভোগ করছিলেন তিনি। কিন্তু নীরবতা ভাঙে আসাদ, 'হুজুর, আপনার কী শক, আমাদের পেহচান ওরা শনাক্ত করেছে?'

বিদেশীর সামনে তাকে 'শাহজাদা' না বলে গোপনীয়তা রক্ষায় আসাদের প্রতি দারা খুশি হলেন। বললেন, 'এখনো নিশ্চিত করে বলা মুমকিন না। কিন্তু শক তো করেছেই।'

'বাইজির সঙ্গে না শুয়ে তার মুলুকের কিসসা শুনতে চাইলে শক তো করবেই', ভাঙা উর্দুতে বলল বিদেশী।

আসাদ খানিকটা বিরক্ত আর অনেকটা রাগ করেছে এ কথা দারা সহজেই বুঝতে পারেন। শাহজাদার সঙ্গে এ রকম কথা বলার এখতিয়ার তো কারো নেই। আসাদের রাগ দেখে দারা মুচকি হাসলেন কেবল। কোনো কথা বললেন না। কিন্তু আসাদ থাকতে পারল না। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কী করে জানলে?'

'জানলাম বলেই তো মদত করতে পারলাম', বিদেশীও ঘুরিয়ে জওয়াব দিল। সহজ মানুষ সে না। হয়তো অনেকদিন পথে ভ্রমণ করেছে বলেই তার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই সঙ্গে মুখ হয়েছে এমন।

এদিকে দুশ্চিন্তায় আসাদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। সে আবার বলল, 'কিন্তু হুজুর, এক বাত সমঝে আসছে না।'

'কী?' দারা জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার চেয়ে আমি দুবলা পাতলা ইনসান। ফির ভি আপনাকে একজন পাকড়ে রাখল আর আমাকে দুই আদমি। কেন?'

'অন্ধকারে সমঝতে পারেনি', বলে দারা আবার মুচকি হেসে বিদেশীর দিকে চেয়ে বললেন, 'সহি বললাম?'

বিদেশী দারার দিকে না তাকিয়ে আসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জবরজং লেবাস পরে যারা কোঠিতে আসে, তাদের কাছে খঞ্জর থাকে না। যদিও থাকে, তা থাকে আমিরের চ্যালার কাছে। তাই তোমাকে দুজন জাপটে ধরেছিল।'

বিদেশীর জওয়াব শুনে আসাদ বোকা বনে যায়। দারা হাসতে হাসতে 'বহুত খুব' বলে বিদেশীকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার নাম?'

'অধমের নাম নিকোলা মানুচি, শাহজাদা', বলতে বলতে সামনে চলে এসেছিল লোকটা। এরপর শাহজাদা সম্বোধন করেই কুর্নিশ করে বসল সে।

৯.

মোগল পুরুষদের—বিশেষত বাদশাহ, শাহজাদা—হাতে অফুরন্ত সময় থাকে না। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা, তারপর ঘোড়সওয়ারী, তলোয়ারবাজি, জঙ শিখতে হয়। দাড়ি-গোঁফ উঠতে না উঠতে একটা মনসব দিয়ে দেয়া হয়। উমর আরো বাড়লেই জায়গিরদার, সুবাদার। তাই অবসর বিনোদন হয় শরাব, ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে ইয়ারি আলাপ। বিবি, বাঁদি তো থাকেই।

দারার মন সেখানে কিছু আলাগ। পড়াশোনা করা, ইলমের খোঁজ তার নেশা। সে নেশা পূরণ করতে কখনো দৌড়ে যান সালতানাতের এক সীমা থেকে আরেক সীমায়। বাতচিত করেন নানা ধর্ম, নানা দর্শনের মানুষের সঙ্গে। সেই কারণে কখনো আবার প্রয়োজনীয় কাজও বাকি থেকে যায়।

মানুচির সঙ্গে পেহচান হলেও তাই বাতচিত আর বাড়েনি। সেই ঘটনার দুই রোজ পরই দারা রওয়ানা হয়েছিলেন লাহোরের পথে। সরমাদ শহীদের সঙ্গে তার মোলাকাত করতে হবে। জাহানারা একবার নিষেধ করেছিলেন কিন্তু দারা সে কথা শোনেননি। কিন্তু জাহানও এখন জানেন সরমাদের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে দারা সেখানে যেতেন না।

সরমাদের সঙ্গে দারার কী বাতচিত হয়েছিল তা দারা কাউকে বলেন না। দারা মনে করেন সে নিগূঢ় কথার সমঝদার তেমন নেই। জাহানারার সঙ্গে বলা যায়। বলতে চেয়েছিলেনও। কিন্তু আব্বাজানের তবিয়ত বিগড়ে যাওয়ার পর জাহান সিয়াসতি ফয়সালা নিয়ে সময় পার করে। তাই নাদিরার সঙ্গেই আলাপে চলে গেলেন দারা।

'আপনার মুরশেদের সঙ্গে বাতচিত করে দিল খুশ হলো?' নাদিরা জিজ্ঞেস করেন।

'মুরশেদ না, নাদিরা। সরমাদ আমার দোস্ত', দারা জওয়াব দেন।

তশতরী থেকে একটা মিষ্টি তুলে নিজের হাতে দারার ঠোঁটের কাছে এগিয়ে দিলে মিষ্টি সরিয়ে দিয়ে দারা নাদিরার ঠোঁটে চুমু দিলেন।

'কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার দোস্তকে নিয়ে অনেক মোগল আমির, মোল্লা কথা বলতে শুরু করেছেন?' প্রশ্ন করলেন নাদিরা।

দারা বিষয়টা জানেন না এমনটা মনে হয় না নাদিরার। আবার না-ও জানতে পারেন। তিনি অনেক কিছুরই খোঁজ রাখেন না।

একটা আলগা ভাব করেই দারা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা?'

নাদিরা কিছুটা ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, 'সে নাঙা থাকে। বেশরা বাত বলে।'

দারা কিছুটা হাসেন। তারপর সরাসরি তাকালেন নাদিরার দিকে। বললেন, 'আমাদের যা পছন্দ হয় না, বিবি, সবই আমাদের কাছে বেশরা। আর পছন্দ হলে তা শরিয়তে না থাকলেও শরিয়তি।'

নাদিরা কিছু বলেন না। বিশ সাল হয়ে গেল দারার সঙ্গে শাদি হয়েছে তার। দারাকে তিনি ভালো করেই জানেন। সোজাসুজি কথা বলেন দারা। কিন্তু মাঝে মাঝে সমঝতে পারেন না স্বামীকে। কেননা নিজের মাঝে অনেক কথা ঘোরে দারার। সে কথা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। আবার যখন করেন, সে কথা এতই গভীর হয় যে কেউ সহজে বুঝতে পারে না। জাহানারা কখনো কখনো ভাইয়ের দিকে দুর্বোধ্য নজরে তাকিয়ে থাকেন, নাদিরা দেখেছে সে দৃষ্টিতে মিশে থাকে মমতা, বেদনা, ক্রোধ আর অসহায়তা।

মানুচির সঙ্গে সেই পহেলা পেহচান হওয়ার পর তিন হফতা পার হয়ে গেছে। ফের মোলাকাতের সুযোগ হয়নি। দারার কয়েকবার মনে হয়েছে লোকটাকে ডাকা প্রয়োজন। অবশেষে মানুচিকে এত্তেলা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

মানুচি এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ালে দারা কথা শুরু করেন।

'তুমি হেকিম?' মানুচিকে জিজ্ঞেস করেন দারা। এর মধ্যে তিনি মানুচি সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজখবর করেছেন।

মানুচি মাথা নাড়াল। বলল, 'জি না শাহজাদা। আমি হেকিম না। হেকিম হওয়ার হেকমত নেই। কিন্তু পথে যখন বেরিয়েছি, বহত কুছ শিখতে হয়েছে। হেকিমি যেমন জানি, গোলন্দাজের কাজও জানি।'

দারা হেসে বললেন, 'তুমি তো তাহলে এলেমদার ইনসান আছো। আমাকে চিনলে কেমন করে?'

মানুচি কোনো কথা বলে না। দারা এবার একটু রুক্ষ স্বরে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। শাহজাদার কর্তৃত্বপূর্ণ স্বর শুনে মানুচির মনে হলো তিনি মোগল শাহজাদার সামনে আছেন। বাজারের কোনো ছদ্মবেশীর না। তাই তিনি বললেন, 'শাহজাদা, গোস্তাকি মাফ। লেকিন আমরা বহু রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। বেওপার বলেন কী জরুরত—মানুষ চিনতে হয়। আপনাকে ঘোড়ায় দেখেছি তিনবার। চেহরা ইয়াদ হয়ে গেছে। আর মীর বহরের খুনের ত্যেহকিকাত আপনি করছেন তা-ও জানতাম।'

দারা সেদিকে গেলেন না। বরং বললেন, 'শুনলাম তুমি নওকরির তালাশ করছ?'

মানুচি ইতিবাচক মাথা নাড়ে। তা শুনে দারা বললেন, 'তোমার নওকরির ইন্তেজাম হয়ে যাবে। পয়লা আমাকে বলো মালেকা জানের কোঠি সম্পর্কে কী কী জানো?'

ওয়ালী আগেই দারাকে জানিয়ে রেখেছিল, দারার গোপন ভ্রমণের পর সেই সকালে মালেকা জানের কোঠিতে আচানক হামলা করেছিল তার ফৌজ। মালেকা জান ফারার, কিন্তু তার মদত করার লোকদের কয়েদ করা হয়েছে। পাওয়া গেছে বেহিসাব আশরফি, আফিম আর বিদেশী শরাব।

'শাহজাদা', মানুচি শুরু করল, 'কোঠা মানে শরীরের ব্যবসা। কিন্তু মালেকা জানের এখানে মুজরা, আর শরীর বিক্রির পাশে চলে আফিম আর শরাবের কারবার। এই কারবারের আসলি লোক আংরেজ মুলুকের। হিন্দুস্তানের বহুত জায়গায় গোপনে আফিম চাষ করে বিক্রির বন্দোবস্ত করে।'

'সেখানে মোগল আমিরদের আনা যানা হয়?' দারা চোখ সরু করে প্রশ্ন করলেন।

মানুচি একটু চিন্তা করল। বলল, 'শাহজাদা, আমি দিল্লি এসেছি এক সাল হয়েছে। সব মোগল আমিরকে আমি পেহচান করি না। কিন্তু লেবাস দেখে মনে হয় তারা মোগল আমির হতে পারেন।'

মানুচির কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না দারার। কেননা মানুচি কেবল তিনদিন তাকে দেখে তার চেহারা মুখস্থ করেছে। এই লোকের পক্ষে অনেক কিছুই জানা সম্ভব। দারা সরাসরি তাকালেন মানুচির দিকে।

'যে আংরেজ ওই কোঠির আসলি মালিক, তুমি তাকে পেহচানো? ওর নাম কি টমাস?' দারা হুট করেই এ প্রশ্ন করলেন।

মানুচি অবাক হলো। কিছু একটা বলবে কিন্তু কী বলবে তা ঠিক করার আগেই, 'হ্যাঁ, লেকিন...' বলে কথা শেষ করতে পারল না।

মাঝেই দারা বলে উঠলেন, 'নিঁদের মধ্যে "টমটম" বলে যে কথা শরফউদ্দীন বলেছে বলে শঙ্করের মনে হয়েছিল, তা আসলে টমাস। তিন সাল আগে সুরাটে এসেছিল। এক সাল থেকে মোগল দরবারে জায়গা পাওয়ার কোশিশে লেগে ছিল।'

দারা এবার প্রশ্ন করলেন, 'মানুচি, তুমি কখনো টমাসকে দেখেছ ওই কোঠিতে?'

মানুচি নিশ্চিত হয় দারা এর মধ্যে অনেক কিছু জেনে গেছেন। তাই সে কোনো রকম লুকোচুরি না করে বলল, 'জি শাহজাদা।'

'তার সঙ্গে কি এমন এক লোক ছিল যার বদন থেকে আজিব কোনো খুশবু আসে?' দারার প্রশ্ন শুনে ওয়ালী আবার অবাক হলো। কেননা এর আগেও খুশবুর প্রশ্ন করেছিলেন দারা।

মানুচি বলল, 'জি শাহজাদা। বড় আজিব খুশবুদার এক আদমির সঙ্গে আচানক টমাসকে পরপর দো রোজ দেখেছিলাম।'

আসাদের কাছ থেকে এক টুকরো কাপড় চেয়ে নিয়ে তা মানুচির হাতে দেন দারা।

মানুচি সে কাপড় শুঁকে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে।

ওয়ালীর স্পষ্ট মনে পড়ে এই কাপড় পাওয়া গিয়েছিল মীর বহরের তৃতীয় বিবির কামরা থেকে। তিনি জানিয়েছিলেন, মওতের তিন রোজ আগেও একদিন এই লেবাস পরে শরফউদ্দীন রাতে মহল থেকে বেরিয়েছিলেন।

লালকেল্লার বারান্দা ধরে হাঁটতে দারার ভালো লাগতে থাকে। তার পাশে মানুচি। পেছনে একদিকে ওয়ালী, একদিকে আসাদ। দারা নজর করে বুঝেছেন ওয়ালী কোন কারণে নাখোশ। হয়তো মানুচিকে এতখানি অন্দরে আনা তার পছন্দ হয়নি। দারা নিজেও জানেন তা। কিন্তু মানুচিকে তার পছন্দ হয়েছে। আর পছন্দ হয়েছে বলেই মানুচিকে নজদিক রাখছেন। এই তরুণের সফরের অভিজ্ঞতা অনেক, কিসসাও জরুর অনেক। তা শুনতে চান দারা। তবে এই ওয়াক্তে সাবেক মীর বহর শরফউদ্দীনের খুনের পুরো ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করছেন।

'ওয়ালী', পেছনে তাকিয়ে দারা বলেন, 'জানতে বলেছিলাম শরফউদ্দীন তার মওতের আগের দিনগুলোতে হঠাৎ কখনো কোথাও চলে যেতেন কিনা। কোনো খবর?'

'না শাহজাদা', মাথা নাড়িয়ে ওয়ালী জানায়, 'বরাবরের মতো সবার একই কথা। তিনদিন তিনি নিজের কামরায় ছিলেন।'

দারা ধীরে চলতে চলতে বললেন, 'অর্থাৎ টমাস যখন মোগল দরবারে দাখিল হওয়ার মওকা লাভ করল না, তাব সে আমিরদের রিশওয়া (ঘুস) দিয়ে, তোহফা দিয়ে আপনা কাম শুরু করল। ফের যেভাবে হোক মালেকা জানের আস্তানার খবর পেয়ে সেটাকেই এই কারবারের জরিয়া (মাধ্যম) বানিয়ে নিল।'

'জি শাহজাদা', ওয়ালী বলল। যদিও সে স্পষ্ট বুঝল না কোন কারবারের কথা বলছেন দারা। কিন্তু ওয়ালীর মনে হলো আরেকটা খবর দেয়া প্রয়োজন। সে বলল, 'ওই ওয়াক্তেই মালেকা জানের আস্তানায় মীর বহর গিয়ে পড়েছিলেন। অথবা মীর বহরকেই সেখানে নিয়েছিল ওই আংরেজ।'

ওয়ালী নিজের মত প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তার ধারণা সে মীর বহরকে ঘুস দিয়ে বশ করার চেষ্টা করেছিল যেন সে সুপারিশ করে টমাসকে মোগল দরবারে নিয়ে আসে। সেখানে আসতে পারলে টমাস নিজের মতো নানা কাজ করতে পারবে। মোগল দরবারে বাদশাহকে খুশি করতে পারলে ইনামের অভাব হবে না।

দারা লক্ষ করছিলেন ওয়ালীর কথা শুনে মুচকি হাসছে মানুচি। কিন্তু মানুচি কিছু বলল না। বললেন না দারাও। বরং তিনি পরিবেশটাকে আরেকটু রহস্যে মোড়ান।

'মীর বহরের কাজ কী আসাদ?' হঠাৎ আসাদকে এ সওয়াল করায় আসাদের কথা হারিয়ে যায়।

কোনোমতে সে বলে, 'মোগল নৌবহরের অধিনায়ক তিনি। নৌযুদ্ধ পরিচালনা, পরিকল্পনা, নৌ সীমানা রক্ষা।'

দারা হাসলেন। বললেন, 'আর কোনো কাজ আছে তার?'

'জরুরত হলে ফৌজ, বাদশাহ, শাহজাদা বা মোগল পরিবারের নৌ-সফরের ইন্তেজাম আর তা দেখাশোনা করা', এবার বলল ওয়ালী।

'এমন একজনকে কেন পছন্দ হলো টমাসের? তার তো দরবারে কোনো সরাসরি প্রভাব নেই', আবার প্রশ্ন করলেন দারা।

এ সওয়ালের জবাবে মানুচি বলল, 'বহরের দেখভালের দায়িত্ব যখন যার, সে সহজেই আফিম, শরাব কিংবা দাস-দাসীদের সেখানে গোপনে নিতে পারে। মোগল বহরের সঙ্গে এরা গেলে কারো সন্দেহ হবে না। এছাড়া নৌবহরের সেনাপতির মাধ্যমে বাদশাহির মধ্যে তো বটেই, বাইরের দেশের সঙ্গেও চোরাচালান করা সহজ।'

'সহি বাত, মানুচি', দারা বললেন।

'টমাস আফিমের বেওপারী ছিল। বেওপার বাড়ানোর ইচ্ছা তার ছিল। আব্বাজান শরাব পান করেন লেকিন শরাবি নন। আমিও না। আওরঙ্গজেব তো নামাজি। আর দাসের কারবারেও আব্বাজান নফরত করেন। শরফের ইয়াকিন ছিল, টমাসের আর্জি মঞ্জুর হবে না। তাই দুজন এই মনসুবা (পরিকল্পনা) তৈয়ার করেছিল', ব্যাখ্যা করেন দারা।

দারা থেমে যেতে বাকি সবাই থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর দারা নিজেই বললেন, 'ওয়ালী, তিনদিন মীর বহর তার কামরায় ছিলেন, না?'

'জি, শাহজাদা', ওয়ালী জবাব দেয়।

'মীর বহরের বিস্তারের (বিছানা) নিচে, পর্দার পিছে দেয়ালে খোঁজ করো। আমার ইয়াকিন, ওই কামরার মধ্যেই কোথাও মোহর, আশরফি লুকিয়ে রেখেছে সে', দারা নিশ্চিত হয়ে বললেন।

'জি, শাহজাদা', বলে ওয়ালী যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই দারা আবার তাকে থামান।

'টমাসের গুজরাত থাকার কথা। আমি আব্বাজানকে বলে তার নামে গ্রেফতারি ফরমান জারি করার ব্যবস্থা করছি। আওরঙ্গজেবের...', দারার কথা শেষ না হতেই তিনি দেখলেন ওয়ালীর মুখে কালো ছায়া। তিনি বুঝতে না পেরে প্রশ্ন চোখে নিয়ে তাকালেন।

মুখ খুলল মানুচি। বলল, 'শাহজাদা, টমাস নিজেও খুন হয়েছে। চার রোজ আগে তার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?' একটাই প্রশ্ন করলেন দারা।

'বুরহানপুর-বেরারের সীমান্তে', ওয়ালী বেগ জওয়াব দেয়ার পর নৈঃশব্দ্য নেমে এল।

১০.

দারা শুকোহ আরেকবার শিখলেন সিয়াসতে সত্য সবসময় প্রকাশ্য নয়। আবার যা মিথ্যা, প্রয়োজনে তা প্রচার করাও অপরাধ নয়।

'দরবার-ই-আম' থেকে নকিব ঘোষণা করেছে, অতিরিক্ত শরাব পান এবং আফিম সেবনের কারণে ভূতপূর্ব মীর বহর শরফউদ্দীনের মওত হয়েছিল। মোগল সালতানাতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে তার তবিয়ত আগেই বিগড়ে গিয়েছিল কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠার কারণে তিনি নিজের অসুস্থতা গোপন করেছিলেন। তবুও তার আচানক মওতের কারণে মোগল বাদশাহ শাহজাহান, সালতানাতের 'ওয়ালী আহ্‌দ' শাহজাদা দারা শুকোহর হাতে এর ত্যেহকিকাতের (তদন্ত) জিম্মাদারি দেন।

তিন মাহিনা ভর মীর বহরের মওত বিষয়ে শাহজাদার ত্যেহকিকাতের পর মোগল দরবার এই ফয়সালায় পৌঁছেছে যে অতিরিক্ত মেহনতের পর শরাব এবং গলত দাওয়াই সেবনে দিলের বিমারির কারণে শরফউদ্দীনের মওত হয়েছে। শরফউদ্দীনের মওতে মোগল দরবার গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। নিঃসন্তান মীর বহরের পরিবারের জন্য মোগল দরবার থেকে ভাতার ইন্তেজাম করা হবে।

এ ঘোষণার পরপর মীর বহরের তিন বিবিকে মোগল হারেমের হেফাজতে নেয়া হয়েছে। তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্বাধীনতা হারিয়েছিলেন তারা কিন্তু কারো প্রতি যেন কোনো জুলুম না হয় সেদিকে নজর রাখার দায়িত্ব খোদ জাহানারা গ্রহণ করেছেন।

মীর বহরের নওকরদেরও মোগল মহলে কোনো না কোনো নওকরির বন্দোবস্ত হয়েছে। তারা যেন এই খুন সম্পর্কে বাইরে মুখ না খোলে সে ব্যাপারে তাদের হুঁশিয়ার করার দায়িত্ব নিয়েছিল ওয়ালী। অবশ্য তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া কেউ জানত না মীর বহর আসলেই খুন হয়েছিল।

এসব মিটে গেলেও মোগল আমিরদের সম্পর্কে যে গোপন খবর প্রকাশ হয়েছিল বাদশাহ ও তার পরিবারের নিকট তাতে অমাত্যদের হুঁশিয়ার করে দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সে কাজের জন্য 'দরবার-ই-খাস'-এ প্রধান প্রধান আমিরের এত্তেলা দেন বাদশাহ শাহজাহান।

সিপাহসালার 'মহাবত খাঁ', 'উজির-এ-আজম' সাদউল্লাহ্‌ খাঁ, ওয়ালী বেগ, মীর আতশ সলীম খাঁ, মীর বকশী রুস্তম বেগ, হেকিম আহসানউল্লাহ্‌, রামদয়ালসহ প্রায় বিশজন প্রধান মোগল অমাত্য উপস্থিত। উপস্থিত শাহজাদা দারা শুকোহ।

'হাজেরিন', বাদশাহ নিজেই কথা শুরু করলে আমিরগণ এই সভার গুরুত্ব অনুভব করতে পারেন।

'আপনারা দরবার-ই-আম থেকে করা ঘোষণা শুনেছেন। অনেকেই জানেন সেখানে ফাঁকি আছে। সত্য হলো মীর বহর খুন হয়েছে। সে খুনের ত্যেহকিকাত আসলেও শাহজাদা দারা পুরা করেছে। সালতানাতের স্বার্থে মুজরিম সম্পর্কে প্রকাশ করা হচ্ছে না। বাদশাহি হুকুম, আপনারাও গোপন কথা গোপন রাখবেন', বলে বাদশাহ বক্তব্য শেষ করেন।

এটুকু বলেই খাস দরবার বরখাস্ত করা যেত। উজির ও সিপাহসালারের তা-ই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দারা শুকোহ মনে করেছিলেন সত্যটা প্রধান আমিরদের সামনে প্রকাশ করা উচিত। আর এই প্রথম সাদউল্লাহ খাঁও তার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন।

দারা শুকোহ এবার সবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে বলতে শুরু করেন, 'মোহমতারাম, আপনারা এই বাদশাহির খুঁটি। সেই কারণেই আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার ইচ্ছা রাখি। কেননা এই ত্যেহকিকাত করতে গিয়ে আমি অনেক নতুন খবর জানতে পেরেছি। প্রতিটি বিষয় মোগল সাম্রাজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।'

কথার গুরুত্ব বোঝাতে থামলেন দারা। আবার শুরু করলেন, 'মোগল আমিরদের অনেকেই রিশওয়াত খোর—এ কথা বাদশাহর কাছে পৌঁছেছে অনেক আগেই। কিন্তু কোনো অমাত্য বেশরমভাবে তা করছেন, পার করেছেন হদ। এমনকি তারা বাদশাহির বিরুদ্ধে সাজিশ করেছেন। এ কথা জেনে বাদশাহ তাদের সাজা দেয়ার ফয়সালা করেছেন।'

শাহজাহান লক্ষ করলেন আমিরদের অনেকেই ঘামছেন। কেউ আবার একেবারেই নির্বিকার। দারাও লক্ষ করলেন তা। ফের বললেন, 'যারা মাত্রা ছাড়া দুর্নীতি-আসক্ত তারা অবশ্যই শাস্তি লাভ করবেন। যারা এখনো অপরাধে ডুবে যাননি, তাদের এক দফা মওকা দেয়া হবে। নিজ অপরাধ কবুল করে এবং অন্য অপরাধীদের শনাক্ত করতে সাহায্য করলে সাজার মাত্রা কম হবে। ইয়াদ রাখবেন, মুজরিমদের (অপরাধী) সম্পর্কে সব সাবুত দরবারের কাছে আছে।'

*

বাদশাহ শাহজাহান তার বিছানায় একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। শিয়রে জাহানারা। পিতার সাদা চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিলেন তিনি। বিছানার একদিকে বসেছেন দারা এবং অন্যদিকে আওরঙ্গজেব। দিল্লি এসেছেন তিনি।

দুজন খিদমতগার দাঁড়িয়ে আছে তফাতে। প্রহরীরা দরওয়াজায় সতর্ক।

শাহজাহান ক্লান্ত বোধ করলেও জাহানের খিদমতে আরাম বোধ করছেন। কিন্তু সামনে বসা দারা আর আওরঙ্গজেবের দিকে তাকিয়ে যে বৈপরীত্য তিনি লক্ষ করছেন তাতে কেন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। নানা কারণেই বিপরীত স্বভাবের এ দুই পুত্রকে পরস্পর থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি।

'দারা', সম্বোধন করেন বাদশাহ। দারা মুখ তুলে চাইলে বলেন, 'বেটা, আমি জানি তুমি চাও সাচ সব ওয়াক্ত সামনে আসুক। লেকিন হর ওয়াক্ত তা মুমকিন হয় না। সিয়াসতের জন্য বহুত কিছু করতে হয়।'

দারা তবু নিশ্চুপ দেখে শাহজাহান আবার বললেন, 'লেকিন দারা, তুমি ইয়াকিন করো, মুজরিমের সাজার বন্দোবস্ত আমি করব।'

'জি আব্বাজান। আপনি ন্যায়বিচার করবেন, আমি ইয়াকিন করি', থেমে দারা আবার বললেন, 'লেকিন মুজরিম কে?'

'কেন? জামশেদ!' জওয়াব দিলেন জাহানারা।

'না, জামশেদ নয়', বলে দুজনের দিকেই নজর ঘোরালেন দারা। দেখলেন শাহজাহানের চুলের মাঝে জাহানের হাত নিশ্চল। বাদশাহ তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে আছেন আর সামান্য কেঁপে উঠেছে আওরঙ্গজেবের হাত।

সামলে নিয়ে জাহানারা জিজ্ঞেস বললেন, 'কিন্তু জেবের খত? জামশেদের এই ওয়াক্তে দিল্লিতে মওজুদগি (উপস্থিতি)? সব সবুত তো জামশেদের দিকে ইশারা করে।'

বাদশাহর দৃষ্টি আওরঙ্গজেবের দিকে। জাহানারা একবার আওরঙ্গজেবকে দেখছেন, একবার দারাকে।

দারা শুকোহ উঠে দাঁড়ালেন। কামরাময় পায়চারি করতে করতে দাঁড়ালেন এক জায়গায়। পিতা এবং ভাই-বোনের দিকে পেছন ফিরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আওরঙ্গজেব জামশেদকে দিল্লি পাঠিয়েছিল দুটো কারণে। পয়লা, আমাকে হুঁশিয়ার করা। আর...', দারা শেষ করলেন না।

'আর?' নিশ্বাস রুদ্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন জাহানারা। আওরঙ্গজেব নিশ্চুপ।

সামান্য হেসে দারা বললেন, 'জামশেদের এক বেটা পয়দা হয়েছে তিন মাহিনা আগে। বেটা পয়দা হওয়ার তিন রোজ আগে দিল্লি পৌঁছে জামশেদ। আমার ইয়াকিন, জামশেদ যেমন কর্তব্যে কঠোর তেমনই

তার আছে একটা নরম দিল। বেটার মুখ দেখার জন্য সে দিল্লি আসার ইজাজত চেয়েছিল। এই কারণেই তাকে পাঠানো হয়।'

কিছুক্ষণ আগে আওরঙ্গজেবের ফর্সা মুখে যে অতিরিক্ত রক্ত জমা হয়েছিল তা সরে গিয়ে স্বাভাবিক রঙ ফিরে এসেছে। দারা দেখলেন সামান্য হাসির আভাসও এসে মুছে গেল।

দারা আবার বললেন, 'দিল্লির পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর আমার আদাতের (অভ্যাসের) কথা আপনারা জানেন। সিয়াসতে আমার সমঝ কম, লেকিন সাধারণ লোকের খবর আমি পাই। জামশেদের খবর জানতে অবশ্য আমার থোড়া দেরি হয়েছিল।'

দারা থামলে শাহজাহান আওরঙ্গজেবের দিকে তাকালেন। সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন তিনি।

এবার মুখ খুললেন জাহানারা। বললেন, 'জামশেদের জিম্মাদারি কী ছিল? কেবল খত পৌঁছে দারাকে হুঁশিয়ার করা?'

আওরঙ্গজেব কোনো জওয়াব দেয়ার আগেই শাহজাহান বললেন, 'জামশেদ তার জিম্মাদারি পালন করেছে। তাকে উপযুক্ত ইনাম দেয়া হবে। এখন তোমরা আসতে পারো।'

হঠাৎ করেই মাঝপথে মজলিশ ভেঙে দিলেন বাদশাহ। যেন তার মনে হয়েছিল প্রসঙ্গ আর বাড়তে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিংবা তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন অনেক বেশি। কিংবা এটা তার ক্ষমতা দেখানোর ধরন। বাদশাহরা এ রকমই হন।

জাহানারার সঙ্গে তার নজর বিনিময় হলো। পিতা-পুত্রীর বিশ্বাস, মীর বহর শরফউদ্দীনের খুন জামশেদের হাতেই হয়েছে। আর যেহেতু তার উদ্দেশ্য ছিল মোগল সালতানাতের পক্ষে, তাই দারা নিজের মতো করে তাকে খুনের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। আওরঙ্গজেবকেও সেখানে নিশ্চুপ থাকতে হয়েছে।

দারাও সিয়াসত তরিকা শিখে যাচ্ছে, ভেবে খুশি হলেন বাদশাহ শাহজাহান।

*

সে সন্ধ্যায় মুসম্মন বুরুজে পাশাপাশি দণ্ডায়মান দুই ভাই—দারা শুকোহ ও আওরঙ্গজেব।

'আপনার জাসুসদের আরো দ্রুত কাজ করার শিক্ষা দেয়া উচিত', বললেন আওরঙ্গজেব।

'জানি', স্বীকার করে দারা বললেন, 'নইলে বাদশাহির অবস্থা খারাপ করে দেবে এরা। দিল্লির চোরা গলি থেকে শুরু করে প্রতি সুবায় যে বিদেশী বানিয়াদের সাজিশ চলছে, তার ইশারা পেলেও আসলি হালত এত খারাপ তা এই দুই মাহিনায় সাফ হয়েছে।'

'হু', বলে নিশ্চুপ রইলেন আওরঙ্গজেব। ধারণা করা যায়, তার মনে অনেক কথা কিন্তু বলতে ইচ্ছা করেন না।

সামান্য হেসে দারা বললেন, 'আর তুমি যা জানতে আমারও আগে। এ তোমার কামিয়াবি। তোমার কাছ থকে আমার আসলেই অনেক কিছু শেখার আছে।'

আওরঙ্গজেব সে কথারও জওয়াব না দিয়ে বললেন, 'জামশেদকে বাঁচানোর জন্য শুকরিয়া।'

দারা এবার ভাবলেশহীন মুখে বললেন, 'কোনো মাসুমের সাজা হোক, আমি চাই না।'

'মাসুম নয়, আবার মুজরিমও নয়', বলে থামলেন আওরঙ্গজেব। আবার বললেন, 'আমার হুকুমেই শরফউদ্দীনকে খুন করেছিল সে।'

'কেন?' প্রশ্ন করতে একটা শব্দই যথেষ্ট।

আওরঙ্গজেব কঠিন মুখে দারার চোখে তাকিয়ে বললেন, 'অনেক রাজ (গোপন) খুঁজে বের করেছেন, লেকিন আসলি রাজ আপনি ভাঙতে পারেননি।'

দু পাতা কাগজ বের করে দারার হাতে দিলেন আওরঙ্গজেব। ইংরেজিতে লেখা একটি খত, সঙ্গে তার ফার্সি অনুবাদ।

সুরাট বন্দর থেকে টমাস তার এক বন্ধুকে লিখেছে। এলাহাবাদে থাকা তার বন্ধু উইলিয়ামকে একবার দারা বের করে দিয়েছিলেন মোগল দরবার থেকে। টমাস লিখেছে, বিহারে তাকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে সে বাংলা অঞ্চলে ব্যবসা বাড়ানোর চেষ্টা করবে। মোগল সালতানাতের মীর বহরের সঙ্গে সে কারবার করছে। তাই কিছু সুবিধা তার হবে। আর উইলিয়ামের দেয়া সুবিধার বদলে সে উইলিয়ামের অপমানকারী 'দারা সেকো'কে হত্যার ব্যবস্থা করবে।

'এই খত মীর বহরের হাতে পড়েছিল। হারামখোর তখন খত ইস্তেমাল (ব্যবহার) করে টমাসকে ডর দেখিয়ে আরো রিশওয়াত নিতে শুরু করে', ব্যাখ্যা করলেন আওরঙ্গজেব।

দারা দেখলেন ইংরেজিতে লেখা খতে একটি ছিদ্র। টমাস নিজের মতো করে Dara Cikoh লিখেছে চিঠিতে, আর এক জায়গায় Dara –koh লেখা। দারার মনে পড়ে মীর বহরের তাকিয়ার পাশে পাওয়া কাগজের টুকরোয় লেখা Ci.

'জামশেদ এই খত হাসিল করে আমাকে পাঠিয়েছিল', এবারো কথা বলেন আওরঙ্গজেব।

দারা মুখ খুলতে গেলে আওরঙ্গজেব এবার আপনি থেকে তুমিতে এসে বললেন, 'তোমার জিন্দেগি বাঁচানোর জন্য শুকরিয়া আদা করার জরুরত নেই। তোমাকে খুনের সাজিশে টমাস কামিয়াব হতো না।'

দারা হাসলেন। সে হাসিতে ছোট ভাইয়ের জন্য স্নেহ ঝরে পড়ছিল। কিন্তু তিনি সত্যিই শুকরিয়া আদা করলেন না।

শুধু বললেন, 'জামশেদ তোমাকে খোদ জানিয়েছে, সে খুন করেছে?'

'না', আওরঙ্গজেব বললেন, 'তার সঙ্গে মোলাকাত হয়নি। সে খত পাঠিয়েছিল।'

এক পাক ঘুরে এসে দারা বললেন, 'আমার ইয়াকিন, জামশেদ খুন করতে পারেনি। হয় সে মীর বহরের খুনের আগে কামরায় পৌঁছে খত হাসিল করেছিল। অথবা সে যখন কামরায় প্রবেশ করে, তখন মীর বহর মৃত। মোলাকাত হলে জেনে নিয়ো।'

আওরঙ্গজেব জঙ জানেন। অর্থনীতিও খানিকটা বোঝেন। দারার মতো বহু মানুষ না দেখলেও তিনি মানুষের মুখের ভাব থেকে অনেক কিছু বোঝেন। দারার মুখ দেখেও এবার বুঝলেন কিছু জিনিস তিনিও বুঝতে বা জানতে ভুল করেছেন।

'আপনি কী করে এ কথা বলতে পারেন?' আওরঙ্গজেব অবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

দারা রহস্যময় হেসে জওয়াব দিলেন, 'জেব, তুমি জঙ-এ সমঝদার, সিয়াসতের সমঝদার। লেকিন ইনসানের মনে আর দিল্লির গলিতে অনেক রহস্য আছে, যা চোখ বুজে দিলের আয়নায় দেখতে হয়।'

*

শঙ্করকে মোগল ফৌজে রাখা হয়েছে। মীর বহরের নওকরদের আলাদা আলাদা কাজে বহাল করার বেলায় শঙ্করের জন্য এই ব্যবস্থাই ঠিক মনে হয়েছিল।

ওয়ালীকে সঙ্গে নিয়ে এক সন্ধ্যায় দিল্লির সেই পুরনো কাবাবের দোকানে পৌঁছেছিলেন দারা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শঙ্করকে নিয়ে পৌঁছল আসাদ।

তাজা রুটি আর কাবাবের সুবাসের সঙ্গে শঙ্করের হাসি মিশে গেছে। দারার ভালো লাগে। খেতে খেতে দারা জিজ্ঞেস করেন, 'ফৌজের কাজ পছন্দ হলো?'

শঙ্কর না সূচক মাথা নেড়ে বলে, 'কুঁচ করো আর কুঁচ করো। বাকি ওয়াক্ত হারামিদের খেদমত করো।'

দারার সহজ ব্যবহারে শঙ্কর ভুলেই গেছে সে শাহজাদার সামনে বসে আছে। শাহজাদার মুখে প্রশ্রয়ের হাসি দেখে ওয়ালী কিংবা আসাদ চুপ থাকে।

হঠাৎই দারা বলে ওঠেন, 'মনিবের গলায় খঞ্জর চালানোর আগে কাভি খঞ্জর হাতে ধরোনি? নাকি ডর পেয়েছিলে?'

শঙ্করের হাত থেমে গেল। মুখ থেকে সরে গেল রঙ।

যেন বহু যুগের নৈঃশব্দ্যের পর শঙ্কর মুখ খুলল, 'আমরা কিষাণ ছিলাম হুজুর। ফসল কাটার কাঁচি চালাতে পারি। খঞ্জর চালানোর আদাত নেই।'

দারা কিছু বললেন না। ওয়ালী আর আসাদ পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে বোবার মতো। তবে তারা বুঝল কেন দারা বারবার বলেছেন জামশেদ এ কাজ করেনি। কিন্তু চমক তখনো ছিল বাকি।

'খঞ্জর ছিল, না রসুইয়ের কোনো হাতিয়ার?' দারা ফের প্রশ্ন করলেন।

শঙ্কর কেবল মাথা নাড়ল। কোনো কথা বলল না। দারাও বললেন না। সময় দিলেন ছেলেটাকে।

কিছুক্ষণ পর শঙ্কর বলল, 'ইনসান যদি শয়তান হয়ে যায় তাহলে কী করব হুজুর?'

এবারো কথা বললেন না দারা। কেবল বললেন, 'লালচ (লোভ) বড় খতরনাক চিজ। ইনসানকে শয়তান বানায়।'

দারা দেখতে পান শঙ্করের মুখ শুকিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমার কি গর্দান যাবে? না হাতির পায়ের তলে দেবেন?'

'কেন?' দারা যেন বুঝতেই পারেন না। তিনি বটি কাবাব থেকে একটু ভেঙে মুখে দিলেন। হাত রাখলেন রুটিতে।

শঙ্করের অবাক দৃষ্টি দেখে দারা বললেন, 'কাভি কাভি ইনসান তার হালতের কারণে জুরম করতে বাধ্য হয়। তাদের জুরম তাই হয়তো জুরম না। আর কোনো ইনসান জুরম করে লোভ থেকে। অন্যের ক্ষতি করতেও তারা পরোয়া করে না। শরফউদ্দীনের ইনসানিয়াত তো ছিল না। নিজের মুনাফা দেখেছে কেবল। সাজিশ করেছে বাদশাহি নিয়েও। আর তার কতদিন গোপন থাকত? তার জুরমের জন্য মওতের সাজা সে মোগল দরবার থেকেই লাভ করত।'

শঙ্কর চুপ করে বসে থাকলে দারা আবার বললেন, 'ফৌজের কাজ পছন্দ না হলে বলো। আমি তোমার গ্রামে ফেরার বন্দোবস্ত করি।'

শঙ্করের চোখ থেকে দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

১১.

'শঙ্কর?' তাজ্জব হয়ে সওয়াল করল রাণাদিল।

দারা হাসলেন।

রাজপুত বেশে সেজে 'দারা-দিল' ঘুরছে দিল্লির পথে। বাজিকরদের খেলার আসর বসেছে চাঁদনি চকে। এক প্রান্তে সাপের খেলা। এগিয়ে গেলে দড়াবাজি। একদিকে জাদু দেখিয়ে চলেছে জাদুকর। নাচের আসরও আছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখছে দুজনে।

দারা জানে আসাদ ও তার লস্কর ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে তাদের। সঙ্গে মানুচিও আছে। যদিও গোলন্দাজ বাহিনীতে চাকরি হয়েছে তার, তবু দারার কাছে থাকতে চায় সে। আসাদের সঙ্গেও ভালো দোস্তি হয়েছে তার। দারা পথে নামলে তারা সবাই মিশে থাকে মানুষের মাঝে। নিশ্চিন্তে পথ চলতে পারেন শাহজাদা। আজ পথ চলতে চলতে মীর বহরের খুনের রহস্য ভেঙে রাণাদিলকে বলছিলেন দারা।

'আপনি কি শুরুয়াত থেকেই জানতেন?' প্রশ্ন করল রাণাদিল।

'না', এক কথাতেই স্বীকার করে দারা বললেন, 'একবার শক হয়েছিল, লেকিন আমার মনে হয়েছিল এই খুন ওই আংরেজের কাজ। সে নিজে না করলেও কাউকে দিয়ে করিয়েছে।'

'শক হলো কেন?' বাজিকরদের ছাড়িয়ে চুড়ির দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। রাণাদিল লাল রঙের চুড়ি হাতে নিল।

দারা চোখে হেসে বললেন, 'মীর বহরের কামরায় ভিনদেশী শরাব দেখে। হ্যাঁ, তা থাকতেই পারে। কিন্তু শরফউদ্দীনের তাকিয়ায় ওই আংরেজি কাগজ আর বেশি শক হয়েছিল খুশবুতে।'

'খুশবু?' হাত গলিয়ে চুড়ি ঢোকাতে চেষ্টা করে রাণা।

দারা তাকে সাহায্য করতে করতে বললেন, 'হ্যাঁ। এমন এক খুশবু যা আমরা কেউ ইস্তেমাল করি না। আর মোগল দরবারে তো আকসার আংরেজ, ফরাসি আসে। কখনো তাদের কারো গায়ে ওই খুশবু পেয়েছিলাম।'

'খুশবু থেকেই রাহ মিলে গেল', রাণাদিল বলল।

চুড়ি পরানো হয়ে গেছে। দারা এবার রাণাদিলের হাত দেখছেন। মানিয়েছে বেশ। হাত ধরে রেখেই বললেন, 'নাহ। রাহ দেখানেওয়ালী তো তুমি। মালেকা জানের কোঠির কথা না জানলে এতসব মুমকিন হতো না।'

নিজের প্রশংসায় গলে না রাণা। সে বলল, 'সেখানে আপনি আফিম আর বেওপার ছাড়া কী পেয়েছিলেন?'

'যা পেয়েছিলাম তা-ই আসলি', দারা বললেন।

'ওহ! পহেলী না করে বলুন শা...', রাণাদিলের মনে পড়ে ছদ্মবেশে থাকা অবস্থায় শাহজাদা বলা যাবে না।

দারা খানিক চুপ থেকে বলতে আরম্ভ করলেন।

'ভিনদেশীদের ওই মজলিশে আমাকে আকর্ষণ করেছিল আর্মেনি মেয়েটির গান। তাকে সে রাতের মতো খরিদ করে যখন তার কাছে পৌঁছলাম, জানলাম সে আমাদের ভাষাও কিছু বোঝে। কর্জের দায়ে পড়ে মেয়েকে বাইজি করেছে। সে মেয়ের সঙ্গে বাতচিত করতে করতে একসময় সে জানিয়েছিল এই কোঠির আড়ালে হওয়া সব কথা', বিশাল আখ্যানের সূচনা করলেন দারা।

দারা খুব বেশি কথা না ঘুরিয়ে বললেন, 'শঙ্করকে শক করার আমার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু জানলাম, শরফউদ্দীন একদিন শঙ্করকে সঙ্গে করে কোঠিতে গিয়েছিল। সেদিন সেখানে টমাসও ছিল। আসলে, মীর বহরের খুনের জন্য টমাস দায়ী।'

'মতলব? টমাস কী করে?' অবুঝের মতো জানতে চায় রাণাদিল। তারা আবারো ফিরে এসেছে বাজিকরদের খেলার আসরে।

সাপুড়ের বীণ যখন বাজতে থাকে তখন দারা বললেন, 'টমাস এক নয়া বেওপারের সন্ধান পেয়েছিল। মানুষের বেওপার। ওদের মুলুকে কিছু কম উমরের লাড়কা দরকার। খোজা করার জন্য না। দাস বানানোর জন্য, জঙ করার জন্য আর ওদের মুলুকে যেসব মর্দ, আওরাত পছন্দ করে না, তাদের জন্য। শঙ্করকে দেখার পর শরফের কাছে শঙ্করকে দাবি করেছিল টমাস। শরফ প্রথম রাজি হয়নি কিন্তু পরে বোধ করি অর্থের লোভেই রাজি হয়েছিল। আর যেখানে তারা আমারই খুনের মনসুবা করেছিল, তারা এক রকম দোস্তি থেকে এক লেড়কার সমঝোতা করে থাকতেই পারে। এমন আরো লাড়কা পাঠানোর বেওপার করবে তারা, এ কথাই ঠিক করেছিল।'

দারার খুনের কথা শুনে রাণাদিল শক্ত করে তার বাহু আঁকড়ে ধরে প্রশ্ন করল, 'শঙ্কর কী করে জানতে পারল?'

'আমার ইয়াকিন, এই কথা শঙ্কর জেনেছিল মীর বহরের তৃতীয় বিবির কাছ থেকে', বলে সামান্য হাসলেন।

'আর খুনটা শঙ্কর একা করেনি। শঙ্করকে সে-ই মদত দিয়েছে। হয়তো রসুই থেকে কোনো হাতিয়ার এনেছিল। অথবা মীর বহরের মুখ চেপে ধরেছিল। হেকিম আহসানউল্লাহ্ বলেছিলেন মীর বহরের ঠোঁটের পাশে কালশিটে ছিল। দুটো আঙুলের দাগ বলেই মনে হয়। আবার মদত না করেও থাকতে পারে। শঙ্কর একাই ডাইনা হাতে মুখ চেপে বাঁয়া হাতে ছোরা চালিয়েছিল।'

দারা থামতেই রাণাদিল তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'শঙ্করের বাঁয়া হাত বেশি চলে তা আপনি কী করে জানলেন?'

এবার শব্দ করেই হাসলেন দারা। বললেন, 'আমি যে শঙ্করের সঙ্গে বসে একদিন রুটি-কাবাব খেলাম, তখনই নজর করেছি সব কাজে শঙ্করের বাঁয়া হাত আগে চলে।'

'হুফ' করে নিশ্বাস ফেলে রাণাদিল বলল, 'ইয়া খোদা, এর চেয়ে ওই দরাবাজদের কাম, নাচনেওয়ালীর কাম ঢের আচ্ছা হ্যাঁয়। শাহ...মতলব আপনি এখন তিন রোজ সিরিফ আরাম করবেন।'

দারা হাসলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। সামান্য তফাতে থেকে ওয়ালী দেখল দারা একা কথা বলছেন, একাই হাসছেন।

রাণাদিল আগ্রায়। দারা দিল্লিতে। ইচ্ছে করলেও এই দিল্লিতে রাণাকে নিয়ে পথ চলা সম্ভব না। আর নাদিরা বেগমকে নিয়ে তো কখনই না। দারা তাই মনের মাঝে এক একজনের মূর্তি বানিয়ে নেয়। কখনো জাহানারা, কখনো রাণা, কখনো নাদিরা, এমনকি আওরঙ্গজেব।

দিল্লির আকাশে মেঘ জমে ছিল। ভেজা ভেজা মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। সেই হাওয়ায় পথ চলতে চলতে বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছিলেন দারা। মাটির পৃথিবী থেকে তার চিন্তা কখনো অন্য দুনিয়ায় চলে যায়। যেখানে তার পেছনে ছায়ার মতো রক্ষী নেই। সালতানাত নেই। সিয়াসত নেই।

নিজের মনে ছিলেন বলেই হয়তো তিনি আনমনা। তবু লক্ষ করলেন বাজিকরদের একজন তাদের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দারার মনে রাণা তখন কথা বলা শুরু করেছে হড়বড় করে। তাই বাজিকরের দিকে খুব একটা লক্ষ করলেন না। করলে বুঝতে পারতেন দৃষ্টিটা স্বাভাবিক না। দারা হেঁটে যান আর দারার পিঠে বিঁধে থাকে বাজিকরের দৃষ্টি।

স্ত্রী ও চার সন্তানের সঙ্গে স্যামসন এইচ চৌধুরী

বেড়াতে গিয়ে খাবার নিয়ে বাছাবাছি করলে বাবার ধমক খেতে হতো

তপন চৌধুরী

পরিচালক, স্কয়ার গ্রুপ

আমার বয়স যখন ১০ বা ১১—ওই বয়সে ছুটির সময়ের ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। ক্রিসমাস, ঈদ বা পূজায় পরিবারের সব সদস্য মিলে নানাবাড়ি যাওয়া হতো। প্রতি বছর না হলেও ২ বছরে একবার এ ধরনের ভ্রমণ হতো। আমরা চার ভাইবোন, মা-বাবার জন্য ট্রেনে দুই বাংকের কেবিন ভাড়া করা হতো। উপরের বাংকে ঘুমাতেন বাবা। নিচেরটায় ঘুমাতেন মা। আর ফ্লোরে আমাদের চার ভাই বোনের ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দেয়া হতো। মেজো সন্তান হিসেবে আমি ছিলাম সব সময়ই 'ট্রাবল মেকার'। যত রকম দুষ্টুমির উৎস ছিলাম আমি। এরকম একটি জার্নির কথা মনে পড়ে। ঈশ্বরদী থেকে রাত ১টা বা দেড়টার দিকে ট্রেন ছাড়ত। ভোর বেলা ট্রেন পৌঁছাতো দর্শনায়। একবার ওই রকম ভোর বেলার ঘটনা। খুব ভোরে ট্রেন থামলে পণ্য দ্রব্য বিক্রি করা ফেরিওয়ালা বা ভেন্ডরদের ট্রেনের যাত্রীরা ডাকতেন খাবার কিনতে। খুব ছোট হওয়ায় ভেন্ডর শব্দটি বুঝতাম না ডাকতাম ভ্যানড্রপ। একবার ট্রেন থামার পর আমার ওই ডাকে বাবার ঘুম ভেঙে গেলো। বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন চুপ কর, সকাল হয়নি, ঘুমা। এই বলে আমার মাথায় চাটি মেরেছিলেন। এতে আমার মা খুব কষ্ট পেয়ে বলেছিলেন ছেলেটা মজা করছে, তুমি ওকে মারলে? আমরা ভাইবোন মিলে সকাল বেলা ওই ভেন্ডরদের থেকে পুরি-সবজি কিনে নাস্তা করতাম। খুব মজার ছোটবেলার স্মৃতিময় সে ঘটনাগুলো খুব মনে পড়ে।

মা'ই মূলত আমাদের দেখভাল করতেন। বাবা সময় খুব পেতেন না। কিন্তু যখনই সময় পেতেন সন্তান ও পরিবারকে সময় দিতে চেষ্টা করতেন। সুযোগ হলেই সন্তানদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। দেশের ভেতরে কক্সবাজার, কুমিল্লা, বগুড়ার মহাস্থানগড় ঘুরতে নিয়ে যেতেন আমাদের ছোটবেলায়। দেশ স্বাধীনের আগে ও পরে দেশের বাইরেও বাবার সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছি ভারতের দার্জিলিং ও দিল্লিসহ বিভিন্ন জায়গায়। একবার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরিবার ও আমাদের পরিবার গিয়েছিলাম কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে আগ্রা—ওই সমস্ত দিকে। ট্রেনে করে গিয়েছিলাম দুই পরিবার। আনন্দঘন ওই মুহূর্তগুলোও খুব মনে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছিলাম। এ রকম একটি ভ্রমণে লোকাল বাসে করে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। সে বাসে স্থানীয় গ্রামের লোকজন ছাগল নিয়ে উঠেছিল। আমার বোনের গায়ে ছাগলটা চাটতে শুরু করলে ভয়ে সে চিৎকার করে উঠেছিল। ছাগল দেখে কেউ ভয় পায়! এতে হতবাক বাসে থাকা গ্রামের লোকজন, খুব হাসাহাসি করেছিল। আরেকবার হরিদ্বারে গিয়েছিলাম। ওই এলাকার মানুষ ছিল নিরামিষভোজী। যেসব খাবারে আমরা খুব অভ্যস্ত না হওয়ায় খাবার সময় হলে মাছ ও গোশতের খোঁজ করতাম। কিন্তু ওখানে সবজি আর ডাল, ভাত আর রুটি ছাড়া কিছু বিক্রি হতো না। আমাদেরও নিরামিষ খেয়ে পেট ভরতো না। বেড়াতে গিয়ে খাবার নিয়ে এসব বাছাবাছির বিষয়ে তখন বাবার ধমক খেতে হতো। এখন

সেই সব ঘটনা মনে হলে খুব স্মৃতিকাতর হয়ে ভাবি যে কেমন ছিলাম আমরা!

ছুটির মৌসুম আসলেই বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সময় কাটানোর সে মুহূর্তগুলো খুব মনে পড়ে। এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ওই সময় পারিবারিক অনুভূতি ও বন্ধনটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। পরিবার ছাড়া একা বেড়ানোর কোনো ভাবনা মানুষের মধ্যে খুব একটা দেখা যেত না। সামাজিক সে মূল্যবোধ অনেক কমে গিয়েছে। ওই সময় মানুষের মধ্যে দেখানো বা শো-অফ করার মানসিকতা কাজ করত না। এমনকি আমরা যখন বিয়ে করে সংসার জীবন শুরু করেছি, তখনো স্ত্রী বা পরিবার ছাড়া ঘুরে বেড়ানোর প্রচলন ছিল না। পুরনো ওই সময়ে এক ধরনের শৃঙ্খলা মেনে চলার মানসিকতা ছিল। যেমন কাজ শেষে অবশ্যই আগে বাড়ি ফিরতে হবে। আর মায়ের প্রভাব অনেক বেশি ছিল। ওই সময়ে মা কে ঘিরেই একটা সংসার হতো। সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল মা।

ছোট বেলার থেকে মা শিখিয়েছিলেন ভাত নষ্ট করতে হয় না। একবার খেতে বসেছি, সঙ্গে মা-বাবাসহ ছিলেন আমার দাদি। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। খাবার সময় আমার দাদির পাতে কিছু ভাত নষ্ট হতে দেখে আমি বলেছিলাম, তুমি এত ভাত নষ্ট করো! তো আমি ভাত নষ্টের কথা বলায় আমার দাদি আমার ওপর রেগে গিয়ে বলেছিলেন, কী! তুই আমাকে ভাতের খোটা দিচ্ছিস? আমি আমার ছেলে খোকারটা খাচ্ছি, তোর কি? (আমার বাবার ডাক নাম ছিল 'খোকা'।) যদিও দাদি আমাকে খুব আদর করতেন, সব থেকে বেশি আদর করতেন, সে জন্যই হয়তো আমি বলতে সাহস করেছিলাম যে তুমি এত ভাত নষ্ট করছ কেন? আর তাছাড়া মা সব সময়ই ভাত নষ্ট না করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। কোনো কারণে ভাত পড়ে গেলেও কুড়িয়ে খাওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। দাদিকে বলা সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে তার ধমক আর তারপর মা ইশারায় আমাকে থামতে বলা—সেই ঘটনাটিও এখন খুব মনে পড়ে।

কর্মজীবন শুরুর পর আমি বাবার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাজ করেছি। পড়ালেখা শেষ করে যখন ব্যবসায় আসি, তখন বয়স কম ছিল। অনেক ব্যাপারেই মনে হতো উনি পুরনো দিনের মানুষ— 'ফ্রম দ্য ওল্ড স্কুল অব থটস', এজন্য ভ্যালুজ নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা বলেন, আইন-কানুন নিয়েও বলেন। অথচ আমি দেখতাম, ওই সময় যারা আমাদের প্রতিযোগী, তারা অনেক ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করছে। ব্যবসার প্রফিট, লয়্যালটি এ বিষয়গুলোয় তিনি ছিলেন কঠোর। আমার মনে আছে, যখন প্রথম এ দেশে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর চালু হয়, তখন আমাদের প্রতিযোগীরা প্রকৃত টার্নওভার ঘোষণা করতেন না। এর জন্য হয়তো অনেক পয়সা তাদের সেভ হতো। আমি একদিন সাহস করে তার কাছে বিষয়টি বলাতে তিনি আমাকে বললেন, ভ্যাট কী জিনিস বোঝ? আমি বিব্রত ও অপমান বোধ থেকেই বললাম, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, ভ্যাট কে দেয়? বললাম কনজিউমার (ভোক্তা) দেয়। এরপর তিনি জানতে চাইলেন আমার ভূমিকা কী? বললাম, 'কালেক্ট করে সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া।' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে এ টাকার দিকে তোমার নজর কেন? এ টাকা কি তোমার?'

এরপর তিনি কড়া কথা শোনালেন। বললেন, তোমার প্রফিট্যাবিলিটি তোমার কস্টিংয়ের মধ্যে যদি বিল্ডআপ না থাকে, যখন দেখছো মুনাফা হচ্ছে না, তখন সে ব্যবসা থেকে বেরিয়ে পড়। তুমি সে পণ্য উৎপাদন কোরো না, যদি দেখ ওই ইন্ডাস্ট্রিতে লাভ নেই। যে টাকা সরকারের, আর দিচ্ছে ভোক্তা, সে টাকার দিকে তোমার নজর কেন? তখন আমি বিপণন পরিচালক। ভেবেছিলাম পুরনো ধ্যান-ধারণার মানুষ এমনই। পরে তিনি ডাকলেন, কথা বললেন পিতা হিসেবে পুত্রকে। বললেন, 'দেখো তুমি যাদের কথা বলছ, আমি হয়তো বেঁচে না-ও থাকতে পারি, কিন্তু তুমি দেখবে এরা কেউ ব্যবসায় থাকবে না।' বাবা যে সঠিক ছিলেন, তিনি জীবিত থাকতেই তা দেখলাম। সাত-আট বছরের মধ্যে কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

'সৎভাবে কাজ করলে সফল হবেই'— এটা বাবা সবসময় বলতেন। আরো বলতেন, তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, সৎভাবে পরিশ্রম করে যেতে হবে। বাবার ওই বিষয়গুলো ভেইনের মধ্যে রয়ে গেছে। সবসময় চিন্তা করতেন কোন উপায়ে ব্যবসায় নিরাপদ থাকা যাবে। দিনে অনেকবার দেখতেন ইল্ড কী হচ্ছে, ওওএস (আউট অব স্পেসিফিকেশন) কোন জায়গাগুলোতে হচ্ছে, কিন্তু মান কম্প্রোমাইজ ছাড়া। যে পণ্যটি কেনা হচ্ছে, সেটা সর্বোচ্চ কম্পিটিটিভ প্রাইসে কেনা কিনা, ওল্ড মার্কেটে কী ধরনের প্রাইস আছে, এ বিষয়গুলোতে সচেতন থাকতে বলতেন। ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য খুবই সেনসিটিভ পণ্য। সস্তায় তো অনেক কিছুই পাওয়া যায়, তাই সোর্সগুলো আবার অডিট করতে হয়। এ বিষয়গুলো সবসময় মাথার মধ্যে ছিল। ইচ্ছা করলেই নীতি বিসর্জন দেয়া যায় না বা কম্প্রোমাইজ করা যায় না। এ বিষয়গুলো রক্তে রয়ে গেছে, কখনো বদলাতে পারব না।

পরিবারের সঙ্গে স্যামসন এইচ চৌধুরী

পরিবারের সঙ্গে আব্দুল মোনেম

বাবা আমার জীবনের লাইটহাউজ

এএসএম মাইনউদ্দিন মোনেম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আব্দুল মোনেম লিমিটেড

যে কাজটা তিনি করেছেন, সেরাটা করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন

একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব পেয়েছে অনেক গুণী ব্যক্তি। আমরা বাংলাদেশের মানুষ সৌভাগ্যবান, কারণ আব্দুল মোনেমের মতো একজন গুণী মানুষ পেয়েছি। তিনি ছিলেন একজন স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। দেশব্যাপী সড়ক ও সেতু নির্মাণসহ বহু ধরনের কাজের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তিনি নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে দেশকে পরিচিত করতে সহায়তা করেছেন। উল্লেখ্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ড্রেজার ম্যানুফ্যাকচারার নেদারল্যান্ডসের আইএইচসি থেকে কাটার সাকশান ড্রেজার আমদানি করেন তিনি। এর মাধ্যমে কৃষিজমির মাটি ব্যবহার না করে নদীর নাব্যতা উন্নয়নে এক অনন্য ভূমিকা রাখেন। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল প্রকল্প এবং বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী সড়ক নির্মাণে তার অবদান যুগান্তকারী। তার স্বপ্ন ছিল সব সময় 'নাম্বার ওয়ান' করার; এ নীতি থেকে কখনো পিছপা হননি। অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন ফুড ও বেভারেজের সঙ্গে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোমল পানীয় কোম্পানি কোকা-কোলা ও বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইগলু আইসক্রিম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রযুক্তির দ্বারা তিনি পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য শ্রেষ্ঠ মেশিনারি সংগ্রহ করেন। ব্র্যান অয়েল, ইগলু ফুড প্রডাক্টস ও ইগলু মিল্কের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলের গরিব মানুষকে সহযোগিতা করেন। বিশেষ করে যারা দুধ বিক্রি করে জীবনযাপন করেন; সেই সব মানুষকে তিনি সহায়তা করেন। সামগ্রিকভাবে বললে, আব্বার ব্যবসায়িক জীবনে একটা সহনশীলতা প্রকাশিত হয়েছে তার কাজের মাধ্যমে। যে কাজটা তিনি করেছেন, সেরাটা করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কাজটা যেন জনসাধারণের উপকারে আসে, সেটা সব সময় তার লক্ষ্য ছিল।

একজন নেতার প্রকৃত সাফল্য তার নিজের অর্জনে নয়, বরং সে কতজনকে সুযোগ করে দিয়েছে তার মধ্যে নিহিত।

তিনি প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতেন

আমার বাবা সব সময় সততার কথা বলতেন। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে কঠোর পরিশ্রম, সততা ও দূরদর্শিতার মতো গুণগত বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। তিনি বুঝতে পারতেন কোন কাজটা করলে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন হবে। অনেক কাজে সরকারকে পরামর্শও দিতেন। এটা তার একটা ভালো দিক। তাছাড়া তিনি প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতেন। আমি বিস্মিত হই, আমরা আধুনিক সময়ে বুঝতে পারছি প্রযুক্তি সাফল্যের অনুঘটক হতে পারে। তিনি সেই সময়ই বুঝেছিলেন সেরা প্রযুক্তি ব্যবহার করলে সেরা হওয়া সম্ভব। এ বিশ্বাস থেকেই ৪০ বছর আগে তিনি কোকা-কোলা প্রতিষ্ঠার সময় ফিলার লাইনটা আনেন জার্মান প্রতিষ্ঠান কেএইচএস থেকে। কেএইচএস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোম্পানি। আমি মনে করি, প্রযুক্তির প্রতি তার আস্থা গড়ে উঠেছিল প্রযুক্তিকে ব্যবসায় ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়ার জন্য। শুধু নির্মাণ প্রযুক্তিই নয়, বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংক ও বীমা খাতের শীর্ষ উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমার বাবা ছিলেন অন্যতম। প্রগতি ইন্স্যুরেন্স,

ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ব্যাংক লিমিটেড ও ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের উদ্যোক্তাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন অন্যতম।

'সততা ও কঠোর পরিশ্রম একসঙ্গে থাকলে যেকোনো স্বপ্ন বাস্তব করা যায়।'

দিনের শুরুতেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার আজকের কাজের পরিকল্পনা কী

এখনো স্পষ্ট মনে আছে, শৈশবের দিনগুলোয় আমি বাবার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম। মাঝখানে ১৫ বছরের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে দেশের বাইরে থাকি, তারপর আবার ফিরে আসি। একটা লম্বা সময় কেটেছে বাবার সান্নিধ্যে। দিনের শুরুতেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার আজকের কাজের পরিকল্পনা কী। আসলে তিনি সব সময় মনে করতেন, যখন একটা মানুষ ভালো চিন্তা করতে পারে বা কাজটা বুঝতে পারে, তখনই কাজটা করতে পারে। বুঝতে পারা ও করতে পারার মধ্যকার সম্পর্ক আমি বাবার মধ্যে দেখতাম। তিনি এদিকে সব সময় মনোযোগ দিতেন।

বাবার সঙ্গে আমরা দুই ভাই একসঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তাম

ঈদের সময় আমরা ভাই-বোন সব সময় একসঙ্গে থাকতাম। বাবার সঙ্গে আমরা দুই ভাই একসঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তাম। সব সময় ঈদের নামাজ থেকে ফেরার পথে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতাম। নামাজের পর অনেক মুরব্বির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। সবার সঙ্গে একটা হৃদ্যতা দেখেছি তার মধ্যে। তিনি সবাইকে খুব সহজভাবে আপন করে নিতেন। এটা ছিল তার একটা বিরাট মানবিক গুণ। আমার এ জীবনে এমন কোনো লোক পাইনি, যারা তাকে খারাপ বলতে পারেন। তিনি মানুষকে সম্মান করতেন। গরিব ও ধনীর মধ্যে ভেদাভেদ করতেন না। মানুষের মূল্যায়ন করতেন। খুব সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। এ স্মৃতি ভোলার নয়। যত বড় হয়েছেন তার জীবনে, তার চলাফেরায় সেটা প্রতিফলিত হতে দেননি। সাধারণভাবে জীবনযাপন করেছেন।

'যদি সৎ হও, কমিটমেন্ট ও অধ্যবসায় থাকে; তাহলে সফল হবেই'

বাবা কখনো আমাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দেননি। সব সময় উপদেশ দিতেন কঠোর পরিশ্রম করা, নিয়মিত নামাজ পড়া ও চরিত্রবান হওয়া নিয়ে। তিনি বলতেন, 'যদি সৎ হও, যদি কমিটমেন্ট ও অধ্যবসায় থাকে; তাহলে সফল হবেই।' স্কুলে পড়ার সময় আমি খেলাধুলা পছন্দ করতাম। তিনি উৎসাহ দিতেন। যেভাবে পড়াশোনা করলে ভালো হবে সেভাবেই তিনি সুযোগ করে দিয়েছেন। আব্বা ও আম্মা দুজনেরই বিশেষ অবদান রয়েছে আমাদের ক্যারিয়ারকে গড়ার পেছনে।

কখনো বাবাকে ক্লান্ত মনে হয়নি

বাবা সারাটা জীবন প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন। তার জীবনটা হলো সংগ্রামের জীবন। মাত্র নয় মাস বয়সে তিনি পিতাকে হারান। দাদিকে নিয়ে তিনি একা শৈশব ও কৈশোর পার করেন। সরকারি পরীক্ষায় সার্ভেয়ার পদে প্রথম হয়েছিলেন, কিন্তু বেশি দিন চাকরি করেননি। ব্যবসায় আসেন। শুধু ৭০ টাকা ছিল পকেটে। সেই ৭০ টাকা নিয়েই ব্যবসায় পা রাখেন। কাজ ও ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি ব্যবসাকে বিকশিত করেছেন। ব্যস্ততাকে তিনি ব্যস্ততা মনে করেননি; ব্যস্ততা ছিল তার জন্য একটা দিকনির্দেশনা। জীবনের একটা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার প্রয়াস, সংগ্রাম। দিক জয় করার প্রবল মনের শক্তি। তিনি মনে করতেন, যদি একাগ্রতা ও সততা থাকে, তাহলে বড় হবেনই। তার জন্য ব্যবসায়িক ব্যস্ততাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। এজন্যই একক জীবনে এত প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। তাকে দেখেছি অনুসরণ করার মতো ব্যস্ততায়। কখনো ক্লান্ত মনে হয়নি।

তার ছোট একটি কথা—'তুই পারবি কিনা', এটাই আমার আদর্শ

বাবার সঙ্গে আমার অনেক ঘটনা। সব সময় তিনি আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছেন। সৎ ও নিষ্ঠাবান থাকতে হবে সব সময়। এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা দ্বারা মানুষ বাংলাদেশ ও মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। আমার মনে পড়ে একটা কথা। তখন আমি বোস্টনে পড়াশোনা করি। সেখানে পাঠানোর ব্যাপারে আমার বাবা-মায়ের অবদান অনেক। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, শারীরিক ব্যায়াম, নামাজ ও বাংলাদেশের প্রচারণা করতাম। বোস্টন স্নাতক পাস করার পর যখন উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিই, তখন আমার এক অধ্যাপক এমআইটিতে পড়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। আন্ডারগ্রেড থাকা অবস্থায়ই বেশ কয়েক বছর তার টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। এমআইটিতে পড়তে পারা ভাগ্যের ব্যাপার। সেখানে ক্লাস শুরু করি। তার অধীনে পিএইচডি করব বলে সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু এক সময় বাবা ফোন করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি যেখানে আছো,

সেখানে একটি ইউনিভার্সিটি আছে, নাম হার্ভার্ড। সেটা নাকি খুব ভালো ইউনিভার্সিটি। দেখো তো একটু।' আমার মনে আছে স্পষ্ট। দুপুরবেলা, তখন আমি এমআইটির ক্যাম্পাসে। সঙ্গে সঙ্গে আমি হার্ভার্ডে যাই। জেনে নিই ভর্তির প্রক্রিয়া। তিন মাস পর আবেদনপত্র জমা দিই। এক বছর পর মেসেজ পাই, হার্ভার্ড আমাকে গ্রহণ করেছে। আমার একাডেমিক জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট এমআইটি ও হার্ভার্ড। সেখানকার অভিজ্ঞতা ও আমার জীবনে যে সাফল্য পেয়েছি; তাতে বাবার দূরদর্শিতা স্পষ্ট। ম্যানেজমেন্ট ফিল্ডে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার।

বাবা সব সময় একটি কথা বলতেন—আমি পারব কিনা। যখন ব্যবসায় এলাম, তখনো তিনি বলতেন—এত বড় ব্যবসা, এত ঋণ, তুমি চালাতে পারবা কিনা। তার সেই 'পারব কিনা' কথাটি এখনো আমাকে এ বয়সে উৎসাহিত করে। আমার উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনে তার ছোট একটি কথা—'তুই পারবি কিনা', এটাই আমার আদর্শ। বাবা উপদেশ দিয়েছেন; যা আমার চলার পথে পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে।

যা কিছু করবে, সেটা হতে হবে নাম্বার ওয়ান

এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। আমি মনে করি না, কোনো সন্তান বাবাকে মূল্যায়ন করতে পারে সত্যিকার অর্থে। পিতাকে কখনই তুলনা করা যায় না। আমার বাবার মূল্যায়ন করতে হলে আমি বলতে চাই, তিনি একজন গর্বিত পিতা। তিনি সন্তানদের উপদেশ দিয়েছেন একটাই—যা কিছু করবে, সেটা হতে হবে নাম্বার ওয়ান। কখনো ব্যবসার ভেতরে ভেজাল না দেয়া, অন্যায় না করা, পরকে না ঠকানোর শিক্ষা দিয়েছেন। নিজের মূল্যবোধ ও বিবেককে প্রশ্ন করে কাজটা করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তার মূল্যবান নিদর্শন রেখে গেছেন আমাদের জন্য—কখনো অন্যায় ও মিথ্যার সঙ্গে যেন কম্প্রোমাইজ না করা হয়। তার জীবন একটা উদাহরণ। সাধারণভাবে থেকেও যে জীবনের মহৎ কাজটা করা যায়, সেটা তাকে দেখে বোঝা যায়। একটা পরীক্ষিত ও স্মরণীয় জীবন ছিল তার। তাকে মূল্যায়ন করেছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী ও দেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব এম সাইফুর রহমান। ২০০৫ সালে বাবা তখন সিলেট বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ করছেন, একদিন এম সাইফুর রহমান সাহেব বিমানবন্দর পরিদর্শনে যান। তিনি কনসালট্যান্টকে জিজ্ঞাসা করেন বিমানবন্দরের কাজের মান নিয়ে। কনসালট্যান্ট জানালেন, 'আমরা তো অনেক বিমানবন্দর করেছি। এ দেশেও যে এত সুন্দর কাজ করতে পারে, এটা তো ধারণা ছিল না।' তারপর সাইফুর রহমান সাহেব বাবাকে ডাকলেন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত ভালো কাজ কীভাবে শিখলেন। বাবা বললেন, 'যদি সৎ ও একনিষ্ঠ হন, তাহলে আল্লাহই আপনাকে পথ দেখাবেন কাজের সেরাটা করার জন্য।' এটাই ছিল তার মোটো।

বাংলাদেশের অনেক বড় ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন তিনি

তিনি নিজেকে খুব একা ভাবতেন। অনেকে বোঝেন না; আমি ছেলে হিসেবে বুঝতে পারি। তিনি যে একা বড় হয়েছেন আমার দাদুকে নিয়ে। আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি নিজেকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত করেছেন। বাংলাদেশের অনেক বড় ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন তিনি। আবদুস সালাম মুর্শেদী, বাদল রায়, কায়সার হামিদ, রকিবুল হাসানের মতো বড় বড় ফুটবলার ও ক্রিকেটাররা এখনো বলেন, তার সময়ে মোহামেডান ক্লাব স্বর্ণযুগ পার করেছে। তিনি ১০ বছর মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চেয়ারম্যান ছিলেন। সেটা ক্লাবটির জন্য সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। তিনি সব সময় খেলোয়াড় ও আয়োজকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন ও দেখাশোনা করতেন। বাবার কথা তারা এখনো বলেন। আসলে আমার বাবা যেখানেই গেছেন, সেখানেই কাজ করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেছেন স্কুল, কলেজ, মসজিদ ও মাদ্রাসা। মিরপুর ডিওএইচএসে নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীর মসজিদ নির্মাণ তার অনন্য কীর্তি। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ তৈরি করেন বিশাল শিক্ষা কমপ্লেক্স। গরিব মানুষের জন্য যেন কিছু করে রাখা যায়, এটা তার বড় একটা দিক ছিল। মানুষের উপকার করার জন্য কিছু করে যাওয়া যায় কিনা সেই খেয়াল রাখতেন। তার দানশীলতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পিতা আব্দুল মোনেমের সঙ্গে
এএসএম মাইনউদ্দিন মোনেম

সব সময় তাকে আলাদা করেছে। জীবনের শেষদিকে একটা আবদুল মোনেম ফাউন্ডেশন করেছেন। ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ভেতরে তিনি অনেক স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডায়ালাইসিস সেন্টার খুলেছেন। প্রথিতযশা চিকিৎসক ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে দিয়ে তিনি ডায়ালাইসিস সেন্টার খুলেছেন; সেখানে গরিব মানুষের জন্য ১ হাজার ৫০০ টাকায় ডায়ালাইসিস করা যায়। এটা ছিল যুগান্তকারী। তার পরিকল্পনা ছিল কার্ডিওলজিস্ট ও ব্রেস্ট সেন্টার তৈরি করবেন। সেজন্য আমার ডাক্তার বোন ফারহানা মোনেমকে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ডায়াগনস্টিক মেশিন চালু করেন। যেহেতু আমার বোনের মেডিকেল ডিভাইসের বিজনেস; ফুজি ও শিমাডজুর মতো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কোম্পানির ডায়াগনস্টিক মেশিন এনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চালু করেন।

বাবা ছিলেন লাইটহাউজ

বাবা কোম্পানিকে ধাপে ধাপে তৈরি করেছেন জীবনের সব পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে। তিনি ছিলেন লাইটহাউজ। যত বড় বাধা বা বিঘ্ন আসুক, তিনি আমাদের ঝড়ো জীবনে পথ দেখিয়ে যাবেন। তিনি একটা গাইডিং ফোর্স। তার প্রতিষ্ঠা করা প্রতিটি কোম্পানি তার একটা প্রতিচ্ছবি, একটা চিন্তা। তিনি বিশ্বাস করতেন, কঠোর পরিশ্রম করলে ও নিষ্ঠা থাকলে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা সম্ভব। তিনি যেন অনড় এক স্তম্ভের মতো। কোনো কিছুই তাকে হেলাতে পারেনি। সমস্ত জীবনে তিনি একটা স্তম্ভের মতোই মূল্যবোধ ও মানুষের প্রতি মর্যাদা ও ব্যবসায়িক নীতি নিয়ে অনড় ছিলেন। কোনো ছাড় দেননি। ভঙ্গ করেননি সততা ও কমিটমেন্ট। তার সেই মূল্যবোধ আমাদের প্রজন্মের চলার পথে একটা পাথেয়। তার সম্পর্কে আমরা একটা বই প্রকাশনায় হাত দিয়েছি। আশা করি, সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে ও দেশ গড়ার কাজে সহযোগিতা করবে।

বাবা ছিলেন আমার বেস্ট মেন্টর

আহসান খান চৌধুরী

চেয়ারম্যান ও সিইও, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

পিতা আমজাদ খান চৌধুরীর সঙ্গে আহসান খান চৌধুরী

বাবার সঙ্গে ছোটবেলার ঈদের স্মৃতি

আমার বাবার সঙ্গে প্রথম স্মৃতি হলো পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ। আমার বাবার কাছে যেটা শিখেছি সেটা ছিল পরিবারের সঙ্গে বন্ডিং। আমরা যখন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্যান্টনমেন্টে থাকতাম, তখন আমার দাদার বাড়ি ছিল ঢাকার আজিমপুরের চায়না বিল্ডিংয়ে। আমরা ছুটিতে দাদার বাড়ি আসতাম। ছোট বাড়ি ছিল, মাত্র একটা বাথরুম ছিল। অনেক সদস্য থাকত। কিন্তু যেটা শিখেছি সেটা হলো বন্ডিং। বন্ডিং নিয়ে আমরা যেভাবে সবার সঙ্গে থাকতাম সেটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা, যা একজন ব্যক্তির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তারপর যখন আমরা ক্যান্টনমেন্টে ঈদ উদযাপন শুরু করলাম, তখন সবার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হলো। ক্যান্টনমেন্টে সিপাহি ও অফিসারদের যাদের পরিবার থাকত, তাদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তার একটা সুন্দর বহিঃপ্রকাশ আমাদের বাসায় দেখতাম। অনেকেই আসতেন আমাদের বাসায় দেখা করতে। এটা আমাদের জন্য একটা বিরল আয়োজন ছিল।

তারপর যখন ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে আসা তখন ঈদের আমেজ অন্য রকম ছিল। তখন ঈদের আমেজটা শুরু হলো নিজেদের কারখানাগুলো পরিদর্শন করে, নিজেদের আনন্দের মাঝে কোম্পানির অন্য মানুষদের সঙ্গে পেয়ে। সবার সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করার মধ্যে ভালো সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলো সবই হয়েছে আমার বাবাকে সঙ্গে করে। সে স্মৃতিটি আমার মনে পড়ছে।

খাওয়ার টেবিলে আলোচনা ছিল ব্যবসাকেন্দ্রিক

আমার বাবা এমন একজন মানুষ ছিলেন, তিনি যখন সামরিক বাহিনীতে ছিলেন তখন আমি তাকে পেয়েছি একনিষ্ঠ সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে। পরবর্তী সময়ে উনি যখন ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এলেন, তাকে সবসময় পেতাম ব্যবসায়ের সৈনিক হিসেবে। আমাদের সঙ্গে জীবনের কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ব্যবসাকেন্দ্রিক, প্রতিটি আলোচনা ছিল ব্যবসাকেন্দ্রিক, খাওয়ার টেবিলে আলোচনা ব্যবসাকেন্দ্রিক, আমাদের চিন্তাভাবনা ছিল ব্যবসাকেন্দ্রিক, আমাদের সবকিছুর মধ্যে ব্যবসার বিষয়টা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আমরা ট্রুলি একটি ব্যবসায়িক পরিবার। ব্যবসার মাধ্যমেই কিন্তু সমাজে আমাদের পরিচয়। এবং এ পরিচয় ধারণ করে নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যবসাকে সঙ্গে নিয়ে কাটানোর লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বাবা খুব কর্মঠ মানুষ ছিলেন

বাবা ছিলেন আমার বেস্ট মেন্টর। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। উনি ব্যাপকভাবে একজন কর্মঠ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় একজন কর্মঠ ছাত্র ছিলেন। আমরা আগামী প্রজন্মকে সবসময় বলি লেখাপড়ার সময় অত্যন্ত কর্মঠ শিক্ষার্থী হওয়া দরকার আমার বাবার মতো। আমি মনে করি বাবার থেকে আমি এটা শিখেছি। আবার বাবা যখন আমাকে ছোটকালে লেখাপড়ার ব্যাপারে কোনো উদাহরণ দিতেন, তখন পরিশ্রমের ব্যাপারে ব্যাপক নজর দিতেন।

পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীতে যখন বাবা ছিলেন, সেখানে তার সফলতার প্রধান কারণ ছিল কঠোর পরিশ্রম। ছুটির সময় বাবা যখন লেখাপড়া করতেন, সেটাও ছিল আর্মি কেন্দ্রিক। পরে বাবা যখন ব্যবসায়ে এলেন, বাবার পেশা চেঞ্জ হয়ে গেল। কিন্তু বাবার সময় কাটানোর ধরনের মধ্যে আমার কাছে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। বাবা যতটুকু পরিশ্রমী ছিলেন আর্মিতে, সমপরিমাণ পরিশ্রমী ছিলেন ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে। বাবা জীবনে পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন পুরোপুরি একনিষ্ঠ ব্যবসায়িক মানুষ হিসেবে বেঁচে ছিলেন। বাবা নিজের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ব্যবসাকে দিয়ে গেছেন। আজকে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের এগিয়ে যাওয়ার প্রধান মন্ত্র হলো গ্রুপের সবার কঠোর পরিশ্রম, যারা আমার বাবার দীক্ষিত। বাবার অনুপ্রেরণায় আমরা আজকের দিন পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছি এবং আগামীতে যেন আমাদের গ্রুপ একটি ভালো গ্রুপ হিসেবে সবার সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারি।

বাবা ছিলেন সফল ব্যবসায়ী

আমি বাবাকে অত্যন্ত সফল একজন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করি। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। তারপর সামরিক বাহিনীতে একজন সফল কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করে ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এসছেন। আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি ব্যবসায়ে সফল হওয়ার জন্য, যেন গর্বের সঙ্গে বলতে পারি আমরা একটি সফল প্রতিষ্ঠান। সবসময় মনে করি আমাদের কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মেজর জেনারেল (অব.) আমজাদ খান চৌধুরী একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে, সফল উদ্যোক্তা হিসেবে তার মৃত্যর পরেও পৃথিবীর বুকে আমাদের মাধ্যমে বিচরণ করছেন।

ঈদে চেষ্টা করি স্টাফদের ভিজিট করতে

যেহেতু আমরা খাদ্যসামগ্রী প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, ঈদের সময় আমাদের কারণে বাজার ব্যবস্থাপনায় যাতে কোনো স্বল্পতা সৃষ্টি না হয়, সেদিকে আমরা নজর রাখি। আমরা সবসময় চেষ্টা করি ঈদের সময় যাতে পণ্যের সরবরাহ ঠিক থাকে। সবসময় চেষ্টা করি আমাদের যারা বিক্রয় প্রতিনিধি আছেন, তারা যেন সার্বক্ষণিক যথাপযুক্তভাবে বাজার ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থাকেন। এ সুন্দর দিনে আমাদের আত্মত্যাগের মাঝে মানুষের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেদিকে আমরা খেয়াল রাখি।

আমি সবসময় চেষ্টা করি বাংলাদেশের মধ্যে নিজেদের স্টাফদের ভিজিট করতে। আমাদের অসংখ্য স্টাফ কর্তব্যরত অবস্থায় থাকেন। ঈদের সময় যারা কোম্পানির জন্য কাজ করছেন, তাদের সঙ্গে দেখা করলে অনেক ভালো লাগে। পাশাপাশি আমরা যেটা করার চেষ্টা করি সেটা হলো বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে আমাদের লোক কাজ করছেন, যারা ঈদের আনন্দ উপভোগটা উপেক্ষা করে কোম্পানির জন্য আত্মত্যাগ করছেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো ঈদের দিনগুলোয়। তাদের আত্মত্যাগের জন্য সঠিকভাবে আমরা কোম্পানির তরফ থেকে যাতে মূল্যায়ন করতে পারি সেটার জন্য কাজ করি।

সুতরাং ঈদ হলো আমাদের জন্য বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সবার সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করা, কোম্পানির স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং ঈদের সময় ব্যাপকভাবে ভিজিবল থাকা যাতে মানুষ দেখতে পায় কেবল আনন্দঘন পরিবেশে আমরা ঈদ করছি না, আমাদের স্টাফদের সঙ্গে নিয়েও আমরা আমাদের আনন্দময় মুহূর্তগুলো শেয়ার করছি।

ঈদের ছুটিতে সবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি

এখন ঈদের ছুটিটাও একইভাবে উদযাপন করি। সবার সঙ্গে কথা বলি, ব্যাপকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করি। অনেকের সঙ্গে কুশল বিনিময় করি। বাংলাদেশ একটা সুন্দর দেশ। এখানে সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ রয়েছে। ছোটবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে ঈদের দিনটা কাটাতাম, এখন সারা দিনটা কুশল বিনিময় করে, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব-কোম্পানির স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অতিবাহিত করি। আমরা বেসিক্যালি ঈদটাকে যোগাযোগের সর্বোত্তম বাহন হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করি।

আমরা চেষ্টা করি এ আনন্দের সময় কেউ যাতে বাদ না পড়ে। তাছাড়া যারা ঈদের দিন কোম্পানির জন্য কাজ করছে তাদের সঙ্গে দেখা করাটাকেও প্রাধান্য দিই। তাছাড়া পরিবারের যারা মৃত্যবরণ করেছেন তাদের কবর জিয়ারত করি।

ছবি : প্রবাস বাংলা ভয়েস

কানাডায় বাংলা মঞ্চনাটক

পারভেজ চৌধুরী

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের কানাডা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শীতপ্রধান দেশ। ১৮৬৭ সালের ১ জুলাই তৎকালীন ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় কানাডার কনফেডারেশন। বাংলাদেশের ৬৪ গুণ বড় কিন্তু জনসংখ্যায় প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ১০টি প্রদেশ ও তিনটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নিয়ে ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনস, ফ্রিডম অব স্পিচের আধুনিক রাষ্ট্র কানাডা। একটি প্লেটে রাখা সবজি সালাদে কোনটি শসা, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, টমেটো কিংবা ধনিয়া পাতা যেমন আলাদা আলাদা চেনা যায়, ঠিক তেমনই কানাডার জাতিগত ধরন। আদিবাসী-অভিবাসী। আদিবাসীদের রয়েছে বিভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা ও সংস্কৃতি, ঠিক তেমনই অভিবাসীদের। খোপ খোপ মোজাইক নিয়ে যেভাবে একটি ঘরের মেঝে তৈরি হয় সে রকম বহু সংস্কৃতি ও জাতীয়তা নিয়ে কানাডা সাংবিধানিকভাবে একটি মোজাইক সংস্কৃতির দেশ। দেশটির জাতীয়তার পরিচয় হাইপেনড নেশন অর্থাৎ যিনি বাংলাদেশ থেকে কানাডার নাগরিক হবেন তিনি বাংলাদেশী-কানাডিয়ান। ইতালি থেকে ইতালিয়ান-কানাডিয়ান, অভিবাসীরা এককভাবে শুধু কানাডিয়ান হবেন না। কানাডার সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো 'মেল্টিং পট' নয় অর্থাৎ বহু দেশের, বহু জাতির সংস্কৃতিকে একত্রে মিশিয়ে অচেনা একটি ভিন্ন সংস্কৃতিতে রূপান্তর করে না। বহু দেশের, সমাজের বিচিত্র সম্প্রদায়কে এক কানাডায় নিজ নিজ স্বকীয়তায় অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়। ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ কানাডার এ দুই অফিশিয়াল ভাষা বাদেও কেউ যদি বাংলা ভাষা অথবা চাকমা ভাষায় শিল্প-সাহিত্য ও নাট্যচর্চা করে সেটিকেও মূলধারার কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ অন্তর্ভুক্তিমূলক বহুত্ববাদ কানাডীয় সমাজের মূল্যবোধ ও সৌন্দর্য।

কানাডায় মঞ্চনাটকের বিকাশ

১৫৮৩ শতকে স্যার হামফ্রে গিলবার্টস জল জাহাজে করে ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল নিয়ে নিউফাউন্ডল্যান্ডে আসেন, তখন উত্তর আমেরিকার জলসীমায় সে জাহাজেই নাটক মঞ্চস্থ করেন। এটিই কানাডায় প্রথম নাট্যকর্মকাণ্ড হিসেবে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্যার হামফ্রে গিলবার্টসের এ অভিযাত্রা দিয়েই প্রথম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার শুরু করেন উত্তর আমেরিকায়। ১৬০৬ শতকে থিয়েটার ডি নেপচুন উত্তর আমেরিকার প্রথম ইউরোপীয় থিয়েটার প্রযোজনা, যা পরিবেশিত হয়েছিল নোভাস্কশিয়ার আনাপোলিস বেসিনে। তারও শত শত বছর আগে থেকেই ওজিবাওয়া, ইরোকুইস, ইন্ডিয়ান, নুতকা, কাওয়াকিউতি ও ইনউইত আদিবাসীরা তাদের লোকাচার, মিথ ও ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করে আসছে নিজ নিজ ভাষায়।

সময়ের বিবর্তনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পেশাদার ও শৌখিনভাবে ঐতিহ্যবাহী থিয়েটার কোম্পানি গড়ে ওঠে। ক্রমেই কানাডা রূপ নিতে থাকে ল্যান্ড অব ইমিগ্রান্টসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, ভাষার ও জনগোষ্ঠীর মানুষ অভিবাসী হয়ে নিজেদের বলয়ে মঞ্চনাটক পরিবেশন করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। আন্তঃপ্রাদেশিক, বহুভাষা, আদিবাসী-অভিবাসী, বিভিন্ন ভাষাসহ আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব হয় নিয়মিত। এছাড়া ওন্টারিও প্রদেশে গড়ে উঠেছে ছোট্ট শহর স্ট্র্যাটফোর্ড। বিশ্বনন্দিত লেখক উইলিয়াম শেকসপিয়রের (২৩ এপ্রিল ১৫৬৪-২৩ এপ্রিল ১৬১৬) জন্মস্থানের অবিকল নামে স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এভন। পাশের নদীটির নামও এভন। শহরটির অর্থনীতি মূলত থিয়েটারভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ওপর পরিচালিত। যেমন পর্যটন, আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট, স্যুভেনির, টি-শার্ট, পানশালা, থিয়েটার সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন হলে নিয়মিত নাটকের শো। বছরের এপ্রিল-অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিনই শেকসপিয়রের নাটকের একাধিক শো হয়। সম্প্রতি আরো বিখ্যাত নাট্যকারের নাটক মঞ্চায়ন হচ্ছে অর্থাৎ পরিধির বিস্তৃতি ঘটছে। থিয়েটারের এসব আয়োজন নিয়েই সারা বছর চলতে থাকে স্ট্র্যাটফোর্ড ফ্যাস্টিভ্যাল।

১৯২০ ও ৩০ দশকের শুরুতেই কানাডায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এথনিক থিয়েটারের ধারণা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যাপকভাবে অভিবাসী ও শরণার্থীদের আগমন ঘটে। সে সময়ে থেকেই এথনিক থিয়েটারের প্রসার ঘটতে শুরু হয়। ভাষার ভিত্তিতে তৈরি হতে থাকে বিভিন্ন পেশাদার-অপেশাদার নাট্যদল। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় মাল্টিকালচারালিজম মন্ত্রণালয় এবং বৈচিত্র্যময় ও বহু সংস্কৃতির প্রসারের জন্য শুরু হয় এথনিক থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা। কানাডায় বাংলা ভাষায় নাট্যচর্চা এথনিক থিয়েটারের অন্তর্ভুক্ত। অনেক এথনিক থিয়েটার দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে এখন কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে মঞ্চনাটকের সফলভাবে মঞ্চায়ন করে নিয়মিতভাবে এবং জাতীয় পর্যায়ে সুনাম অর্জন করছে।

কানাডা ও রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কানাডায় আসেন ১৯২৯ সালে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন অব কানাডার আমন্ত্রণে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে আসেন। তিনি একবারই এসে কানাডায় ছিলেন ১০ দিন। কানাডায় বাংলাভাষী অভিবাসীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে তার গান, কবিতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে। নাটক, নৃত্যনাট্য প্রচুর হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে গল্প থেকে নাটক, নাট্য রূপান্তর। শুধুই বাংলা ভাষায়ই নয়। টরন্টোর ঐতিহ্যবাহী পেশাদার নাট্যদল প্লিডিস থিয়েটার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' অবলম্বনে ইংরেজি অনুবাদ 'দ্য পোস্টম্যান' মঞ্চস্থ করে। দ্য পোস্টম্যান অনুবাদ করেন জুলি মেহতা। নির্দেশনা দেন জন ভ্যান বুরেক। অভিনয়ে মিনা জেমস, প্যাট্রেসিয়া মার্সেও, স্যাম মোজেস, এরল সিতাহাল, ডিলান স্কট স্মিথ, সুগিথ বারুঘিজ ও জেনিফার ভিলাভেরদে। ইংরেজি ভাষার এ নাটকে বাংলাদেশের কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা 'ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো...' গানটি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য পোস্টম্যান টরন্টোয় মঞ্চস্থ হয় ২০১১ সালের ৭ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালসমূহে একাডেমিক পরিসরে বিভিন্ন আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাকে নিয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কালিদাসের নাটক

২০০৯ সালের ৪-১৫ ফেব্রুয়ারি কানাডার টরন্টোয় হারবার ফ্রন্ট সেন্টারে টানা মঞ্চস্থ হয় কালিদাসের শকুন্তলা। অনুবাদ করেন ডব্লিউ জে জনসন। নির্দেশনা দেন চার্লেস রয়। অভিনয়ে: ডেভিড কলিন্স, ফ্র্যাংক কক্স ও কনেল, প্রাগনা দেশাই, মেলি ইউটন, রেজা জ্যাকবস, অনিতা মজুমদার, ক্যারি-লিন নিলস ও সঞ্জয় টালওয়ার।

মঞ্চ পরিকল্পনা: তেরেসা প্রিজিবিলিস্কি, পোশাক: মিলন সাহনি, আলোক: ইতাই এরডাল, সংগীত: রেজা জ্যাকবস, কোরিওগ্রাফি: হরি কৃষনন, মঞ্চ ব্যবস্থাপক: ম্যারিন্ডা ডি বীর। প্রযোজনা করে প্লিডিস থিয়েটার।

কানাডা ও বাংলাদেশ সম্পর্ক

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের পক্ষ নেয় এবং বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাদেও কানাডা বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী।

কানাডায় বাংলাভাষী অভিবাসী

কানাডায় বাংলাভাষীদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতীয়রা। ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য অঞ্চলের বাংলাভাষী। ১৯০৩ সাল থেকে কানাডায় ভারতীয়রা অভিবাসন শুরু করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকেই ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মূলত বাংলাদেশের নাগরিকরা কানাডায় অভিবাসন শুরু করে। তারও আগে কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করতে আসেন অনেকেই। কানাডার ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দক্ষিণ এশীয় মোট অভিবাসীদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ ভারতীয় ও ৩ শতাংশ বাংলাদেশের নাগরিক।

বাংলা ভাষা ও কানাডা

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের জাতীয় শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় লবিং করেছিলেন রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম। দুজনই বাংলাদেশী-কানাডিয়ান।

কানাডার পার্লামেন্ট প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয়ভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করতে একটি আইন করেছে ২৭ এপ্রিল ২০২৩। বাংলাদেশ ছাড়া কানাডাই বিশ্বের প্রথম দেশ, যারা একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়। কানাডা সরকারের বিভিন্ন অফিসের বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশিকা কিংবা ভিডিও বিজ্ঞাপন প্রয়োজন অনুসারে বাংলা ভাষায় হয়।

বাংলা ভাষায় নাট্যচর্চা

বাংলাভাষী জন ঘনত্বের ওপর কানাডায় বাংলা ভাষায় সাংস্কৃতিক চর্চা ও তার আয়োজন নির্ভর করে। গান, কবিতা, নাচ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন বাদে সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়মিত চর্চার বিষয় মঞ্চনাটক। নাটকের আয়োজন ও পরিবেশনার ধরন নিম্নোক্ত:

এক. বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতির অনুষ্ঠান।
দুই. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের অনুষ্ঠান।
তিন. বাংলা চলচ্চিত্র ও নাটকের সেলিব্রিটিদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
চার. মন্দিরভিত্তিক পূজার আয়োজন।
পাঁচ. ব্যক্তিক প্রচেষ্টা।
ছয়. গ্রুপ থিয়েটার।

স্বদেশের বিভিন্ন নাট্যদলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন নাট্যকর্মী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটক, নৃত্য ও সংগীত বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী কিংবা আগে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, বিদেশ এসে কিছু একটা করতে হবে এমন শৌখিনরাই সংগঠক হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

গ্রুপ থিয়েটারগুলো বাংলা ভাষায় যেসব নাটক প্রযোজনা করে:

১. বাংলা ভাষায় বিখ্যাত নাট্যকারদের মৌলিক নাটক
২. কমিউনিটির বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত
৩. বিশ্বসাহিত্যের অনূদিত নাটক
৪. নৃত্যনাট্য
৫. গীতি নৃত্যনাট্য
৬. যাত্রা
৭. ছোটদের নাটক
৮. একাঙ্কিকা

প্রথমত, একক প্রচেষ্টায় নাটক করার উদ্যোগ থেকে নাট্যদলে রূপ নেয়। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, পোস্টার, ফ্লায়ার ও নাট্যকর্মশালার মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয়ত, মতাদর্শগত পার্থক্য, নাট্য আঙ্গিকের ভিন্নতার কারণে দল ভেঙে নতুন নাট্যদলের শুরু হয়। নাট্যদলের দাপ্তরিক কার্যক্রম সাধারণত যেকোনো সদস্য বা দলনেতার বাসা, বাসার আন্ডারগ্রাউন্ড কিংবা গ্যারেজ থেকে পরিচালিত হয়। গ্রীষ্মকালের মহড়া সাধারণত বাসার ড্রয়িং রুম, আন্ডারগ্রাউন্ড, ব্যাক ইয়ার্ড, ফ্রন্ট ইয়ার্ড, পার্ক কিংবা মাঠে হয়। শীতকালে একবারেই বাসার আন্ডারগ্রাউন্ড কিংবা ড্রয়িং রুমে হয়। স্ক্রিপ্ট রিডিং দল বেঁধে একসঙ্গে বসে হয় কিংবা অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ফোন, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, পোস্টার, ফ্লায়ারের মাধ্যমে নাটকের শোয়ের তারিখ প্রচার হয়। পুশিং, অনলাইনে ও শোয়ের আগে হলের কাউন্টারে টিকিট বিক্রি হয়। টিকেটের সঙ্গে নাটকের ব্রোশিউর দিয়ে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের নাটকের দলগুলোর মতোই কানাডায় দলের কর্মীদের মধ্য

থেকে সংগীত ও কস্টিউম পরিকল্পনা করে। কানাডায় মেক-আর্টিস্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল। শোয়ের দিন একজন আরেকজনকে মেকআপ করে দেয়।

পেশাদার থিয়েটারের সেট স্থায়ী ও ভারী হয়। অপেশাদার দলের নাটকের সেট খুবই হালকা-পলকা, গাড়িতে বহনযোগ্য হয়ে থাকে।

কানাডার প্রায় প্রতিটি পাড়া মহল্লায় লাইব্রেরি বা কমিউনিটি সেন্টার আছে। সেসব সেন্টারের দর্শক ধারণক্ষমতা প্রায় ২০০-৩০০ জন। নাটকের শোর জন্য খুবই অত্যাধুনিক হল। এক একটা শোকে কেন্দ্র করে হলের সামনে তুমুল জমজমাট আড্ডা হয়। এক ধরনের সামাজিক ভাব বিনিময়।

অর্থায়ন

নাট্যদলের ব্যয় ও নাটক মঞ্চায়নের অর্থায়ন মূলত সদস্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত চাঁদা, কমিউনিটির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের স্পন্সর ও টিকিট বিক্রি থেকে হয়। তাছাড়া কাজ করতে করতে কিছুটা অভিজ্ঞ হয়ে গেলে কানাডিয়ান আর্টস কাউন্সিল, প্রাদেশিক আর্টস কাউন্সিল, আঞ্চলিক, শহরভিত্তিক আর্টস কাউন্সিল থেকে অনুদান পাওয়া যায়।

বাংলা নাট্যদলের অনুশীলন ও কার্যক্রম

আটলান্টিক অঞ্চল

ইউরোপিয়ানরা উত্তর আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। কানাডার পূর্ব প্রান্তে আটলান্টিকের তীরে চারটি প্রদেশ নিয়ে এ অঞ্চল। ১. নিউ ফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড লাব্রাডার। ২. প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ড। ৩. নোভাস্কোশিয়া। ৪. নিউ ব্রান্সউইক। এখানে জনবসতি খুবই হালকা। বাংলাভাষীদের বসবাস বেশ কম। বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের মাঝখানে নাটকের স্কিট থাকে কিন্তু বাংলা ভাষায় কোনো নাট্য কার্যক্রম বা নাটকের গ্রুপ নেই।

মধ্য কানাডা

কানাডার মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মধ্য কানাডায় বসবাস। বাংলাভাষী জনবসতি কুইবেক ও ওন্টারিও দুই প্রদেশে বেশি। বাংলা মঞ্চনাটকের তৎপরতা এখানে অনেক বেশি।

১. কুইবেক প্রদেশ : কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্যারিসের পর ফরাসি ভাষায় কথা বলার পৃথিবীর দ্বিতীয় শহর মন্ট্রিয়লে বাংলা মঞ্চনাটক হয়।

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে মন্ট্রিয়ল সিটির কোনো একটি হলে মঞ্চস্থ হয় নাট্যকার মুনির চৌধুরীর কবর। নির্দেশনা দেন ইকবাল আনোয়ার। সে সময়ে বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাংলাভাষী অভিবাসীদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তখন কোনো নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নাটকটি ছিল সম্মিলিত প্রযোজনা।

এরপর ১৯৯৪ সালে আরেক নাট্য পাগল দল মঞ্চস্থ করে 'হায়নার আনাগোনা'। রচনা ও নির্দেশনা : নাসিমুল আনাম খান। অভিনয়ে : নাসিমুল আনাম খান, আফরোজা রহমান লিপি, মাহিয়া আবরার, ওয়ালিউদ্দিন মুজিব, পিয়ারুল আলম/তুহিন ও মুফতি ফারুক।

নাটক করতে যেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাট্যদল বাংলাদেশ থিয়েটার অব কানাডা। নাট্যদলের লোগো ডিজাইন করেন শিল্পী সৈয়দ ইকবাল। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ থিয়েটার অব কানাডার দ্বিতীয় প্রযোজনা ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাঁচালী। রচনা : এসএম সোলাইমান। নির্দেশনা : ওয়ালিউদ্দিন মুজিব। অভিনয়ে : ওয়ালিউদ্দিন মুজিব, শহীদুল আলম খান, আশিস সোম, মাহিয়া আবরার, মানীয়া আবরার, আফরোজা রহমান লিপি, সোমা সোম, ইসলাম ভাই, মেহেদী ফারুক ও অচিন্ত্য রায়।

১৯৯৫ সালের ৩০ অক্টোবর ভেনিয়ার কলেজ অডিটোরিয়ামে মঞ্চস্থ হয় তৃতীয় প্রযোজনা জমিদার দর্পণ। রচনা : মীর মশাররফ হোসেন। নব নাট্যায়ন : মমতাজউদ্দিন আহম্মদ। নির্দেশনা : ওয়ালিউদ্দিন মুজিব ও আশিস সোম। অভিনয়ে : বিশ্বনাথ সাহা, নাসিমুল আনাম খান, ওয়ালিউদ্দিন মুজিব, সিরাজুল ইসলাম মিজি, দিদার আহমেদ, আশিস সোম, মাহিয়া আবরার, মুফতি ফারুক, শহীদুল আলম কান, আজিজুর মোল্লা, বিশ্বজিৎ দে বাবুল, আফাজ উদ্দিন তোতন, সুস্মিতা সোম সোমা, উইলিয়াম গোমেজ, শক্তিব্রত হালদার মানু, জোৎস্না খানম ও জন।

২৮ জুন ১৯৯৭ সালে মঞ্চস্থ হয় নাটক দেওয়ান গাজীর কিসসা। নির্দেশনা দেন রানা বোস। অভিনয়ে : মাহিয়া আবরার, শহীদুল আলম খান, সকাল অনন্ত, বিশ্বনাথ সাহা, আশিস সোম, ওয়ালিউদ্দিন মুজিব, মীর শফিকুর রহমান মেহবুব, জোৎস্না খানম, আফরোজা রহমান লিপি, আজিজুর রহমান, অপরাহ্ন সুসমিতো ও দিদার আহম্মেদ। নাটকটির নেপথ্যে কাজ করেন রানা বোস, সাইফুল ওয়াদুদ হেলাল, নাসরিন নাহার শেলী, শক্তিব্রত হালদার মানু, ওয়ালিউদ্দিন মুজিব, আব্দুল হান্নান চৌধুরী, আজিজুর রহমান, অচিন্ত্য রায় ও জোৎস্না খানম।

২. ওন্টারিও প্রদেশ : কানাডার মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগই ওন্টারিওতে বসবাস। কানাডার সবচেয়ে বড় ও অভিবাসীদের শহর টরন্টো। প্রচুর বাংলাভাষীদের বসবাস। বাংলা মঞ্চনাটকের চর্চা এ শহরেই বেশি। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত টরন্টো বাংলা ড্রামা গ্রুপ ভারতীয় বাংলাভাষীদের নাট্যদল।

উইন্ডসর :

অটোয়া :

কানাডার রাজধানী অটোয়া। ওন্টারিও প্রদেশের ছোট্ট শহর।

দেশান্তরী

২০০৪ সালের গ্রীষ্মকালে কার্লটন ইউনিভার্সিটির একটি হলে মঞ্চস্থ হয় 'অতৃপ্ত আত্মার ক্রন্দন'। রচনা : নবী হোসেন। নির্দেশক : খোকন অব্বাস। সহকারী নির্দেশক : আফরোজা লিপি। অভিনয়ে : আতাউর রহমান, নাসিম সাইদী, এনাম রহমান, শিল্পী রহমান, ফারজানা তন্বী প্রমুখ।

২০২৪ সালের ২০ জুলাই আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত কোকিলারা মঞ্চস্থ হয়। নির্দেশক : শিশির শাহনেয়াজ। সহকারী নির্দেশক : ফারজানা মওলা। অভিনয়ে : শিউলি হক লিপি, শারমিন সিদ্দিক ও সারভিনাজ সাঈদী। সূত্রধর : জুলফিকার সাদেক। প্রযোজনা : Crystal cliff inc.

হ্যামিলটন :

ওয়াটার লু :

প্রেইরি অঞ্চল

পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি প্রেইরি অঞ্চলে তিনটি প্রদেশের মধ্যে ম্যানিটোবায় কানাডার সর্বপ্রথম শহীদ মিনারের আদলে ভাষা সৌধ নির্মাণ হলেও বাংলা মঞ্চনাটক নিয়ে কার্যক্রম নেই। সাসকাচেওয়ান প্রদেশেও নাট্যদল না থাকলেও ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় নাটক হয়েছে। আলবার্টা প্রদেশের রাজধানী শহর এডমন্টনে ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় কিছু নাটক হয়েছে। রাফাত আলম ও জাহিদুল ইসলাম জাহিদের চেষ্টায় এডমন্টন বাংলা থিয়েটারের যাত্রা শুরু। অন্যতম শহর ক্যালগেরি ...

পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল

পাহাড় ঘেরা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে কানাডার পশ্চিমে অবস্থিত ব্রিটিশ কলম্বিয়া।

স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল

কানাডার মোট ভূমির তিন ভাগের একভাগ নিয়ে ১. নূনাভূত ২. উত্তর পশ্চিম এলাকা ৩. ইয়ুকোন এলাকা পৃথিবীর উত্তর মেরুতে অবস্থিত। কোনো বাঙালি জনবসতি নেই।

মনোজগতে স্বদেশ

একজন মানুষ নিজ দেশ ছেড়ে যখন অন্য আরেকটি দেশে যায় বসতি স্থাপনের জন্য, তখন বাক্স-পেটরার সঙ্গে মনে ও মগজে স্বদেশকে নিয়ে যায়। সম্পূর্ণ অচেনা দেশে এসে এক সংস্কৃতিগত বিভেদে পড়ে। সংস্কৃতিগত বিভেদ হচ্ছে একটি মারাত্মক মানসিক পীড়ন।

নাটক মঞ্চায়নের প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ

১. কমিউনিটি ছোট। নাট্য প্রযোজনায় আর্থিক সহায়তা বা স্পন্সর খুব ভালো পরিমাণে পাওয়া বেশ দুরূহ ব্যাপার।
২. অভিবাসী জীবনের সংগ্রামের ফলে ইচ্ছে ও আগ্রহ থাকলেও নাটকে সময় দিতে পারে না।
৩. অভিবাসীদের দুটি মন। একটি জন্মভূমিতে অন্যটি আবাস ভূমিতে।
৪. অধিকাংশ নাটকের শো একবারই হয়।
৫. সবকিছুই অত্যধিক ব্যয়বহুল।
৬. নতুন সমাজ সংস্কৃতিতে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত।
৭. অভিবাসীদের পরবর্তী প্রজন্ম নাটক বা নাট্যদলে সম্পৃক্ত নয়। সম্পৃক্ত হয় না।
৮. দেশের ইস্যু নিয়ে বিভক্তিতে থাকে।
৯. অন্য কমিউনিটির খোঁজখবর কম রাখে।
১০. কানাডীয় সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা কম।
১১. ভাষা প্রতিবন্ধকতা।
১২. সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা।
১৩. মনমানসিকতা সমপর্যায়ের নয়, ফলে পারস্পরিক অসম ও ভারসাম্যহীন সম্পর্ক বিরাজ করে।

[এ লেখায় ব্যবহৃত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার, টেলিফোন, ই-মেইল, ভিডিও কল, বই, পত্রিকা, টেলিভিশন সংবাদ, সংগঠনের নিজস্ব ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট, ব্রোশিউর ও নাট্যদলের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে।]

ডায়নোসর

হাসনাত আবদুল হাই

একটা ধাতব শব্দ শুনে প্রৌঢ় ডাইনিং টেবিল থেকে মুখ তুলে বিরক্ত হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। টিকটিকিটা তার দিকে তাকিয়ে মুখের ভেতর থেকে লাল জিভ বের করছে লকলক করে, সেই সঙ্গে বের হয়ে আসছে কখনো হিস হিস শব্দ, আবার পরক্ষণেই ধাতব কিছুর ঝংকার।

প্রৌঢ় টেবিলের অন্যপ্রান্তে তার বিপরীতে বসে থাকা প্রৌঢ়া মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি শব্দটা শুনতে পেয়েছেন? ওটার মুখ থেকে দু ধরনের শব্দ বের হচ্ছে এখন।

মহিলা কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, কীসের শব্দ?

প্রৌঢ় বললেন, টিকটিকিটার মুখের ভেতর থেকে আসা শব্দের কথা বলছি।

প্রৌঢ়া বললেন, মাদি, না পুরুষ? কোনটার কথা বলছেন?

প্রৌঢ় দেয়ালে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, মরদটাই হবে। মাদিটা এত বড় দেখায় না। এমন বেপরোয়াও মনে হয় না তাকে।

প্রৌঢ়া দেয়ালে তাকিয়ে দেখে বললেন, দুটোই কিন্তু বড় হচ্ছে আকারে। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়।

হ্যাঁ, তা করেছি। দুজনই একটু একটু করে বাড়ছে দেহে। বেশ নাদুস-নুদুস দেখায়। তবে আগে শুধু হিস হিস শব্দ করত। আজ শুনছি ধাতব শব্দ বের করছে, যেন শরীরের ভেতর যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। মাদি টিকটিকিটাও এমন করে কিনা কে জানে।

প্রৌঢ়া রুটিতে ক্যানের ভেতরের পিনাট বাটার লাগাতে লাগাতে বললেন, সামনে এলে জানা যাবে। তারপর বাটার লাগানো শেষ করে বললেন, ওরা বেশ বদলাচ্ছে। ধীরে কিন্তু নিয়মিতভাবে। চোখের সামনে বলে হঠাৎ চমকে ওঠার মতো না। কিন্তু টের পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত কত বড় হবে কে জানে।

আমরাও কি বদলাইনি? ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছি। প্রৌঢ় রুটি হাতে নিয়ে বলেন।

প্রৌঢ়া বলেন, 'বয়স হলে এমনই হয়। স্কুলে থাকতে পড়েছিলে না টিএস এলিয়ট নামে কবির কবিতা, আই গ্রো ওল্ড, আই গ্রো ওল্ড/ আই শ্যাল ওয়্যার মাই ট্রাউজারস রোল্ড?

হ্যাঁ। পড়েছি। কিন্তু সেই বুড়ো বয়সে খাটো হয়ে যাওয়া ছিল অন্য রকম। বায়োলজিক্যাল ক্লকের অমোঘ গতি। এখন অনেকদিন থেকে আমাদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক যে পরিবর্তন তার পেছনে রয়েছি আমরাই, আমাদের উদ্ভাবন।

প্রৌঢ়া কিচেনের দিকে তাকিয়ে ডাক দিয়ে বললেন সুজি। কফি নিয়ে এসো।

কিছুপর সুজি হাসি মুখে দুহাতে কফির ট্রে হাতে ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে রেখে বলল, কাফে লাটে। অন সানডে ইউ টেক লাটে।

প্রৌঢ়া হেসে বললেন, তোমার ভুল হয় না। ইউ আর এফিসিয়েন্ট।

সুজি বলল, আই অ্যাম প্রোগ্রামড।

প্রৌঢ়া বললেন, ও কাম অন। ইউ আর স্মার্টার দ্যান দ্যাট। তুমি নিজের মতো চিন্তা করতে পারো। মানুষের মতো বুদ্ধিমত্তা রয়েছে তোমার। প্রোগ্রামের বাইরে অনেক কিছু করতে পারো তুমি। তোমার অ্যালগরিদম, সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতি মানুষের মতো।

প্রৌঢ় বললেন, সুজিরা হয়তো একদিন মানুষের বুদ্ধিমত্তা ছাড়িয়ে যাবে। তার মানে কী হবে বুঝতে পারছেন জোছনা?

হোয়াট?

প্রৌঢ় সুজির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখন যেতে পারো।

সুজি যেতে যেতে বলল, ইউ হ্যাভ সাম প্রাইভেট থিংস টু ডিসকাস। ওকে আই গো।

সুজি ডাইনিং রুম থেকে চলে গেলে প্রৌঢ় বললেন, দেখলেন? সব বুঝতে পারে। মানুষের সঙ্গে কোনো তফাত নেই।

প্রৌঢ়া বললেন, কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বলুন শুনি।

ও হ্যাঁ। সুজিরা মানুষের বুদ্ধিমত্তা ছাড়িয়ে গেলে আমাদের ব্রেইনের কাজ অনেক কমে যাবে। ফলে আমাদের ব্রেইনের সাইজ কমে আসবে। আমি জেনারেশনাল চেঞ্জের কথা বলছি। বলে প্রৌঢ় কফির কাপে চুমুক দিলেন।

প্রৌঢ়া কফির কাপ নামিয়ে রেখে বললেন, তার মানে এমন দিন আসবে যখন মানুষের সব চিন্তাভাবনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ সব সুজিরাই নেবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ হলিডে উপভোগ করবে। তারপর হেসে বললেন, নট আ ব্যাড আইডিয়া। ইউনিভার্সাল ইনকামের মতো ইউনিভার্সাল হলিডে। অল্ডুস হাক্সলে তার 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে' এমন ভাবতে পারেননি।

প্রৌঢ় দেয়ালে টিকটিকিটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এরই মধ্যে সেটার পাশে মাদিটা এসে যোগ দিয়েছে। দুটোর মুখ থেকেই এখন বের হচ্ছে হিস হিস আর ধাতব শব্দ। একসঙ্গে না, পরপর, মিউজিক্যাল কাউন্টারপয়েন্ট তৈরি করে। দুটোর জিভই বেরিয়ে এসেছে মুখের বাইরে। হঠাৎ দেখলে ছোট দুটো লালবাতি মনে হয়। গনগনে আগুনের মতো লাল। হল্কা বের হচ্ছে কি? দেখার চেষ্টা করলেন প্রৌঢ়। হঠাৎ তার মনে হলো লাল বিন্দু দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। দারুণ হিপনোটিক সেই লাল রঙের আভা। তিনি চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রৌঢ়ার দিকে তাকালেন। তার মনে হলো মহিলা জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন। যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

তিনি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জোছনা আর ইউ ওকে? ইউ সিম টু বি শর্ট অব ব্রেথ?

প্রৌঢ়া কিছুটা হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ইয়েস। কিছুটা। ঘরে কি অক্সিজেন কমে গেল?

প্রৌঢ় উঠে গিয়ে অক্সিজেন সিলিন্ডারের মিটার দেখে এসে বললেন, হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু কোম্পানির তো কথা ছিল সামনের সপ্তাহের আগে রিফিল লাগবে না। তাহলে এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে কেন?

আমরা কি আগের চেয়ে বেশি অক্সিজেন নিচ্ছি? প্রৌঢ়া জানতে চান।

না। তা হবে কেন? আমাদের ইনটেক আগের মতোই আছে। তবে কি লিক হচ্ছে, অথবা... । কথা শেষ না করে তিনি টিকটিকি দুটোর দিকে তাকালেন। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, মাই গড!

কী হলো? অবাক হচ্ছেন কেন? বলে তিনি প্রৌঢ়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেয়ালে টিকটিকি দুটো দেখে আস্তে আস্তে বললেন, ইউ ডোন্ট মিন?

প্রৌঢ় তন্ময় হয়ে বললেন, দেয়ার আর মোর থিংস ইন হ্যাভেন অ্যান্ড আর্থ দ্যান ইওর ফিলোসফি ক্যান থিংক অব। আমার মনে হচ্ছে, দে আর পোচিং আওয়ার অক্সিজেন। ইফ পোচিং ইজ দ্য রাইট ওয়ার্ড। ওই দুজনের অক্সিজেন ইনটেক বেড়ে গিয়েছে। সেজন্যই সিলিন্ডারে অক্সিজেন লেভেল কমে গিয়েছে।

তাহলে উপায়? শ্বাসকষ্ট নিয়ে আমরা থাকতে পারি না। রেগুলেটরি অথরিটিকে জানান এখনই। তারা কোম্পানিকে বলুক শিডিউলের আগেই রিফিল দিয়ে যেতে।

প্রৌঢ় উঠতে উঠতে বললেন, হ্যাঁ। তাই করতে হবে। কোম্পানিকে বলে লাভ নেই। তারা আইনকানুন, বিধিমালার কথা বলবে। ব্লাডি ব্লাড সাকারস।

কিছু পর ফিরে এসে বললেন, পাবলিক টেলিফোনটা খুব ব্যস্ত। ফ্রি পাওয়া গেল না। বলল, লিভ ইওর মেসেজ।

কিরণ, আপনি কি তাদের মেসেজ দিয়ে বলেছেন আমরা বিপদে পড়েছি? প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যাঁ, জোছনা বলেছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো তাদের কাছে এই মেসেজ পৌঁছবে কখন? ওরা কী করে জানবে এটা ইমার্জেন্সি?

জোছনা জোরে জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, উই মে বি ওয়ান অ্যামাং থাউজ্যান্ডস ইমার্জেন্সিজ।

একটু পর বসবার ঘরে পাবলিক টেলিফোনের টার্মিনাল থেকে রিং শুনে প্রৌঢ় উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাতে মেসেজের প্রিন্ট আউট নিয়ে টেবিলে বসে শুকনো মুখে প্রৌঢ়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, লিখেছে শিডিউলের আগে অক্সিজেন রিফিল দেয়া সম্ভব না। আমাদের কোটা থাকলে পার্কে গিয়ে অক্সিজেন সেবন করতে বলেছে।

আমাদের এ মাসে পার্কে যাওয়ার কোটা কি শেষ হয়ে গিয়েছে? প্রৌঢ়া ব্যগ্র হয়ে বললেন, আমাদের মান্থলি কোটা কি শেষ? খুব বেশি তো যাওয়া হয়নি এ মাসে কিরণ।

প্রৌঢ় ওয়ালেট থেকে কার্ড বের করে দেখতে দেখতে বললেন, জানেনই তো, পার্কে যাওয়া শুধু আমাদের যাওয়ার ওপর নির্ভর করে না। অন্যেরা কতটা ব্যবহার করছে, সেটাও নির্ধারণ করে আমরা যেতে পারব কিনা। তার ওপর রয়েছে পার্কের ওয়ার্ডেনের কারচুপি। দেখি ফোন করে ওয়ার্ডেন কী বলে।

শুনে প্রৌঢ়া দাঁত কিড়মিড় করে বলেন, ব্লাডি রেন্ট সিকারস!

ফোনে কথা বলার পর প্রৌঢ় বললেন, ওয়ার্ডের অফিস আমাদের ভিজিটের রেকর্ড আর সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করি আমরা। দু ঘণ্টার জন্য পার্কে গিয়ে থাকতে পারব জানিয়েছে। চলুন যাওয়া যাক। কিন্তু এতে সাময়িক সমাধান হবে। তারপর? বলে উঠতে উঠতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়ের মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে এল। তিনি হাতে কাঁটাচামচ নিয়ে হিংস্রভাবে এগিয়ে গেলেন টিকটিকি দুটোর দিকে। কাছে যাওয়ার আগেই তারা সরসর শব্দ তুলে উঠে গেল ওপরে, তার নাগালের বাইরে। তিনি রাগে গরগর করে বললেন, ওই দুটোকে তাড়াতে হবে। ওরা শুধু ঘরের অক্সিজেন কমিয়ে দিচ্ছে না, আমাদের খাবার সাবাড় করছে। লক্ষ করেছেন আজকাল সব খাবার কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে? সুজি খায় না, তার অক্সিজেন লাগে না। তাকে নিয়ে চিন্তা নেই। ওই পরগাছা দুটোই প্রবলেম ক্রিয়েট করছে। উই হ্যাভ টু গেট রিড অব দেম। দ্য প্রিডেটরস।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে প্রৌঢ় সুজিকে বললেন, আমরা পার্ক থেকে আসছি।

লাঞ্চ? বলে সুজি তাকাল দুজনের দিকে।

আমরা সঙ্গে এনার্জি বিস্কিট নিচ্ছি। লাঞ্চ স্কিপ করছি। প্রিপেয়ার ডিনার ফর আস। পিৎজা মার্গারিটা তারা বেরিয়ে আসতে পেছন থেকে সুজি বলল, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

প্রৌঢ় ভাবলেন, সুজি কি ঠাট্টা করে বলল?

দুই.

পার্কে গিয়ে বসার জন্য কোনো খালি বেঞ্চ পাওয়া গেল না। একটা গাছের নিচে কাগজ পেতে বসলেন দুজন। কিছুপর একটা কাঠবিড়ালি দৌড়ে গেল সামনে দিয়ে। দেখে প্রায় আঁতকে উঠলেন প্রৌঢ়া। আর্তস্বরে বললেন, কী ওটা? আ নিউ স্পেসিস?

কাঠবিড়ালি। নতুন স্পেসিস না।

এত বড় কাঠবিড়ালি। গত মাসেও ছোট দেখেছি। প্রৌঢ়া অবাক হয়ে বললেন।

প্রৌঢ় বললেন, মনে হচ্ছে প্রাণিজগতে ইভল্যুশনারি সাইকেল দ্রুত বদলে গিয়েছে। সব প্রাণী আকারে বড় হচ্ছে।

মানুষ ছাড়া। প্রৌঢ়া বলেন।

মানুষও বদলাচ্ছে। বললাম না, আমাদের ব্রেইন ছোট হয়ে আসছে।

প্রৌঢ়া কিছুক্ষণ অস্থির হয়ে গলা, মুখ মুছলেন সঙ্গে আনা তোয়ালে দিয়ে। তাঁর মুখে বিরক্তি আর যন্ত্রণা। বললেন, পার্কে অক্সিজেন আছে। কিন্তু টেম্পারেচার ইজ ভেরি হাই। আই অ্যাম সোয়েটিং। লাইক আই অ্যাম ইন আ সৌনা বাথ। আজ কত টেম্পারেচার?

ফিফটি সেলসিয়াস।

মাই গড! সুন উই উইল বি সিঞ্জড। ভাঁজা ভাঁজা হয়ে যাব এই গরমে।

প্রৌঢ় বললেন, ইনসুলেটেড স্যুট পড়ে নিন। চেঞ্জ করার ঘর কাছেই দেখতে পাচ্ছি।

হোয়াট অ্যাবাউট ইউ কিরণ? আপনি ড্রেস চেঞ্জ করবেন না?

আমি দেখি কতক্ষণ এভাবে থাকা যায়।

উঠতে উঠতে প্রৌঢ়া বলেন, এনডিউরান্স টেস্ট? উইশ ইউ গুড লাক।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে আগের জায়গায় বসার পর প্রৌঢ়া বললেন, এমন হতো না যদি সত্তর বছর আগে ২০১৫ সালে জলবায়ু সম্মেলনে প্যারিস অ্যাকর্ড মেনে নিয়ে সব দেশ কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লবের আগের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখত। আমাদের বয়স তখন ছিল বিশের নিচে। উই ওয়ার টিন এজারস উইথ হেডস ইন ক্লাউড। আমরা ভেবেছিলাম স্বাক্ষরকারী সব দেশ তাদের প্রতিশ্রুতি রাখবে। উই ওয়ার সো নাইভ দেন।

প্রৌঢ় বললেন, সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশ আমেরিকা মেনে নিলে সেই স্বপ্ন পূরণ হতো। কার্বন-ক্যাপিং মোটেও মরীচিকা হয়ে থাকত না। কিন্তু ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে বেরিয়ে এলেন প্যারিস চুক্তি থেকে। বললেন, এসব আমেরিকার উন্নতি রোধের চক্রান্ত। তিনি তার মন্ত্র 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' অনুযায়ী বাড়িয়ে চললেন ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার। কার্বন নিঃসরণ বেড়ে চলল শনৈঃশনৈঃ গতিতে। আমেরিকার দেখাদেখি চীন, ভারত এই সব প্রধান ফসিল ফুয়েল ব্যবহারকারী দেশও পিছিয়ে থাকল না। কনফারেন্স অব পার্টিজ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ পর্যবসিত হলো বক্তৃতা দেয়ার প্লাটফর্মে। একেবারে যাকে বলে হারাকিরি, তাই করল সব দেশের সরকারপ্রধানরা। এর খেসারত দিতে হচ্ছে এখন।

প্রৌঢ়া বললেন, একটা টার্মের জন্য প্রেসিডেন্ট হলেও পৃথিবী আমেরিকার অমিতব্যয়িতা সহ্য করে বিপদ এড়াতে পারত। কিন্তু এমন প্রতিক্রিয়াশীল দেশ আমেরিকা যে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়া সত্ত্বেও সেই ট্রাম্পকেই দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউজে পাঠাল ভোটাররা ২০২৫ সালে। পরের ষাট বছরে কী বিপর্যয়ই না ঘটে গেল। পৃথিবীর নানা দেশে। সাইক্লোন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, মেরুতে বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নিচু দেশের ভূখণ্ড নিমজ্জিত হওয়া।

প্রৌঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ট্রাম্পের অভ্যন্তরীণ আর পররাষ্ট্র নীতির ফলে আরো বিরাট ক্ষতি হলো। শুধু জলবায়ু কেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সকল দেশের সহযোগিতার ভিত্তিতে যে ওয়ার্ল্ড অর্ডার গড়ে উঠেছিল শান্তি ও প্রগতির জন্য, সবই ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো তার সময়েই অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্তৃত হয়ে কোটি কোটি লোককে বেকার করে দিল। যুদ্ধ-বিগ্রহে নতুন মাত্রা যোগ করল সেই প্রযুক্তি। মানুষের জীবন এখন যে বিপন্ন সে তো ট্রাম্পের মতো স্বার্থপর কুটিল মানুষের জন্যই। তার দোসরগুলোও ছিল তেমন। লোভী, স্বার্থপর আর মিসএনথ্রপ ইলোন মাস্ক। প্রতিক্রিয়াশীল মার্ক রুবিও। প্রৌঢ়া উত্তেজিত হয়ে কথাগুলি বলে হাঁফাতে থাকলেন।

প্রৌঢ় উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, জোছনা এত উত্তেজিত হবেন না। আমাদের আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন এসব পুরনো কথা ভেবে মন খারাপ করার মানে হয় না। বয়সের কথা মনে আছে তো? আপনার চুরাশি, আমার ছিয়াশি। আমাদের হার্ট বেশি চাপ নিতে পারে না এখন। তাই উত্তেজিত হবেন না। ভাবুন, কী আর হবে আমাদের? জীবন তো পার করে দিলাম।

প্রৌঢ়া বিষণ্ন স্বরে বলেন, আমি আমাদের কথা ভাবছি না। আমাদের দুজনের লিভিং টুগেদার সুখের ছিল। ইনস্পাইট অব এভরিথিং। আমি চিন্তিত, উত্তেজিত হচ্ছি নতুন প্রজন্মের কথা ভেবে। যে জীবন যাপন করবে তারা সেটা কি তাদের পূর্ব পুরুষের জীবনের মতো হবে? এই প্রশ্নের উত্তরটা জানাই আছে। হবে না। ইজ দ্যাট প্রগ্রেস?

প্রগ্রেস ইজ রিলেটিভ। প্রৌঢ় বললেন। তারপর রুমাল দিয়ে গলা, মুখ মুছে নিয়ে বলতে থাকলেন, নতুন প্রজন্ম হয়তো এই জীবনকেই পছন্দ করে। এই জীবনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এমনকি সংক্ষিপ্ততা তাদের কাছে থ্রিলিং মনে হয়। তাদের লাইফস্টাইল, লিঙ্গো সব আগের তুলনায় কত পৃথক হয়ে গিয়েছে! তাদের দেখে কি আপনার অসুখী মনে হয়? বলে তিনি তাকান প্রৌঢ়ার দিকে।

আই ডোন্ট নো ডিয়ার কিরণ। ফ্র্যাংকলি আই ডোন্ট নো। আই ক্যান অনলি ফিল সরি ফর দেম। দে ডু নট নো হোয়াট দে আর মিসিং। বলে তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রূপালী ব্যাংক

নিয়ে এলো আকর্ষণীয় ৩টি নতুন স্কিম

স্কিমের নাম	স্কিমের মেয়াদ	সুদ/মুনাফার হার	জমার পরিমাণ (টাঃ)	মাসিক মুনাফা/ মেয়াদপূর্তিতে পরিশোধ
রূপালী আস্থা রূপালী মাল্টলি আর্নিং স্কিম	০৩ (তিন) বছর	১০.২৫% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৫৪.০০
রূপালী শ্রদ্ধা রূপালী মাল্টলি বেনিফিট ফর সিনিয়র সিটিজেন	০৩ (তিন) বছর	১০.৫০% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক তবে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ	প্রতি ১ লক্ষ এর মাসিক মুনাফা টাঃ ৮৭৫.০০
রূপালী ডাবল বেনিফিট স্কিম আরডিবিএস	৬ (ছয়) বছর ০৯ (নয়) মাস	১০.৮২% (বার্ষিক)	সর্বনিম্ন ১ লক্ষ অথবা এর গুণিতক	প্রতি ১ লক্ষ এর বিপরীতে মেয়াদপূর্তিতে প্রদেয় টাঃ ২ লক্ষ

* বিধি মোতাবেক সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী উৎসে কর এবং আবগারী শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

হিসাব খোলার জন্য রূপালী ব্যাংকের নিকটস্থ শাখায় যোগাযোগ করুন

রূপালী ব্যাংক পিএলসি

উত্তম সেবার নিশ্চয়তা

www.rupalibank.com.bd

STAR Cineplex

GRAND OPENING

CENTREPOINT
AIRPORT ROAD, DHAKA.

EID-UL-FITRE 2025

STAR Cineplex, Centrepoint Shopping Mall, Level 05 & 06,
United Terminal, Airport Road, Kurmitola, Dhaka-1229.
Visit: www.cineplexbd.com,
Hotline: 09617660660, 01755665544

Hazrat Shahjalal International Airport

প্রৌঢ় ঘাসের ওপর শুয়ে বললেন, ডোন্ট টেল দেম হোয়াট দে আর মিসিং। না বললে তারা জানবে না। ইগনরেন্স ইজ ব্লিস। সে কথা তো আপনার জানাই আছে। লেট দেম বি।

প্রৌঢ়া হেসে প্রৌঢ়ের মাথার সাদা চুল নিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বলেন, ইউ হ্যাড সাচ থিক ব্ল্যাক হেয়ার। শক অব হেয়ার। ডু ইউ মিস দেম কিরণ ডিয়ার?

নো। আই ডোন্ট। সেসব সাদা হওয়ার বিনিময়ে আমি আনন্দ পেয়েছি। সুখ অনুভব করেছি। আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে। নাথিং ইজ ফর নাথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড।

আনন্দ পেয়েছেন, সুখী হয়েছেন? তাই? একা একা? প্রৌঢ়ার মুখ কুঞ্চিত হয়, কপালে ভাঁজ পড়ে।

টুগেদার, মাই ডিয়ার। টুগেদার। এটাও বলতে হবে?

প্রৌঢ়া মুখ নিচু করে প্রৌঢ়ের কপালে চুমু দিয়ে বললেন, আই লাভ ইউ, কিরণ। আই লাভ ইউ দি ওশানস।

তিন.

টেম্পারেচার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। চব্বিশ ঘণ্টা এয়ার কন্ডিশনার চালিয়ে রাখতে হচ্ছে বিশ সেলসিয়াসের নিচে। সেই সঙ্গে বাড়ছে মিটার। প্রৌঢ় আর প্রৌঢ়া, দুজনকেই খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। আবহাওয়া বিভাগে ফোন করতে হচ্ছে না পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য। তারাই প্রতিদিন সকাল-বিকাল টেলিভিশনে খবর দিয়ে জানাচ্ছেন তাপমাত্রা আর আর্দ্রতার খবর। তাপমাত্রা কমার কোনো আশ্বাস দিতে পারছেন না তারা।

ডাইনিং টেবিলে বসে প্রায়ই হিসাব করছেন দুজন। দেখছেন সঞ্চয় কমে আসছে দ্রুত। খাবারের দাম বাড়ছে। ইউটিলিটির বিল উত্তরমুখী। অক্সিজেন সিলিন্ডার, পার্ক ব্যবহার, ওষুধের দাম, সব কিছুই ঊর্ধ্বমুখী। খরচ বাড়ছে অথচ দুজনের পেনশন ছাড়া আয় নেই। সেই পেনশন ইনফ্লেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না, ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। দুজন হিসাব মেলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

একদিন হিসাব শেষে মেলাতে না পেরে দুজনই ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ বসে আছেন ডাইনিং টেবিলের পাশে। সুজি এসে তাদের দেখে বলল, ইজ দেয়ার এনিথিং রং? ইউ লুক ওরিড।

শুনে একজন ভ্রু বাঁকিয়ে, অন্যজন ঠোঁট কুঁচকে তাকালেন সুজির দিকে। ঠিক ধরে ফেলেছে যে তারা চিন্তিত। অবিকল মানুষের মতো বুদ্ধি। প্রৌঢ় ভাবলেন সুজিকে জিজ্ঞাসা করা যাক তাদের কী করা উচিত। সে তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বলুক বিদ্যমান পরিস্থিতির মোকাবেলা কীভাবে করা যেতে পারে? নিজে হলে এই সংকট থেকে বের হয়ে আসতে কী করত সে? শোনা যাক না সুজির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী বলে।

শোনার পর সুজি একটু সময় নিল ভাবতে। তারপর বলল, আপনাদের এখনকার প্রধান সমস্যা বিদ্যুতের বিল। গরমের জন্য সব সময় লো ডিগ্রিতে এসি চালাতে হচ্ছে। এই খরচ না করার একমাত্র উপায় হলো এসি না চালানো। বলে সে দুজনের দিকে তাকাল।

প্রৌঢ়া বলেন, তা কী করে সম্ভব? গরমে সেদ্ধ হয়ে মারা যাব। কী যে বলো তুমি।

সুজি বলে, আমি কথা শেষ করিনি। একটা উপায় আছে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য।

কী সেই উপায়? প্রৌঢ় ব্যগ্র হিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

সুজি বলে, দুজন সি বিচে কোনো রিসোর্টে চলে যান। সেখানে গরম কম।

শুনে দুজন একে অন্যের দিকে তাকান। তারপর প্রৌঢ় সুজির দিকে তাকিয়ে বলেন, সি বিচের রিসোর্টে যেতে চাইলেই কি যাওয়া যাবে? সেখানে প্রার্থীদের লম্বা কিউ। তার ওপর ধরাধরি করতে হয় বলে শুনেছি। এখন এই আবহাওয়ার কারণে রিসোর্টে যাওয়ার আবেদন নিশ্চয় আরো বেড়ে গিয়েছে। নো সুজি, দ্যাট ইজ নো সলিউশন। বলা যায় এ পুওর সলিউশন।

সুজি সপ্রতিভ হয়ে বলে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? হোয়াট আদার চয়েস ডু ইউ হ্যাভ?

তাদের কথার মধ্যে দেয়াল থেকে টিকটিকি দুটো ডেকে উঠল কর্কশ স্বরে। অনেকটা ইয়েসের মতো শোনাল সেই স্বর।

প্রৌঢ় দেয়ালে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, এক মাসের মধ্যে আরো বড় হয়ে গিয়েছে দুটো। কী কাণ্ড!

শুনে সুজি বলল, আপনাদের জন্য যে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড ফুড দেয়া হচ্ছে তার উচ্ছিষ্ট খেয়ে ওদের গ্রোথ বাড়ছে।

সুজির কথা শুনে দুজন চুপ করে থাকলেন। কথাটা মিথ্যা কিংবা অতিরঞ্জিত মনে হচ্ছে না। কিন্তু না জানিয়ে জিএম ফুড তাদের দেয়া হচ্ছে কেন? তিনি প্রৌঢ়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, দিস ইজ ভায়োলেশন অব কার্তাগেনা প্রটোকল।

হোয়াট ইজ কার্তাগেনা প্রটোকল ডিয়ার? এনলাইটেন মি। আমি আগে শুনিনি।

প্রৌঢ় বললেন, কলম্বিয়ার কার্তাগেনা নামে প্রাচীন শহরে কনভেনশন ইন বায়োডাইভার্সিটির মিটিংয়ে ঐকমত্য হয়েছিল যে কোনো দেশের অমতে বা অজ্ঞাতে জিএম ফুড সরবরাহ করা যাবে না। আমাদের দেশে সেই প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে দিব্যি জিএম ফুড খাইয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ মার্ডার। স্লো পয়জনিং।

প্রৌঢ়া দেয়ালে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু জিএম ফুড খেয়ে ওরা দিনদিন নাদুসনুদুস হচ্ছে। তাদের স্লো পয়জনিং হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

দেয়ালে টিকটিকি দুটোর দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ় বললেন, ওদের মেটাবলিজম ভিন্ন। তাই কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

পাশে থেকে সুজি বলল, ঠিক ধরেছেন। ওদের সিস্টেম মানিয়ে নিয়েছে।

প্রৌঢ়া রুষ্ট হয়ে সুজিকে বলেন, তুমি আমাদের এতদিন বলোনি কেন জিএম সাপ্লাই দিচ্ছে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর? এটা কি তোমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না?

পড়ে। অবশ্যই পড়ে। আইজাক আসিমভ রোবটদের জন্য তিনটি নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রথমটা হলো কোনো রোবট মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু জিএম ফুডের ব্যাপারে আমি কিছু করছি না। কর্তৃপক্ষ করছে। এখানে আমার কিছু করার নেই।

প্রৌঢ় অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন, অন্তত জানাতে পারতে।

সুজি বলল, আসিমভ আমাদের ইনফর্মার হতে বলেননি। আমাদের দ্বারা যেন মানুষের কোনো ক্ষতি না হয় সে কথা বলেছেন।

প্রৌঢ়া বললেন, হু ইজ আসিমভ? রাশিয়ান মনে হচ্ছে।

সুজি সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, হি ইজ দ্য ফাদার অব রোবোটিকস। যখন কোনো রোবট তৈরি হয়নি, তিনি তাদের কথা লিখেছেন। তার লেখা, 'আই, রোবট' একটা ক্ল্যাসিক। রোবটদের বাইবেল।

প্রৌঢ় বললেন, তা হলে সি বিচের রিসোর্টে অ্যাকোমোডেশনের জন্য চিঠি লিখে ফেলা যাক। বলে তিনি সুজির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিই লিখে ফেলো না কেন? তোমার ল্যাংগুয়েজ লার্নিং মডেল কাজে লাগাও।

সুজি বলল, এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি। কোনো ব্যাপারই না।

দুই মিনিটে চিঠির প্রিন্ট আউট নিয়ে এসে প্রৌঢ়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সই করুন। সফট কপি পাঠানো হয়েছে।

প্রৌঢ় হাতে নিয়ে পড়ে বললেন, আমাদের দুজনের সব তথ্য দেয়া হয়েছে। কোথাও ভুল নেই। দারুণ! থ্যাংক ইউ সুজি। তারপর হেসে বললেন, এখন নিশ্চয় 'ইউ আর ওয়েলকাম' বলবে তুমি?

সুজি হেসে বলল, ইয়েস। ইউ আর ওয়েলকাম।

চার.

দশতলা রিসোর্টটা সি বিচের খুব কাছে, এত কাছে যে জেগে থাকলে যেকোনো জাগা থেকেই তার ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ ব্যালকনিতে সবচেয়ে জোরে হয়, আর যত ভেতরে যাওয়া যায় শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে, কিন্তু হারায় না। ফিসফিস করে কথা বলার মতো হলেও সেটা থাকে। রুমে বিছানায় শোয়ার পর বেশ একটা ঘুমপাড়ানিয়া সুরের মতো শোনায়। চেক ইন করার সময়

ম্যানেজার বলেছিলেন আর্কিটেক্ট এই রিসোর্ট-হোটেলের ডিজাইন আর অ্যাকুস্টিক সমুদ্রকে মনে রেখে করেছিলেন।

রিসোর্টের দশতলায় অনেক ঘর। বেশির ভাগই ডাবল রুম, কিছু ফ্যামিলি রুম আছে তিন কী চার বেড নিয়ে। ম্যানেজার বলেছিলেন এখানে বয়স্করাই বেশি আসেন, আর যেহেতু তাদের সঙ্গে ছেলেমেয়ে থাকে না সেই জন্য ডাবল রুমই বেশি। বয়স অনুযায়ী রিসোর্টগুলি চিহ্নিত করে রাখার মধ্যে সুবিবেচনা আছে, ভেবেছেন প্রৌঢ়। এক এক এজ গ্রুপের অভ্যাস, চাহিদা আর রুচি আলাদা। সবাই একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনা, কোলাহল সৃষ্টি হতে পারে। সব মনে রেখেছেন পরিকল্পনাবিদরা।

তাদের রুম পাঁচতলায়, ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সমুদ্র চোখে পড়ে। সামনে নীল শুধু নীল। তার ওপর সচল বিন্দুর মতো ওড়াউড়ি করে সাদা অসংখ্য সি গাল। কাছে এলে তাদের চিহিই ডাক শোনা যায়। সমুদ্র থেকে যে বাতাস আসে তার শীতল স্পর্শে শরীর মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়। এখানে আসার পর একদিনও একটু সময়ের জন্য এসি চালাতে হয়নি। আর এই জন্যই তো আসা তাদের।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে প্রৌঢ় বললেন, জোছনা ভেবে দেখো কেমন সৌভাগ্য আমাদের। এবার রিসোর্টে আসার আবেদন এত পড়েছে যে কর্তৃপক্ষকে লটারি করতে হলো। সেই লটারি জিতে গেল যারা তাদের মধ্যে আমাদের থাকা কি অলৌকিক ব্যাপার না?

প্রৌঢ়া বললেন, হ্যাঁ। অলৌকিক। আমরা কখনো লটারি জিতিনি।

প্রৌঢ় রুটি হাতে নিয়ে বললেন, সুজিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। সে না বললে আবেদন করার কথা মনে আসত না। সে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান খুঁজে পেয়ে বলেছে আমাদের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই এক ভালো দিক। প্রবলেম সলভিং আর ডিসিশন মেকিংয়ে তাদের জুড়ি নেই।

সেবাতেও খুব পারদর্শী। দেখছ না এখানে যারা কাজ করছে তারা সবাই কেমন এফিসিয়েন্ট। এই পর্যন্ত কমপ্লেইন করার মতো কিছু দেখতে পেলাম না।

প্রৌঢ় একটু উদাসীন হয়ে বললেন, মাত্র এক মাসের জন্য পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে চারদিন শেষ। দেখতে দেখতে মাস শেষ হয়ে যাবে। তখন ফিরতে হবে সেই অগ্নিকুণ্ডে। এয়ার কন্ডিশন্ড নাইটমেয়ার নামে একটা বই ছিল। কে যেন লেখক?

প্রৌঢ়া বললেন, হেনরি মিলার। তারপর নাক কুঁচকে বললেন, বড় নোংরা লেখক। সেক্স ছাড়া কিছু বোঝেন না। সবকিছু এত এক্সপ্লিসিট যে পর্নোগ্রাফির সঙ্গে পার্থক্য নেই।

প্রৌঢ় বললেন, চাহিদা আছে, তাই ওই ধরনের বই লেখেন। তারপর কী ভেবে বলেন, ক্যান ইউ রিমেম্বার আমরা শেষ কবে সেক্স করেছি?

প্রৌঢ়া চোখ কপালে তুলে বলেন, আর ইউ ক্রেজি? এই বয়সে ওই কথা মনে আসে কী করে? ইউ ডিসগাস্ট মি কিরণ। ইউ আর কুইয়ার। ইউ রিয়েলি আর।

প্রৌঢ় নড়েচড়ে বসে দুষ্টুমির হাসি মুখে নিয়ে বলেন, সেক্স ইজ ফরএভার। দ্য বেস্ট ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক অব মেন অ্যান্ড উইমেন। ওটা ডার্টি মনে করলেই ডিসগাস্টিং। তারপর মুখ সামনে নিয়ে বলেন, ভেবে দেখেছেন সেক্সই একমাত্র কাজ, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক, যা পুরুষ আর নারী যৌথভাবে সম্পন্ন করে। আর কোনো শিল্পকর্মের কথা ভাবতে পারেন আপনি যা এর সঙ্গে তুলনীয়?

প্রৌঢ়া কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর বলেন, হ্যাঁ তাই তো। আমি বিষয়টাকে এভাবে দেখিনি। আ ভেরি নিউ আইডিয়া। নিউ পার্সপেক্টিভ অন সেক্স। তারপর হেসে বলেন, আপনার সঙ্গে একমত হচ্ছি বলে মনে করবেন না আই অ্যাম এগ্রিয়িং টু মেক লাভ উইথ ইউ টু নাইট। তারপর হো হো করে হেসে বললেন, এই অশীতিপর শরীর নিয়ে লাভ মেকিং হয়? ইউ মাস্ট বি ক্রেজি। ইউ হ্যাভ গন বোনকারস। টক সামথিং এলস। ইট ইজ সাচ আ বিউটিফুল ডে।

প্রৌঢ় চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের ফুলদানি থেকে লাল গোলাপ হাতে নিয়ে প্রৌঢ়ার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে ফুল বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, জোছনা উইল ইউ ম্যারি মি?

বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ়া ত্রস্তে চাপা গলায় বলেন, কিরণ হচ্ছে কী? ইউ আর ক্রিয়েটিং এ সিন। পিপল আর লুকিং অ্যাট আস। উঠে আসুন। উঠে আসুন। এই বয়সে ছেলেমানুষি মানায় না। ডোন্ট মেক ইওরসেলফ আ লাফিং স্টক।

প্রৌঢ় বলেন, বাট আই অ্যাম সিরিয়াস। আমি সত্যি সত্যি প্রপোজ করছি। সে ইউ উইল ম্যারি মি।

পঞ্চাশ বছর লিভ টুগেদার করার পর বিয়ের কথা মনে এল কেন? আর উই নট হ্যাপি অ্যাজ উই আর? কিরণ আর ইউ নট হ্যাপি উইথ আওয়ার পার্টনারশিপ?

আই অ্যাম। আই অ্যাম। কিন্তু বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হলে কেমন হয় জানতে ইচ্ছে করছে। বিবাহিত জীবনটা বাকি থাকে কেন? দেখি না কেমন লাগে।

প্রৌঢ়ার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে প্রৌঢ়ার বাড়িয়ে দেয়া গোলাপ হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, আই ডু।

ব্রেকফাস্ট করছিল যারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলেন। করতালিতে গমগম করে উঠল হলঘর।

হন্তদন্ত হয়ে ম্যানেজার যখন ঘরে ঢুকলেন জোছনা আর কিরণ তখন আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চুমু খাচ্ছেন। ম্যানেজার কাছে এসে হাঁফাতে

Jamuna Bank

EID OFFER

with Jamuna Bank Credit Cards.

Lalbut Arong 15%	Apex 15%	Article 10%	Artisan 10%	Bishwo Rang 10%	Bowling 10%
Cats Eye 10%	Dorjibari 10%	Easy 10%	Ecstasy 10%	Gentle Park 10%	Infinity 15%
Le Reve 10%	Lotto 10%	Lubnan 15%	Rich Man 15%	Sailor 10%	Spark Gear 10%
Top Ten 10%	Top Ten 10%	Vero 10%	Vibrant 10%		
unimart 10%	Agora 10%	Amana Big Bazar 10%	Chaldal 10%	foodpanda 15%	Meena Bazar 15%
10%	10%	15%			
Amaya Amari Dhaka Pay 1 Eat 4	Beyond Buffet Pay 1 Eat 3	Canari Park Pay 1 Eat 2	Crowne Plaza Dhaka Gulshan Pay 1 Eat 3	Dhaka Regency Pay 1 Eat 2	Grand Sylhet Pay 1 Eat 2
Hotel Agartha Pay 1 Eat 5	Holiday Inn Pay 1 Eat 3	InterContinental Dhaka Pay 1 Eat 2	Lakeshore Heights Pay 1 Eat 4	Le Meridien Dhaka Pay 1 Eat 2	Pay 1 Eat 3
Radisson Blu Gulshan Avenue Pay 1 Eat 4	Radisson Blu Dhaka Water Garden Pay 1 Eat 2	Renaissance Dhaka Gulshan Hotel Pay 1 Eat 2	Rose View Hotel Sylhet Pay 1 Eat 2	Sheraton Pay 1 Eat 2	Sky City Hotel Pay 1 Eat 2
The Westin Dhaka Pay 1 Eat 2					

Enjoy maximum Cash Back of Tk 1,500 per Merchant (Fashion & Grocery) and Dine upto Pay 1 & Eat 5 on selected Restaurants

*Applicable to all Credit Card Users for POS and Online Purchases.

*Conditions Apply

হাঁফাতে বললেন, দিস ইজ দ্য থার্ড ম্যারেজ হিয়ার দিস মান্থ। কংগ্রাচুলেশনস টু বোথ অব ইউ। কিন্তু আমাকে আগে থেকে জানানো উচিত ছিল। আমার কিছু করণীয় আছে।

জোছনা আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কিরণকে বললেন, কিরণ শোনো ম্যানেজার কী বলছেন।

কিরণ রুমাল দিয়ে ঠোঁটের লিপস্টিক মুছতে মুছতে ম্যানেজারকে বললেন, হঠাৎ করে হয়ে গেল। বলতে পারেন এই রিসোর্টের প্রভাব।

ম্যানেজার কৃতার্থ হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, এতটা, আমাদের স্পেশালিটি। অনেক ডিভোর্সি এখানে এসে আবার বিয়ে করেন।

কিরণ বললেন, কিন্তু আমরা ডিভোর্সি নই। উই ওয়্যার পার্টনার্স ফর লং ফিফটি ইয়ার্স। লিভ টুগেদার করেছি।

বিয়ে এই তো প্রথম? ম্যানেজার দুহাত বাড়িয়ে দুজনকে বরণ করে নেয়ার ভঙ্গিতে বলেন।

তা বলতে পারেন। কিন্তু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা কিছু হয়নি এখনো।

ম্যানেজার দুজনের গালে চুমু দিয়ে বলেন, লিভ দ্যাট টু মি। সব আয়োজন রিসোর্ট থেকে করা হবে। বিয়ে, ডিনার, সি ক্রুজ, হানিমুন। সবকিছু নিয়ে দারুণ প্যাকেজ।

কিরণ স্বর নামিয়ে বলেন, আমাদের কিন্তু বাজেট খুব কম। বোথ পেনশনার্স।

ম্যানেজার মাছি তাড়াবার মতো ভঙ্গি করে বলেন, হু ইজ টকিং অ্যাবাউট বাজেট? ইট ইজ অল অন দ্য হাউজ। সব দায়িত্ব আর খরচ আমাদের। জাস্ট লিভ ইট টু মি। রিলাক্স। জীবনে প্রথম বিয়ে করছেন, একটু ঘটা না করলে কেমন দেখায়? আমরা আছি কী করতে?

কিরণ জোছনার কাছে গিয়ে স্বর নামিয়ে বলে, এ দেখি ঝামেলায় পড়া গেল। টাকা লাগবে না বললেই হলো? শেষে একটা মস্ত অংকের বিল হাতে ধরিয়ে দেবে।

তাহলে কী করবে কিরণ?

কিরণ একটু ভেবে বলে, ম্যানেজারকে বলি আমরা তামাশা করছিলাম। প্লে অ্যাক্টিং।

জোর গলায় বলল জোছনা, নো। কিরণ ইউ কান্ট ডু দ্যাট। ইউ জাস্ট প্রপোজড টু মি। অ্যান্ড আই অ্যাকসেপ্টেড। সবাই দেখেছে। হাততালি দিয়েছে। নাউ ইউ কান্ট গো ব্যাক। আমাদের বিয়ে হবে। বলে সে হাসি মুখে ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল, গো অ্যাহেড ম্যানেজার। আপনিই কন্যা প্রদান করবেন। আপনার প্যাকেজ খুবই চমৎকার। আমাদের পছন্দ হয়েছে।

কথা শেষ করে জোছনা কিরণের কাছে গিয়ে বলল, মুখ অমন গোমড়া করে রেখো না কিরণ। উই আর ম্যারিয়িং, নট ডিভোর্সিং। ওহ হোয়াট আ ওয়ানডারফুল লাইফ।

সেই রাতে ব্রাইডাল বেডে দুজন শুয়ে ওপরে স্বচ্ছ কাচের ছাদ দিয়ে আকাশ দেখল। ঘরে তখন বাজছে রোমান্টিক মিউজিক। ম্যানেজারের চয়েস। খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে আসছে সমুদ্রের পানিভেজা শীতল বাতাস। জোছনা কিরণকে জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক রবার্ট রেডফোর্ড আর জেন ফন্ডার মতো।

কিরণ তখন বাজেটের কথা ভাবছে। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে বলল, তাদের মতো কি?

আহ! মনে নেই? বুড়ো বয়সে বিয়ে করে তারা বিছানায় এইভাবে শুয়েছিল।

কিরণ হাই তুলে বলল, সেটা তো সিনেমা।

বিছানায় উঠে বসে জোছনা বলল, কিরণ ডোন্ট বি আ কিলজয়। এটা আমাদের হানিমুন। আওয়ার ভেরি ফার্স্ট হানিমুন।

কিরণ এক হাতে জোছনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ফিলিংসটা সত্যি ভিন্ন। ওয়াইফ আর পার্টনারের মধ্যে বেশ তফাত আছে।

জোছনা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, সেই জন্যই তো আমরা বিয়ে করলাম। দুটো অভিজ্ঞতাই হলো। একটাই তো জীবন।

বিয়ের পরদিন আরেক সুখবর পাওয়া গেল। রিসোর্টে তাদের থাকার মেয়াদ আরো দু মাস বাড়ানো হয়েছে। এর পিছনেও ম্যানেজারের হাত আছে মনে করল নতুন দম্পতি। চেক আউটের সময় সে হাতে একটা বড় বিল ধরিয়ে না দিলেই হয়। জোছনা যতই বলে ম্যানেজার সত্যি সত্যি সব খরচের ব্যবস্থা করেছে রিসোর্টের পক্ষ থেকে, কিরণের মনের আশঙ্কা যায় না। সে ঘুমের মধ্যেও দেখে ম্যানেজার বিল নিয়ে তার পিছনে দৌড়ে আসছে। পিছনে তার রোবট বাহিনী।

পাঁচ.

তিন মাস পর বাড়িতে এসে দরোজার কি হোলে চাবি দিয়ে ঘুরাবার আগেই দরোজা খুলে গেল। দেখা গেল দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফুট লম্বা দুই টিকটিকি। লাল মুখ বের করে হিস হিস শব্দ করছে। বেশ হিংস্র দেখাচ্ছে তাদের। সাদা লম্বাটে বুকে রক্ত এসে জমেছে।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল কিরণ। বিস্ফারিত চোখে দেখল তার বাড়ির দরোজায় দাঁড়িয়ে দুই টিকটিকিকে। হুমকি দিচ্ছে তারা, যেন কিরণ আর জোছনা ট্রেসপাস করতে যাচ্ছে।

জোছনা বলল, অবিকল ডায়নোসরের মতো দেখাচ্ছে। স্পিলবার্গের সিনেমা যেন।

কিরণ দাঁত কিড়মিড় করে বলল, দিস ইজ রিয়েল। ওদের গরম নিশ্বাস এসে ঝলসে দিচ্ছে মুখ। দিস ইজ রিয়েল। নট কম্পিউটার জেনারেটেড। এখন সুজি পারে এর ব্যাখ্যা দিতে। তাকে বলে গিয়েছিলাম মাঝে মাঝে এসে যেন বাড়ি দেখে যায়। সে কি কিছুই দেখেনি?

জোছনা বলল, ফোন করো তাকে। শোনো কী বলে। এ তো মস্ত ঝামেলায় পড়া গেল। বলে সে ফুটপাতে সুটকেসের ওপর বসে পড়ল। তার পা শরীরের ভার নিতে পারছে না।

কিরণ একটু পর ফোনে সুজিকে পেয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল, হ্যালো, সুজি। ইয়েস উই আর ব্যাক। কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে পারছি না। টিকটিকি দুটো দরজা আগলে রেখেছে। এত বড় হলো কী করে তারা এই তিন মাসে?

ওপাশ থেকে সুজি বলল, জিএম ফুড খেয়ে।

তুমি আমাদের কিছু জানালে না। তোমাকে বলে গিয়েছিলাম মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে। মনে ছিল না বুঝি?

থাকবে না কেন? বাড়ির অবস্থা দেখার পর আমি তোমাদের জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রিসোর্টের ম্যানেজার নিষেধ করলেন। বললেন, তোমরা হানিমুন করছ, এই সময় খারাপ খবর দেয়া ঠিক হবে না।

তাই বলো। আমি জানতাম তুমি দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু আমরা এখন ঢুকব কী করে? ওদের বের করে দেয়ার জন্য কাউকে বলো।

সুজি বলল, কর্তৃপক্ষ জানে তাদের কথা। তাদের সরানো যাবে না। সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ওখানেই থাকবে। কনভেনশন অন বায়োডাইভারসিটিতে স্বাক্ষরকারী হিসাবে এদেরকে ডিস্টার্ব করতে চায় না কর্তৃপক্ষ।

আমরা তাহলে যাব কোথায়? হোয়াট অ্যাবাউট আস? আমরাও তো এন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস হয়ে গিয়েছি।

সে ব্যবস্থাও হয়েছে। তোমাদের ওল্ড হোমে নিয়ে যেতে বাস আসবে। আমি ফোন করে দিচ্ছি। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো।

পাঁচ মিনিট পর বাস এসে থামল কিরণ আর জোছনার পাশে। তাঁরা সুটকেস নিয়ে বাসে উঠে দেখল তাদের বয়সী আরো মানুষ বসে রয়েছে। কেউ কথা বলছে না। সুজির মতো একজন তাদের সিট দেখিয়ে বসতে বলল হাসিমুখে।

সিটে বসে কিরণ বলল, একটাই ব্রাইট সাইড। ওল্ড হোমে মনে হয় ইউটিলিটিজ বিল আগের মতো হবে না।

জোছনা বলল, তা হয়তো হবে না। কিন্তু প্রাইভেসি থাকবে না।

প্রাইভেসি? প্রসিভেসির কী আছে? সবাই যেমন থাকে আমরাও সেভাবেই বাস করব ওল্ড হোমে।

উফফ কিরণ! তুমি ভুলে গেলে উই জাস্ট গট ম্যারিড। হানিমুনের মুড এখনো রয়ে গিয়েছে। মুডটা নষ্ট করো না। জাস্ট রিলাক্স।

লেখকের আঙুল ফুঁড়ে

কিষী তাহ্‌নিন

লেখকের নাম জাফর আহমেদ সোহাগ। চাঁছা ঝকঝকে নাক, ঢেউ খেলানো চুল, হাসিটা সাধারণের চেয়ে আলাদা, আত্মায় টুক করে খোঁচা দেয়, আনন্দভাব জাগে। লেখক হাসলে মনে হয় পুরো দুনিয়াকে সাথে নিয়ে সে হাসছে। যতদিন সে তার সুন্দর হাসির বিষয়ে সচেতন ছিল না, ততদিন অপ্রয়োজনে খুব একটা হাসত না। এখন যেমন প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে অহেতুক হাসি হাসে। স্কুলজীবনে মাঠে বন্ধুদের সাথে মাত্রাহীন পিটাপিটি শেষে জিতে যাওয়ার নির্মম আনন্দে যে হাসি হাসত, তার নাম ছিল 'হায়েনার হাসি'। কাউকে বেধড়ক পিটিয়ে উল্টো করে মাঠে শুইয়ে দিয়ে সোহাগ আর বন্ধুরা মিলে বলত, 'ল এবার হায়েনার হাসি দেই। হা হা হা হো হো হো হি হি হি।' সে হাসির প্রশংসা কেউ করেনি কখনো। সে সময় ছিল বড্ড উন্মাতাল, প্রশংসা তখন বিনয়ের সমার্থক, আর বিনয় অর্থ স্রেফ পরাজয়। ওসবের ধার ধারেনি ক্লাস নাইনের চ্যাংড়া খ্যাপাটে সোহাগ। কিন্তু কলেজের শেষের দিকে সাহিত্য যখন পেয়ে বসেছে, খানিকটা প্রেমবোধও, অনর্থক বাহাস আর মারপিটকে রুচিহীনতা মনে হচ্ছে, কবিতা কিংবা প্রেম টানছে তখন। বন্ধুদের সামনে যদিও তা বলার সাহস হতো না। বললে ভেড়া বলে ডাকবে, হায়েনার হাসি হাসবে, নারীদের পাছা আর বুক নিয়ে ফিসফিসানি আলোচনায় তার মেয়েলি ব্যক্তিত্ব নিয়েও একচোট আলোচনা হবে। কী দরকার! এমন একসময়ে এসে কেমিস্ট্রি ক্লাসে একদিন রুমানা ম্যাডাম বললেন, 'এই যে সুন্দর হাসির ছেলেটা এই তুমি, জাফর না তোমার নাম? দাঁড়াও, কথা বলছ কেন? বলত কী বলছিলাম এতক্ষণ?' সুন্দর হাসির ছেলেটাতে মন গেঁথে গেল চ্যাংড়া সোহাগ ওরফে আজকের নামজাদা লেখক জাফর আহমেদ সোহাগের। তার মিচকি হাসিটুকু, আড়াল হতে হতে খানিকটা প্রকাশিত কৃপণ হাসিটি বহুদিনের চর্চায় এখন জমজমাট। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ লেখক জীবনের ভক্তকুল জাফর আহমেদ সোহাগের হাসির ফুলঝুরিতে ডুবে যায়। গত ঈদ সংখ্যায় ভোরের আকাশ পত্রিকায় এক বিশাল সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল লেখকের। শিরোনাম ছিল হাসিতে আর সাহিত্যে সেরা—জাফর আহমেদ সোহাগ। নিন্দুকেরা বলে, ওই হাসি দিয়ে পটিয়ে নাম কেনে আর ভক্তের সংখ্যা বাড়ায়। নইলে কী আছে এমন ওর লেখাতে? কী নেই! সেটাও অবশ্য তারা বলতে পারে না। ভক্তরা

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখকের। লেখকের লেখায় বিদ্রোহ ভরপুর। পাঠকেরা শক্তি খুঁজে পায়। আর নিন্দুকেরা খোঁজে কী নেই, কী নেই? এমন ঢাউস ঢাউস বই লেখকের, নিন্দুকদের সময় কই ওসব তাত্ত্বিক আলোচনা করে সে লেখাকে খারিজ করে? অমন ধৈর্য, সময় আর সাহস কারো নেই। সমালোচনা এ দেশে চায়ের কাপেই চলে, কাগজে লিখে গুছিয়ে সমালোচনা এ দেশে কেউ করেও না ওসবের ডিমান্ডও নেই। তাই বইমেলার আড্ডায় ফ্রিতে পাওয়া বিড়ি-চা ফুঁকতে ফুঁকতে আর দূর থেকে লেখককে স্টলে স্তূপ বইয়ের মধ্যে ডুবে অটোগ্রাফ দিতে দেখতে দেখতে, কিংবা পয়সাওয়ালা কোনো লেখকের বাড়িতে মুরগির রান আর দু পেগ হুইস্কির মাঝে, 'ধুর ওই শালার লেখা হয় নাকি?' বলা পর্যন্তই এদের দৌড়। এর বেশি সাহিত্য সমালোচনা এ দেশে এগোয় না। তবে লেখকের কাছাকাছি এলে ঘিয়ে মাখনে যে গলে গলে যায় সবাই, চা-বিড়িতে ঝড় তোলা ওই নিন্দুকেরাও, সেও সত্য।

লেখক সাহেব অবশ্য এসব নিয়ে ভাবে না এখন আর। লেখক হতে তাকে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দুই দলের আন্দোলনে ছুরির আঘাতে জবা নামের এক মেয়ে মরে যায়। সেই নিয়ে ক্যাম্পাসজুড়ে শোরগোল, তার মাঝে মধুর ক্যান্টিনে বসে হুট করে লিখেছিল, টিনের তলোয়ার নামের এক কবিতা। দুটো লাইন তো হিট হয়ে গেল।

টিনের তলোয়ার কেঁপে ওঠে আজ
রক্তজবার আকরে।

সেই থেকে শুরু। হৈ হৈ করে উঠল চারপাশের সকলে, ভালো তো ভালো তো। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে স্লোগান হিসেবে ব্যবহার হলো সে লাইনগুলো। তারপর পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশকদের আবদার। সেই আবদার মেটাতে যেয়ে লেখক হয়ে ওঠা। কবিতা ততদিনে পালিয়েছে, পুরোদস্তুর ঔপন্যাসিক আর গল্পকার হিসেবেই সুনাম ছড়াচ্ছে। সংগ্রাম আর জীবনের চাঁছাছোলা গল্প। তাতে একটু প্রেম, একটু যৌনতা যা যা থাকলে রঙ্গ-রস পূর্ণ হয় তা থাকে, মাপমতন। ভাষার জাদুতে কিংবা কৃপণ হাসির টানে কিংবা দুয়ের মিশেলে জাফর আহমেদ সোহাগ হয়ে উঠল নন্দিত-নিন্দিত। লিখতে বেগ পেতে না হলেও নাম নিয়ে ভারি যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে। এ দেশে লেখকদের দুই শব্দের নামের চল। প্রথমে ভাবল শুধু জাফর আহমেদ থাকুক, বন্ধুরা বলল, 'হুমায়ূন আহমেদের মতন নক্ষত্রের আড়ালে চাপা পড়ে ভর্তা হয়ে যাবি।' 'জাফর সোহাগ?' 'উহু কেমন প্রেম প্রেম সস্তা।' আহমেদ সোহাগ, সোহাগ জাফর সব ঘেঁটেঘুঁটে অতঃপর আদিতেই দফা হলো ভালো নাম ডাক নাম জুড়ে জাফর আহমেদ সোহাগ। জমে গেল নামটা।

নিজের মতন করে লিখে যায়। পত্রিকার ঈদ সংখ্যা আর বিশেষ সংখ্যার জন্য লেখে, ভারী পারিশ্রমিক ছাড়া লেখে না। লেখকদের আড্ডা এড়িয়ে চলে, তবে প্রকাশক আর খানদানি লেখকদের নিমন্ত্রণে যায়। সাহিত্য পুরস্কার পেলে সে অনুষ্ঠানে যায় নতুবা নয়। দুই-তিনজন ভালো বন্ধু জুটেছে এ সাহিত্য সমাজে তাদের সাথে নিজ বাড়িতে দামি মদের আসর বসিয়ে আড্ডা দেয়। বছরে একবার ছেলেকে নিয়ে বিদেশ ট্যুর দেয়া হয়। ডিভোর্সের আগে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে যেত দেশ-বিদেশ। এখন একাই ঘোরে। ইচ্ছে হলেই কক্সবাজার, সিলেট নেপাল চলে যায়, মন-মগজ ঠাণ্ডা করে ফিরে এসে লিখতে বসে। একগাদা অ্যাডভান্স নেয়া থাকে প্রকাশকদের কাছ থেকে। নিয়ম করে না লিখে তো উপায় নেই তার। পারিবারিক ব্যবসা আছে, গাড়ি বেচাকেনার শোরুম। দুই ভাই আর সে মিলে চালায়। লেখালিখির ব্যস্ততার মাঝে সপ্তাহে দুই-তিনবার অফিসে যায়। বড় ভাইয়েরা ব্যবসা সামলে নিচ্ছে বরং ছোট ভাইয়ের এই নামডাক পরিচিতির কারণে খদ্দের আসে আগের চেয়ে বেশি। তাই ছোট ভাই ব্যবসায় সময় তেমন না দিলেও তার নামটা বড় কাজে লাগছে।

'সকালের পাখি' পত্রিকার ঈদ সংখ্যার লেখা লিখতে যেয়ে ঘটনার শুরু। ডান হাতের আঙুলগুলোয় তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। পত্রিকা কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছে অগ্রিম নভেলা লেখার জন্য। প্রেমও দ্রোহের গল্প চায় তারা। নরসিংদীর রাজু ফকিরের বাস্তুহারা হওয়ার ঘটনা সে পত্রিকায় মনোযোগ দিয়ে ফলো করেছে। রাজু নাকি ঢাকায় এসেছিল ব্যবসার কাঁচামাল কিনতে, শাহবাগের গার্মেন্টস শ্রমিক-মালিক আন্দোলনে ডাণ্ডার বাড়িতে অচেতন হয়ে ঢাকা মেডিকেলে মরেছে। রাজুর খালাতো ভাই তাকে ঢাকায় দাফন করেছে বলে নিশ্চিত করেছিল। আর তিন বছর পর জলজ্যান্ত রাজু ফিরে এসে দেখে মা তার স্ত্রী আর ভাইদের মাঝে জমি ভাগ করে দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর খবর জেনে এক বছর শোক পালন করে তার স্ত্রী জুলেখা, দেবরকে মানে রাজুর ছোট ভাই সাজুকে বিয়ে করেছে। জুলেখার ভাগে পাওয়া জমিতে এখন ভরপুর ফুলকপির চাষ করছে রাজুর ছোট ভাই, জুলেখার একসময়ের দেবর মানে বর্তমান স্বামী। রাজুকে তিন বছর পর দেখে তার মা মিনিট দুয়েক গলা ফাটিয়ে কেঁদেছিল, তারপর অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। মা জানে না রাজুকে কীভাবে ফিরিয়ে নেয়া যায়? চারপাশজুড়ে প্রশ্ন, তবে মরল যে ঢাকায়, সে কে ছিল? এতদিন কোথায় ছিল রাজু? একরাতের জন্য নিজের বাড়িতে না থাকতে পারার অভিমানে আর প্রত্যাখ্যানের ভারে বাড়ির পাশের সেই ফুলকপির খেতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল রাজু ফকির। সত্যিই মরল এবার রাজু ফকির, সন্দেহের অবকাশ থাকল না। এ গল্পটা রাজু ফকিরের বয়ানে লেখার কথা ভাবছিল লেখক, ভেবেছিল সাথে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কিছু রূপক জুড়ে দিয়ে চমকে দিবে পাঠকদের। গল্পটা উপেক্ষা আর অনাদরের গল্প। এর মাঝে প্রেম আসবে কেমন করে! প্রেমকে বাদ দিয়েই লিখতে বসেছিল সে সকালে। লিখছিল এক স্বস্তির মৃত্যু কীভাবে সম্পত্তি বাটোয়ারার রাজনীতিকে সফল করল। ছুটির দিন সেই দিন, টানা লিখে দুপুর পর্যন্ত, ভাইদের সাথে আড্ডা দিয়ে ভরপেট কাচ্চি খেয়ে ঘুম। উঠে লিখতে বসল যখন আবার, ডান হাতের আঙুলগুলো বড্ড ভারী হয়ে উঠছে। সারাদিন টানা লিখেছে। আঙুলগুলো ক্লান্ত, লেখা থামিয়ে পড়তে থাকল। কী লিখল এতক্ষণ! লেখক একবার বারবার পড়তে থাকে, একী এ তো ভরপুর ফুলেফেঁপে ওঠা এক প্রেমের গল্পের দিকে বাঁক নিচ্ছে! গল্পটা রাজুর নেই, জুলেখার হয়ে উঠছে। কাদামাটি মন নিয়ে এ সংসারে এসেছিল জুলেখা। পাশের বাড়ির চৌকোনা টিভিতে শাবানা জসিমের সিনেমা দেখে প্রেম ছলছল কণ্ঠে স্বামী রাজু ফকিরকে বলেছিল, 'আমারে একটা ফুল কিন্যা দিবা?' রাজু ফকির মুখ বাঁকিয়ে কেঁপে উঠছিল, 'তুই কি বেশ্যা?' বেশ্যা মাগীরা ফুল দিয়ে সাইজ্যা খদ্দেরকে খুশি করে। আর কোনো এক ভরদুপুরে উঠোনে ভাতঘুমে এলিয়ে যেতে যেতে কেঁপে উঠেছিল মেঘের গর্জনে। মুরগিগুলাকে খোয়াড়ে ঢোকাবে বলে উঠোনের এমাথা-ওমাথা হুড়হুড় দৌড়াতে দৌড়াতে থমকে দাঁড়াল। ঝড় মাথায় নিয়ে উঠোনের কোনায় দাঁড়িয়ে আছে দেবর সাজু ফকির। হাতে এই এক তোড়া কচুরিপানার ফুল। 'নিবা নাকি, বিল থেইক্যা তুইল্যা আনলাম।' কেঁপে ওঠে জুলেখা, আমার জন্য আনছ গো?

পরদিন তার পরদিন আঙুলগুলোর ভারী ভারী ভাবটা রয়ে যায় সাথে জুড়ে পিনপিন ব্যথা। তা উপেক্ষা করে লিখে যায় লেখক। শেষ লাইনে যেয়ে লেখে, 'সেই বাড়ি যেন বিরান ভূমি, ধড়াম ধড়াম নিস্তব্ধতার শব্দ, কান পাতলেই শোনা যায়।' রাজু ফকিরের শরীরের নীল বিষাক্ত ঘ্রাণে নিথর পরে আছে ফুলকপির খেত, সদ্য মৃতদেহটার মতন। আর উল্টো পাশে বিলে জেগে থাকা কচুরিপানার ফুল বিষের ঘ্রাণে কাঁপছে। এই যে ঠিক মাঝখানটায় জুলেখা। কোন পথে যাবে ভাবছে। সম্পাদক তো সেই নভেলা পড়ে ধেই ধেই নাচ জুড়ে দেয় প্রায়।

'বস লিখছেন কী! আপনি নাকি প্রেমের গল্প লিখতে পারেন না!'

'নাহ পারি না তো।'

'লিখলেন ক্যামনে?'

'ওই আর কী। কষ্ট হইছে। আঙুলে যে ব্যথা।'

'বস আপনাকে আরো দশ হাজার দেয়ার কথা ছিল। দিয়ে দিব, ইফতার পার্টির দিন। আসতেছেন তো? এবার গুলশান ক্লাবে পার্টি করব বলে ঠিক করেছি।'

ডানহাতের আঙুলগুলোয় তিরতিরে ব্যথা, হাতের পাতার দিকে

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রতিষ্ঠান

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি : এর

উৎপাদিত চিনি, ভিনেগার, ডিনেচার্ড স্পিরিট ও অন্যান্য ডিস্টিলারী পণ্য ব্যবহার করুন

১। চিনি :-

- আখ হতে উৎপাদিত স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কেরুজ চিনি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
- কেরুজ উৎপাদিত দেশীয় চিনি ১ কেজি/২ কেজি প্যাকেটে বাজারজাত হচ্ছে।

২। ভিনেগার :-

- কেরুজ মল্টেড ও সাদা ভিনেগার বাজারের সেরা।
- গুণে মানে ও স্বাদে অতুলনীয়।
- আচার, সস্ সংরক্ষণে অদ্বিতীয়।
- সুস্বাদু সালাদ তৈরিতে সর্বোত্তম।
- পরিপাকে সাহায্যকারী।

৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট :-

- কেরুজ ডিনেচার্ড স্পিরিট গুণে মানে অতুলনীয়।
- বার্নিশের কাজে কেরুর ডিনেচার্ড স্পিরিট ব্যবহার করুন।

৪। কেরুজ জৈবসার :-

- মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং মাটির বুনট ও গঠন উন্নত করে।
- মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে ও মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- গাছের পুষ্টি ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।
- মাটির অম্ল ও ক্ষারের সমতা বিধান করে।
- মাটির দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- কেরুজ জৈবসার দেশের একমাত্র সালফার সমৃদ্ধ জৈবসার-এ সার শতকে ২-৩ কেজি হারে প্রয়োজন করলে বাড়তি কোন সালফার ব্যবহার করতে হবে না।

৫। কেরু'জ হ্যান্ড স্যানিটাইজার

- হাত এবং ত্বক জীবাণুমুক্ত করণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল জীবাণুনাশক সলিউশন।

৬। আমাদের উৎপাদিত অন্যান্য ডিস্টিলারী পণ্য ববহার করুন।

কেরুর পণ্য
গুণে মানে অনন্য

"বীমা ফসল হিসেবে অধিক আখ
আবাদ করে অধিক লাভবান হউন।"

কেরুর পণ্য
কিনে হউন ধন্য

বহুমুখী সেবার মাধ্যমে আমরা জনগণের বন্ধু হতে চাই।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লি :

(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

ডাকঘর : দর্শনা, জেলা : চুয়াডাঙ্গা।

পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে
সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী-কে

ঈদ মোবারক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

গণমানুষের ব্যাংক

তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আঙুলগুলোকে দেখতে দেখতে মনে হয়, নাহ এবার পাক্কা দুই সপ্তাহ বিশ্রাম। অনেক ধকল গেল। ঈদের পরের দিন ব্যাংকক চলে যাবে তখন আরো এক সপ্তাহ ছুটি। অনেক লেখা হলো এবার, পত্রিকাগুলো যা টাকা দিচ্ছে তাতে ব্যাংকক ভ্রমণের অর্ধেক খরচ উঠে যাবে। কাকে সঙ্গী করবে ভাবছে। মিলিয়াকে বলা যায়। রাজি হয়ে যাবে, অনেক দিন ধরেই বলছিল, সোহাগ তোমাকে অন্যদেশে অন্য কোথাও এক্সপ্লোর করতে চাই। তা এক্সপ্লোর করা ব্যাপারটা কী, তা বোঝার একটা কৌতূহল আছে। মৌয়ের সাথে যাওয়া যায়, আগেও দিয়েছে, সময় ভালো কাটে। কিন্তু প্রতিবার ফিরে এসে মৌ বড় জ্বালায়, শুরু করে ঘ্যানঘ্যান, প্রেম প্রেম উপসর্গে আক্রান্ত হয়। কিন্তু লেখক তো ট্রিপ থেকে ওইসময়ের ভালোলাগাটুকু নিয়েই শুধু ফিরে আসতে চান। সাথে যে মানুষটা ছিল, তার কথা ভাবে না, ভাবতে ইচ্ছে করে না। সময় নষ্ট অযথা টক ঢেকুরের মতন অস্বস্তি। প্রেমট্রেম যে এদের সাথে হবে না, আপাতত কারো সাথেই হবে না, সেটা স্পষ্ট করেই দেয় সোহাগ। আশেপাশে তার একা জীবন নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। ৪৬ বছরের ডিভোর্সি চাবুক হাসির মনোহরণ এমন লেখকের জীবনে কেন প্রেম আসছে না! বিয়ে কবে করবে আবার? নাহ, একা ব্যাংকক ঘুরে আসা সবচেয়ে নিরাপদ। নিজের ইচ্ছে মতন থাকা যাবে, ভাবা যাবে, ভিনদেশী কারো সাথে পরিচয়, সখ্য হলেও মন্দ না। সাথে খানিকটা ফুর্তি, শর্তহীন হ্যাপি এন্ডিং রোমান্স, সে গল্প সেখানেই শেষ। অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে। হাত ঝাড়া দিয়ে ধুয়ে মুছে দেশে ফিরে আসা যায়। ছুটি শেষে মুক্তি, ঘ্যানঘ্যানে ঝামেলাগুলো ঝুলে থাকে না। 'প্রেম চাই না শুধু ফুর্তি', এ কথা বললেও এ দেশের মানুষ মানতে চায় না। ফুর্তির পর 'প্রেম চাই প্রেম চাই' করে ঝুলোঝুলি শুরু করে। প্রেমে মন নেই লেখকের আপাতত। প্রেম মানে নাছোড়বান্দা মাথাব্যথা। ফুর্তিতে কাজ হয়ে যায় তার, মন খুশি থাকে কিছুদিন।

থাইল্যান্ডের ভিসা জমা দিতে যাবে বলে সকাল সকাল উঠল সেদিন, যাওয়া আর হলো না। লেখক বিস্মিত, ঘর আটকে একা বসে আছে। অনেকখানি ভয় আর তার চেয়ে বেশি বিস্ময় মিলেমিশে শরীর গুলিয়ে ওঠে। দুঃস্বপ্ন ভেবে ঘুমিয়ে পড়বে ভেবে আঙুলের দিকে তাকায়। কিন্তু এত দুঃস্বপ্ন নয়। ডান আঙুলের তিনটি আঙুলজুড়ে পাতা, মানে গাছের পাতা। মানে আঙুল চিরে আঙুল ফুঁড়ে গাছের পাতা—তর্জনী, মধ্যমা আর অনামিকার আশপাশচুরি পাঁচটি গাছের পাতা, কচি নরম। ছেঁড়া যাচ্ছে না। পাতার খানিকটা আঙুলের ভেতরে। আঙুলে কোনো ব্যথা নেই, এ ক'দিন যে অস্বস্তিকর ব্যথা ছিল তা কমে গেছে। আঙুল মুঠো করা যায়, বাঁকানো যায় কোনো সমস্যা নেই। শুধু তিন আঙুলজুড়ে পাঁচটি পাতা গজিয়েছে রাতারাতি, তিরতিরে জ্যান্ত গাছের পাতা! কাকে বলে এ কথা! কেমন করে বলে? শরীর ভালো নেই, ঘুমাচ্ছি, লিখছি এসব অজুহাতে ঘর থেকে বের হয়নি প্রথম দিন। ঘরের ভিতর বসে খাওয়া দাওয়া সেরেছে, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুইয়ে থেকেছে, যাতে ভাইদের চোখে না পড়ে। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া দালান, মেজো ভাই থাকে পাশের ফ্ল্যাটে, বড় ভাই ভাবি আর সে এক ফ্ল্যাটে। ডিভোর্সের পর থেকে এখানেই থাকে। তিনতলার নিজের ফ্ল্যাট আর দালানের বাকি ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া দেয়া। ঘরের কোনো কাজ নিয়ে ভাবতে হয় না। নিজের ইয়া বড় ঘর, বারান্দা অ্যাটাচড বাথরুম। সারাদিন ঘরে বসেই লেখে। অনেক অনেক সময় যায় এমন যে টানা দুইদিন ঘর থেকে বের হয় না, লিখে যায়। খাওয়া-দাওয়া আর চা নিয়ম করে ঘরের সামনে রেখে যায় বাড়ির মানুষ। এবার তিনদিনের মাথায় বড় ভাবি জোর করে ঘরে ঢুকল। পরিবারের মধ্যে ঘটনা চাউর হলো। এমন তাজ্জব ঘটনা কে কবে জেনেছে? গুগলে সার্চ করে উল্টেপাল্টে ফেলেছে লেখক এ কদিন, ট্রি গ্রোয়িং আউট অব ফিঙ্গার অব এ হ্যান্ড দিলে বাকোয়াস সব জিনিস দেখা যায়। হয় পরিবেশবাদী সাজানো-গোছানো ছবি যেখানে সবাই হাতের তালুতে গাছ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়তো প্রেমিক প্রেমিকাকে হাত বাড়িয়ে গাছ উপহার দিচ্ছে, এমন ইমেজ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

বড় ভাই লেখকের আঙুলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। 'আহারে আহারে ভাই। কষ্ট হচ্ছে?' লেখক আঙুলের দিকে তাকিয়ে দেখে পাঁচটি নয় পাতা বেড়ে এখন সাতটা।

ভাই বলে, 'চল ডাক্তারের কাছে যাই।'

'কী বলো ভাইয়া, আমি এই উৎকট সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে রাষ্ট্র হবে, সব পত্রিকায় ছাপা হবে। মার্কেট শেষ আমার।'

'ব্যাংকক যা। আমি বা মেজো কেউ একজন যাব নে তোর সাথে।'

'ভিসা করব কেমনে?'

'ক্যান ভিসা করতে কী সমস্যা?'

'এই হাত ভর্তি গাছ পাতা নিয়ে যাব ভিসা করতে!'

'গ্লাভস পরে যা। নইলে একটা হালকা ব্যান্ডেজ বেঁধে যা। বলবি ব্যথা পাইছিস।'

মেজো ভাই আর বড় ভাই অহেতুক বাহাস করে।

'এইটা কীসের পাতা?'

'বুঝতেছি না।'

'বরই পাতা নাকি?'

'পাগল নাকি, হাতের আঙুল ফুঁড়ে বরই হয়?'

সোহাগের কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। বরং হাতের আঙুলজুড়ে, আস্তে আস্তে শরীরজুড়ে থোকা থোকা বরই জন্মাবে, ভাবতেই শিউরে ওঠে।

মেজো ভাই এর মধ্যে ডাক্তার সাব্বির আলমগীরকে ফোন করেছে। সাব্বির ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, মেজো ভাইয়ের স্কুল বন্ধু, বারডেমের জেনারেল সার্জন। সে এসে চুপি চুপি ঘটনা দেখে যায়, বিশ্বাসযোগ্য মানুষ, কাউকে বলবে না হয়তো।

ডাক্তার সোহাগের হাত নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বলেন : 'বলব কী, এই ঘটনা জীবনেও দেখিনি! কী তাজ্জব!'

'কী করব বলেন তো সাব্বির ভাই?'

'তোমার ভাই বলল তোমার নাকি ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল, চলে যাও।'

'ওরা পারবে?'

'সেটা বুঝতে গেলে তো যেতে হবে। আমার দুই তিনটা ভালো হাসপাতালে জেনারেল সার্জন পরিচিত আছে। খুবই নামকরা। দেশ বিদেশ থেকে লোক যায়। আমি যোগাযোগ করে দেখি। তোমার হাতের ছবি তুলে পাঠাতে হবে।'

'হুম।'

'টেনশন করো না। আমি কারো সাথে শেয়ার করব না। তোমার কত নামধাম, এইসব জানলে মানুষজন ঝামেলা করবে। বুঝি তো।

লেখক টেনশন করছে না, মন দিয়ে আঙুল দেখছে। পাতা এখন নয়টা। আগে কয়টা ছিল সাতটা?'

আর এর মাঝে সামিরা ফোন করে একদিন। নম্বর সেভ করা ছিল না। স্ক্রিনে ভেসে আসা হোয়াটসঅ্যাপের প্রোফাইল ছবিতে সামিরাকে দেখে ভিরমি খাবার জোগাড় লেখকের। অন্যরকম ঘোরগ্রস্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে। সামিরা তো আসলে এমন অদ্ভুত সময়েই ফোন করবে। জীবন যদি কখনো আবার একঘেয়ে সাদামাটা লবণকম আলুভর্তা হয়ে যায়, সামিরাও হারিয়ে যাবে, বারবার যেমন যায়।

যেন কিছু হয়নি, এমন করেই বলল প্রথমে, 'হ্যালো লেখক খবর কী?'

'তুমি কোত্থেকে সামিরা?'

'মঙ্গল গ্রহ।'

'আমি অবাক হব না, তোমার পক্ষে মঙ্গলে যাওয়াও সম্ভব।'

'তোমার নাকি হাত পায়ে গাছ গজিয়েছে? এ কেমন অদ্ভুত কথা!'

'হুম, পায়ে না, শুধু হাতে। তোমাকে কে বলল?'

'সেটা বলব না।'

সোহাগ বুঝতে পারছে যে এ কথা গোপন রাখা অসম্ভব। যাক, এই সুবাদে সামিরা ফোন করল, এই তো অনেক।

'তুমি কই সামিরা? ঢাকা?'

'হু।'

'তোমাদের একতলা বাড়িটা এখনো আছে? হলুদ হলুদ ভাব।'

'বাড়ি নাই, অব্বা আম্মা ভাবে শোন পরে ফোন দিব।'

'দিবা তো?'

'দিব দিব রাখি।'

এর মাঝে থাইল্যান্ডের ভিসা করতে দেয়া হলো। কী একটা ঝামেলা চলছে, ভিসার সিস্টেমে পেমেন্ট নিতে দেরি হচ্ছে। এজেন্ট জানাল এক-দুই মাসও লাগতে পারে ভিসা পেতে। লেখক জরুরি কাজে বের হচ্ছিল হাতে ব্লুটুথ পরে। কদিন পর সেটাও সম্ভব হলো না। ছোটখাটো অসুখ একটা গুছে পরিণত হচ্ছে হাতটা, প্রয়োজনের চেয়েও জীবন্ত হাত নাচলে গুছ নাচে, হাত ভিজলে গুছ ভিজে, হাত ঘুমালে গুছ ঘুমায় কিনা কে জানে! জেগেই থাকে হয়তো, নতুন প্রতিদিন সকালে নতুন নতুন পাতা গজায় কীভাবে! এদিকে মাথার মধ্যে গুঁড়ো মাছের পোনার মতো হলহল করছে নতুন লেখার। যা লিখছে সবটুকুই জুড়ে প্রেম। পুরান ঢাকার বুরবুরে দালানে বাস করা এক বিধবার সিনেমার গ্রুপের প্রডাকশন বয়ের সাথে প্রেম, অন্ধ জাদুকরের সার্কাস দলের নাচের মেয়েটার সাথে প্রেম। যখন লেখা পৃথিবী ভালো যায় সে শান্তি পায়। আর এসবের মাঝে বাকি থেকে যাওয়া অর্ধ বিলুপ্ত যত কথা তরতর করে ডালপালা মেলে, সুমির যখন ফোন করে। সুমির যখন ফোন করে লেখক ভুলে যায় এই গুছগুলার জীবনের অনিশ্চয়তা ভাবে, এতবার না হারালে কি সে সুমিরা কে মনে মনে খুঁজত? যদি সুমিরা আর অন্যদের মতন হতো, সেহাগের সাথে শুধু একটু প্রেম করে বর্তে যাওয়া আর অন্যদের মতন?'

সেগুনবাগিচার একতলা একটা বাড়িতে থাকত সুমিরা ওরা বাবা মা ও এক, কোনো ভাই বোন নেই, বড্ড হ্যাপাটে ছিল সুমিরা গলির শেষ মাথায় থাকত সেহাগরা যে সময়টায় সেহাগের জীবনে কবিতা আর প্রেম, আর বাকিটুকু জুড়ে সুমিরা কত কথা, ল্যান্ডফোনে, লন্ড্রির পাশ ঘিরে যে সিঁড়ি তার ঠিক পাশে সবাইকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কখনো পড়ার জিঞ্জার নামের এক অখাদ্য ফাস্টফুড শপে বার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে খেতে যখন তার লেখা কবিতা পড়ার দেয়া হলো, সব মেয়েদের আরাধ্য সুন্দর হাসির সেহাগ, অমন সময় সুমিরা টুক করে চলে গেল বলে গেল, 'তুমি যখন আরো ভালো লিখবে, অনেক ভালো, সত্যি লেখক হবে, তখন দেখা হবে।' আর খুঁজে পায়নি সে সুমিরাকে। ওনাকি ইন্ডিয়ায় পড়তে চলে গিয়েছে, ওর বাবা-মা এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে

SHIMANTO BANK PLC.
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি.
সীমাহীন আস্থা

ব্যাংকিং হোক
সীমাহীন আস্থায়

আস্থা ও নিরাপত্তার ব্যাংক

সীমান্ত ব্যাংকে থাকুক আপনার কষ্টার্জিত সঞ্চয়

সীমান্ত ব্যাংকে মাসিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে
আপনিও হতে পারেন কোটিপতি

এসএমবিএল কোটিপতি ডিপোজিট স্কিম

সীমান্ত ব্যাংক কোটিপতি ডিপোজিট স্কিম একটি মাসিক ডিপোজিট স্কিম, যা গ্রাহকের কষ্টার্জিত অর্থ আকর্ষণীয় ইন্টারেস্ট রেটে মাসিক ন্যূনতম ২৩,৯২৮ টাকা জমানোর মাধ্যমে গ্রাহককে ভবিষ্যতে ১ কোটি টাকার মালিক হবার সুবিধা প্রদান করে।

এসএমবিএল মাল্টি-মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কিম

সীমান্ত ব্যাংক মাল্টি-মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কিম একটি মাসিক ডিপোজিট স্কিম, যা গ্রাহকের কষ্টার্জিত অর্থ আকর্ষণীয় ইন্টারেস্ট রেটে মাসিক ন্যূনতম ২৪,৯২০ টাকা জমানোর মাধ্যমে গ্রাহককে ভবিষ্যতে ৫০ লক্ষ টাকার মালিক হবার সুবিধা প্রদান করে।

এসএমবিএল মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কিম

সীমান্ত ব্যাংক মিলিয়নিয়ার ডিপোজিট স্কিম একটি মাসিক ডিপোজিট স্কিম, যা গ্রাহকের কষ্টার্জিত অর্থ আকর্ষণীয় ইন্টারেস্ট রেটে মাসিক ন্যূনতম ৪,৯৮৪ টাকা জমানোর মাধ্যমে গ্রাহককে ভবিষ্যতে ১০ লক্ষ টাকার মালিক হবার সুবিধা প্রদান করে।

বিস্তারিত জানতে আপনার নিকটস্থ সীমান্ত ব্যাংকের যেকোন শাখা বা উপশাখায় যোগাযোগ করুন অথবা ফোন করুন ১৬৭৯০ নম্বরে।

16790 shimantobank.com shimantobankbd

*শর্ত প্রযোজ্য

ধানমন্ডি নতুন ফ্ল্যাটে উঠেছে। কত কত খুঁজেছে। কেউ ইচ্ছে করে হারালে খুঁজে পাওয়া যায়? ওর বন্ধুদের কাছে কত মিনতি করেছে, 'কই আছে সামিরা? ফোন নম্বর, ঠিকানা কিছু দাও।' একটা ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল, চিঠির পর চিঠি লিখে একসময় থেমে গেছে সে। উত্তর আসেনি।

ভিসার কোনো খবর নাই। ভিসা হলেও এই আস্ত গাছ নিয়ে সে কেমন করে অন্য দেশে যাবে! হতাশ লাগে। বারডেমের ডাক্তার সাব্বির ভাই, থাইল্যান্ডে তার পরিচিত কয়েকজন ডাক্তারকে কেসটা জানিয়েছে। তারা অবাক হয়েছে, তারা চায় রুগী আসুক। তারা এ নিয়ে গবেষণা করবে, সমাধা একটা হবে হয়তো। ভিডিও কলে লেখকের সাথেও কথা হলো ডাক্তারদের। তারা থাই ভাষা আর ইংরেজি ভাষা মিলে যা বলে, পাশে বসে থাকা দোভাষী তা ঠিকঠাক ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেয়। তারা জানায় বিষয়টা অদ্ভুত নতুন, তারা আশ্বাস দেয় সব ঠিক হয়ে যাবে। তারা নানারকম টেস্ট দেয়, রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, এমআরআই কী কী সব। যতদিন ভিসা না হয়, তারা এসব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসার একটা খসড়া তৈরি করতে চায়। সাব্বির ভাই আশ্বাস দেয় ব্যবস্থা হবে গোপনে, কেউ জানবে না। তার পরিচিত প্যাথলজির লোক এসে বাসা থেকে রক্ত নিয়ে যায় পরীক্ষার জন্য। সাব্বির ভাইয়ের ভায়েরার ছোট্ট ক্লিনিক আছে আদাবরে। ভিড় জমার আগে সকাল সকাল গোপনে সাব্বির ভাই দাঁড়িয়ে থেকে বাকি সব টেস্ট করিয়ে দেয়।

সামিরা খুঁটিনাটি সব মন দিয়ে শোনে। প্রায়ই সে ফোন করে। ফোনে কথা হলে চিকিৎসার খবর জানতে চায়। তারপর কতদিকে কথার বাঁক ঘুরে যায়, হাসতে হাসতে দুজন যখন ফোন রাখে মনে হয় আঙুল ফুঁড়ে জেগে ওঠা গাছ একটা রূপকথার গল্প। এমন কিছু হয়নি কখনো।

সেদিন সামিরা ফোন করে বলল, 'শোনো আমি শুনেছি বার্সিলোনাতে একজনের অমন হয়েছিল। এন্টোনি হুগো তার নাম। তার আঙুলের গাছ থেকে ফুল হয়েছিল, জেসমিন ফুল। তারপর অনেকদিন পর সেই গাছ মরে গেল, আঙুল থেকে ঝরে গেল মরা গাছ। আঙুলগুলো সব ঠিকঠাক হয়ে গেল আগের মতন।'

'সত্যিই? কে বলল তোমাকে?'

'সে জেনে কী করবা? তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?'

'করি, ইয়েস।'

'তুমি কোন ফুল চাও সোহাগ?'

'আঙুলে?'

'হুম।

'কাঁঠালচাঁপা, তোমার প্রিয়।'

'এহ আমার প্রিয় এখন রজনীগন্ধা।'

'তবে রজনীগন্ধাই হোক। তোমার পছন্দ এত ঘনঘন পাল্টায় ক্যান সামিরা?'

'আচ্ছা রাখি'

'ফোন দিও।'

'দিব দিব, যেদিন তোমার হাতের গাছ মরে যাবে, সেদিন চলে যাব।'

লেখক মন দিয়ে গল্প লেখে, প্রেমের গল্প। সামিরার ধারণা, তার আঙুলে জন্মে ওঠা এই গাছের কল্যাণে তার গল্পে প্রেম এসেছে।

'সত্যি? তুমি আমার গল্প পড়ো?'

'নাহ আমার তো কবিতা প্রিয়। আমার বর পড়ে তোমার গল্প।

'তাই? জানে যে তুমি আমাকে চেনো?'

'তোমার কি এক চরিত্র আছে মালতী, যার পিঠে ছুরির কাটা দাগ। সে যে আমাকে নিয়ে লেখা তাও জানে।'

'তোমার মেয়েটা তোমার মতন দেখতে?'

'হুম।'

বলতে ইচ্ছে করে একদিন তোমাকে দেখতে চাই। ভয় হয়। বললেই হয়তো ফোন করা, ফোন ধরা বন্ধ করে দিবে। থাকুক যেমন আছে। কলের নিচে আঙুল মেলে মন দিয়ে তাতে পানি ঢালে। গাছ মরে গেলে আঙুল স্বাধীন হবে, কিন্তু ঠিক সামিরা চলে যাবে। যেমন করে চলে গিয়েছিল দ্বিতীয়বার। লেখকের বিয়ের ঠিক দুই মাস আগে। প্রেমের বিয়ে, তার আর দিলশাদের। অনেক ভক্তের মাঝে গুণেমানে যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে, দিলশাদ, তার সাথেই বিয়ে। একদিন নিউমার্কেটের মোড়ে দেখা সামিরার সাথে। ওইদিন দাঁড়িয়ে কিংসে দুইজন মিলে তিনপ্লেট ফুচকা খেয়ে, পথ হাঁটতে হাঁটতে দুপুর থেকে সন্ধ্যা হলো। সামিরার তখন বিয়ে হয়নি। অনেকবার চেষ্টা করেও লেখক বলতে পারেনি এই তো আমার বিয়ে সামনে। বরং মনে মনে অংক কষে ফেলেছিল কীভাবে দিলশাদকে বুঝিয়ে বিয়ে বাতিল করে দেয়া যায়। সামিরাকে যে আবার খুঁজে পেয়েছে সে!

সামিরা বিয়ের খবর জেনেছিল এক সপ্তাহ পর, কেউ জানিয়েছিল।

তুমুল আনন্দে স্নাত সোহাগ গিয়েছিল সামিরার কাছে, বলতে, 'চলো বিয়ে করে ফেলি।'

সামিরা সেই সব হালকা কথা এক চুটকিতে উড়িয়ে বলেছিল, 'যাও বিয়ে করো দিলশাদকে।'

'তুমি চলে যাচ্ছ? যেও না প্লিজ।'

'যাচ্ছি, আবার আসব তোমার বিয়ে ভাঙার পর।'

'আমার বিয়ে ভাঙবে কেন!'

'তুমি কি জানো টিকিয়ে রাখতে হয় কেমন করে!'

সামিরা যদি আবার সামনে না আসত, দিলশাদের সাথে বিয়েটা কি টিকে যেত? কে জানে? সামিরা এসেছিল আবার ডিভোর্সের আগে এক ঝলকের জন্য। সোহাগের ছেলেটার বয়স তিন, নিউমোনিয়া জ্বর, হাসপাতালে ভর্তি। দিলশাদ আর সে দিনরাত ছেলের পাশ থেকে নড়ে না। ছেলেটাই তাদের সম্পর্কের একমাত্র সুতো হয়ে ঝুলছে তখন। ওষুধ আনতে হাসপাতালের নিচতলায় ফার্মেসিতে এসে দেখে সামিরা। পেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ডেলিভারি হবে যখন তখন।

'তোমার হাজব্যান্ড কই?'

'ওই যে।'

যেদিকে আঙুল তুলল সেদিকে কেউ ছিল না। এক স্ট্রেচারে করে রোগী আসছিল, পাশ কেটে দাঁড়াতে যেয়ে দেখে সামিরা নাই। আশেপাশে কোথাও নাই। কী অদ্ভুত! এরপর আরো তিনদিন ছিল ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে, ফার্মেসির সামনে, আশেপাশের কেবিনের সামনে যেয়ে অনেকবার খুঁজেছে, নার্সদের জিজ্ঞেস করেছে, সামিরাকে খুঁজে পায়নি। আর এই যে এতদিন পর আবার পেল সামিরাকে। সামিরা এল, পেল তো না আর। পেল কী!

সেদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে মধ্যমার মুখ থেকে জেগে উঠেছে একটা হলুদ গোলাপ। যাক বাবা বরই তো নয়। হাতে ফলের বাগান হলে কী বিচ্ছিরি হতো। ঝুপুত ঝুপুত করে ভিজিয়ে দেয় সে আঙুলের গাছটা, গোলাপের পাপড়ি।

সামিরা বলে, 'দেখ, গোলাপ ফুটেছে দেখেই এমন প্রেমের গল্প আসছে মাথায়।'

'তা সত্যি, আগে তো কখনো প্রেমের গল্প লিখতে পারিনি।'

ঢাউস একটা পাণ্ডুলিপিও পেয়ে প্রকাশ আলহাদে আটখানা। 'এমনিতেই আপনার আঙুলে ইয়ে, তারপর এমন মুচমুচে প্রেমের গল্পের বই। এবার মেলায় কিন্তু এটা হট কেক হবে বলে রাখলাম।' শালার প্রকাশকও হাতের ঘটনা জেনে গিয়েছে! দুই লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে তবে পাণ্ডুলিপি ছাড়ে লেখক।

আজ তার ভিসা হয়েছে। তিনদিন পর ব্যাংকক যাবেন, ভাইয়েরা জোগাড়যন্ত্র করছে, হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে কেমন করে যাওয়া যায়, তা নিয়ে তুলমুল আলোচনা চলছে। আর ঘুম থেকে উঠে দেখেন হাতের গোলাপটা ফুলে-ফেঁপে কেমন পাখা মেলেছে, হলুদ গোলাপ। কাঁচা হলুদে হাওয়াই মিঠাই পলকা উঁকি দিচ্ছে। গাছের দুটো মরা পাতা বিছানায় পড়ে আছে। তবে কি গাছ মরতে শুরু করল? আহারে আহারে হাত পা ছড়িয়ে লেখক জাফর আহমেদ সোহাগ কাঁদছে, বিষণ্ন আকুলতায় কেঁদে কেঁদে ওঠে সে। আঙুলের শরীর চিরে জন্মে ওঠা হলুদ গোলাপ গাছটা মরে গেলে তার আঙুলগুলো মুক্তি পাবে। তবু লেখক কেন কাঁদছে কে জানে!

NRB Bank

Ramadan MUBARAK

Spread The **Happiness** of Ramadan with **NRB Bank** Selected **Credit Cards**

Aarong	Apex	Sailor	Yellow
12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000	12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000	12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000	12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000

Infinity Mega Mall	Richman	Lubnan	Anjans
12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000	12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000	12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000	12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000

*T&C Apply

Cats Eye	Le Reve
12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000	12% Cashback or BDT 450 (Whichever is Lower) Per Day Total Highest Cashback BDT 1000

Terms & Conditions

- Minimum transaction should be BDT 3500 in order to avail the cashback offer
- Total Highest Cashback Per Card (As Per Client ID) During This Campaign Period Will be BDT 1000.
- The offer will be applicable for both online & offline transaction
- Offer for "Anjans" is only applicable for offline transaction
- Offer is valid till the last day of Ramadan 2025

24 HOURS CALL CENTER

16568
+88 09666456000
www.nrbbankbd.com
www.facebook.com/nrbbankbd

পীর পাঞ্জাল পাহাড়ের পটভূমিসহ নিশাতবাগের এক টুকরো

কাশ্মীরের মোগল বাগিচা

ফারুক মঈনউদ্দীন

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট থেকে ইন্ডিগো এয়ারের প্লেনটা টেক অফ করতে সন্ধ্যা ছ'টা বেজে যায়। আকাশযানটা আকাশে সুস্থির হওয়ার পর পাইলটের ঘোষণায় যখন জানতে পারি আমরা ৩৫ হাজার ফুট ওপরে আছি, তখন চোখে পড়ে পশ্চিমের দিকচক্রবালজুড়ে তীব্র কমলা রঙের এক অসাধারণ আলোর আভা। এ আভা দেখে বোঝার উপায় নেই নিচের ভূমিতে তখন নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। দিগন্তজুড়ে ছড়ানো আলোর আভায় ঠিক এ সময়ই বলা যায় 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া, যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, ...।' সকাল দশটার পর একবার ঢাকা এয়ারপোর্টে জুতো, কোমরের বেল্ট, ঘড়ি ইত্যাদি খুলে হ্যান্ড লাগেজ, ল্যাপটপ, ক্যামেরা ইত্যাদি টানাহেঁচড়া করতে হয়েছে। তারপর ভারী সুটকেস নিয়ে শাটল বাসে চড়ে দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল থেকে ডমেস্টিক টার্মিনালে পৌঁছে সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় দ্বিতীয় দফায় আবার সেই খোলাখুলি, টানাহেঁচড়া। ক্লান্তি তো সত্যিই আসবে 'অঙ্গে নামিয়া।' তবে শরীরে ক্লান্তি থাকলেও মন চাঙ্গা। প্রথমবারের মতো বহু কাঙ্ক্ষিত কাশ্মীর যাওয়া হচ্ছে। টানা পাঁচ বছর মুম্বাইতে থেকেও ভূস্বর্গ বলে পরিচিত রাজ্যটিতে কখনই যাওয়া হয়নি। চাকরির সুবাদে যখন মুম্বাই যাই, তখনো কারগিল যুদ্ধের দাগ শুকোয়নি। স্পর্শকাতর রাজ্য কাশ্মীর এ যুদ্ধের মূল কেন্দ্র, তাই সেখানকার সম্ভাব্য অশান্ত পরিস্থিতির কারণে ওদিকে পা বাড়ানোর সাহস পাইনি।

বাংলাদেশে তখন শরতের শেষ, দিল্লির আবহাওয়া থেকে শ্রীনগর এয়ারপোর্টের টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে বাইরে আসার পর বুঝতে পারি শীতটা যেন আচমকা ঝুপ করে নেমে এসেছে। পার্কিং লটের ম্লান আলোয় আমাদের ড্রাইভার এবং আগামী দশদিনের গাইড আইউবের সঙ্গে পরিচয় হয়। বেশ আদব লেহাজ জানা মাঝবয়সী লোকটির গায়ের রঙ দেখে কাশ্মীরি মনে হয় না। এতদিন ভাবতাম কাশ্মীরের সব মানুষই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের। অবশ্য পরে জানতে পেরেছি এবং প্রমাণও পেয়েছি, আমার এ ধারণা ভুল।

শ্রীনগরের পথে নামার পর বোঝা যায় পুরো শহরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। কয়েক কিলোমিটার পরপর নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্ট, সেখানে আর্মার্ড গাড়ির পাশে অস্ত্র হাতে সতর্ক পুলিশ। আমাদের থামিয়ে কোথাও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না বটে, কিন্তু একটা টানটান পরিস্থিতির আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে কোনো অজানা ভয়। কাশ্মীর-কুসুম নামে রাজেন্দ্রমোহন বসুর একটা ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। সেখানে তিনি কাশ্মীর ভ্রমণকারীদের উদ্দেশে লিখেছেন :

পর্য্যটকেরা কাশ্মীরে উপনীত হইয়া মনে রাখিবেন, যে, তাঁহারা এক স্বাধীন রাজার রাজ্যে আসিয়াছেন। সুতরাং, কোনো স্থলে মহারাজা, তৎপুত্র, তৎকুটুম্ব অথবা তাঁহার কোনো প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং সর্ব্বদা তথাকার নিয়ম ও ব্যবহারানুসারে চলিবেন।

পথে পথে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা 'স্বাধীন রাজার রাজ্যে'র সিপাহি বা প্রধান কর্মচারী না হলেও আধো অন্ধকারের মধ্যেও তাদের গুরুদায়িত্ব পালনের নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্য অনুভব করা যায়। তবে আমাদের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ ঘটেনি বলে তাদের প্রতি 'যথোচিত সম্মান প্রদর্শন' করার দরকার পড়েনি।

শ্রীনগর এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের হোটেল প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার। পথে একটা নদী পার হওয়ার সময় আইউবকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল নদীটার নাম ঝিলম। মুহূর্তেই নজরুলের বহুবার শোনা 'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা' গানটা বেজে ওঠে মনের মধ্যে। নদীটির দেখা মেলে গানের সঞ্চারীতে। 'ঝিলম রেবা নদী তীরে/ মেঘদূত যেন খুঁজে ফিরে।' কাজী নজরুল কখনো কাশ্মীর গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু তার গানে এসেছে ঝিলমের নাম। এক তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা তরুণীকে খুঁজে ফিরেছেন তিনি ঝিলম, নর্মদা, কাবেরী নদীর তীরে। সংস্কৃত 'রেব' থেকে আসা 'রেবা' হচ্ছে নর্মদার আরেক নাম। 'রেব' শব্দের অর্থ পাথুরে নদীগর্ভ।

রবীন্দ্রনাথ কাশ্মীর গিয়েছিলেন ১৯১৫ সালে। কাশ্মীরে লেখা একাধিক গান ও কবিতা রয়েছে তার। বলাকা কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় রয়েছে ঝিলমের নাম, 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা/আঁধারে মলিন হল—যেন খাপে-ঢাকা/বাঁকা তলোয়ার।' কাশ্মীরে প্রথমে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল ডাল লেকে 'পরীস্থান' নামের এক হাউজবোটে। পরে ঝিলম নদীর অন্য একটা গৃহতরীতে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। এক শান্ত সন্ধ্যায় সেই হাউজবোটের ছাদে বসেছিলেন তিনি। এমন সময় সন্ধ্যার শান্ত গাম্ভীর্য উপেক্ষা করে মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক হাঁস উড়ে যায় রাতের আশ্রয়ে। সে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় তার মনে হলো হংস-বলাকার উড্ডীন পাখার শব্দ যেন বিদ্যুচ্ছটার মতো বিস্ময়ের ঢেউ তুলে ছুটে গেল দূরে কোথাও।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
...
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও' গানটিও লেখা হয়েছিল কাশ্মীরে। 'স্পাই' কবিতায় কাশ্মীর ভ্রমণের কথা লেখেন তিনি 'এই বছরে বেড়িয়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মীরে।'

কাশ্মীর-কুসুম বইতে রাজেন্দ্রমোহন বসু লিখেছিলেন,

শ্রীনগরের পর্য্যটকদিগের জন্য মহারাজা অনেক উত্তম বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজ দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণ—একটীও প্রায় শূন্য পাওয়া যায় না। নগরাভ্যন্তরে অনেক বাটী ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু নগর অতি মলিন, সুতরাং বাসোপযোগী নয়। নৌকা বাসই অতি প্রীতিকর।

রাজেন্দ্রমোহনের বইটি প্রকাশিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন কাশ্মীর। তাই বোধকরি তার জন্য নৌকাবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার একশ বছরেরও বেশি সময় পর আমরা যখন যাই, আমাদের নৌকা বাস করতে হয়নি। ডাল লেকে রয়েছে অগণিত হাউজবোট, সেখানে রাত্রি যাপনের খাসা বন্দোবস্তও আছে। অভিজ্ঞতার জন্য এক রাত কাটিয়েছি হাউজবোটেও। ভেতরের লাউঞ্জ ও ডাইনিং হল দেখে জমিদারবাড়ির মতো মনে হলেও থাকার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত হোটেলগুলোর তুলনায় খুব আরামের বলে মনে হয়নি সেগুলোকে। হাউজবোটের চেয়ে ঢের বেশি আছে ভালো মানের অজস্র হোটেল। ডাল লেকের এক প্রান্তে অতি মলিন দু-একটা ভাসমান ঘরও দেখতে পেয়েছিলাম, যদিও সেগুলো ভ্রমণকারীদের জন্য নয়। নিতান্ত নিম্নবিত্ত মানুষের ঘর বলেই মনে হয়েছে, কিংবা নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য বোর্ডিং। রাজেন্দ্রমোহন বসু যখন কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন ভ্রমণকারীদের থাকার জন্য উপযুক্ত নিবাস খুব বেশি ছিল না ঠিক, কিন্তু দেড়শ বছর আগের অবস্থা এখন নেই।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল শ্রীনগরের চিনারবাগ এলাকার 'কারীম রেসিডেন্সি' নামের এক হোটেলে। রিসেপশনে বুকিং ভাউচার দেখানোর পর কাউন্টারের ভদ্রলোক জানালেন, আপনাদের বন্ধু চেক ইন করে ফেলেছেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার আমাদের সফরসঙ্গী অনিল আচার্য ও সাহানা বৌদি কলকাতা থেকে আগেই পৌঁছে গেছেন হোটেলে। আমাদের পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কাউন্টারের ভদ্রলোক কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না, আমি বাংলাদেশের আর অনিলদা কলকাতার, ধর্মও আলাদা—তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব হলো কীভাবে? একটু রহস্য করে বললাম, কেন এ রকম হলে কি বন্ধুত্ব হয় না? আমরা তো একসময়ে একই দেশের বাসিন্দা ছিলাম, একই ভাষায় কথা বলি। ধর্ম আলাদা বলে কি বন্ধুত্ব হতে নেই? তাকে আমাদের দেশের প্রচলিত কথাটাও শুনিয়ে বুঝিয়ে দিই, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ভদ্রলোক সমঝদারের মতো দুদিকে মাথা নাড়েন। অনেকেই জানেন, ভারতে দুদিকে মাথা নাড়ানোর অর্থ হ্যাঁ-বাচক।

কাশ্মীর-কুসুম বইতে রাজেন্দ্রমোহন বসু কাশ্মীর ভ্রমণকারীদের উদ্দেশে লিখেছেন :

কাশ্মীর রাজ্যে প্রথম উপস্থিত হইয়াই পর্য্যটক রাজকীয় শাসন প্রণালী ও লোকদিগের আচার ব্যবহার সে সব হইতে বিষম দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার এটী স্মরণ করা আবশ্যক যে, তিনি যে প্রদেশে পদচারণা করিতেছেন, তথাকার লোক অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও অসভ্য এবং তথাকার শাসনকর্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন, প্রভূত প্রতাপশালী এবং কিয়দংশে স্বেচ্ছাচারী। সুতরাং পর্য্যটকদের চরিত্র যেন কোনোরূপ দোষাবহ এবং প্রজাপীড়ক না হয়। যদিও এস্থলে ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অনেক অনুকূল পদার্থ আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম করাই মানুষের কাজ। অনেকে ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ হইয়া নানা পাপাচারণবশতঃ অবশেষে অপমানিত ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমা হইতে দূরীভূত হইয়াছেন।

এ বর্ণনা থেকে বর্তমান কাশ্মীরকে বিচার করা যাবে না। এখানকার মানুষ এখন 'অজ্ঞ ও অসভ্য এবং...শাসনকর্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন, প্রভূত প্রতাপশালী এবং কিয়দংশে স্বেচ্ছাচারী' কোনোটাই নন। 'ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অনুকূল পদার্থ' এখনো আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি, তবে ভারতের অন্য রাজ্যগুলোর মতো যে সুলভ নয়, সেটা বোঝা গেছে।

কাশ্মীর নামটি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সংস্কৃত শব্দ 'কাশ্মীরা' থেকে কাশ্মীর নামটির উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে কাশ্মীর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জল থেকে উদ্ভূত ভূমি।' উল্লেখ্য, সংস্কৃত ভাষায় 'কা' শব্দের অর্থ জল। 'শিমিরি' শব্দের অর্থ 'শুষ্ক' করা। অর্থাৎ জল শুকিয়ে যে স্থলভাগের উৎপত্তি, তা-ই 'কাশ্মীর'। পৌরাণিক ধারণা মতে, ঋষি কাশ্যপ জলসেচন করে এ অঞ্চলকে শুষ্ক করেছিলেন। এভাবেই নামকরণ হয় কাশ্মীর অঞ্চলের। অন্য ভাষ্যমতে, কাশ্মীর শব্দটি এসেছে বৈদিক ঋষি কাশ্যপের নাম থেকে। যিনি এ ভূমিতে লোকবসতি স্থাপন করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এ বয়ানে কাশ্মীর শব্দটি এসেছে কাশ্যপের হ্রদ অথবা কাশ্যপের পর্বত শব্দ থেকে। প্রাচীন গ্রিকরা এ অঞ্চলকে বলত 'কাস্পেরিয়া।' টলেমির কাসপিরিয়া দেশ বলতে কাশ্মীরকেই বোঝানো হয়েছে। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও চীনা ভ্রমণকারী হিউয়েন সাং কাশ্মীরকে কিয়া-শি-মিলো নামে উল্লেখ করেছেন। এতগুলো মত ও পথের মধ্যে কোনটি যে কাশ্মীর নামের প্রকৃত উৎস সেটা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিই।

হিন্দু পুরাণের রাজা দক্ষের কন্যা সতী বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছিলেন শিবকে। তাই শিবের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাজা দক্ষ এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। এ যজ্ঞে সব দেবতাকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও সতী কিংবা তার স্বামীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবু স্বামীকে প্রায় জোর করে নিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন সতী। অনাহূত কন্যা আর জামাতাকে দেখে রাজা দক্ষ অপমান করেছিলেন তাদের। স্বামীর এ অপমান সইতে না পেরে সতী আত্মহত্যা করেন। স্ত্রী শোকে উন্মত্ত শিব শ্বশুরের যজ্ঞানুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়ে সতীর শবদেহ কাঁধে নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রলয়নৃত্য শুরু করলে ভগবান বিষ্ণু তার সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর মৃতদেহকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। সেই দেহখণ্ডের মধ্যে কণ্ঠদেশ এসে পড়েছিল কাশ্মীরে। সে কারণে এ উপত্যকাকে সারদাপীঠ বলা হয়। উল্লেখ্য, বাংলা বাগধারায় হট্টগোল বা প্রলয়কাণ্ড বোঝাতে দক্ষযজ্ঞ শব্দটির উৎপত্তি এ ঘটনা থেকেই।

* * *

সকালে হোটেল থেকে বের হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর চোখে পড়ে খালের মধ্যে বড়সড় দুটো নৌকা, সেগুলোর ওপর পুরো দৈর্ঘ্য লম্বালম্বিভাবে আস্ত দোচালা ঘর বসানো। কোনো দরজা জানালা খোলা নেই। নিতান্ত

গরিব-গুর্বো চেহারা। কাশ্মীরের মশহুর হাউজবোটের কথা বহু শুনেছি। এগুলো যদি হাউজবোট হয়, তাহলে বিরাট স্বপ্নভঙ্গ হবে। খালটা আসলে ডাল লেকের একটা লেজ, পানিও বেশ অপরিষ্কার। সে খালের ধারঘেঁষে আরো কিছুদূর গিয়ে ডানে মোড় নিতেই হাতের বামে দৃশ্যমান হয় প্রশস্ত শান্ত জলরাশি। হাতের ডানে দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, হোটেল, অভিজাত কনফেকশনারি, স্যুভেনিরের দোকান। লেকের পাড়ে বাঁধা শিকারার সারি, জলের মাঝখানে ইতস্তত ভেসে থাকা বহুবর্ণিল শিকারার ঝাঁক পুরো জলরাশিকে রঙিন করে রেখেছে গুচ্ছ গুচ্ছ বর্ণে। লেকঘেঁষা বুলেভার্ড রোড থেকে একখণ্ড ভূমি দলছুট হয়ে লেকের ভেতর উপদ্বীপের মতো জেগে আছে। সেখানে একটা অভিজাত হোটেল আর কনভেনশন সেন্টার। সে ভূমিখণ্ডের ধারঘেঁষে জলের ওপর নুয়ে আছে উইপিং উইলোর নতমুখী কোমল শাখা, পেছনে সটান দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী পপলারের সারি। বুলেভার্ড রোডের উল্টোপাশে অচেনা বৃক্ষ ছেয়ে আছে হলুদ পাতায়, চিনার আর পপলার দাঁড়ানো প্রহরীর মতো।

'চশমে শাহী' নামটা যখন প্রথম শুনি, ভেবেছিলাম নামটার সঙ্গে চোখের কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু পরে জানতে পারি উর্দু ভাষায় 'চশমে' শব্দটার অর্থ ঝরনা। তাহলে চশমে শাহীর অর্থ হওয়ার কথা রাজকীয় ঝরনা। চট্টগ্রামের ষোলশহরে 'চশমা হিল'-এর নামও এসেছে ঝরনা থেকে। জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানে পাহাড়ের একটা পাথরের ওপর একপায়ে দাঁড়িয়ে সাধনা করেছিলেন শেখ ফরিদ। এ পাহাড়ের গোড়ায় ছিল একটা ঝরনা। এ ঝরনার কারণেই পাহাড়টার নাম হয়েছে চশমা হিল।

জানা যায়, কাশ্মীরের সাহিব গোত্রের আধ্যাত্মিক গুরু পণ্ডিত মাধব জু ধরের কন্যা সাধিকা ও মরমি কবি রূপা ভবানী (১৬২১-১৭২১) একটা ছোট টিলার ওপর আবিষ্কার করেছিলেন এক প্রাকৃতিক ঝরনা। তাদের পারিবারিক পদবি 'সাহিব' থেকে ঝরনাটির নাম দেয়া হয় 'চশমে সাহিবি।' কিন্তু লোকমুখে নামটি একসময় 'চশমে শাহী' হয়ে যায়। মোগল সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে শাহজাদা দারাশুকোর জন্য এখানে একটা বাগান তৈরি করা হয় ১৬৩২ সালে। তাহলে ধরে নেয়া যায় রূপা ভবানীর বয়স যখন ১১ বছর, তখন ঝরনাটা আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।

প্রাকৃতিক ঝরনা বলে এটির পানির কিছু খনিজ গুণ থাকতে পারে। তাই অতি উৎসাহীরা এটিকে কুদরতি পানি বলে মনে করেন। দাবি করা হয় জওহর লাল নেহরুও নাকি এ ঝরনার জল আনিয়ে নিতেন খাওয়ার জন্য। বিষয়টার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বাগিচার তিনটি ধাপের সবচেয়ে ওপরের ধাপে একটা ছাদঢাকা কটেজের ভেতর ফুটখানেক উঁচু চার মিনার ও গম্বুজের ভেতর থেকে দুটো মুখ দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে জলের ধারা। দর্শনার্থীরা সেখান থেকে আঁজলা ভরে খাচ্ছে শীতল পানি, কেউ সংগ্রহ করে নিচ্ছে বোতলে। একটা চৌবাচ্চায় গিয়ে পড়ছে সে অবিরল ঝরনার পানি। দর্শনার্থীদের বেশির ভাগই সে পানি পরম ভক্তিতে খেয়ে চললেও বর্তমান পরিবেশ দূষণের যুগে সে কুদরতি পানি খেয়ে দেখার সাহস করলাম না। এ রকম জলের উৎস দেখেছিলাম সমরখন্দে ইমাম বুখারির মাজারের সামনের চত্বরে। সে পানিকেও লোকজন পবিত্র জ্ঞান করে পরম ভক্তিতে খায়, মাথায় ঢালে। বহু বছর আগে কিশোর বয়সে চট্টগ্রামের মহামুনিতে সরকারি ডাক্তারখানার সামনে একটা টিউবওয়েল দেখেছিলাম, চব্বিশ ঘণ্টাই জল পড়ছে। তবে স্থানীয় মুসলমান. হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কেউই এটাকে স্বর্গীয় ঝরনা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেনি।

বাগিচার নিচের ধাপে সে ঝরনার জল নেমে জমা হয় অগভীর চৌবাচ্চায়, তার মধ্যে ফোয়ারা বসানো। এ ধাপের প্রশস্ত চত্বরের একপাশে স্যালভিয়ার সারি। টকটকে লাল ফুলে ছাওয়া সে অনুচ্চ গাছের সারি ঝকঝক করছিল উজ্জ্বল রোদে। চত্বরের এক কোণে এক বিশাল চিনার গাছ। ওটার প্রকাণ্ড কাণ্ডে সাঁটা একটা বোর্ডে গাছটা নিজের পরিচয় ঘোষণা করে জানাচ্ছে, ওটার বয়স আনুমানিক তিনশ বছর, উচ্চতা দেড়শ ফুটের বেশি। স্কুলজীবনে একটি বট গাছের আত্মকাহিনী নামের রচনা লিখতে হতো। বয়সী চিনারও এ বোর্ডে সেই রচনার মতো লিখে রেখেছে, 'স্থাপত্যকর্মের সেরা এই কীর্তি এবং ভালোবাসার নিদর্শনটির প্রাকৃতিক সাক্ষীদের একজন আমি। লোকজন আমাকে ঘিরে বসে বিশ্রাম নেয়, বলাবলি করে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা। সেসব গোপন কথা লুকিয়ে রাখি আমার পাতায় চমৎকার উৎকীর্ণ শিরার ভেতর। আমি ছাড়াও পুরো কাশ্মীর উপত্যকাজুড়ে আরো বিশাল সব চিনার রয়েছে, ...।' বয়সী সেই চিনারের ছায়ার বাইরে চত্বরে কিছু অচেনা বৃক্ষের ডালকে বনসাইয়ের কায়দায় বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে তৈরি হয়েছে গাছের ভাস্কর্য। বিশ থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু গাছগুলোকে অনেক দূর থেকে দেখলে ঢ্যাঙ্গা বনসাই মনে হতে পারে।

নিচের গোলাপ বাগিচায় ফুটে আছে একই সঙ্গে লাল গোলাপি, সাদা আর হালকা হলুদ রঙের গোলাপ। চত্বরের সামনের দিকে একটা চারকোনা উঠোন, ওটার চারপাশে তিন ফুট উঁচু চওড়া দেয়াল, দর্শনার্থীরা সেখানে বসে ছবি তুলছে ঝপাঝপ। সেলফি তোলায় বিরাম নেই। সেই চাতালে থরে থরে নানা বর্ণের কাশ্মীরি পোশাক সাজিয়ে রাখা, সবই মেয়েদের। দর্শনার্থী নানা বয়সী মহিলা সেসব গায়ে চড়িয়ে ছবি তুলছে নানা ভঙ্গিমায়। দূরের জাবারওয়ান পর্বতের পটভূমিতে নভেম্বরের কবোষ্ণ রোদে মৌসুমি ফুলে সয়লাব বাগিচার এসব দৃশ্য অলস চোখে তাকিয়ে দেখলে অপার্থিব মনে হয়।

চশমে শাহী থেকে নেমে এলে পার্কিং এরিয়ার মাঝ বরাবর একটা চিনার গাছকে ঘিরে একাধিক শুষ্ক খাবারের স্টল, ঠেলাগাড়িতে ফলের পসরা।

ডাল লেকের ফোয়ারা, পটভূমিতে
হজরতবাল দরগাহর গম্বুজ

মাইলস্টোন কলেজ

▪ EIIN:108572

২২, ৩০ ও ৪৪ গরিব-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১ এবং ডিয়াবাড়ি (**মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ৭৫ গজ দূরে**), তুরাগ, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।
www.milestonecollege.com, www.facebook.com/MilestoneCollegeUttara

- **শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি:** ২০০৮ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তন দ্য নিউ ইয়র্ক একাডেমি অব সায়েন্সেস'র সদস্য স্কুল হিসেবে স্বীকৃত।
- মেধাতালিকা পদ্ধতি থাকাকালীন সারাদেশে এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মেধাতালিকায় মোট ১৩বার স্থান লাভ।
- এইচএসসি, এসএসসি, জেএসসি এবং পিইসি পরীক্ষার ফলাফল (বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি ভার্সন):

এইচএসসি	২০২৪ সালে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩১০৭ জন। পাসের হার ১০০%। জিপিএ-৫ অর্জন করে ২০১১ জন। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পায় ১৯৬৩ জন। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১০ম ও ৭ম স্থান অর্জন করে।
এসএসসি	২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১৭৫০ জন। পাসের হার ১০০% এবং জিপিএ-৫ অর্জন করে ১২৯৮ জন। ২০০৯, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ৫ম, ১০ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে। তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে শতভাগ পাসের ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে মাইলস্টোন কলেজের অবস্থান প্রথম।
জেএসসি	২০১৯ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৫৮৯ জন। ২০১৭ সালে শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ৮৪৮ জন। জেএসসিতে ২০১০, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে ঢাকা বোর্ডে যথাক্রমে ১৩তম, ৭ম ও ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
পিইসি	২০১৯ সালে ১১৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, শতভাগ পাসসহ জিপিএ-৫ অর্জন করে ১১৩৮ জন। জিপিএ-৫ অর্জনের হার ৯৬.৩৬%। ২০১১ ও ২০১২ সালে ৪র্থ স্থান এবং ২০১৩ ও ২০১৪ সালে সারাদেশে ৩য় স্থান অর্জন করে।

- দেশসেরা কলেজগুলোর অন্যতম একটি মাইলস্টোন কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা কর্নেল নুরন্ নবী (অব.)। ফৌজদারহাট ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল নুরন্ নবী; যিনি রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ও মাইলস্টোন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে স্বপ্নকারিগর নুরন্ নবী স্যার বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন মাইলস্টোন কলেজের উপদেষ্টা হিসেবে। কর্নেল নুরন্ নবী প্রতিষ্ঠিত আরেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম 'মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল'। বর্তমানে এটিও দেশসেরা স্কুলগুলোর অন্যতম একটি। মূলত: এই প্রাজ্ঞজনের হাত ধরেই মাইলস্টোন কলেজ এবং মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল এগিয়ে থাকছে সেরাদের সেরা হওয়ার পথে।
- **বিশেষ সুবিধা:** মফস্বল এলাকার ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল এবং পরিবহণের ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের এবং বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের ক্লাস পৃথক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।
- **ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা:** মাইলস্টোন কলেজের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ৪৭৫ জন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষক-কর্মকর্তা [ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন উপাধ্যক্ষ, সরকারি কলেজের প্রাক্তন ১ জন অধ্যক্ষ, ২ জন কর্নেল (অব.), ৪ জন লে. কর্নেল (অব.), ৪ জন মেজর (অব.), ৯ জন সহযোগি অধ্যাপক, ৯১ জন সহকারি অধ্যাপক এবং ৩৬২ জন প্রভাষক ও সিনিয়র শিক্ষক] শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- কলেজটি এমএনআরএস ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত। উত্তরাস্থ মেইন ক্যাম্পাস ছাড়াও উত্তরার ডিয়াবাড়িতে (**মেট্রোরেল উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মাত্র ৭৫ গজ দূরে**) অবস্থিত মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস। খেলাধুলার জন্য বিশাল মাঠ, মানসম্মত শিক্ষার জন্য অবকাঠামোগত সকল প্রকার সুবিধাদি এবং সার্বিক নিরাপত্তাসহ সবুজ শ্যামল মনোরম পরিবেশে অবিস্থত সুবিশাল ক্যাম্পাসটিতে ৮০০ আবাসিক ছাত্রছাত্রীসহ সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- **সহ শিক্ষা কার্যক্রম:** বিতর্ক, বিজ্ঞান, কুইজ, আবৃত্তি, সংগীত, ক্রিকেট, ফুটবল, হ্যান্ডবল, ফটোগ্রাফি প্রতিটি বিষয় ভিত্তিক ক্লাবের মাধ্যমে সারা বছরই চর্চা হয় সহ শিক্ষা কার্যক্রমের। রয়েছে বিএনসিসি, স্কাউট এবং গার্লস গাইডের শাখা। মাইলস্টোন কলেজে অনুষ্ঠিত সহশিক্ষা কার্যক্রমের অনন্য দিক হলো শিক্ষাবর্ষের শেষভাগে অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী খেলাধুলা প্রতিযোগিতা যাতে শিক্ষার্থীরা মনোদৈহিক বিকাশের পাশাপাশি নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়।

▪ **মোহাম্মদ জিয়াউল আলম**
অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন কলেজ

▪ **মো. মাসুদ আলম**
উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
মাইলস্টোন কলেজ

▪ **মিসেস রিফাত নবী আলম**
নির্বাহী অধ্যক্ষ
মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল

স্বাদে অনন্য
সবার জন্য

স্টার লাইন®

স্টার লাইন ফুড প্রোডাক্টস্ লিঃ

starlinefoodproducts starlinefoodproducts

মোবাইল: ০১৯৪৪-৬৬২২১১

পরিবেশকের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ০১৯৭৩-২৬০০২৫, ০১৯৭৩-২৫৯৯৫৯, ০১৯৭৩-২৫৯৯৫০, ০১৯৭৩-২৫৯৭১১, ০১৯৭৩-২৫৯৭১০

স্টার লাইন গ্রুপ

কর্পোরেট অফিস ঃ স্টার লাইন কমপ্লেক্স ৩১৪/১
শহীদ শহীদুল্লা কায়সার সড়ক, ফেনী, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০২৩৩৪৪-৭৩২০০

অন্যপাশে স্যুভেনির স্টোর, গরম কাপড়, শাল, শীতের টুপি ইত্যাদির পসরা। এখান থেকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাল লেকের তীরঘেঁষে আবার বুলেভার্ড রোড ধরে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার যাওয়ার পর নিশাতবাগ। এটাও মোগল বাগিচা, তবে চশমে শাহীর চেয়ে অনেক বড়।

* * *

বিশ্বের খোঁজখবর রাখেন অথচ আগ্রার তাজমহলের কথা জানেন না, এমন মানুষ খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। স্ত্রী মমতাজ মহল ওরফে আরজুমান্দ বানুর মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজাহান স্ত্রীর সমাধির ওপর অনন্য স্থাপত্য তাজমহল নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন যে বছর, তার পরের বছরই সম্রাটের শ্বশুর আসফ খান কাশ্মীরের ডাল লেকের পূর্ব পাড়ে তার বাগিচা নিশাতবাগ উদ্বোধন করেন। পূর্ব প্রান্তে পীর পাঞ্জাল পাহাড় আর পশ্চিমে ডাল লেকের মধ্যবর্তী ছেচল্লিশ একর জায়গাজুড়ে অপূর্ব এ বাগিচার কাজ শুরু হয়েছিল ১৬১৯ সালে। আমরা জানি, তাজমহলের নির্মাণকাজ শেষ হতে সময় লেগেছিল ২০ বছরেরও বেশি। সে হিসাব ধরলে কিন্তু আমাদের গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বিআরটি প্রকল্পটির সময় অনেক কম লেগেছে বলা যায়। আট বছরে পুরোপুরি শুরু না হলেও দশ বছরের গিয়ে শেষ হবেই।

বাগিচা তৈরি হওয়ার পর মেয়ে জামাইকে বাগানটিতে দাওয়াত করেছিলেন আসফ খান। বাগিচা দেখে মুগ্ধ বাদশাহ শাহজাহান। মুগ্ধ হওয়ার কারণও আছে। পেছন দিকে পাহাড়, আর সামনের দিকে ডাল লেকের জলের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত নিশাত বাগের কাছে শাহজাহানের শালিমার বাগ কিছুই নয়। অপেক্ষাকৃত ছোট শালিমার বাগ থেকে ডাল লেকের সরাসরি কোনো নৈকট্যও নেই। তাই কমপক্ষে তিনবার বাগিচাটির অসাধারণ সৌন্দর্যের প্রতি নিজের মুগ্ধতার কথা জানান তিনি শ্বশুরকে। তার আশা ছিল বাগানটা উপঢৌকন হিসেবে জামাতাকে দিয়ে দেবেন আসফ খান। মোগল যুগে যৌতুকের প্রচলন ছিল কিনা জানি না, তবে শাহজাহানের মনে সে রকম আশাই ছিল। আসফ খান জামাইর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন কিনা কে জানে, তবে জামাতার উচ্ছ্বাসে সাড়া দেননি। স্বভাবতই সম্রাট শাহজাহান হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু ততদিনে স্ত্রী মমতাজও গত হয়েছেন, সুতরাং শ্বশুরের ওপর অসন্তোষের শোধ স্ত্রীর ওপর চাপাবেন, সে উপায়ও নেই।

তাই মনঃক্ষুণ্ন সম্রাট শ্বশুরকে একটা সবক দেয়ার জন্য নিশাত বাগের পানির উৎস বন্ধ করে দেন। উল্লেখ্য, এ বাগিচার পানি আসত সম্রাটের মালিকানাধীন শালিমার বাগ থেকে। ফলে বাগিচার গাছগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে যেতে শুরু করে, তার সঙ্গে ভেঙে যেতে থাকে আসফ খানের হৃদয়। এ সময় গ্রীষ্মাবকাশে এখানেই থাকছিলেন তিনি, চোখের সামনে তার প্রিয় বাগানটাকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। একদিন ভগ্নহৃদয় আসফ খান শুষ্ক চৌবাচ্চার পাশে একটা বড় গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আচমকা জলের শব্দে ঘুম চটে যায় তার। তারপর চোখ মেলে যা দেখলেন, যেন নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ফোয়ারাগুলো থেকে আবার ঊর্ধ্বমুখে ছুটছে জল, ঝরনাগুলোর নিচে উপচে উঠছে জলের সাদা ফেনা। জানতে পারলেন, তার এক ভৃত্য মনিবের মনঃকষ্ট উপলব্ধি করে শালিমার বাগ থেকে পানি সরবরাহের মুখটা খুলে দিয়েছে। আতঙ্কিত আসফ খান সম্রাটের আদেশ অমান্যের পরিণতি চিন্তা করে ভৃত্যটিকে ভর্ৎসনা করে তক্ষুণি পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে বলেন।

সম্রাট শাহজাহানও সে সময় শালিমার বাগে অবস্থান করছিলেন। তাই খবরটা তার কানে যেতে সময় লাগে না। ভৃত্যটিকে দরবারে হাজির করতে বললেন তিনি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সম্রাটের সামনে উপস্থিত হয় সে ভৃত্য। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাকে কোনো শাস্তি দেয়ার বদলে উল্টো ওকে একটা শাল উপহার দেন তিনি। সেই সঙ্গে ছেলেটির প্রভুভক্তির প্রশংসাও করেছিলেন। সেদিনই নিশাত বাগে পানির সরবরাহ আবার চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। শালিমার বাগ থেকে নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহের একটা স্থায়ী সনদও অনুমোদন করে দিয়েছিলেন একই সঙ্গে।

উল্লেখ্য, ইংরেজ লেখিকা ও চিত্রশিল্পী কনস্ট্যান্স মেরি ভিলিয়ার্স স্টুয়ার্ট (১৮৭৬-১৯৬৬) ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন স্বামীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন ১৯০৮ সালে। এ সময় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোগল বাগিচাগুলো দেখার অভিজ্ঞতা থেকে গার্ডেনস অব দ্য গ্রেট মুঘলস (১৯১৩) নামে সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার একটা বই লিখে ফেলেন তিনি। ভারতের উদ্যান শিল্প বিষয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি উল্লেখ করে কনস্ট্যান্স লিখেছেন, 'ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে প্রচুর বই লেখা হলেও লক্ষ করা যায় ভারতীয় উদ্যান নিয়ে এ-যাবৎ কেউ কাজ করেননি। যদিও ঐতিহ্য, শিল্প ও প্রতীকী বিষয়সমৃদ্ধ মোগল আলঙ্কারিক শিল্পের প্রধান ধারাগুলো এসেছে মোগল উদ্যান স্থাপত্য থেকে, যা এখন পর্যন্ত ভারতীয় কারিগর ও নির্মাতাদের শিল্পভুবনকে প্রভাবিত করে রেখেছে।'

উর্দু শব্দ 'নিশাত'-এর অর্থ আনন্দ বা আমোদ, সে হিসেবে এ বাগিচার বাংলা নাম হতে পারে 'আনন্দকুঞ্জ' কিংবা 'প্রমোদ কানন।' নিশাত বাগ সম্পর্কে কনস্ট্যান্স লিখেছেন, 'নামের মতোই সার্থক নিশাতবাগ হচ্ছে মোগল বাগিচাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উচ্ছ্বল।'

একটা প্রাচীন স্থানীয় প্রবাদে বলা হয়:

নিশাতবাগের প্রভাতবেলার ছায়া
শালিমার আর নিসিমবাগের সন্ধ্যারাগে
মাঠভরা সব টিউলিপের হাওয়া,
কাশ্মীরের এই আনন্দ আর কোথায় যাবে পাওয়া?

আমরা চশমে শাহীতে যে রকম দেখে এসেছি, এটিতেও মোগল বাগিচাশৈলী স্পষ্ট। উঁচু পাহাড়ের গোড়া থেকে ধাপে ধাপে নেমে আসা ভূমিস্তরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নামা নহরের পানিতে অগভীর চৌবাচ্চা, আর তার মধ্যে বসানো সারিবদ্ধ ফোয়ারা—এটাই মোগল বাগিচাশৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য। নিশাত বাগে রয়েছে ধাপে ধাপে নেমে আসা এ রকম বারোটা স্তর। এগুলো বানানো হয়েছে জ্যোতির্বিদ্যার রাশিচক্রের বারোটি পর্বের সঙ্গে মিল রেখে। সবচেয়ে ওপরের স্তর অর্থাৎ বারোতম স্তরে রয়েছে কেবল মহিলাদের জন্য জেনানা মহল। আদিতে যখন এ বাগিচা বানানো হয়, পশ্চিম দিকের একদম নিচের অর্থাৎ প্রথম স্তরটা নামিয়ে মিলিয়ে দেয়া হয়েছিল ডাল লেকের সঙ্গে। এখন প্রথম কয়েকটা স্তর দখল করে তৈরি হয়েছে বাগিচা আর ডাল লেকের মাঝখানের বুলেভার্ড রোড। প্রতি স্তরে জলের নহর আর অগভীর চৌবাচ্চা ঘিরে চিনার আর পপলারের সারি। তার মাঝে টকটকে লাল স্যালভিয়া, জেরানিয়াম, কসমস, জিনিয়া, সাদা ও লাল গোলাপ। পেছনের পটভূমিতে অনড় দাঁড়ানো গম্ভীর পীর পাঞ্জাল পাহাড়, বাগিচাজুড়ে নানা রঙের ফুলের মেলা, সযত্নে ছাঁটা ঝাউয়ের সারি, হেমন্তের রঙে লালাভ পাতায় সাজানো চিনারের চপল উপস্থিতিতে বাগিচাটা যেন হেমন্তের উজ্জ্বল সোনারোদে ঝলমল করছিল।

বাগিচার বেশ ভেতর দিকে এক চিনার গাছের নিচে বসে নারকেলের ভেতর থেকে বের করা বড় বড় টুকরো বিক্রি করছিলেন এক বুড়ো। সে নারকেলের ওপর মরিচ গুঁড়ো, লবণ আর লেবুর রস ছিটিয়ে দেয়া। প্রতি টুকরো বিশ রুপি। নারকেল অনেকভাবে খেয়েছি, মুড়ি দিয়ে, চিনি দিয়ে কিংবা কোনো কিছু ছাড়া কেবলই নারকেল—কিন্তু এ অনুপান দেয়া বস্তুটি আগে খাইনি কখনো। একেবারে ভিন্ন স্বাদের। গাছের ছায়ায় ওপরের ধাপে যাওয়ার সিঁড়ির ওপর বসে খেতে গিয়ে আমার মেয়ের হাতের টুকরোটা মাটিতে পড়ে যায়। অগত্যা আরেকটা টুকরো কিনতে হলো। কিন্তু দাম দিতে গিয়ে গোল বাঁধে। অনেক সাধাসাধি করেও দাম দেয়া গেল না। লোকটা বলে, ছোড়িয়ে সা'ব। প্যায়সা নেহি চাইয়ে, গির গিয়া তো বেচারি ক্যায়া করেগি। দূর দেশের ভিনদেশী এ দরিদ্র স্ট্রিট ভেন্ডারের বদান্যতাকে কী বলা যায়, জানি না। আমাদের দেশে তো ট্যুরিস্টের কাছ থেকে যা হাতিয়ে নেয়া সম্ভব, তার কিছুই ছাড়ে না কেউ।

এখানেও বাগিচার একপাশে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সম্ভার সাজিয়ে ক্যামেরা নিয়ে মজুদ কয়েকটা অস্থায়ী ঠেকের লোকজন মহিলাদের ছবি তোলানোর জন্য নানা কায়দায় সাধাসাধি করছিল। দরকষাকষি করে এক জায়গায় আমাদের সঙ্গের তিন মহিলার ছবি তোলার প্রস্তুতি নেয়ার সময় আরেক জায়গা থেকে আরো কম রেট হাঁকলে ওদের মধ্যেই কাশ্মীরি ভাষায় ঝগড়া শুরু হয়। কিন্তু প্রথমজনের সঙ্গে যে রেটে চুক্তি হয়, কিছু টাকা গচ্চা গেলেও আমরা সাচ্চা ঈমানদারের মতো তার সঙ্গেই থাকি। ছবি তোলার জন্য ওদের বাতলে দেয়া ভঙ্গিগুলো মোটেই শোভন ছিল না। এরা

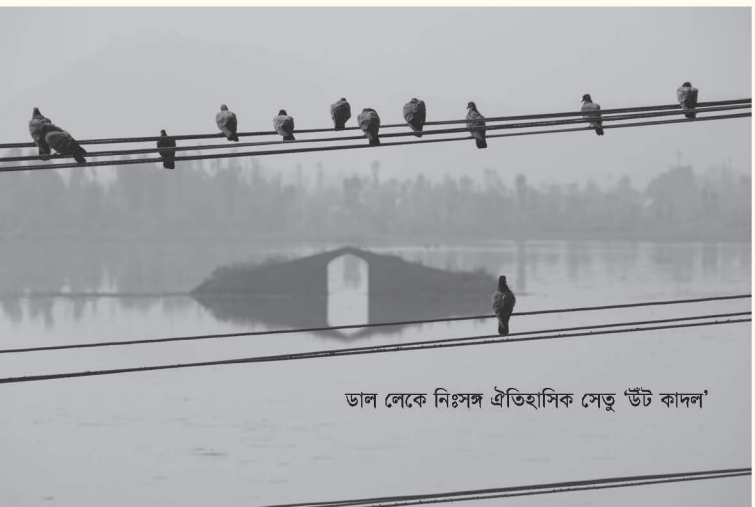

ডাল লেকে নিঃসঙ্গ ঐতিহাসিক সেতু 'উঁট কাদল'

দেখলাম মডেলের আধুনিক ভঙ্গির বিষয়ে কোনো ধারণাই রাখে না।

সূর্য মধ্যাকাশ ছেড়ে ডাল লেকের দিকে নেমে গেলেও রোদটা এতই মিষ্টি লাগছিল যে এ পরিবেশ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু দুপুরের খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে একসময় জায়গাটা ছাড়তেই হয়। রাস্তা থেকে বাগিচায় ওঠা এবং নামার জন্য আলাদা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে বড় বড় পাথরের যে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়, সেগুলো দেখলে মোগল আমলের বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ডাল লেক ঘেঁষা রাস্তাটা তৈরি করতে গিয়ে বাগিচার পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটা ধাপ দখল করতে হয়েছে। সুতরাং এ সুড়ঙ্গ সিঁড়ি যে বহু পরের সংযোজন, সেটা একটু মাথা খাটালেই বোঝা যায়।

সুড়ঙ্গে ঢোকার আগে আচমকা একটা দৃশ্য দেখে থমকে যেতে হয়। বলা নেই কওয়া নেই, আচমকা লেকের জলের ভেতর থেকে উঠে এসেছে বহু পুরনো একটা ইটের তৈরি সেতু, পিঠটা উটের পিঠের মতো, তার তলা দিয়ে একচিলতে জলপথ। পুলের আগে বা পরে কোনো পথের নিশানা নেই, দুপাশেই জল। সেতুটা দেখে মনে পড়ে গেল, মাঝে মাঝেই পত্রিকায় ছাপা হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিঃসঙ্গ সেতুর ছবি। তার আগে বা পরে কোনো রাস্তা নেই। সেসব ছবির ক্যাপশন থেকে জানা যায়, ঠিকাদারি বাগিয়ে সরকারি টাকায় সেতু তৈরি করে দিয়েছে সরকারের ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যবসায়ী। সেখানে রাস্তা থাকুক বা না থাকুক, তাতে তাদের কীই-বা আসে যায়, ওরা সেতু বানিয়ে কিংবা না বানিয়ে বিল নিয়ে হাওয়া। কিন্তু কাশ্মীরেও এমন কাণ্ড ঘটেছে, এটাই-বা বিশ্বাস করি কীভাবে?

পরে জানা যায়, মোগল যুগে (১৬৭০) তৈরি করা হয়েছিল এ সেতু। একসময় লেকের অগভীর জলের ওপর দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ বা জাঙ্গাল ছিল, তারই অংশ এ সেতু, নাম ছিল 'উঁট কাদল,' অর্থাৎ 'উট সেতু।' সেতুটার মূল কাঠামো উটের পিঠের মতো বলেই এ নামকরণ। এ জাঙ্গালের কিছু অংশ ছিল কাঠের তৈরি, এখন সেই জাঙ্গাল, হাঁটা পথ, কিছুরই অস্তিত্ব নেই, কেবল নিঃসঙ্গ সেতুটি ছাড়া। পদব্রজে চলা মানুষের জন্য এ সেতুর তলা দিয়ে চলাচল করতে পারত শিকারাগুলো। বলিউডের সিনেমা 'আরজু,' 'কাশ্মীর কি কলি' যাদের দেখা, উঁট কাদলের দৃশ্যের কথা তাদের মনে থাকার কথা। সে সময়ের বহু আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফারও সেতুটি এবং তার আগে ও পরের পথের দুধারে তরুবিন্যাসের অপার্থিব দৃশ্যকে চমৎকার বিষয় হিসেবে বেছে নিতেন। কিন্তু আমরা কেবল জলের মধ্যে নিঃসঙ্গ দাঁড়ানো সেতুটার দেখা পাই, পাইনি তার আগের বা পরের কোনো পথের দিশা।

ডাল লেকের পূর্ব পাড়ে নিশাত বাগের ঠিক বিপরীতে অর্থাৎ লেকের পশ্চিম পাড়ে হজরতবাল মসজিদ ও মাজার। এখানে সংরক্ষিত আছে হজরত মুহাম্মদের একগাছা দাড়ি। মুসলমানদের কাছে এ পবিত্র নিদর্শন প্রথম কাশ্মীরে নিয়ে আসেন মুহাম্মদের বংশধরদের একজন সৈয়দ আবদুল্লাহ মাদানি। মদিনা থেকে এসে দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরে যখন তিনি অভিবাসী হন, সে সময় মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হচ্ছিল ভারতজুড়ে। আবদুল্লাহ মারা যাওয়ার পর তার ছেলে সৈয়দ হামিদ এ অমূল্য নিদর্শনের হেফাজতকারী হন। কিছুদিন পর মোগলরা এ অঞ্চল জয় করে। পবিত্র নিদর্শনটি নিজের কাছে রাখতে পারবেন না বুঝতে পেরে এক ধনী কাশ্মীরি ব্যবসায়ী খাজা নূর-উদ্দিন ইসাইর কাছে মালিকানা দিয়ে দেন।

বিষয়টা সম্রাট আওরঙ্গজেবের কানে পৌঁছলে পবিত্র নিদর্শনটা জব্দ করে আজমীঢ়ের মইনউদ্দিন চিশতির মাজারে পাঠিয়ে দেন এবং কারাগারে পাঠান নূর-উদ্দীন ইসাইকে। এ ব্যবস্থার কিছুদিন পর আওরঙ্গজেব চার খলিফাসহ হজরত মুহাম্মদকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে হজরত মুহাম্মদ তাকে নির্দেশ দেন তার দাড়ির নিদর্শনটা যাতে আজমীঢ় থেকে কাশ্মীরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ স্বপ্নাদেশ পেয়ে আওরঙ্গজেব মূল্যবান নিদর্শনটি কাশ্মীরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসাইকে মুক্তি দেয়ার আদেশ দেন। কিন্তু ততদিনে ইসাই মারা গিয়েছেন কারাবন্দি অবস্থায়। ফলে ইসাইয়ের মেয়ে ইনায়েত বেগম এ নিদর্শনের মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত হন। তার উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় হজরতবাল মাজার।

আমরা যখন হজরতবাল মসজিদে পৌঁছাই, তখন জোহরের নামাজ শেষ হয়েছে। বেশ উঁচু মূল ফটকের বাইরের পাশটিতে একঝাঁক পায়রা রাস্তা থেকে কোনো ভক্তের ছড়ানো দানা খুঁটে খেতে খেতে ডানা ঝাপটে বেড়াচ্ছে। মসজিদের বাইরের চাতালের ওপর গোল তাঁবু আকৃতির অস্থায়ী ছাউনি। সে ছাউনি পেরিয়ে মূল মসজিদের প্রশস্ত হলঘর। বাইরে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকলে চোখে পড়ে গালিচা বিছানো হলঘরে উঁচু প্রশস্ত জানালা

চশমে শাহীতে তিনশ বছর বয়সী চিনার

গলে আসা উজ্জ্বল আলোর আভা। সে আলোর নিচে দু-একজন মুসল্লি বিচ্ছিন্নভাবে নামাজ পড়ছিলেন এদিক সেদিক। এ রকম জায়গায় গেলে মনটা দ্রবীভূত হয়ে যায়। আমি ভেতরে একচক্কর ঘুরে আসার পর অনিলদা ভেতরে ঢোকেন। তার জুতো পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি হজরত মুহাম্মদের দাড়ি জনসমক্ষে আনা হয় বছরে মাত্র কয়েকবার, সেটা এখানে নয়, সামান্য দূরের হজরতবাল দরগায়। কিছুটা আশাহতই হলাম। সে পবিত্র দাড়ি আমরা দেখতে না পেলেও কাশ্মীর-কুসুম বইতে রাজেন্দ্রমোহন বসুর বর্ণনা থেকে এ দর্শনানুষ্ঠানের একটা চিত্র পেতে পারি :

স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী মৌলবীরা উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করত দোদুল্যমান হইয়া কোরাণ পাঠ করিতেছে—কেহ কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া শ্রোতৃবর্গকে স্বধর্ম্মের সনাতনত্ব ও মুক্তিদাদৃত্ব মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিতেছে। মসজীদাভ্যন্তর প্রবেশ করিয়া দেখ, লোলচর্ম্ম বিগলিতদন্ত, শুভ্রকেশ, শুভ্রবাস, সুচিত্র উষ্ণীষধারী এক অশীতিপর বৃদ্ধ ভক্তিসহকারে সকম্পহস্তে পূর্ব্বোক্ত মহম্মদের শ্মশ্রূলোম ঊর্দ্ধদেশে ধারণ করত দর্শকদিগকে দেখাইতেছে এবং অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মহম্মদের গুণগান করিতেছে।

অনেকের হয়তো জানা নেই, এখান থেকে পবিত্র এ নিদর্শন চুরি বা অপহৃত হয় ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে। এ ঘটনায় কাশ্মীরের মুসলমান জনগোষ্ঠী প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হয় হিন্দুদের ওপর, যার রেশ ছড়িয়ে পড়ে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। ফলে ১৯৬৪ সালে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিরাট অংশ দেশত্যাগ করেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হয় এবং উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া নিদর্শন। পরবর্তী সময়ে অনেকেই সন্দেহ করেন যে পুনরুদ্ধারের কৃতিত্ব নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যই এ চুরির নাটক সংঘটিত করেছিল সরকার। রাজনীতির এ খেলা পৃথিবীর নানা দেশে থাকলেও আমাদের উপমহাদেশের মতো এমন ধ্বংসাত্মক নয় কোথাও।

স্বাস্থ্য বীমা

প্রগতি লাইফের স্বাস্থ্য বীমা নিন
নির্ভাবনায় কাটুক দিন

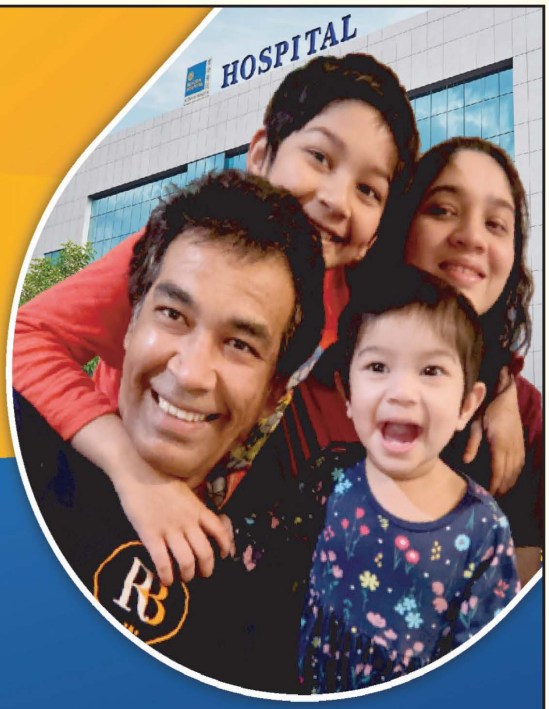

সুবিধাসমূহ

- দেশি-বিদেশি যে কোন হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ
- হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায়
  - রোগ নির্ণয়ের জন্য সকল প্রকার পরীক্ষা
  - ডাক্তারের পরামর্শ ফি
  - অপারেশন খরচ
- হাসপাতাল ভর্তির পূর্বের ১৫ দিনের চিকিৎসা খরচ
- হাসপাতাল ছাড়ার পরের ৩০ দিনের চিকিৎসা খরচ
- অ্যাম্বুলেন্স খরচ
- বীমা চলাকালীন অবস্থায় মৃত্যুবরণে সম্পূর্ণ বীমা অংক নমিনীকে প্রদান
- প্রিমিয়াম এর উপর আয়কর রেয়াত সুবিধা
- দেশব্যাপী ২৫০+ নেটওয়ার্ক হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টারে সর্বোচ্চ ৪৫% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট সুবিধা

সুবিধা	প্যাকেজ - ১	প্যাকেজ - ২
মৃত্যু ঝুঁকি	৫ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকা
হাসপাতালে ভর্তি চিকিৎসা	৫ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকা

বার্ষিক প্রিমিয়াম শুরু ১০,৭৮৫/- টাকা থেকে (বয়স এবং প্যাকেজের ভিত্তিতে)

০৯৬৭৮৭৭৯২০৮
(সকাল ৯টা - বিকাল ৬টা) (শনি - বৃহঃ)

আরো জানতে স্ক্যান করুন

আজীবন বিশ্বস্ত

প্রগতি লাইফ
ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়ঃ প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন,
২০-২১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

গাও

এনামুল রেজা

নামেই স্টুডিও—সেকেলে ধরনের একটা তিনতলা বাণিজ্যিক ভবনের দুই কামরার ফ্ল্যাট, একটা কামরার কোনায় সাউন্ডপ্রুফ লম্বাটে চৌকো বাক্সে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা; অন্য কামরায় একদল বিহারি কারচুপির কাজ করে। বাক্সের ভেতরে অনুজ্জ্বল আলোয় স্ক্রিপ্ট পড়তে শিল্পীর দারুণ সংগ্রাম করতে হয়, সঙ্গে বদ্ধ গুমোট গরমে অযাচিত গোসলের ব্যবস্থা করে ঘাম। শিল্পী? তাহিরা যা করে একে শিল্প বলে কেউ অবশ্য স্বীকার করবে না। অষ্টধাতু আংটির কার্যকারিতা, শপিং মলের বিজ্ঞাপনী জিংগেল যা প্রচারিত হয় শুধু স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে, ধ্বজভঙ্গ আর ফিস্টুলার অব্যর্থ ওষুধ বিক্রেতার লিফলেট পাঠ—এসব কেনই বা রেকর্ড হয়, এ সময়ে কারাই বা এসব কেনে সে জানে না, কিন্তু শুকনো প্রাণহীন কণ্ঠকে মাদকীয় করে তোলার চেষ্টায় তাহিরা সফলতা দেখায়। প্রতিবার বিল দেয়ার সময়ে বুড়ো ম্যানেজার বিষ্ণু সরকার আফসোস করে, 'কী প্রতিভা! এইসব আকাজে নষ্ট হইয়া গেলো রে মাইয়া, ধুর ধুর।'

আজ বিষ্ণু সরকারের ভাষ্যেই একটা খারাপ দিন, ঘন্টাখানেক বসে থাকার পরেও ইলেকট্রিসিটি এল না—শোনা গেল ট্রান্সমিটার বার্স্ট হয়েছে বা এ-জাতীয় কোনো সমস্যা। স্টুডিওর কামরা থেকে বের হয়ে তাহিরা দেখল কারচুপির কারিগর একদল নারী-পুরুষ মোমের আলোয় হাসাহাসি করছে কিছু একটা নিয়ে। ওদের পার করেই মূল দরজা খুলে বের হতে হবে। তাকে দেখে অল্প বয়সী একটা মেয়ে হাসি থামিয়ে বলল, 'ম্যাডাম বোসেন, মুড়ি মাখিয়েছি, সোঙ্গে লাল চা ভি আছে।' ওদের ক্রিয়াপদের উচ্চারণে একটা যেন বাড়তি 'আ' থাকে সবসময়, শুনতে মজা লাগে তাহিরার। তবে আজ বসার উপায় নেই। এখানে যেহেতু কিছু হলো না, অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে, নিমন্ত্রণটা তাই সে ফেরায় মৃদু কিন্তু সপ্রতিভ গলায়, 'না রে বুন্দি, আজ যাই, আরেক দিন।'

ভবনটার নিচতলায় ব্যাগের কারখানা, সিঁড়ি দিয়ে নামলে সোজা করিডোর গিয়েছে গেট বরাবর, বন্ধ গেটের পাশে একটা টুলে ঝিমাচ্ছে দারোয়ান—সেদিকে যাওয়ার পথে নাকে আসে প্লাস্টিক, প্রক্রিয়াজাত চামড়া আর পেস্টিংয়ের একটা মিশ্র ঘ্রাণ, ওতে কী রকম মাথা ভার লাগে। তাকে দেখে দারোয়ান দরজা খুলে দেয়ার আগে ছোট্ট করে সালাম ঠোকে হাত নেড়ে। বেশ কায়দার ব্যাপার, যদিও এর দরকার আছে মনে হয় না তাহিরার। এরা যেমন অক্লেশে তাকে শিল্পী ভাবে আজও, সে নিজেকে আর তা ভাবতে পারে কই? গেট পার হয়ে সরাসরি ফুটপাতে এসে পড়লে ধুলোর একটা জাল মুহূর্তেই ছেঁকে ধরে, সানগ্লাস পরা চোখে মাথা তুলে সে ওপরে তাকায় একবার—আকাশের ভাবভঙ্গি কিছুই বোঝা যায় না। এক মুহূর্তের জন্য এমন স্বজনহীন দুপুরে তাহিরার মনে হয় এখন কোথায় যাবে তার জানা নেই। যদিও কিছুক্ষণ পরই আরফার কথা খেয়াল হয়।

ব্যাটারিচালিত রিকশাটা তাকে নিয়ে এগোতে থাকে সাতমসজিদ রোড ধরে ধানমন্ডি বরাবর—একটা শীতল শোঁ শোঁ শব্দ বাহনটির অনিরাপদ গতিকে যেন অনায়াস প্রশংসা করছে, যেকোনো সময় যেকোনো কিছুর ওপর সজোর সংঘর্ষের জন্য টানটান প্রস্তুত। বেখেয়াল না হলে যে কেউ ভয়ই পাবে, হয়তো সেজন্যে তাহিরাও বেখেয়াল হওয়ার চেষ্টা করে: আরফাদের কাফেটা দুই নম্বর রোডে—নামটা সে ভুলে গেছে, বেহেন্স কফিশপ বা এ-জাতীয় কিছু। কদিন আগেই আরফা বলেছিল, 'যেকোনো দরকারে চইলা আসবা। নতুন হইলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হইয়া গিছি আমরা। কালচার্ড পোলাপান আসে এইখানে আড্ডা পিটাইতে।' আমন্ত্রণটা উষ্ণ ছিল না, আরফা খোঁচা মারতে চেষ্টা করছিল—রিকশার মৃদু কম্পনে বিষয়টা ভেবে শব্দ করেই হেসে ফেলল তাহিরা, বিষ্ণু দাসের স্টুডিওর বিষয়টা জানে না তার এ বাল্যবন্ধু, জানলে কী করত কে জানে। রিকশাঅলা তখন পিছন ফিরে জানতে চায়, 'আফা কিছু কইলেন?' সে না সূচক মাথা নেড়ে বলে, 'ভাই, তুমি আস্তে চালাও, এত তাড়া নাই তো।'

ফোন নম্বর না থাকায় আরফাকে না জানিয়েই একজন কাস্টমারের মতো সে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বেহেন্স কাফেই নাম। একটা ফাঁকা টেবিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় যে বিষয়টা তাকে স্বস্তি দিল—কাফেটা চলছে পে ফার্স্ট নিয়মে, সুতরাং কাউন্টারে নিজ উদ্যোগে না যাওয়া অব্দি কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। যদিও অনেকেই তাকে চিনে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে আসা যাওয়ার পথে আড়চোখে তাকায়। লোকে চিনে ফেলে নাকি তাহিরার এমন মনে হয়—এর উত্তরে সে পরের সম্ভাবনাটাই বেছে নেয়; এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাকে কোন কারণে চিনবে? এসব ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল সকালে কিছু খেয়ে বের হয়নি সে, এমনিতেও যে খুব নিয়ম করে ব্রেকফাস্ট করে এমন নয়, তবে এ মুহূর্তে পরিবেশের কারণেই হয়তো বেশ ক্ষুধা লাগে। মেসেঞ্জারে নক দিয়ে সে আরফাকে টোকা দেয়, 'কই তুমি? আমি বেহেন্সে আসছি।' যত দ্রুত মেসেজটা সিন হলো, উত্তর অমন দ্রুত আসে না। অপেক্ষায় কেমন গভীর একটা ক্লান্তি আর অস্বস্তি দুটোই তার শরীর-মনকে আক্রান্ত করতে চায়। কিন্তু এই আক্রমণকে এখন পাত্তা দিলে চলবে না, তার সে উপায়ই নেই। দখলের চিহ্ন হিসেবে হোক বা অবহেলায় হোক, কাঁধের ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে সে ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে যায়।

বেসিনের শীতল পানিতে অনেকক্ষণ ধরে মুখ ধোয় তাহিরা, আরাম লাগে, এমনকি কিছু ক্লান্তিও কাটে। একদম হালকা করে মেকআপ করেছিল, সেটা পুরোপুরি মুছতে সময় নেয়। আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আজ একটু বেশিই বয়স্ক দেখাচ্ছে, বাম কানের পাশে দুটি পাকা চুল, চোখের নিচে কয়েকটা নতুন রেখা। তাহিরা হাসার চেষ্টা করে কিন্তু হাসিটা জমে না—তখন আয়নায় তার প্রতিবিম্বের পাশে যেন ভোজবাজির মতো উদয় হয় আরেকটা মুখ, আরফার খলখলে কণ্ঠ বেজে ওঠে, 'কী বিউটি কুইন, আর কত দেখবা নিজের চেহারা?'

বিব্রত হলেও সামলে নেয় সে, 'আরেহ, মেসেজ দিছিলাম তো। যাক, পাইয়া গেলাম।'

গা দুলিয়ে আরফা হাসে, 'আজকে আইসা ভালো করছো। আমরা নতুন একটা আইটেম চালু করলাম, টাউনের সেরা জিনিস। যদিও আরো অনেক জায়গাতেই এইটা কমন, তবে কাস্টমারেরা চাইতেছিল মেলাদিন ধইরা।'

'স্ন্যাকস-জাতীয় কিছু না হইলে খাওয়াও। আমার ক্ষুধা লাগছে। ভারী কিছু দরকার।'

'ভারী হালকা সবই নাও, সমস্যা কী। কফি কোনটা নিবা বলো।'

'রেগুলার লাতে।'

হাতের ইশারায় একটা ছেলেকে ডাকে আরফা। অর্ডার পাস করে দেয়। অনুগতের মতো মাথা নেড়ে ছেলেটা চলে গেলে আরফা বলে, 'তা বলো দেখি সুন্দরী, এমনে এমনে তো আসো নাই আমার কাছে, ঝাইড়া কাশো।'

'তোমাদের এখানে তো একটা মিউজিক প্রোগ্রাম চালু করবা বলছিলা। করে ফেলছ নাকি?'

'করছি তো অলরেডি।'

সরাসরি নিজ থেকে প্রস্তাবটা দিতে তাহিরার কেমন যেন গায়ে লাগে। কথা ঘুরাতে সে বলে, 'বিজনেস তাহলে ভালোই চলতেছে, কী বলো?'

'হ, তা চলতেছে। আর শোটাও বেশ জমছে, একেক সপ্তায় একেকজন গায়। আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডের কিছু পোলাপান আসে, এছাড়া উঠতি সিঙ্গার এত আছে শহরে চিন্তা কইরা পারবা না।'

'আচ্ছা।'

এরপর আসলে তেমন কথা চলে না, অস্বস্তি আসে, টেবিলে রাখা বোতল খুলে কয়েক ঢোক পানি খায় তাহিরা। এর কিছুক্ষণ পরেই খাবার চলে আসে—হান্টার বিফ স্যান্ডউইচ, বেশ বড় এক স্লাইস চিজ কেক, কাপভর্তি লাতে।

আরফা বলে, 'চিজ কেকটাই আমাদের নিউ আইটেম বুচ্ছ, এক ইতালিয়ান শেফ এইটা বানায়, একদম অরিজিনাল স্বাদ পাইবা।'

স্যান্ডউইচে বড় কামড় বসিয়ে সময় নিয়ে চিবায় তাহিরা। ভিতরে মাংসের পাতলা ফালি কিছুটা শক্ত হলেও সুস্বাদু ও রসালো, তার ভালো লাগে, মুখ জলে ভরে ওঠে। আরফা চোখে আগ্রহ আর কৌতুক মিশিয়ে চেয়ে থাকে—যা দেখে তার হাসি পায়, রাগও লাগে। কথাটা বলেই ফেলবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত আর নেয়া হয় না। কিন্তু আরফা এত সহজে ছাড়ে না তাকে, 'ভালো কথা, কেনো আসছ বললা না কিন্তু, মিউজিক শোর খবর জিগাইলা যে?'

'ওই এমনিই আরকি। ভাবলাম দেইখা যাই তোমার কাফেটা।'

'আচ্ছা। বুঝতে পারছি। ভাবলাম আর কিছু বলবা কিনা। তো বন্ধু খাইতে থাকো, আমি একটু কাউন্টারের দিকে যাই, কিছু কাজ সামলাইতে হবে।'

'যাও', সে মাথা নাড়ে, কিছুটা বোকার মতোই। যেন এখানে এসেছিল ফ্রি লাঞ্চের জন্য। আরফার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে

তার কানের দুই পাশ গরম ভাপ ছাড়তে থাকে। নিঃশব্দে কফির কাপটা খালি হয়ে যায় দ্রুত।

তিন নম্বর রোড হয়ে লেক এরিয়ায় ঢুকে পড়ল সে হাঁটতে হাঁটতেই। একটা সিমেন্টের বেঞ্চে বসে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টায় স্ক্রল করে গেল ফোনের স্ক্রিন, ফেসবুকে আজ তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা চোখে পড়ল না, গ্যালারি খুলে একের পর এক ছবি স্লাইড করে গেল। আরফা এই অপমানটা তাকে করবে সে কি জানত না আগে? তবু সেধে কেনো ওখানে গেল? এর উত্তরও সহজ, কাজ দরকার তার।

জিগাতলা থেকে বাসে চড়ে আবার আল্লাহ করিম, সেখান থেকে রিকশায় আদাবর বাজার। এরপর মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ—ভাঙাচোরা, এক পাশে একটা ডাস্টবিনও পড়ে, ওই সময়টুকু আর সবার মতো তাহিরাও নাক চেপে পার হয় রোজ, আজ যেমন শাড়ির আঁচল দিয়ে সারল কাজটা। পাহারাহীন স্যাঁতসেঁতে সাড়ে সাততলা বিল্ডিংটা দেখা যায় তারপর, বহুসময় লাগিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সে পৌঁছায় সবচেয়ে ওপরের ফ্লোরে। সাততলার ওপরে অর্ধেক ছাদ, বাকিটায়—তাদের উনো অ্যাপার্টমেন্ট—একটা বড় কামরা যা দিয়ে বেডরুম ড্রয়িং ডাইনিং সমস্ত কাজ চালিয়ে নিতে হয়, অ্যাটাচ বাথ, কিচেন।

দরজা খোলাই ছিল, আলো জ্বলছে ভিতরে আর বাইরে আরো একটা বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। ভিতরে ঢুকে সে দেখল টেবিলে ঝুঁকে কিছু লিখছে মাজনুন।

'কতদূর আগাইলো উপন্যাসটা?'

মাজনুন লেখা থামিয়ে তাকাল, হাসিমুখে বলল, 'বুঝতেছি না, লিখেই যাইতেছি, কিন্তু কোনদিকে যে যাইতেছে বিষয়টা, আসলেই ধরতে পারতেছি না।'

গত চার বছর ধরে একই কথা বলে যাচ্ছে মাজনুন। তার উপন্যাস আর শেষ হচ্ছে না। এসবের ফাঁকে পত্রিকায় লিখছে নিয়ম করে ফিচার, গল্প, অনুবাদ। একটা ধুঁকতে থাকা পোশাক কারখানায় অ্যাকাউন্টসে কাজ করে সে। সেই চাকরি নিয়ে ইদানীং বেশ ঝামেলা যাচ্ছে, সেকশন ইনজার্জ দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার—লোকটা এখন যদি ইচ্ছা করে শয়তানি করে, তার নাম নেয়—চাকরিটা যাবে। ওসব ভুলেই লেখায় মন দিতে চাইছিল। তাহিরার শুকনো মুখ দেখে তার চাপা দেয়া দুশ্চিন্তাটা ফেরত আসে। নিঃশব্দে সে তাকিয়ে থাকে নতুন কোনো প্রশ্নের বা প্রসঙ্গের আশায়।

'আজ আরফার সঙ্গে দেখা হইলো বুচ্ছ? মনে আছে না ওর কথা?'

মাজনুন মাথা নাড়ে। তাদের বিয়েতে এসেছিল আরফা। অনেক বছর আগের কথাই হবে। তাহিরা বলে, 'পুরাই খানকি মাগি হইয়া উঠছে বুঝলা না? দেমাগ দেখলে গা জ্বইলা যায়।'

মাজনুন কিছুটা বোঝে, কিছুটা অনুমান করে—থাকে না এমন, খুব কাছের দুই বন্ধুর মধ্যে ছোট থেকেই একটা প্রতিযোগিতার ব্যাপার। সবকিছুতে। পরীক্ষার ফলাফলে, প্রথম প্রেমে, বিয়ে বাচ্চাকাচ্ছায়, পেশাগত জীবনে—একসময় বন্ধুত্ব মরে যায়, বন্ধুত্বের নামে থাকে শুধু প্রতিযোগিতা, একে অন্যের খোঁজ রাখা হয় খোঁচা মারামারি বজায় রাখার জন্য। তাহিরার সঙ্গে আরফার বিষয়টা অমন কিছুই হয়ে থাকবে—বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করে না তার।

পোশাক ছাড়তে ছাড়তে তাহিরা বলে যায়, 'রেকর্ডিংয়ে আজ সমস্যা হইলো, ভাবলাম ওদের কাফেটা ঘুইরা আসি। নতুন দিছে, বেশ নাম করছে শুনছিলাম। এখন বিরক্ত লাগতেছে। না গেলেও পারতাম। আমার কপালও দেখো। রোজ একটু করে নিচে নামতেছি। তোমার কোনো গল্প উপন্যাসের চরিত্র হইতে পারব, কী কও?'

ঝুঁকি আছে জেনেও মাজনুন চটুল ভঙ্গিতে বলে, 'পারবা, তবে একটা পরিণতি তো লাগে চরিত্র হইতে হইলে, তোমার পরিণতি এখনো আসে নাই।'

'পরিণতি আসে নাই? বেটা লোকের খাড়া সোনা বিশ সেন্টিমিটার লম্বা করার বিজ্ঞাপন রেকর্ড করতেছি ভেষজ কোম্পানির জন্য, এরপরেও তোমার মনে হইতেছে পরিণতি আসে নাই?'

'বিশ সেন্টিমিটার আসলেই লম্বা হয় নাকি ওইটা? সম্ভব?'

তাহিরা হেসে ফেলে। অনেক যন্ত্রণার মধ্যেও মাজনুনের কিছু ব্যাপার তাকে স্বস্তি দেয়, জীবনের যেকোনো শঙ্কাই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে লোকটা—সে কেন পারে না? এসব ভাবতে ভাবতেই ওয়াশরুমে ঢুকে যায়, গোসল করে অনেক সময় লাগিয়ে। অতঃপর বের হয় প্রায় ভেজা চুল নিয়েই। মাজনুন ততক্ষণে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, ফিনফিনে ধোঁয়ার রিং বাতাসে ভাসিয়ে সে বলে, 'প্রথম আলো থেকে বড় একটা বিল নিয়ে আসছি, অনেক লেখা জইমা গিছিল। রাইতে কী খাবা বলো। কাচ্চি?'

গভীর রাতে তাদের নিয়মতান্ত্রিক এবং অরক্ষিত যৌনতা চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছলে দুজনেই আবিষ্কার করে ঘেমে কাদা হয়েছে পারস্পরিক অস্তিত্ব—চৈত্র এখন, ওপরের ফ্লোরের এই অসহ্য গরম তারা দরজা জানালা খুলে সামাল দিতে চেষ্টা করে একেক দিন। স্বভাবতই এই অতি ঘনিষ্ঠতার সময়টুকুতে চারপাশ ভালোমতো এঁটে দেয়া হয় অভ্যেসের বশে। কাল্পনিক ঘোড়সওয়ারির এমন এক মুহূর্তে তাহিরা কাঁপা গলায় খুব কঠিন একটা কথা বলে মাজনুনকে চমকে দিতে চায়, 'এমন যদি হয়, সময়ের আগেই আমার মেনোপজ চইলা আসে, কী করবা তুমি?' কিছুক্ষণ চুপ করে উপভোগ করে যায় মাজনুন, জবাব দিতেও ইচ্ছা করে না, তারপর নিজ থেকে আচমকা এমন দ্রুতলয়ে সক্রিয় হয় যে তাহিরা হয়তো প্রশ্নটা ভুলেই যায় কি যায় না। তবে রাগমোচনের পর পাশাপাশি শুয়ে মুখোমুখি অবস্থায় প্রসঙ্গটা তোলে সে, 'বউয়ের মেনোপজ শুরু হইলে আর বেটারা যা করে, আমিও সেইটাই করব। আমি তো আলাদা কেউ না।'

'আর বেটারা কী করে?'

'করে বহু কিছু, কিংবা কিছুই করে না...', বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালায় মাজনুন। শব্দ করে চলছে বৈদ্যুতিক পাখা, সে দরজাটাও খুলে দেয় আর বেশ নরম শীতল একটা বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ে।

'লিখবা নাকি এখন?'

'দেখি চেষ্টা করে। কাল ছুটি আছে।'

'উইকেন্ড তো শেষ, কীসের ছুটি?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে মাজনুন বলে, 'নিছি ছুটি, জমছে বেশকিছু। তোমার কাজ না থাকলে কাইল চলো ঘুইরা আসি কোথাও থিকা।'

মেসেঞ্জারে আরফার বার্তাটা আসে ঠিক সে মুহূর্তেই, 'জাইগা আছো? একটা দরকারে নক দিলাম।' কয়েক ঘণ্টা আগের রাগ-ক্ষোভ ছাপিয়ে একটা ঔৎসুক্য দখল করে নেয় তার হৃদয়, সে উত্তর লেখে, 'আছি, কী বিষয় বলো।' ফিরতি বার্তা না দিয়ে আরফা ওভার দ্য নেট কল করে। খোলা দরজা দিয়ে ছাদে বের হয়ে সেটা রিসিভ করে তাহিরা।

'কী অবস্থা বন্ধু? তখন তো চইলা আসলা তাড়াহুড়া কইরা।'

'এত রাতে এইটা বলতে কল দিছো?'

'এহহে বিলা হইয়া আছো। কল দিছি দরকারেই। তুমি না আমাদের মিউজিক প্রোগ্রামটার বিষয়ে জিগাইতেছিলা, অই বিষয়েই।'

'বলো শুনতেছি।'

কথা শেষ করে চারদিকে তাকিয়ে কিছুটা চমকে ওঠে তাহিরা। বিরান মাঠের মতো লাগে বড় ছাদটাকে, আকাশে চাঁদ-তারা কিছুই নেই—কৃষ্ণপক্ষ চলছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল একদম রেলিংঘেঁষে। নিচে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, মাঝবরাবর থেমে আছে একটা রিকশা।

এ্যাপ ২টি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে যথাযথ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে হিসাব খোলা ও লেনদেন করা যাবে

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
Agrani Bank PLC.
Committed to serve the nation

www.agranibank.org

কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পপুলার লাইফের ভূমিকা

দেশের "কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পপুলার লাইফের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভা ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স এর স্বপ্নদ্রষ্টা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। কোম্পানীর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর উদ্যোক্তা পরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যান আমির হুমায়ূন মাহমুদ চৌধুরী, কোম্পানীর উদ্যোক্তা পরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ মোতাহার হোসেন, উদ্যোক্তা পরিচালক শাহজাদা মাহমুদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কোম্পানীর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শওকত আলী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে প্রধান অতিথিকে বক্তব্যরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

জীবন বীমায় বিশ্বস্ত নাম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

রিকশাঅলা মুখ উঁচু করে যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে—অনড় অবিচল।

ঘরে ঢুকে সে দেখল মাজনুন ঘুমিয়ে পড়েছে। কী ভেবে টেবিল ল্যাম্পটা আর নিভাল না। অনেক দিন পর এককালের প্রেমিক আর বর্তমানের সঙ্গীকে জড়িয়ে ধরে সে চোখ বুজল।

***

প্রিয় সুধী, শুনুন, বলছি আপনাকেই। ঘুমে কি খুব সমস্যা হচ্ছে আজকাল? স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না? যৌনমিলনে মিলছে না তৃপ্তি? স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়ে বিছানায় প্রস্রাব করে দিচ্ছে? ব্যবসায় মন্দা? চাকরিতে পদোন্নতি হচ্ছে না? আপনি কি বেকারত্বের অভিশাপে ক্লান্ত? হয়েছে দুরারোগ্য ব্যাধি? তবে ভাই ও বোনেরা, শুনুন, আপনাকেই বলছি। আপনাকে নিশ্চিত সমাধান দেবে সুবিখ্যাত সৈয়দ নেছারুদ্দিন মহাজাতকের আশীর্বাদপুষ্ট রত্নপাথর। এই রত্ন ধারণের এক মাসের ভিতরে আপনার জীবনে সুনিশ্চিত...

একঘেয়ে লাগে প্রতিবারই, তবু পেশাদারিত্বে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শব্দবাক্যগুলো মাইক্রোফোনের সামনে আউড়ে যায় তাহিরা। আজ পরপর কয়েকটা স্ক্রিপ্টের কাজ আছে। একটু ব্রেক নিয়ে ফেসবুকের নিউজফিড স্ক্রল শুরু করে সে। খবরটা চোখে পড়ে তখন। কোনো এক তরুণ কণ্ঠশিল্পীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে তিনশ ফিটের নির্জন রাস্তার এক ধারে। পুলিশের ধারণা হত্যাকাণ্ড। ফেসবুক পোস্ট মারফত এর বেশি সে জানতে পারে না। ছেলেটার হাস্যোজ্জ্বল ছবির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট টুটুল দুধ চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। সিলিংয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিকট শব্দ করে চলে ফ্যান। সে রেকর্ডিং বক্সে ঢোকামাত্রই ওটা বন্ধ করে দেয়া হবে। বুড়ো বিষ্ণু সরকার কাউন্টারের ওপাশে প্রাচীন রিভলভিং চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে, মৃদু নাক ডাকছে তার। তাহিরা উপায় না পেয়ে টুটুলকেই জিজ্ঞেস করে, 'খবরটা দেখছিস টুটুল? অই যে তিনশ ফিটে এক গায়কের লাশ নাকি পাইছে?'

টুটুল বিমর্ষ কণ্ঠে জানায়, 'ম্যাডাম মনে কয় খিয়াল করেন নাই, এই রকম তিনডা ডেডবডি মিলিছে গেল কয়েক সপ্তায়। তিনজনেই গান করে, এখ্যান মাইয়েও আছে এইগে মধ্যি। মানে এই তিন নম্বর ঘটনার পর সবার চোখে লাগতিছে।'

'কী বলিস!'

'হই। কী যে হচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে না।'

চা শেষ না করেই আবার রেকর্ডিং বক্সে ঢুকে পড়ে সে, দিন কয়েক আগে সেই রাতে ছাদে দাঁড়িয়ে যে অস্বস্তিকর ফাঁকা একটা অনুভূতি মনে চেপে বসেছিল, ফিরে আসে সেটা। কী রকম এক তাড়াহুড়ার বোধও ভিতরে জাগে, মনে হয় যে খুব দ্রুতই বাসায় ফেরা দরকার।

যদিও ঘণ্টা দুয়েক পর তাকে বেহেস্ত কাফের একটা কোজি কর্নারে বসে থাকতে দেখা যায়। বাইরে ঝরছে অসময়ের বৃষ্টি। স্বচ্ছ কাচের দেয়াল, এই উঁচু থেকে পুরো শহরটাকে ভিজতে দেখার মধ্যে কেমন এক ঘোর লেগে আসে, যেন অনেক দূরে বসে মেঘমল্লার গাইছেন ওস্তাদ লাতাফাত হুসেন খান। আরফা তার মুখটা এগিয়ে আনে, নিচু কণ্ঠে বলে, 'কাজ একদম সহজ। সর্বোচ্চ তিন থেকে চারটা গান গাইতে হবে, চল্লিশ মিনিটের স্লট। পারবা না?'

'কিন্তু অমন উদ্ভট সময়ে কেন? আর অত রাতে আমি বাসায়ই বা ফিরব কীভাবে?'

'আরে বাসায় ফিরা নিয়া ভাইবো না। এরা এলিট লোকজন। আমজনতার চোখের আড়ালে মিটআপ করে নিজেদের মতো। এলিট মানে একেবারে বিএমডব্লিউ—অদি টাইপের এলিট। বাসায় তোমারে পৌঁছাইয়া দিবো। আর এক শো-তেই মোটা টাকা পাইবা।'

'আমি যে গাইব, বাজাবে কারা? ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিসেরও তো কিছু বিষয় আছে।'

'আরে এ নিয়ে চিন্তাই কইরো না, সেই যুগ কি আর আছে? তুমি রাজি কিনা ভাইবা দেখো।'

ভেবে দেখার মতো কিছু আসলে পায় না সে। কাজটা দরকার। দরকার একটা পুনরাবির্ভাবেরও। সেই কোন এক যুগে খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তার কিছু গান, মানুষের মুখে মুখে ফিরত, কয় দশক আগের কথা সেসব? এত দ্রুত কেন সবাই ভুলে যায় সবকিছু?

***

বিষয়টা মাজনুনের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ মেলে না। করতে পারলে হয়তো ভালো হতো এমন মনে হয়।

রাত সাড়ে এগারোটায় গাড়িটা কথামতো তাকে তুলে নেয় রিং রোডের এক মোড় থেকে। কাচের পার্টিশনের কারণে ড্রাইভিং সিটে কে আছে সে দেখতে পায় না। এসির তীব্রতা আর পারফিউমের সুবাসে খুব আরামদায়ক একটা অনুভূতি হয়। জায়গামতো পৌঁছতে তেমন সময় লাগে না, রাস্তা এ সময় আর যেকোনো দিনের মতো ফাঁকাই পাওয়া যায়। সামনে থেকে অনুরোধ আসে, 'একটু অপেক্ষা করবেন ম্যাডাম। আমরা এখন পার্ক করব।'

গাড়ি থেকে নেমে সরাসরি বেজমেন্টের লিফটে চড়েই সে ওপরে ওঠে।

বেহেস্তের ভিতরের দিকে এমন আলাদা একটা জায়গা আছে দিনের বেলা কখনো খেয়াল করেনি তাহিরা। কাউন্টারে কেউ নেই, আরফাকেও দেখা যায় না কোথাও। মুখে ময়ূরের পালকের মুখোশ ঢাকা এক ধোপদুরস্ত সুটেড বুটেড লোক তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে, হাতের ইশারায় স্টেজের দিকে যেতেও ইশারা করল। একজন পারকাশনিস্ট, ড্রামে একজন, একজন গিটারিস্ট। এই তার ব্যান্ড। তার মতো এদের মুখেও কোনো মুখোশ নেই, কিন্তু চেনা লাগে না কাউকেই। মৃদু হাসি বিনিময় করে ওরা। নিচু গলায় সে জানতে চায়, 'কী বাজাবেন আপনারা, আর আমিই বা কী গাইব?'

পারকাশনের পিছনে দাঁড়ানো নেভি ব্লু টি-শার্ট আর সাদা ডেনিম পরা মোটা লোকটি আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠে জানায়, 'ম্যাডাম, আপনার যা ইচ্ছা গাইবেন, আমরা আপনার সুর ধরে বাজাব।'

এরপর বেশ অনেকটা সময় কাটে খাওয়াদাওয়ায়। মুখোশ পরা কয়েকজন ওয়েটার টেবিলে নিয়ে আসে ওভেন বেকড পাস্তা, চিকেন শাসলিক, ফ্রায়েড প্রন আর ব্ল্যাক কফি। এগুলো সে অর্ডার করেনি, তবে তার গানের সঙ্গী লোকগুলোর আচরণে বোঝে এসব আগে থেকেই ঠিক করা, সেট মেন্যুর মতো। খাওয়া শেষে যখন তারা আবার স্টেজে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কাফের বড় ঘড়িতে একটার ঘণ্টা বাজে—এমন বিকট লাল রঙের গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক কোত্থেকে জোগাড় করল আরফা, ভেবে পায় না তাহিরা।

তখনই দৃশ্যটা সে দেখে। এক রকম সরব হাসাহাসিকে সঙ্গী করে ভিতরে প্রবেশ করে মুখোশ পরা পনেরো বিশজন মানুষ, সকলের পরনেই একই রকমের পোশাক—সবুজ হাওয়াই শার্ট, সাদা সুতির ব্যাগি ট্রাউজার, পায়ে চকচকে কালো বুট জুতা। তারা যে যার মতো বিভিন্ন চেয়ার টেবিলে বসে পড়ে, হাসির রোল স্তিমিত হয়ে আসে, নিজেদের মতো লোকগুলো কথা বলতে শুরু করে—এই দূরত্ব থেকে কিছুই কানে আসে না। এদের মাঝখানে এমন এক কোনায় দাঁড়িয়ে নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগে তাহিরার, সে একজন শিল্পীই তো—নিজেকে অনেক দিন পর একজন শিল্পী মনে করার ভাবনাটা ফিরে আসে অহমের রূপ ধরে, মনে হয় কোনো বাক্য ব্যয় না করেই এখান থেকে তার চলে যাওয়া উচিত। এরপর অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ঘটে। লোকগুলো আড্ডা থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। পাশ থেকে গিটার কাঁধে ঝোলানো লোকটা ফিসফিসিয়ে ওঠে, 'ম্যাডাম, প্লিজ শুরু করেন।'

অন্তত মিনিট খানেক সে ভেবে পায় না কী গাইবে। মুখোশ পরা অবয়বগুলো পাথুরে মূর্তির মতো চেয়ে থাকে, আর এসির শীতলতায় দাঁড়িয়েও মেরুদণ্ড বেয়ে ঘামের সরু একটা রেখার নেমে আসা টের পায় তাহিরা। তারপর অকস্মাৎ আর কিছু না ভেবেই শুরু করে, অনেক বছর পর, যেন সে তারুণ্যে ফিরে গেছে—

'আমি কি রইলাম বন্ধু একেলা সাঁঝের কুলে
তোমার ছায়া পড়িলো আমার কানের দুলে
শোকে নাই সন্তাপেও যে নাই
বনবাসে আইসা কুলও যায় রাই
বসন্ত হায় মিছে কহে নাই আমারে তুমি যাইবা ভুলে...'

গান শেষ হয়, মুখোশে আড়ালে দর্শকদের ভিতরে কী প্রতিক্রিয়া জাগল জানা হয় না। তবে বিরূপ কিছু হয়নি সে বোঝে, লোকগুলো নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে, কী ভেবে সে গায় ফাইভ হান্ড্রেড মাইলস, বার্লিনের টেইক মাই ব্রিদ অ্যাওয়ে, রবীন্দ্রনাথের মায়াবন বিহারিণী। আর শেষ টানে জোয়ান বায়েজের ডায়মন্ড অ্যান্ড রাস্ট দিয়ে।

... Cause I need some of that vagueness now
It's all come back too clearly
Yes, I loved you dearly
And if you're offering me diamonds and rust
I've already paid

তাকে অবাক করে দিয়ে ওরা সবাই উঠে দাঁড়ায়, আর তালি বাজায় সশব্দে। ব্যাপারটা এমন বেসুরো আর অপ্রত্যাশিত ঠেকে যে অচেনা একটা আতঙ্কে কাঠ হয়ে দৃশ্যটা দেখে যায় তাহিরা। উপভোগ করতে পারে না এক বিন্দু।

তালিপর্ব শেষে যেভাবে এসেছিল, তেমন হইচই করতে করতে কাফে থেকে বেরিয়ে যায় ওরা। মুখোশধারী একজন ওয়েইটার এসে তাকে জানায়, 'ম্যাডাম যেভাবে এসেছেন, সেভাবেই লিফট ধরে গ্রাউন্ডে নেমে যাবেন, দেখবেন আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ড্রাইভার।

রাত আড়াইটার দিকে কালো গাড়িটা তাকে আদাবরে একদম বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে যায়। এত রাতেও এখানে নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার মনে হয় অনেকগুলো চোখ আশপাশের বিবিধ বারান্দা থেকে জানালা থেকে লক্ষ করছে তার গতিবিধি। নিঃশব্দে সে ঢুকে পড়ে কেঁচিগেটের তালা খুলে। সিঁড়িতে অন্ধকার, বাধ্য হয়ে ফোনের আলো জ্বালিয়ে নিতে হয়। ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারে মাজনুনের দেখা সহজে সে আর পাবে না, দুইদিন আগে বেরিয়েছিল লোকটা, ফেরেনি আজও।

পরের দিন টানা দুপুর অব্দি ঘুমায় সে। ঘুম ভাঙে আরফার কলে, 'বান্ধবী, তোমার তো কপাল খুইলা গেল।'

'কী হইছে?'

'ওরা তোমার গান পছন্দ করছে খুব। প্রতি বুধবার রাইতে এমন একেকটা শো। কী বলো?'

তাহিরা কিছু বলে না। কিন্তু এর পর থেকে প্রতি বুধবার মধ্যরাতে নিজেকে সে আবিষ্কার করে একদল মুখোশধারী দর্শকের সামনে ঘুরেফিরে একই জিনিস ক্লান্তিহীনভাবে গেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তার নিজের কিছু গান, এক কালে যেসব গান খুব হিট করেছিল, তারপর কভার। প্লে-লিস্টও বদলায় না খুব একটা।

তবে এসবের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার ভাগ্য বদলে যায়। আদাবরের আবাসটা ছেড়ে দেয়, উঠে পড়ে লালমাটিয়ায় টানা বারান্দাঅলা প্রশস্ত একটা ফ্ল্যাটে, সেখানে খুব আলো-বাতাস খেলে, আর টবে লাগায় কয়েক প্রজাতির ক্যাকটাস, গোলাপ, নয়নতারা আর নাইট কুইন। খাঁচায় একটা ককাটেল পোষে, পাখিটা একই শব্দ বারবার বলে, 'পুসি পুসি পুসি...'

জীবনের এমন পরিবর্তনের কারণগুলো খুব অতলে গিয়ে যে সে ভেবে উঠতে পারে তাও নয়। শুধু ভেসে যাচ্ছে এটুকু বোঝে—সময়ের বাতাসে একটা ফুলের রেণুর মতো। বুড়ো বিষ্ণু সরকার একেকদিন ফোন করলে সে বলে, 'আসব বিষ্ণু দা, আগামী সপ্তাহে আসব।' ওই পর্যন্তই। অষ্টধাতুর গুণাগুণ বা যৌনতাবর্ধক বলারিস্টের প্যামফ্লেট রেকর্ড করতে একটা প্রায় প্রস্তর যুগের স্টুডিওতে যাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ভেবে তার হৃদয়ে আশ্চর্য শান্তি নামে।

এসমস্ত আত্মবিশ্বাসী দিনগুলোতেই একদিন তাহিরা ঠিক করে মুখোশধারীদের আসরে আর সে যাবে না। অনেক তো হলো। হাতে কম অর্থ জমেনি। এ দিয়ে এমনকি সে চাইলে আরফার মতো একটা কাফে কিংবা কমপক্ষে একটা রেস্তোরাঁও খুলে বসতে পারে, সঙ্গে ছোট্ট করে একটা গানের স্কুল।

ফোনে আরফাকে কথাটা জানাতেই ওপাশে একটা অসহ্য নীরবতা নেমেছে তা বুঝতে পারে।

'ছেড়ে দিবা? কেন কী হইলো হঠাৎ?'

'কিছু হয় নাই। আর ভাল্লাগতেছে না আসলে।'

'ভালো না লাগলেই ছাইড়া দিতে হবে? সবকিছুর তো একটা নিয়ম আছে...'

অকস্মাৎ কি আরফার কণ্ঠ একটু চড়ে যায়? যায় হয়তো। তবু সিদ্ধান্তটা আরেকবার শীতল কণ্ঠে জানিয়ে ফোন রেখে দেয় তাহিরা।

জমানো টাকাগুলো দিয়ে কী কী করা যায় এর একটা স্বচ্ছ ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলে সে। ব্যাংকের সঙ্গেও কথা বলে লোনের জন্য। তারপর বেশ অনেক দিনের বিরতি দিয়ে একদিন জেলখানায় যায় মাজনুনের সঙ্গে দেখা করতে। লোকটার বলা সব কথাই বিশ্বাস করতে ভালো লাগে তার। বিনা অপরাধেই হয়তো সাজা খাটছে, বাসা থেকে পালিয়ে যাওয়াটা আসলে ভুল হয়েছিল—অকপটে স্বীকার করে মাজনুন, 'বুঝলা, বের হইয়া এই দফায় উপন্যাসটা শেষ কইরা ফেলব দেইখো।'

'আচ্ছা কইরো। শোনো, আমি একটা পাখি কিনছি জানো?'

'কী পাখি? কথা কয়?'

'একটাই শব্দ বলে—পুসি। কোই থিকা শিখছে কে জানে।'

'নতুন বাসায় একা থাকতে ভয় করে না?'

'করে। একটা কাজের মাইয়া রাখছি যদিও। তুমি বের হবা কবে?'

মাজনুন বলে, 'আর বেশি দিন নাই।'

***

এক হেমন্তের মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায় তাহিরার। মনে হয় যে কোথাও ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। তার মনে হয় যে ড্রয়িংরুমে অনেক মানুষের শোরগোল। নাকি দরজার বাইরে থেকে আসছে শব্দ? ফ্ল্যাটে আজকাল কত রকমের দুর্ঘটনা ঘটে, ডাকাত পড়ে, আগুন লেগে যায়।

বিছানা থেকে উঠে সে ঘরের বাতি জ্বালায়। দরজা খুলতেই প্রথমে পড়ে ডাইনিং। শোরগোলটা কোথা থেকে আসছে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারে। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সেদিকে। পর্দাটা এক হাতে সরিয়ে দেখে ডিম বাতির নিচে পনেরো বিশজন মানুষ, পরনে সবুজ হাওয়াই শার্ট আর ব্যাগি সুতি ট্রাউজার, পায়ে চকচকে কালো জুতো। ওদের সবার মুখে একই রকমের মুখোশ। তাকে দেখে ওরা শোরগোল থামিয়ে দেয়। এরপর মুখোশগুলো একে একে খুলে ফেলতে থাকে। সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির মুখ দেখতে পায় তাহিরা। ঠিক লোকও নয়—পরিপাটি চুল, সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফের একজন তরুণ, তার পাশের মুখটিও হুবহু একই রকম; একই উচ্চতা, তার পাশের মুখটিও—সবাই যেন একে অন্যের প্রতিবিম্ব পাশাপাশি।

তাহিরাকে ওরা একটা মঞ্চ প্রস্তুত করে দেয়—সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে যেন একপাল দর্শক-শ্রোতা, অতঃপর জলদ গম্ভীর কণ্ঠে ওদের কেউ আদেশ করে, 'গাও।'

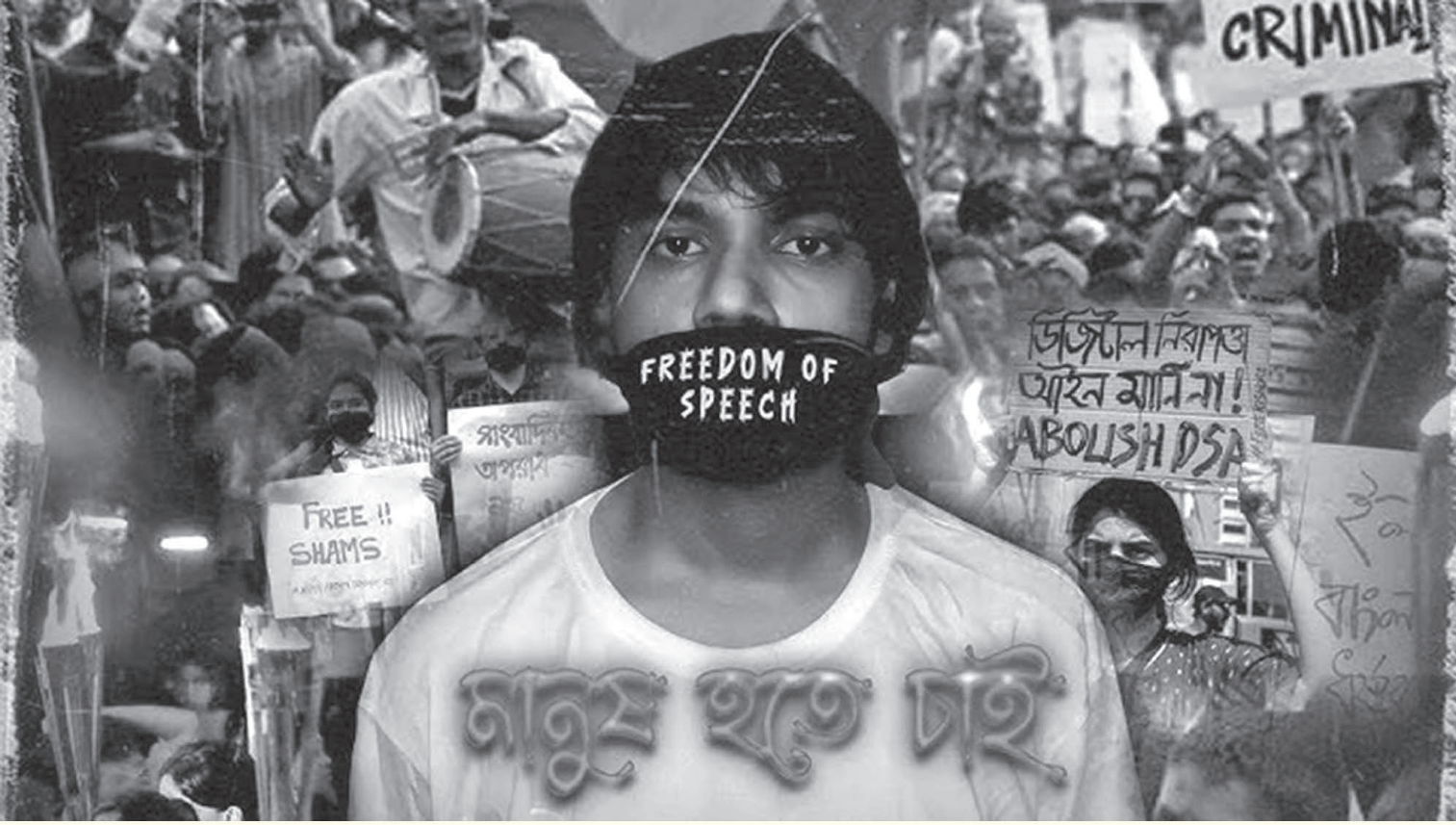

ছবি : গোল্ড কিউব

প্রতিবাদের গান সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে

প্রেক্ষিত চব্বিশের জুলাই

হুমায়ূন আজম রেওয়াজ

আমার প্রতিবাদের ভাষা/আমার প্রতিরোধের আগুন
দ্বিগুণ জ্বলে যেন/দ্বিগুণ দারুণ প্রতিশোধে
করে চূর্ণ ছিন্ন-ভিন্ন/শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন
আনে মুক্তি আলো আনে/আনে লক্ষ শত প্রাণে।

(কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী)

প্রতিরোধ, প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে সংগীতের অনিবার্য উপস্থিতি নতুন করে ব্যাখ্যা করার নেই। আমেরিকায় সিভিল রাইটস মুভমেন্ট, চিলিতে নিউ সং মুভমেন্ট, ভারতবর্ষে আইপিটিএ আন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ-আন্দোলন কিংবা চব্বিশের জুলাই, গান আছে সর্বত্র, নানা রূপে-মাত্রায়! পৃথিবীজুড়ে কোনো রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনই বোধকরি এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংযোগ এড়াতে পারে না। কোনো কোনো আন্দোলনের রেশ পেরোয় ভৌগোলিক সীমারেখা। চব্বিশের জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে নয়া মাত্রা যোগ করে। সুদীর্ঘ ফ্যাসিবাদী তথা অগণতান্ত্রিক শাসনের বৃত্তে গতানুগতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভাষা যখন প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ছিল তখন চব্বিশ নয়াভাষ্যে নয়া বাস্তবতা নিয়ে প্রোজ্জ্বল। এ নতুন ভাষ্যের অগ্রভাগে র‍্যাপ গানের উচ্চকিত, আগ্রাসী উপস্থিতি বিগত দিনগুলোর নান্দনিকতাকে প্রায় নাকচ করে দিয়ে নতুন সমীকরণ হাজির করেছে। চব্বিশের র‍্যাপ গান যেন নতুন দিনের গণসংগীত। অথচ একুশ শতকের বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে সংগীত তথা সাংস্কৃতিক তৎপরতা প্রায় নিবুনিবু হয়ে বিনোদনবাদিতা, আপসকামিতা আর ক্ষমতা কাঠামোর অনুগত নেপথ্য সংগীতই হয়ে উঠছিল প্রায় সর্বাংশে। চব্বিশের চেতনাবৃত্ত নির্ণয়ের কালে আমরা দেখব যে '৫২, '৭১, '৯০ হতে এ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক মূহূর্তগুলো জুড়ে আছে পরস্পর। জুলাইয়ের তুমুল কোলাহল তাই নিবিড় পাঠ দাবি করে বৈকি।

জুলাইয়ের অগ্নিশপথ চূড়ান্ত ভাষা পেয়েছে র‍্যাপ গানে—এটা নির্বিবাদে মেনে নেয়া যায়। তবে তথাকথিত মূলধারার সাংস্কৃতিক মাধ্যমের আপাত ব্যর্থতা খতিয়ান কিংবা এ বিরুদ্ধ স্রোতে দ্রোহের সলতে জ্বালিয়ে রাখা চিহ্নগুলো পাঠ করাও জরুরি, কেননা সে চিহ্ন আমাদের টেনে নিয়ে যাবে অতীত ও ঐতিহ্যের দীর্ঘ পথে! বাংলা র‍্যাপ গানের এ বৈপ্লবিক উত্থান মোটেও সরলরৈখিক ঘটনা নয়। বাংলা গানের ইতিহাসে এর নাড়ি পোঁতা আছে ঢের আগে

থেকেই, আর চব্বিশে তারই চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটেছে। মিজানুর রহমান নাসিম সম্পাদিত 'র‍্যাপচার : জুলাই অভ্যুত্থানের র‍্যাপসঙ্গীত' গ্রন্থটি বাংলা র‍্যাপ গানের উত্থান পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থেই দেখতে পাই, র‍্যাপার Restive (সাদিদ বিন ফেরেদৌস) এক আলাপচারিতায় বাংলা র‍্যাপ গানের শিকড় খুঁজতে গিয়ে কবিগানের ঐতিহ্যের সঙ্গে র‍্যাপের সাযুজ্যকে ব্যাখ্যা করছেন। আরেক আলাপচারিতায় র‍্যাপার Gold Cube (মো. আল ইসলাম নিরব) নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন 'প্রোটেস্ট পয়েট' বলে। একটা পরোক্ষ সংযোগরেখা এভাবে খুঁজে পাওয়া যায় বৈকি। নিরাপদ ছাত্র আন্দোলনের সময়েও বেশকিছু র‍্যাপ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু এতটা সাড়া ফেলতে পারেনি নানা কারণেই। তো প্রতিবাদী গানের কালচারের অংশ হিসেবেই র‍্যাপকে পাঠ করা এ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। র‍্যাপ তথ্য প্রতিবাদী গানের উত্থান ও বিস্তৃতির সুলুক সন্ধান করতে গিয়ে প্রতিবাদী গানের পরম্পরা চকিত পাঠ করে নেয়া যাক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে।

> "The freedom songs are playing a strong and vital role in our struggle... They give the people new courage and a sense of unity. I think they keep alive a faith, a radiant hope, in the future, particularly in our most trying hours".
>
> Martin Luther King

প্রতিবাদী গান হলো এমন একটি গান, যা প্রতিবাদ ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত আর তার বিস্তার ছাড়িয়ে যায় কালের সীমা। এটি হতে পারে লোক, ধ্রুপদী অথবা বাণিজ্যিক ধারার। এ বিষয়ে বৈশ্বিক উদাহরণগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক। ১৯৬০-এর দশকে বব ডিলানের 'Blowing in the wind' এবং 'The Times They Are a-Changin'-এর মতো গানগুলো নাগরিক অধিকার এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সংগীত হয়ে ওঠে। লুডভিগ ভ্যান বিথোভেনের 'Ode to the joy'-এর মূল অনুপ্রেরণা ছিল ফ্রিডরিখ শিলারের একটি কবিতা। যে গানগুলো স্থিতাবস্থাকে সমর্থন করে, সেগুলো প্রতিবাদী গান হিসেবে গণ্য নয়। আঠারো শতকের একটি নারীবাদী-প্রতিবাদী গান 'Rights of Woman', যা লেখকের 'A lady' ছদ্মনামে ১৭ অক্টোবর, ১৭৯৫ সালে ফিলাডেলফিয়া মিনার্ভায় প্রকাশিত হয়েছিল। চেব মামির 'Parisien Du Nord' গানটি ২০০৫ সালের ফরাসি দাঙ্গার সূত্রপাতকারী বর্ণবাদী উত্তেজনার প্রতিবাদ হিসেবে লেখা হয়েছিল।

আলজেরিয়ায় লোকসংগীত 'রাই'কে এখনো বিদ্রোহের সংগীত এবং 'নিন্দার প্রতীক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মিসরের আহমেদ ফুয়াদ নেগমকে একজন গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার আরবি কবিতা মিসরের নিম্নবিত্তদের কণ্ঠস্বর দিয়েছে এবং বিক্ষোভকারীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ২০১১ সালে রাষ্ট্রপতি হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় তাহরির স্কোয়ারে নেগমের 'Who Are They, and Who Are We?' কবিতার লাইনগুলো উচ্চারিত হয়েছিল। বিশ শতকের দক্ষিণ আফ্রিকার বেশির ভাগ প্রতিবাদী সংগীত ছিল বর্ণবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। বেনেডিক্ট ওয়ালেট ভিলাকাজির 'মিডোল্যান্ডস' এবং হিউ মাসেকেলার 'ব্রিং হিম ব্যাক হোম' (১৯৮৭), নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করার আন্দোলনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগীত হয়ে ওঠে। স্পেশাল একেএর 'ফ্রি নেলসন ম্যান্ডেলা', বাসিল কোয়েটেজি এবং আবদুল্লাহ ইব্রাহিমের 'ম্যানেনবার্গ' বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের একটি অঘোষিত সাউন্ডট্র্যাক হয়ে উঠেছিল। তিউনিসিয়ায় ইমেল মাথলুথি অল্প বয়স থেকেই এমন গান রচনা করেছিলেন, যা স্বৈরশাসক জিন এল আবিদিন বেন আলীর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছিল। সরকারি গণমাধ্যমে নিষিদ্ধ হলেও তার প্রতিবাদী গানগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

চীনা-কোরিয়ান কুই জিয়ানের ১৯৮৬ সালের গান 'নাথিং টু মাই নেম' তিয়েনআনমেন স্কয়ারের বিক্ষোভকারীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। হংকং রক ব্যান্ড বিয়ন্ডের 'বাউন্ডলেস ওশানস ভাস্ট স্কাইস' (১৯৯৩) এবং 'গ্লোরি ডেজ' (১৯৯০) বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে প্রতিবাদী সংগীত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২০১৯-২০ হংকং বিক্ষোভের সময়, লেস মিজেরেবলসের 'ডু ইউ হিয়ার দ্য পিপল সিং' (১৯৮০) বিক্ষোভের সংগীত হিসেবে ব্যাপকভাবে গাওয়া হয়। ভারতের বামপন্থী আন্দোলনগুলোও জনসাধারণের মধ্যে তাদের বার্তা প্রচারের জন্য পথনাটকের পাশাপাশি প্রতিবাদ সংগীত ব্যবহার করে। ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আইপিটিএ) দ্বারা আয়োজিত নাটকগুলোর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিবাদ সংগীত। ইরানের মোনা বোরজোই বিরচিত "Woman's Anthem" ২০২২ সালের মাহসা আমিনী বিক্ষোভের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদী গান ছিল, যে গানে উঠে এসেছে ইরানের নারীদের সংগ্রামের কথা। ফেরেদুন ফারোখজাদের 'স্যাড ইস্টার্ন' ইরানি প্রতিবাদী গানগুলোর মধ্যে একেবারে শুরুর দিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গান হিসেবে বিবেচিত হয়। গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল (১৯৬৯ বা ১৯৭০)। ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদী গানগুলোর অন্যতম হলো হিচকাসের এ গুড ডে উইল কাম। র‍্যাপার ফাদাইয়ের প্রথম একক 'ইরান ইরান' প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৯ সালের ইরানি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিক্ষোভের এক বছর পর। ২০২৩ সালের মার্চে র‍্যাপার ফাদাইয়ে "ব্ল্যাক শিরোনামে ২০২২-২৩ সালের ইরানি বিক্ষোভের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি প্রতিবাদী গান প্রকাশ করেন। গানটি পপসংগীতের সঙ্গে মিশ্রিত মাদ্দাহী গাওয়ার শৈলীর কারণে খুবই বিতর্কিত হয়েছিল। ২০০৭ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমাদিনেজাদ যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন ইহুদিরা হিব্রু প্রতিবাদী গান গাইছিল। প্রথম ইন্তিফাদা নামে পরিচিত আরব বিদ্রোহের সময়, ইসরায়েলি গায়ক সি হেইম্যান ইসরায়েলি নীতির প্রতিবাদে গেয়েছিলেন 'ইওরিম ভেবোখিম' (গুলি করো এবং কাঁদো)। পিংক ফ্লয়েডের 'অ্যানাদার ব্রিক ইন দ্য ওয়াল' গানটি এখন পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রতিবাদী গান হিসেবেও স্বীকৃত।

১৯৮৮ সালের বিদ্রোহের সময়, বার্মিজ সুরকার নাইং মায়ানমার 'কাবার মাকায়ে বু' লিখেছিলেন, যা ইংরেজিতে 'We Won't Be Satisfied till the End of the World' নামে বহুল পরিচিত। এ প্রতিবাদী গানটির অনুদিত ভার্সন ছড়িয়ে পড়েছিল লাখ লাখ বার্মিজের কাছে এবং বিদ্রোহের একটি অবিচ্ছেদ্য সংগীতে পরিণত হয়েছিল। ফিলিস্তিনি প্রতিবাদী সংগীত মূলত ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাত, শান্তির আকাঙ্ক্ষা এবং ফিলিস্তিনিদের ভূমির প্রতি ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা করে। এ ধরনের গানের একটি আদর্শ উদাহরণ হলো 'বিলাদি, বিলাদি' (আমার দেশ, আমার দেশ), যা এখন অনানুষ্ঠানিক ফিলিস্তিনি জাতীয় সংগীতে পরিণত হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ হলো 'Al-Quds our Land' গানটি, যার কথা লিখেছেন শরীফ সাবরি। 'ড্যাম' একটি আরবি হিপ-হপ গ্রুপ, যারা দখলদারত্বের অধীনে ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা আর পরিবর্তনের কাহিনী বলে আরবি ও হিব্রু ভাষায়। কাহলিল জিবরানের একটি কবিতার পটভূমিতে রচিত কামিলিয়া জুবরানের 'গারিবা' গানটি ফিলিস্তিনি নারীর বিচ্ছিন্নতা এবং একাকিত্বের গল্প বলে।

হাম দেখেঙ্গে গানটি পাকিস্তানের প্রতিবাদ সংগীতের একটি উদাহরণ মাত্র। বিশিষ্ট কবি ফয়েজ আহমেদ মূলত পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হকের দমনমূলক স্বৈরশাসনের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে একই শিরোনামে কবিতাটি লিখেছিলেন। ১৯৮৫ সালে জিয়ার জোরপূর্বক ইসলামীকরণের কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপমহাদেশে নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের অংশ হিসেবে শাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়। সেই বছর পাকিস্তানের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী ইকবাল বানু লাহোরের একটি স্টেডিয়ামে কালো শাড়ি পরে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে হাম দেখেঙ্গে গানটি গেয়েছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিবাদী গানগুলোকে মিনজুং গায়ো,

আক্ষরিক অর্থে 'জনগণের গান' বলা হয় এবং প্রতিবাদী গানের ধারাটিকে 'নোরে আনডং' বলা হয়, যার আক্ষরিক অর্থ 'গানের আন্দোলন'। আইল্যান্ডস সানরাইজ হলো তাইওয়ানের ২০১৪ সালের সূর্যমুখী ছাত্র আন্দোলনের থিম সং। পর্তুগালের প্রতিবাদ গানগুলো বেশির ভাগ অ্যান্টিফ্যাসিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের মধ্যেই প্রধানত বিকাশ লাভ করেছিল। সেখানে সর্বাধিক পরিচিত গান হলো পাওলো ডি কারভালহো এবং জোসে আফোনসোর গানগুলো যথাক্রমে 'ই ডিপোইস ডু অ্যাডিয়াস' ও 'গ্রানডোলা ভিলা মোরেনা'।

তেলেঙ্গানার প্রতিবাদী গণসংগীতশিল্পী 'জনতার গায়ক' গদর-এর ভাষায়, গান এক বিশেষ হাতিয়ার, গান আমার বুলেট, যাকে রোখা অসম্ভব। বিশ্বজুড়ে এমন অজস্র উদাহরণের ভিড়ে আমরা কই? চব্বিশেই কি হঠাৎ করে দ্রোহস্বর নাজিল হলো? একদমই না। পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয়েছে বারবার কিন্তু সময়ের প্রয়োজনেই আবার সময়ের সন্তানরা কণ্ঠ তুলে দাঁড়িয়েছেন বিপুল ক্রোধে। জুলাইয়ের নন্দিত র‍্যাপ গানের তেমনই ইশারা—

'৫২-র তে '২৪-এ তফাত কই রে? কথা ক!
দ্যাশটা বোলে স্বাধীন, তাইলে খ্যাচটা কই রে? কথা ক!
(কথা ক, সেজান)

এ সময়ের তরুণ র‍্যাপার সেজান তার এই 'কথা ক' গানে এক সুতোয় বেঁধে ফেলেন ইতিহাসের বিস্তীর্ণ জমিন। ভয়ের শাসনে মানুষের অবদমিত ক্রোধ যেন ভাষা পেল সহসা। ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধ প্রেরণা জোগায় চব্বিশে, শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অধিকারের প্রশ্নে, আত্মমর্যাদার প্রশ্নে জনতাকে এ গান বেঁধে ফেলে একই রেখায়। সহসা উবে যায় ভাষার বিবিধ ব্যাকরণ। প্রমিত-অপ্রমিত, আঞ্চলিক, মহল্লার ভাষা, স্ল্যাং, নাগরিক ভাষার বিচিত্র উপাদান মিলে এজমালি ভাষার নয়া চেহারায় মূর্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রূপ।

'৫২-র টা ভুলতারি নাই '২৪-এর টা ভুলবি ক্যা?
শিক্ষার মাজা ভাঙবি তাইলে স্কুল-কলেজ খুললি ক্যা?
বাঙালি ত বোকা ভাই আমরা পায়ে পায়ে ধোঁকা খাই
এত বছর চুইস্যা খাইসোস পরের পাঁচেও তরে চাই
(আওয়াজ উডা, হান্নান)

এ গান লিখে হান্নান গ্রেফতার হন পুলিশের হাতে, ১২ দিন কারাগারে ছিলেন এ র‍্যাপার। লক্ষণীয় এ গানেও '৫২ পথ দেখাচ্ছে চব্বিশকে। জুলাইয়ের অধিকাংশ র‍্যাপেই '৫২ ও '৭১ ঘুরেফিরে এসেছে। উৎপ্রেক্ষা কিংবা নিখাদ স্লোগান বুনে একেকটি গান হয়ে উঠেছে ইতিহাসের দলিল। আর এ বুননের জমিনে অতীতের ইতিহাসের সঙ্গে দূর অতীতের কোনো ভাষ্যও নতুর রূপে, নয়া অর্থে বিকশিত হয়। এ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ দূরের আলাপে বলে নেয়া যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাপার ইপিআর কৃষকদের দুরবস্থার বিবরণ দিয়ে র‍্যাপ গান লিখেছেন, যার শিরোনাম 'একলা চল রে'। র‍্যাপ গানের সংগীতায়োজনের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সম্মিলন চিন্তা করা কষ্টকল্পনা মাত্র, অথচ কী দারুণ মেজাজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের একটি চরণকে আশ্রয় করে বিপ্রতীপ মেজাজ ও ঝাঁঝালো বয়ানের গান লিখে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছেন এ তরুণ র‍্যাপার! শিল্পীর মুনশিয়ানা আর স্বকীয়তা এখানেই। স্থিতাবস্থা গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন বাণী হাজির করা মহৎ শিল্পীর কাজ। চব্বিশে এ কাজে সবচেয়ে অগ্রণী দলটি নাম র‍্যাপার, যারা তথাকথিত মূলধারার সংস্কৃতিচর্চায় প্রায় অনালোচিত ও অনালোকিত অঞ্চল। এ আন্দোলনের মধ্যে অন্তত ৪০টি বাংলা র‍্যাপ গান প্রকাশিত হয়েছে। সবক'টি গান 'আওয়াজ উঠা' বা 'কথা ক'-এর তুলনাবিচারে মানোত্তীর্ণ ও জনপ্রিয় না হলেও আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে প্রতিটি গানই তপ্ত বারুদের ভূমিকা পালন করেছে। চব্বিশের আন্দোলনে গ্রাফিতি শিল্পী আর র‍্যাপাররাই প্রধান সাংস্কৃতিক যোদ্ধা। হিপহপ সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে গ্রাফিতি হিপহপ কালচারেরই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। চব্বিশের জুলাইয়ে দেশজুড়ে গ্রাফিতি শিল্পের বিপুল এবং বহুমাত্রিক বিকাশকে তাই সরলরৈখিকভাবে

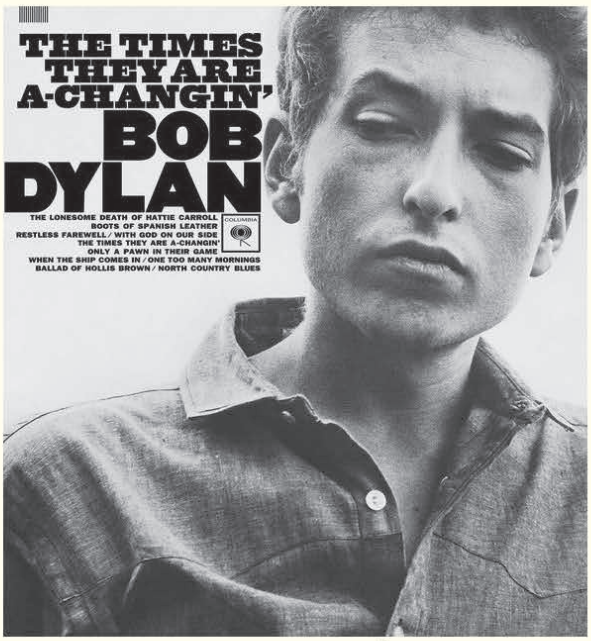

ছবি : রক অ্যান্ড রোলস্ গ্লোব

বিবেচনার সুযোগ নেই। নগরে সুনির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক এবং আন্ডারগ্রাউন্ড হিপহপ কালচার সহসা মূলস্রোতে উত্তরণের এ সাময়িক ইতিহাসকে বিশেষভাবে পাঠ করা জরুরি। যে প্রমিতপনার দাপটে বরাবরই নাক সিটকানো হয়েছে হিপহপ কালচারকে, তারাই দুর্দিনে পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশকে! আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা র‍্যাপ গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বাংলা ব্লকেড', 'দেশ সংস্কার', 'স্বাধীনতার গন্ধ', 'ছাত্র', 'অধিকার', 'দেশ কার', 'আবু সাঈদ', 'যুদ্ধ করতে জানি', 'রক্ত', 'দেশ কারও বাপের না', 'জবাব দে', 'জয় বাংলা', 'কত খাবি', 'শকুনের চোখ', 'বাংলা মা', 'বায়ান্ন', 'গদি ছাড়', 'দাম দে', 'স্লোগান', 'ফ্রিডম', 'রণক্ষেত্র', 'খোরাক', 'হিসাব দে', 'রাজাকার', 'শিক্ষা নাই', 'আর কত?', 'এইডা আমার বাংলাদেশ', 'ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি', 'চব্বিশের গেরিলা', 'দেশ লাল', 'শকুনের চোখ', 'প্রতিরোধ' ইত্যাদি।

চব্বিশের জুলাইয়ের র‍্যাপ স্বকীয় এর রাজনৈতিক মেজাজের গুণে। 'প্রমিত সংস্কার' আর 'শুদ্ধবাদিতা'র আছর অতিক্রম করে এসব গানের শিল্পীরা স্বৈরাচারকে সরাসরি স্বৈরাচার বলার সাহস দেখিয়েছেন। প্রমিত-অপ্রমিত, স্ল্যাং, বাংলা-ইংরেজি শব্দবন্ধ প্রয়োগে প্রায় প্রতিটি গানই ধারণ করেছে সময়ের রক্তাক্ত বয়ান। অধিকাংশ গানেই মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ এ দেশের মানুষের মুক্তিসংগ্রামে নানা ইতিহাসকে সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে জুড়ে গণদাবিটিকে তীব্র ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন ভাষণকে আওয়ামী বয়ানের বাইরে থেকে ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র প্রয়াসও লক্ষ করা গেছে। এমনকি ফ্যাসিস্ট শাসকগোষ্ঠীর নানা বক্তব্যের টুকরো বয়ান ও পাল্টা বয়ান হাজির হয়েছে নিমিষেই। 'রাজাকার' সম্বোধনের রাজনীতিকে মোক্ষম জবাব দিয়েছে 'পলিটিক্যাল কারেক্টনেস' প্রমাণের শঙ্কাকে শতভাগ মুলতবি রেখেই। গান, স্লোগান আর গ্রাফিতি তৈরি হয়েছে সমান্তরালে আর তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হয়েছে, পুনঃ পুনঃ নতুন কন্টেন্ট হিসেবে উৎপাদিত হয়েছে। শেখ মুজিবুর

রহমানের নানা উক্তি ব্যবহার করে প্রতিবাদ জানানোটা এতদিন ছিল আপাত নিরাপদ ঢাল, কখনো মতাদর্শিক অবস্থানেরও স্মারক, কিন্তু জুলাইয়ে সেটা যাবতীয় আড়াল ছেড়ে সুতীব্র স্যাটায়ার হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যমে, যেমন 'তুমি রিয়ালিটি মাইনা নাও'। শাসক পক্ষের জবানিতেই জবাব দেয়ার এ প্রক্রিয়া যেন যোগাযোগের পাল্টা বয়ান। গান গ্রাফিতি আর স্লোগান এভাবেই পরস্পরের সম্পূরক হয়ে চব্বিশের জুলাইয়ের চেতনা বিনির্মাণ করেছে।

র‍্যাপার হান্নান গ্রেফতার হন পুলিশের হাতে, ১২ দিন কারাগারে ছিলেন তিনি। পুলিশি আর তৎকালীন সরকারের বিবিধ সন্ত্রাসী বাহিনীর হুমকি, নির্যাতন আর নজরদারির গল্প বলেছেন র‍্যাপারদের প্রায় সবাই। ইন্টারনেট সংযোগের অভাবে অনেকেই গান আপলোড করতে পারেননি, নইলে ১৬ জুলাইয়ের পরবর্তী কয়েক দিনেই মুক্তি পেত অধিকাংশ গান। শিল্পী হায়দার হোসেন তার জুলাইয়ের গান শেষ পর্যন্ত আপলোড করতেই পারেননি। এই যে সীমাহীন নজরদারি, মৃত্যুর পরোয়ানার মুখে গান রচনা, মিলে যাচ্ছে যেন ইতিহাসের নানা মহান শিল্পীর সঙ্গে। বব ডিলান, জোয়ান বায়েজ, ভিক্টর জারা, সলিল চৌধুরী কিংবা চারণ কবি মুকুন্দ দাস? ইতিহাস কাকে মেলায় কোথায়? এই অনন্য বৈশিষ্ট্য আন্দোলনের গানগুলোকে অনন্য মর্যাদায় ভূষিত করেছে। বাংলা গানের বাঁকবদলে এটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়েই ইতিহাসে লেখা থাকবে। আন্দোলনের নানা গানের সঙ্গে এ জনপদের মানুষের বিদ্রোহ আর সংগ্রামের নানা গান ও বয়ান মিলিয়ে পাঠ করা যাক। র‍্যাপার হান্নান ও সেজানের দুই গান 'আওয়াজ উডা' আর 'কথা ক' কি মনে করায় না আব্দুল লতিফের সেই অমর গান—ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়/ওরা কথায় কথায় শিকল পরায় আমার হাতে-পায়। শিকল পরার গল্প সেই কবেই বলেছেন দ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল/এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥ চব্বিশের জুলাইয়ে নজরুল ছিলেন স্বমহিমায়। আন্দোলনজুড়ে নজরুলের গান বেজেছে, স্লোগান হয়েছে গ্রাফিতির ভাষা হয়েছে। জনদাবিকে ঐকতানে বাঁধতে নজরুল ভাষা দিয়েছেন, সুর দিয়েছেন জনতার মুখে। এ দৃশ্য সাম্প্রতিক কয়েক দশকের নজরুলচর্চার গতানুগতিক অবয়বটিকে বেমানান করে দিয়েছে একেবারে। আধিপত্যকামী শাসন ব্যবস্থায় যখন নতজানু আর তোষামুদে সংস্কৃতির জয়জয়কার তখন এই দ্রোহী নজরুল আদৌ জনচৈতন্যে জাগরূক আছেন কিনা সেটাই ছিল প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু সহসা প্লাবনে বাঁধ ভেঙে গেল।

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম
মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়
মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল।

উদ্দাম জনস্রোত পথে নেমেছিল। তাদের কণ্ঠে, কলমে, তুলিতে মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, কারার ঐ লৌহ কপাট, এ শিকল পরার ছল, দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, চল চল চল ইত্যাদি গান। ৩ আগস্ট এভয়েড রাফার ইউটিউব চ্যানেলে রিলিজ দেয়া হলো কয়েকজন জনপ্রিয় ব্যান্ড সংগীতশিল্পীদের সমবেত পরিবেশনা 'শিকল পরার ছল'। চলমান গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে গানের বিবরণীতে লেখা হলো ছোট অথচ গভীর মর্মবাহী একটি বার্তা, It's a call for justice! নব্বইয়ের আন্দোলন এবং পরবর্তী দশকে ব্যান্ড সংগীতে রাজনৈতিক আলাপ যতটা প্রখর ছিল, একুশ শতকে এসে ক্রমে তা মিহিসুর বা দূরের আলাপ! বিনোদনবাজার আর পুঁজিবাদী জমানার বিভিন্ন সমীকরণে সবাই সাক্ষীগোপাল প্রায়! নজরুলেই তাই মুখরক্ষা! ৩১ জুলাই সামাজিক গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল আরো একটি মর্মস্পর্শী পরিবেশনা। আন্দোলনকারীদের প্রতি আইনজীবী মনজুর আল মতীনের অকৃত্রিম দরদ আর ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতি দ্রোহী উচ্চারণে ধ্বনিত হলো কাজী নজরুল ইসলামের তুলনামূলক স্বল্পশ্রুত 'আজি রক্ত নিশি-ভোরে একি এ শুনি ওরে/মুক্তি-কোলাহল বন্দি-শৃঙ্খলে'!

৩০ জুলাই মঙ্গলবার বিকালে 'প্রতিবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন'গুলোর উদ্যোগে এক প্রতিবাদী গানের মিছিল পথে নামল নূর হোসেন চত্বর থেকে, পুলিশি বাধায় বেশি দূর এগোতে পারল না সে মিছিল, কিন্তু প্রতিবাদের আগুন তখন ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্বিদিক। সে মিছিল যতটা গানের, তার চেয়েও ঢের বেশি প্রতিরোধের। সে মিছিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়ালেন শিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান। তার সাংগীতিক তৎপরতা কী যে দারুণভাবে রাজনৈতিক, সেটা তার সাম্প্রতিক দুই দশকের গানে কান পাতলেই নিবিষ্ট পাঠক টের পাবেন নিঃসন্দেহে। জুলাই আগস্টে রাজপথের আন্দোলনে তার সজীব উপস্থিতি এবং সোচ্চার কণ্ঠস্বর যেমনি করে গণদাবিকে তুলে ধরেছে, সাহস জুগিয়েছে তা অসামান্য প্রয়াস। বৈষম্যবিরোধী দেশ গড়ার আহ্বান তো বহু আগে থেকেই বোনা আছে তার 'আমিই বাংলাদেশ' গানে;

আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার দিন তো শেষ
নাম আমার জনগণ, আমি বাংলাদেশ

আলজেরিয়ান ব্র্যান্ড দেমোক্রাতোজ
ছবি : দ্য ওয়ার্ল্ড

আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার দিন তো শেষ
নাম আমার জনগণ, আমি বাংলাদেশ।

আন্দোলনের সময় ফের আলোচনায় সায়ানের একটু পুরনো একটি গান, ভয় বাংলায়, যেটি লেখা হয়েছিল আবরার ফাহাদের নির্মম মৃত্যুকে কেন্দ্র করে।

ভয় বাংলায় ভয় বাংলায় ভয় বাংলায় ভয়,
এই বাংলা নাকি তাঁদের অন্য কারোর নয়
জয় ক্ষমতার, জয় ক্ষমতার, জয় ক্ষমতার জয় ...

আবু সাইদ, মুগ্ধদের মৃত্যু আর আবরার ফাহাদ এক কাতারে দাঁড়িয়ে যেন পথ দেখান ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে 'আমার মুক্তিযোদ্ধা', 'স্বাধীন পক্ষশক্তি' কী অকপট উচ্চারণ। বাংলাদেশ কী এ গান শোনেনি? সায়ান যেন গিটার হাতে আমাদের বব ডিলান, জোয়ান বায়েজ! আন্দোলন শেষে কে কোথায় ফিরেছে ঘরে, অথচ সায়ান সরব 'কল্পনা চাকমা', আরজি কর আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে 'তিলোত্তমা' ইত্যাদি গান নিয়ে। এ লড়াকু সায়ানকে ছুঁয়েই এ সময়ের নানা বাঁকে বারবার খুঁজে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে সময় ও সমাজ!

এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে একটা দমবন্ধ সময়ে মানুষের অবদমিত ক্ষোভের আগুনেই জিইয়ে ছিল ইতিহাসের নানা বাঁকে রচিত দ্রোহী শিল্পকৃতিগুলো। মুকুন্দ দাসের 'ভয় কি মরণে' কি প্রতিধ্বনিত হলো খ্যাপার গান 'বাংলা ব্লকেডে', 'জানি রক্তের বদলে রক্ত আর লাশের বদলে লাশ ঠেইকা/গেছে দেয়ালে পিঠ আজকা ভয় করি না মরণে'! বাইরে কারফিউ, নেট বন্ধ তবু সামান্য সুযোগেই উত্তাল ভার্চুয়াল দুনিয়া। র‍্যাপ গান তো আছেই, সঙ্গে পুরনো অনেক গান নতুন ভাষ্যে সয়লাব। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় অজস্র কন্টেন্টের সঙ্গে জুড়ে দেয়া গানের অধিকাংশই অন্য কোনো আয়োজনে গাওয়া। 'ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', কিংবা 'কারার ঐ লৌহ কপাট' জনসমাগমে কতজন নিয়মিত পরিবেশন করেন উপলক্ষ ছাড়া তা অনুমান করা মুশকিল, তবে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সহসাই সময়ের রেখা মুছে যায় যেন। ২ আগস্টের দ্রোহযাত্রার অজস্র ভিডিও এসব গানের সুরসহ জনতার হৃদয় ছুঁয়েছে দারুণ আবেগে। দ্রোহযাত্রায় জনতার সমুদ্রই বুঝি বিজয়ের পথরেখা তৈরি করে দিয়েছিল! এরপর উপুর্যপরি কর্মসূচি নানা প্রান্তে জনতার ঢেউ তোলে। ৩ তারিখে ব্যান্ড শিল্পীদের প্লাটফর্ম 'গেট আপ স্ট্যান্ড আপ' আত্মপ্রকাশ করে রাজপথে। এরই মধ্যে প্রিন্স মাহমুদের কথায় জেমসের গাওয়া 'বাংলাদেশ', ওয়ারফেজের 'জনস্রোত', শিল্পী হায়দার হোসেনের 'স্বাধীনতা', মাকসুদের 'আবার যুদ্ধে যেতে হবে', শূন্য ব্যান্ডের 'শোনো মহাজন'সহ আরো কয়েকটি পুরনো গান আন্দোলনের মধ্যে চর্চায় এসেছে। এর বাইরে সোহেল আরমানের লেখা, হাবীব ওয়াহিদ, আরফিন রুমি ও প্রদীপ কুমারের গাওয়া 'হৃদয় আমার বাংলাদেশ', ইথুন বাবুর লেখা ও মৌসুমীর গাওয়া 'দেশটা তোমার বাপের নাকি'ও নিয়মিত বেজেছে। আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের উৎসর্গ করে অনি হাসান প্রকাশ করেছেন 'আমরা বীর'। শহরতলী ব্যান্ডের ভোকালিস্ট সোহাগ গেয়েছেন 'ও প্রধান'। তরুণ গায়িকা পারশা মাহজাবীনের 'চলো ভুলে যাই' ভাইরাল হয়েছিল ২৮ জুলাই রাতে পোস্ট করার পরপরই। সহজবোধ্য লিরিক আর অকৃত্রিম দরদি পরিবেশনা নিমিষেই ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিক। ইতিহাসের পাতায় থাকুক এ গানটিও—

ভুলে যাই আমি ভুলে যাও তুমি ভুলে যাক পুরো জাতি
কিভাবে মানুষ মরেছে অকালে কিভাবে কেটেছে রাতি

গোঁ ধরে থাকুক আরশের মানুষ আঁকড়ে থাকুক গদি
পরে কোনো গানে ফিরবো আবার এই প্রাণটা থাকে যদি!

আন্দোলনের সময়ে মৌলিক গানের শূন্যতার বিপরীতে পারশা যেন এক ললিতকণ্ঠের প্রতিবাদ। অভাবনীয় সাড়া পড়ে গেল চতুর্দিক। আরো অনেকের মতো পারসার গানের শেষেও জীবন বাজি রাখার পণ। চকিতে মনে পড়ে নিবারণ পণ্ডিতের অসামান্য সেই গানের কথা। ১৯৭৬, ভারতে তখন জরুরি অবস্থা জারি ও সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছে। সেই সময়ে একজন শিল্পী আকাশবাণী বেতারে গান গাইতে যান 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো'। তখন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ বলে এ গানের 'আগুন জ্বালো' শব্দটা বাদ দিতে হবে! শিল্পীর আর এ গান গাওয়া হয়নি। এ ঘটনা কবি নিবারণ পণ্ডিতকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করে। নিবারণ পণ্ডিত ওই ঘটনার প্রতিবাদে একটি গান লিখলেন। সেই গানটিও আটকে গেল সেন্সরে। তখন তিনি তারও প্রতিবাদে আরেকটি গান লিখলেন, গানটার নাম 'গীদালের যন্ত্রণা'। তিনি এ গানে সমগ্র সেন্সর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

আগুন বাদ দিয়া শুধু জল দিয়া কী করে গান গাই
ভাবে বুঝিনু দুঃখ পাইলেও বলিবার উপায় নাই

ছবি : **হান্নানের ইউটিউব**

হামার গান তোমরা ভাইরে সাঙ্গ করি নিও
সময় এলে আগুনে গান হাজার কণ্ঠতে গাহিও।

পারসা মাহজাবীন আর নিবারণ পণ্ডিতের শেষ কথা যেন মিলে যায় এক বিন্দুতে। এই বিন্দুতে মিলেছেন র‍্যাপারদের আরো অনেকেই। র‍্যাপ গানগুলোর টেক্সট নিবিড় করে পড়তে গেলে সুশীল মনস্তত্ত্ব,

প্রমিতবোধ হোঁচট খাবে বারবার। আগেই বলেছি, প্রমিত-অপ্রমিত আর স্ল্যাং মিলেমিশে একাকার। লক্ষণীয় এই মিশেল গ্রহণে জনতার অরুচি হয়নি এতটুকু, কারণ দ্রোহের মূল সুরটি, অবদমিত ক্ষোভের সার কথাটি উঠে এসেছে অকপট। প্রমিতপনা আর সুশীল আধিপত্যকামিতার নামে যে জনগণের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল এতকাল, সহসা তা ভেঙে চুরমার। চব্বিশের জুলাইয়ের র‍্যাপাররা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এভাবেই নতুন বাঁকবদলের সূচনা করেন, যেখানে আওয়াজ ওঠানোর কথা যেমন বলা আছে, আছে 'দেশটা কারো বাপের না'—এ অধিকার বোধের সুতীব্র চিৎকার। 'আমার বইনরে মারলি ক্যান', ছাত্রদের উপর গুলি ক্যান-এর সঙ্গে সীমান্ত হত্যা, কল্পনা চাকমা কিংবা পাহাড়ে দমন-পীড়ন, বিভিন্ন দুর্নীতির খতিয়ান এতটাই নগ্নভাবে উঠে এসেছে যে শাসকের হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায় নিমিষেই। তথাকথিত রাজনীতিবিমুখ প্রজন্ম সহসা হাজির করে তুমুল রাজনীতির আলাপ, প্রশ্ন তোলে রাজা কার? চব্বিশের গেরিলা'র কয়েকটি চরণ—

আমরা সমাজ র‍্যাপার কলম হাতে যোদ্ধা
কোটার লাইগা কেমনে করস ছাত্র সমাজ হত্যা?
আমরাই যখন রাজাকার, তাইলে ক তুই রাজা কার?
সমাজ বইতে কি পড়াইলি এখন দেহি খটকা

নতুন প্রজন্ম গানে গানে জবাব দিয়েছে অজস্র প্রশ্নের, পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েছে অসীম সাহসে। র‍্যাপার Raafky (ফাহিম আহাম্মেদ রিকি) 'র‍্যাপচার'-এর আলাপচারিতায় বলেন, 'আমরা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারিনি, কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রির চেয়েও বড় হয়েছি। কারণ আমাদের গানে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছে, আমাদের গান থেকে মানুষ শিখছে।' চব্বিশের জুলাইয়ের পর এ উক্তি এতটুকু অযৌক্তিক ঠেকে না। আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিক কালচার হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আন্দোলনের কেন্দ্রে এসে হাজির। 'সুবিচার চাই', 'সময়ের গান' বলেছে সময়ের জরুরি কথাগুলোই। কাকতাল-এর 'রক্ত গরম মাথা ঠাণ্ডা' নতুন দিনের রাজনৈতিক চিন্তার দারুণ সম্মিলন—

স্বাধীন দেশে আমরা সবাই আইজও কেন বন্দী!
রক্ত গরম মাথা ঠাণ্ডা কইরা ভাবসো কি?
আরও অনেক প্রশ্ন আছে—বুঝলাম পরিবর্তন আসবে
কিন্তু তারপর কি? অল্টারনেটিভ কি?

অঘোষিত জরুরি অবস্থায় এসব গান আমাদের জুড়ে রেখেছে অলক্ষ্যে। উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে সবাই নতুন ভাষ্যের জন্য। ঠিক যেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হয়ে উঠল ভার্চুয়াল মাধ্যম। ভোলার সংগীতশিল্পী আসিফ আলতাফ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদী গান গেয়ে আসছেন। এ কারণে তার বাড়িতে হামলা করা হয়েছে, একাধিক মামলার ঘানি টানতে হয়েছে শিল্পী ও তার পরিবারকে। 'ফ্যাসিবাদী পাগলা ঘোড়া', 'স্বাধীনতা', 'বেচিনি মাথা', 'ওপারেতে বসে', 'লেবাস'সহ বেশকিছু গানে সরাসরি স্বৈরাচারের অপশাসন তুলে ধরেছেন আসিফ আলতাফ। জুলাই আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন নিজের লেখা ও সুরে তৈরি করেন 'স্টেপডাউন' শিরোনামের একটি গান। আমার দেশ পত্রিকার এক প্রতিবেদনে আসিফ আলতাফ জানান, স্টেপডাউন গানটা ৩ আগস্ট থেকে আপলোড দেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপলোড হচ্ছিল না। কয়েকবার আপলোড হলেও ৫ মিনিটের মধ্যে ইউটিউব থেকে গানটি নামিয়ে ফেলা হয়।' গান রিলিজ দিতে না পেরে ব্লুটুথ স্পিকারে বাজিয়ে আন্দোলনে যাওয়ার গল্প শুনিয়েছেন র‍্যাপার Rmcez (সৈয়দ রেদওয়ান আহমেদ)। বলার অপেক্ষা রাখে না মুক্তিযুদ্ধের অনেক গানই জনতার মিছিলে বেজেছে অবিরাম। স্বাধীন দেশে মৌলিক অধিকারহীনতায় মানুষ তো মুক্তিযুদ্ধের গানেই মুক্তি খুঁজবে। ২ ও ৩ আগস্ট দেশজুড়ে নানা কর্মসূচিতে আগুন ছড়িয়েছে সেইসব গান। মোহিনী চৌধুরীর অমর গান 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' কতভাবে ফিরে এসেছে এই আন্দোলনে! দেয়ালে দেয়ালে আজও লেখা আছে। সেই কবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গান পথ দেখাচ্ছে চব্বিশের জুলাইয়ে। মহৎ গানের শক্তি এখানেই। প্রতিটি আন্দোলনে নতুন ভাষ্যে পুনরুজ্জীবন ঘটে এসব গানের। ঠিক যেমন করে গসপেল থেকে এখন বিশ্বজুড়ে নন্দিত গণসংগীত 'আমরা করব জয়'। কিংবদন্তি সংগীতকার ময়মনসিংহের ভাটিয়ালী একটি গানের উল্লেখ করেছেন, যেটি ১৩৫০ বা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি। গানটি হলো 'আমার দুঃখের অন্ত নাই/দুঃখ কার কাছে জানাই/সুখের স্বপন ভাঙলোরে চুরাইবাজারে। কবিয়াল রমেশ শীল গানের জন্য নিগৃহীত হয়েছিলেন, কারাবরণও করেছিলেন। হতাশার মধ্যেও আশার আলো নিয়ে শেষ বয়সে লিখেছিলেন—

'অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে
আমার পরে আসবে যারা বোধ করি তারাই নেবে।
সারাজীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব।
মনের কোণে সুর উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাজাব।
...
হিংস্র জন্তুর ডাক থামিবে, পথের বাধা হবে শেষ
বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এই তো আমার দেশ।'

৫ আগস্ট বিকালে আগারগাঁওয়ের রাস্তায় জনস্রোতে এক যুবককে দেখি চিৎকার করে গাইছে জেমসের বিখ্যাত গান 'বাংলাদেশ'। শিহরণ বয়ে বয়ে গেল সারা গায়ে। এ উত্তাল জনসমুদ্রের সুর কি তবে এই? নতুন দিনের বাংলাদেশ কোন সুরে গাইবে সে মীমাংসা সময়ই বলে দেবে। তবে মনে রাখা জরুরি হবে যে এই প্রতিবাদী গানের মিছিলের শুরু বা শেষ চব্বিশে নয়, এর পেছনের ইতিহাস দীর্ঘ। এ জনপদে, ঘনঘোর ফ্যাসিবাদের দিনে একদা জনতার কণ্ঠস্বর হয়ে ছিলেন সঞ্জীব চৌধুরী। শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি একদা প্রান্তর কাঁপিয়ে গেয়েছিলেন 'আমি স্বপ্নের কথা বলতে চাই'। একজন কফিল আহমেদ এখনো 'প্রাণে প্রাণ মেলাবই, বলে রাখি' কিংবা 'সাতটা শঙ্খ একসাথে বাজাবো' বলে জড়ো করেন সাহসী মিছিল। অরুপ রাহী 'রাজায় কইছে চুদির ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই' বলে জুলুমশাহীর বিরুদ্ধ স্বর দীর্ঘকাল! 'সমগীত' রাজপথের চেনামুখ সকলের। বিগত কয়েক দশকের গান ঘেঁটে আমরা নিশ্চয়ই দু'দণ্ড দাঁড়াব হায়দার হোসেনের '৩০ বছর পরেও আমি স্বাধীনতাটাকে খুঁজছি'-এর তীরে। স্মরণ রাখা জরুরি যে সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলনেরও প্রায় ৪০টি গান-পালা রচিত হয়েছিল এই ফ্যাসিবাদী সময়ে। এ তালিকা দীর্ঘ হবে অবশ্যই। এ আলাপে তা শেষ করাটাও অসম্ভব। এ শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া আর সতর্ক করে দেয়ার প্রয়াস, যাতে করে ক্ষীণদৃষ্টি দিয়ে চব্বিশের লড়াইকে শুধু চব্বিশের উপাদান দিয়ে মূল্যায়নের বিপদ এড়ানো যায় অনাগত দিনে। এ জনপদের যাপন ও সংস্কৃতির ইতিহাসেই বোনা আছে এমন অনেক বীজ, সময়ের আগুনে তাকে পরখ করে নেয়া চাই দরদি চিত্তে। রাজনৈতিক চৈতন্যের এ জাগরণ অক্ষয় হবে সর্বজনের চর্চায় সেমত কামনা। এ আলাপের ইতি টানার ক্ষণে চব্বিশের জুলাইয়ে প্রতিবাদের গানের পুনরুজ্জীবনকে অভিবাদন জানাই, সায়ানের প্রতিবাদী গানের চরণ আশ্রয় করেই—

জেগেই ছিল জেগেই আছে ঘুমের করে ভান
সময় মত শুনতে পাবে বাংলাদেশের গান
জেগেই ছিল জেগেই আছে জেগেই তারা রয়
তাদের তুমি আমলে নাও তাদের করো ভয়
জেগেই ছিল জেগেই আছে বাংলাদেশের প্রাণ
শত্রু যারা বাইরে ঘরে ... সাবধান ... সাবধান!!

সহায়ক পাঠ

১. *প্রতিবাদের গান, গানের প্রতিবাদ*, কবির সুমন, কারিগর
২. *লাল জুলাই*, আলতাফ পারভেজ, প্রথমা
৩. *র‍্যাপচার : জুলাই অভ্যুত্থানের র‍্যাপসংগীত*, সম্পাদনা : মিজানুর রহমান নাসিম, গ্রন্থিক
৪. *বাহাছ, লাল জুলাই সংখ্যা*, ডিসেম্বর ২০২৪ সম্পা : জোবাইরুল হাসান আরিফ
৫. *মননরেখা, দেয়ালের ভাষা সংখ্যা*, ডিসেম্বর ২০২৪ , সম্পাদনা : মিজানুর রহমান নাসিম
৬. *লেখালেখির উঠান*, সংগীত সংখ্যা, এপ্রিল ২০২৩, সম্পা : হুমায়ুন আজম রেওয়াজ।

সুপারহিরোর রমরমা দুনিয়ায় টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির প্রভাব

ওয়াহিদ সুজন

স্পাইডার-ম্যানের চোখে টুইন টাওয়ার। ছবি : ক্রিন র‍্যান্ট

২০২১ সালে মুক্তি পায় জন ওয়াটস পরিচালিত হলিউড সিনেমা 'স্পাইডার-ম্যান : নো ওয়ে হোম'। এ সুপারহিরো সিরিজের নতুন ফেইজে নাম ভূমিকায় রয়েছেন টম হল্যান্ড। চলমান ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তিতে চমক হিসেবে ছিলেন এর আগে স্পাইডির পোশাকে শরীর গলানো দুই তারকা টবি মাগুয়ের ও অ্যান্ড্রু গারফিল্ড। যেখানে মাল্টিভার্স নামের ফিকশনাল বয়ানে শত্রু নিধনে মুখোমুখি হয় তিন স্পাইডার-ম্যান, সঙ্গে পুরনো শত্রুরা। যারা সিনেমা হলে বা চোরাই হল প্রিন্ট দেখেছেন, তারা খেয়াল করে দেখবেন, টবি মাগুয়ের যখন পর্দায় হাজির হলেন দর্শকের মাঝে কী তুমুল উল্লাস! এর পেছনে নস্টালজিয়া কাজ করেছে নিশ্চিত। তবে এ শতকের প্রথম দশকে মুক্তি পাওয়া টবি মাগুয়ের অভিনীত ও স্যাম রাইমি পরিচালিত 'স্পাইডার-ম্যান' ট্রিলজির বিবিধ ভূমিকা রয়েছে হলিউড সিনেমা ও মার্কিন রাজনীতিতে। এমনও ভাবতে পারবেন যে ৯/১১-এ টুইন টাওয়ারে হামলা না হলে স্পাইডার-ম্যান এতটা জনপ্রিয় হতো না। এর ফলে পরের দুই দশকে হলিউড বক্সঅফিস সুপারহিরোনির্ভর নতুন ইতিহাস দেখেছে, যা প্রথাগত স্টুডিও সিনেমার বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে বলেও অভিযোগ অনেকের। এমনকি বদলে দিয়েছে হলিউড সিনেমায় কীভাবে ধ্বংসাত্মক দৃশ্য চিত্রায়িত হবে তার ধারণাকেও। অবশ্য এ লেখার পরিসর সংক্ষিপ্ত যা কিনা আরো ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রেখে শেষ হবে। আর কৃতজ্ঞতা হিসেবে বলে নেয়া ভালো, এ লেখায় বিবিধ বিদেশী উৎসের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

হলিউডে সুপারহিরো সিনেমার প্রধান দুই ধারা ডিসি ও মার্ভেল কমিকসের বইনির্ভর। দুটি ধারাকে কেন্দ্র করে স্টুডিওগুলোর মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে ডিসির কনটেন্টের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য ওয়ার্নার ব্রসের। অন্যদিকে মার্ভেলের কনটেন্ট ডিজনি স্টুডিওনির্ভর হলেও স্পাইডার-ম্যানের স্বত্বের কারণে সনি পিকচার্সের সঙ্গেও জোট বাঁধতে হয়েছে তাদের।

এ ধারণার প্রসঙ্গে ঢোকার আগে একটা বিষয় সাফ করে নেয়া ভালো যে যুক্তরাষ্ট্রে কমিক বুক শিল্পের যে উত্থান তা মোটেও ৯/১১-কেন্দ্রিক নয়। বরং টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডি একে নতুন আকার দান করেছে। এটি আমলে না নিলেও মার্কিন সুপারহিরোরা কখনো রাজনীতি বিযুক্ত ছিল না। কমিক বুকের মলাট নাম হিসেবে আমরা 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা'কে ধরতে পারি। যার আবির্ভাব ১৯৪১ সালে, যখন সারা বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপে কাঁপছে। যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন সৈন্যদের দেশপ্রেম ও মনোবল বাড়ানোর জন্য চরিত্রটি তৈরি হয়েছিল। আর প্রথম কমিকসের প্রচ্ছদে ক্যাপ্টেন আমেরিকাকে দেখা যায় হিটলারকে ঘুসি মারতে, যা তাকে যুদ্ধকালীন প্রচারণার অংশ করে তোলে। এভাবে ক্যাপ্টেন আমেরিকা তখনকার কমিকসের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্রগুলোর একটি হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী সময়ে মার্ভেল ইউনিভার্সের অন্যতম নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯/১১-এর আগে প্রতি দশকেই একাধিক কমিকনির্ভর সিনেমা তৈরি হয়েছে হলিউডে। কিন্তু ওয়ার অন টেরর বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধকালের মতো ততটা রমরমা হয়ে ওঠেনি। একই সঙ্গে এ সিনেমাগুলো সারা বিশ্বে মার্কিন কমিক হিরোদের নতুন পরিচয় দিয়েছে; যারা কিনা একই সঙ্গে নতুন ত্রাণকর্তা হয়ে উঠেছে। ওয়ার অন টেরর বৈশ্বিক এজেন্ডা হয়ে ওঠায় এ ধরনের শত্রু-মিত্র ধারণায় বেশির ভাগই দর্শক একমত পোষণ করেছে। অর্থাৎ কালচারাল হেজিমোনি আকারে হলিউড মার্কিন যুদ্ধকে দর্শকের মনস্তত্ত্বের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, তারাও প্রায় নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। এ সুযোগে গত আড়াই দশকে ৮০টির মতো সুপারহিরো মুভি মুক্তি দিয়েছে হলিউড। আমাদের এ লেখায় সেখান থেকে শুরুর অংশ এবং পরবর্তীকালে দু-একটি গল্প সামনে আনা হবে।

মূল গল্পের প্রেক্ষাপট হিসেবে ভূরাজনৈতিক আলাপে যাওয়া যাক। উন্নত রণপ্রস্তুতির পাশাপাশি ভূপ্রাকৃতিক কারণে যেকোনো বহিঃশত্রু থেকে সুরক্ষা বজায় রাখতে পারে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চল কোনো না কোনো পক্ষের হামলায় আক্রান্ত হয়েছে, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাকল্যে ক্ষতি বলতে পার্ল হারবারে হামলা; যাও কিনা দেশটির মূল ভূখণ্ডের বাইরে। এর বিপরীতে জাপানের জনবহুল হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমার অমানবিক ক্ষত কখনো কখনো যেন পার্ল হারবারের কাছে ম্লান হয়ে যায়। এখানে হলিউডের শক্তিমত্তা আপনি টের পাবেন। এটা শুধু কে আগে হামলা করেছে তা নয়, বরং শত্রু-মিত্রের আধিপত্যশীল বয়ানের মাধ্যমে গল্পটি নির্মাণ হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে সামরিক উপস্থিতি ও নিজভূমে মার্কিনদের সুরক্ষিত থাকার রাজনৈতিক ও ভূপ্রাকৃতিক আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরায় নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলা। আবার এ হামলার কারণ হিসেবে সিদ্ধান্তমূলক কিছু ঘটনা বদলে দিয়েছে পুরো বিশ্বকে। কিন্তু টুইন টাওয়ার আক্রান্ত হয়ে বুঝিয়ে দেয় এমন হামলা এখন আর শুধু হলিউড সিনেমার বিষয় নয়। ইউনিভার্সেল স্টুডিওর সেটে নির্মিত কোনো দৃশ্য নয়। বরং অতি সাধারণ একটি দিন, যেটি রৌদ্রোজ্জ্বলভাবে শুরু হয়েছিল, অনেকে সবে কফির প্রথম কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু নিউইয়র্কের গর্ব জোড়া দালানের ওপর ভর করল সাক্ষাৎ শয়তান। মুহূর্তে শহরজুড়ে নেমে এল নরক। বলা বাহুল্য, ২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের আগের আর পরের দুনিয়া একই থাকল না। ওই ঘটনার আড়াই যুগ পরও সেই রেশ বিশ্বজুড়ে বহমান।

টুইন টাওয়ারের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র পেল সুপারভিলেন। এ নিয়ে বিপরীত মত ও বিতর্কগুলো জনপ্রিয় কোনো বয়ানেই পাত্তা পায়নি। ওসামা বিন লাদেন; এর আগে যদিও মার্কিন মিত্র ছিলেন। সেই মিত্র শুধু রাজনৈতিক অস্ত্রই হয়ে ওঠেননি; জনপ্রিয় ধারায় হয়ে ওঠেন খল চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। তো ৯/১১ হামলার মাত্র সাত মাস পর মুক্তি পায় 'স্পাইডার-ম্যান' সিরিজের প্রথম সিনেমাটি।

স্পাইডার-ম্যানের সরিয়ে ফেলা একটি ট্রেলারের ফুটেজ এখনো বিভিন্ন ধরনের লেখায় রেফারেন্স হিসেবে আসে। ওই ভিডিওতে এ তরুণ সুপারহিরোর চোখে টুইন টাওয়ারের ঝলক দেখা যায়। কিন্তু পরে ৯/১১-এর দগদগের স্মৃতির কারণে ট্রেলারটি সরিয়ে নেয়া হয়, সিনেমার কিছু দৃশ্য পুনরায় শুট করা হয়। কিন্তু গ্রিন গবলিন নামে এক উড়ন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে স্পাইডার-ম্যানের বিজয় কিছুটা হলেও মার্কিন দর্শকদের হৃদয়ে স্বস্তি এনে দেয়, আর প্রথম সপ্তাহান্তের বক্স অফিসে একাধিক রেকর্ড ভেঙে দেয়। সিনেমার পর্দায় প্রায় অক্ষত নিউইয়র্ক শহর দর্শকের মনে আশাবাদ তৈরি করে। এমনকি এ সিনেমার ত্রাণকর্তা র‍্যাম্বোর মতো বয়সী কোনো চরিত্র নয়। কিশোর ও তারুণ্যের মাঝামাঝি থাকা পিটার পার্কার। তরুণপ্রাণ হয়ে উঠল রক্ষাকর্তা।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের নেতৃত্বে বৈশ্বিক রাজনীতি দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে। শুধু আফগানিস্তানে আক্রমণই নয়, পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ইরাকে (যার প্রমাণ কখনো পাওয়া যায়নি) শিগগিরই ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করবে। ফলে গ্রিন গবলিনের সঙ্গে পিটার পার্কারের লড়াইয়ের সাইডলাইনে থাকা প্রযুক্তিগুলোই সামনে চলে আসে। মার্কিন সামরিক বাহিনীগুলো সরঞ্জামের দিক থেকে আরো দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। বিষয়টি কীভাবে সুপারহিরো সিনেমাকে প্রভাবিত করে তার উদাহরণ হতে পারে 'স্পাইডার-ম্যান টু' (২০০৪)। প্রথম কিস্তির অভাবনীয় সাফল্যের কারণে সাধারণ নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয় সিনেমাটির বাজেট বাড়ে। গল্পও আরো এগিয়ে থাকা কিছু। যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব উঠে আসে। তবে ডক্টর অক্টোপাস নামের খল চরিত্রটি আসলে অ্যান্টি-হিরো। এখনো 'স্পাইডার-ম্যান টু' ভীষণ দর্শকপ্রিয়, কাল্ট বিবেচিত হলেও প্রথম কিস্তির তুলনায় এর বক্স অফিস কালেকশন কিন্তু কম!

টুইন টাওয়ার হামলার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও ইরাকে হামলা যুক্তরাষ্ট্রে বড় ধরনের বিতর্ক তৈরি করে। মানুষ দুই ভাগ হয়ে যায়। কিন্তু রাজনীতি ঠিকই যুদ্ধ উত্তেজনাকে কাজে লাগাতে পেরেছে। দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউজে চলে আসেন জর্জ বুশ। একই সময়ে সর্বকালের অন্যতম সুপারহিরো মুভি হয়েও কিছু ব্যাক ফুটে থাকে 'স্পাইডার-ম্যান টু'। এর পরিবর্তে ডিসির অধীনে ক্রিস্টোফার নোলানের অতি উদযাপিত 'দ্য ডার্ক নাইট ট্রিলজি' ও 'এক্স ২ : এক্স-মেন ইউনাইটেড'-এর জন্ম দেখল দর্শক।

মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বিপন্নতা, ভয় শিল্প-সাহিত্যে বড় অনুষঙ্গ হলেও এ সিনেমাগুলো যূথ ভয়ের ওপর নির্মিত, যা একই সঙ্গে মার্কিন রাজনীতির মাঠে ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল। এ ভয় অন্যের প্রতি সহিংসতা। এ অপরায়ন দ্রুত সারা বিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন নামে ছড়িয়ে পড়ে। যা শুধু প্রতিরক্ষামূলক নয়, আগাম প্রতিরোধমূলকও। যেখানে শত্রু-মিত্রের অনুমান বিধ্বংসীকর। এর পরিণতিতে সামরিক শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। এমন শক্তিশালী অস্ত্র ধ্বংসের অজুহাতে কোনো দেশে হামলা বিবেচনাপ্রসূত হিসেবে চিত্রিত হচ্ছে। সেই দৃশ্য আবার যেন জনপ্রিয় সিনেমার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে টেলিভিশনে প্রচারের মাধ্যমে। ভাবা যায়, আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা; দুটি দেশে পুরোপুরি তছনছ হয়ে যাওয়া কীভাবে মার্কিনরা ও সারা বিশ্ব টেলিভিশনের মাধ্যমে উপভোগ করেছে। সুপারহিরো সিনেমার লার্জার দ্যান লাইফ ভাষ্য থাকলেও মার্কিন আবহে মন্দ কল্পনাপ্রসূত নয় বা কোনো দানবীয় চরিত্র নয়, এটি মানুষ এবং এর উৎপত্তি ট্র্যাজিক। স্পাইডার-ম্যান-পরবর্তী সুপারহিরো সিনেমায় রাষ্ট্রের একদম সর্বোচ্চ পর্যায়ে আক্রমণ দেখা যায়। যেমন হোয়াইট হাউজে সুপারভিলেনের প্রবেশে সেই ভয় বাড়িয়ে তোলে যে যুক্তরাষ্ট্রে কেউ নিরাপদ নয়। এমনকি প্রেসিডেন্টও। এখানে কিন্তু 'এয়ারফোর্স ওয়ান' (১৯৯৭) সিনেমার মতো প্রেসিডেন্ট নায়ক নন। মানে প্রচলিত হিরোরা যুক্তরাষ্ট্র তথা দুনিয়াকে বাঁচাতে পারছে না। এ পরিসরে স্পাইডার-ম্যান কামিং এজ হিরো হিসেবে যতটা আশাবাদী; তার বিপরীতে ব্যাটম্যান বা এক্সম্যান হতাশাজনক এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক আবহে অদ্ভুতভাবে বাস্তবসম্মত।

৯/১১-পরবর্তী আমেরিকান বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে ক্রিস্টোফার নোলানের ব্যাটম্যান ট্রিলজি, যা ন্যারেশন ও নির্মাণ বৈচিত্র্যে সুপারহিরো সিনেমার ইতিহাসে মাস্টারপিস হয়েই থাকল। যেখানে 'ব্যাটম্যান বিগিনস' (২০০৫) শুরু হয় মা-বাবা হারানো তরুণ ব্রুস ওয়েনের গল্পে। ট্রমা থেকে ফিরে আসার এ পর্বে গোথাম শহরের ভেঙে পড়া অবস্থান

পুনরুদ্ধারে তাকে নামতে হয়। যখন কিনা স্কারক্রো নামের ভিলেন শহরবাসীর মানুষের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করছে। যেখানে বের হয়ে আসছে মানুষের ভেতরকার ভয় ও কষ্ট। স্কারক্রো মূলত মধ্যপ্রাচীয় নামের ভিলেন রা'স আল গুলের সাজানো ঘুটি হিসেবে কাজ করে। এমন এক সময় এ গল্প বলা হচ্ছে, যখন বিশ্বজুড়ে শত্রু-মিত্র মেরুকরণ ক্রমেই বাড়ছে, শান্তির কোনো সম্ভাবনা আর কাজ করছে না।

ওই সময়ে আরেক সুপারহিরো সিনেমা 'ফ্যান্টাস্টিক ফোর' (২০০৫) একদমই জমল না। কিন্তু নোলানের ট্রিলজির দ্বিতীয় পর্ব 'দ্য ডার্ক নাইট' (২০০৮) দর্শক লুফে নিল। এখানে গোথাম শহরে দুর্নীতি থাকলেও তা সহনীয় পর্যায়ে যতক্ষণ না জোকার এসে সব উল্টে দিচ্ছে। জোকার হলো এমন এক ডিলেমা, যে বিদ্যমান স্বাভাবিকতার ফাঁকগুলো ধরিয়ে দেয়। বালির বাঁধের মতো ভেঙে দেয় সবকিছু। নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রের রাজনীতি দিয়ে আপনি একে বুঝতে পারেন। কিন্তু এমন এক সময় জোকারের আবির্ভাব, তখন দুর্নীতি স্বীকার করে নিয়েও এক ধরনের স্বাভাবিকতা দাবি করে রাষ্ট্র। যেখানে পুঁজির সঙ্গে দুর্নীতির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক! অন্যদিকে সিনেমার মতো বাস্তব জীবনে মার্কিনরা মন্দার কারণে মেডিকেল বিল, বাড়ি ভাড়া দিতে অক্ষম; এর বিপরীতে করপোরেট নোংরামি উঠে আসছে। তা সত্ত্বেও জোকারই ভিলেন, তাকেই ধ্বংস হতে পাবে। কারণ বাস্তব দুনিয়ায় নিপীড়ন মেনে নেয়াই হলো রাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশনকৃত শান্তির ঠিকানা।

এবার অন্য বিষয়ে আসা যাক। ওয়ার অন টেরর প্রকল্পে গুরুত্ব পেয়েছে সর্বব্যাপী নজরদারি। যাকে বলা যায় 'বিগ ব্রাদার ওয়াচিং ইউ'। ব্যাপক নজরদারির বাইরে নয় বাংলাদেশের মতো দেশগুলো। 'দ্য ডার্ক নাইটে' নিজস্ব ভার্সনের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টও ছিল। ওই সময়ের খুব বেশি পরিচিত না হলেও প্রজেক্ট প্রিজম নামে ব্রুস ওয়েনের তৈরি নজরদারি প্রযুক্তি সমান্তরাল দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দেয়। যা গোথাম শহরের সব ফোনের মাইক্রোফোন ও সোনার সিগনাল ব্যবহার করে লোকেশন ট্র্যাক ও কথোপকথন শোনা সম্ভব করে। ওয়েনের সহকারী লুসিয়াস ফক্স নৈতিক অর্থে এ ধরনের প্রযুক্তির বিরোধিতা করলেও ব্যাটম্যানের যুক্তি ছিল, অপরাধ দমনে নজরদারি ঠিক আছে।

এদিকে সিনেমা হলের বাইরে প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রের নির্বাহী শাখার যুদ্ধক্ষমতা আরো বাড়লে অনেক মার্কিন বুশ প্রশাসনের প্রতি বিরক্ত হয়ে ওবামার কাছে শান্তি, আশা ও পরিবর্তনের আশা করেছিল। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মিডিয়ায় এরই মধ্যে আবু গারিব কারাগারের কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে গেছে। মার্কিন সেনারা ইরাকি বন্দিদের কীভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করছে সেই কেচ্ছা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গুয়ানতানামো বের নির্যাতনের কৌশল—ওয়াটারবোর্ডিং, ঘুমহীন রাখা এবং নির্যাতনের উদ্দেশে উচ্চশব্দে গান বাজানো—সবই জনসাধারণের জানা হয়ে গেছে (বাংলাদেশের আয়নাঘরের কথা মনে পড়ছে কি)। এর সঙ্গে মার্কিন সমাজে রাজনৈতিক বিভক্তি বাড়তে থাকে; টি পার্টি, অল্ট-রাইট ও অকুপাই মুভমেন্টের উত্থান ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে সিনেমা হলে আসে 'দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস' (২০১২), যদিও এ সিক্যুয়েল যথাযথ মূল্যায়িত হয়নি। সিনেমার শুরুতে দেখা যায়, সুপারভিলেন বেনের সহচরদের হাতকড়া পরিয়ে ও মুখ ঢেকে একটি উড়োজাহাজে করে নিয়ে যাচ্ছে সিআইএ এবং একজন বন্দিদের গুলি করে ফেলে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে গোয়েন্দা কর্মকর্তা। এ দৃশ্য আবু গারিব কেলেঙ্কারির মতোই মনে হয়। পরে জানা যায়, বেন নিজেও বন্দিদের মধ্যে একজন, যে মুক্ত হয়ে উড়োজাহাজটি ধ্বংস করে দেয় এবং একজন পরমাণুবিজ্ঞানীকে অপহরণ করে। এরপর গল্প শুরু হয়, যেখানে আমরা দেখি গোথাম শহর 'দ্য ডার্ক নাইটের' ঘটনার কয়েক বছর পর কেমন আছে। বাস্তব জীবনে যুদ্ধকালীন বিশেষ ক্ষমতা এবং আইনি ফাঁকফোকর ব্যবহার করে যেভাবে নির্যাতনকে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছিল, তেমনভাবেই গোথাম হার্ভি ডেন্ট অ্যাক্ট পাস করে, যা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে আইনি প্রক্রিয়াকে পাশ কাটায়।

এ গল্পগুলো ৯/১১ সংঘটিত হওয়ার প্রথম দশকের ঘটনা। সেখানে যতটা ফিকশনাল কিছু ঘটুক না কেন, তা আর বৈশ্বিক রাজনীতি থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। বরং সমান্তরাল একটা দুনিয়া আমরা দেখতে পাই। এ যেন কমিক বুক সিনেমার অদলে আরেকটা মাল্টিভার্স হিসেবে বিরাজ করছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, 'দ্য ডার্ক নাইট' সিরিজে টুইন টাওয়ার হামলা ও মার্কিন মনোজগতের অন্ধকার দিকগুলো যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, 'দ্য স্পাইডার-ম্যান' সিরিজ ততটা টানতে পারেনি। এর কারণ হতে পারে স্পাইডার-ম্যান তারুণ্য, আনন্দ ও আশাবাদের প্রতীক হয়ে উঠলেও ব্যাটম্যান আসলে তা নয়। এখানে এমন এক ধরনের ধ্বংসাত্মক ট্র্যাজেডি আছে, যা দর্শককে টেনে ধরছে। এমনকি একই ধরনের সমস্যা দেখা যায় 'ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান' (২০১৬) ও 'জাস্টিস লিগের' (২০২৭) ডার্ক টোনে। সুপারম্যান হিরো হিসেবে আশাবাদী হলেও তাকে ব্যাটম্যানের মতো ডার্ক টোনে হাজির হতে হয় পর্দায়। এমনিতে যেকোনো সুপারহিরো কোনো না কোনো যন্ত্রণায় তাড়িত থাকে, যা আমরা মহাকাব্যিক চরিত্রগুলোয় দেখি; বেশকিছু সুপারহিরো চরিত্রও মিথলজি থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু ৯/১১-এর ঘটনা অপরের প্রতি যে ভয় তৈরি করে গেছে; এর সঙ্গে পুঁজিবাদের নিজস্ব সংকট মিলে সুপারহিরো চরিত্রগুলোকে আরো যন্ত্রণাকর করে তুলেছে এবং এ চরিত্রগুলো আরো বাস্তবিক।

তবে ব্যাটম্যানের ডার্ক টোন যেভাবে সুপারহিরো সিনেমায় পরিবর্তন আনে, তা ধরে রাখতে পারেনি ডিসি। তার জায়গায় 'আয়রন ম্যান' ফ্র্যাঞ্চাইজি, পরে ক্যাপ্টেন আমেরিকা ও মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স (এমসিইউ) আকারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে মার্ভেল কমিকস। তার সঙ্গে হাত মেলায় ডিজনি স্টুডিও। ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবসায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এ স্টুডিও। লেখার শুরুতে আমরা বলেছিলাম ক্যাপ্টেন আমেরিকার আবির্ভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সেনা রিক্রুটে বড় ভূমিকা রাখে। একই কথা বলা যায় ক্যাপ্টেন মার্ভেলের ক্ষেত্রেও। ক্যাপ্টেন মার্ভেল একজন নারী পাইলট, যে অনেকটা মার্কিন বিমান বাহিনীর পোস্টার গার্লে পরিণত হয়।

২০১৯ সালে মুক্তি পায় আনা বডেন ও রায়ান ফ্লেক পরিচালিত 'ক্যাপ্টেন মার্ভেল'। আদর্শিকভাবে প্রথম দেখায় মনে হবে, ক্যাপ্টেন মার্ভেল যুদ্ধ ও মিথ্যার বিরুদ্ধে কথা বলছে। এসব ধারণা সাধারণত মার্কিন বিমান বাহিনীর সঙ্গে মেলে না। এমনকি 'টপগানের' (১৯৮৬) মতো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো অ্যাডভেঞ্চার সিনেমার সঙ্গে মিলে না। তবু এ সিনেমা সামরিক বাহিনীর জন্য ভালো এক নিয়োগ বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজ করে। এখানে আমেরিকা নিজেকে সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক শক্তি হিসেবে দেখে। আমেরিকানরা নিজেদের সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদ ও দমননীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে দেখে। তাই ক্যাপ্টেন মার্ভেলের উপনিবেশবিরোধী কাহিনী আসলে আমেরিকার স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয় না। গবেষক লিসা লোয়ের মতে, এটি 'আমাদের অজ্ঞতার রাজনীতি'র একটি অংশ, যেখানে ইতিহাসের কিছু দিককে গুরুত্ব দেয়া হয়, আর কিছু দিক ভুলে যাওয়া হয়।

ক্যাপ্টেন মার্ভেল সম্পর্কিত ওপরের আলোচনাটি পিটার জে ব্রুনোর এক গবেষণা থেকে নেয়া। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ৯/১১-পরবর্তী সুপারহিরো সিনেমাগুলো একদিকে মার্কিন সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদকে মজবুত করে, আবার কখনো কখনো তা প্রশ্নবিদ্ধও করে। এসব সিনেমা এক ধরনের অনিশ্চিত ও শেষ না হওয়া 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র প্রেক্ষাপটে তৈরি। যেখানে হয় শত্রু নয় বন্ধু ধারণার মধ্য দিয়ে শত্রু-মিত্রের ধূসর রেখা অতিক্রম করে। এসব সিনেমায় শত্রু-মিত্রের ধারণা খুবই সরল। 'ক্যাপ্টেন আমেরিকা: দ্য উইন্টার সোলজার' (২০২৪) সিনেমায় এমন প্রশ্ন শোনা যায়, 'হেই ক্যাপ, আমরা ভালো ও খারাপ মানুষের পার্থক্য কীভাবে করব?' উত্তরে ক্যাপ্টেন আমেরিকা বলে, 'যদি তোমার দিকে গুলি ছোড়ে, তাহলে তারা খারাপ।' একইভাবে আয়রন-ম্যান চরিত্রটিকে একটি সংলাপের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব। যেখানে আয়রন-ম্যান ওরফে টনি স্টার্ক বলছেন, 'আমি খুবই সফলভাবে বৈশ্বিক শান্তিকে প্রাইভেটাইজ করেছি। আপনি আমার কাছে আর কী চান?'

২০০৮ সালে জন ফেব্রু পরিচালিত 'আয়রন-ম্যান' দিয়ে শুরু হয় এমসিইউর। এরপর প্রায় দুই ডজন সিনেমার মাধ্যমে কামিয়ে নিয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এবং এ সিনেমায় প্রথম কোনো সুপারহিরো সরাসরি মার্কিনদের যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র বিলিয়নেয়ার টনি স্টার্ক আধুনিক অস্ত্র নির্মাণে বিশেষজ্ঞ। এ প্রতিভাবান উদ্ভাবক স্টার্ক ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক। তো আফগানিস্তানে নতুন অস্ত্রের প্রদর্শনী শেষে ফেরার সময় টনি স্টার্ককে অপহরণ করে সন্ত্রাসী সংগঠন

টেনে ধরে। বন্দিদশায় তাকে জোর করে ভারতের অস্ত্র বানানোর শিক্ষা দেয়া হয়। কিন্তু টনি তাঁর মেধাসম্পন্ন মস্তিষ্কের অনা একটি 'অস্ত্রশস্ত্র' তৈরি করেন এবং তা ব্যবহার করে বন্দিদশা থেকে পালান। দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন, তার কোম্পানির অস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাচ্ছে। তাই তিনি তাঁর ইন্ডাস্ট্রিজের অস্ত্র বানানো বন্ধ করার ঘোষণা দেন। এরপর টনি তাঁর আগে ব্যবহৃত প্রযুক্তির আয়রন-ম্যান সুট তৈরি করেন এবং দুনিয়াকে রক্ষার জন্য এক নতুন পথ বেছে নেন। তার পরবর্তী আয়রন-ম্যান ও অ্যাভেঞ্জার্স সিনেমায় তাকে প্রতিরক্ষা ও উন্নত প্রযুক্তি তৈরিতে মনোযোগ দিতে দেখা যায়, যা কিনা শক্তি বন্ধার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এখানে শক্তি বিষয়টা অনেক বড়, অন্তত পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে। যুক্ত দুনিয়ার বহু রাজনৈতিক অস্থিরতা বা লড়াইয়ে, সব ক্ষেত্রেই শক্তিশালী মার্কিনদের জন্মজন্মান্তে অস্ত্র ব্যবসার দেখা যাচ্ছে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক তবে। ইউরোপীয় জোট ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল পাঁচ বছর (২০২১-২৪)। অসমনিবৃক্ত অস্ত্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের উৎস ছিল যুক্তরাষ্ট্র। নতুন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়েছে সুইডেন। লন্ডন ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল পীস রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এসআইপিআরআই। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০২১-২৪ সালের মধ্যে ন্যাটো অঞ্চলে অস্ত্র অমদানি আগের পাঁচ বছরের তুলনায় বেড়ে হয়েছে। এর কারণ ইউক্রেনে রুশ আক্রমণের পর অনেকটি প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। এরইমধ্যে বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘ অস্ত্র ব্যবসায়ীকারক হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে দেশটি। এর নাম অবশ্য মানের 'প্রাইভেটাইজড শক্তি' ধারণাকে মিলিয়ে পড়া যায়। এ সিনেমাগুলোর নায়কেরা প্রতিটা একটাই পরিস্থিতি কাটে যে সিনেমা নিয়ে বাকর পরিস্থিতির সহজে বিচরণ করা যায়। তার পাঁচটিকে মুক্ত বানিয়ে নেয় ৯/১১।

এখানে অতিত্ব বাস্তবতার একটি মজবা ফুটে নেয়া যায়, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক ৯/১১ এবং এর পরবর্তী ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিস্ট ওয়ার্ল্ডভিউকে হালানোর মাঝে একটি অভিজাত্যের মাঝামাঝি হারাচ্ছে। অনেক কী হালানো? এটি সেই অধিকার হালানোর বিষয়, যেখানে শুধু মার্কিনরাই অনা রাষ্ট্রের সার্বভৌম নিমাত্র লঙ্ঘন করতে পারবে, কিন্তু কখনই তাদের নিজেদের নিমাত্র লঙ্ঘন হওয়ার শঙ্কায় থাকতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্রকে এমন এক জায়গা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে অত্রমণ নাগর নয়, যেখানে জীবন বিদেশি দখিলকারী থেকে নিরাপদ, যেখানে অমাদের জন্য একমাত্র দখিলকারী হলো সেই দখিলকারী, যা অমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর চাপাই। অমরা অনাদের ওপর যে দখিলকারী চাপিয়ে দিই, সেটি শুধু—এবং চরমভাবে—নির্দিষ্টভাবে জনগণের জনা হয়।'

ফেরা শুরুর দিকে দেখেছি, সুপারহিরো সিনেমার ভিলেন স্পাইডার-মানের ভূমিকা বাকলেও বাকর দুনিয়ার রাজনীতি। পরিষ্ঠ ভিলেনের তো অবশ্যই। তাকে বাটমানের তুলনায় বাচ্চাদের নিয়ে যায়। অবার এমসিইউভুক্ত প্রথম সুপারহিরো মোভিজ আয়রনিকার দুনিয়ে এর পর থেকেও আয়রন-ম্যানের হাতে বাচ্চাদের চলে তোলে রাখা হয়। বিলিয়ার্ডের নেতৃত্বের অনেন চলে আসে এ অস্ত্র বানানো। এমনকি হোমকামিংয়ের টুডাড় পর অ্যাভেঞ্জার্স, এন্ড গেম' ।২০১৯। মানবজাতির অর্ধেক অংশকে বাঁচাতে ইনফিনিটি অ্যাকসেস করে। অনাদিকে মোভিজ আয়রনিকা দুই-শক্তিকে বন্ধার করতে লড়ছে।

চরিত্রগুলোকে ডিফেন্ড করা আরেকটি বিষয়ে নজর তোলানো যাক। ৯/১১-এর প্রভাবে হলিউডে ক্যারেক্টার ডেপথে দেখিয়ে তের পরিবর্তন এসেছে। আগে মাইনর পরিসরিক বাটমান ভার্সেস সুপার, ডন অব জাস্টিসের' ।২০১৬। ট্রেলারের কথা মনে আছে? গুলেন্ড আমরিকার ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের হেডেজ নেয়া যায়, যার দায় লাগে মিল টুইন টাওয়ার হামলা-পরবর্তী সুপার। সেই স্মৃতি জাগিয়ে তোল নির্মাতারা দর্শকদের হাতে টানাতে চেয়েছিলেন। কমিউনিটার ৯/১১-এর আগের ক্ষতিগ্রস্ত করানো করানো 'সেনসিটি' ভবন ধ্বংস হতে নেয়া হয়েছে বা এখনকার দুনিয়ে অনেকটা অবাক ও রাউনির মাঝে। অনেক সিনেমায় ভবনগুলো সাধারণত বাসোমো ধরে রাখত, বেশির ভাগ সময় এক পাশে ভেঙে পড়ত এবং সামনা অভাতেই সেগুলো ধরে ফেত। কিন্তু পরের সিনেমাগুলোয় ধ্বংসের দৃশ্য যেন বাকর সহজ হয়ে গেছে। ভন্ন ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সহজে ভেঙে না পড়া ভবন এবং দুই ভবনের মাঝ দিয়ে ছুটে চলা সাধারণ মানুষ।

বাংলার গ্রাম। শিল্পী : জর্জ চিনারি, ১৮১৯

গ্রামবাংলার ইতিহাস

খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার

গ্রাম আমাদের সবার পরিচিত। আমরা প্রায় সবাই এখনো গ্রামে বাস করি, অথবা মাত্র দুই-চার পুরুষ আগে গ্রামের মায়া কাটিয়ে শহরে এসে বসতি করেছি। কিন্তু ইতিহাস পড়তে গেলে দেখা যায়, গ্রন্থিত ইতিহাসের প্রায় পুরোটাই শহর-নগরের ইতিহাস। রাজারা বাস করেন শহরে, ক্ষমতার পালাবদল হয় শহরে। ইতিহাস লেখা হয় এবং সংরক্ষিত হয় শহরেই। সে কারণে শহরের ইতিহাস সহজেই পাওয়া যায়, গ্রামের প্রামাণ্য ইতিহাস খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। কিছু কিছু গ্রামে স্থানীয়ভাবে মুখে মুখে চলে আসা কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে ইতিহাস-পুরাণ-কিংবদন্তি-লোককথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

বাংলার ইতিহাস এমনিতেই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। নগরের ইতিহাসও এখানে খুব কম ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রামের ইতিহাস জনবসতির, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষুদ্রতম বা নিম্নতম একক বলে যাকে সবকালেই অবহেলা করা হয়েছে তার প্রামাণ্য রূপ প্রায় নেই বললেই চলে। ইতিহাস গ্রামকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে শুধু সম্রাটের রাজস্ব আয়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে, এছাড়া আর সব বাবদে গ্রামের প্রতি ইতিহাসবেত্তাদের অবহেলা চোখে পড়ার মতো।

তবু গ্রন্থিত ইতিহাসের ফাঁকফোকর দিয়ে গ্রামের যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তারই ভিত্তিতে এ নিবন্ধে বাংলার গ্রামের ইতিহাসকে আলাদাভাবে দেখতে চেষ্টা করছি।

উর্বর আধোচাঁদের উত্তরাধিকার

আমাদের নাগরিক চোখে গ্রামকে প্রাচীন বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে গ্রাম বেশ সাম্প্রতিক ব্যাপার। মানুষের গুহাবাসের ইতিহাস প্রায় কুড়ি লাখ বছরের পুরনো, অথচ গ্রাম সৃষ্টি করে সেখানে বসবাসের সবচেয়ে পুরনো প্রমাণটির বয়স খুব বেশি হলে কুড়ি হাজার বছরের পুরনো।

মানুষ যতদিন শিকার করে দিন কাটাত, গ্রামের প্রয়োজন পড়েনি। শিকারের পিছু পিছু গোষ্ঠীসমেত মানুষ প্রায় যাযাবরের জীবন কাটাত। সে সময় মানুষ বসতি স্থাপন করত বড়জোর কয়েক মাসের জন্যে। স্থায়ী বসতিতে থাকার সময় তারা শস্য সংগ্রহ করত কালেভদ্রে, শখের বশে। কিন্তু এই শখ থেকেই ক্রমে মানুষ ফসল ফলানোর কৌশল শিখে ফেলল। কৃষিকাজ শেখামাত্র মানুষ শিকারের ওপর নির্ভর করা অনিশ্চিত জীবিকার একটা নিশ্চিততর বিকল্প খুঁজে পেল—ফসলের মাঠকে ঘিরে মাসওয়ারি নয়, প্রজন্মব্যাপী স্থায়ী বসতি বানিয়ে খাদ্যনিরাপত্তা প্রায় নিশ্চিত করার এক সংস্কৃতিকে সে আপন করে নিল।

গ্রামের বিকাশ প্রথমে হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য আর পশ্চিম এশিয়ার দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকায়। আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ জেমস হেনরি ব্রেস্টেড এর নাম দিয়েছেন 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট' আর আরবরা একে ডাকেন 'আল হিলাল আল খাসিব' বলে। পুবে পারস্য উপসাগর থেকে পশ্চিমে ফিলিস্তিন পর্যন্ত এ এলাকার বিস্তার, সুপ্রাচীন এশিরিয়া আর ব্যাবিলন এ উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূমির অংশ।

এখানেই ঋতু অনুযায়ী ফসল চাষ করে, চাষে গৃহপালিত পশু আর সেচের ব্যবহার করে মানুষ বুঝল, যাযাবর জীবনের ইতি টানার সময় এসেছে।

তুলনামূলকভাবে বেশি শান্তিপূর্ণ, বেশি নিরাপদ এ জীবনের হাতছানি দ্রুত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

এশিরিয়া, ব্যাবিলনে সতেরো হাজার বছর আগে যে ধরনের কৃষিগ্রাম প্রথম দেখা গিয়েছিল, প্রায় পনেরো হাজার বছর আগে সেই একই ধরনের কৃষিগ্রাম বাংলায় স্থাপন করেছে আদি বাঙালি অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। বাংলার মাঠের বর্ণনা দিতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব; / খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে

চরের খুব কাছে: / পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল:— / এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।' কিন্তু বাংলার গ্রাম-সংস্কৃতির মধ্যে ছাই হয়ে যাওয়া, ধুলো হয়ে যাওয়া সেই এশিরিয়া, ব্যাবিলনের অমোচনীয় উত্তরাধিকার রয়ে গিয়েছে।

অস্ট্রিকভাষী বাঙালির আদি গ্রাম : শান্ত নদীটির তটে আঁকা ছবি

আদি অস্ট্রিক জনগোষ্ঠী বাংলায় যে গ্রামগুলো স্থাপন করেছিল, এগুলোকে বলা যায় রৈখিক গ্রাম বা লিনিয়ার ভিলেজ। নদী, বিল বা সমুদ্রের তটরেখা ধরে এ গ্রামগুলো তৈরি হয়েছিল। বাংলার জলমগ্ন এলাকাগুলোতে নৌকাই ছিল প্রধান বাহন। সে কারণে জলপথের সমান্তরালে গ্রাম স্থাপন করা সুবিধাজনক ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে বন্যার সম্ভাবনা থাকায় বাড়িগুলো করা হতো অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকায়, নিচু এলাকায় ফসল চাষ করা হতো।

প্রায় ১০ হাজার বছর ধরে বাংলার প্রায় সব গ্রামই ছিল রৈখিক গ্রাম।

কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ওপর তার বসতি সংস্থানের নকশা বেশ প্রভাব বিস্তার করে। আদি বাঙালির সংস্কৃতির ওপর রৈখিক গ্রামের আকার বড় ধরনের ছাপ ফেলেছিল।

রৈখিক গ্রামে কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র থাকে না। পুরো গ্রামটিই একটি তট বরাবর ছড়ানো। এই ধরনের গ্রামে গোষ্ঠীর অধিকার প্রবল, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের অধিকার ততটা প্রবল নয়। বাঙালি সংস্কৃতিতে একক ব্যক্তির উত্থানকে খুব সন্দেহের চোখে দেখা হয়, ব্যক্তি গোষ্ঠীর চেয়ে ক্ষমতা বা মর্যাদায় বড় হয়ে উঠলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দেয়। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য উৎস আদি বাঙালির সামষ্টিক অবচেতনে রৈখিক গ্রামের গভীর গোপন প্রভাব।

আজও বাংলাদেশে যে নতুন শহরাঞ্চল গড়ে ওঠে, সেখানে নগরায়নের গোড়ার দিকে আমরা এই রৈখিক গ্রামের নকশার প্রভাব দেখতে পাই। শুরুতে পুরো এলাকাটি একটি বড় রাস্তার সমান্তরালে দুই পাশ ধরে গড়ে ওঠে। জনবসতি বেড়ে গেলে তারপর শহর বড় রাস্তার পাশ থেকে সরতে থাকে। ছোট রাস্তা, গলি, তস্য গলি ধরে ক্রমেই 'ভেতরের' দিকে সরে যায়।

অস্ট্রিকভাষীরা গ্রাম-সংস্কৃতিতে প্রকৃতি-পূজার উপাদানগুলো (গাছ-পূজা, মাটি-পূজা, সাপ-বাঘ-কুমির ইত্যাদি প্রাণীর পূজা, নক্ষত্রের পূজা) এনেছিলেন। নবান্ন উৎসব বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে অস্ট্রিকভাষী আদি বাঙালির উত্তরাধিকার বহন করছে। যেসব সামাজিক অনুষ্ঠান আমরা এখনো করি, তার মধ্যে গায়ে-হলুদ, পান-চিনি ইত্যাদিও সেই আদি অস্ট্রিকভাষী বাঙালির গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ।

বাংলার পুকুর-নদী-খালে আমরা ভেলা-ডিঙি-ডোঙা ভাসাই। এই তিনটি শব্দই অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছে।

অস্ট্রিকভাষী আদি বাঙালি কোমরের নিচ থেকে পোশাক পরত। নারী-পুরুষ কেউই বুক ঢাকার প্রয়োজন অনুভব করত না। শীতকালে নিম্নাঙ্গের আরেকটি বসন ব্যবহার করেই বুক-পিঠে ঢেকে নিত।

দ্রাবিড় বাঙালির নতুন গ্রাম : চাকায় চড়ে সীমানা সম্প্রসারণ

বাংলায় যখন থেকে দ্রাবিড়ভাষীরা আসতে শুরু করল, গ্রামের আকারের বিবর্তন হতে শুরু করল। রৈখিক গ্রাম থেকে কেন্দ্রমুখী গ্রাম স্থাপিত হতে শুরু করল। দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায় নগরভিত্তিক সভ্যতার পত্তন করেছিল। দ্রাবিড় জাতি আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই নগর-বসতি গড়ে তুলতে পেরেছিল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর নগরসভ্যতা দ্রাবিড়দের গড়ে তোলা। পশ্চিম উপকূলে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণেই হোক, কিংবা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে, দ্রাবিড় জাতি ক্রমেই পশ্চিম থেকে পুব দিকে সরে এসেছে। আজ থেকে অন্তত সাড়ে চার হাজার বছর আগেই দ্রাবিড় জাতির একটি অংশ বাংলায় চলে এসেছিল। বাংলার নদী-ধোয়া সমভূমিতে নগর স্থাপনের পাশাপাশি তাদের পত্তন করা গ্রামের আকারগুলোও ছিল অন্য রকম।

অস্ট্রিকভাষী আদি বাঙালির মতো দ্রাবিড়রা শুধু নৌকানির্ভর ছিল না। চাকার ব্যবহার তারাই আগে শিখেছিল। তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন ছিল গরুর গাড়ি। গরুর গাড়ি ব্যবহার করতে হতো বলে রাস্তা বানানো এবং সংরক্ষণের প্রযুক্তিতেও দ্রাবিড়রা এগিয়ে ছিল, উপমহাদেশ জুড়ে তার অসংখ্য নিদর্শন আছে। দ্রাবিড় বাঙালির গ্রামে নৌকা এবং গরুর গাড়ি—এ দুই বাহনের ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় গ্রামগুলো রৈখিক না হয়ে কেন্দ্রমুখী হয়ে উঠল, যাকে বলে নিউক্লিয়েটেড ভিলেজ। কেন্দ্রমুখী গ্রামে সাধারণত একটি গ্রামকেন্দ্র থাকে—সেটাই গ্রামের যাবতীয় সম্মিলিত সামাজিক কাজকর্মের স্থান। এ কেন্দ্রে উপাসনার জায়গা থেকে, গ্রামের লোকের জমায়েত হওয়ার মতো মাঠ থাকে, বাজার কিংবা গ্রামপ্রধানের বাড়িও থাকতে পারে।

কেন্দ্রমুখী গ্রামের সমাজে সাধারণভাবে কিছু শ্রেণীভেদ থাকে। গ্রামের কেন্দ্রের কাছাকাছি জায়গা করে নেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষেরা। ক্ষমতাহীন মানুষকে সরে যেতে হয় গ্রামের সীমানার দিকে, তারা আক্ষরিক অর্থেই 'প্রান্তিক' হয়ে ওঠে। দ্রাবিড়ভাষী বাংলার গ্রাম-সমাজে উঁচু শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতো বণিত (বণিক) আর বেল্লাল (ভূমির মালিক যে কৃষক)। নিচু শ্রেণীর মধ্যে ছিল বিলইবলার (বর্গাচাষী, কৃষি-শ্রমিক, ক্ষুদ্র শিল্প-শ্রমিক) আর আদিওর (ভূমিদাস)।

কেন্দ্রমুখী গ্রামে পানির জন্য নদী ছাড়াও অন্য উৎস দরকার হয়। দ্রাবিড়ভাষীদের কেন্দ্রমুখী গ্রামে সেজন্যেই বেশি আকারে পুকুর-খাল-বিল কাটার চল ছিল, যাতে গ্রামের ভেতরের দিকে মানুষের পানীয় জল কিংবা গোসলের কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। গ্রাম যত বড় হতো, ততই বেশি করে পুকুর এবং দীঘি কাটানোর দরকার হতো। বহু গ্রামেই উঁচু শ্রেণী আর নিচু শ্রেণীর জন্য আলাদা পুকুর-দীঘির ব্যবস্থা ছিল। সম্পন্ন গৃহস্থমাত্রই নিজের বাড়ির পাশে নিজস্ব জলাশয় রাখতেন, গোলাঘরে শস্য সংরক্ষণ করতেন।

দ্রাবিড় ভাষায় গ্রামের নাম ছিল 'উর'। বাংলার যেসব পুরনো গ্রামের নামের শেষে 'উর,' 'উরা,' 'পুর,' 'ড়া,' 'গুড়ি,' 'জুলি,' 'জুড়,' 'কুণ্ড' ইত্যাদি আছে, সেগুলোর বেশির ভাগই দ্রাবিড় বাঙালির স্মৃতি বহন করছে।

দ্রাবিড় বাঙালির গ্রাম-সমাজে মাতৃপূজা ও লিঙ্গপূজা চালু ছিল। এছাড়া ছিল রক্ষাকারী দেবীর পূজা। রোগের হাত থেকে বাঁচতে শীতলা দেবীর, সাপের কামড় থেকে বাঁচতে মনসা দেবীর এবং বনের পশুর হাত থেকে বাঁচতে বনদুর্গা দেবীর পূজা বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় দ্রাবিড় গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সামাজিক পশুবলির প্রথাও দ্রাবিড় গ্রাম-সমাজেই শুরু হয়েছিল। পূর্ণিমার রাতে দ্রাবিড়-বাঙালি গ্রামে উৎসব হতো, গভীর রাত পর্যন্ত পান-ভোজন, সম্মিলিত নাচ-গান ও খেলাধুলা চলত। গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কড়ি খেলত।

দ্রাবিড় বাঙালির গ্রাম-সমাজে প্রধান খাবার ছিল ভাত। ভাতের সঙ্গে মাছ ছিল সবচেয়ে প্রচলিত খাবার। বড় মাছ ধরা পড়লে গ্রামের লোক অনেক সময় গোষ্ঠী-ভোজের আয়োজন করত। মাছের শুঁটকি খাওয়ার চল ছিল। মাংসের মধ্যে মুরগি, হরিণ, ছাগল, শুয়োর, গরু, কাঁকড়া, কচ্ছপ—প্রায় সব ধরনের মাংসেই দ্রাবিড় বাঙালির আগ্রহ ছিল। বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরোল, কচু, মেটে আলু এ সময় বাংলার গ্রামগুলোতে পাওয়া যেত। ফলের মধ্যে পাওয়া যেত কলা, নারকেল, আম, কাঁঠাল, তাল ইত্যাদি। গ্রামে আখ ও তালের রস থেকে গুড় তৈরি হতো। দ্রাবিড়েরাই পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় খেজুর গাছ নিয়ে আসেন এবং খেজুরের রস ও গুড় খাওয়ার চলও এ সময়েই শুরু হয়।

অস্ট্রিকভাষী আদি বাঙালি ভাত পচিয়ে মদ বানাতে জানত। দ্রাবিড় বাঙালি মদ উৎপাদনে আরো বৈচিত্র্য এনেছিল। দুধ, নারকেল-পানি, গুড়, মধু, তালরস গেঁজিয়ে নানা রকম মদ তৈরি করা হতো।

দ্রাবিড় বাঙালি কার্পাস তুলা থেকে কাপড় তৈরি করত। বিশেষ জাতের কার্পাস তুলা থেকে যেসব আরামদায়ক কাপড় তৈরি হতো, তা চলে যেত শহরে এবং সেখান থেকে বিদেশে রফতানি হতো। গ্রামের মানুষের ভাগ্যে জুটত সাধারণ কার্পাস তুলা থেকে তৈরি মোটা কাপড়। খুব মোলায়েম না হলেও এই কাপড় আবহাওয়া উপযোগী এবং টেকসই ছিল।

আর্য শাসনে বাংলার গ্রাম-সমাজ : নিয়ম আর কাঠামোর শক্ত বাঁধন

দ্রাবিড়-বাঙালির এক হাজার বছরের একাধিপত্য ঘুচিয়ে বাংলায় এল আর্যরা, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। আর্যরা প্রথমে দ্রাবিড় অধ্যুষিত বাংলাকে বর্জন করেছিল। কিন্তু ক্রমেই বাংলার কৃষিসম্পদ ও উর্বর জমি তাদের আকর্ষণ করল। তারা দ্রাবিড় রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এক বিস্তৃত আর্য রাজ্য স্থাপন করল।

বাংলা ভাষায় এখন আমরা যে 'গ্রাম' শব্দটি ব্যবহার করি, এটি এসেছে সংস্কৃত ভাষার 'গ্রাস করা' শব্দ থেকে। আর্যরা যুদ্ধ করে দ্রাবিড়দের 'উর' গ্রাস করে তাকেই 'গ্রাম' নাম দিয়েছিল। আর্য শাসনে গ্রামের কাঠামোগত পরিবর্তন খুব বেশি হয়নি। দ্রাবিড় বাঙালির মতো আর্য বাঙালিও কেন্দ্রমুখী গ্রামের কাঠামোতেই অভ্যস্ত ছিল।

তবে আর্য শাসনে বাংলার গ্রামে শ্রেণী-বিভাজন আরো বেড়েছিল। গ্রামে ব্রাহ্মণ থাকলে তারাই হতো উচ্চতম শ্রেণী, পূজা পরিচালনা ও ধর্মীয় নেতৃত্বে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ক্ষত্রিয় গ্রামে থাকলে গ্রাম শাসনের অধিকার দেওয়া হতো ক্ষত্রিয়কে। আর্য শাসনে বণিকদের সামাজিক অধিকার কিছুটা খর্ব হয়েছিল বলেই মনে হয়, গ্রামের ইতিহাসে তাদের

উল্লেখ খুব কম। তবে কৃষিজমির মালিকেরা অগ্রগণ্য ছিল। এর বাইরে অন্য সব পেশাজীবীদের (নাপিত, ধোপা, কামার, কুমার, ছুতার, মাঝি, বাহক, মেথর) অন্ত্যজ জাতি বলে গণ্য করা হতো। যেসব দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী আর্য আধিপত্য মেনে না নিয়ে পুরনো দ্রাবিড়-রীতিনীতিতে জীবন কাটাতে লাগল, তাদের ক্রমেই গ্রামের প্রান্তে ঠেলে দেয়া হলো এবং কোনো কোনো সময় তাদের বাধ্য করা হতো গ্রামের সীমানার বাইরে বসবাস করতে। পুলিন্দ, শবর, চণ্ডাল, ডোম—এই জনগোষ্ঠীগুলোকে সমাজের নিম্নতম স্তর বলে বিবেচনা করা হতো।

আর্য শাসনে রাজারা গ্রাম থেকে রাজস্ব আয়ের জন্য প্রতি গ্রামে একজন মণ্ডল-কর্তা নিয়োগ করতেন। এই 'মণ্ডল' নামটাই মানুষের মুখে মুখে হয়ে দাঁড়াল 'মোড়ল।' বাংলার বেশির ভাগ গ্রামে আজ পর্যন্ত গ্রামপ্রধানকে মোড়ল নামেই ডাকা হয়। চারটি গ্রামকে একসঙ্গে বলা হতো 'চতুরক'—যার থেকে পরে 'চৌকি' নামটি এসেছে। প্রতিটি গ্রামকে দুই থেকে তিনটি অংশে ভাগ করা হতো, প্রত্যেক অংশের নাম ছিল 'পাটক'। এটিই পরে লোকের মুখে 'পাড়া' নামে পরিচিত হয়ে যায়।

গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শুরুও সম্ভবত আর্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই। গ্রামের পাঁচজন বা তার বেশি লোক নিয়ে একটি সংঘ তৈরি হতো, যারা গ্রামের অঘোষিত স্থানীয় সরকার হিসেবে কাজ করত। প্রায় সব ক্ষেত্রেই মোড়ল পঞ্চায়েতের অংশ হতেন। পঞ্চায়েতের খরচ মেটানোর জন্য কিছু ফসলি জমি রাজারা বরাদ্দ করতেন। বিনিময়ে পঞ্চায়েত রাজস্ব আয়ের কাজে সহায়তা করত। পঞ্চায়েতের তহবিল থেকেই গ্রাম প্রতিরক্ষার জন্য লোক নিয়োগ করা হতো, কালক্রমে এদেরই নাম হয়ে যায় চৌকিদার। সে যুগে অনেকটা পুলিশের মতো কাজ করলেও চৌকিদারেরা ছিলেন গ্রামীণ সমাজের আপন লোক, পাহারা বা আইন প্রয়োগের কাজ ছাড়াও গ্রামের মানুষের উৎসবে-পার্বণে চৌকিদারের শরিক হতেন।

মৌর্য যুগের খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের একটি শিলালিপি থেকে সে সময়ের পরিস্থিতি খানিকটা আঁচ করা যায়। এ শিলালিপিতে অজ্ঞাতনামা শাসক পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। মহামাত্রকে বলা হয়েছিল গোলাঘরে তেল, ধান ও বীজ সংরক্ষণ করে রাখতে যাতে বন্যা হলে, আগুন লাগলে বা পাখির দল শস্য নষ্ট করলে মানুষকে সাহায্য করা যায়। এ শিলালিপি থেকে আরো জানা যায়, তখন দুই ধরনের ছোট মুদ্রা চালু ছিল। সবচেয়ে ছোট মুদ্রা ছিল কাকনিক (কপর্দক), আর তার চেয়ে একটু বড় মুদ্রা ছিল গণ্ডক (চার কাকনিকে এক গণ্ডক হতো)।

আর্য শাসনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা শাসকদের কাছ থেকে শহর ও গ্রাম—দুই জায়গাতেই জমি বরাদ্দ পেয়েছিলেন। সমাজের নিয়ন্ত্রণ এদের হাতে চলে যাওয়ার পর খাওয়াদাওয়া নিয়ে আগের মতো নির্বিচার স্বাধীনতা থাকল না। নানা রকম মাংস ও মাছের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। এসব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার শাস্তি ছিল সমাজচ্যুত হওয়া। উত্তর ভারতের গ্রামগুলোতে সমাজচ্যুত হওয়া ছিল প্রায় মৃত্যুর শামিল, কারণ গ্রামগুলোতে সুপেয় পানির উৎস ছিল অল্প কয়েকটি, সমাজচ্যুত হলে পরিবারগুলো সেই পানির উৎস থেকে পানি নেয়ার অনুমতি পেত না। কিন্তু বাংলায় সমাজচ্যুত হয়েও মানুষ সহজে পানিবঞ্চিত হতো না। ফলে সমাজচ্যুতির শাস্তি মানুষের খাদ্যাভ্যাস বা ধর্মচর্চার অভ্যাসকে খুব বেশি পরিবর্তন করতে পারেনি। জলমগ্ন পূর্ববঙ্গে উত্তর কিংবা পশ্চিমবঙ্গের এলাকাগুলোর তুলনায় জাতিভেদের কড়াকড়িও কম ছিল।

বাঙালির ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আর্যদেরই বরং বহু রকম আপস করতে হয়েছে। তারা বাঙালির খাবারের ওপর নানা রকম বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে বা কিছু কিছু বিধিনিষেধ শুধু ব্রাহ্মণের ওপরেই বহাল রেখেছে। বহুদিন পর্যন্ত সাপের মতো দেখতে যেসব মাছ (যেমন শিং, মাগুর ইত্যাদি) সেগুলো ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

আর্য শাসনেই বাংলায় ডাল খাওয়ার প্রচলন শুরু হয়, সম্ভবত উত্তর ভারত থেকে আর্যরা এ অভ্যাসটি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। আর্যপূর্ব যুগে আদি বাঙালির ডাল চাষ বা খাওয়ার কোনো বিবরণ পাওয়া যায়না।

আর্য শাসনের সময় বাংলার গ্রামগুলোতেও ফুল এবং ফলের বাগান করার রীতি চালু হয়েছিল। এ সময় পাশা (দ্যূত) ও দাবা (চতুরঙ্গ) খেলার প্রচলন গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পুরনো দাবা চৌষট্টি ঘর কেটেই খেলা হতো, আর তাতে গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হতো ঠাকুর (রাজা), মন্ত্রী, গজ (হাতি) আর বড়িয়া (বোড়ে)।

দ্রাবিড় বাঙালির মতো আর্য বাঙালিও গ্রামে ইট-পাথরের বাড়ি বানাত না। নগরগুলোতে যেখানে বহু ইটের বাড়ি ছিল, গ্রামে ইটের বাড়ি দেখাই যেত না। সে কারণেই বাংলার গ্রামগুলোতে বহু পুরনো বাড়ির চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্পন্ন গৃহস্থও বাড়িতে বাঁশের খুঁটি দিতেন, খড়ের চালা দিতেন আর দেয়াল হতো মাটির। বড় বাড়ির ক্ষেত্রে বাঁশের বা কাঠের খুঁটির ওপর ধনুকের আকারে কিংবা দুই-তিন স্তরে ছাউনি দেয়া হতো। এ ধরনের বাড়ি খুব টেকসই না হলেও বাংলার আবহাওয়ায় বসবাসের জন্য আরামদায়ক হতো। গৃহস্থের দুশ্চিন্তা ছিল বর্ষাকাল নিয়ে। প্রতি বর্ষার পর ঘরামিরা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন গ্রামের ঘরগুলোর ছাউনি ও দেয়াল মেরামত করে আরেক বছরের জন্য বাসযোগ্য করে তুলতে।

গ্রামের মানুষ আর্য শাসনের সময়েও মাটির পাত্রেই পান-আহার করতেন। শুধু বাসন-কোসন নয়, গ্রামের কুমোররা (মৃৎশিল্পী) মাটি দিয়ে হাঁড়ি, লোটা, দোয়াত, ফুলদানি, কলস, জালা—সবই তৈরি করতেন। কামারেরা (যারা লোহা-তামার কাজ জানেন) এবং ছুতোরেরা (সূত্রধর, যারা কাঠের কাজ জানেন) মিলে তৈরি করতেন যাবতীয় কৃষি সরঞ্জাম লাঙল, দাঁতওয়ালা মই, কাস্তে, দা, কোদাল, শাবল ইত্যাদি।

গ্রামীণ বাঙালির পোশাকের যে বিবরণ পাই, তাতে মনে হয় সাধারণভাবে গ্রামের পুরুষরা ধুতি পরতেন, নারীরা শাড়ি পরতেন। বাড়ির বাইরে বের হলে পুরুষেরা ধুতির ওপর উত্তরীয় পরতেন, নারীরা শাড়ির ওপর ওড়না (উড়নি) ব্যবহার করতেন। তবে ব্লাউজ বা চোলিজাতীয় কোনো কাপড়ের বিবরণ পাওয়া যায় না। শহরের নারীরা স্তনপট্ট ব্যবহার করলেও গ্রামের নারীদের এ রকম কিছু ব্যবহার করার কথা শোনা যায় না। তবে গ্রামের নারীরাও সিঁদুর দিতেন, লাক্ষারসের আলতা (অলক্তক) ব্যবহার করতেন, খোঁপায় ফুল গুঁজতেন। তবে সাজগোজের বেলায় নারীকে সেকালেও সাবধান থাকতে হতো। কবি গোবর্ধনাচার্যের কবিতা থেকে জানা যাচ্ছে, বেশি সাজগোজ করা এবং পুরুষের দিকে কটাক্ষপাত করা নারীকে গ্রামপতিরা 'ডাকিনী' বলে ধরে নিয়ে শাস্তি দিতেন। নারী-পুরুষ সবাই সাধারণত লম্বা চুল রাখতেন।

আর্য শাসনের সময় বাংলার গ্রামের সব মানুষ যে সম্পন্ন ছিলেন, তা নয়। অল্প জমির মালিক কিংবা কৃষিশ্রমিকদের ঘরে অভাব লেগেই থাকত। নিরন্নের সময় গৃহস্থকে সপরিবারে দাসখত লিখে দিতে হয়েছে, এমন ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। যৌতুক প্রথা তখনো ছিল, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছেলের পরিবার মেয়ের পরিবারের কাছ থেকে যৌতুক নিত। বেশি পরিমাণে যৌতুক পেলে ছেলের পরিবার যে জাতিভেদের বিচারের ক্ষেত্রে নমনীয় হয়ে যেত, এমন উল্লেখও আছে। এই সময় থেকেই বাংলায় সতীদাহ বা সহমরণ প্রথাকে উৎসাহিত করা হতে থাকে, তবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের বাইরে গ্রামীণ বাঙালি এ প্রথাকে গ্রহণ করেনি।

বাংলা ভাষায় প্রবাদ আছে, 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। পার্বণের এই আধিক্য আর্য বাঙালির কল্যাণেই শুরু হয়েছিল। বৈশাখ মাসে বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণকে দান করত, জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীর পূজা করত, মেয়েরা সেই সঙ্গে সাবিত্রী-ব্রত পালন করত। আষাঢ়ে বিষ্ণুপূজা হতো। শ্রাবণে মনসাপূজা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী (শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন), আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও কোজাগরী উৎসব পালন করা হতো। কার্তিকে হতো দীপান্বিতা বা দীপাবলি আর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া (যা পরে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে রূপ নিয়েছে)। মাঘ মাসে হতো সরস্বতী পূজা আর ভীষ্মপূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি, আর চৈত্র মাসজুড়ে থাকত শীতলার পূজা, বারুণী উৎসব, রামনবমী আর মদন-পূজা।

আর্য ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার গ্রামগুলোতে পূজা ছাড়াও নতুন কিছু অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল। পুংসবন (ছেলে সন্তানের জন্ম নিশ্চিত করার অনুষ্ঠান), নামকরণ, অন্নপ্রাশন (শিশুর মুখে ভাত দেয়ার অনুষ্ঠান), চূড়াকরণ (মাথা মুড়ানো), উপনয়ন (শিক্ষাজীবন শুরু করার অনুষ্ঠান) এবং সমাবর্তন (গুরুর বাড়ি থেকে পড়াশোনা শেষ করে ছাত্রের ফিরে আসার অনুষ্ঠান) ইত্যাদি গ্রামেও প্রচলিত ছিল।

সুলতানি আমলের গ্রামবাংলা : নতুন ধর্ম, নতুন অর্থনীতি

পাল রাজত্ব ও সেন রাজত্বের পর বখতিয়ার খলজির বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে সুলতানি আমলের সূচনা হলো। সুলতানি আমল আসার আগেই বাংলার গ্রামীণ সমাজ একটি সংঘবদ্ধ কাঠামোতে পরিণত হয়েছিল। ফলে রাজত্বের হাতবদল হলেও গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক আকারে পরিবর্তন আসেনি।

কৃষিতে সেচের ব্যবহার সুলতানি আমলে বেড়েছিল, সেচের জন্যে সরকারি ব্যবস্থায় নানা গ্রামে খাল কাটার বিবরণ আছে। সুলতানেরা রাজস্ব আয় বাড়াতে জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাড়ানো এবং অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভ্রমণে এসে বিখ্যাত ভূপর্যটক ইবন বতুতা দেখেছেন, নদীর পানিতে চক্রাকারের সেচযন্ত্র বসিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে।

সুলতানি আমলেই সত্যিকারভাবে জমিদারি প্রথা চালু হয়। সুলতানের প্রশাসন রায়-রায়ান নামে ভূস্বামীদের নিয়োগ দিয়ে গ্রাম থেকে রাজস্ব আয়ের

ব্যবস্থা সুসংহত করেন। রায়-রায়ানরা আবার মোড়লদের কাজে লাগিয়ে খাজনা তুলতেন।

ভূমি রাজস্ব ছাড়াও গ্রামের লোকদের কাছ থেকে আরো দুটি কর নিয়মিতভাবে আহরণ করা হতো—পশুচারণের কর (চরাই) আর বাসস্থানের ওপর কর (ঘরি)। যেসব গ্রাম রায়-রায়ানদের অধীনে দেয়া হয়নি, সেসব গ্রাম থেকে সুলতানের কর্মচারীরা সম্পন্ন বড় চাষীদের (এদের মুকাদ্দম বলে উল্লেখ করা হয়েছে) রাজস্ব আহরণের কাজে নিয়োগ করতেন। উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকেরও বেশি কৃষককে খাজনা হিসেবে দিয়ে দিতে হতো। ফলে খুব কম কৃষকই নিশ্চিন্তে সংসার চালাতে পারতেন। ভূমিকরের চাপে পিষ্ট কৃষকেরা বিদ্রোহ করেছেন, সুলতানি আমলে এ রকম কয়েকটি নজির পাওয়া যায়। সুলতানের সৈন্যরা বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে কিছুদিনের জন্যে ভূমিকর খানিকটা কমানো হতো। রায়-রায়ান আর মুকাদ্দমরা ঠিকমতো খাজনা আদায় করছেন কিনা তা তদারক করতে সুলতানেরা নানা রকম কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। মধ্যযুগের নানা বিবরণে পাটোয়ারি, তরফদার, মাজমুয়াদার, ওয়াদ্দাদার, কুটকিন্দার, সেজওয়াল ইত্যাদি সরকারি কর্মচারীর নাম পাওয়া যাচ্ছে, যারা সবাই রাজস্ব আহরণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

সুলতানি আমলে গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। সরকারি সড়ক দিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গরু, মোষ ও ঘোড়ার গাড়িতে জনপরিবহন ও মাল পরিবহনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে গ্রামগুলো আর আগের মতো বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রতি বছর নববর্ষের সময় বর্ধিষ্ণু গ্রামে মেলা বসত, সেই মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে বণিকেরা নানা ধরনের পণ্য নিয়ে আসতেন। গ্রামের অধিবাসীরা এসব মেলা থেকে সুগন্ধি, সিসা-চুমকি-রুপার গহনা, তামা-কাঁসা-পিতল-রুপার বাসন, খেলনা, দামি কাপড় ইত্যাদি কিনে রাখতেন। মেলায় বাঁশ-কাঠের সাময়িক দোকান তৈরি করা হতো, এগুলো মেলা শেষে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হতো। ইতালির পর্যটক সেজার ফ্রেদারিক ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রামের কাছে এমন একটি মেলা দেখেছিলেন।

তবে রাস্তার উন্নতি হলেও বেশির ভাগ গ্রাম তখনো জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। গ্রামের অদূরেই চরে বেড়াত বুনো মোষ, বুনো শুয়োর আর হরিণের দল। শুধু সুন্দরবন নয়, উত্তরে গৌড় পর্যন্ত বাঘের বিচরণ ছিল—খাবারের অভাব পড়লে বুড়ো বাঘ গ্রামে হামলা চালাতে দ্বিধা করত না। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সফর করার সময় ব্রিটিশ বণিক র‍্যালফ ফিচ এসব বন্য পশু দেখেছেন এবং সেগুলোর বিবরণ লিখে রেখেছেন।

সুলতানি আমলে বাংলার গ্রাম থেকে গুড় ও সূক্ষ্ম বস্ত্র সংগ্রহ করে বণিকেরা তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশে রফতানি করতেন। পর্তুগিজ পাদ্রি ফাদার মেলকিওর ফনসেকা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বাকলা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে বিস্তীর্ণ আখখেত দেখেছেন।

বাংলার সুগন্ধি, সরু চালের সুখ্যাতি ছিল দিল্লির বাজারে। রফতানি করতে পারায় সম্পন্ন কৃষকের আয় বেড়েছিল, তবে ক্ষুদ্র চাষীকে খাজনা দেয়ার পর বছরের খোরাকি জোগাড় করতেই হিমশিম খেতে হতো। এ চাষীদের দুরবস্থার সুযোগ নিত মহাজনেরা। কুসীদজীবী মহাজনেরা চড়া সুদে টাকা ধার দিতেন। অশিক্ষিত কৃষক সুদের হার আর হিসাবের মারপ্যাঁচে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে সারা জীবনেও ধারের টাকা শোধ দিতে পারতেন না, জমি-বাড়ি বিক্রি করে দাসে পরিণত হতেন।

বাংলার নানা জায়গায় জমির নানা রকম মাপ ছিল। তবে সুলতানি আমলে কিছু কিছু মাপ নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গে সুলতানি আমলের শেষের দিকে জমির একক ছিল গণ্ডা (আজকের হিসেবে প্রায় দুই শতাংশ জমি)। কুড়ি গণ্ডায় এক কানি জমি হতো, ষোলো কানিতে এক দ্রোণ। তবে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে কাঠা ও বিঘা দিয়েই জমি মাপা হতো।

সুলতানি আমলে জমিদারির আকার বড় ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে গোবর্ধন দাস নামে এক জমিদার প্রতি বছর কুড়ি লাখ টাকা খাজনা আদায় করে সুলতানের কোষাগারে বারো লাখ টাকা জমা দিতেন, এ বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু জমিদার বা মাজমুয়াদার নন, জোতদারেরাও কয়েকশ কৃষি-শ্রমিক নিয়োগ করে চাষবাসের কাজ করাতেন। সমাজে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকটভাবে ছিল, সেটা বোঝা যায়। তবে জমিদারদের ওপর জনকল্যাণের নানা দায়িত্ব ছিল। তারা নিজের জমিদারির প্রজাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য ছিলেন। বড় আইনি-বিবাদের বিচার করতেন কাজি, কিন্তু গ্রামের ছোটখাটো বিরোধ নিষ্পত্তি জমিদার বা তার মনোনীত প্রতিনিধি করতেন।

সুলতানেরা কাপড় উৎপাদনের জন্য গ্রামের মানুষকে রেশম চাষে উৎসাহ দিয়েছিলেন। পাট থেকেও কাপড় ও চট তৈরি হতো। তবে দামি কাপড় (বিশেষ করে 'গঙ্গাজল' নামের সূক্ষ্ম সুতি কাপড় ও মিহি মসলিন) তৈরি হতো অল্প কিছু জায়গায় এবং মূলত রফতানির জন্য। তবে কাপড় রফতানির ফলে তাঁতিদের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাঁতিরা চাষের কাজ সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে পুরোপুরি বয়ন-বুননের কাজে নিয়োজিত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু কামার-কুমার-সুতার-মুচিকে নিজেদের পেশার পাশাপাশি চাষের কাজ করে বছরের খোরাকি নিশ্চিত করতে হতো।

আর্য শাসনামলের মতো সুলতানি আমলেও বাংলায় ধাতব মুদ্রার ব্যবহার সীমিত ছিল। গ্রামের মানুষের লেনদেনের প্রধান মুদ্রা ছিল কড়ি। চার কড়িতে এক গণ্ডা, পাঁচ গণ্ডায় এক বুড়ি, চার বুড়িতে এক পণ, ষোলো পণে এক কাহন এবং দশ কাহনে এক টাকা হতো। অনুমান করা যায়, গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ সারা জীবনে সোনার মুদ্রা দূরে থাক, আস্ত একটি রুপার মুদ্রাও চোখে দেখতে পেত না।

সুলতানি আমলেও গ্রামীণ সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতাপ ছিল, বহু ব্রাহ্মণ নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। এই আমলেই ফারসি-শিক্ষিত হিন্দু করণিকদের 'কায়স্থ' সম্প্রদায়টি গড়ে ওঠে। এরা সুলতানের প্রশাসনে চাকরি করতেন এবং ভালো আয় করতেন। সেই আয়ের একটি অংশ এরা আবার ব্রাহ্মণদের সেবায় ব্যয় করতেন। গ্রামগুলোতে পূজা উপলক্ষে বিরাট আয়োজন হতো। পর্তুগিজ পর্যটক সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গ্রামে দুর্গা বিসর্জনের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পূজার পর দুর্গা প্রতিমাকে রথে চড়িয়ে শত শত লোক সেই রথ টেনে নিয়ে যেত। রথের সামনে দেবদাসীরা নাচত, এবং গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ঘুরে রথ নদীর তীরে এলে নদীতে প্রতিমার বিসর্জন হতো।

সুলতানি আমলে গ্রামগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করা নও-মুসলিমদের যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা কিছু রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেলেও সামাজিকভাবে হিন্দুদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সমাজে 'মোল্লা' উপাধি নিয়ে একদল লোক প্রায় ব্রাহ্মণদের আদলে নিজেদের মুসলমানের ধর্মযাজক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এরা বিয়ে পড়াতেন, মিলাদ-কুলখানি-দোয়া মাহফিল পরিচালনা করতেন, আকিকা দিতেন, ক্ষেত্রবিশেষে মুরগি জবাই এবং তাবিজ দেয়ার কাজেও এদের ডাক পড়ত। হিন্দু কৃষকের বাড়ি থেকে যেমন ব্রাহ্মণের কাছে 'সিধে' হিসেবে চাল-মাছ-সবজি-ফল যেত, মুসলমান কৃষকের বাড়ি থেকেও মাছ-মাংস-ভাত-তরকারি মোল্লাকে পাঠানোর রেওয়াজ ছিল।

কৃষক-বণিক-করণিক ছাড়াও আরো নানা পেশার লোক সুলতানি আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁতি, দর্জি, মাঝি, পরি (পিঠা-বিক্রেতা), কাবাড়ি (মাছ-বিক্রেতা), কাগজি (যারা কাগজ বানাতেন), রংরেজ (যারা কাপড় রঙ করতেন), হাজাম (যাদের দায়িত্ব ছিল মুসলমানি করানো), কসাই ও শানাকর (যারা তাঁত বানাতেন)—এমন সব পেশার অধিকাংশ মানুষ মুসলমান ছিলেন। ফলে সুলতানি আমলেই গ্রামীণ মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে।

আর্যদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যেমন বাংলায় এসে লোকজ সনাতন ধর্মের রূপ নিয়েছিল, তেমনি সুলতানি আমলে বাংলার গ্রামগুলোতে যে ইসলামের প্রচলন ছিল, তা এক ধরনের লোকজ ইসলাম। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রভাব ইসলামকে তার মূল আদর্শকে খানিকটা বিচ্যুত করেছিল। অনেক গ্রামে পীরপূজার চল ছিল। বহু গ্রামে মুসলমানদের মধ্যেও গাছ-পূজা বা চিহ্ন-পূজার অভ্যাস পুরোপুরি বাতিল হয়নি। অনেক গ্রামে অজু করার, নামাজ পড়ার বা রোজা রাখার নিয়ম ইচ্ছামতো স্থানীয় মানুষ বদলে নিতেন। কোনো কোনো গ্রামে রমজান মাসে ভোর রাতে সেহরি খাওয়ার পর নও-মুসলিমরা একটি মাটির হাঁড়ির ভেতর ফুঁ দিয়ে সেটা ঢাকনা দিয়ে আটকে 'রোজা-বন্ধন' করতেন। রোজা বন্ধ আছে, এই অজুহাতে তাঁরা দিনের বেলায় পানাহার করতেন, আবার বিকালবেলায় হাঁড়ির ঢাকনা খুলে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে 'রোজা ফিরিয়ে' নিতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় ইফতার করে মনে করতেন, তারা রোজা রাখতে পেরেছেন। নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা গ্রামের নও-মুসলিমদের কুসংস্কার দূর করার জন্য চেষ্টা করতেন, তবে তারা চোখের আড়াল হলেই অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মগুলো ফিরে আসত।

সুলতানি আমলে হিন্দু ধর্মের ওপর তান্ত্রিক চর্চার প্রভাব পড়েছিল। তন্ত্র-সাধনার নামে বাংলার কোনো কোনো গ্রামে একদল মানুষের নরবলি, নেশাসক্তি ও যৌন অনাচারের বিবরণ পাওয়া যায়।

মুসলমান শাসকের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হওয়ায় এ সময় বহু ব্রাহ্মণের কৌলিন্য নিয়ে সমাজে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এ সংকট কাটিয়ে উঠতে ব্রাহ্মণেরা 'জাতিমালা কাছারি' নামের একটি সংগঠন তৈরি করে জাতে-

পতিত ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এছাড়া শাক্ত ও বৈষ্ণব মতবাদের দ্বিমুখী চাপের ফলে শৈবধর্ম বাংলার গ্রামগুলোতে গুরুত্ব হারাতে শুরু করেছিল।

গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহ চালু হতে খানিকটা সময় নিয়েছিল, কিন্তু এই প্রচলন হয়ে যাওয়ার পর গ্রামীণ হিন্দু সমাজ চাপে পড়েছিল। হিন্দু বৈধব্যের কঠোর নিয়ম পালন করতে না পারা মেয়েদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগের প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু যে পরিবারের মেয়ে ধর্ম ত্যাগ করত, সে পরিবারের সব সদস্যকেই সমাজে 'পতিত' হতে হতো। এ ক্ষোভ থেকেই মনসা-মঙ্গল কাব্যে মুসলমান নারীর বিধবা বিয়ে বা একাধিক বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছিল।

মোগল আমলে বাংলার গ্রাম-সমাজ : মগ-হার্মাদ-বর্গির হানা

বিদ্রোহী বারোভুঁইয়াকে দমন করে মোগল বাদশাহ আকবর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে নেন। এর পরে দেড়শ বছর ধরে বাংলায় মোগল শাসন চলেছে।

আকবরের বাংলা জয়ের কিছুদিন আগেই পাঠান শাসনের সময় সম্রাট শের শাহ বাংলায় ভূমি জরিপ করিয়েছিলেন। এই জরিপ মোগলদের খুব কাজে এসেছিল। সম্রাট আকবর শের শাহের ভূমি-সংস্কার উদ্যোগ অব্যাহত রাখলেন। খাজনা আদায়ের সময় পাল্টে বাংলার ফসল উৎপাদনের সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনলেন। মোগল সাম্রাজ্য বাংলায় তুলা ও রেশমের মতো অর্থকরী চাষে উৎসাহ দিয়েছিল, অনাবাদি জমি আবাদ করতে পারলে আবাদকারীকে জমির মালিকানা পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল এবং সরকারি খরচে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিল। ফলে বাংলায় কৃষি আবাদ বেড়ে গিয়েছিল এবং জঙ্গল কেটে নতুন নতুন গ্রামের পত্তন হয়েছিল।

সম্রাট আকবরের প্রশাসন খাজনা আদায়ের জন্য আমিল নিয়োগ করেছিল। এরা প্রত্যেক গ্রাম থেকে একজন সম্পন্ন গৃহস্থ বেছে নিয়ে তাদের সাহায্যে ভূমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ধারণের কাজ করতেন। সাহায্যকারী এ কৃষকদের নাম দেয়া হয়েছিল কানুনগো। আর অনিচ্ছুক প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের কাজে আমিলকে সাহায্য করতেন ফৌজদার। ফৌজদাররা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করতেন, দরকারমতো চোর-ডাকাত দমন করতেও তাদের সসৈন্যে পাঠানো হতো।

মোগল ইতিহাসবেত্তা আবদুল লতিফ বাংলায় এসে কিছু গ্রাম ঘুরে দেখেছিলেন। তার লেখায় বাংলার গ্রামের মসজিদ, মাদ্রাসা, টলটলে পানির পুকুরের বর্ণনা আছে। বাংলার গ্রামে আমবাগানের শোভাও তাকে মুগ্ধ করেছিল।

মোগল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে এ সময় ইউরোপীয় বণিকেরা বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে আফিম, লবণ, মসলিন আর মসলা রফতানি করতে শুরু করে। এ রফতানির ফলে বাংলায় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আসতে শুরু করে, কিন্তু মোগল সম্রাটকে খাজনা দিতে গিয়ে এর প্রায় পুরোটাই বাংলা থেকে বের হয়ে যেত। ফলে গ্রামের লোক এর খুব বেশি সুফল পায়নি।

তার ওপর মোগল আমলে বাংলার গ্রামগুলো, বিশেষত পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃত এলাকা বহুদিন পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের হানায় জর্জরিত ছিল। ১৬১৬ থেকে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ—এই পঞ্চাশ বছর ছিল বাংলায় মগ-হার্মাদ দস্যুতার যুগ। পর্তুগিজ ও মগ দস্যুরা চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রামগড় (এখন মুন্সিগঞ্জ) পর্যন্ত এসে নানা দলে ভাগ হয়ে বিক্রমপুর, সোনারগাঁ, বাকলা, ভূষণা ও যশোর পর্যন্ত গিয়ে লুটপাট চালাত। নদীপথে লড়াইয়ের জন্যে এই দস্যুরা স্লুপ নামের ছোট আকারের পালতোলা যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করত। এ জাহাজের গতির সঙ্গে বাংলার জমিদার বা স্থানীয় শাসকদের নৌকাগুলো পাল্লা দিতে পারত না। তাদের পরনে থাকত লাল কোট, খাটো কালো প্যান্ট ও টুপি। লাঠি, তলোয়ার, বল্লমের পাশাপাশি তারা বন্দুক ব্যবহার করত। এছাড়া তাদের কাছে ছিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ, যেটা ব্যবহার করে তারা দূর থেকেই কোনো নৌকা, জাহাজ বা জনবসতির সন্ধান পেয়ে যেত।

মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যু বাহিনী অল্পদিনেই বুঝে গিয়েছিল, লুটপাটের চেয়েও লাভজনক ব্যবসা হলো বাংলার মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া। পর্তুগিজ দস্যুরা যে এলাকায় আক্রমণ করত, সেখানে নারী-পুরুষ-শিশু, হিন্দু-মুসলমান বাছবিচার করত না। যাকে সামনে পেত, তাকেই বন্দি করত। বন্দিদের সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে তাদের দড়ি দিয়ে বাঁধা হতো, কিংবা হাতের তালু ফুটো করে তার মধ্যে দিয়ে বেত ঢুকিয়ে দেয়া হতো, যাতে বন্দিরা পালাতে না পারে। এরপর তাদের নৌকা বা জাহাজের পাটাতনে স্তূপাকারে ফেলে আরাকান রাজ্য বা দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলোতে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রতি বছর এই দস্যুদল বাংলার অন্তত কুড়ি হাজার মানুষকে ধরে নিত, পথকষ্টে বহু বন্দি মারা যাওয়ার পরেও দশ থেকে পনেরো হাজার মানুষ দাস হিসেবে জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। ১৬২১-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দ—এ তিন বছরে শুধু চট্টগ্রামের দাস-বাজার থেকেই তারা বাংলা থেকে ধরে নেয়া প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার নারী-পুরুষ-শিশুকে দাস হিসেবে বিক্রি করে। হার্মাদদের ভয়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও খুলনার উপকূলের গ্রামগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। নদীর ধারগুলোতেও জনবসতি কমতে থাকে।

পর্তুগিজ-আরাকান জলদস্যুদের অত্যাচারে বাংলার অর্থনীতি প্রায় ধসে পড়েছিল। মোগল সম্রাটের রাজস্ব লোকসান দাঁড়িয়েছিল বছরে দশ লাখ রুপির কাছাকাছি। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কী বিপুল ক্ষতি হয়েছিল, এ থেকে তার খানিকটা আঁচ করে নেয়া যেতে পারে। জলদস্যুদের দমন করতে মোগলরা নানা অভিযান চালিয়ে সফল হতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সুবাদার শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করে পর্তুগিজ-আরাকান জলদস্যুতার অবসান ঘটাতে পেরেছিলেন।

জলদস্যু আক্রমণ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাংলায় বাণিজ্য ও কৃষিকাজে গতির সঞ্চার হল। ফসলের উৎপাদন বাড়ল। উদ্বৃত্ত ফসলের কারণে একবার দাম কমে এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যাচ্ছিল। শায়েস্তা খান এ সাফল্যে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু টাকায় আট মণ চালের জোগান দিতেন যে কৃষক, তার শ্রমের মূল্য যে কত কম ছিল, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আরেক সুবাদার মুরশিদ কুলি খান পুরনো মোগল প্রথা জায়গিরদারির বদলে মাল-জসমানি প্রথা চালু করেন। এ প্রথা অনুযায়ী পরগনার বন্দোবস্ত নিতে জমিদারদের দিওয়ানখানায় আগেই টাকা বা সম্পদ জমা রাখতে হতো। এ ব্যবস্থার আওতায় মুরশিদ কুলি বাংলা থেকে এক কোটি তিরিশ লাখ টাকা রাজস্ব আয় করেছিলেন। কিন্তু বেশি রাজস্ব আহরণ করতে গিয়ে মুরশিদ কুলি খান বাংলার জমিদারদের ওপর খুব চাপ তৈরি করেছিলেন। জমিদারেরাও অনন্যোপায় হয়ে প্রজাদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত খাজনার ভার চাপিয়ে দেন। সূর্যের চেয়ে বালি গরম—তালুকদার, ইজারাদার, মৎসুদ্দি মিলে খাজনা আদায়ের নামে কৃষক ও স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর নিপীড়নের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি আবার দুর্বল হয়ে পড়ে।

মোগল আমলের শেষ দিকে গ্রামের অর্থনীতি আরেকবার সংকটে পড়ল, যাকে বলে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মারাঠা দস্যুরা বারবার বাংলা আক্রমণ করেছে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ—এই ছয় বছরে মারাঠা আক্রমণে বাংলার প্রায় চার লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল, অন্তত এক লাখ বাঙালি ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। ভাগীরথী ও গঙ্গার পূর্ব তীর প্রায় জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছিল, পদ্মার পশ্চিম তীরের বেশির ভাগ এলাকাতেই সম্পন্ন গ্রামীণ গৃহস্থ মারাঠা আক্রমণ ঠেকাতে বাড়ির পাশে পরিখা খুঁড়তে বাধ্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নবাব আলিবর্দি খান কৌশলে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করে মারাঠা আক্রমণের ইতি ঘটান। কিন্তু ততদিনে যে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, বাংলার গ্রাম-সমাজ সে ক্ষতি আর পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলার গ্রামে ইংরেজ শাসন

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করায় বাংলা স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, এমনটাই আমরা ইতিহাসের বইয়ে পড়েছি। কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় এবং ১৭৬৫ সালে কুষ্ঠরোগে মীর জাফরের মৃত্যু হওয়ার পর সরকারিভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার বুঝে নেয়। মোগল সরকার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকেই বাংলার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব বা 'দিওয়ানি' দিতে বাধ্য হয়।

মোগল সম্রাটের সুবাদার কিংবা স্বাধীনতা ঘোষণা করা নবাবদের মতোই বাংলা থেকে নির্বিচারে খাজনা সংগ্রহ করার কৌশলই ইংরেজ প্রথম দিকে অনুসরণ করেছিল। ১৭৬৬ থেকে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ বাংলার কৃষি কিংবা গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানত না। ১৭৬৭ সালে যখন অনাবৃষ্টিতে বাংলাজুড়ে ফসলহানি হলো, ইংরেজ সতর্ক হয়নি। তার পরের বছর গ্রীষ্মকালে মহামারী আকারে দেখা দিল গুটিবসন্ত। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ইংরেজ একদিকে সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ চাল কিনল আর কোম্পানির অনুগত গোমস্তাদের চালের একচেটিয়া ব্যবসা করার অনুমতি দিল। এসবের মিলিত অভিঘাতে ১৭৭০ সালে চালের দাম বেড়ে তিন গুণ হলো। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের দরিদ্র মানুষের পক্ষে এ দামে চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। পুরো বাংলাজুড়ে তিন কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের

কবলে পড়ল, মারা গেল প্রায় এক কোটি মানুষ।

এই ভয়াবহ, মর্মান্তিক প্রাণহানি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের পাষাণ হৃদয়েও খানিকটা দয়ার সঞ্চার করেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলায় অবস্থিত ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে লেখা এক চিঠিতে শিকার করেছেন, 'ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে' প্রদেশের 'তিন ভাগ লোকের অন্তত এক ভাগের মৃত্যু হয়েছে' এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করনীতির ভুলের ফলে 'বেশির ভাগ এলাকায় দুর্ভিক্ষে বেঁচে যাওয়া জনগণের ওপর আরো বেশি হারে করভার পড়েছে', ফলে 'তাদের এলাকা ছেড়ে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকছে না।' এতে দীর্ঘমেয়াদে কোম্পানির লোকসান হচ্ছে, সে কথা স্বীকার করে নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছেন, 'রাজস্বের হিসাব সহজ ও বোধগম্য করার, আহরণের হার নির্ধারিত করার, প্রদেশের সর্বত্র আদায়ের একই প্রক্রিয়া চালু করার এবং সমানাধিকারের ভিত্তিতে বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দিকে নজর রেখেছি।'

১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করার অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল, তা হেস্টিংসের এ চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। বিচক্ষণ হেস্টিংস 'হালদারি' নামের বিবাহ কর বাতিল করারও সুপারিশ করেছিলেন। কারণ কর দিতে না পারায় মানুষ বিয়ে করতে দেরি করছিল আর বিয়েতে দেরি হওয়ায় ব্রিটিশদের করদ প্রদেশে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছিল।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বাংলার গ্রামীণ সমাজের কাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। মোগল ব্যবস্থায় রায়তরা ছিল জমির স্বাধীন মালিক, জমিদারের শুধু কর আহরণের অধিকার ছিল। নতুন বন্দোবস্তে জমিদার হলো জমির আসল মালিক, রায়তো হলো জমিদারের প্রজা, তার জমিতে ভাড়াটে বিশেষ। জমিদারের প্রজাপালনের দায়িত্ব তত থাকল না, যত তার হাতে এল প্রজাপীড়নের অধিকার।

নতুন বন্দোবস্ত খাজনা আদায় এবং আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যতই সহায়ক হোক, এর ফলে শাসক ইংরেজের সঙ্গে বাংলার গ্রামবাসীর দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিল। গ্রামে না থেকে, শুধু ক্ষণিকের গ্রাম-পরিদর্শন থেকে ইংরেজ শাসকেরা বাংলার গ্রামজীবন সম্পর্কে যে ধারণা করেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত।

ইংরেজ লেখক ও ইতিহাসবেত্তাদের একটা ধারণা হলো বাংলা ও ভারতবর্ষের বেশির ভাগ গ্রামই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মতো। এরা বলেছেন, গ্রামগুলো আসলে একেকটা 'ভিলেজ রিপাবলিক'। ১৮০৯ সালে টমাস মানরো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক প্রতিবেদনে প্রথম এ কথা লিখেছিলেন। তার ভাষায়, 'দেশের উত্থান-পতনে গ্রামের লোকের কিছু আসে যায় না। যতক্ষণ না গ্রাম ভেঙে দুই টুকরো হচ্ছে, গ্রামবাসী জানতেও চায় না রাজত্ব হাতবদল হলো কিনা। গ্রামীণ অর্থনীতি আপন গতিতে চলতে থাকে।' টমাস মানরোর এ ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায় চার্লস মেটকাফের মুখে, যিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেক গ্রাম যেন একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, সম্পূর্ণ স্বনির্ভর অচলায়তন।'

ইংরেজদের লেখা পড়ে কার্ল মার্ক্সের মতো দূরদর্শী তাত্ত্বিকও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিও ধরে নিয়েছিলেন, 'ভারতের গ্রামগুলোর অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর, লবণ ছাড়া আর কিছুই বাইরে থেকে গ্রামে আমদানি করতে হতো না।' শুধু কার্ল মার্ক্স কেন, উত্তরকালের বহু ভারতীয়-পাকিস্তানি-বাংলাদেশী লেখক-চিন্তক এ কথাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু এ রকম স্বনির্ভর, অন্য গ্রাম কিংবা রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন গ্রাম কেবল কল্পনাতেই থাকতে পারে, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। মেলা উপলক্ষে প্রত্যেক গ্রামেই কখনো না কখনো দূর-দূরান্ত থেকে পণ্যসম্ভার আসত। গ্রাম থেকে কৃষিপণ্য, ক্ষুদ্র শিল্পপণ্য অন্য গ্রাম, কাছের শহর এমনকি দূরের নগরেও চালান যেত। পাকা রাস্তার স্বল্পতা থাকলেও জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদীনালার মাধ্যমে জলপথে গ্রামগুলো একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

তা যদি না-ই হবে, পাল আমল কিংবা সুলতানি আমলের সমৃদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির মোগল আমলে কিংবা ইংরেজ আমলের শুরুর দিকে এ বিপর্যয় হলো কেন? ইংরেজ শাসক গ্রামবাংলার প্রাণটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। ইংরেজ লেখক ও প্রশাসকেরা যে গ্রাম দেখেছিলেন, তা মোগল আমলের শোষণে বিপর্যস্ত, ইংরেজ আমলের শুরুর দিকের অদক্ষ ব্যবস্থাপনায় জর্জরিত হতোদ্যম গ্রাম। সেই গ্রামকে অচল, অনড় প্রমাণ করতে পারলে নিজেদের লোভ ও ব্যর্থতার ভার গ্রাম-সংস্কৃতির স্থবিরতার ওপর চাপানো যায়।

প্রায় একশ বছর ধরে বাংলার গ্রামগুলো ইংরেজের কাছে শুধু খাজনা আদায়ের ক্ষেত্র হয়েই থেকে গিয়েছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলো ১৮৩৩ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চতুর্থ আইন, যা ইংরেজদের বাংলায় জমি কিনে জমিদারি করার ঢালাও অনুমতি দেয়। এ আইন কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ নীল উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা বাংলার গ্রামগুলোতে কৃষকদের শোষণ ও নিপীড়ন করার অবাধ অনুমতি পেয়ে যায়। প্রায় তিরিশ বছর ধরে অমানুষিক বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েও বাঙালি কৃষক প্রতিকার পাননি। সুসভ্য ইংরেজের ন্যায়ের আদালত সবসময় নীলকরের স্বার্থ রক্ষা করে রায় দিয়েছে। পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে ১৮৫৯ সালে বাঙালি কৃষক সশস্ত্র বিদ্রোহে নামেন, প্রাণের মায়া না করে নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পাবনা, যশোর, খুলনায় নীলকরদের কুঠি জ্বালিয়ে দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্রিটিশ সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়, নীলকরদের অবাধ স্বাধীনতা খর্ব করতে হয়। সেই হিসেবে বলা যায়, বাংলার গ্রামের কৃষকের এ বিদ্রোহই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারতে করা প্রথম সার্থক বিদ্রোহ।

তবে ইংরেজ আমলেও পরের দিকে গ্রাম-সংস্কারে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হয়েছে। বিশেষত, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়ে যখন থেকে ব্রিটিশ রাজপরিবারের শাসন শুরু হলো, তখন থেকে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও ব্রিটিশ প্রশাসন বাংলায় গ্রামীণ প্রজাদের কল্যাণে কিছু কাজ করেছে। ১৮৭০ সালে ভারতের ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মেয়ো চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন প্রণয়ন করে গ্রামের পঞ্চায়েতকে একটি আইনি ভিত্তি দেন। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের আওতায় চার-পাঁচটি গ্রামের একটি ইউনিয়ন ধরে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বাতিল করে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতো, এর মাধ্যমে বাংলার গ্রামগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় সরকারের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলার গ্রামগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দিকে ইংরেজ শাসক দীর্ঘদিন নজর দেয়নি। মধ্যযুগে বাংলার গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও মক্তব গড়ে উঠেছিল, ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকেও টোল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসা মিলিয়ে এক লাখ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসকের অবহেলায় গ্রামের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৮৫৪ সালের ব্রিটিশ সরকারি শিক্ষাভাষ্য বা উড'স ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার গ্রামে শিক্ষার প্রসারের ওপর জোর দেয়। এর পর থেকে অনেক জমিদার উৎসাহিত হয়ে নিজের জমিদারিতে স্কুল স্থাপন করেন।

তবে বাংলার গ্রামীণ সমাজে সবচেয়ে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল ব্রিটিশ সরকারের করা ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন। জমিদারদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও কর শোষণের প্রতিবাদে ১৮৪০ থেকেই সারা বাংলায় কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্রিটিশ শাসক ১৮৮০ সালে 'রেন্ট কমিশন' গঠন করে প্রজাদের দাবি অনুযায়ী স্থায়ী রায়তের অধিকারের সংজ্ঞা বেঁধে দেয়। পরে ১৯২৮ সালে আরেক সংস্কারের মাধ্যমে এ আইনে নিমস্বত্ব রায়তদের (বর্গাচাষী) অধিকারও স্বীকার করে নেয়া হয়। এ আইন উপনিবেশোত্তর যুগে জমিদারি প্রথা বাতিল করে বাংলার গ্রামগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে আরো গতিশীল করে তোলার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।

গ্রামের ইতিহাস সংরক্ষণ : আমাদের দায়

আমি জানি, বেশির ভাগ পাঠক গ্রামবাংলার এই সংক্ষিপ্ত, অগভীর ইতিহাস পড়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু আমি অনন্যোপায়, যাতে গ্রামবাংলার ইতিহাস লেখা আছে, এমন প্রামাণ্য বাংলা বা ইংরেজি বইয়ের সংখ্যা অল্প।

সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করি, গ্রামবাংলার ইতিহাস সংরক্ষণের দায় আমাদেরই। শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিস্তারের এ যুগে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের একটি সমন্বিত চেষ্টা করা খুবই সম্ভব এবং এ উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নেয়া যেতে পারে।

গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। বিশেষত যারা ইতিহাস এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন, তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের কাজে সম্পৃক্ত করতে পারলে যে তথ্যভাণ্ডার পাওয়া যাবে, তা যাচাই-বাছাই করলে আগের চেয়ে অনেক পূর্ণাঙ্গ, অনেক অর্থবহ গ্রামীণ ইতিহাস আমাদের জাতীয় জ্ঞানসম্পদের ভাণ্ডারে যোগ হবে।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে গ্রামবাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, সমৃদ্ধ আত্মপরিচয় তুলে দেয়ার জন্য এ কাজটি এখনই শুরু করা দরকার।

minister®

LED TV AC REFRIGERATOR

১২ বছর গ্যারান্টি

75% UPTO ENERGY SAVING

Dual Smart INVERTER Technology

Minister Refrigerator Features:

R600a GAS Energy saver Eco friendly | 75% Energy saver | Built in voltage stabilizer | Real Tempered Glass Door

Minister Air Conditioner Features:

Dual Smart INVERTER Technology | USED JAPAN BRAND COMPRESSOR | 100% BTU Capacity & full Copper tube | Fast Cooling System (Cold in 1 Minute) | Anti Bacterial Filter

Minister LED & Smart TV Features:

10 YEARS WARRANTY | Eye Protective | 4K ULTRA-HD | DOLBY DIGITAL | Voice Control

www.ministerbd.com /Minister.Bangladesh **Hotline: 09606 700700**

দুজন

তানজিনা হোসেন

কলাবাগানে ছয়তলা অ্যাপার্টমেন্টটার নিচে কার পার্কিংয়ে কয়েকজন পাঞ্জাবি পরা লোক ঘোরাঘুরি করছে। কয়েকটা প্লাস্টিকের চেয়ার এনে রাখা হয়েছে অতিথিদের জন্য। দারোয়ানরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। কে যেন হন্তদন্ত হয়ে মালিহার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। এর চেহারাটা একটু চেনা চেনা। কোনো কবি-সাহিত্যিক কি? পরিচয় হয়েছিল কখনো? নিশ্চয়ই শুভ্রর কোনো বন্ধু হবে। মালিহা একটু ইতস্তত করে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। লিফটের চার, লিফট থেকে নেমে ডান দিকের কোনার ফ্ল্যাট। ফোর ডি। দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট। ছোট্ট বেডরুমের সাথে একটা লাগোয়া বারান্দা আছে। এ বারান্দা দিয়ে প্রচুর বাতাস আসত। অত স্পেস ছিল না যে চেয়ার রাখা যাবে, তাই মালিহা দুটো বেতের মোড়া কিনেছিল। মাঝে মাঝে মন ভালো থাকলে তারা মোড়ায় বসে হাওয়া খেতে খেতে বিকালে চা আর মুড়িমাখা খেত।

লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একটা মেয়ে হুড়মুড় করে এসে ঢুকল। পরনে ফ্যাকাসে সাদা কুর্তি আর সালোয়ার, কুঁচকে গেছে একেবারে। চুলও এলোমেলো। ঠিকমতো আঁচড়ানোর সময় পায়নি বোধহয়। ফোর বাটনে টিপ দিতে গিয়ে দেখে আগেই টিপ দেয়া হয়ে গেছে। পাশ ফিরে পরিপাটি শাড়ি পরা কপালে টিপ দেয়া মালিহাকে দেখে একটু থমকে গিয়ে বলল, আপনি কি ফোর ডিতে যাবেন?

মালিহা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল—হুঁ।

দুই সেকেন্ড বিরতি নিয়ে মেয়েটা বলল, আপনি কি মালিহা জেবিন?

মালিহা আগের চেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল—হুঁ।

একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। ততক্ষণে লিফট চারতলায় পৌঁছে গেছে। দরজা খুললে মেয়েটা আগে নেমে তারপর পেছন ফিরে বলল—আসেন। ডেডবডি পুলিশ নিয়ে গেছে। হাসপাতালে ইমার্জেন্সিতে বলছে ন্যাচারাল ডেথ, হার্ট অ্যাটাকই হবে হয়তো। তাই পোস্টমর্টেম লাগবে না। একবারে রেডি করে নিয়ে আসছে এখন। রায়েরবাজারে মনে হয় কবর দেবে।

ন্যাচারাল ডেথ! মৃত্যু তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপারই। মানে খুবই ন্যাচারাল। শুভ্র বলত, দেখো এই সহজ স্বাভাবিক জিনিসটারে নিয়া জীবনানন্দ বাবু কত ক্যাঁচাল করছে! মরণ লইয়া ব্যাটার রোমান্টিসিজমের শেষ নাই। ভুয়া!

মালিহার ভালো লাগে জীবনানন্দর কবিতা। তাই সে এসব শুনে রাগ করত। ভুয়া কেন? জীবনানন্দে তোমার সমস্যা কী?

—আরে এইগুলা কোনো কবিতা হইল? বাঙালি কবিতা বোঝে না, তাই রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দরে নিয়া খালি নাচে। আনস্মার্ট।

—হুম, তোমরাই খালি কবিতা বোঝো। আর ভাবো যে তোমরাই কেবল ভালো কবিতা লিখতে জানো। কী যে লেখো, কেউ তো পড়ে না! কেউ নামও জানে না! মালিহা রাগ করে বলত। শুভ্র মাঝে মাঝে হাসত, মাঝে মাঝে রেগে যেত।

ফোর ডি ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলা। ভেতরে ড্রইংরুমের মেঝেতে চাদর বিছানো। ফ্যানের বাতাসে চাদরের কোনাগুলো উড়ে যাচ্ছে। কয়েকজন বিভিন্ন বয়সী মহিলা বসে আছেন ইতস্তত। শুভ্রর ঢাকায় তেমন কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। তবু গ্রাম থেকে কেউ এসে থাকতে পারে। পাড়াপ্রতিবেশীও হতে পারে। তিন বছরের সংসারজীবনে এক বৃদ্ধ ফুপু ছাড়া শুভ্রর কোনো আত্মীয়কে দেখেনি মালিহা। সেই ফুপুও গত বছর নাকি মারা গেছেন। দরজার বাইরে স্যান্ডেল খুলে ভেতরে এসে মেঝেতে বসল মালিহা। উপস্থিত নারীরা প্রায় সবাই মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। মালিহা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। সে এখানে কাউকে চেনে না। এরাও তাকে চেনে না। শুভ্রর বন্ধুবান্ধব কই। সবাই কি হাসপাতালে? নাকি সে এখন পুরোপুরি বন্ধুহীন?

ভেতর থেকে সেই মেয়েটা একটু পর বেরিয়ে এসে মালিহার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ভেতরে এসে বসেন।

—নাহ, থাক। একটু বিব্রত হলো মালিহা।

—না কেন? আসেন। ভেতরে কেউ নাই।

মালিহা উঠে দাঁড়িয়ে শাড়িটা গুছিয়ে ভেতরে গেল। খাবার টেবিলের ওপর এখনো এঁটো প্লেট-বাসন। বিস্কুটের খোলা বয়াম। টেবিলক্লথটা নোংরা। এখানে ওখানে হলুদ ঝোল লেগে আছে। বেডরুমের পর্দা পতপত করে উড়ছে। বারান্দার দরজা খোলা। দখিনা হাওয়া আসছে ওদিক থেকে। মেয়েটা বেডরুমে ঢুকে বলল, ডেডবডি বাথরুমের সামনে নাকি পড়ে ছিল। ছুটা বুয়াটা এসে বেল দিতে দিতে পরে বিল্ডিংয়ের সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে। ঘটনা কখন ঘটেছে কেউ জানে না। রাতেই হবে।

ঘরে সিগারেটের তীব্র গন্ধ। অ্যাশট্রে নাই, বিছানার পাশে একটা চায়ের কাপে অনেকগুলো সিগারেটের শেষাংশ। মালিহা থাকতে সিগারেট খাওয়া কমিয়ে এনেছিল শুভ্র। পরে মনে হয় আবার বেড়েছে।

মেয়েটা বিছানার এক কোণে বসে বলল—বসেন। গল্প করি। আপনার কথা অনেক শুনেছি।

মালিহা কোনো কথা বলল না। মেয়েটার বয়স অনেক কম। এর সঙ্গে কি শুভ্র প্রেম করত? লিভ ইনও?

—আমার নাম টুম্পা। স্মার্টলি বলল মেয়েটা। ওর সঙ্গে একটা সম্পর্ক হতে পারত এমন একটা অবস্থা চলছিল। তবে জানেনই তো, এসব মানুষের সঙ্গে রেসপনসিবল রিলেশনশিপ গড়ে ওঠা মুশকিল। তাই ব্যাপারটা ঝুলে ছিল। এখন তো চিরকালের জন্যই ঝুলে গেল। মেয়েটা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল।

—আমি দুঃখিত। মালিহা বলল। সরি ফর ইওর লস।

মেয়েটা মাথা নাড়ল—নাহ তেমন কিছু খারাপ লাগছে না। শুধু একটা কেমন শূন্যতা। এই ঘরে, এই বারান্দায় অনেক আড্ডা দিয়েছি। বই পড়েছি। সিনেমা দেখেছি। ঝগড়া করেছি। অথচ এখন মানুষটা নাই। আর কোনোদিন আসবেও না। একটা কেমন এম্পটিনেস হচ্ছে। কদিন পর হয়তো এই ফিলিংটাও আর থাকবে না। স্ট্রেঞ্জ, তাই না? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ আসলে কিছুই না। মুছে যেতে এক মুহূর্তও লাগে না। একটা মানুষ পৃথিবী থেকে নাই হয়ে গেলে কিছুই আসে যায় না পৃথিবীর।

মালিহা আবার চুপ করে গেল। এই ঘরে তারাও অনেক বই পড়েছে। সিনেমা দেখেছে। ঝগড়া করেছে। শুধু ঝগড়া নয়, মারামারিও করেছে দু-একদিন। শুভ্র একদিন ওকে চড় মেরেছিল, জবাবে সে পিরিচ ছুড়ে শুভ্রকে আহত করেছিল। অনেক রক্ত বেরিয়েছিল শুভ্রর। তারপর গভীর রাতে আবার হাসপাতালে নিয়ে কপালে দুটো সেলাই করিয়ে এনেছিল। আরেকবার মালিহা বেশ রাতে বের হয়ে ওর এক বান্ধবীর বাসায় চলে গিয়েছিল। তারপর ভোরবেলা দেখে শুভ্র ওই বাসার নিচে কলাপসিবলের বাইরে অপেক্ষা করছে। শীতের রাত। ঠাণ্ডা লেগে সেবার নিউমোনিয়া বাঁধানোর উপক্রম। পরের কয়েক দিন খুব ভুগতে হয়েছিল। মালিহাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শুভ্রর জন্য নয়, বরং এই কথা ভেবে যে যৌথ জীবন বোধ হয় এ রকমই হয়। মাধুর্যের চেয়ে তিক্ততা বড় হয়ে ওঠে একসময়। শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর একসময় মনে হয় জীবনে শান্তিটাই সবচেয়ে বড় জিনিস। তার জন্য বাকি সব হারালেও কিছু যায় আসে না। না, টুম্পার মতো এম্পটিনেস তেমন বোধ হচ্ছে না। তবে মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে। হয়তো নিজের জন্যই। তার জীবনে শান্তি এখনো আসেনি, তবে স্বস্তি এসেছে। এই বা কম কী?

মালিহা এবার উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। এক কোণে মালিহা কয়েকটা ছোট ছোট ফুলের টব রেখেছিল, গাছগুলো মরে কঙ্কাল হয়ে গেছে, শুভ্র টবগুলো ফেলে দেয়নি। হয়তো খেয়ালই করেনি। কোনো কাজে ইনিশিয়েটিভ ছিল না শুভ্রর। এমনকি কবিতার বই প্রকাশেও না। বেশ একটা নির্জলা জীবন কাটিয়ে গেল। কোনো দায়দায়িত্ব নেই, দুশ্চিন্তা নেই। রোজকার উপার্জন আর খরচের দুশ্চিন্তা নেই। মালিহার এখন একটু হিংসাই হচ্ছে কেন যেন। কেউ চাইলেই এমন নিশ্চিন্ত নির্ভার জীবন পায় না। কবিরা হয়তো পায়। টুম্পা মেয়েটাও বারান্দায় ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। বারান্দার রেলিংয়ে হাত দিয়ে বলল, বাড়িওয়ালা আসছে। চার মাসের বাড়ি ভাড়া নাকি বাকি। খুঁজতেছে আপনজন কেউ আছে নাকি। রাগারাগি করতেছে।

মালিহা একটু হেসে বলল, আমরা দুজন কেউই বৈধ আপনজন না।

—হুম। তা ঠিক। বসার ঘরে একজন চালাক-চতুর মানুষ আছেন, উনি বলছেন নগদ টাকা দেয়ার কেউ নেই, বাড়িওয়ালা চাইলে ঘরের সব জিনিস রেখে দিতে পারে।

মালিহা একবার পেছন ফিরে তাকাল। কী আছে এই ঘরে? বেডরুমে একটা খাট, খাটের পাশে ছোট বেডসাইড টেবিল। ড্রেসিংটেবিল ছিল না মালিহার, বাথরুমের আয়নায় কাজ সারত। বসার ঘরে এক সেট বেতের সোফা কিনেছিল। আর খাবার ঘরে ছোট্ট চার সিটের একটা ডাইনিং টেবিল। এই নিয়ে কি লোকটা খুশি হবে? দেনা রেখে নাকি কাউকে কবর দিতে নেই, শুভ্রর আরো কত জায়গায় কত দেনা রয়ে গেছে কে জানে?

চলো বসার ঘরে গিয়ে বসি—মালিহা বলল।

নাহ—চুল ঝাঁকিয়ে বলল টুম্পা। অলরেডি কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে। আপনি যে তালাক হওয়া স্ত্রী, প্রাক্তন স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে শাড়ি পরে কপালে টিপ দিয়ে সেজেগুজে ঢং দেখতে আসছেন, এইটা নিয়ে আলোচনা হইতেছে। একটু পর এই অকালমৃত্যুর জন্য আপনারেই দায়ী করা হইতে পারে।

—ও। আর তোমাকে ওরা চেনে? তোমাকে নিয়ে কিছু বলছে না?

—হুম, দারোয়ানদের কাছ থেকে খবর নিছে। আমি যে এইখানে মাঝে মাঝে আসি, এমনকি রাতও কাটাই, মানে চরিত্রহীন মেয়েমানুষ—এইসব আর কি।

—এখন কী করা? মালিহা একটু চিন্তিত হয়ে বলল। চলে যাব নাকি?

—আমি লাশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই। শুভ্রর মুখটা একটু দেখব। মুখে ওর সেই চিকন হাসি লেগে আছে কিনা দেখতে চাই। এইটুকু। ব্যস।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টুম্পা। মালিহার এবার সত্যি খারাপ লাগতে লাগল। মেয়েটা সত্যি শুভ্রকে ভালোবাসত। বাচ্চা একটা মেয়ে। কষ্ট পাচ্ছে।

টুম্পা আবার মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী করবেন? লাশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন?

মালিহা ভাবল একটু। আসলে সে কেন এসেছে? অফিসে বসে খবরটা পেয়ে মনে হচ্ছিল তার একবার আসা উচিত। কেন, তা জানে না। শুভ্র নিজে উচিত-অনুচিতের ধার ধারত না। আর এখন তো সে মৃত, এসব নিয়ে ভাবার প্রশ্নই আসে না। সে কি শুভ্রকে দেখতে চায়? না, তাও চায় না। শুভ্র তার স্মৃতি থেকে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। প্রথম প্রথম প্রচণ্ড রাগ হতো। মনে হতো তার জীবনের এই দশার জন্য শুভ্রই দায়ী। খারাপ স্মৃতিগুলো খুব কষ্ট দিত। সব ভেঙেচুরে ফেলতে মন চাইত। তারপর ধীরে ধীরে খারাপ স্মৃতিগুলো মিলিয়ে গেল। একসময় সে রিয়ালাইজ করল যে কারো জীবনের জন্য কেউ দায়ী না, সে নিজে ছাড়া। আশ্চর্য ব্যাপার, এখন শুভ্রর কথা মনে পড়লে বিয়ের আগের দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে বেশি। যখন তারা দুজন রিকশা করে সারা শহর ঘুরে বেড়াত, নাটক দেখতে যেত, চায়ের দোকানে আড্ডা দিত। না, শুভ্রর মৃত মুখ সে দেখতে চায় না। আর কোনো ভার নেয়ার মতো অবস্থা তার নেই। এখানে তার কোনো প্রয়োজন নেই।

সে ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে উঠল। বলল, আমি বরং যাই।

—শুভ্রকে দেখবেন না?

—না।

—ঠিক আছে। যান তাহলে। মন খারাপ করবেন না।

শুনে একটু হাসল মালিহা। টুম্পার মাথায় হাত রেখে বলল, তুমি খুব ভালো।

টুম্পাও হাসল। মালিহা ব্যাগ থেকে তার কার্ড বের করল। বলল, এটা আমার কার্ড। তোমার ইচ্ছে হলে একদিন অফিসে এসো। গল্প করব। আমার গল্প করার মতো কেউ নেই।

—আমারও নেই। টুম্পা বলল। শুভ্রর সঙ্গেই যত কথা হতো।

—আমারও তাই।

—তাহলে আমরা কী নিয়ে গল্প করব?

—কেন, শুভ্রকে নিয়েই হতে পারে। হাসল মালিহা।

এবার জোরে হেসে উঠল টুম্পা। বসার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে অচেনা মহিলারা রাগী চোখে তাকালেন ওদের দিকে। বাইরে অ্যাম্বুলেন্সের বিকট শব্দ। শুভ্র বোধ হয় এল।

মালিহা টুম্পার হাতে একটু চাপ দিয়ে বেরিয়ে এল। লিফটের জি। মানে গ্রাউন্ড ফ্লোর। ছয় বছর আগে নেমে আসার সময় মনে হয়েছিল আর কোনোদিন এখানে আসা হবে না। অথচ আবার আসতে হলো। তবে এবারই শেষ।

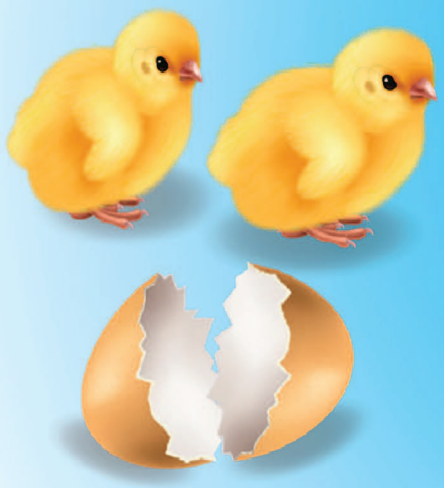

নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম

সঞ্চিত আমানত দ্বিগুণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে 'নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম' চালু করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। এককালীন ০১ (এক) লক্ষ বা এর গুণিতক যে-কোন পরিমাণ টাকা জমা রেখে ৬½ (সাড়ে ছয়) বছরে দ্বিগুণ মুনাফা বুঝে নিন।

এ স্কীমে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিতে মুনাফার হার ১১.২৩%

হিসাবের মেয়াদ: ৬½ (সাড়ে ছয়) বছর

- জনতা ব্যাংক পিএলসি-এর যে-কোন শাখায় এ স্কীম খোলা যায়
- ০১ (এক) লক্ষ বা এর গুণিতক তদুর্ধ্ব পবিমাণ টাকা জমা রেখে সাড়ে ছয় বছরে দ্বিগুণ মুনাফা
- রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকে আমানতকারীর বিনিয়োগ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও নিরাপদ
- জমাকৃত টাকার বিপরীতে ৮০% ঋণ গ্রহণের সুবিধা
- মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানতকারীর মৃত্যু হলেও নমিনির ইচ্ছায় মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত হিসাব চালু রাখার সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে মেয়াদপূর্তির আগেই আংশিক মুনাফাসহ টাকা তুলে নেয়ার সুবিধা

● বিধি মোতাবেক মুনাফা হতে কর কর্তনযোগ্য

জনতা ব্যাংক পিএলসি.

উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

www.jb.com.bd

আস্থা ফেরাতে ঘুচে যাক জরা, দৃশ্যমান এখন নতুনধরা!

বহুল কাঙ্ক্ষিত 'পদ্মা সেতু' সংযুক্ত ৩০০ ফিট ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সাথে নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন পৃথিবীর প্রত্যাশায় গড়ে উঠছে অপ্রতিদ্বন্দ্বি আবাসন প্রকল্প **নতুনধরা** !

আবাসনে আস্থার আদর্শ...

নতুনধরা™

নতুন প্রজন্মের নতুন পৃথিবী

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ই.আই.এ অনুমোদনপ্রাপ্ত
- পরিবেশের চূড়ান্ত অনুমোদন পরিবেশগত ছাড়পত্রপ্রাপ্ত
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়পত্রপ্রাপ্ত
- জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেজিস্টার্ড
- জেলা প্রশাসন কর্তৃক দায়মুক্তি সনদপত্রপ্রাপ্ত
- জেলা প্রশাসন কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল অনুযায়ী জমি ক্রয় ও মিউটেশন করার অনুমোদনপ্রাপ্ত একমাত্র কোম্পানী
- সরকারী ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা রাজস্ব কমিটি কর্তৃক পরপর ২ (দুই) বার শীর্ষ অবস্থানে থেকে বিশেষ সম্মাননা স্মারকপ্রাপ্ত কোম্পানি
- আইএসও ৯০০১ : ২০১৫ সার্টিফাইড
- ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক কৃতজ্ঞতাপত্র প্রাপ্ত একমাত্র আবাসন কোম্পানী
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়পত্রপ্রাপ্ত
- সংশ্লিষ্ট দুই (০২) উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক শুভেচ্ছা স্মারকপ্রাপ্ত
- সংশ্লিষ্ট দুই (০২) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত
- বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সপ্রাপ্ত
- ট্রেডমার্ক রেজিস্টার্ডকৃত কোম্পানী
- প্রতিষ্ঠিত আবাসন প্রকল্পকে শতভাগ সফলতার সাথে সম্পূর্ণরূপে টেকওভার (ক্রয়) করা একমাত্র কোম্পানী
- বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপারস্ এসোসিয়েশন-এর সদস্য
- ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সদস্য

ISO 9001:2015 NOTUNDHORA ASSETS LTD. CERTIFIED

নতুনধরা এসেটস্ লিমিটেড

(নতুনধরা গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান)

কর্পোরেট হেডকোয়ার্টারস্:
৫৫, নিক টাওয়ার (৭ম, ৮ম ও ৯ম তলা), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মতিঝিল অফিস:
৮২, আলহাজ্ব টাওয়ার (১০তম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

গুলশান অফিস:
লেক ভিউ গার্ডেন, বাড়ী # ১/বি (৪র্থ তলা), রোড # ৩৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

01708454572, 01729228228 , 01709818090
01708454571 , 01729272086, 01729272092
+88 02 223388909, +88 02 223388910

www.notundhora.com

শিল্পের অন্যতম মাধ্যম সংগীত। কখনো সেখানে শুধু সুর থাকে আবার কখনো কথা যুক্ত হয়। কিছু সুর মানুষের কানে লেগে থাকে। আর কিছু কথা ছুঁয়ে যায় হৃদয়। সঙ্গে থাকে বাদ্যযন্ত্র। গানকে পরিপূর্ণ করে তা। অবশ্য সঙ্গে থাকে গীতিকার, সুরকার ও শিল্পীর মুনশিয়ানা। এসব যখন একত্র হয় তখন একটা গান যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেটি ছাড়িয়ে যায় দেশ, কাল ও সময়। বাংলাদেশেও এমন বহু গান আছে। কয়েক দশক পর দেশ, কাল ও মানুষ বদলে গেলেও গানগুলোর আবেদন কমে না। এমনই পাঁচটি গান নিয়ে এ আয়োজন। অর্ধশতাব্দী পরও গানগুলো মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

সৃষ্টির অর্ধশতাব্দী পরও জনপ্রিয় যে বাংলা গানগুলো

অহিদুর রহমান

তোমারে লেগেছে এত যে ভালো

সংগীত অঙ্গনে গানটিকে মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

'তোমারে লেগেছে এত যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে' গানটি এখনো বহু মানুষ শোনে। বহু মানুষ গেয়ে থাকে। প্রথম গেয়েছিলেন তালাত মাহমুদ। আর অমর এ গানের গীতিকার কেজি মোস্তফা। 'রাজধানীর বুকে' সিনেমার গানটি তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ১৯৬০ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমায় অভিনয় করেন শবনম, সুভাষ দত্ত, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। ৭০ বছরেরও বেশি সময় আগের গানটি এখনো প্রজন্মের পর প্রজন্মের কাছে প্রিয় গানের তালিকায় রয়ে গেছে। ষাটের দশকের অন্যতম প্রধান নায়ক রহমানের ঠোঁটে গানটির চিত্রায়ণ হয়েছিল।

গানটির নেপথ্য গল্প নিয়ে গীতিকার কেজি মোস্তফা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'মনে পড়ে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হলাম। ১৯৫৬ সাল। পড়াশোনার পাশাপাশি কবিতাচর্চা ছিল আমার। তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকের পাতায় কবিতা লিখতাম।... সে সুবাদে আচমকা আমন্ত্রণ এল রাজধানীর বুকে চলচ্চিত্রের গান লেখার জন্য। স্বনামধন্য পরিচালক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। সুরকার রবীন ঘোষ। কণ্ঠশিল্পী উপমহাদেশের তৎকালীন গজল সম্রাট তালাত মাহমুদ।... আমাকে ছবির সিকোয়েন্স বুঝিয়ে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সুরের ওপর কথা বসাতে বললেন। শুনে তো আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এতদিন যা কিছু লিখেছি, সে তো মনের খেয়ালে। এখন এ যেন এক অগ্নিপরীক্ষায়।... যথাসম্ভব কাহিনীটা মাথায় রেখে সুরের ওপর কথা বসাতে চেষ্টা করলাম। প্রথম লাইন লিখলাম তোমারে লেগেছে এত যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে। ভীষণ উৎসাহী হয়ে রবীন বললেন, পরের লাইন লিখুন...। লিখলাম রাতের বাসরে দোসর হয়ে/ তাই সে আমায় টানে।'

রাজ্জাক-শাবানার রসায়ন ‘শুধু গান গেয়ে পরিচয়’

সত্তরের দশকে দর্শক হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গান ‘শুধু গান গেয়ে পরিচয়’। গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ারের কথা এবং শহীদ আলতাফ মাহমুদের সুরে গানটিতে কণ্ঠ দেন সাবিনা ইয়াসমিন ও আবদুল জব্বার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার খুব কাছের সময়ে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে মুক্তি পায় রাজ্জাক-শাবানা অভিনীত সিনেমা ‘অবুঝ মন’। সিনেমাটি নির্মাণ করেন নির্মাতা কাজী জহির।

বাংলা গানের তালিকায় কয়েকটি গান আছে, যেগুলো প্রকাশের অর্ধশত বছর গেলেও এ গানগুলোর সুর যেন এখনো কানে বেজে ওঠে। তার মধ্যে শুধু গান গেয়ে পরিচয় একটি। পাঁচ দশক পার হয়ে গেলেও এ গানের সুর শুনলেই সহজেই অনুমান করা যায় এ গানের কথা। আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে শুধু গান গেয়ে পরিচয়।

গানটি ঢাকাই সিনেমার আলোচিত জুটি রাজ্জাক-শাবানার ঠোঁটে চিত্রায়িত হওয়া এবং গানের কথা ও সুরের কারণে সত্তরের দশকে দর্শকের হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল। সিনেমাটির গল্পে দুই ধর্মের দুই তরুণ-তরুণীর প্রেম, সে প্রেমের জন্য দুই বন্ধুর ত্যাগ ও মানবতার গল্প উঠে এসেছে এ সিনেমায়। সিনেমার কাহিনী, চিত্রনাট্য ও অভিনয়ের পাশাপাশি শুধু গান গেয়ে পরিচয় গানের পরিচিতিও ছড়িয়ে পড়ে দর্শকমহলে।

আজও সবার পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ‘রেললাইনের ঐ বস্তিতে’

বাংলাদেশের পপ ও রক সংগীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম আজম খান। দেশীয় সংগীতাঙ্গনে তিনি গুরু নামে পরিচিত। ব্যান্ড সংগীতকে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিয়ে গেছেন আজম খান। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েও এ দেশের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন এ কিংবদন্তি। তার গাওয়া ‘রেললাইনের ঐ বস্তিতে’ গানটি আজও বাজে ঘরে ঘরে।

১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় একদিন আজম খান রেললাইনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন অনেক ক্ষুধার্ত শিশু তাকে ঘিরে ধরে সাহায্যের জন্য। আজম খান ভারাক্রান্ত মন দিয়ে মানুষের দুর্দশা দেখেন। তার কাছে যা ছিল সব দিয়ে শিশুদের সাহায্য করেছিলেন সেদিন। সে অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হলো কালজয়ী এ গানের। বাংলা পপ গানের ধারায় সামাজিক বিষয় নিয়ে এমন সহজ কথা এত নান্দনিকভাবে এর আগে কেউ শোনেনি।

১৯৭৪-৭৫ সালের দিকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে গানটি প্রচারের পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। আজ পর্যন্ত সবার পছন্দের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে তার গানটি। এখনো বিভিন্ন কনসার্টে শিল্পীদের কণ্ঠে শোনা যায় গানটি। আজম খানের এ গানের আবেদন যেন ফুরানোর নয়। অর্ধশত বছর আগে এ গানের জন্ম হলেও এর আবেদন চলতে থাকবে আরো অনেক সময়।

ADMISSION OPEN

INTERNATIONAL STANDARD UNIVERSITY

NEW DIMENSIONS IN EDUCATION

ISU SPECIAL FEATURES

Up to 100%
Scholarship and Waiver on Tuition Fees

Female Students'
waiver @ 5% (Applicable only with General Waiver)

Quality Education
at an Affordable Cost

Free Courses
(i) English Foundation
(ii) Computer Foundation
(iii) Mathematics Foundation

OBE Curricula
Followed by All Programs

Hostel Facilities
Available

OUR PROGRAMS

- ✓ BBA
- ✓ LLB (Hons.)
- ✓ BA (Hons.) in English
- ✓ B.Sc in CSE ✓ B.Sc in Textile Engineering
- ✓ Bachelor of AMM (Apparel Merchandising & Management)
- ✓ MBA ✓ MA in English Literature & Cultural Studies

More info:
01313 037 071
01313 400 600

Contact us at:
+8809613 100 100
69 Mohakhali C/A, Dhaka-1212
admission@isu.ac.bd, www.isu.ac.bd

ভাবনাহীন নিশ্চিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে

সঞ্চয় করুন মার্কেন্টাইল ব্যাংকে

সুপার মুনাফা আমানত প্রকল্প

নিয়মিত আয়ে নিশ্চিন্ত জীবন

প্রতি লাখে **১,০০০/-** (করের আগে)

মাসিক মুনাফা

মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প

আজকের ছোট সঞ্চয়
ভবিষ্যতের সুরক্ষার প্রত্যয়

- মাসিক জমার পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা
- মেয়াদকাল: ১, ৩, ৫, ৮ ও ১০ বছর
- বছরভেদে আকর্ষণীয় মুনাফা
- ৮০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা

মাসিক মুনাফা আমানত প্রকল্প

নিরাপদ বিনিয়োগে সর্বোচ্চ মুনাফায়
পরিবারের মাসিক খরচ মেটায়

- প্রতি লাখ টাকা জমায় মাসে ৮৯০ টাকা (করের আগে) পাওয়া যায়
- ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা ও গুণিতক যে কোনও এমাউন্ট বিনিয়োগ করা যায়
- প্রতিমাসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুনাফা অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর
- ৮০%পর্যন্ত ঋণ সুবিধা

আকর্ষণীয় মুনাফায় মার্কেন্টাইল ব্যাংকের রয়েছে - নারী সঞ্চয় প্রকল্প, দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত প্রকল্প, পরিবার সুরক্ষা আমানত প্রকল্প, কোটিপতি মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প সহ বেশ কিছু আমানত প্রকল্প।

বাংলার ব্যাংক

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি.
Mercantile Bank PLC.
দক্ষতাই আমাদের শক্তি

১৬২২৫

www.mblbd.com

সাবিনা ইয়াসমিন

শাজনাজ রহমতুল্লাহ

নকিব খান

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ এ গানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অন্যতম সেরা শিল্পী শাজনাজ রহমতুল্লাহ। গান গেয়ে তিনি দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তার কণ্ঠে গাওয়া এমনি একটি দেশের গান 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ'। এ গানের গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির ও সুর করেছেন আলাউদ্দিন আলী।

সত্তর দশকের শেষভাগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে নওয়াজিশ আলী খান প্রযোজিত 'বর্ণালী' অনুষ্ঠানে মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা গানটি শাহনাজ রহমতুল্লাহ প্রথম পরিবেশন করেন। এরপর দেশজুড়ে গানটি ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মুখে মুখে। বাংলাদেশে দেশের গান হিসেবে যে কয়েকটি গান এ পর্যন্ত মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে তার মধ্যে শাহনাজ রহমতুল্লার এ গান অন্যতম। এ গানের ভাষায় উঠে এসেছে গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, মাটি, মানুষ, মাঠ-ঘাট ও ফসলের কথা।

গানটি যেমন সবার প্রিয়, পাশাপাশি গানটি নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। ১৯৮০-এর দিকে গানটি জিয়াউর রহমানের দলের দলীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। দলের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে গানটিকে এর সংগীত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ২০১৮ সালে কণ্ঠশিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ ও সুরকার আলাউদ্দিন আলী দাবি করেছেন যে তাদের অনুমতি ছাড়াই দলটি আনুষ্ঠানিক সংগীত হিসেবে গানটিকে ব্যবহার করছে।

মন শুধু মন ছুঁয়েছে, 'কল্পনাও করিনি গানটি মানুষের কাছে এত প্রিয় হতে পারে'

বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের ভুবনে জনপ্রিয় 'মন শুধু মন ছুঁয়েছে'। গানটির বয়স কিন্তু ৫০ বছরেরও বেশি। বিভিন্ন অনুষ্ঠান কনসার্টে আজও একই আবেদনে গানটি গেয়ে চলেছেন শিল্পীরা। এর গীতিকার নকিব খান ও সুরকার জিলু খান।

গানটির সৃষ্টির কথা খোদ নকিব খানই জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যখন আমরা সোলসে গান করি, তখন সোলস মৌলিক গান করত না। আমি জয়েন করার পর মৌলিক গান শুরু করে। আমার বড় ভাই জিলু খান একদিন একটি সুর গুনগুন করছিলেন। শুনে আমার খুব ভালো লাগল। আমি সঙ্গে সঙ্গে সুরটা ধরে রাখার জন্য গানটা লেখার চেষ্টা করলাম। পরে বড় ভাইকে দেখালাম। উনি দেখে খুবই খুশি হলেন। তার পর উনি সুর করলেন। এভাবেই গানটা হয়ে যায়।'

পরে সোলস ব্যান্ডের মূল গায়ক তপন চৌধুরী গানটি গাইলেন। বাংলাদেশের প্রথম ব্যান্ড ক্যাসেট 'সুপার সোলস'-এ রিলিজের পর তুমুল জনপ্রিয় হয়। সে জনপ্রিয়তা আজও বজায় আছে।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহ

মুহাম্মদ আলমগীর কবীর

কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের উপকণ্ঠে নরসুন্দা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দান। এটি বাংলাদেশের তথা উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম ঈদগাহ ময়দান। বছরের দুই ঈদে কিশোরগঞ্জ জেলার পাশাপাশি বৃহত্তর ময়মনসিংহের ছয় জেলাসহ সারা দেশ থেকে মুসলিম পুরুষরা একত্রিত হন ঈদের দুই জামায়াতে। কিশোরগঞ্জের এ ঈদগাহ মাঠ নিয়ে রয়েছে বর্ণিল ইতিহাস। এই ঈদগাহ মাঠের জামায়াতে অংশ নিতে শত বছর আগে থেকেই বংশপরম্পরায় বিভিন্ন পরগনার জমিদাররাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসল্লিরা আসত। ইয়ামেন থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে আসা শোলাকিয়ার 'সাহেব বাড়ি'র পূর্ব পুরুষ শাহ সুফি সৈয়দ আহমেদের হাতে শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের গোড়াপত্তন হয়। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলা শহরে অবস্থিত শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে ১৮২৮ সালে প্রথম ঈদুল ফিতরের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। শাহ সুফি সৈয়দ আহমেদ এই নামাজে ইমামতি করেন বলে সর্বস্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে। আর ওই প্রথম জামায়াতের কাতার গণনায় সোয়া লাখ মুসল্লির উপস্থিতির প্রমাণ হওয়ায় সেই থেকে এ ঈদগাহ মাঠের নাম হয় 'সোয়া লাখিয়া'। উচ্চারণ বিবর্তনের ফলে এ ঈদগাহ ময়দানটি এখন শোলাকিয়া নামেই সমধিক পরিচিতি। ১৮২৮ সালের পর থেকে টানা ঈদ জামায়াত অনুষ্ঠিত হলেও ২০২০ ও ২০২১ সালে করোনার কারণে ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০১৬ সালে মাঠে জঙ্গি হামলার কারণে ২০১৭ সাল থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় এখানে। ঈদ জামায়াতে প্রায় চার লাখ মুসল্লি অংশ নেন বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয়রা জানায়, এই ঈদগাহের জমির পরিমাণ প্রায় ৭শ একর। বর্তমানে ঈদগাহটির চারদিক পাকা প্রাচীরে ঘেরা এবং এর মূল মাঠে ২৬৫টি কাতার রয়েছে। প্রতি কাতারে নামাজির সংখ্যা হয় প্রায় ৭০০। সেই হিসাব অনুযায়ী নামাজির সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ৫০০। ঈদের জামায়াতে মুসল্লিরা মাঠ উপচে চারপাশের খালি জায়গা, সড়ক ও বসতবাড়ির আঙিনায় জামায়াতে অংশ নেন। ফলে এর ব্যাপ্তি দাঁড়ায় প্রায় চার লাখ মুসল্লিতে। এর পশ্চিম সীমারেখা উত্তর-দক্ষিণে ৩৩৫ ফুট এবং পূর্ব সীমারেখা উত্তর-দক্ষিণে ৩৪১ ফুট এবং উত্তর সীমারেখা পূর্ব-

RUPAYAN GRAND

FEW UNITS LEFT

- 63% Open Space
- Schools
- Mosques
- Facility Management
- 3 Layer Security
- Community Club
- Spectacular Courtyard

RUPAYAN GRAND

RUPAYAN CITY UTTARA
A Premium Mega Gated Community

RUPAYAN CITY
First City Brand in Bangladesh

HAPPY TO SERVE YOU 16504 | 017 0122 3644 | www.rupayancity.com

Enjoy the

Blissful

Ramadan with Exciting Deals

This Ramadan, use your **Dhaka Bank Credit Card** and enjoy exciting offers

UP TO 50% DISCOUNT	20% CASHBACK	BUY 1 EAT UP TO 5	0% EMI OFFER

To Learn more
Please visit:

*T&C Apply

DHAKABANK PLC.
EXCELLENCE IN BANKING

www.dhakabankltd.com

পশ্চিমে ৭৮৮ ফুট ও দক্ষিণ সীমারেখা পূর্ব-পশ্চিমে ৯৪১ ফুট। ঈদের সময় দেশের বৃহত্তম এ ঈদ জামায়াতকে কেন্দ্র করে ঈদগাহ মাঠ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মুসলমানদের ব্যবহৃত টুপি, সুন্নতি লাঠি, জায়নামাজ, হিজাব, হস্ত, কারু ও নানা রকম শিল্পের মেলা বসে। অনেকের কাছে এটি উৎসব ও অন্যতম আকর্ষণের কারণ বলে বিবেচিত। জমিদার আমল থেকে নানা প্রথা ও মাঠের সুনাম এবং বিস্তৃতির কারণে ঈদের কয়েক দিন আগে থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভিন্ন জেলা ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল এমনকি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শোলাকিয়ায় ঈদের নামাজ পড়তে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা আসেন। ঈদের আগে শহরের আবাসিক হোটেলগুলোয় ভিড় পড়ে যায়। কেউবা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ও মসজিদে রাত্রি যাপন করে। ঈদের দিন এই জামায়াতের জন্য দুটি বিশেষ ট্রেন এখনো চলাচল করে। ময়মনসিংহ থেকে একটি এবং ভৈরব থেকে একটি বিশেষ ট্রেন এই দিনের জন্য বরাদ্দ রয়েছে, যাতে মুসল্লিরা ঈদ জামায়াতে অংশ নিতে পারেন।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, কিশোরগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য এখন এই বড় জামায়াতকে ঘিরে। কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শোলাকিয়া দেশের অন্যতম প্রাচীন ঈদগাহ মাঠ। তাই ইতিহাস ও ঐতিহ্যর প্রাচীন এই শোলাকিয়ার মাঠটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যময় স্থান হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় মুসল্লিরা। এছাড়া শোলাকিয়া মাঠের পরিধি বৃদ্ধি এবং আরো উন্নয়ন দাবি করেছে এলাকাবাসী। যদিও মাঠের সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে। ঈদের আগে মাঠের এলাকা পৌরসভা ও স্থানীয় উদ্যোগে আলোকসজ্জা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের তোরণ আর ব্যানার-ফেস্টুনে ছেয়ে যায় পুরো এলাকা। ঈদেও জামায়াত শুরু হওয়ার আগে শটগানের গুলি ছুড়ে জানান দেয়া হয় নামাজ শুরু হচ্ছে। এ প্রথা জমিদার আমল থেকেই চলে আসছে। পুরো মাঠটিতে সীমানা প্রাচীর থাকলেও নেই পাকা সারি বা কাতার।

স্থানীয়রা জানায়, শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠের ইতিহাস ও নামকরণ নিয়ে শোলাকিয়া সাহেব বাড়ির বংশধর ড. সৈয়দ আলী আজহার 'ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ' নামের একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এর ইতিহাস। তিনি লিখেছেন, শোলাকিয়া সাহেব বাড়ির পূর্ব পুরুষ শাহ সুফি মরহুম সৈয়দ আহমেদ ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে শোলাকিয়া সাহেব বাড়িতে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়েমেন থেকে আগত শোলাকিয়া সাহেব বাড়ির বংশধর সুফি সৈয়দ আহমেদ তার নিজস্ব তালুকে ১৮২৮ সালে নরসুন্দা নদীর তীরে তার প্রতিষ্ঠিত মাঠে ঈদের জামায়াতের আয়োজন করেন। ওই জামায়াতে ইমামতি করেন সুফি সৈয়দ আহমেদ নিজেই। মোনাজাতে তিনি মুসল্লিদের প্রাচুর্য প্রকাশে 'সোয়া লাখ' কথাটি ব্যবহার করেন। সেদিনের ঈদের জামায়াতে ১ লাখ ২৫ হাজার (অর্থাৎ সোয়া লাখ) লোক জমায়েত হয়। ফলে এর নাম হয় 'সোয়া লাখি'। পরবর্তী সময়ে উচ্চারণের বিবর্তনে শোলাকিয়া নামটি চালু হয়ে যায়। ঈদের জামায়াত শুরুর আগেই শোলাকিয়া সাহেব বাড়ির পূর্ব পুরুষদের মাঠে নেয়ার জন্য হয়বতনগরের দেওয়ান বা জমিদারবাড়ি থেকে শোলাকিয়া সাহেব বাড়িতে হাতি পাঠানো হতো এবং মাঠের প্রথম কাতার শোলাকিয়া সাহেব বাড়ির পূর্ব পুরুষদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হতো। দ্বিতীয় কাতার ছিল জংগলবাড়ির জমিদারদের জন্য এবং তৃতীয় কাতার নির্ধারিত ছিল হয়বতনগরের দেওয়ান বা জমিদার বাড়ির প্রতিনিধিদের জন্য। মোগল আমলে এখানে অবস্থিত পরগনার রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল সোয়া লাখ টাকা। উচ্চারণের বিবর্তনে সোয়া লাখ থেকে সোয়ালাখিয়া সেখান থেকে শোলাকিয়া নামটি হতে পারে বলে গ্রন্থটিতে উল্লেখ রয়েছে।

২০১০ সালে লেখক আমিনুল হক সাদীর প্রকাশিত মহিনন্দের ইতিকথা গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় মহিনন্দের পুরনো মসজিদ ও ঈদগাহ মাঠের ইতিহাস বিশ্লেষণে লেখেন, মাও. কেরামত আলী জৌনপুরী রহ. দ্বীনি দাওয়াত প্রচারকালীন সময়ে পথিমধ্যে নরসুন্দা নদীর থেকে জেগে ওঠা চরে আঠারো শতকে প্রতিষ্ঠিত মহিনন্দের চরপাড়া জামে মসজিদে অবস্থান করেন এবং সেখানে জুমার নামাজ আদায় করেন। শুধু তাই না করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়ায় জন্মগ্রহণকারী বাংলা ভাষার পণ্ডিত বিখ্যাত পুথিকার মুন্সী আজিমুদ্দিন হানাফি (রহ.)-এর ধর্মীয় গুরু বা পীর ছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহ.)। পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আসা-যাওয়ার বিষয়টি তার জীবন ইতিহাসের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। জৌনপুরী (রহ.) জীবদ্দশায় বেশ কয়েকবার কিশোরগঞ্জে, হয়বতনগর, বৌলাই ও জংগলবাড়ি ধর্মীয় সভায় ওয়াজ নসিহত করতে এসেছিলেন বলেও জানা গেছে।

এলাকাবাসী জানায়, হয়বতনগরের শেষ জমিদার দেওয়ান মো. মান্নান দাদ খান ১৯৫০ সালে ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহের নামে দুই একর ৩৫ শতাংশ জমি ওয়াকফ দলিল করেন। তিনি নিজেও এ মাঠের মুতাওয়াল্লি ছিলেন এবং তার পূর্ব পুরুষরাও মুতাওয়াল্লি ছিলেন বলে দলিলে উল্লেখ রয়েছে। হয়বতনগর জমিদারবাড়ির তৎকালীন জমিদার সৈয়দ মো. আব্দুল্লাহ ১৮২৯-১৯১২ সাল পর্যন্ত এই শোলাকিয়া মাঠে ইমাম ছাড়াও তিনি এই ঈদগাহের মুতাওয়াল্লি ছিলেন। পর্যায়ক্রমে হয়বতনগর জমিদার পরিবার থেকে মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত হয়ে আসছে। সর্বশেষ মুতাওয়াল্লি ছিলেন এই জমিদার পরিবারেরই সদস্য দেওয়ান ফাত্তাহ দাদ খান মঈন। এরপর থেকে এটি চলে যায় সরকারের তত্ত্বাবধানে এবং জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে মাঠ পরিচালনা হয়। ২০০৯ সাল থেকে শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ কমিটির প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান কমিটিতে পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার দায়িত্ব পালন করছেন। মাঠ পরিচালনার এই কমিটি ৫১ সদস্যবিশিষ্ট।

আকবর আলী নামের একজন ব্যবসায়ী জানান, ঈদুল ফিতরের সময় ঈদগাহ ও এর আশপাশ এক ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শহর থেকে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় মানুষের ঢল নামে। ঈদের সময় শহরের বিভিন্ন হোটেলে বাড়তি লোকের চাপ পড়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেও মানুষের ভিড় হয়। ঈদের জামায়াতকে কেন্দ্র করে ঈদগাহের পাশে মেলা বসে। এ মেলায় সুন্নতি লাঠি, তসবিহ, টুপি, রেহাল, সুরমা, জলচৌকি, পিঁড়িসহ বিভিন্ন কাঠের খেলনা ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি ইত্যাদি বিক্রি হয়। নামাজ শেষে মুসল্লিরা এখান থেকে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করে বাড়ি ফেরেন।

স্থানীয় প্রবীণ আব্দুল আলিম জানান, জন্মের পর থেকে দেখে আসছি সারা দেশ থেকেই এখানে মুসল্লি আসত ঈদের নামাজ পড়তে। পাকিস্তান আমল ও ব্রিটিশ শাসনামলে এ মাঠে ভারতের আসাম ও কুচবিহার থেকে অসংখ্য মানুষ ঈদের নামাজ পড়তে এখানে আসত। তখন ময়মনসিংহ জেলা ছাড়াও সিলেট, কুমিল্লা এমনকি চট্টগ্রাম জেলা থেকে অনেক মুসলিমরা ঈদের নামাজ পড়তে আসতেন। পাকিস্তান আমলেও দূরদূরান্ত থেকে লোক আসার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। এখনো এ প্রথা চালু আছে।

মাঠ সম্পর্কে বাবা-দাদার কাছ থেকে শোনা কথা জানালেন স্থানীয় আব্দুল আজিজ। তিনি জানান, ঈদের দিন জমিদারি ঐতিহ্যে ঘোড়ার গাড়িতে করে বিভিন্ন পরগনার জমিদাররা আসতেন ঈদের জামায়াতে অংশ নিতে। এ সময় বিশেষ বাহিনী নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে শোলাকিয়া জমিদাররা তাদের আসার বিষয়টি জানান দিতেন। জমিদাররা ঈদগাহে আসার পথে প্রজাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা বিলিয়ে দিতেন।

স্থানীয় সাইদুর রহমান জানান, এই ঈদগাহ মাঠটি ছিল তৎকালীন জমিদারদের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ। সব জমিদার এখানে একত্রে নামাজ আদায় করতেন। ইটনা হাওরের জমিদার নৌকায় করে এ ঈদগাহে নামাজ পড়তে আসতেন। জমিদারদের সঙ্গে একত্রে নামাজ আদায় করতে পারতেন বলে অসংখ্য লোকজন শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে নামাজ আদায় করতে আসতেন। এটা ছিল মুসল্লিদের জন্য বাড়তি একটা আকর্ষণ। এভাবেই এ মাঠের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। প্রায় সাত একর জায়গার মধ্যে অবস্থিত শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ কিশোরগঞ্জবাসীর জন্য গর্বের। এ মাঠ শুধু কিশোরগঞ্জেরই না সারা দেশের ঐতিহ্য। মাঠটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যময় স্থান হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান এখন সময়ের দাবি।

শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. এরশাদ মিয়া জানান, ঈদগাহ কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসকসহ আমরা এরই মধ্যে মাঠ একাধিকবার পরিদর্শন করেছি। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কাজ চলছে। আলোকসজ্জাসহ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। এ বছর মাঠে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ২০০৪-০৯ সাল পর্যন্ত ইমামের দায়িত্বপালনকারী ইমাম মুফতি আবুল খায়ের মো. সাইফুল্লাহ।

‘বড় তুফানের কবিতা’ পুঁথিতে উনিশ শতকে চট্টগ্রামের বন্যা

মো. মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ

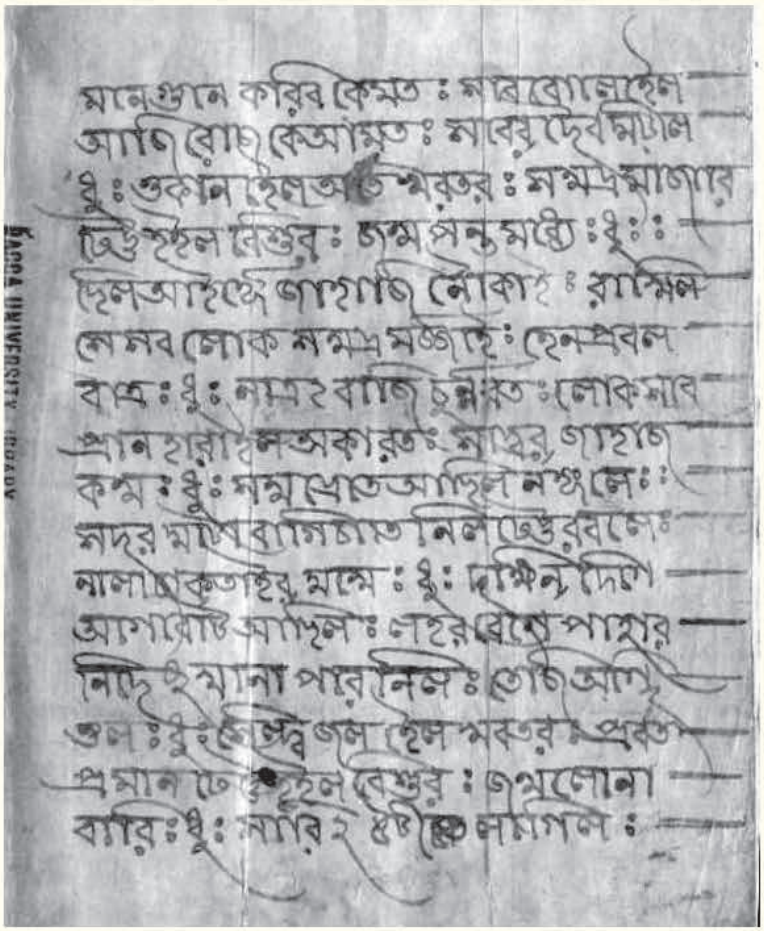

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা অন্যতম। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে কখনো বা অসময়ে নদীবিধৌত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা বন্যায় আক্রান্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকে বন্যায় চট্টগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অনেক নজির রয়েছে। উনিশ শতকে চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘটে যাওয়া এমনই একটি ভয়াবহ বন্যার বিবরণ রয়েছে বড় তুফানের কবিতা নামক পাণ্ডুলিপিতে। বড় তুফানের কবিতা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুঁথিগুলোর একটি। এটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত রয়েছে (ক্রমিক নং- সা.বি. ৩২১, পুঁথি নং-৫২০)।

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

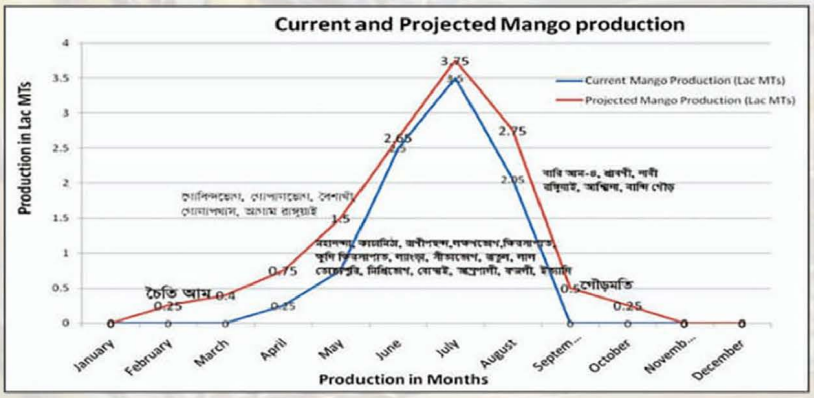

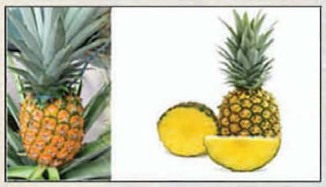

প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশে যে ফলগুলো পাওয়া যায় তার ৬০% পাওয়া যায় ৪ মাসে (মে-আগস্ট) এবং ৪০% পাওয়া যায় বাকি ৮ মাসে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রচলিত, অপ্রচলিত এবং অন্যান্য সম্ভাবনায় ফলের চাষাবাদ বাড়িয়ে সারা বছরব্যাপী সমানভাবে ফলের সরবরাহ বাড়ানো হবে। পাহাড়ি, অসমতল, অব্যবহৃত জমিতে ফলের গাছ রোপন এবং বসতভিটার জমিকে উদ্যান ফসল উৎপাদনের আওতায় নিয়ে এসে ফলের উৎপাদন বাড়ানো হবে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য :

৩টি পার্বত্য জেলাসহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য এলাকার অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়িতে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সমতল ভূমিতে মাঠ ফসল চাষের সুযোগ অব্যাহত রাখা; দেশীয় রপ্তানিযোগ্য ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের সাথে সাথে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সেবা বৃদ্ধি করা। প্রর্দশনী প্লট স্থাপন, মাঠ দিবস ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। নতুন হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপনসহ বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের আধুনিকায়ন, নারীদের ক্ষমতায়ন, কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

প্রকল্প এলাকা :

৮টি বিভাগের ৫১টি জেলার ৪০৩ উপজেলা প্রকল্পের আওতাভুক্ত। উদ্যান ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী সমতল ও পাহাড়ি এলাকাকে প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রধান কার্যক্রম :

ফল বাগান ও অন্যান্য প্রর্দশনী স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান, আরবান সেলস সেন্টার, অফিস বিল্ডিংসহ ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটরি এবং অফিস বিল্ডিং কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ।

বর্তমানে দেশে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার হেক্টর জমিতে ফলের উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৪৩.৮ লক্ষ মে. টন (বিবিএস-২০১১)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন প্রায় ১২ লক্ষ মে. টন বৃদ্ধি পাবে। এতে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা যোগ হবে।

বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

রুম নং-৭৩১,মধ্যম বিল্ডিং, ৭ম তলা
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন-০২৫৫০২৮৩৪৮,ইমেইল-pdyrfp@gmail.com

আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নত জাতের মসলা ফসলের বছরব্যাপী অধিকতর উৎপাদনপূর্বক আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং মসলা জাতীয় ফসল স্বয়ংসম্পূর্নতা অর্জনে গতিশীলতা আনয়ন।

প্রধান মসলাসমূহ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

১. স্থায়ী ও মৌসুমী পতিত জমির পাশাপাশি বসতবাড়ির ফাকা জমি চাষের আওতাভূক্ত করে ২-৫% শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মসলা ফসলের ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা।

২. বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিশেষ করে মসলা ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বহুমুখীকরণ।

৩. প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে মসলা জাতীয় ফসলের ৫% কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; আয়বর্ধক কার্যক্রমে ২৫-৩০% মহিলাদের (বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মহিলাদের) সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছিলেন পুঁথি সংগ্রাহক। তিনিই প্রথম চট্টগ্রামের মুসলমানদের বাড়ি থেকে মুসলিম বাংলা পুঁথিসহ অন্যান্য পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। এর আগে ধারণা করা হতো শুধু হিন্দুদের বাড়িতেই পুঁথি পাওয়া যাবে। তার নিরলস পরিশ্রমের কারণেই মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যে মুসলমানদেরও অবদান রয়েছে তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। তার সংগৃহীত পুঁথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তিনি আলাওলের বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যটি সম্পাদনা করেছেন।

বড় তুফানের কবিতা সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুঁথি পরিচিতি বইয়ে বলা হয়েছে :

> '১৮৩৭ অথবা ১৮৯৭ সালে চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সাইক্লোনের বর্ণনা দেওয়া আছে এই পাণ্ডুলিপিতে। তবে এই দুটির মধ্যে কোন বন্যা সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। পাণ্ডুলিপির লিপিকাল উনিশ শতকের শেষের দশক অথবা বিশ শতকের প্রথম দশক। উনিশ শতকের আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি কাগজে লেখা আট ইঞ্চি × ছয় ইঞ্চি মাপের এই পাণ্ডুলিপির ২-৯ নং ফোলিও শুধু পাওয়া গেছে।'

প্রথম ফোলিও না পাওয়ায় ভণিতা ও স্তুতি অংশ পাওয়া যায়নি। ফলে কাব্য রচয়িতা ও পৃষ্ঠপোষকের নাম জানা সম্ভব হয়নি। বর্তমান গবেষকের অনুমান, পাণ্ডুলিপিটি লেখকের স্বাক্ষর কপি বা মূল কপি। উল্লেখ্য, স্বাক্ষর কপি অর্থ লেখকের স্বহস্তে লিখিত কপি। সাহিত্যবিশারদ ও আহমদ শরীফের অনুমানকৃত লিপিকাল সঠিক হলে বড় তুফানের কবিতা পুঁথিটি ১৮৯৭ সালের বন্যা নিয়েই রচিত। কবিতার বর্ণনা থেকে জানা যায়, সংঘটিত বন্যার ফলে সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, আলোকদিয়া, মাতারবাড়ী, মহেষখালী, মিরসরাই, বাঁশখালী, ঘোরামারা, বানিগ্রাম, দৌলতপুর, কোলাগাঁও, মাহাম্মদনগর, উত্তর দেআঙ্গ, চর কানাই, হাবিলাশ দ্বীপ প্রভৃতি জায়গার মানুষ, কৃষিখেত (আউশ ধান), ঘরবাড়ি ও গৃহপালিত পশু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব নেমে আসে। পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত স্থান নামগুলোর অনেকগুলোই বর্তমানে সুপরিচিত। কিছু নাম সামান্য বানান পরিবর্তনে প্রচলিত এবং কিছু নাম বর্তমানে অন্য নামে প্রচলিত। যেমন দেআঙ্গ নামটির প্রচলন এখন আর নেই। বর্তমান চট্টগ্রামের আনোয়ারা ও কর্ণফুলী একসময় দেআঙ্গ, দেআঙ, দিআঙ নামে প্রচলিত ছিল। এছাড়া বন্যা-পরবর্তী অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন মাসে এসব এলাকার মানুষের দুর্ভোগ ও ভয়াবহতার বর্ণনা রয়েছে বড় তুফানের কবিতা পাণ্ডুলিপিতে।

ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট বন্যার ভয়াবহতা এত ব্যাপক ছিল যে কবি তার পাণ্ডুলিপির শুরুতে (২ নং ফোলিওতে) উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কেয়ামতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবি বলেছেন, সবাই মনে করছে আজ কেয়ামত হয়ে যাবে। প্রচণ্ড বেগে তুফান আসছে। এই গভীর রাতে সমুদ্রের চতুর্দিকে উথালপাথাল ঢেউ। মানুষ অকাতরে প্রাণ হারাতে লাগল। মানুষ সমুদ্রে জাহাজ ও নৌকা রেখে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। সমুদ্রের জল অতি খরতর হয়ে আসতে লাগল। ঢেউ পর্বতের সমান হয়ে আছড়ে পড়তে লাগল। কবির ভাষায় :

মনে গুনে করিব কেমত।
শবে বোলে হৈল আজি রোজ কেআমত ॥
শবের দৈব ঘটীল। ধু।
তুফান হৈল অতি খরতর ॥
সমুদ্র মাজার ঢেউ হইল বিস্তর। (দেখুন চিত্র ১)

কাব্যের পরের অংশে (৩ নং ফোলিও) সুনামি থেকে সৃষ্ট বন্যার ব্যাপকতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। কবির বর্ণনায় লোনা জলের গভীর বেগে সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। প্রথমে কৃষিখেত এবং এরপরে বসতবাড়ি ডুবল। মানুষ মনে করল আজ রোজ কেয়ামত নেমে আসছে। সেই ভয়ে অনেক মানুষ প্রাণ হারাল। জলে ডুবে মরার পর অনেক লাশ সোলার মতো ওপরে ভেসে উঠতে দেখা গেল। কত মানুষ মরল তার সঠিক হিসাব বলা কঠিন। কবির বর্ণনায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো হলো চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, আলোকদিয়া, মাতারবাড়ী, বুরুমচড়া, মহেষখালী, মিরসরাই, বাঁশখালী, বাণীগ্রাম, মিরপুর, দৌলতপুর, কোলাগাঁও, ভাণ্ডলগাঁও, উত্তর দেআঙ্গ, মাহাম্মদনগর, খোআজনগর, চর কানাই, হাবিলাশ দ্বীপ, নোয়াপাড়া।

বড় তুফানের কবিতার চতুর্থ ফোলিওতে কবি বলেছেন, চট্টগ্রাম ও তার আশপাশের সব এলাকা ডুবে গেল। সন্দ্বীপে আঠারো হাত পানি। বাড়িঘর, মানুষ, পশু-পাখি সব ভেসে গেল। গাছের শাখা ধরে কোনো কোনো প্রাণী ভেসে যাওয়া ঠেকিয়েছিল। গভীর রাতে ঐশ্বরিক শক্তিতে বাতাসের প্রবল বেগে সমুদ্রের লোনা পানি বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ল। মানুষ তাদের পশু-পাখি হারাল। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া রক্ষা করতে পারল না। কবির ভাষায়—

রাজ্য চট্টগ্রাম ॥ ধু ॥
এই নামে আছে জথ দেশ।
বাকি না রহিল সব ডুবিল বিশেষ ॥
দেশ হাত্যা সন্দীপ। ধু।
সেই দিগ আঠার হাত জল ॥
ঘর বারি মনুষ্য পশু ভাসিল সকল।

এছাড়া এ ফোলিওতে কবি আরো বলেছেন, বন্যার ফলে মারা যাওয়া পশু-পাখির দেহাবশেষের গন্ধে মানুষ চলাচল করতে পারত না। তাই সবার মন বিষণ্ন। রাতে ছিল প্রচণ্ড ঢেউ এবং দিনে প্রখর সূর্য তাপ। ধীরে ধীরে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ফিরে গেল। ধানখেত মরে সাদা বর্ণ ধারণ করল। বাজারে চালের সের হলো ৮ টাকা এবং লবণের সের ৮ আনা। খাবার খেতে না পেরে মানুষ বেহুঁশ হওয়া শুরু করে। মশার কামড়ে তাদের ঘুম ভাঙে। সবাই মারা যাবে, কেউ বাঁচবে না।

এর পরের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন, অনেকদিন থেকে বৃষ্টি হয়নি। আশ্বিন মাসের উচ্চতাপে সবকিছু পুড়ে গেল। এরপর এল অগ্রহায়ণ। ধানের অবস্থা এত খারাপ যে কাটার মতো অবস্থায় নেই। এ বছর বাঁচার কোনো উপায় নেই। একেক কানি জমি থেকে মাত্র পাঁচ-ছয় সারি ধান পাওয়া গেল। না খেতে পেরে অনেকেই সন্দ্বীপ গেল। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা এত বেশি ছিল যে ভিক্ষা চেয়েও ভিক্ষা পেল না। ফলে স্ত্রী ছেড়ে স্বামী সন্দ্বীপ গেল। মাঠে-ঘাটে অনেকেই না খেয়ে মরে পড়ে আছে। বাপ-বেটা এবং ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে তারা শত্রু হয়ে গেল খাবারের জন্য। সবাই নিজের জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে পড়ল। কর গ্রহণ করার জন্য আইন জারি হলো। কোনো নর-নারী খাজনা দেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। খাজনা দিতে না পারায় অনেক জমিদারি নিলামে তুলতে হলো। কবির ভাষায়—

ভিক্ষ্যা মাগী ভিক্ষ্যা না পাইআ ॥
স্ত্রী ছারি পুরুষ গেল সন্দীপ চলিআ।
জথ হাটে মাঠে ॥ ধু ॥
মাঠে বাটে অন্ন বিনে মরি।
আপ্ত বাপ পুত্রে ॥ ধু ॥
হৈল শত্রু আর ভাই ভাই।
সব ছারি আপনা আপনা রক্ষ্যা চাই ॥

অগ্রহায়ণ মাস চলে এল। ধানের অবস্থা খুব খারাপ। লোক মাঠ থেকে ধান কেটে নিয়ে আসে। ধান তো নয় যেন খড়। কানিপ্রতি খুদ পায় চার-পাঁচ সের। ধান কেটে নিয়ে আসে দুঃখ মনে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে। পৌষ গেল মাঘ মাস এল আর তো রক্ষা নেই। কর্তার মনে শান্তি নেই। ওলা ওঠা (কলেরা) রোগে মানুষ মারা যেতে শুরু

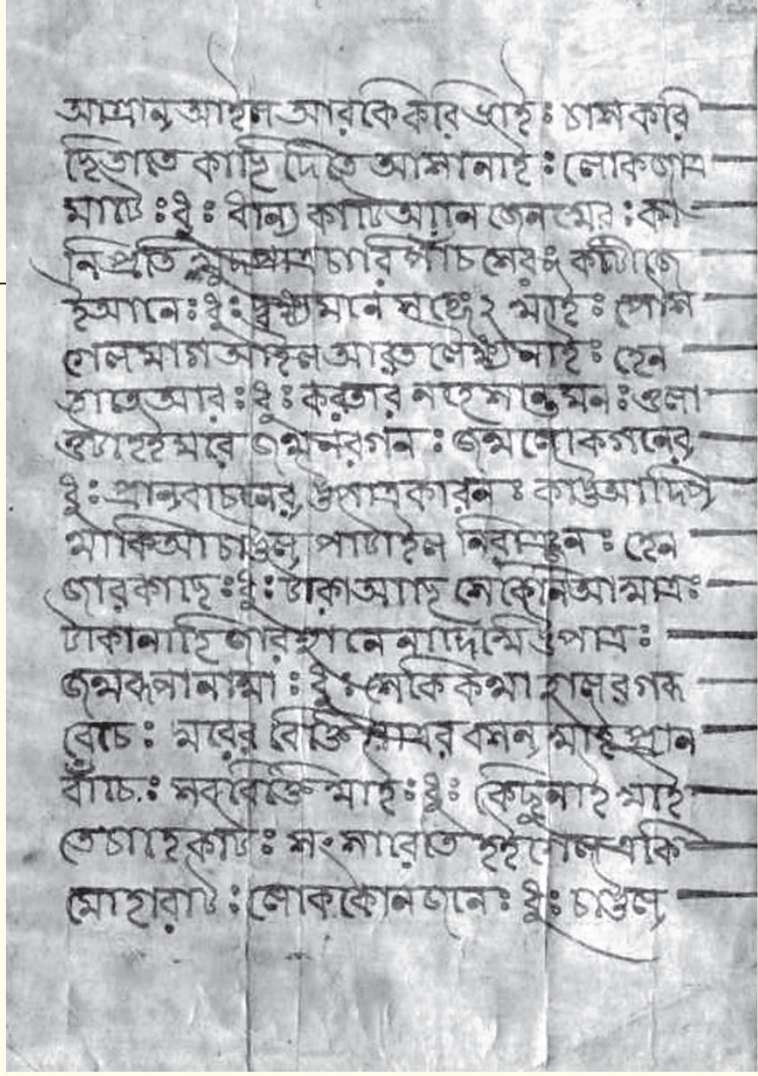

চতুর্থ ফোলিওতে কবি আরো বলেছেন, বন্যার ফলে মারা যাওয়া পশু-পাখির দেহাবশেষের গন্ধে মানুষ চলাচল করতে পারত না। তাই সবার মন বিষণ্ন। রাতে ছিল প্রচণ্ড ঢেউ এবং দিনে প্রখর সূর্য তাপ। ধীরে ধীরে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ফিরে গেল। ধানখেত মরে সাদা বর্ণ ধারণ করল। বাজারে চালের সের হলো ৮ টাকা এবং লবণের সের ৮ আনা। খাবার খেতে না পেরে মানুষ বেহুঁশ হওয়া শুরু করে। মশার কামড়ে তাদের ঘুম ভাঙে। সবাই মারা যাবে, কেউ বাঁচবে না

করল। মানুষের প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়ল। এক দ্বীপ থেকে চাল পাঠাল কোনো এক প্রভাবশালী। যার কাছে টাকা আছে সে কিনে খেতে পারল। যার টাকা নেই সে কোনো উপাই না পেয়ে সঞ্চিত রুপা, হালের গরু, ঘরের বাসন বিক্রি করে খাবার কেনা শুরু করল। এরপর আর কিছু খাওয়ার মতো নেই। পৃথিবীতে এ কি খারাপ সময় নেমে এল! (দেখুন চিত্র ২)

এ বন্যা সমাজ ও অর্থনীতিতে বয়ে এনেছে অশনিসংকেত। কবির চিত্রায়ণ হলো ৭-৮ টাকা সের দরে কে চাল কিনতে পারবে? রাজা, প্রজা কিংবা জমিদার সবাই রাতের বেলা হাহাকার করতে লাগল। এভাবেই ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাস গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে মানুষ আউশ ধান রোপণ করল। শ্রাবণের সঙ্গে সঙ্গে আষাঢ় এল। অসহায় অবস্থায় মানুষ আউশ চাষ করল। তারা ভাবল এবার বুঝি দুঃখ, দুর্দশা, অপমান ঘুচে যাবে। কিন্তু প্রভু নীরঞ্জন ক্রোধিত ছিল মানুষের ওপর। তাই তিনবার বন্যা নেমে এল। সবাইকে নিরাশ করে দিয়ে আউশ কিংবা শাইল সব পচে গেল।

একুশ শতকীয় বাস্তবতা থেকে উনিশ শতকে ঘটে যাওয়া বন্যার প্রকোপ তুলনামূলক কম মনে হলেও সে সময়ে এটাই ছিল প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ। বর্তমানে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ অনুসন্ধান করলে মানবসৃষ্ট কারণাদি মুখ্য মনে হলেও উনিশ শতকের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ C_{02}, CH_4 সহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের উৎপাদন। উনিশ শতকীয় ধরনিতে সেটি বর্তমানের মতো প্রকট ছিল না এবং প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের বাড়াবাড়িও ছিল না। তবু প্রকৃতির নিয়মেই বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগ ঘটত। দিনদিন যে হারে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে, নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রের মতো করে প্রকৃতিও আমাদের সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে, যার প্রতিফলন দেখা যায় দুর্যোগের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে। এভাবে চলতে থাকলে হয়তো অদূরভবিষ্যতে ঘটবে প্রলয়কারী দুর্যোগ এবং ভবিষ্যতের কোনো প্রকৃতির স্বরূপ অনুসন্ধানী ইতিহাসবিদ সে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এভাবেই আলোচনা করবে।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭।

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

করিম, আবদুল, *আলাউল বিরচিত পদ্মাবতী*, চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭।

শরীফ, আহমদ (সম্পা.) আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত *পুঁথি-পরিচিতি*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

পলাশ, মোস্তাফিজুর রহমান, *পাঠান প্রশংসা ও জোরওয়ার সিং কীর্তি : পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার ও স্তুতি কাব্যের পুনর্মূল্যায়ন*, ইতিহাস প্রবন্ধমালা, বর্ষ ২২, সংখ্যা ২০, ২০২৫।

হক, মুহম্মদ এনামুল, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, পুনর্মুদ্রণ ২০০১।

Hasan, Sahidul, *Water Management in Medieval Bengal*, Bangladesh Historical Studies, 2014-16.

Munshi Abdul Karim and Ahmed Sharif, *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscript in Munshi Abdul Karim's Collection*, Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1960.

PRESIDENCY UNIVERSITY

ADMISSION OPEN

SUMMER 2025

Our programs

B.Sc. in Civil Engineering | CSE | EEE
BBA | L.L.B | English | BSS in Economics

MBA | EMBA | LLM | MA in ELT
MSS in Economics

UP TO **100%** SCHOLARSHIP

50% Discount on Admission Fee

EARLY BIRD OFFER

SMART WATCH CAP SMART BAG

Female Hostel & Transport Facilities

House 11/A, Road 92
Gulshan-2, Dhaka 1212

Apply online

01766 554433, 01958 041421 www.presidency.edu.bd

admission@pu.edu.bd presidencyuniversity Tel: (02)-55052194-9

সাদা হাতি

মোস্তাফিজ কারিগর

ইশানে বৃষদলমেঘ নিয়ে আকাশ ক্রমশ নিচে নামতে থাকলে মানুষেরা দেখতে পায়—ঘনকৃষ্ণ মেঘের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে নেমে শহরের প্রধান সড়ক মাড়িয়ে সাদা হাতিতে চড়ে সওদাগর তার ভৃত্যকে নিয়ে পৌরভবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; বিলক্ষণ যা ঘটে—শহরের ক্রীড়ামতি বালক-বালিকা, বিদ্যালয়গামী বিদ্যার্থী এবং প্রথমে অবসরগ্রস্ত বৃদ্ধরা, যারা বাড়ির সামনের রোয়াকে বসে লুপ্তপ্রায় দাঁতের নিচে পানিফল নিয়ে জাবর কাটতে কাটতে স্মৃতিবৃষামৃতকথার স্বগোতক্তিতে বিভোর ছিল, তারপর একে একে—শহরের ব্যস্তবিপুল পথচারী, বীমা কোম্পানির ব্যর্থ মার্কেটিং অফিসাররা—যারা নিশ্চিত জানে যে বীমা কোম্পানিকেও আবার বীমা করতে হচ্ছে কোনো রাঘব বীমা সংস্থার কাছে, তবু তারা নাছোড় তাবলিগি দাওয়াতিদের করুণকৌশলে গ্রাহক বাড়ানোর মন্ত্র মানুষের কানে

গুঁজে দিতে দিতে ক্লান্ত, চা-ক্ষেত্রে বসে জুতোর ভেতর থেকে পা বের করে অনৈতিহাসিক কৃতদাস হয়ে ফোসকা দেখছিল—তারা, আরো আরো শহরের মায়েরা যারা আসন্ন শীতের জন্যে উল বুনছিল ফুটপাতে মাদুর বিছিয়ে, যাদের সন্তান কিন্ডারগার্টেনের ভেতরে টিফিন পিরিয়ডে মৃত ব্রয়লারের থোড়া দিয়ে বানানো বার্গার খাচ্ছে, তারাও অদম্য কৌতূহলে সাদা হাতির পিছু পিছু পৌরভবনের সামনে এসে মৃত পশুর পেট থেকে শকুনের ঠোঁটে খুবলে বের করে আনা নাড়িভুঁড়ির মতো জড়িয়ে পেঁচিয়ে জটলা হয়ে আছে এবং সেই জটলায় ক্রমশ শহরের নানা স্তরের মানুষেরা—যেন বা তীর্থস্থান, কমণ্ডলুতে গণ্ডূষ পূতজল নিয়ে ঘরে ফিরতেই হবে।

শহরের ইথারে ইথারে সয়লাব হয়ে গেলে প্রায় পরিত্যক্ত শতাব্দীপ্রাচীন বাড়িটার ঊর্ধ্বমুখী সুড়ঙ্গসদৃশ সিঁড়ি টপকে দোতলার ঘরে তেঁতুলের বিচির মতো চকচকে রঙের বার্মা থেকে আনা লোহাকাঠের খাটে অসংখ্য ছবির নেগেটিভ বিছিয়ে বসে থাকা হক সাহেব ওরফে ফায়জুল হকের কানে সাদা হাতি ও সওদাগরের খবর যখন স্রোতের ঘায়ে নদীর পাড়ভাঙা শব্দের মতো আছড়ে পড়ে, তখন হক সাহেব টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আতশকাচে যে নেগেটিভটা দেখছিল, তাতে একবার ছায়া হয়ে উঠছিল কোনো এক হিংস্র পশুর মুখ আবার কখনো প্রকাণ্ড কোনো বৃক্ষের আকৃতি। নেগেটিভের ধন্দে পড়া হক সাহেবকে টেনে তোলে তার একমাত্র কর্মসচিব বালক ইয়াসিন; ইয়াসিনকে বিবিসির খুদে সংস্করণ বলা চলে, কেননা সারা দিন ঘরের মধ্যে আত্মনির্বাসনে থাকা হক সাহেব ওরফে ফায়জুল হকের কোনো টেলিভিশন নেই, খবরের কাগজে অপ্রীতি, ফলে তার শ্রবণসীমায় শহরের কানাকঞ্চিতে ঘটমান ও দেশ-বিদেশের আলোচিত খবরগুলো এনে দেয়ার পাশাপাশি ইয়াসিন বাজারাদি, পোস্ট অফিসে চিঠিপত্র পৌঁছে দেয়া—কেননা অনেকানেক কুরিয়ার সেবাকে অগ্রাহ্য করে হক সাহেব এখনো পোস্ট অফিসের মাধ্যমেই চিঠিপত্র পাঠাতে আরাম বোধ করে; শহরের প্রধান সড়কের পাশে দাদা মৌলবি শাহীদুল হকের রেখে যাওয়া প্রায় দুই বিঘা জমিসহ লাল ইটের বিশাল বাড়িটা ওয়ারিশগণের ভেতরে বণ্টন হয়ে গেলে মৌলবি শাহীদুল হকের তৃতীয় পুত্রের তৃতীয় পুত্র হক সাহেব ওরফে ফায়জুল হকের ভাগে পড়া সরু সুড়ঙ্গসদৃশ সিঁড়িওলা দোতলার ঘরটা ব্যতীত আর সমস্তই শরিকানারা আধুনিক আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবন প্রকল্পের মুকুটে সজ্জিত করলে, ক্ষয়রোগে শিকার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী মহিমার আকস্মিক মৃত্যুর পর আয়কর বিভাগের চাকরি ছেড়ে ছয়বার পৌরসভার কমিশনার পদে ইলেকশনে পরাজয়ের পরে পৈতৃক শাড়ি-পোশাকের ব্যবসায় ইস্তফা টেনে দোতলার এ ঘরটাকে একটা ডার্করুম বানিয়ে সৌখিন আলোকচিত্রী দাদা মৌলবি শাহীদুল হকের কাছ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত জাপানি ইয়াসিকা ব্র্যান্ডের ক্যামেরা ও অজস্র নেগেটিভ বিছিয়ে সারাদিন বসে থাকা হক সাহেব কোনো কোনো বিষ্যুদবার গভীর রাতের অন্ধকারে দাদার সেই পুরনো জাপানি ক্যামেরা নিয়ে হেঁটে হেঁটে যখন শহরের গলিসমস্ত ঘুরে অন্ধকারের ছবি তোলার জন্য বের হয়, কিন্তু কোনোদিন ছবি তোলা না হলেও নিজেকে একজন সত্যিকারের আলোকচিত্রী ভেবে শ্লাঘা বোধ করে, তখন ঘুমগ্রস্ত চোখে সাথে থাকতে হয় ইয়াসিনকেও, সেই ইয়াসিন—যাকে হক সাহেব একদিল শাহর মাজারের খাদেম নকিমুদ্দিনের কাছ থেকে এনেছিল; খাদেম নকিমুদ্দিন একদিন ফজরের নামাজ শেষে মাজারের অশ্বত্থতলা ঝাড়ু দিতে গিয়ে দেখে লালসালু জড়িয়ে অশ্বত্থতলার বেদিতে ঘুমিয়ে আছে একটি বালক, তার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত নকিমুদ্দিন বসে ছিল; বালকের ঘুম ভাঙলে পরিচয়াদি কিছুই বলতে অপারগ কেবল নামটা বলেছিল—ইয়াসিন; ইয়াসিনকে হক সাহেবের হাতে তুলে দেয়ার সময় নকিমুদ্দিন বলেছিল—মাওলার দুনিয়ায় আমরা সবাই এতিম, পরিচয়হীন; এতদিন মাওলা আমার হেফাজতে দিয়েছিল ওকে আর এখন আপনার হেফাজতে, ওরে রাখেন হক সাহেব, যত্নে থাকবে—সেই থেকে ইয়াসিন, আজ যখন গলির মাথা থেকে আনা খবরের কাগজে ঢাকা রমিজের গরম ক্ষীর চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল—ইয়া বিরাট হাতি কাকা, দুধের মতো সাদা—সেই হাতিতে চড়ে সওদাগর, সাথে তার ভৃত্য; শুনলাম সপ্তাহে দুইদিন, শনি-মঙ্গল, না না রবি-বিষ্যুদ, সাড়ে সাত মণ দুধে হাতিটারে গোছল করায় সওদাগরের ভৃত্য। শহরের গোয়ালাদের ভিড় পড়ে গেছে পৌরভবনের সামনের মাঠে, গোয়ালারা নাকি দুধের সাথে শ্যাম্পু আর ময়দা মিশায়ে দুধের দিঘি বানাচ্ছে।

ভৃত্যসহিত সাদা হাতিতে চড়ে সওদাগরের শহরে আসার হেতু আবিষ্কারে চা-ক্ষেত্র, পার্ক, পুরনো স্টেশন, হাইকোর্টের ব্যস্ত বারান্দা, কাঁচাবাজার, সদর হাসপাতালের মুমূর্ষুদের পাশে ক্লান্ত-বিষণ্ন স্বজনেরা কৌতূহলী হয়ে উঠলে এবং অতি উৎসুক হয়ে পৌরভবনের মাঠে ভিড় জমালে নগরকর্তা মেয়র আলী আসগর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা ভৃত্যসহিত সাদা হাতি নিয়ে পৌরভবনের পাশের মাঠে তাঁবু গেড়ে বসা সওদাগরকে নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক মানুষেরা ভিড়ের চাপে নিজেরাই হতাহতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে আখেরে বদনাম হবে মেয়রের, তখন নানা টেলিভিশন ও পত্রিকার সাংবাদিকেরা ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত মেয়র আলী আসগরের ঘুমের সমস্ত সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দেবে প্রশ্নে প্রশ্নে। তাই খুব দেরি না করে মেয়র আলী আসগর সওদাগরকে তার অফিসকক্ষে ডেকে পাঠালে এবং আসতে অসম্মতি জানালে মেয়রের রাগের পারদ ঊর্ধ্বে উঠে যায় এবং ঊর্ধ্বমুখী রাগের পারদ নিয়ে মেয়র নিজেই জনতার ভিড় ঠেলে সওদাগরের তাঁবুর কাছে যায়। তখন বটের দগদগে আঠার মতো রাত ঘন হয়েছে। আসন্ন বসন্তের বাতাসে ভাসছে পূর্ণিমার আলো। সওদাগরের মাথার টুপিতে অলৌকিক মণিরত্ন জ্যোৎস্নার আলোয় আরো নেচে উঠছে আর বাতাসে উড়ন্ত তার শুভ্র শ্মশ্রুতে জ্যোৎস্নার রেণু ঠিকরে পড়ছে। সওদাগরের তাঁবুর সামনে মেয়র এসে দাঁড়ানোর পরে কৌতূহলোদ্দীপক মানুষেরা সমস্ত কোলাহল থামিয়ে দেয়—যেন কোনো শোকসভায় এসেছে, দীর্ঘক্ষণ নীরবতা পালনে ব্রত তারা।

সাদা হাতির পাশে গালিচা পেতে রঙদার বালিশে হেলান দিয়ে বাতাসে উড়ন্ত শুভ্র শ্মশ্রুতে বিলি কাটছিল সওদাগর, মেয়রকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। উষ্ণ করমর্দনের পর সওদাগর তাঁবুর ভেতরে নিয়ে যায় মেয়রকে। তারপর রাতের প্রহর প্রবাহিত হতে থাকে আর তাঁবুর বাইরে অপেক্ষমাণ উৎসুক কিন্তু নীরবতাগ্রস্ত মানুষেরা আরো বেশি নৈঃশব্দ্যের ভেতরে তলিয়ে যেতে থাকলে, পূর্ণিমার চাঁদ তাদের মাথার ওপরে এসে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে ডানপিটে বালকের মতো আর তখন মানুষেরা আবিষ্কার করে তাঁবুর ভেতরে বাহারি আলোর ভেলকি আর অদৃশ্য এক চিমনি দিয়ে তাঁবুর ভেতর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশ জ্যোৎস্নার আলো টপকে চাঁদের দিকে উঠে যাচ্ছে। রাতের শেষ প্রহরে সওদাগরের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ শেষে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে মেয়র যখন বেরিয়ে আসে, তখন তার পোশাক থেকে অদ্ভুত এক সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, সেই সুগন্ধির ভেতরে অপেক্ষমাণ কয়েক হাজার শহরবাসী, পাখির পালকের মতো দিশাহীন ভাসতে থাকে। ধীরে সেই সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রতি কানাকঞ্চিতে। মেয়র আলী আসগরের পোশাক থেকে শহরময় ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধির সঙ্গে একীভূত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মেয়রের মুখ নিঃসৃত যেন কোনো অলি-আল্লাহর পবিত্র বাণী—বাণীতে বর্ণিত হয় সাদা হাতিতে চড়ে ভৃত্যসহিত সওদাগরের শহরে আসার হেতু—শহরের যার যার কাছে যত পুরনো, ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র আছে অতি উচ্চমূল্য দিয়ে কিনে নিতে এ শহরে এসেছেন সওদাগর। যার পণ্য যত বেশি পুরনো ও ব্যক্তিগত হবে, তার মূল্য পাওয়া যাবে অধিক। রাতভর অপেক্ষমাণ মানুষেরা তাদের নীরবতাব্যূহ ভেঙে উল্লাসে বেরিয়ে ছুটে যায় নিজ নিজ গৃহাভিমুখে।

সকালের বিবিসি—ইয়াসিন; ফায়জুল হকের পূর্ণ হওয়া ঘুমের পাশে গরম চায়ের সঙ্গে শহরে ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধির উষ্ণতা ও শহরে সওদাগরের আগমনের হেতু বার্তা বয়ে আনে। বিছানায় এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে থাকা ছবির নেগেটিভগুলো সরিয়ে সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে বেতের আরামকেদারায় বসে হক সাহেব। ইয়াসিন চায়ের কাপ এগিয়ে দিলে গরম চায়ের কাপ ঠোঁটে ধরতেই, কাপ থেকে ঝাঁপিয়ে ওঠা ধোঁয়ায় হক সাহেবের চশমার কাচ ঘোলাটে

হয়ে যায়, যেন মাঘি কুয়াশা আছড়ে পড়েছে কাচে। নির্বাক স্লো মোশন দৃশ্যের মতো চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে লুঙ্গির কাপড়ে ঘষে মাঘি কুয়াশা মুছতে মুছতে ইয়াসিনের দিকে গুরুগম্ভীর দৃষ্টি বিঁধিয়ে জিজ্ঞাসা করে—তাহলে শহরের মানুষেরা তাদের সব পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছে সওদাগরের কাছে?—হ কাকা। লাইন পড়ে গেছে। পুরনো হাঁড়ি-পাতিল, ঘটি-বাটি, পুরনো সোনা-রুপার গহনা, পুরনো আসবাব, পুরনো বইপত্তর সব!

—পুরনো বইপত্রও কিনছে সওদাগর?

—হ, কাকা। বিদ্যাপ্রভা লাইব্রেরির সব পুরনো বইও নাকি সওদাগরের কাছে বেচি দেচ্ছে। সওদাগর ব্যাগ ব্যাগ টাকা দেচ্ছে মানুষরে।

লুঙ্গির কাপড়ে চশমার কাচ মোছা হলে চশমাটি চোখে তুলতে তুলতে আফসোসে ডোবা স্বরে স্বগতোক্তি করে হক সাহেব—শহরের সবচেয়ে পুরনো লাইব্রেরি, ওরাও সব বই বিক্রি করে দিচ্ছে। কত মূল্যবান বইপত্র ছিল বিদ্যাপ্রভা লাইব্রেরিতে! কত প্রাচীন সেসব বই!

—খালি কী বইপত্তর কাকা, মানুষেরা নাকি তাদের পুরনো সব চিঠিপত্তর, পারিবারিক অ্যালবামের বাপ-দাদার পুরনো সব ছবিও বিক্রি করে দিচ্ছে। তা কাকা আপনার কাছেও তো মেলা পুরনো ছবি আছে, বিক্রি করে দিলেই তো পারেন। মেলা টাকা পাবেন।

ইয়াসিন নাবালক; ইয়াসিনের কথায় ক্রোধ কিংবা কৌতুক কোনোটাই বোধ করল না হক সাহেব। ইয়াসিন ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরও হক সাহেবের হাতের কাপের চা ফুরিয়ে যায় না, বরং যেন শান্ত জল হয়ে আছে প্রাচীন ইঁদারা গভীরে। সেই শান্ত জলের ইঁদারা গভীরে প্রতিপদের চাঁদের মতো নিশ্চুপ ভাসতে থাকে সে আর তার আগলে রাখা ছবির নেগেটিভগুলো—দাদা মৌলবি শাহীদুল হক কবেকার পুরনো জাপানি ক্যামেরায় ছবিগুলো তুলেছিল। কিন্তু ছবিগুলো কোনোদিন ওয়াশ হয়নি, আর হয়তো হওয়ার সম্ভাবনাও নেই তা হক সাহেব এতদিনে স্থির বুঝে গেছে। কেননা নতুন প্রযুক্তি, ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইলের পৃথিবীতে নেগেটিভ থেকে ছবি করার কারিগররা হারিয়ে গেছে; যদিও ডিজিটাল প্রযুক্তির নানা বাহাদুরি মারফত হক সাহেব শুনেছে নেগেটিভ থেকেও নাকি ছবি করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে বিশেষ আগ্রহের অভাব বরাবরই, বরং নিজের ঘরটাকেই ডার্করুম বানিয়ে বছরের পর বছর নেগেটিভগুলো নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। নিজেই রপ্ত করতে চেয়েছে নেগেটিভ থেকে ছবি করার পদ্ধতি, শিখেও ফেলেছে বেশ; কিন্তু কী এক অলৌকিতায় আক্রান্ত হয়ে দাদা মৌলবি শাহীদুল হকের নেগেটিভগুলো ওয়াশ করতে গিয়েও বারবার থেমে গেছে—তার মনে হয়— এসব নেগেটিভের মধ্যে যেসব দৃশ্য ঘুমিয়ে আছে, তাদের জাগাবে না কখনো। কতসব মুখের নেগেটিভ!—দাদা এসব ছবি তুলেছিলেন, থাক—মুখগুলো গোপনে, ঘুমন্ত, মায়া হয়ে। নেগেটিভ থেকে তারা বেরিয়ে এলে যদি মায়া কেটে যায়, যদি মানুষগুলোর চেহারা সত্যিকার মানুষের মতো না হয়; বরং নিজের রচিত ডার্করুমের আলো জ্বালিয়ে আতশকাচে নেগেটিভের ছায়াদৃশ্য আর আবছায়া মুখগুলোকে দেখতেই তার বেশি ভালো লাগে। ডার্করুমের আলো নিভিয়ে নেগেটিভগুলো বিছিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে যেতে ভালো লাগে তার।

স্বরচিত ডার্করুমের ঘুমের ইঁদারা থেকে হক সাহেবকে মাঝে মাঝে টেনে তোলে ইয়াসিন; কানে গুঁজে দেয় সওদাগর ও শহরের নানা খবর—শহরের মানুষেরা একে একে তাদের সমস্ত পুরনো আর ব্যক্তিগত আর পারিবারিক ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছে সওদাগরের কাছে; বিনিময়ে অনেকানেক টাকা পেয়ে শহরের মানুষেরা দৃশ্যত ধনী হয়ে উঠল। উন্নয়নের সামুদ্রিক উল্লাসে নেচে উঠল শহর। মানুষেরা তাদের পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী বাড়িঘর ভেঙে ভেঙে নতুন ও আধুনিক দালানকোঠা নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে উঠল। শহরে আর কোনো পুরনো বাড়ির চিহ্নরইল না; চারিদিকে চকচকে দালানের দাপুটে মাথা মানুষের চোখ থেকে নিটোল আকাশের চেহারাটা মুছে দিতে থাকল। পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করে বিচিত্র ও ব্যস্ত ব্যবসায়িক হয়ে উঠল শহরের মানুষেরা। মানুষেরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে উঠল যে কেউ কারো দিকে গর্দান ঘুরিয়ে তাকাবার সময় হারিয়ে ফেলল; এমনকি পরিবারের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটাবার সময় উড়ে গেল তাদের। শহরের প্রতিটা মোড়ে মোড়ে বাজার, এমনকি প্রতিটি বাড়ির সাথে বাজার; ঘর বানানোর আগেই মানুষ দোকান বানাতে শুরু করল। 'বেগুনতলায় হাট' এই লৌকিক প্রবাদের অর্থ মানুষের কাছে বাস্তব হয়ে উঠল ক্রমশ। পৌরভবনের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা দুইশ বছরের পুরনো যে ঘড়িটা দেখে শহরের মানুষেরা দিনের কর্মসূচি নির্ণয় করত, সেটিও সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে শহরের মেয়র। ফলত মানুষেরা রাস্তায় বের হয়ে পলকে সময় দেখে নিয়ে কর্মসূচি নির্ণয়ের ক্ষমতা হারিয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত দৌড়ে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

এসব খবর এসে হক সাহেবের কানে জমা হতে থাকলে সে ক্রমশ বিষণ্নতায় ডুবে গেলে ইয়াসিন তাকে মনে করিয়ে দেয়—আজ বিষ্যুদবার। অনেকদিন পার হয়ে গেছে ছবি তোলার ওছিলায় বের হয় না। আজ একবার মনে করিয়ে দিতেই ক্যামেরাটা নরম সাদা কাপড়ে যখন মুছে নিচ্ছিল হক সাহেব, ইয়াসিন আরো অনেক দিনের মতো ভাবল—এ পুরনো ক্যামেরায় সত্যিই কি ছবি উঠবে অথবা ক্যামেরায় ফিল্ম আছে তো? বারবার জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও জিহ্বা আটকে ধরা ইয়াসিনের আজ মুখ ফোটে—কাকা, ক্যামেরায় কি ফিল্ম আছে। এখন তো সব ডিজিটাল। এই পুরনো ক্যামেরাটা সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দেন, মেলা টাকা পাবেন। তাতে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা কিনলে হয়।

ঘন মনে নরম সাদা কাপড়ে ক্যামেরাটা মুছেই চলেছে হক সাহেব। ইয়াসিন যদিও জানে—ক্যামেরা হাতে রাতের অন্ধকারে সারা শহর ঘুরে ঘুরে কোনো ছবি না তুলেই আজও হয়তো ফিরে আসবে হক সাহেব। তবু নিষ্ঠাবান কর্মসচিবের মতো বিষ্যুদবার এলে হক সাহেবকে একবার মনে করিয়ে দেয়া তার দায়িত্ব।

বিষ্যুদবারের অমাবস্যা রাতে ইয়াসিনকে সঙ্গে নিয়ে দাদা মৌলবি শাহীদুল হকের কাছ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত জাপানি ইয়াসিকা ব্র্যান্ডের ক্যামেরা হাতে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে হক সাহেবর চোখ

ভৃত্যসহিত সাদা হাতিতে চড়ে সওদাগরের শহরে আসার হেতু আবিষ্কারে চা-ক্ষেত্র, পার্ক, পুরনো স্টেশন, হাইকোর্টের ব্যস্ত বারান্দা, কাঁচাবাজার, সদর হাসপাতালের মুমূর্ষুদের পাশে ক্লান্ত-বিষণ্ন স্বজনেরা কৌতূহলী হয়ে উঠলে এবং অতি উৎসুক হয়ে পৌরভবনের মাঠে ভিড় জমালে নগরকর্তা মেয়র আলী আসগর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা ভৃত্যসহিত সাদা হাতি নিয়ে পৌরভবনের পাশের মাঠে তাঁবু গেড়ে বসা সওদাগরকে নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক মানুষেরা ভিড়ের চাপে নিজেরাই হতাহতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে আখেরে বদনাম হবে মেয়রের, তখন নানা টেলিভিশন ও পত্রিকার সাংবাদিকেরা ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত মেয়র আলী আসগরের ঘুমের সমস্ত সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করে দেবে প্রশ্নে প্রশ্নে

SONY | SMART

Smart Technologies (BD) Ltd. - Official Distributor of SONY in Bangladesh

ঈদ হবে আরামে চরম এই গরমে...

G5 GUARANTEED

সনি-স্মার্ট ঈদ মুবারাক অফার

ঈদ স্পেশাল প্রাইস

নিশ্চিত উপহার

২৬% ডিসকাউন্ট

gpstar নগদ

Free Streaming Service for 6 month

GIFT Chorki hoichoi T SPORTS

43" 50" 55" 65" 75" 85"

SONY | Google TV

32" 43" 50" 55" 65" 75" 85" 100"

SMART | Google TV

অনলাইনে সনি-স্মার্ট এর পণ্য কিনতে ভিজিট করুনঃ sonysmart.com.bd

Jahir Smart Tower, 205/1/A, Begum Rokeya Sharani, Taltola, Agargaon, Dhaka-1207

আগারগাঁও, ঢাকা ০১৭০৯৬৭৯৮৪২ | গুলশান ০১৩৩২৮৩৭৪৩৫ | উত্তরা, ঢাকা ০১৭০৯৬৫১১১৫ | শ্যামলী, ঢাকা ০১৩১৩০০২৬২১ | বায়তুল মোকাররম, ঢাকা ০১৭০৯৬৭৯৮৩১ | ধানমন্ডি-২৭, ঢাকা ০১৭০৯৬৭৯৮৪১ | যমুনা ফিউচার পার্ক, ঢাকা ০১৭০৯৬৭৯৮৩২ | মোহাম্মদপুর, ঢাকা ০১৩৩২৫৪৬৬৭৪ | রামপুরা, ঢাকা ০১৩২৪৪১৮০২১ | নারায়ণগঞ্জ ০১৩২৪৪১৮০১৯ | টাঙ্গাইল ০১৩২৪৪১৮০০৯ | নিউ মার্কেট, চট্টগ্রাম ০১৩২৪৪১৮০২৮ | লালখান, চট্টগ্রাম ০১৩২৪৪১৮০১৭ | আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ০১৩২৪৪১৮০১১ | হালিশহর, চট্টগ্রাম ০১৩২৪৪১৮০১৬ | ঘোড়ামারা, রাজশাহী ০১৩২৪৪১৮০০৭ | কে ডি এ, খুলনা ০১৩২৪৪১৮০০৬ | সদর রোড, বরিশাল ০১৩২৪৪১৮০১৩ | ফেনী সদর ০১৩৩২-৮৩৭৪৩১ | টি এ রোড, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ০১৩৩২৫৪৬৬৭১ | বাইপাস, লাকসাম ০১৩২৪৪১৮০২৪ | লক্ষীপুর সদর ০১৩২৪৪১৮০২৫ | ঝাউতলা, কুমিল্লা ০১৩২৪৪১৮০২৩ | মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী ০১৩২৪৪১৮০২৭ | রংপুর -০১৩২৪৪১৮০১২ | উপশহর, সিলেট ০১৭০৯৬৫১০৭৯ | মাদারীপুর সদর ০১৩৩২৮৩৭৪৩৮ | সিরাজগঞ্জ-০১৭০৯৬৫১১১২

EID STAYCATION

20 MARCH TILL 6 APRIL, 2025

THE WESTIN
DHAKA

Silver	Gold	Platinum
BDT 11,999 Net. (Room Only)	BDT 15,999 Net. (With Buffet Breakfast)	BDT 29,999 Net. (Buffet Breakfast & Dinner)

This Eid, experience a rejuvenating family staycation with us and avail many extra benefits! Stay in our **Deluxe Room** at BDT 11,999 Net per night.

*T&C APPLY

- Buffet Suhoor/Breakfast*
- 20% discount on Spa*
- 20% discount on laundry*
- Buffet Iftar & Dinner/ Buffet Dinner*
- Early check-in and late check-out
- Complimentary pick-up and drop-off*

Call **+8801799987589, +8801799987566 +8801799987549, +8801958133013, +8802222291988** for bookings

Offer valid from March 20 till April 6, 2025
*Early check in after 10 am & late check-out till 4 pm.
*Complimentary pickup & drop service within Gulshan, Banani & Baridhara

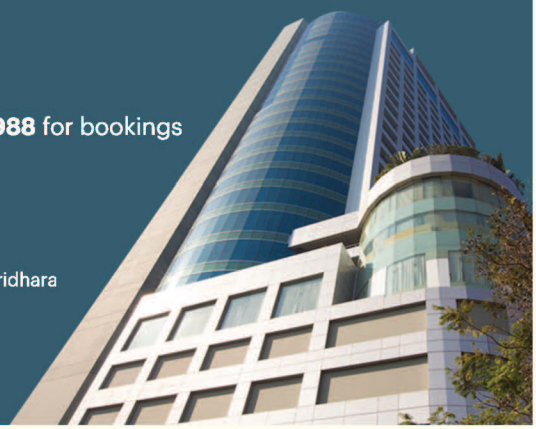

ঝলসে যায়। অমাবস্যা রাতের মেলায়েম অন্ধকার নেই, শহরের চারদিকে বিচিত্র রোশনাই আলো। প্রতিটি বাড়ি, রাস্তার আইল্যান্ড, মোড়ের থামে থামে উজ্জ্বল বাহারি আলোয় শহর যেন ঝলসে উঠেছে। আলোয় চোখ পুড়ে যেতে চাইলে হবে সাহেবের, আর এক অচেনা বিশ্রী সুগন্ধির গন্ধ শহরের সমস্ত অলিগলিতে ভুর ভুর করছে। তাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্লান্ত হয়ে পড়লে শহরের ঘুমন্ত প্রধান সড়কের বুক মাড়িয়ে তাড়া খাওয়া ভিখিরির পদক্ষেপে পৌরভবনের সামনের বিশাল মাঠের সামনে পৌঁছলে এতক্ষণ পরে এক বিদঘুটে অন্ধকারের সম্মুখে পড়ে তারা। সারা শহরজুড়ে এত আলো, কিন্তু নগরভবনের সামনের মাঠে এত অন্ধকার বিস্ময় জাগায়। ইয়াসিনের বাঁধে হাত রেখে হুজুর সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে—এখানে এত অন্ধকার?

—ওই যে আঁধারের মধ্যি সাদা সাদা তাঁবু দেখা যাচ্ছে, ওই তো সওদাগরের আস্তানা। তাঁবুর পেছনে বাঁধা আছে সাদা হাতি।

বিড় বিড় পায়ে ইয়াসিনকে নিয়ে তাঁবুর কাছে এগোতেই শহরময় ছড়িয়ে থাকা সেই অচেনা বিশ্রী সুগন্ধির গন্ধ আরো প্রকট হয়ে নাকে আছড়ে পড়লে, পকেট হাতড়ে রুমাল খুঁজে ব্যর্থ হয়ে বাম হাতে নাসারন্ধ্র চেপে ধরে হুজুর সাহেব, ইয়াসিন নাসারন্ধ্র চেপে ধরে না। গন্ধটা ইয়াসিনের হয়তো ভালো লাগছে বা নাও লাগতে পারে। তাঁবুর আরেকটু কাছে এগোতেই তারা আবিষ্কার করে ইটভাটার চিমনির মতো গাদা গাদা ধোঁয়া, ধোঁয়ার ভেতরে তাঁবুর পেছনে সাদা হাতিটাকে তারা প্রথমে আবিষ্কার করে। তাঁবুর ভেতরে ক্ষীণ আলো। সওদাগর হয়তো ঘুমিয়ে আছে। তাঁবুর বাইরে একটা ছোট গাছের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে অথবা ঘুমের ঝোলে এলিয়ে আছে সওদাগরের ভৃত্য। কিন্তু তাঁবুর পেছনে একদল সাদা জুব্বা পরা শশব্যস্ত মানুষগুলো কারা? কৌতূহল ভাঙতে আর দু-এক পা এগোলেই তারা দেখতে পায়—সাদা জুব্বা পরা একদল মানুষ সাদা হাতির পিঠের গোলাসদৃশ ভাণ্ডে নানা জিনিসপত্র তুলে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে বোঝা যায় একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, অগণিত সাদা হাতি পিঠে গোলাসদৃশ বিরাট ভাণ্ড নিয়ে পৌরভবনের পেছন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য—এমন একটি দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ করার জন্যই হয়তো এতদিন অপেক্ষা করে ছিল হুজুর সাহেব। কাঁধের ঝোলা থেকে ক্যামেরাটি বের করে আকাশে উঠে যাওয়া সাদা হাতিগুলোর দিকে ক্যামেরা তাক করে ধরে একলব্যের তীরের মতো। হঠাৎ একটা শীতল হাতের পরশ হুজুর সাহেবের পিঠে পড়লে সারা শরীর কেমন কেঁপে ওঠে। পেছনে তাকিয়ে দেখে—মহাশয় পাগড়ি বাঁধা, বিরাট শ্মশ্রুশোভিত একজন দরবেশবেশী মানুষ, মুখে বিনম্র হাসি নিয়ে বলছে—হুজুর সাহেব, আপনার ক্যামেরায় তো ফিল্ম নেই।

—আছে।

—আছে কিন্তু ওটা ফিল্ম নয়, ফিল্মের স্মৃতি। একটা পুরনো ক্যামেরার মধ্যে স্মৃতি ঢুকিয়ে রেখে এতদিন নিজেকে নিজেই প্রতারিত করছেন না তো। এত স্মৃতি, ঐতিহ্য আঁকড়ে বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ কোথায় হক সাহেব। আপনার স্মৃতিগুলো আমার কাছে বিক্রি করে দেন। সামনের নতুন আনন্দে শামিল হতে ইচ্ছে করে না আপনার?

—মানে?

—জলের মতো। আপনার দাদার ওই ক্যামেরা, নেগেটিভগুলো—নেগেটিভগুলো জানি খুব মূল্যবান, এ শহরের অনেক পুরনো স্থাপনা আর শহরের অনেক খ্যাতিমান মানুষের ছবি ওই নেগেটিভগুলোর মধ্যে আটকা পড়ে আছে। আমাকে দিয়ে দেন আর আপনার যত পুরনো স্মৃতি, গল্প, কথা—সব বিক্রি করে দেন আমার কাছে। মূল্য নগদ ও যথেচ্ছা পাবেন। শহরের মানুষেরা তো হামেশাই তাদের সব স্মৃতি বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছে। আপনি একা একা এত স্মৃতি জমিয়ে রেখে কী করবেন। কেননা আপনি যখন স্মৃতিতাড়িত হয়ে শহরের কোনো মানুষের কাছে গল্প করতে যাবেন, আপনার গল্পের সাথে এ শহরের মানুষেরা আর কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাবে না।

চারদিকে সুগন্ধির বিকট গন্ধ আরো বিকটতর হয়ে ওঠে আর আকাশের দিকে উঠতে থাকা সাদা হাতিরা পিঠে বোঝাই করা শহরের মানুষের সব পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী জিনিস বয়ে নিয়ে আরো দ্রুত আকাশের ভেতরে সেঁধিয়ে যেতে থাকলে কাঁধের ওপর থেকে সওদাগরের হাত আলগোছে নামিয়ে হন হন করে বাড়ির পথে রওনা করে হক সাহেব; কিন্তু কী আশ্চর্য—আজ ছবি তুলতে বের হয়ে দেখা সারা শহরে জ্বলতে থাকা বাহারি আলোগুলো কোথায় উধাও হয়ে শহরটাকে এখন একটা আদিম গুহা বানিয়ে ফেলেছে; ক্লান্ত ও বিষণ্ন হক সাহেব ইয়াসিনের কাঁধে ঝুঁকে এক আশ্চর্য অন্ধকার কেটে কেটে সুড়ঙ্গসদৃশ সরু সিঁড়ি মাড়িয়ে তার দোতলার ঘরে ঢুকে সহায়-সম্বলহীন ভিক্ষুকের মতো কাঁধ থেকে ক্যামেরার ঝোলা নামিয়ে বয়স্ক শরীর এলিয়ে বিছানায় ছড়িয়ে থাকা নেগেটিভগুলোর ভেতরে নিজেকে অন্তরীণ করে।

দোতলায় ওঠা সিঁড়ির কোনায় চৌবাচ্চাপ্রমাণ ঘরটিতে ঘুমিয়ে থাকা ইয়াসিন প্রতিদিনের মতো ঘুম থেকে উঠে মোড়ের দোকান থেকে গরম ক্ষীর চা নিয়ে দোতলার ঘরে ঢোকার অনেক আগেই হক সাহেব আজ বিছানা ছেড়েছেন। বিছানা থেকে সরাসরি বাথরুমে; শিশুর প্রস্রাবের গতিতে ট্যাব থেকে পড়া জলে বালতি ভরে গেলে, নীল একটা মগে জল তুলে শরীরে ঢালে আর সওদাগরের হাতের ছোঁয়ায় লেগে যাওয়া বিকট সুগন্ধির ঘ্রাণ আশরীর ঘষে ঘষে তোলার যুদ্ধে সশস্ত্র যোদ্ধা হয়ে উঠলেও সুগন্ধির বিকট ঘ্রাণ যেন শরীর ছেড়ে যেতে চায় না। ঘষে আর স্বগোতক্তি করে—না, না, হে আমার আদুরে স্মৃতিগুলো, আমি তোমাদের কোথাও যেতে দেব না, এই বুকের ভেতরে গহনার মতো সাজিয়ে রাখব। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ভেজা শরীরে। নিজের বুকটা চেপে ধরে বাথরুমের দেয়ালে পারদলুপ্ত আয়নায় নিজের মুখোমুখি হয়; তখন বায়োস্কোপের রিলের মতো একে একে কত কত স্মৃতি চলাচল করতে শুরু করে—তাদের বিরাট লাল ইটের জমিদার বাড়িটা, বাড়ির পেছনে আকাশের মুখ দেখার আয়না হয়ে যে পুকুরটা জ্যোৎস্নারাতে রুপালি জলে আন্দোলিত হতো, দাদা মৌলবি শাহীদুল হকের সঙ্গে ঘোড়ার পেছনে চড়ে জোড়া ময়ূর আঁকা বিছানার মতো নরম শহরটা ঘুরে বেড়ানোর কী আশ্চর্য সেসব স্মৃতির মায়াবি হাত যেন তার সমস্ত শরীরটাতে প্রশান্তি বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে; অনেকানেক স্মৃতির ইঁদারা থেকে লাফিয়ে উঠে একটা স্মৃতি তার সামনে পড়ে রাঘববোয়ালের মতো তড়পাতে থাকে—গুরুপূর্ণিমার রাতে মৃত্যুপথযাত্রী দাদা যেন সারা রাত সাধুসঙ্গ সাঙ্গ করে আলেক আলোয় জ্বলে ওঠা গুরুর মতো তার আঁচলাঝোলা নিবেদিত শিষ্য হক সাহেব ওরফে ফায়জুল হকের হাতে সঁপে দিয়ে একতারার তারটা টুং করে ছিঁড়ে ফেলে উড়তে উড়তে আকাশের গভীরে জ্যোৎস্নার মোলায়েম চাদরে নিজেকে ঢেকে ফেলছে, ঝোলার মুখ খুললে শত শত নেগেটিভ আর দাদার প্রিয় জাপানি ক্যামেরা উজ্জ্বল মাছের মতো বেরিয়ে আসছে—সেই ক্যামেরা সেই নেগেটিভ সেই স্মৃতি কোনোদিন হৃদয়ছাড়া করবে না হক সাহেব। এই একলা জীবনে তাকে একমাত্র সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে এই ক্যামেরা, নেগেটিভগুলো আর স্মৃতিরা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আরামকেদারায় বসতেই চায়ের কাপ হাতে ইয়াসিন ঢোকে—কাকা, শুনলাম চৌধুরী ফারজাদ হুসেন নাকি তার বাপ চৌধুরী মিনহাজ হুসেনের চেহারা কিছুতেই মনে করতি পারছে না, মাঝে মাঝে বাপের নামও উল্টাপাল্টা আওড়াচ্ছে, খালি ফারজাদ হুসেন না, চৌধুরী বাড়ির কেউই নাকি পূর্বপুরুষের কোনো স্মৃতি মনে করতি পারছে না। এত বড় জমিদার বংশ, শহরে এক নামে চেনে তাদের মানুষে ! ওদের বাড়ির কেউ বলছে বড় চৌধুরী মানে চৌধুরী মিনহাজ হুসেন লবণের ব্যবসা করত, কেউ বলছে হাতির দাঁতের চিরুনির ব্যবসা করত। চৌধুরী বাড়িতে যত পুরনো জিনিসপত্র ছিল, পুরনো ফটো অ্যালবাম, পুরনো খাট-পালঙ্ক, ঘটি-গামলা সব বেচি দেছে সওদাগরের কাছে। খালি কি চৌধুরীদের এই হাল, ও মালেক সাহেবদেরও একই ছিরি—বাপ-চাচা কারো নাম মনে করতি পারছে না নাকি ওরা। কী বারেখাঁ লোক ছিল শুনিছি সাহেবরা।

ইয়াসিনের একটানা খেদোক্তি শুনতে শুনতে আরামকেদারায় আবারো কি ঘুমিয়ে পড়ল হক সাহেব। ইয়াসিন কয়েকবার ডাকল—কাকা, চা নেন, ও কাকা। কোনো শব্দ নেই। নড়ে না চড়েও না। হতভম্ব ইয়াসিন একবার গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিতে গিয়েও পিছিয়ে এল। নাকের কাছে কান এগিয়ে ধরেও হক সাহেবের নিশ্বাসের কোনো শব্দ খুঁজে পেল না। ইয়াসিন বায়েজীদ বোস্তামির মতো চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ পরে হাতের ইশারায় ইয়াসিনকে চা-টা টিপয়াতে রেখে নিচে নেমে যেতে বলল হক সাহেব।

টিপয়াতে রাখা চায়ের কাপে নাৎসি সৈন্যের মতো সারি সারি কালো ডেও পিঁপড়েরা এসে শর্করা নিয়ে যাচ্ছে। সারা দিন চোখের পাপড়ি আলাদা না করেই ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়েই রাত ডেকে আনল হক সাহেব। মাত্রই তো অমাবস্যা পড়েছে, কিন্তু আজ কে ে কে গুরুপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো আলো ঢুকছে তার দোতলার ঘরের জানালার ঝালর মাড়িয়ে আর সে আলোয় বিছানায় ছড়ানো নেগেটিভগুলো থেকে অজস্র মায়াবি দৃশ্য ও আশ্চর্য আশ্চর্য মানুষের মুখ সূর্যমুখীর মতো ফুটে বেরোচ্ছে। আরামকেদারা ছেড়ে বিছানায় গিয়ে বসলে নেগেটিভগুলো সব যেন পোষা জোনাকির মতো জড়ো হয়ে তার করপুটে উঠে এল। বিছানার এক কোনায় রাখা ঝোলাটা থেকে দাদার পুরনো ক্যামেরাটা বের হয়ে আসছে আদুরে খরগোশের মতো। খরগোশটাকে কোলে চড়িয়ে নিয়ে আদর করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির নিচ থেকে একটা হাঁক আসে—হক সাহেব, নেমে আসেন। আমি নিজেই চলে এলাম আপনার কাছে।

জানালার পাশে গিয়ে দেখে—সওদাগর আর তার ভৃত্য; আর তাদের পেছনে পিঠে মালবোঝাই শত শত সাদা হাতি। সওদাগর আবারো হাঁক ছাড়ে—হক সাহেব—আপনার ক্যামেরা আর নেগেটিভগুলো দেন আমাকে। বিনিময় মূল্য যা চান আপনি নিজে তুলে নেন আমার ঝোলা থেকে। আজ আমি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আজই শেষ সুযোগ।

হক সাহেব সওদাগরের কথার কোনো জবাব না দিয়ে আলতো করে জানালা ভিড়িয়ে দেয়। আকাশের ঈশান কোণ থেকে সওদাগর ও তার ভৃত্য মাত্র একটা হাতি নিয়ে নেমেছিল শহরে আর শত শত হাতি নিয়ে নৈঋতে উঠে যাওয়ার পরে শহরের মানুষেরা তাদের কোনো অতীত মনে করতে পারে না আর। শহর নিয়েও কোনো স্মৃতি জাগে না তাদের। পুরো শহরটা অচেনা নগর হয়ে উঠলে মানুষেরা একদিন নগরভবনের সামনে হাজির হয়। তারা ভেবেছিল—নগরভবনে মেয়রের রুমে বিরাট বাঁধানো শহরের পুরনো যে ছবিটা আছে, সেই ছবিতেই একমাত্র শহরের ঐতিহ্যের চেহারা দেখা যাবে। মানুষেরা বরং সিংহাসনচ্যুত সম্রাটের মতো নতমস্তকে মেয়রকে ছবিশূন্য বিশাল কাঠের ফ্রেমটা নিয়ে নগরভবনের প্রধান ফটক দিয়ে বের আসতে দেখে—যেন ক্রুশকাঠ কাঁধে রক্তাক্ত জিসাস এগিয়ে আসছে।

01761429381
www.amarfoods.com

"নিজেদের জন্য
নিরাপদ পণ্য"

/amarfood.organic

আমার ফুড

দেশী
সরিষার
তেল

আমারফুড খাঁটি মসলা

Chilli Powder

Turmeric powder

Cumin Powder

Coriander Powder

আমার ফুড ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেইজ সহ এখন পাওয়া যাচ্ছেঃ

www.amarfoods.com

evaly Daraz

ব্রিটিশ আমলে যতীন কুমার দাশের ইটভাটার ইট

১৯৪৯ সালে তৎকালীন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন মাজেদ সরকার

চীনা মাটির আন্টা। বাহাদুর শাহ পার্কে এক সময় এ খেলা হতো

শত বছরের পুরনো ক্যামেরা

ঢাকার টেলিভিশন সেন্টার চালুর পর দ্বিতীয় মডেলের টেলিভিশন

মোহাম্মদ আজিম বখ্‌শ

পুরান ঢাকার হারিয়ে যাওয়া নিদর্শনের সংগ্রাহক

জান্নাতে নাঈম

একটি জাতির আত্মজীবনী লেখা থাকে তার পুরাবস্তুর মধ্যে। কথাটিকে যেন আপ্তবাক্য হিসেবে নিয়েছেন মোহাম্মদ আজিম বখ্‌শ। তাই তো তিনি ঢাকার ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিলেন। এজন্য অবশ্য গর্ব ভরে তার নাতি-নাতনিদের কাছে শত বছর আগের পুরান ঢাকার লোহার পুলের ছবিতে থাকা সারি সারি বাঁশ দেখিয়ে বলতে পারেন, 'ওই বাঁশগুলো আমার দাদার।' এই সংগ্রাহকের বর্তমান বয়স ৭৮ বছর। তার দাদা ছিলেন তৎকালীন ঢাকার পঞ্চায়েত সরদার পেয়ার বখ্‌শ। লোহারপুলে তার ছিল বাঁশের ব্যবসা। ধোলাই খালের ওপর নির্মিত সেই লোহার ঝুলন্ত সেতুটির অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও বিচিত্র সংগ্রাহক আজিম বখ্‌শের কাছে রয়েছে সেতুর শেষ স্মৃতিচিহ্ন বিশাল সাইজের দুটি ইট, যা টালি ইট নামে পরিচিত। তার সংগ্রহে রয়েছে তৎকালীন ঢাকার ৩২টি বনেদি পরিবারের সাংবাৎসরিক কাজে ব্যবহৃত নানান জিনিসপত্র। এবং সেসব পরিবারের কতশত ছবি! প্রায় শত বছর আগের ওই ছবি দেখে উত্তরসূরিরা আবেগে আপ্লুত হয়। রক্তের সম্পর্কের পরিচয় মেলে তার সংগ্রহের ছবি দেখে।

বিচিত্র এই সংগ্রাহকের জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৫ ডিসেম্বরে। পুরান ঢাকার মোহনী মোহন দাশ লেনে। বাবা মাওলা বখ্শ সরদার। যিনি ১৯৩২ সালে ৬৭ ফরাশগঞ্জ রোডে গড়ে তোলেন 'মেসার্স ইন্ডিয়া মোটর ওয়ার্কশপ'। মুড়ির টিন বাস সার্ভিসের মালিক হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন তার বাবা। আজিম বখ্শ একাডেমিক পড়াশোনা সম্পন্ন করে ব্যবসায় নামেন ১৯৬৭ সালে। মোটর মেকানিকের পাশাপাশি ইটের ভাটা ও লবণের ব্যবসাও ছিল তাদের। দাদা পিয়ার বখ্শ সরদার মারা যান ১৯৪১ সালে। ১৯৪৪ সালে ঢাকার নবাব 'বাইস' পঞ্চায়েতের সরদার মনোনীত করেন আজিম বখ্শের বাবা মাওলা বখ্শকে। এই বনেদি পরিবারের চার সন্তানের তৃতীয় সন্তান আজিম বখ্শ। যিনি ঢাকার হারিয়ে যাওয়া হাজারো গল্পের চাক্ষুস সাক্ষী।

তার এই দীর্ঘ সংগ্রাহক জীবনের গল্প শুনতে সেদিন উপস্থিত হই তার বর্তমান নিবাস গুলশান সাউথ এভিনিউয়ের দেড়তলা বাড়িতে। আটপৌরে এ গৃহের ফটক পেরিয়ে প্রবেশ করি একটি খানকা ঘরে। প্রথমে নজর পড়ে থরে থরে সাজানো বইয়ের ওপর। দেখি সবগুলো বই-ই 'ঢাকা' নিয়ে লেখা। তিনি গল্পের শুরুটা করেন '৪০ বছর ধরেই এই তপস্যার মধ্যে আছি' বলে। জানান ঢাকা নিয়ে লেখা প্রায় দশ হাজার বই তার সংগ্রহে রয়েছে। ঢাকা সম্পর্কে যেকোনো লেখা চোখে পড়লে তিনি সংগ্রহ করেন। আজিম বখ্শের মুখে তার দাদার পূর্ণাঙ্গ নাম উচ্চারিত হওয়ার পর 'বখ্শ' কীভাবে লিখব তখন এক পশলা হাস্যরোল বয়ে গেল ছোট্ট ঘরটি। বখ্শ পদবি নিয়ে করলেন শৈশবের স্মৃতিচারণা। জানালেন, মুঘল আমলে যারা অর্থ মন্ত্রণালয়ে কাজ করতেন তাদের বলা হতো 'বখ্শী'। সেখান থেকে তাদের পরিবারের 'পদবি' এসেছে কিনা? তা অবশ্য তিনি নিশ্চত নন। নানান স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসলেন আজিম বখ্শ।

মোহাম্মদ আজিম বখ্শ

পুরাকীর্তি বা দুর্লভ জিনিস সংগ্রহের শুরুটা কীভাবে? এমন কথার আলাপে তিনি বলেন, 'ফরাশগঞ্জ, গেন্ডারিয়া, ওয়ারি তখনকার দিনে ঢাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কিন্তু আমরা যখন বড় হলাম, কলেজে পড়ি, ক্রমেই দেখলাম পুরান ঢাকার সেই সংস্কৃতির অনেক হারিয়ে গেছে। আমার দাদা সেই আমলে নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উনি সবজিমহল ড্রামাটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। তখনকার দিনে উর্দু এবং ফার্সি নাটকে অভিনয় করতেন দাদা। সেই ধারাবাহিকতায় আমার বাবার মধ্যেও এটা সংক্রমিত হয়। যার জন্য আমাদের ফরাশগঞ্জের সরদার বাড়ি হয়ে উঠেছিল সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র। আমাদের বাড়িটি ছিল প্রায় এক বিঘার মতো। পাঁচ কাঠাজুড়ে বিল্ডিং। বাকি জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকত। শীতের মধ্যে বাড়ির আঙিনায় মঞ্চ তৈরি করে প্রচুর নাটক হতো। বাংলাদেশের সে সময়ের এমন কোনো বিখ্যাত অভিনেতা নেই যারা আমাদের বাড়িতে অভিনয় করেন নাই! পরবর্তী সময়ে আমার বাবা ১৯৬১ সালে ফরাশগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হন। এরপর উনি লালকুঠিতে সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে ফরাশগঞ্জ ইউনিয়ন কমপ্লেক্স তৈরি করলেন। ১৯৬৭ সালে সেখানে বাবা "মঈনুদ্দিন চৌধুরী মেমোরিয়াল হল" এবং "নর্থব্রুক হল" নামে দুটো মঞ্চ তৈরি করলেন, যা তার জীবনের বড় কাজের একটি। বাঁশ, কাঠ দিয়ে মঞ্চ তৈরি করা ছিল অনেক ব্যয়বহুল। কিন্তু যখন স্থায়ী নাটকের হল তৈরি হলো তখন নাট্যচর্চা অনেকটা সহজ হয়ে গেল। বাবা সংস্কৃতির জোয়ার এনেছিলেন। লালকুঠিতে প্রতি বছর নাট্য প্রতিযোগিতা হতো। এমন একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছি আমরা। আরো একটি বলে রাখি, যেটা "ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব"। ১৯৫৯ সালে এই ক্লাবের উৎপত্তি আমাদের বাড়ি থেকে। আগে এর নাম ছিল "ইকবাল ভয়েজ ক্লাব", তারপর "নজরুল সংঘ"। শেষে হয় ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব। মনে আছে আমার মেজো বোন মমতাজ বেগমের বিয়েতে আমরা বিয়ের গেট বাড়িতে সাজিয়েছিলাম। বিয়েসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান হতো বাড়িতেই। তখনকার দিনে তো এত ডেকোরেটর ছিল না। দেবদারু গাছের পাতা এবং বাঁশের চটি দিয়ে গেট বানালাম। তখন সবাই মিলে গেটা বানালাম। সেই আমলে বরপক্ষের কাছ থেকে বিয়ের গেট সাজানো বাবদ ৬০ টাকা পেলাম। সেই টাকা দিয়ে ক্লাবের নানান জিনিস কিনলাম। এভাবে ছোটবেলা থেকেই সাংগঠনিক কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। ১৯৬৫/৬৬ সালে মঈনুদ্দিন চৌধুরী ঢাকা মিউনিসিপালিটির প্রশাসক হলে উনাকে ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো আমাদের বাড়িতে। তখন ক্লাবের সভাপতি ছিলেন সাঁতারু ব্রজেন দাস। এই অনুষ্ঠানের ছবিও সংগ্রহে আছে। সে যাহোক, মঈনুদ্দিন চৌধুরী তখন ফরাশগঞ্জ ক্লাবকে জায়গা দিলেন লালকুঠিতে। এই ক্লাবের থার্ড ডিভিশনের আমিও একজন খেলোয়াড় ছিলাম। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন বড় ভাইয়েরা। পেছনে থেকে আমরা কাজ করে যেতাম। ছোটবেলায় ফরাশগঞ্জ, গেন্ডারিয়া এলাকায় যা দেখেছি সেই সংস্কৃতি ধরে রাখার উদ্দেশে আমার এ সংগ্রহ।'

নতুন প্রজন্মের জন্য পুরান ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্য রেখে যেতে তিনি এ বয়সেও নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আজিম বখ্শ আফসোস করে বললেন, 'এই প্রজন্ম পুরান ঢাকার আসল চিত্র কেমন ছিল, তা জানেই না। তারা শুধু কয়েকটি পুরাতন ভাঙাচোরা জমিদার বাড়ি দেখেছে। এই যা। কিন্তু সেই আমলে পুরান ঢাকার কৃষ্টি কালচার ও পরিবেশটা কেমন ছিল। সেটিই সংরক্ষণ করার জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা।'

নতুন তথ্যের সন্ধানে তিনি খুঁজে বেড়ান পুরাতন দলিলপত্র। পুরান ঢাকাতে রয়েছে তাদের অনেক আত্মীয়। যে আত্মীয়দের অবস্থা এক সময় খুব ভালো ছিল। পরবর্তী সময়ে আর্থিক অবনতি ঘটে। কাগজীটোলা বড় মিয়ার বাড়ি তার বোনের শ্বশুরবাড়ি। তারা একসময় ছোটখাটো জমিদার ছিলেন। আজিম বখ্শ একবার বোনের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, পুরাতন জিনিসপত্র সিঁড়ির নিচে বা চিপাচাপায় এখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে, যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেটার মূল্য এ প্রজন্ম জানে না। সেগুলো দেখে তিনি সংগ্রহ করতে চাইলে তারা সেগুলো দিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এসব জিনিস রাখবেন কোথায়? এজন্য স্থায়ীভাবে রাখার জন্য আজিম বখ্শরা গড়ে তুললেন 'ঢাকা কেন্দ্র' নামের একটি সংগ্রহশালা। যেটির অবস্থান ফরাশগঞ্জের ২৪ মোহনী মোহন দাস লেনে। স্মৃতির স্মারক হিসেবে এই ভবনের দেওয়ালের অল্প একটু জায়গা সাজিয়েছেন জাফরি ইট দিয়ে। যে ইটগুলো মুঘল আমলের তৈরি। তাদের পুরাতন বাড়ি ছিল জাফরি ইটের তৈরি। জাফরি ইটের আয়তন ৩/৩ ইঞ্চি। এ প্রজন্মকে জানানোর কয়েকটি জাফরি ইটও রেখে দিয়েছিয়েন। শুধু কি তাই! একজীবনে কত কিছুই সংগ্রহ করেছেন। তার সঠিক হিসাব কি তার কাছে আছে এ মুহূর্তে! মুঘল

শরী'আহ ভিত্তিক ব্যাংকিং হবে
নিশ্চিন্তে ও সহজে
এনসিসি ইসলামিক

মেঘনা লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসি
MEGHNA LIFE INSURANCE PLC

দাবি পরিশোধের হার

৯৯.২৬%

নিশ্চিন্ত জীবনের পথচলায়
আপনার আস্থার সঙ্গী

বিগত বছর সমূহে

৪,১৫০ কোটি

টাকা বীমা দাবি পরিশোধ

২০২৪ সালে
দাবি পরিশোধ

৩৬৪ কোটি টাকা

আমলের ৩/৩ ইঞ্চি এবং দেড় ইঞ্চি পুরু জাফরি ইট, 'জে কে ডি' ব্রিকস ইট। নবাবি আমলে তৈরি ৯ ইঞ্চি লম্বা ইট। এরপর ব্রিটিশ আমলের দুটি ইট ভাটার মালিক ছিলেন যতীন কুমার দাশ। রেবতি মোহন দাশের ফ্যাক্টরির 'আর এম ডি' ইট। এ দুটি ইটের আকার ছিল ১০ ইঞ্চি। আজিম বখ্‌শদের পারিবারিক ইটভাটার ব্যবসাও ছিল। সেটার নাম ছিল 'বি ইউ এক্স'ইট। সেগুলোও তার সংরক্ষণ রয়েছে। তার কাছ থেকে জানা গেল, নবাবি আমলেরও আগে ফরাশগঞ্জ এলাকায় মুসলমানদের নামে রাস্তা ছিল। পরবর্তী সময়ে তা হিন্দুদের নামে নামকরণ হয়েছে।

আজিম বখ্‌শের কাছে জানা গেল, ঢাকার প্রথম ট্রাফিক সিগন্যাল বাতির গল্প। ১৯৬১ সালে ঢাকার প্রথম ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বাতি বসানো হয়। পুলিশের কাছে থাকত বাতির সুইচ। লাল বাতি জ্বলে উঠলে রাস্তা বন্ধ। হলুদ বাতি প্রস্তুত হওয়ার সংকেত। সবুজ বাতি জ্বলে উঠলে গাড়ি চলাচল শুরু করে দিত। তখন আজিম বখ্‌শের যৌবনকাল। সব স্মৃতিই রয়েছে তার অলিন্দে। তিনি জানালেন, পরে ঢাকার দ্বিতীয় ট্রাফিক পয়েন্ট বসানো হয় সদর ঘাটের ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সামনে চৌরাস্তায়। প্রথম ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি সম্পর্কে অনেক মজার তথ্য দিলেন এ সংগ্রাহক। প্রকৌশলী তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী প্রথম ট্রাফিক বাতি ও রেগুলেটর বানিয়েছিলেন। এ প্রকৌশলীই একদিন আজিম বখ্‌শকে বলেন, 'তুমি যেহেতু পুরাতন জিনিসপত্র সংগ্রহ করো। আমার কাছে এই জিনিস আছে নিয়ে রাখো।' এভাবে তিনি পেয়ে গেলেন ঢাকার রাস্তার প্রথম ট্রাফিক সিগন্যালের স্মারক। প্রথম ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের একটা বাতি ছিল ফরাশগঞ্জের দিকে, আরেকটা সূত্রাপুর বাজারের দিকে, অন্যটা লোহারপুলের দিকে। এই তিনটি রাস্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো সূত্রাপুর থানার সামনে ছোট্ট একটা সিমেন্টের ঘরে বসে। এসব কথা জানিয়ে এই সংগ্রাহক আফসোস করে বললেন, 'আজাদ সিনেমা হলের সামনে ঢাকা কোর্টের ট্রাফিক অফিস ছিল। সেখানে আমি অনেক দিন বাতিগুলো পড়ে থাকতে দেখেছি। এছাড়া মদন সাহা লেনের প্রথম ট্রাফিক ঘরটিও খুব বেশি দিন হলো ভাঙা হয়নি।' তার চোখের সামনে পরিবর্তন ঘটেছে পুরান ঢাকার চিত্র। তার মুখে হাজারো পুরান ঢাকার স্মৃতি শুনে পরদিন উপস্থিত হই তার সংগ্রহের জিনিসপত্র দেখতে ফরাশগঞ্জের মোহনী মোহন দাশ লেনের ঢাকা কেন্দ্রে। সেসব দেখে তো চক্ষু চড়ক গাছ। আজিম বখ্‌শের সংগ্রহে থাকা ৩২ পরিবারের মধ্যে ১২টি পরিবারের ব্যবহৃত অল্প কিছু তৈজসপত্র ও ছবি। ছবিগুলো তো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। যেমন ১৯৪৯ সালে তৎকালীন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার জেতেন ঢাকা পঞ্চায়েত সরদার হাজী মাজেদ। সেই পুরস্কারের রেপ্লিকা রেখে দিয়েছেন সযত্নে। আছে হাজী মাজেদ সরদারের ব্যবহার করা বন্দুকের কার্তুজ রাখার একটি চামড়ার ব্যাগ। এ ব্যাগটি ১৯৫৪ সালের। আছে ১৯৩৪ সালের চীনামাটির থালা। সেই সময়ে পুরান ঢাকায় একটা রীতি ছিল, যেকোনো ফল পাকার সঙ্গে সঙ্গে গরিব মানুষকে দাওয়াত করা হতো। নিজেরা খাওয়ার আগে প্রায় শ দেড়েক গরিব মানুষকে ফল ও দুধ-ভাত খেতে দিতেন। এই কাজের জন্য পিতলের তৈরি ড্রাম, যা দুধ রাখার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এমন বেশকিছু পাত্রও রেখে দিয়েছেন। অবাক বনে যেতে হয়, ১৯১৭ সালের একটি বিয়ের উপহারের মোরগ পোলাও ডিস দেখে। বিশাল সাইজের দুটি ডিস পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। শত বছরেও বেশি আগের এ তৈজসটি গোলাম রহমান ও বিবি মরিয়মের বিয়েতে পাওয়া উপহার। এর মধ্যে কত প্রজন্ম চলে গেছে এ দম্পতির। কিন্তু তাদের ব্যবহার করা জিনিসটি এখনো রয়ে গেছে। কত কত মানুষের হাতের স্পর্শমাখা এ ডিস দুটি! এদের আত্মীয়দের কাছে এ দুর্লভ বস্তুটি আবেগের।

ভাওয়াল রাজার একটি দুর্লভ ছবি রেখে দিয়েছেন। এছাড়া রয়েছে ১৯৩৪ সালের ১৭ মে বাংলার রূপ পত্রিকায় প্রকাশিত ভাওয়াল সন্ন্যাসী কুমারের মামলার সংবাদের পেপার কাটিং। এ থেকে অনুমান করা যায়, ভাওয়াল রাজার ছবিটি ১৯৩০-এর দশকের। আরো কত দুর্লভ জিনিস যে রয়েছে, আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের বিশাল আকারের কাঠের ফ্রেমের রেডিও। যেটির উচ্চতা ১৭ ইঞ্চি, লম্বা ২২ ইঞ্চি লম্বা এবং এর ভেতরে ১২ ইঞ্চি। হিজ মাস্টার ভয়েজের বিভিন্ন আকারের সিডিও প্লেয়ার। পুরাতন টেলিফোন সেট। এটি মাওলা বখ্‌শ সরদারের বাড়িতে ব্যবহার হতো ১৯৫০ সালের দিকে।

এ দেশ থেকে ব্রিটিশরা চলে গেছে। আজিম বখ্‌শ ধরে

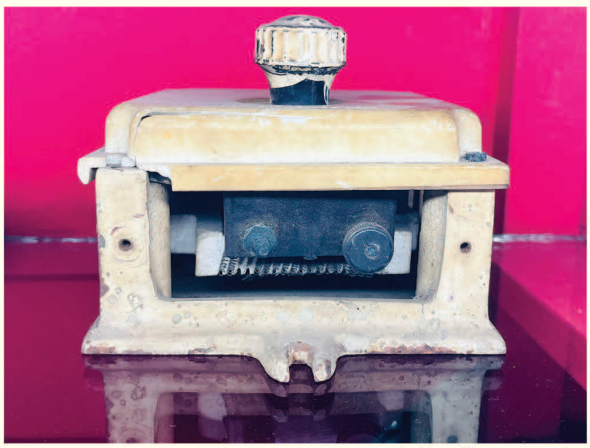

ঢাকার প্রথম ট্রাফিক সিগন্যালের সুইচ

মোগল আমলের জাফরি ইট

আপনার ব্যাংক, আপনার সাথেই সবসময়!
NCC Always
মোবাইল অ্যাপ

তফাজ্জল হোসেন চৌধুরী

রেখেছেন তাদের স্মৃতিচিহ্ন। বাহাদুর শাহ পার্কে ইংরেজরা বিলিয়ার্ড খেলতেন বলে পার্ককে তখন বলা হতো আন্টা ঘরের মেলা। সেই বিলিয়ার্ড খেলার চীনামাটির আন্টা তার সংগ্রহে রয়েছে। ছোট ছোট সাদা ডিমের মতো বস্তুটি এখনো ঝকঝক করছে। নজর কাড়ল, বৈদ্যুতিক রেকর্ড প্লেয়ার চেঞ্জার, হিজ মাস্টার ভয়েজের সিভি প্লেয়ার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্যবহৃত রেডিও, জলকান্দা (খাবারের মিটসেফ রাখার পা দানি, ঢাকার টেলিভিশন সেন্টার শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় মডেলের টেলিভিশন। ১৩ ইঞ্চির তামার পানদানি, পিতলের গামলা (চৌরা), তামার সেলিঞ্চি, মেহমানদের জন্য মজলিশে পান পরিবেশনের পিতলের পানদানি, পিতলের কারি চামচ, লোহার তিন পা ওলা স্যান্ড, রূপার বাটা— আফসান বা রাঙতা দিয়ে লবঙ্গ মুড়ে বিয়ের দাওয়াতে ব্যবহার হতো।

মাওলা বখ্শ সরদার 'ইন্ডিয়া মোটর ওয়ার্কশপ' চালু করেন ১৯৩২ সালে। সেই কারখানায় ব্যবহার করা নেহারি রয়েছে। এটি দিয়ে গাড়ির পাতির কাজ হতো। আছে মোটর ওয়ার্কশপের ব্রেক ওয়েল জার। এ পাত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন মাওলা বখ্শ নিজেই। বাবার জিনিস খুব যত্নে রেখে দিয়েছেন আজিম বখ্শ। তার বাবা-মায়ের বিয়ে হয় ১৯৩১ সালে। আলমারিতে রয়েছে বাবা-মায়ের বিয়ের সময়ের সাজপোশাক। এই পোশাক প্রমাণ করে তখনকার দিনে রুচি ও আভিজাত্যে। ১৯৩৯ সালের একটা সোফাসেট এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে তার সংগ্রহে। এ আসবাবটি নারায়ণগঞ্জ খানপুরের ইসলাম সরদারের। আছে পানির ফিল্টার, পেয়ার বখ্শ সরদারের ব্যবহার করা লাঠি। মাওলা বখ্শ সরদারের ইজি চেয়ার। সরদার বাড়িতে সেমাই বানানো হতো হাত মেশিনে। সেই মেশিনও রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের দেওয়াল ঘড়ি, গ্রামোফোন।

আছে অসংখ্য দুর্লভ মুদ্রা। এ মুদ্রাগুলো তিনি ছোটবেলা থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। আছে হাতে লেখা চারটি দলিল, যা ১৮৯৮ সালের। এটি জিন্দাবাহার চৌধুরী বাড়ির একটি সম্পত্তির দলিল। হাতে লেখা গোটা গোটা অক্ষরগুলো অফ হোয়াইট কাগজের জমিনে এখনো জ্বলজ্বল করছে। এ দলিলটিতে ১৮১৮ সালের একটি রেফারেন্সও উল্লেখ রয়েছে। এ দুর্লভ দলিলটি দিয়েছেন জিন্দাবাহার চৌধুরী বাড়ির কন্যা আমাতুল বেগম। যিনি টিকাটুলি সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। আছে ১ ইঞ্চি পুরু এবং ১৩ ইঞ্চি তামার পানদানি, পিতলের হাতা, জালি হাতা বা খুরচুন, পিতলের ভাতের চামচ, তামার কলস, টেলিফোন, লবণ রাখার মাটির পাত্র, এ পাত্রটির বয়স তাও তো শত বছর পেরিয়ে গেছে। ঘর-গৃহস্থালির কাজে লাগে কত যে বিচিত্র গড়নের জিনিস। আছে মেটালের ধূপদানি, ল্যাম্প ভেজ, পিতলের ঘটি, ওষুধ তৈরির খল, পিঠা বানানোর জন্য মাটির তৈরি বিভিন্ন ধরনের হাঁড়ি, পিতলের পানির জগ, ঢাল ভাঙানোর যাতা, মুড়ির রাখার টিনের পাত্র, বাকরখানি রাখার টিন, ঢাকার টেলিভিশন সেন্টার শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় মডেলের টিভি, সরদার বাড়িতে পিঠা বানানোর হাঁড়ি, মুড়ি ভাজার ঝাঁজর, যা মাটির তৈরি, সুরমাদানি, প্রাকটিকা ক্যামেরা; এটির বয়সও শত বছর পেরিয়ে গেছে। এ ক্যামেরাটি জার্মানির পেন্টাকন কোম্পানির তৈরি। আছে খাবার রাখার মিটসেলফ রাখার পা দানি, যা অন্যরকম এক সংগ্রহ। এ জিনিসটির চারপাশে পানি ভরে রাখা হতো। যাতে পানি ডিঙিয়ে পিঁপড়া মিটসেলফের খাবারের কাছে পৌঁছতে না পারে।

আছে চীনামাটির থালা। যে থালার নিচে রয়েছে পোলাও কোরমা গরম রাখার জন্য ট্যাংক। রোজ গার্ডেনের কর্ণধার কাজী আবদুর রশীদ সাহেবের স্ত্রীর ব্যবহার করা শাড়ি রেখেছেন একটি বাক্সে। বিশাল লম্বা পাইপ লাগানো হুক্কা, আছে কয়েক প্রকারের হুক্কাও। নজর কাড়া ক্যাসেট প্লেয়ার, বিভিন্ন ব্যান্ডের রেডিও। চাঁদ তারার নকশা তোলা একটি চীনামাটির পোলাও ডিসও রয়েছে, যা দেখে সহজের অনুমান করা যায় এটি পাকিস্তান আমলের। হাজী আবদুল্লাহ সরকারের পরিবারের বেশকিছু ফটো রয়েছে। সেখানে একটি ছবি রয়েছে স্বর্ণখচিত এক জোড়া জুতোর। এই জুতো জোড়া ব্যবহার করতেন জাহানারা খাতুন। সিল্কের কাপড়ের তৈরি সোনার পাতের নকশা। কোথাও গোলাকার বা চারকোনা সোনার টুকরো দিয়ে নকশা তোলা এ জুতা জোড়া ১৯৪১ সালে জাহানারা খাতুনের বিয়ের সময়কার।

আজিম বখ্শের সংগ্রহের আছে রোজ গার্ডেনের মালিক কাজী আবদুর রশীদ, ইয়ার মো. খান, জিন্দাবাহার চৌধুরী বাড়ি, মান্নান সরদার ও ভাওয়াল রাজার, হাজী মাজেদ সরদার, মেয়র মোহম্মাদ হানিফের, রূপলাল দাস, রেবতি মোহন দাস, ঢাকা সমিতি, ফরাশগঞ্জ স্কুল, ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব, দেবনিবাশ, বাবু যতীন কুমার দাশ, মির্জা আব্দুল কাদের সরদার, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার ও জাতীয় অধ্যাপক আব্দু রাজ্জাকসহ আরো কিছু পরিবারের ছবি। পুরাতন দিনের পুরান ঢাকার ছবি দেখে আজকের শ্যামবাজার দিয়ে ফরাশগঞ্জের যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, এর সঙ্গে কোনোভাবেই মেলানো যাবে না। এই রাস্তা এখন আলু, পটোলসহ মসলার আড়তে ঠাঁসা। হাঁটাচলার উপায় নেই। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত ফরাশগঞ্জ ছিল ছিমছাম পরিপাটি এলাকা। ১৯৪৭ দেশভাগের আগে বড় বড় কোম্পানির অফিস ছিল শ্যামবাজার, যেমন এসও বাংলাদেশ, স্পেনসার অ্যান্ড কোম্পানি। এ রকম আরো বড় বড় কোম্পানির অফিস ছিল এই এলাকায়। কিন্তু যখন মতিঝিলে বিল্ডিং ওঠা শুরু হলো। একেকটি ভবন তৈরি হয়, আর এই ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানান্তরিত হয়ে মতিঝিল যেতে থাকে। ফরাশগঞ্জ থেকে অফিসগুলো চলে গেলে বড় বড় ফার্নিচারের শোরুম বসতে লাগল। এর পর সেগুলোও চলে গেল। বর্তমানে সেখানে গড়ে উঠেছে মসলার দোকান। পুরান ঢাকার রূপান্তরের জীবনী পাওয়া যায় আজিম বখ্শের সংগ্রহে থাকা পুরাতন দিনের ছবিগল্পে। তিনি ছোটবেলায় যে দৃশ্য দেখেছেন, ফরাশগঞ্জ এলাকায়। সেটি ধরে রাখার জন্য নিয়েছেন এ উদ্যোগ। তোর চোখের সামনে পুরান ঢাকা থেকে হারিয়ে গেছে অনেক পেশাজীবী। যেমন কুয়া পরিষ্কার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এদের বলা হতো কুয়া। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এরা কু-উ-য়া বলে হাঁক ছাড়তেন। তখন মানুষ বুঝে নিত কুয়া পরিষ্কারের লোক এসেছে। এ পেশাজীবীরা 'কুয়া' নামে পরিচিতি হয়ে ওঠে লোকমুখে। তাদের কাছে থাকত কাছি ও কাঁটা। সেই কাছি অবশ্য আজিম বখ্শ সংগ্রহে রাখতে পারেননি। তবে তার কাছে রয়েছে কাঁটা। এই সংগ্রাহকের থলেতে রয়েছে আরো কত শত মানুষের জীবন ছুঁয়ে যাওয়া গল্প। যে গল্প খুঁড়লে পাওয়া যাবে হয়তো ইতিহাসের অজানা কোনো তথ্য।

মালেক বিন নবি ও মুসলিম সভ্যতার পুনর্পাঠ

আহমেদ দীন রুমি

তোমার সভায় কথা বলার নাইক যাদের যোগ্যতাই-
পাচ্ছে তারাও ধন-দৌলত! বেশত! তাতেও দুঃখ নাই।
কিন্তু একী। কাফিররা পায় এই ধরাতেই 'হুর-কসুর',
মুসলমানের বেলায় শুধুই ওয়াদা হুরের-স্বর্গপুর!
আফসোস! আর আগের মতন নওক' তুমি মেহেরবান,
ব্যাপারটা কী। এখন কেন দাও না মোদের তেমন দান?

খোদার প্রতি বান্দার তীব্র অভিযোগ। অনুবাদ কবি গোলাম মোস্তফার। মূল মুহম্মদ ইকবালের 'শিকওয়া'। শিকওয়া প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। উসমানি খেলাফত তখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত না হলেও প্রায় শক্তিহীন। ক্ষমতা এক রকম নিয়ে ফেলেছে তরুণ তুর্কিরা। এদিকে সমাপ্ত হয়েছে ভারতের মোগল, বাংলায় সিরাজউদ্দৌলা ও মহীশূরে টিপু সুলতানের দিন। ধ্বংসাবশেষে পরিণত বাগদাদ, কর্ডোবা, কায়রো, ইস্তানবুল ও সমরকন্দের মতো প্রাণকেন্দ্র। দরিদ্রতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞতার মধ্যে খাবি খাচ্ছে মুসলমান। অথচ পশ্চিমা উপনিবেশের সূর্য তখন মধ্যগগনে। পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত গৌরবময় পদচারণা ব্রিটিশ, ফরাসি ও পর্তুগিজ পরাশক্তির। ইকবাল সারাজীবনই এ পরিস্থিতির কারণ খুঁজে গেছেন। ১৯৩৮ সালে মারা যান তিনি, ঠিক সে বছরই মালেক বিন নবি লিখেছেন একটা উপন্যাস। শ্রেষ্ঠ রচনা বলতে যা ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে, তার কোনোটিই তখনো লেখা হয়নি। তবে আধুনিক বিশ্বে দাঁড়িয়ে মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয়, পতন ও সামাজিক পরিবর্তনকে পর্যালোচনা করার পরবর্তী দায়িত্বটা তিনিই নিয়েছেন কাঁধে। ধারণ করেছিলেন একদিকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক ইবনে খালদুন এবং আধুনিক সময়ের কবি ও দার্শনিক ইকবালের উত্তরাধিকার।

মালেক বিন নবিকে মনে করা হয় আরব বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী তাত্ত্বিকদের একজন। তার জন্ম ১৯০৫ সালে আলজেরিয়ায়। উত্তর আফ্রিকায় তখন ফরাসি উপনিবেশ। তার অধিকাংশ লেখালেখিই ফরাসিতে। আলজেরিয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামে ইসলাম যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল, তার বড় দলিল তিনি। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে দার্শনিক ভিত প্রস্তুত করেন। ইকবালকে যেমন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পাঠ করতে হয়, মালেক বিন নবিকে তেমন পাঠ করতে হয় আলজেরিয়ার স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে।

মালিক বিন নবির জন্ম কনস্ট্যান্টাইন শহরে। পরিবার সম্ভ্রান্ত ছিল না। নিজের চোখে দেখেছিলেন ফরাসি সৈন্যদের দখলদারত্ব ও নিজ জনতার রক্তাক্ত ইতিহাস। বিন নবি স্থানীয় আল জালিস স্কুলে ভর্তি হন। তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতেন। পত্রিকায় চোখ রাখতেন নিয়মিত। আমির খালেদ ও মোস্তফা কামালের বীরত্বের কাহিনী কিংবা জগলুল পাশার ইংরেজবিরোধী লড়াইয়ের খবর তাকে আকর্ষণ করত। সে আকর্ষণ তাকে নিয়ে যায় মোহাম্মদ আবদুহু আর রশিদ রিদার লেখালেখির কাছে। তিনি মুসলিম সংস্কৃতির অতীত গৌরব আর বর্তমান জরাজীর্ণ চেহারা থেকে ব্যথিত হন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালীন তিনি দুজন নওমুসলিম ইসাবেল এবারহার্টের খবর পান। তার লেখা *In the warm Shadow of Islam* পড়ে তিনি দারুণ মুগ্ধ হন। তবে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় আবদুল রহমান কাওকাবীর উম্মুল কুরা বইটি।

লেখাপড়া শেষ হলে ভাগ্য ফেরানোর জন্য তিনি ফ্রান্সে পাড়ি জমান। একটি যন্ত্র প্রকৌশল স্কুলে ভর্তি হন এবং প্রকৌশলী হিসেবে বের হন। এ সময় বিন নবির আলজেরীয় মাদ্রাসার পুরনো বন্ধু হামুদা বিন সাই ও খালিদি প্যারিসে আসেন। হামুদা কুরআন শরীফের সমাজ বিশ্লেষণ করে বর্তমান মুসলমানদের দুর্দশাকে ব্যাখ্যা করত। তার সাহচর্যই বিন নবিকে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ করে এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিম দুনিয়ার সমস্যাকে দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে উজ্জীবিত করে। খালিদির গড়া সংগঠনে বিন নবি একবার *Why We are Muslim* শীর্ষক বক্তৃতা দেন। প্রকৌশল স্কুল থেকে বের হওয়ার পর ফ্রান্সে তার চাকরি পাওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে প্রবাসী আলজেরীয় শ্রমিকদের একটা স্কুলে পাঠদান শুরু করেন। বিন নবি এ সময়ে বিশ্বরাজনীতির উত্থান-পতন, সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর আয়োজন ও ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তি এবং দুর্বলতার দিকগুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝতে পারেন সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়, আদর্শগত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা দরকার।

মালিক বিন নবির সভ্যতা বিশ্লেষণের নমুনা পাওয়া যায় তার দুটি বিখ্যাত বইতে। প্রথমটির নাম *The Conditions of Renaissance*; এ বইয়ে তিনি আলজেরিয়ার সমস্যাকে সামাজিক দর্শনের পটভূমিতে স্থাপন করেন। তার এ চিন্তার পরিণতি ঘটে *Islam in History and society* বইয়ে। মূলত বই দুটি একে অন্যের পরিপূরক এবং একই চিন্তার গভীর থেকে গভীরতর বিশ্লেষণ। এ বইয়ে বিন নবি ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের অগ্রগতি ও বিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। ইবনে খালদুনের বিখ্যাত আসাবিয়া তত্ত্বকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে বিন নবি তার সভ্যতার বিবর্তনের তত্ত্ব হাজির করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন প্রত্যেকটি সভ্যতাই নানা রকম রূপান্তরের ভেতর দিয়ে নিজেকে সংহত করে। এ সম্মুখযাত্রাকে সামনে রেখে মালিক বিন নবি মুসলিম ইতিহাস ও সভ্যতাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে কুরআনের আদর্শে উজ্জীবিত এক সমাজ, যা রসুল (সা.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ জীবন্ত সমাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায় সিফফিনের যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। সিফফিনের যুদ্ধ হজরত আলী ও হজরত মুয়াবিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং মুসলিম সমাজের সংহতি তখন থেকেই দুর্বল হতে শুরু করে। দ্বিতীয় স্তরে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। সর্বশেষ স্তরকে তিনি বলেছেন উত্তর আল মুয়াহিদ যুগ, যে যুগ আমাদের এ কাল পর্যন্ত। বিস্তৃত হয়েছে এবং জড়তা, অবক্ষয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক পচন যার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম সভ্যতা আজ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অনুকরণপ্রবণতা।

মালেক বিন নবির ভাষ্য, সময় একই সঙ্গে চক্রাকার ও সম্মুখগামী। সময়ের চক্রাকার রূপকে ইবনে খালদুন তুলে ধরছেন তার বহুল পরিচিত গ্রন্থ মুকাদ্দিমায়। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে উত্থান (মিলাদ) ও স্বর্ণযুগ (আওজ) পার

Eastern Bank PLC.
Cashless
Payments are
smarter and easier
12:40
Log In
EBL Skybanking
Enter User ID
Save ID
Enter Password
Forgot ID or Password?
Login
QR Payment
Eastern Bank PLC.
EBL Skybanking
WEAREBL
VISA
mastercard.
UnionPay
Diners Club INTERNATIONAL
EBL 24/07 CONTACT CENTER
16230
ebl.com.bd
myebl

করে কোনো একটা সাম্রাজ্য ধসে পড়ে (উফুল)। সে ধসে পড়া ছাইয়ের ওপর স্থাপিত হয় নতুন সাম্রাজ্যের ভিত। শুরু হয় নতুন চক্র। তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রূপ দেয় আসাবিয়া বা গোত্রীয় বন্ধন। ইবনে খালদুনের সে আলোচনাকে এখানেই সীমাবদ্ধ রাখতে নারাজ মালিক বিন নবি। তিনি চক্রাকার ধারণাকে বিস্তৃত পরিসরে প্রয়োগ করেন সভ্যতা বুঝতে গিয়ে। সেক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের তিনটি স্তরকে তিনি অন্য তিনটি স্তর দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। প্রতিটি সভ্যতার জন্য তার চোখে রয়েছে আধ্যাত্মিক স্তর, বৌদ্ধিক স্তর ও খায়েশের স্তর। আধ্যাত্মিক স্তরে সমাজ ও সভ্যতার চালিকশক্তি থাকে খোদায়ি ফিতরাত। মুহাম্মদ (সা.) থেকে রাশেদুন খেলাফত পর্যন্ত এটা বিস্তৃত। বৌদ্ধিক স্তরে জ্ঞানচর্চা ও শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তো খায়েশ বা আকাঙ্ক্ষাকে অতটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না, যতটা সম্ভব খোদায়ি ফিতরাত দিয়ে। তাই কিছুটা বিকৃতি থাকে। সভ্যতার তৃতীয় স্তরে খায়েশ অবমুক্ত হয়। খোদায়ি ফিতরাত দূরে থাক এবং বুদ্ধি দিয়েও খায়েশকে আটকে রাখা যায় না। ফলে সময়টা নৈরাজ্যের।

মালেক বিন নবির কাছে সভ্যতা হলো চিন্তার সমাবেশ। যে সভ্যতা যত বেশি চিন্তাকে জায়গা দেবে, সে তত সমৃদ্ধ। মানুষের আসলে দুইটা পরিচয়। খোদ মানুষ হিসেবেই সে আল্লাহর কাছে সম্মানিত। তার জন্য আলাদা আর কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই, এটা নির্ধারিত। দ্বিতীয় পরিচয় হলো আল্লাহর খলিফা। এটা নির্ধারিত না, ইতিহাসের বিভিন্ন সময় বদলে যেতে পারে যোগ্যতা অনুসারে। এজন্য মানুষকে ফারদ থেকে শাখসে পরিণত হতে হয়। ফারদ ও শাখস্ দুটোর অর্থই ব্যক্তি। তবে শাখস্ একজন সম্পূর্ণ সক্রিয় ব্যক্তি সত্তা, যিনি সভ্যতা গঠনের ইউনিট হিসেবে কাজ করেন। যেকোনো সমাজের শাখস্ আর চিন্তা মিলিত হলেই সফলতা দৃশ্যমান হয়। এখানেই প্রগতিশীল রূপটার জায়গা। এই যে মিসর, গ্রিস, ভারত, আরব করে ইউরোপ পর্যন্ত চক্রাকারে উত্থান-পতন ঘটল, এর মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে মানুষের মধ্যেই। মানে ইতিহাস সামনে এগিয়েছে। এক সভ্যতার সূর্য যখন ডুবে যাচ্ছে, অন্য সভ্যতায় তখন সকাল। যারা যোগ্যতা ধরে রেখেছে, থেকেছে। যোগ্যতা হারিয়েছে, ডুবেছে।

সময়ের গোপন পরিচালকের নাম ধর্ম। কারণ ধর্ম পেছনে থেকে কিছু কাজ খুব ভালোমতো সামাল দেয়। ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক বানায়। হাতে ধরিয়ে দেয় একটা সাধারণ উদ্দেশ্য, যার ওপরে মানুষ একমত হয়। পাশাপাশি বিপুল মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে কেন্দ্রীভূত করে। একটা নৈতিক পাটাতন তৈরি করে সামনে যাওয়ার জন্য। এজন্যই প্রতিটা সভ্যতার মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য প্রথম ধাক্কাটা ধর্মই দেয়। মালেক বিন নবির কাছে ধর্ম তাই সভ্যতার রুহ। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রূপে হিন্দুধর্ম, আরব-পারসিকদের উত্থানে ইসলাম ও পশ্চিমাদের জয়যাত্রায় খ্রিস্টধর্ম সে রুহ হিসেবেই রয়েছে। যেকোনো সভ্যতার জাহিরি উন্নতির পেছনে এমন একটা বাতেনি সফর জড়িত। ইউরোপিয়ান এম্পায়ার সোজা হওয়ার অনেক আগেই ছড়িয়ে পড়ছিল খ্রিস্টধর্মের বাতাস। আরো গুছিয়ে বললে, যে যে অঞ্চলে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বাতাস গেছে, সে অঞ্চলকে বগলে নিয়েই মাথা উঁচু করছে ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্য। এ অংশে মালেক বিন নবি অনেকটা জার্মান দার্শনিক হেগেলের সুরেই কথা বলেছেন। তবে মালেক বিন নবির ভাষায়, সিফফিন যুদ্ধের পর মুসলিম সভ্যতার আত্মাও নৈতিকভাবে দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুসলমানদের বিদ্যমান দুরবস্থার জন্য কয়েকটি বিষয় আছে। প্রথমত তারা সভ্যতার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জায়গাটুকু হারিয়ে ফেলা। দ্বিতীয়ত 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা' বলতে তারা ইসলামকে না, বুঝতে চায় মুসলিম হওয়া মানেই পূর্ণাঙ্গ হওয়া। এটা তাদের চিন্তার দিক থেকে আড়ষ্টতা তৈরি করে। আর আড়ষ্টতা ও ভেতর থেকে আধমরা হয়ে থাকা মুসলিমরা হঠাৎ ঔপনিবেশিক শাসনে ডুবে গেছে হীনম্মন্যতায়। তারা নিজেদের যতটা না চিনেছে, তার চেয়ে বেশি চিনেছে কলোনিয়াল অধিপতিরা। ফলে ব্যবহার হয়েছে। তাদের চিন্তাধারা মৃত। কারণ প্রতিটি চিন্তারই কনটেক্সট থাকে। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় তাদের চিন্তা যেন কনটেক্সট খুঁজে পায় না, যেন মেয়াদোত্তীর্ণ। ফলে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাদের ঝুলি সমৃদ্ধ না। অথচ স্বর্ণযুগে মুসলমান সমাজে শিয়া, সুন্নি, মুতাজিলা, আশয়ারি, সুফি, কালামবিদদের মতো নানা রকম বৈচিত্র্য ছিল। দিনশেষে তাদের উপকারিতাও ছিল। প্রতিটা মতবাদই বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সমস্যাকে ব্যাখ্যা করার ভিন্ন পথ বাতলে দেয়। সামনে আনে একটা বিকল্প বুঝব্যবস্থা। তাতে চিন্তা দ্রুত মরতে পারে না। আত্মজিজ্ঞাসার পরিস্থিতি তৈরি হয়। মুতাজিলারা বুদ্ধিকে বড় পরিসরে প্রায়োগিক করে তুলছে, তাতে প্রতিক্রিয়া কিন্তু ছিল সুদূরপ্রসারি। মুতাজিলাদের বিরোধী হতে গিয়ে একটা বৌদ্ধিক ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে আশারিয়াদের মধ্যে। বর্তমান সময়ে যদিও সে সময়কার মুতাজিলা ও আশারীয় চিন্তা বা যুক্তির বড় অংশ অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এটা প্রাসঙ্গিক যে তাদের চিন্তায় বৈচিত্র্য ছিল। আল্লাহ কোথাও থাকেন নাকি স্থাননিরপেক্ষ এটা আজ আর কোনো প্রশ্ন না। প্রশ্ন হলো আল্লাহ থাকার পরেও মুসলমানরা হীনবল কেন?

ইসলাম আসার পর ছিন্নবিচ্ছিন্ন আরব উপদ্বীপ একত্র হলো। বিশ্ব জয় করার সব ক্ষমতা তাদের মধ্যে ছিল। শুধু ছিল না ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা। সেটাই পেয়েছে মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। রাসুলের ইচ্ছা মানে খোদার ইচ্ছা, আর মুসলমান মাত্রই খোদার ইচ্ছার কাছে বাঁধা। এই সেই ঐক্য। মুসলমানরা এখনো যথেষ্ট সৃষ্টিশীল ও কর্মতৎপর। কিন্তু তাতে ভারসাম্য নেই। অন্তত ২০০ বছর ধরে সেটাই প্রমাণ হচ্ছে। জামালউদ্দিন আফগানি পরবর্তী প্রতিটি ঘটনায়ই মুসলমানদের ছটফট দেখা গেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। সে পুরনো পানিতেই খাবি খাচ্ছে। মুসলমান সমাজে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে অনুকরণের অসুখ। এদিক থেকে মালেক বিন নবির চিন্তা ইবনে খালদুনের চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। খালদুন তার আল মুকাদ্দিমায় লিখেছেন, বিজিত জাতি বিজেতাকে অনুসরণ করে, কারণ বিজিত জাতির প্রতিরোধ শক্তি ফুরিয়ে যায়। প্রতিরোধের অস্ত্র চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এতখানি বাঁঝরা হয়ে যায়। সেটা দিয়ে বিজেতাকে মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না। বিজেতা এসে বিজিতের ঘাড়ে চেপে বসে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়। মুসলিম সমাজের এ অনুকরণের প্রধান কারণ নিজেদের মধ্যে কোনো রেনেসাঁ ঘটেনি। জামালউদ্দিন আফগানি বলেছিলেন ইসলামের মধ্যে রিফরমেশন দরকার। মালেক বিন নবি এ জাগরণ আনতে চান নৈতিক শক্তির উত্থানের ভেতর দিয়ে। কারণ তিনি মনে করেন মুসলিম উম্মাহর শক্তি হচ্ছে কুরআনি নৈতিকতা। এ নৈতিক শক্তি দিয়েই সে বরাবর জাহেলি শক্তিকে পর্যুদস্ত করে এসেছে। মুক্তি দিয়েছে জড়তা থেকে।

বিন নবি মনে করেন সভ্যতা কোনো কুড়িয়ে পাওয়া বা অনুকরণের বিষয় নয়। এমনকি এটা কোনো সংগ্রহশালাও নয়। এটি একটি নির্মাণের বিষয়। সুতরাং বাঁঝরা হয়ে যাওয়া ইসলামী সভ্যতার পুনর্নির্মাণ চান তিনি। বিন নবি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইসলামী শক্তির ভরকেন্দ্র আরব দুনিয়া থেকে একদিন এশিয়ায় চলে যাবে। সেখানেই নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটবে। সে সভ্যতার প্রাগ্রসর পুরুষ হিসেবে তিনি ইকবালকে চিহ্নিত করেছেন। বিন নবি আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। একটি হচ্ছে *The Quranic Phenomenon*, অন্যটির নাম *In the Whirlwind of the Battle*. প্রথমটিতে বিন নবি বলতে চেয়েছেন কুরআন অধ্যয়ন এবং ব্যাখ্যার চিরাচরিত ও ঐতিহ্যবাহী ধারাটি সংস্কার করা দরকার। কারণ আজকের মুসলিম তরুণরা পশ্চিমা শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে এক ধরনের বিশ্বাসের সংকটে ভুগতে শুরু করেছে এবং ইসলামকে বোঝার জন্য পশ্চিমা প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের ওপর ভর করছে। এ আত্মঘাতী ধারা থেকে তরুণদের ফিরিয়ে রাখতে হলে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন পদ্ধতি চালু করতে হবে। তিনি মনে করেন, যদি Astrophysics ও Archaeology-এর মতো আধুনিক প্রেক্ষাপট যুক্ত করা যায়, তাহলে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে। *In the Whirlwind of the Battle* বইটি লেখা হয়েছিল আলজেরীয় বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রাক্কালে। এতকাল বিন নবি মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসেবে যে চিন্তার জাগরণের কথা বলে আসছিলেন তার বাস্তব ও প্রয়োগিক দিকটি তিনি এখানে পর্যালোচনা করেছেন এবং সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাবনাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছেন।

মালিক বিন নবি এ সময় মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান-পতন, মুসলিম জগতের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পুনরুত্থান, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও আধিপত্যের মুখে মুসলমানদের আদর্শিক সংকট ও

এনসিসি রিটেইল লোন
এনসিসি ব্যাংক
আপনার সাথেই সবসময়

ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ভর্তি ফিতে ৫০% বিশেষ ছাড়

Eastern University

22 Years of Success in Quality Education

Permanent Certificate Holder

Male and Female Hostel

Free Bus Service

Up to 100% Scholarship or Tuition Fee Waiver

24 Active Clubs

Admission Helpline
01741300002
01844169651

Programs

Graduate
- MBA
- EMBA
- LL.M.
- M.A. in ELT
- M.A. in English Language & Literature
- MBA in Islamic Finance, Banking & Insurance

Summer 2025 Admission Going on

Undergraduate
- BBA - CSE - EEE - LL.B.
- English - Pharmacy
- Civil Engineering
- BBA in Islamic Finance, Banking & Insurance

Follow Us:

Ashulia Model Town, Birulia, Savar, Dhaka | www.easternuni.edu.bd

সম্ভাবনাকে পুনর্মূল্যায়ন করে আরো লেখালেখি করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন। তিনি বলতে চেয়েছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আগে দরকার আদর্শের ভিত প্রস্তুত করা। সদ্য স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোয় এ আদর্শিক সংগ্রাম সফল সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি। তিনি বরাবরই কোরআনে বর্ণিত সামাজিক সুবিচার ও ইনসাফের নীতিকে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এটা ছাড়া মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা কাটার সম্ভাবনা কম। পরাশক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু ক্ষমতার নয়, এর সঙ্গে আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাও রয়েছে। যুগযুগান্তরের মূল্যবোধকে অপসারণ করে নতুন মূল্যবোধ দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে এবং ফলে আসছে ভয়াবহ শূন্যতা। এ শূন্যতার পটভূমিতে মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিচ্ছে। সভ্যতা হারাচ্ছে তার ধর্ম। এভাবে মালিক বিন নবি আমৃত্যু সবরকমের চেতনাগত ও বস্তুগত দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। ১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন।

মুসলিম জাগরণ বলতে যেটাই বোঝানো হোক, তা যথেষ্ট জটিল। ঔপনিবেশিক শক্তির মোকাবেলায় মুসলিম সভ্যতা কয়েকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। একটা শ্রেণী স্বপ্ন দেখেছে পুনরুত্থানের। অর্থাৎ ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রত্যাবর্তনের। ফলে উত্থান ঘটেছে সালাফি মতবাদ। প্যান-ইসলামিক মুভমেন্টও এরই অন্তর্গত। এমন প্রতিক্রিয়ায় আসলে ইসলামের অদৃশ্য স্বর্ণযুগে ফেরার চেষ্টা করা হয়েছে; যা অসম্ভব। কারণ গত হাজার বছরের ইতিহাসে সভ্যতার গতিপথ আগের মতো নেই। তাছাড়া স্বর্ণযুগ ঠিক কোন সময়টুকু কিংবা স্বর্ণযুগের ঠিক কী কী অনুসরণীয়, সেটা নিয়েও দ্বিধা থাকে। এর বিপরীতে দ্বিতীয় দল চেয়েছে তাবৎ মুসলিম সমাজের আধুনিকায়ন। যেন উন্নত পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীর অনুকরণেই সার্বিক উন্নতি নিহিত। স্যার সৈয়দ আহমদ ও তার পরবর্তী আলিগড় আন্দোলনে এ প্রবণতা দেখা যায়। এটাও অসম্ভব। কারণ দিনশেষে মুসলিমদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি আছে, যা পাশ্চাত্যের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাবে না। এমনকি তাদের অবস্থাও এক না। পুনরুত্থান বা আধুনিকায়ন উভয় আন্দোলনের অসম্ভব দিকটা যখন বোধগম্য হতে শুরু করেছে, তখন হতাশ জাতি ঝুঁকেছে আরো দুই প্রবণতায়। প্রথমটা নৈরাজ্যপূর্ণ ধর্মীয় উগ্রবাদ কিংবা দ্বিতীয়টি দুনিয়াবিমুখ বৈরাগ্যবাদ। ফলে মোটাদাগে এ কথা বলা যায়, মুসলিম জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে আধুনিকতার মোকাবেলা কীভাবে করা হবে, তার সঠিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা সেভাবে প্রস্তুত হয়নি।

সভ্যতায় সৃষ্ট লুপ থেকে বের হওয়ার রাস্তা তৈরিতে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। মুসলিম বলতে কোন হোমোজেনাস সমাজ অবশিষ্ট নেই। মুসলিম পরিচয় অজস্র মতবাদ দ্বারা বিভাজিত। ফলে জাগরণের পথ তৈরিতে সিফফিন যুদ্ধের আগের ইসলামকে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তখন মুসলিম জাতির হাতে দুইটা বিষয় ছিল প্রথমত কোরআন ও দ্বিতীয়ত সত্যনিষ্ঠ আকল বা বুদ্ধি। অদ্ভুতভাবে বর্তমান সময়েও এ দুটি বিষয় পাওয়া সম্ভব। প্রথমত, মুসলিম মাত্রই বিশ্বাস করে কোরআন অবিকৃত অবস্থায় হাজির আছে। (সূরা হিজর, আয়াত-৯)। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি মানুষ খোদায়ি ফিতরাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। (সূরা রুম, আয়াত-৩০)। এজন্যই ইসলামে শিশুকে নিষ্পাপ জ্ঞান করা হয়। পরবর্তী সময়ে যা কলুষিত হয় সমাজ ও সংস্কৃতির কলুষতা দ্বারা। দুটি মৌলিক বিষয়ই যেহেতু এখনো মানুষের মধ্যে জারি রয়েছে; ফলে পুনর্জাগরণ চিন্তা এ দুটি থেকেই শুরু করতে হবে। একদিকে কোরআন ব্যবহার হবে সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিকে পরিণত করতে, অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধি ব্যবহার হবে কোরআনের নতুন মাত্রা আবিষ্কার করতে। এ আলাপ পুনরুত্থানের মতো হাজার বছর আগে ফিরে যাওয়ার কল্পনা না। বরং ইতিহাসের বাঁকে পরবর্তীকালে জন্ম নেয়া নানা কৃত্রিম কল্পনার হাত থেকে মুসলিম সভ্যতার রুহকে আলাদা করা।

প্রতিটি সভ্যতারই জিসমি (শরীরী) ও রুহানি (আত্মিক) দুইটা রূপ থাকে। সিফফিনের যুদ্ধ বা ফিতনার মাধ্যমেই পরবর্তী মুসলিম সভ্যতার রুহ ক্ষয়িষ্ণু রূপ নিয়েছে, যা আর মীমাংসা করা হয়নি বা করা যায়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার যতটুকু হয়েছে তা সে ক্ষয়িষ্ণু রুহের জোরেই। হালাকু খান বা কামাল পাশা সভ্যতার স্থবির মূর্তিটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছেন কেবল। তাতে বরং দৃশ্যমান হয়েছে শূন্যতাটুকু। যে শূন্যতা আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। একই অবস্থা ঔপনিবেশিক যুগে। তবে এক্ষেত্রে ইতিবাচক একটা দিককে চিহ্নিত করেছেন দার্শনিক বিন নবি। মুসলমানদের মধ্যে অন্তত এতটুকু সচেতনতা এসেছে যে তারা ভালো নেই।

প্রশ্ন হলো, রেনেসাঁর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কি মুসলিম জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে? জবাব হলো না। বরং জাত (সত্তা) ও সিফাতকে (গুণ) আলাদা করা হচ্ছে। মুসলিম সভ্যতার জাত হলো কোরআন ও বুদ্ধির সম্পর্ক। খোদার কালাম ও মানুষের বুঝের সম্পর্ক। বাদবাকি সামগ্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য হলো সিফাত। সিফাতকে প্রতি প্রজন্মেই যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সুস্থ সভ্যতার বৈশিষ্ট্যই থিসিস-সিন্থেসিসের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া। ফারাবি নিয়ে কথা তুললেন ইবনে সিনা, ইবনে সিনার দর্শনকে নাকচ করলেন ইমাম গাজালি, গাজালিকে নাকচ করে কলম ধরলেন ইবনে রুশদ। কিংবা ইবনে সিনাকে এগিয়ে নিলেন ইবনে তোফায়েল; আবার সেই ইবনে তোফায়েলকে নাকচ করলেন ইবনে নাফিস। এ ঐতিহ্য বা ধারাবাহিকতা মুসলমান সমাজ হারিয়ে ফেলেছে। পরবর্তী সময়ে তাদের চিন্তাকে না কেউ ক্রিটিক করতে গেছে, না পরিমার্জন পরিবর্ধন করতে চেয়েছে। যে কাজটা হয়েছে ইউরোপে।

ইউরোপ যেমন তাদের রুহানিয়াত ধরে রেখে স্বর্ণযুগের ইসলামী সভ্যতা থেকে উপকৃত হয়েছে, সেভাবে মুসলমান সভ্যতাও উপকৃত হতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস কেবল মুসলমানের ইতিহাস না। মানবজাতির ইতিহাস। মুসলিমরা একসময় পারসিক, ভারতীয় ও গ্রিক জ্ঞান জড়ো করেছে। সেটাই তুলে দিয়েছে আধুনিক ইউরোপের হাতে। সভ্যতার পরবর্তী ওয়ারিশ হতে গেলে সেটুকুকে নিয়েই পরবর্তী পথ এগিয়ে যেতে হবে। অযোগ্যের হাতে আল্লাহ নেতৃত্ব দেন না। তবে বাইরের চিন্তাধারাগুলোকে ক্ষুধার্ত ভোক্তার মতো না গিলে যাচাই-বাছাই করে উত্তমটুকুকেই নেয়া উচিত।

মুসলমানদের সেকট্যারিয়ান হওয়া নিয়ে দার্শনিক মুহম্মদ ইকবাল প্রায়ই আক্ষেপ করতেন। বিন নবির কাছে আদতে সেকট্যারিয়ান হওয়াটা বড় কোনো সমস্যা না। প্রতিটা মানুষের বেড়ে ওঠার ভিন্নতা তার ভেতরে ধর্ম সম্পর্কে বোঝাপড়ায় ভিন্নতা দেয়। বিশ্বাস বিষয়টাই বহুমাত্রিক। কেউ হয়তো খোদার আলিম নামের স্মরণে আবেগতাড়িত বেশি হন, কেউবা রহমান নামে। ফলে 'বিশ্বাসী' বলে জেনারেলাইজ করে ফেললেও বিশ্বাসীর কাফেলাকে কখনই হোমোজেনাস বানানো সম্ভব না। বিশ্বাস যেন এক প্রশস্ত বাগান। ব্যক্তি তার বুঝ অনুসারেই গাছ নির্বাচন করে ও সাজাতে চায়। যদি দ্বন্দ্ব থামিয়ে সহাবস্থান নিশ্চিত করা যায়, বিশ্বাসের বৈচিত্র্য মূলত সৌন্দর্যই।

মুসলিম সভ্যতার বর্তমান দেউলিয়াত্ব প্রমাণিত হয় ঘুরেফিরে সব আলোচনায় ফারাবি, রুশদ, ইমাম গাজালি বা ইবনে খালদুনের ফ্রেমে আটকে যাওয়ার মাধ্যমে। তারা কেউ পরিত্যক্ত নন। কিন্তু বর্তমানে যে ফারাবি বা রুশদের কথা কেবল গ্রহণ বা বর্জনের বিষয় হয়ে উঠছে, মালেক বিন নবির কাছে এটাই বিপজ্জনক। কারণ চিন্তার পরিমার্জন বা পরিবর্ধন না ঘটলে যুগের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রাখা অসম্ভব। আত্মা সম্পর্কে ইবনে সিনার অভিমত অনেক দিক দিয়েই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কে কে এগিয়ে নিয়েছে সে চিন্তাকে? এ শূন্যতার শেষ পরিণতি হতাশ প্রজন্ম। যারা অস্তিত্বের বিবেচনায় নির্বিচারে গিলতে থাকে পশ্চিমা প্রগতিবাদ। কিন্তু সেটাও কি আরেক ধরনের অনুকরণ নয়? মানুষ ভুল করে ও করবে। তার জন্য জারি থাকবে ফিরে আসার সুযোগ। তবে মানবজাতির জন্যই সে 'অরিজিনাল আইডিয়া'-এর পরিবর্ধন প্রয়োজন। প্রয়োজন নতুন মাত্রা আবিষ্কার করা।

মালেক বিন নবি সারাজীবন মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয়ের কারণ, বর্তমান সমস্যা ও মুক্তির পথ নিয়ে কাজ করেছেন। ইবনে খালদুনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যের বৌদ্ধিক চর্চার যে আলো থমকে গিয়েছিল, তাকে উসকে দিয়েছেন প্রাচ্য জ্ঞানতাত্ত্বিক বয়ানের ভেতরে থেকেই। এজন্য জামালউদ্দিন আফগানি, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও মুহম্মদ ইকবালের মতো তিনিও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। কারণ অগ্রগতির নানা রূপ থাকলেও অবক্ষয়ের রূপ প্রায়ই এক রকম। আলজেরিয়ার সমস্যা তাই পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশেরও সমস্যা, যা বিন নবিকে একই সঙ্গে স্থানিক ও বৈশ্বিক করে তোলে।

বিকাশ
বিকাশ-এ
দেখুন বিল
আসলো কতো
জমাও দিন
সময়মতো
পে বিল
প্রতি মাসের বিল দেখুন
বিকাশ অ্যাপে
বিল জমা দিয়ে পান
ডিজিটাল রিসিট
বিস্তারিত জানতে
স্ক্যান করুন
16247 | bkash.com

ইনফিনিটি : দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ, সফলতা ও সম্ভাবনার সঙ্গী

নাইমুল হক

ভাইস চেয়ারম্যান, ইনফিনিটি, রিচম্যান

পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে ফ্যাশন ব্র্যান্ডের বয়স বিভিন্ন। কোনো দেশে বয়স ২৫ বছর কিংবা কোনো দেশে বয়স ৪০ বছর। কোনো দেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি হয়তো ২০০ বছরের পুরনো। তবে ফ্যাশন হাউজের অগ্রগতি প্রায়ই বয়সের সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে যায়। যেমন ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'জারা'-এর বয়স ৩৫-৪০ বছর। অথচ এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি ব্র্যান্ড। বৈশ্বিক ফ্যাশন প্রবণতার তুলনায় বাংলাদেশে ফ্যাশন হাউজের যাত্রা শুরুটা অনেক পরে।

গোড়ার কথা

ফ্যাশন, ফ্যাশন সচেতনতা মানুষের মধ্যে ছিলই। তবে শিল্প খাত হিসেবে ফ্যাশন হাউজ বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে নব্বই দশকের পর। তার আগে 'আড়ং' থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা ছিল এনজিওভিত্তিক। 'আড়ং'-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের হস্তশিল্প ও দেশীয় পোশাককে শহরের সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। পরে ধীরে ধীরে তারা চলে এসেছে ফ্যাশন খাতে। ক্রমে আড়ংকে অনুসরণ করে মিরপুর রোডকেন্দ্রিক বেশকিছু বুটিক হাউজ আত্মপ্রকাশ করে। ২০০৪-০৫ সাল পর্যন্ত ওদিকে অনেক বুটিক হাউজ ছিল। অবশ্য এগুলো সীমাবদ্ধ ছিল ঐতিহ্যবাহী পণ্যতেই।

বৈশ্বিক ট্রেন্ডের বিষয়টি বাংলাদেশে এসেছে আরো পরে। আশি বা পঁচাশির দিকে 'মেনস ওয়্যার' নিয়ে ব্র্যান্ড আকারে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে 'ক্যাটস আই'। তাদেরই আরেকটা ব্র্যান্ড ছিল 'মুনসুন রেইন'। এর বাইরে তেমন কোনো ব্র্যান্ড তখন চোখে পড়েনি।

ইনফিনিটির যাত্রা শুরু যেভাবে

২০০৩ সালে যাত্রা শুরু করে ইনফিনিটি। এর আগে দুই বছর আমরা কিছু এক্সপোর্টের কাজ করি। ফ্যাশন হাউজের যাত্রা যখন শুরু হয় তখন আমি সদ্য স্নাতক। আমার এক বড় ভাই নাজমুল হক খান, মো. জোনায়েদ এবং আমি ছিলাম মূল উদ্যোক্তা। শুরুতে কিছু পণ্য দেশের বাইরে রফতানি করলাম। শুরুটা ছিল মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। চাইলে দেশের বাইরে ব্যবসা করার সুযোগ ছিল, তবু দেশকেন্দ্রিক কিছু কাজ করার কথা ভাবলাম। ভাবলাম ব্যবসার জন্য বিভিন্ন খাত নিয়ে। তখন দেশের ফ্যাশন খাত অতটা উন্নত না। আমরা দেখলাম পাশের দেশে আন্তর্জাতিক কোনো ব্র্যান্ড না থাকলেও বেশকিছু লোকাল ব্র্যান্ড আছে। সেই চিন্তা থেকেই যাত্রা শুরু। ব্র্যান্ডের নাম দিলাম 'লুবনান'। আমরা শুরু করেছিলাম নিজস্ব উৎপাদন দিয়েই।

'লুবনান' শুরু করার আগে লক্ষ করলাম ভারত থেকে দেশে প্রচুর পাঞ্জাবি আসে। সেগুলোর দামও অনেক। অথচ আমরা এ ধরনের পণ্য নিজেরা তৈরি করতে পারি। দেশে ভালো কাপড়ের সোর্স আছে। তারপর দেশীয় কাপড়ের এক্সক্লুসিভ পাঞ্জাবি তৈরি করি। শুরুতে দেশীয় কাপড়ের পাশাপাশি বাইরের কিছু ফেব্রিকস আমরা ব্যবহার করি, যেগুলো তখন দেশে তেমন ব্যবহার হতো না। আমাদের প্রথম শো রুম ছিল মেট্রো শপিংমলে। পরবর্তীতে রাইফেলস স্কয়ারে আরেকটা শোরুম নেয়া হয়। অল্প কিছুদিন পর আমরা বুঝতে পারি ব্র্যান্ড তৈরি করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য তৈরি করাই ভালো। তখন ছেলেদের পোশাকের তেমন

কোনো ব্র্যান্ড ছিল না দেশে। 'ক্যাটস আই'-এর অল্প কিছু ছেলেদের পোশাক ছাড়া বাকি দোকানগুলোয় বাইরের পোশাক বিক্রি হতো। তখন 'রিচম্যান' নামে একটি ব্র্যান্ড শুরু করলাম। 'রিচম্যান' নামটা দেয়ার কারণ যাতে মানুষ নিজেকে 'রিচ ফিল' করাতে পারে। অর্থাৎ 'রিচম্যানের' পণ্য গায়ে দিলে যেন নিজেকে ধনী মনে হয়। 'রিচম্যান' শুরু থেকেই নিজস্ব ডিজাইন এবং পোশাককে প্রাধান্য দিয়েছে। এটির প্রথম আউটলেট ছিল বসুন্ধরা সিটিতে। তখন আমরা 'লুবনানকে' সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেললাম।

এশিয়ার সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সবাই শাড়ি-পাঞ্জাবি আগ্রহ নিয়ে পরে। ফলে এটার একটা ব্র্যান্ড করা দরকার—এ চিন্তা থেকে 'লুবনানকে' আমরা পাঞ্জাবির ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলাম। 'লুবনানের' আগে দেশে পাঞ্জাবির একক কোনো ব্র্যান্ড ছিল না। বসুন্ধরাতেই আরো তিন-চারটা শোরুম নিলাম আমরা। পাশাপাশি আরো কয়েকটা 'রিচম্যানের' শোরুম ছিল।

তবে এসবের মধ্যেই আবার চিন্তা করলাম, তাহলে তো সালোয়ার কামিজ, শাড়ি, কিডস এগুলোরও তেমন কোনো ব্র্যান্ড নেই। কিডস পণ্য তখন ছিল প্রায় সবই চীনা এবং থাই। এখনো ঢাকা শহরে অসংখ্য চীনা এবং থাই পণ্য বিক্রি হয়। অথচ এসবের সোর্সও আমাদের দেশে আছে। তাই সবকিছু ভেবে আমরা তৃতীয় একটা ব্র্যান্ড শুরু করলাম—'ইনফিনিটি'। এটা আমরা শুরু করলাম ২০০৫ সালের দিকে। তখনকার সময়ে খুব সাহস করেই বড় ১২ হাজার স্কয়ার ফিটের ওপরে একটা আউটলেট করলাম।

নাইমুল হক

লুবনান এবং রিচম্যানের বাইরেও কেন ইনফিনিটি?

দেশের বাইরে অনেক জায়গায়ই 'শপ ইন দ্য শপ' আছে, যেখানে এক ছাদের নিচে ফ্যাশন-লাইফস্টাইলের সব পাওয়া যায়। এটা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই 'ইনফিনিটি' শুরু করি। পরে দেখলাম কনফিডেনশিয়াল কসমেটিকসেরও কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড নেই। বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলো কেনাকাটা করে মানুষ। তাই এখানে কসমেটিকসেরও সেকশন করলাম। যেহেতু এটা 'শপ ইন দ্য শপ' কনসেপ্টের আউটলেট, এখানে 'রিচম্যান', 'লুবনান', 'ইনফিনিটি' ব্র্যান্ডের শো রুমও রয়েছে। এছাড়া আরো কিছু ব্র্যান্ডকে আমরা এক ছাদের নিচে নিয়ে আসলাম। যেহেতু 'রিচম্যান' শুধু ম্যানস ওয়্যারের একটি ব্র্যান্ড, সেখানে অন্যকিছু রাখার সুযোগ থাকে না। অথচ আধুনিক লাইফস্টাইলের জন্য সুইম স্যুট, জিম স্যুট ও নাইট ড্রেসের মতো আরো অনেক কিছু দরকার। সবকিছুর জন্য তাই আলাদা একটা ব্র্যান্ড করা। যেহেতু ব্যবসার সুযোগ আছে এবং একটা ব্র্যান্ড ভালো করলে অন্যগুলোও ভালো করে—এ ভাবনা থেকেই 'ইনফিনিটি' করা। একই সঙ্গে যেকোনো উৎসবে মানুষের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার যে প্রবণতা সেটি কমাতেও 'ইনফিনিটির' যাত্রা চলমান। বর্তমানে 'লুবনান', 'রিচম্যান' ও 'ইনফিনিটি' মিলিয়ে দেশজুড়ে আমাদের দেড়শর বেশি আউটলেট আছে।

দেশীয় ফ্যাশন হাউজ ও ক্রেতাদের আগ্রহ

আমরা তো শুরু করলাম। এর অনেক পরে ইয়েলো ও সেইলরের মতো কিছু ব্র্যান্ড বাজারে আসে। তখন দেশে গার্মেন্টিস সেক্টরের বিশাল সোর্স ছিল। শুরুর দিকে তাই তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে যুক্ত আছে, এমন লোকজনই তখন অনেক ব্র্যান্ড তৈরি করেছিল। যখন দেখা গেল যে মানুষ দেশের বাইর থেকে দামি জামাকাপড় নিয়ে আসে, অথচ প্রায়ই সেগুলো 'মেইড ইন বাংলাদেশ', তখন মানুষ বুঝতে পারল চীন বা থাইল্যান্ডের পণ্যের চেয়ে বাংলাদেশের পণ্য কোনো অংশেই কম নয়। বরং এগুলোর গুণগত মান আরো বেশি। তখনই ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মানুষ ধীরে ধীরে দেশীয় ব্র্যান্ডগুলো থেকে কেনাকাটা শুরু করল। ২০১৫ সালে মধ্যে আরো অনেক ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হলো। মানুষ যখন বাইরে কেনাকাটা বন্ধ করল, তখনই দেশে অসংখ্য ফ্যাশন হাউজ গড়ে উঠল।

সফলতা ও সম্ভাবনা

বর্তমানে দেশের ফ্যাশন হাউজগুলো ঢাকাকেন্দ্রিক নয়। প্রতিটা জেলা, উপশহর থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রি ধীরে ধীরে উপজেলা পৌরসভা পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে। ব্র্যান্ড মালিকরা কিন্তু আউটলেট কেনেন না, ভাড়া নেন। এতে এসব অঞ্চলে মানুষের আয়ের নতুন উৎস তৈরি হচ্ছে, কর্মসংস্থান বাড়ছে।

বাইরেও দেশীয় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির সফলতা বিশাল। কারণ এখানে কম দামে ভালো পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। একটা সময় ঈদ এলেই ভালো পোশাক কেনার আশায় সবাই ভারতে চলে যেত। বিয়ে, গায়ে হলুদ যেকোনো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটত। এ কেনাকাটাগুলো এখন দেশেই হচ্ছে।

আগে লেহেঙ্গা কিনতেও ভারতে যেতে হতো ক্রেতাদের। এখন আমাদের দেশে লেহেঙ্গা তৈরি হয়। বেশকিছু ব্র্যান্ড ভালো লেহেঙ্গা তৈরি করছে। এতে দেশে উৎপাদন বাড়ছে, কর্মসংস্থান বাড়ছে, ডলার খরচ কমছে। সেসঙ্গে এ বড় ব্র্যান্ডগুলোকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ছোট প্রতিষ্ঠান দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটা বিশাল সফলতা।

গত আগস্ট থেকে ভারতের ভিসা সীমিত হওয়ায় আমরা দেশীয় ব্র্যান্ডগুলো কিছুটা লাভবান হয়েছি। কারণ যেহেতু কেনাকাটা করতে মানুষ যাচ্ছে না, সেহেতু আমাদের বিক্রি তুলনামূলক বেড়েছে।

আবার এত ব্র্যান্ড কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ শ্রীলঙ্কারই নিজস্ব তেমন ভালো কোনো ব্র্যান্ড নেই। মালয়েশিয়ায় স্থানীয় কিছু ব্র্যান্ড থাকলেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে তৈরি হওয়া কোনো ব্র্যান্ড নেই। এদিক থেকেও আমরা এগিয়ে। আমাদের দেশে যখন বিদেশ থেকে কেউ আসে, আমাদের ব্র্যান্ডগুলো থেকে কেনাকাটা করে নিয়ে যায়। কারণ এখানে কম দামে ভালো পণ্য পাওয়া যায়। এছাড়া আমরা অনলাইনে দেশের বাইরে পণ্য বিক্রি করছি। ইউরোপ-আমেরিকায় প্রতিদিন পণ্য যাচ্ছে। প্রবাসীরা বাইরে বসে আমাদের পণ্য কিনে দেশে তাদের আত্মীয়দের উপহার দিচ্ছেন। দেশের ক্রেতারাও বুঝে গেছে যে ভালো পণ্য কিনতে দেশের বাইরে যাওয়া জরুরি না। নিতান্ত শখ থেকে কেউ কেউ দেশের বাইরে গিয়ে কেনাকাটা করেন।

তবে আমাদের এখন অনেক নিজস্ব ব্র্যান্ড আছে, সেখানে ভালো পণ্যও তৈরি হচ্ছে কিন্তু তার পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে সেই ব্র্যান্ডগুলো কেন আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে না?

আসলে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন আমি যদি এখন ইউরোপ বা আমেরিকাতে দশটা ব্র্যান্ড করতে চাই, সেটা কঠিন হবে। কারণ এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন প্রক্রিয়া অনেক জটিল। আমাদের দেশ যেহেতু রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। এর ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নীতি হলো 'দেশে টাকা আসবে'। এখন কেউ কেউ হয়তো দুবাই বা মালয়েশিয়াতে একটা বা দুইটা আউটলেট করতে পারে কিন্তু সেটা সঠিক প্রক্রিয়ায় করা হয়নি এতটুক নিশ্চিত। আমরাও দেশের বাইরে আউটলেট করতে চেয়েছিলাম। পরে দেখা গেল আইনগতভাবে সেটা সম্ভব না।

এক্ষেত্রে সরকার আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। যেসব ব্র্যান্ড দেশে ভালো করছে তাদের দেশের বাইরে শাখা উদ্বোধনের জন্য ফান্ডের অনুমোদন দিতে পারে। ফান্ড প্রদানের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া যেতে পারে যার মধ্যে ফান্ডের টাকা ব্যবসায়ী রিটার্ন করে দেবেন। এটা করলে দেশর বাইরে ব্র্যান্ডগুলোর শাখা খুলে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

ঈদে ইনফিনিটির আয়োজন

ইনফিনিটির পণ্য মৌসুম এবং উৎসবকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়। আমাদের 'সামার' এবং 'উইনটার' দুই ধরনের পণ্যই আছে। তবে এবারের ঈদ যেহেতু গরমের মধ্যেই আসছে, বিষয়টিকে মাথায় রেখেই 'সামার'কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আশা করছি, ঈদকেন্দ্রিক বেচাকেনাও এবার ভালো যাবে। কারণ ভারতে গিয়ে কেনাকাটার সুযোগ এবার কম। তাই দেশে কেনাকাটার হার বাড়বে। ইনফিনিটিতে এবার দেশীয় ফেব্রিকসের পণ্য বেশি। অবশ্য শাড়ির ক্ষেত্রে আগেও তাই ছিল। আমাদের শাড়ি শতভাগ দেশীয়। বাংলাদেশ থেকে জামদানি, তাঁত ও টাঙ্গাইল শাড়ি ভারতে যাচ্ছে। ঈদকে কেন্দ্র করে তাই আমরা দেশীয় শাড়ির বিশাল কালেকশন রেখেছি। এছাড়া পাঞ্জাবি, শার্ট, বাচ্চাদের পোশাক—সবই থাকছে ঈদ আয়োজনে।

বিফ স্টেক

এটি মূলত রিব-আই স্টেক, যা নানা ধরনের সবজি, পটেটো ওয়েজেস ও ব্ল্যাক পেপার/মাশরুম সসের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। স্টেকটি ফ্রিজারে ১৫ দিন ও চিলারে ৩ দিন রাখা যেতে পারে।

উপকরণ

- বিফ স্টেক ১টি
- চটকানো আলু ১ সেট
- ব্ল্যাক পেপার/মাশরুম সস ১ সেট
- পটেটো ওয়েজেস ১০০ গ্রাম
- মিক্সড ভেজিটেবল ১৩৫ গ্রাম

প্রস্তুত ও পরিবেশন প্রণালি

- উষ্ণ স্টেকটির দুই পাশে লবণ ও মরিচ মাখাতে হবে।
- ঝলসানো স্টেকটি পরিবেশন করার উপযোগী।
- তাপমাত্রা থার্মোমিটারে মেপে নেয়া হয়।
- একটি চারকোনা থালায় চটকানো আলু ও পটেটো ওয়েজেসের সঙ্গে এটি পরিবেশন করা যায়।
- জুলিয়ান কাট করা পেঁয়াজ কলি ও গাজর দিয়ে গার্নিশ করা যেতে পারে।

Secret Recipe®

গ্রিক সালাদ

লেটুস, চেরি টমেটো, রেড অনিয়ন, কালো অলিভ, ফেতা চিজ এবং দইয়ের ড্রেসিং দিয়ে তৈরি হয় সিক্রেট রেসিপির গ্রিক সালাদ।

উপকরণ

আইসবার্গ লেটুস ৭০ গ্রাম, চেরি টমেটো ১৫ গ্রাম, সবুজ ক্যাপসিকাম ১৫ গ্রাম, পেঁয়াজ স্লাইস ১০টা, কালো অলিভ ১০ গ্রাম, ফেতা চিজ ২০ গ্রাম, শুকনা অরিগ্যানো।

প্রস্তুত প্রণালি

একটা রাইস বোলে লেটুস, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, দইয়ের ড্রেসিং, কালো অলিভ, চেরি টমেটো, ফেতা চিজ ও শুকনা অরিগ্যানো নিতে হবে। এরপর সাজিয়ে সার্ভ করতে হবে।

গ্রিক ইয়োগার্ট ড্রেসিং: দই, শুকনা অরিগ্যানো, সুন্দর করে কাটা রসুন, লেবুর রস, সাদা ভিনেগার, অলিভ অয়েল, লবণ, ব্ল্যাক পেপার পাউডার নিতে হবে। সবগুলো একটি বোলে নিয়ে ভালো করে মেশাতে হবে। চিলারে তিনদিনের মতো রাখতে হবে (এর বেশি না)। ৩০ গ্রাম নিয়ে সার্ভ করতে হবে।

ডাম্পলিং স্যুপ

থাই ধারার স্যুপ এটি। মসলাদার মুরগির মাংসের পুর দেয়া ডাম্পলিং দিয়ে এটি তৈরি হয়। -১৮ ডিগ্রি থেকে -২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখে ফ্রিজারে এক মাস সংরক্ষণ করা যায়।

উপকরণ

- পানি ৪০০ মিলিলিটার
- সিজনিং মিক্স ১ সেট
- ডাম্পলিং ১ সেট
- ভাজা রসুন ১ গ্রাম
- পেঁয়াজ কলি ১ গ্রাম
- লেবুর রস ১০ গ্রাম
- গুল্মজাতীয় অন্যান্য মসলা

প্রস্তুত ও পরিবেশন প্রণালি

- একটি সসপ্যানে পানি নিতে হবে।
- ফুটন্ত পানিতে ডাম্পলিংয়ের সঙ্গে গুল্মজাতীয় মসলাগুলো দিতে হবে।
- সিজনিং ও লেবুর রস দিয়ে পানির স্বাদ চেখে দেখতে হবে।
- পরিবেশন করার আগে ভাজা রসুন ও পেঁয়াজের কলি দিতে হবে।
- টম ইয়াম ধাঁচের পাত্রে সাধারণত স্যুপটি পরিবেশন করা হয়।

Secret Recipe®

চিকেন স্কিউয়ার্স

উপকরণ

ফেতা চিজ ৫০ গ্রাম, লাল রঙের ক্যাপসিকাম, সবুজ ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, কালো গোলমরিচের গুঁড়া, তাজা পার্সলে পাতা কুচি লবণ, স্টেক সস

প্রস্তুত প্রণালি

- ফ্রিজ থেকে মাংসগুলো নামিয়ে নিতে হবে।
- মুরগির রানের মাংসগুলো একটি ট্রেতে নিয়ে ১৫ মিনিটের জন্য ২৪০ ডিগ্রি টেম্পারেচারে ওভেনে দিতে হবে।
- কক্ষ তাপমাত্রায় মাংসগুলো এনে তারপর ফেতা চিজের সঙ্গে মিক্সড করতে হবে।
- স্কিউয়ার্সের কাঠিতে বাকি উপাদানগুলোর সঙ্গে পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম যুক্ত করতে হবে।
- স্কিউয়ার্সগুলোকে গ্রিল করতে হবে স্টেক সস দিয়ে অন্তত ৮-১০ মিনিটের জন্য।
- গ্রিলড করতে হবে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়ার আগ পর্যন্ত।
- স্কিউয়ার্স পরিবেশন করতে পারেন পটেটো ওয়েজেস ও কর্নের সঙ্গে।

লন্ডন ফিশ অ্যান্ড চিপস

উপকরণ

- টারটার সস ৩৫ গ্রাম
- টেম্পুরা ফিশ ২ পিস
- ক্রিঙ্কল কাট ফ্রাই ১০০ গ্রাম
- লাল বাঁধাকপি ২০ গ্রাম (পাতলা স্ট্রিপে কাটা)
- বেবি রোমেইন ২০ গ্রাম (বড় কিউবে কাটা)
- চেরি টমেটো ২০ গ্রাম
- লেমন প্লাম ড্রেসিং ১৫ গ্রাম
- ইয়েলো লেমন ওয়েজেস

প্রস্তুত প্রণালি

কাঁটাবিহীন মাছ লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে মেরিনেট করতে হবে। তারপর মিটব্রিডার প্রয়োগ করে সঙ্গে টেম্পুরা মিক্স যোগ করতে হবে। তারপর ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তেল গরম করে নিন। তেলে কোনো পুড়ে যাওয়া খাদ্যকণা থাকলে তা সরিয়ে নিন। গরম তেলে আলাদাভাবে কাঁটাবিহীন মাছ এবং ক্রিঙ্কল কাট ফ্রাইকে ৫ মিনিট ডিপ ফ্রাই করুন। তেল থেকে উঠিয়ে ক্রিঙ্কল কাট ফ্রাই ও ফিশ টারটার সস দিয়ে পরিবেশন করুন

সালাদের প্রস্তুত প্রণালি

- বেবি রোমেইন লেটুস বড় কিউবে কাটুন।
- লাল বাঁধাকপি স্ট্রিপ কেটে লেটুসের ওপরে রাখুন।
- ৩টি চেরি টমেটো অর্ধেক করে কাটুন এবং লেটুসের ওপরে রাখুন।
- লেমন প্লাম ড্রেসিং যোগ করুন

পরিবেশন : একটি প্লেটে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের সঙ্গে সালাদ, টারটার সস ও লেবুর টুকরো দিয়ে লন্ডন ফিশ অ্যান্ড চিপস পরিবেশন করুন।

Secret Recipe®

ল্যাম্ব শ্যাংক

উপকরণ

- ল্যাম্ব শ্যাংক
- ধনেপাতা

প্রস্তুত প্রণালি

ল্যাম্ব শ্যাংক মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ২-৩ মিনিট গরম করুন। একটি পোক থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে কিনা পরীক্ষা করুন। প্রয়োজন হলে আরো ১ মিনিট গরম করুন।

পরিবেশন : একটি টম ইয়াম বাটিতে রান্না করা ল্যাম্ব শ্যাংক নিয়ে তার ওপরে ধনেপাতা ছিটিয়ে দিন। তাজা মসলা দিয়ে ধীরে রান্না করা কোমল ল্যাম্ব শ্যাংক গোল্ডেন ক্রিস্পি পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

চিকেন কর্ডন ব্লু

হাড়বিহীন চিকেন চপ, চিকেন স্কয়ার ও চিজ দিয়ে তৈরি জনপ্রিয় রেসিপি চিকেন ব্লু। খাবারটি পরিবেশন করা হয় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও গার্ডেন সালাদের সঙ্গে।

উপকরণ

- চিকেন কর্ডন ব্লু ১ সেট
- ক্রিঙ্কল কাট ফ্রাই ১২৫ গ্রাম
- গার্ডেন সালাদ
- লাল বাঁধাকপি ২০ গ্রাম
- লেটুস ২০ গ্রাম
- টমেটো ২০ গ্রাম
- লেমন প্লাম ড্রেসিং ১৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালি

- প্রথমে চিলার থেকে বের করে নিতে হবে মাংস।
- মাইক্রোওয়েভের ভেতরে একটা নিরাপদ পাত্রে রাখতে হবে।
- ২ মিনিট মাইক্রোওয়েভে রাখলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আসবে।
- এবার মাইক্রোওয়েভ ওভেন থেকে বের করে নিয়ে ফ্রাই করতে হবে ২-৩ মিনিট। মাংসের গায়ে সোনালি দাগ পড়বে।
- তারপর ক্রিঙ্কল কাট ফ্রাই ও লবণ প্রয়োজনমতো দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

সালাদ

- বড় বড় কিউব করে লেটুস কেটে নিতে হবে।
- লেটুসের ওপরে রাখতে হবে লাল বাঁধাকপি
- ৩ পিস টমেটোকে অর্ধেক করে কাটতে হবে। তারপর সেগুলোকে রাখতে হবে লেটুসের মাথায়।
- সবার ওপরে দিতে হবে লেমন প্লাম ড্রেসিং
- সালদাকে রাখতে হবে চিকেনের পাশে।

Secret Recipe®

বিফ স্ট্রোগানফ

উপকরণ

- ফেটাচিনি পাস্তা (সেদ্ধ) ১৫০ গ্রাম
- রসুন চার গ্রাম
- অলিভ অয়েল পাঁচ গ্রাম
- কুচি করে কাটা পার্সলে এক গ্রাম
- লবণ এক গ্রাম
- গোলমরিচ এক গ্রাম

ম্যারিনেশন

হাড় ছাড়া বিফ ১ কেজি ১০০ গ্রাম, লবণ তিন গ্রাম, এলপি সস পাঁচ গ্রাম, সরিষা বাটা ১০ গ্রাম, গোলমরিচের গুঁড়া তিন গ্রাম, কাঁচা পেঁপে ২০ গ্রাম।

রান্নার জন্য : পেঁয়াজ ৬০ গ্রাম, মাশরুম ৪০০ গ্রাম, লবণ পাঁচ গ্রাম, অ্যারোম্যাট সিজনিং পাউডার ১০ গ্রাম, গোলমরিচের গুঁড়া পাঁচ গ্রাম, ব্রাউন সস পাউডার ৩০ গ্রাম, পানি ২৫০ গ্রাম, কুকিং ক্রিম ৩০ গ্রাম, অলিভ ওয়েল ৬০ গ্রাম, প্লাস্টিকের ব্যাগ নয় পিস।

প্রস্তুত প্রণালি

ফ্রাইপ্যান পর্যাপ্ত গরম হওয়ার পর সেখানে অলিভ অয়েল ও রসুন দিতে হবে। গরমে তা সোনালি রঙ ধারণ করলে সেখানে মেশাতে হবে ফেটাচিনি পাস্তা। দ্রুত নাড়তে হবে। অ্যারোম্যাট সিজনিং পাউডার মিশিয়ে ফের নাড়তে হবে। তারপর পাস্তাকে চপস্টিক দিয়ে ঠিকমতো বসিয়ে প্লেটের একপাশে রাখতে হবে। অন্যপাশে থাকবে বিফ স্ট্রোগানফ। পাশাপাশি বসিয়ে মাইক্রোওয়েভ বা প্যানে তিন-চার মিনিট গরম করে নিতে হবে। সেখানে মরিচ, পেঁয়াজ কুচি ও ধনে পাতা দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।

রংপুরের ঐতিহ্যবাহী ‘শোলকা’

এস এম পিয়াল

এক মাস সিয়াম সাধনার পর সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ঈদুল ফিতরের জন্য। এ ঈদকে ঘিরে সকল শ্রেণীর পরিবারের মানুষের মাঝে ঘটবে মহামিলন। দূর-দূরান্তের আত্মীয়-স্বজন দিয়ে ভরে উঠবে সকলের বাসা। অনেকেই এই সময়টাকে আরো মধুময় করার জন্য অনেক আয়োজনের মধ্যে থাকবে নানা পদের রান্না। দামি রান্নার ভিড়ে তুলনামূলক কম দামের রংপুরের ঐতিহ্যবাহী খাবার ‘শোলকা’ হতে পারে স্বাদে ও পুষ্টিতে অতুলনীয়।

মূলত খাবার সোডা দিয়ে কচু শাক, পাট শাকসহ পাঁচটি থেকে সাতটি শাকের সমন্বয়ে রান্না করা এক ধরনের খাবার ‘শোলকা’। পেঁয়াজ এবং কোনো প্রকার তেল ছাড়াই জনপ্রিয় এ খাবার রংপুরের মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ, পীরগাছা, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়াসহ আশপাশের কিছু এলাকায় রংপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা বসবাসের সুবাদে সুস্বাদু খাবার হিসেবে শোলকা রান্না হয়।

রংপুরের বিভিন্ন উপজেলার রান্নার উপকরণের ভিন্নতার কারণেও শোলকার কিছুটা ভিন্নতা পাওয়া যায়। তবে সব ধরনের শোলকা খেতে বেশ সুস্বাদু হয়। কোনো কোনো শোলকায় উপকরণ হিসেবে পাট শাক বেশি ব্যবহার করেন আবার কোথাও কচু শাক বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। এই শাকের পাশাপাশি আরো লাউ শাকের পাতা, কুমড়া শাকের পাতা, পুঁই শাকের পাতা, কচুর পাতা, সজনে ডাঁটার পাতা, নাপা শাকের পাতা, ডাঁটা শাকের মতো আরো পাঁচ-সাত ধরনের শাক ব্যবহার হয়।

শোলকা রান্নার প্রধান উপকরণ শাকের পাতা কাটার ধরনটাও একটু ভিন্ন। শাকের পাতা গুছিয়ে গুছিয়ে মুঠোভর্তি করে নিয়ে কুচি কুচি করে কাটতে হয়। শোলকা সাধারণত পিচ্ছিল হয়ে থাকে। তাই খাওয়ার সোডা ছাড়া রান্না করলে শোলকাই হবে না বলে জানিয়েছেন অভিজ্ঞ শোলকা রন্ধনকারীরা। তারা বলেন, শোলকাকে পিচ্ছিল করার জন্য প্রায় এক চামচ খাবার সোডা দেয়া হয়। প্রথমে একটু পানি গরম করতে করতে সেখানে পরিমাণমতো লবণ, কাঁচামরিচ, রসুন ও সোডা দিয়ে নেড়ে কেটে রাখা পাট শাক দিতে হয়। অল্প একটু আদা কুচি। ১০-১৫ মিনিট হালকা আঁচে নাড়তে হয়। এভাবে রান্না করা প্রিয় শোলকা।

মজাদার এই শোলকা রান্না করতে কোনো হলুদ, পেঁয়াজ, তেল ব্যবহার হয় না। তবে শোলকার মধ্যে কাঁঠালের বিচি দিলে এর স্বাদ আরো অসাধারণ হয় বলেও জানান অনেকে।

বগুড়ার আলু ঘাঁটি, দই ও কটকটি

এইচ আলিম

দেশের চৌষট্টি জেলার রয়েছে নিজস্ব খাবার এবং এই খাবার স্বাদে বেশ জনপ্রিয়। তেমনি বগুড়া জেলায়ও রয়েছে স্বাদের ও জনপ্রিয় বেশকিছু খাবার। বিশেষ করে দুই ঈদকে ঘিরে বাড়তি আয়োজন থাকে। এর সঙ্গে নানা উৎসবে বা বিশেষ দিবসেও থাকে ভিন্ন খাবারের আয়োজন। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে দই, কটকটি, আলু ঘাঁটি, সাদা সেমাই, লাচ্ছা সেমাই, আলু, লাল মরিচসহ রয়েছে হরেক রকমের মিষ্টির সমাহার।

আলু ঘাঁটি এবং আঠালো আলুর ভর্তা

বগুড়ার আলু ঘাঁটি আরো একটি জনপ্রিয় ও স্বাদের খাবার। সমাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় খাবারের মধ্যে বগুড়া মাংস আলু ঘাঁটিও এখন বেশ সুনাম কুড়িয়ে যাচ্ছে। মূলত আলু ঘাঁটি নাম হলেও রয়েছে নিজেদের পছন্দের মাংসের ব্যবহার। আর মাংস দিয়ে আলু ঘাঁটি রান্নার কৌশলের কারণেই দেশের মধ্যে এখন আলু জনপ্রিয় খাবার।

দেশের প্রতিটি এলাকায় আলু চাষ হলেও বগুড়ায় সবচেয়ে বেশি আলু চাষ হয়। কৃষি তথ্যমতে, বগুড়াসহ উত্তরের জেলায় মধ্য কার্তিক থেকে (নভেম্বরে প্রথম সপ্তাহ) চাষ হয়। আবার দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নভেম্বরের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ চাষাবাদ করার উপযুক্ত সময় থাকে। স্বাভাবিক শীতে আলুর ফলন বেশি হয়ে থাকে। আলুর বিভিন্ন নাম থাকলেও পাকরি জাতের আলু বেশি চাষ হয়। এর সঙ্গে কাটিলাল নামের এক ধরনের আলু আছে, যা ছানা বা ভর্তা হিসেবে জনপ্রিয়। এই আলুর ভর্তা হয়ে থাকে আঠালো এবং বেশ সুস্বাদু। অতীতকাল থেকে চাষীরা নিজ-নিজ বাড়িতে নতুন আলুর ঘাঁটি করেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে এই আলু ঘাঁটি তৃপ্তিসহকারে খেতেন। পর্যায়ক্রমে আলু ঘাঁটির স্বাদ অতুলনীয় হওয়ার কারণে এ আলু ঘাঁটির তরকারি পুরো জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। নতুন ও পুরনো আলু দিয়ে আলু ঘাঁটি হয়ে থাকে। আলু ঘাঁটির সঙ্গে কেউ মাছ, কেউ মাংস, কেউ বা ডিম দিয়ে থাকেন। তবে এর মধ্যে মাংস দিয়ে আলু ঘাঁটির স্বাদ সবচেয়ে বেশি। অতিথি আপ্যায়নে, পিকনিক, মজলিসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বাদের তরকারি হিসেবে আলু ঘাঁটির বেশ প্রচলন রয়েছে বগুড়ায়। আলু ঘাঁটি রান্নাটাও সহজ। প্রথমে আলু ভালো করে সেদ্ধ করে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে ভেঙে নিতে হবে। ভাঙা আলুর মধ্যে কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে রাখতে হবে। এরপর মাংস

হলে তা প্রথমে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হলে পানি মেশানো ভাঙা আলু ঢেলে দিয়ে রান্না করে নিতে হবে। রান্নার এক পর্যায়ে ঝাল, লবণ ও অন্যান্য মসলার পরিমাণ চেখে নিতে হবে। কয়েকটা বলক দিয়ে আলু ঘাঁটি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করতে হয়।

দই

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ডাকঘর নাটকে বলা হয়েছে—দই, দই; ভালো দই! এমন হাঁক শুনে নাটকের অমল চরিত্র দইওয়ালাকে তিনবার ডেকেছিল দইওয়ালা, দইওয়ালা ও দইওয়ালা! অমল দইওয়ালার কাছ থেকে দই কিনতে না পারলেও দইওয়ালার সঙ্গে চলে যেতে চেয়েছিল। অমলের দূর থেকে দইওয়ালার হাঁক মধুর লেগেছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘরের সেই মধুর স্মৃতি দেখা যায় বগুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। ভাঁড়ে করে কতশত দইওয়ালা দই বিক্রি করে চলেছেন। আর দইকে করেছেন জনপ্রিয়। বগুড়ার দই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবারের মধ্যে একটি।

বগুড়ার কথা উঠলে মহাস্থানগড় আর বগুড়ায় এসে খাবারের কথা উঠলেই দই। কোনো বিকল্প নেই। দইয়ের স্বাদ না নিয়ে বগুড়া ছাড়া খুব কষ্টসাধ্য বিষয়। প্রিয়জন বা অতিথি আপ্যায়নে বগুড়ার দইয়ের জুড়ি নেই। বগুড়ার কোনো ভোজ উৎসবের তালিকায় দই নেই এমন কেউই ভাবতে চান না। হোক সে অতি দরিদ্র কিংবা শহরের অতি বিলাসী পরিবার। অতিথি আপ্যায়নে কিংবা প্রিয়জনের মন ভোলাতে বগুড়ার দইয়ের দ্বিতীয় কোনো ব্যবস্থা হয় না। বগুড়ার দই দিনদিন হয়ে উঠেছে আত্মীয়তার সেতুবন্ধ। শুধু দইকে কেন্দ্র করেই বগুড়া পেয়েছে নতুন পরিচিতি। স্বাদে অতুলনীয় হওয়ায় দই এখন দিনদিন আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও চলে যাচ্ছে বিদেশেও।

বগুড়ায় প্রধানত দুই ধরনের দই তৈরি হয়। একটি মিষ্টি ও অন্যটি সাদা বা টক দই। ৩৫০ টাকার মধ্যে বগুড়ায় এক হাঁড়ি বা এক সরা ভালো মানের দই পাওয়া যাবে। বাজারে কিছু কম দামের দই থাকলেও সেটিতে স্বাদের হেরফের থাকতে পারে। বগুড়া জেলায় প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকার দই বিক্রি হয়। ব্যবসায়ীরা দইয়ের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন—নবাবি, শাহি, শাহি স্পেশাল, স্পেশাল, মোগল, মিষ্টি দই, কম মিষ্টি, ডায়াবেটিস দই, টক দই, সাদা দই। বগুড়া জেলাজুড়ে রয়েছে হরেক নামের দইয়ের দোকানও।

কটকটি

বগুড়ার আরো একটি জনপ্রিয় খাবারের নাম কটকটি। নামটার মধ্যেই যেন একটি শক্ত ভাব থেকে গেছে। অথচ খাবারটি শত বছর ধরেই বগুড়ার মহাস্থানগড়ে ও শহরে বিক্রি হয়ে আসছে। মহাস্থানগড়ের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে সমৃদ্ধ হয়েছে কটকটি। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে শিবগঞ্জ উপজেলার পাশে অবস্থিত পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন, যা পর্যায়ক্রমে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত হয়েছে। মহাস্থানগড়ে হজরত শাহ সুলতান বল্‌খী মাহীসওয়ার (র.)-এর মাজার এলাকায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থকে প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের আগমন ঘটত। আবার মহাস্থানগড় ভ্রমণে আসতেন শত শত দেশী-বিদেশী দর্শনার্থী। মহাস্থানগড়ের পর্যটকদের কাছে মিষ্টান্ন হিসেবে কটকটি খাবার বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। মুখরোচক, লোভনীয় খাবার হিসেবে কটকটি অনেক জনপ্রিয় খাবার। কটকটির কারিগরদের সঙ্গে কথা বললে জানান, প্রথমে চাল গুঁড়ো করে আটা তৈরি করতে হয়। চালের আটার খামির করে চতুর্ভুজ আকারের ছোট ছোট টুকরা করে তা তেলে ভেজে নিতে হয়। পরে অন্যান্য মসলার সাথে মেখে নিয়ে জ্বাল দেয়া গরম গুড়ের মধ্যে ভিজিয়ে নিতে হয়। তারপর কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে তা বাজারজাত করা হয়।

সাতকরা গরুর মাংস সিলেটের ঐতিহ্য

আহমদ আফরোজ

সিলেটের মানুষের কাছে সাতকরা দিয়ে গরুর মাংস একটি পছন্দের পদ। এ অঞ্চলে অতিথি আপ্যায়নে সাতকরার সুনাম বহুকালের। সিলেটে ঘুরতে আসা পর্যটকরা এ খাবারের স্বাদ একবার হলেও নিতে চান এজন্য সিলেট, মৌলভীবাজারের অনেক রেস্টুরেন্টে ইদানীং বিশেষ পদ হিসেবে খাবারটি রাখা হয়। স্থানীয় অনেক রেস্টুরেন্টের নাম পর্যন্ত রাখা হয়েছে 'সাতকরা'। অনেকের মতে, সাতকরা ভারতের আসামের পাহাড়ি অঞ্চলের আদি ফল। আঠারো শতকের শুরুর দিকে এর চাষ শুরু হয় সেখানে। এটি উত্তর-পূর্ব অঞ্চল মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর রাজ্যে জন্মায়। সিলেটের জৈন্তাপুর, বিয়ানীবাজার, গোয়াইনঘাট, জাফলং, মৌলভীবাজারের জুড়ী, বড়লেখা ও শ্রীমঙ্গল ছাড়াও সিলেট বিভাগের পাহাড়ি টিলায় সাতকরার চাষ হয়।

গরুর মাংসের সঙ্গে সাতকরার রন্ধনশৈলী

এক কেজি গরুর মাংসের সঙ্গে টুকরো করা একটি সাতকরা। পেঁয়াজ কুচি ২ কাপ। পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ। রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ। আদা বাটা ২ টেবিল চামচ। হলুদ আধা চা চামচ। মরিচ ২ চা চামচ। ধনিয়া ১ চা চামচ। গরম মশলা গুঁড়া ২ চা চামচ। জিরা বাটা ১ চা চামচ। তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি কয়েক টুকরো। লবণ স্বাদমতো এবং তেল আধা কাপ।

প্রণালি

প্রথমে সাতকরা ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। গরুর মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরাতে হবে। এরপর হাঁড়ি গরম করে তেল দিন। গরম তেলে তেজপাতা, লবঙ্গ ও দারুচিনি কিছুক্ষণ ভেজে পেঁয়াজ কুচি দিতে হবে। পেঁয়াজ ভাজা হলে একে একে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া, জিরা বাটা দিয়ে অল্প পানি দিয়ে মসলা কষিয়ে নিন।

সময় নিয়ে মসলা কষাতে হবে। এরপর মাংস দিয়ে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিন আরো ২০ মিনিট। এরপর সাতকরার টুকরো কষানো মাংসতে দিন। এক কাপ গরম পানি দিয়ে কম আঁচে রান্না করুন আরো ৪০ মিনিট। ৪০ মিনিট রান্না করার পর মাংস নরম হয়েছে কিনা দেখুন। তেল ওপরে উঠে এলেই বুঝবেন রান্না হয়েছে।

ঈদে চাই মতলবের ঐতিহ্যবাহী ক্ষীর

শেখ মহিউদ্দিন রাসেল

চাঁদপুরের মতলবের ক্ষীর, না খেয়ে কেমনে রই। চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার সুস্বাদু ক্ষীর সম্পর্কে এ প্রবচন স্থানীয় ভোজনরসিক লোকজনের মুখে মুখে। ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি মতলবের ক্ষীর দেশ ও বিদেশে প্রায় সমানভাবে সমাদৃত, যা বিদেশেও রফতানি হয়। ব্রিটিশ আমলে জমিদার ও ইংরেজদের খাবারের তালিকায় ক্ষীর থাকত। এবার এ ঈদে খাবার টেবিলে চাই মতলবের এ ঐতিহ্যবাহী ক্ষীর। ঈদ স্বাদ, ঘ্রাণ, রঙ, ঐতিহ্য ও খাদ্যগুণের কারণে এ ক্ষীর স্থানীয় বাসিন্দা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষের কাছে আজও জনপ্রিয়।

স্থানীয় লোকজনের চাহিদা মিটিয়ে এ ক্ষীর বিক্রি হচ্ছে বিদেশেও। সারা বছর প্রবাসী বাঙালিরা ফরমাশ (অর্ডার) করে মতলব থেকে এ ক্ষীর কিনে নিচ্ছেন। সম্প্রতি জেলার ব্র্যান্ডিং তথা ঐতিহ্যের তালিকায় এ খাদ্যকে তালিকাভুক্ত করেছে জেলা প্রশাসন।

চাঁদপুরের সব উপজেলা ও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার লোকজন তো বটেই, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রবাসী অনেক বাংলাদেশী এ ক্ষীর অর্ডার দিয়ে কিনছেন।

সুস্বাদু ক্ষীর সম্পর্কে এ প্রবচন স্থানীয় ভোজনরসিক লোকজনের মুখে মুখে। স্থানীয় লোকজনের চাহিদা মিটিয়ে এ ক্ষীর বিক্রি হচ্ছে বিদেশেও।

মতলব উপজেলা সদর বাজারের ঘোষপট্টি এলাকার 'লক্ষ্মী-নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এর মালিক সজল ঘোষ জানান, ব্রিটিশ আমলে উপজেলার ঘোষপাড়া এলাকার প্রয়াত শশী ঘোষ, প্রভাত ঘোষ, বেণী ঘোষ ও গান্ধী ঘোষ এ ক্ষীর তৈরি করতেন। তারা মারা যাওয়ার পর তাদের বংশধররা এ ব্যবসা চালু রেখেছেন। প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ মণ ক্ষীর বিক্রি হচ্ছে। প্রতি কেজি ক্ষীর বানাতে খরচ পড়ে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা। বিক্রি হয় ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকায়।

চাঁদপুরের সব উপজেলা ও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার লোকজন তো বটেই, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকাপ্রবাসী অনেক বাংলাদেশী এ ক্ষীর অর্ডার দিয়ে কিনছেন।

খামার থেকে দেশী গরুর দুধ সংগ্রহ করার পর তা গরম করে এতে সামান্য পরিমাণ চিনি ঢেলে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণে প্রতিদিন বানানো হচ্ছে সুস্বাদু ক্ষীর।

গাজীপুরের নকশি পিঠা

মো. হাজিনুর রহমান শাহীন

গাজীপুরের ঐতিহ্যবাহী নকশি পিঠা, যা শুধু একটি খাবার নয়, বরং শহর ও গ্রামের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক সময় বিশেষ করে ঈদ, পার্বণ কিংবা যেকোনো আনন্দঘন মুহূর্তে নকশি পিঠা ছিল অতিথি আপ্যায়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ পিঠা শুধু মিষ্টি আর সুস্বাদু নয়, এর মধ্যে রয়েছে শত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কষ্ট, শ্রম আর ভালোবাসা।

নকশি পিঠার মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর নকশা। হাতে তৈরি এসব পিঠার মধ্যে বিভিন্ন নকশা আর সৃজনশীলতার ছোঁয়া থাকে। গ্রামের মহিলারা তাদের নিপুণ হাতের স্পর্শ দিয়ে বিশেষ ধরনের কাঁটার সাহায্যে সুন্দর নকশা তৈরি করেন। পিঠা তৈরি করার সময় তারা শুধু খাবার নয়, বরং শিল্প রচনা করেন। একেকটি পিঠার মধ্যে যেন একেকটি গল্প লুকিয়ে থাকে। তাদের কল্পনা আর মেধা দিয়ে তৈরি হয় নকশি পিঠার আকৃতি, যা অতিথিদের মুগ্ধ করে।

অবসর সময়ে বেশ কয়েকজন মহিলা একসঙ্গে বসে বাড়ির আঙিনায় বা বারান্দায় কিংবা কোনো খোলা জায়গায় মাদুর পেতে বাঁশের তৈরি ডালার মধ্যে কলাপাতা বিছিয়ে খেজুর কাঁটা বা বাঁশ দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের কাঁটার সাহায্যে তৈরি করেন এ পিঠা। পিঠায় সাধারণত চালের গুঁড়া, সামান্য রঙ ব্যবহার করা হয়। হালকা শক্ত ও পুরো ডো তৈরি করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা নকশা তৈরি করে পিঠা বানানো হয়।

তবে শুধু পিঠা তৈরিই নয়, গাজীপুরের মানুষের হৃদয়ে নকশি পিঠার জায়গা এত গভীর যে, এটি শহর ও গ্রামের মধ্যে সম্পর্কের একটি সুগন্ধি সেতুবন্ধ সৃষ্টি করে। পিঠা তৈরি করে মহিলারা একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। পিঠার মতোই তাদের সম্পর্কগুলোও গাঢ় আর মধুর হয়ে ওঠে।

রাজবাড়ীর ক্ষীর চমচম সুবাস ছড়াচ্ছে বিদেশেও

মেহেদী হাসান

মিষ্টি খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। আর সেটা যদি হয় রাজবাড়ীর ক্ষীর চমচম তাহলে তো কথাই নেই। যার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও। ব্যবসায়ীরা বলছেন গরুর খাঁটি দুধের ছানা ও মাওয়ার কারণে রাজবাড়ীর চমচম বিখ্যাত। ক্রেতারা বলছেন সুস্বাদু হওয়ায় এ চমচম দেশ-বিদেশে চাহিদা বেড়েছে।

জানা গেছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিষ্টির চাহিদা থাকায় ১৯৬৩ সালে নির্মল সাহা ওরফে ভাদু সাহা রাজবাড়ী বাজারে গড়ে তোলেন নির্মল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। যেখানে গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা খাঁটি গরুর দুধ দিয়ে ভেতরে রসালো আর ওপরে ক্ষীর ও মেওয়া থেকে তৈরি হয় ক্ষীর চমচম। খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু হওয়ায় দিন দিন বাড়তে থাকে রাজবাড়ীর চমচমের চাহিদা। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তৈরি হতে থাকে নতুন নতুন মিষ্টির দোকান। বর্তমানে রাজবাড়ীর নির্মল মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, হোসেন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, জিকে সুইটস ও মিষ্টি বাড়ির চমচম স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে পাঠানো হচ্ছে বিদেশে।

জেলা শহরের বিভিন্ন মিষ্টির কারখানা ও দোকান ঘুরে গেছে, প্রতিটি দোকানে সাজানো রয়েছে বিখ্যাত ক্ষীর চমচমসহ নানান ধরনের রসালো মিষ্টি। সেখানে ক্ষীর চমচম বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকা কেজি দরে, রসগোল্লা ৩৫০, রাজভোগ রড় ও মাঝারি ৩২০ টাকা কেজি, কালোজাম, মনতোয়া, মনচোরা, ছানার জিলাপি ৩৫০ টাকা কেজি, রসমালাই, মালাইকারি ৫৫০ টাকা, সরমালাই ৬৫০ টাকা, বরফি সন্দেশ, গুড়ের সন্দেশ ৬০০ টাকা, ছানার পোলাও, স্পঞ্জভোগ, কমলাভোগ ৬০০ টাকা কেজিতে। আছে কয়েক ধরনের ঘি ও দই।

LUBNAN®
ETHNIC WEAR

Trust Bank PLC.
A Bank for Financial Inclusion

Trust Money
Trust Bank এর একটি অনন্য সেবা

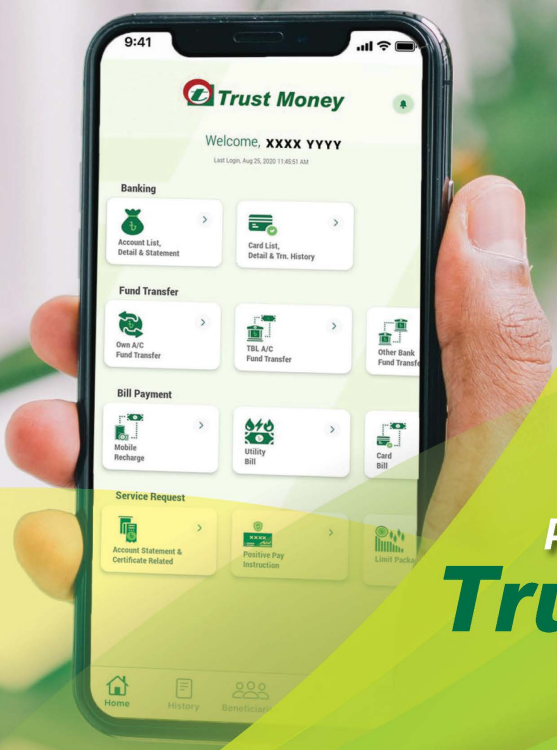

Ease of life

REGISTER NOW @ Trust Money

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

09612316201
app.support@tblbd.com

Major Features

- Fund Transfer
- Credit Card Bill Payment
- Account Information
- Utility Bill Payment
- Mobile Top-up (All Telco)

And many more...!

www.tblbd.com

TrustBankLtdBD

16201

হেপাটাইটিস-বি কে ‘না’ বলুন ভ্যাকসিন নিন

হেপাটাইটিস-বি, লিভার ক্যান্সার বা সিরোসিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।
যে কেউ হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

Hepa-B®

Hepatitis B vaccine (rDNA) BP

ভ্যাকসিন নিন, হেপাটাইটিস-বি থেকে সুরক্ষিত থাকুন

Incepta

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.inceptavaccine.com

- ঔষধ ক্রয়ের সময় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে নিন, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ক্রয়, বিক্রয় ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক এন্টিবায়োটিক ক্রয় ও সেবন করুন।

NASIR FLOAT GLASS

Light up your space

আমাদের চ্যালেঞ্জ

বাজারের সবচেয়ে স্বচ্ছ ফ্লোট গ্লাস

EXPERIENCE 700 PPM FLOAT GLASS

দেশের সর্ববৃহৎ হাইটেক ফ্লোট গ্লাস মেগা ফ্যাক্টরি

Nasir Float Glass Industries Ltd.

www.nasirfloatglass.com

facebook/NFGIL

Hotline

+88019 666 56 888

+88019 666 52 555

For Processed & Tempered Glass